উৎসর্গ।

দানশীল, বিদ্যোৎসাহী, ভ্রমণ-প্রিয়

ময়মনসিংহ কালীপুরের প্রখ্যাতনামা

ভূম্যধিকারী

স্বর্গীয় পিতৃদেব

তারিণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

মহাশয়ের পবিত্র নাম-স্মরণে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা।

অতি শৈশব হইতেই আমার হৃদয়ে ভ্রমণ-স্পৃহা জাগরিত হয়। আমার প্রথম ভ্রমণ স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত ৺কাশীধাম দর্শন, সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় যাতায়াত এত সুগম ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে লাইনের (E. B. S. R.) শেষ ষ্টেসন ছিল তখন কুষ্টিয়া,—ওদিকে আবার ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্তও রেলওয়ে হয় নাই, কাজেই এতটা পথ নৌকাযোগে আসিতে হইত। এখন যেমন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে কোনওরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না—তখন সেরূপ ছিলনা;—আমরা ময়মনসিংহ হইতে নৌকাযোগে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মা, গৌরাই প্রভৃতি নদী বাহিয়া আসিয়া কুষ্টিয়া পহুছিতাম। নৌকাযোগে যাতায়াত এখন একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, ঐরূপ ভ্রমণে যে কতখানি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগ এবং দর্শন-কুতূহল চরিতার্থ হয়, তাহা এখন আমরা বুঝিতে অক্ষম; কারণ তখন সময়ের মূল্য এতটা বুঝিতাম না—এখন বেশ বুঝি, কাজেই কর্ত্তব্যের তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও খুঁজিয়া পাই না! সে পূর্ব্বের আমোদ-প্রমোদ ভ্রমণের রীতিনীতিও তাই বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রথমবার বৈদ্যনাথ ও ৺কাশীধাম দর্শন করি। বৈদ্যনাথের পাহাড়গুলির ধূম্র সৌন্দর্য্য, বনভূমির শ্যাম মাধুর্য্য এবং নির্ম্মলসলিলা জাহ্নবী-তটবর্ত্তী ৺কাশীধামের নাগরিক শোভা-সম্পদের সুরম্য-চিত্র আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বৈষয়িক কর্ম্ম-কঠোরতার মধ্যেও আমার সে ভ্রমণ-স্পৃহা হ্রাস হয় নাই; অবসর ক্রমে যখন সুযোগ বুঝিয়াছি, তখনই ভ্রমণে বাহির হইয়াছি,—এইরূপভাবে বহুবার ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করিয়াছি—এ ভ্রমণ-কাহিনী সে পর্য্যটনের ফল।

কোনদিন সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই নাই—কিংবা কোন সামান্য রচনায়ও হস্তক্ষেপ করি নাই, কাজেই এ বিরাট গ্রন্থ লইয়া আজ বড়ই সঙ্কুচিত চিত্তে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। আশা করি, সুধীবৃন্দ আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমার এ ভ্রমণ-কাহিনী কোনদিন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিব এরূপ কল্পনাও আমার মনে আসে নাই, কারণ বঙ্গসাহিত্যেও ত আজকাল আর ভ্রমণ-কাহিনীর অভাব নাই! দশজনের নিকট গল্প করিয়াই আমি শান্তিলাভ করিতাম, কোথায় কোন্ বিপদে পড়িয়াছি—কেমন করিয়া সে বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছি—নানা দেশের নানা রীতিনীতি ও আচারব্যবহার, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নাগরিক সমৃদ্ধির আলোচনাই

আমার তৃপ্তির কারণ ছিল। এ গ্রন্থ-প্রকাশের কল্পনা একজন মহীয়সী মহিলার অনুরোধে আমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে জাগরিত হয়। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জননী, দানশীলা শ্রীযুক্তা বিশ্বেশ্বরী দেবীচৌধুরাণী আমাকে বহুবার এ বিষয়ে অনুরোধ করেন—তাঁহার সে অনুরোধ আমার নিকট অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই—অতঃপর বন্ধুবান্ধব যাঁহাদের নিকট এ কথা বলিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ঐ মন্তব্যের সারবত্তা অনুভব করিয়া আমাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন, তাঁহাদের সে উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই অদ্য এই ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশে সমর্থ হইলাম।

যে ভারতবর্ষ সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যে গঠিত, যাহার নানাবিধ সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা জগতের বিভিন্নাংশের অধিবাসীবৃন্দের নিকট স্বর্গলোকের ন্যায় অপূর্ব্ব বলিয়া পরীকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে—সেই দেশের অধিবাসী হইয়াও আমরা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা ও যত্ন হইতে বঞ্চিত! একটা কথা আছে 'যাহা নাই ভারতে—তাহা নাই জগতে', যিনি ভারতের বিভিন্নাংশ পর্য্যটন করিয়াছেন তিনিই এ উক্তির সারবত্তা হৃদয়ে অনুভব করিবেন। এমন সুন্দর দেশ জগতে কোথায়? তুষার কিরীট-শোভিত হিমালয়ের বিরাট বিপুল সৌন্দর্য্য—জাহ্নবী, কাবেরী, সিন্ধু, গোদাবরী, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর বক্রগতি, রজত শুভ্র—সলিল শোভা, দিগন্ত-বিস্তৃত অরণ্যানী, প্রাচীনের পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক তীর্থস্থলসমূহের কঙ্কাল চিহ্ন, এক অব্যক্ত মহিমায় ভারতবর্ষকে জগতের নিকট বিধাতার সৃষ্টি-গৌরব-স্বরূপ বিরাজমান রাখিয়াছে। এত বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য্য, এত বিভিন্ন প্রকারের জল বায়ু, এত বিভিন্ন প্রকারের ভাষা, ধর্ম্ম, জাতি, আচারব্যবহার, রীতিনীতি আশ্চর্য্যরূপে এক ভারতবর্ষে বিদ্যমান। সেই ভারতের অধিবাসী হইয়াও আমরা ভারতকে দেখিতে জানি না, সুদূর ইউরোপ আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ ভারতকে যে ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমরা তাহারি স্নেহকোলে লালিত পালিত হইয়া তৎসম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। ভ্রমণ লোকের শিক্ষাকে মার্জ্জিত ও উন্নত করে—উহার দ্বারা বহু অপঠিত ইতিহাস পঠিত হয়—অনেক নূতন শিক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে অনেক বৃথা দম্ভ, অহঙ্কার ও সংকীর্ণতা হৃদয় হইতে দূর হয়—ভ্রমণের শিক্ষা হৃদয়ে যেরূপ দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়—অন্য কিছুতেই তদ্রূপ হয় না, অতএব ভ্রমণ-স্পৃহা মানবমাত্রেরই থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। কত প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী রাজবংশ, কত প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরের এখন অস্তিত্বও নাই—সে সকল প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস-সম্পর্কিত স্থানসমূহ দর্শনে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ হয়—তাহা গৃহকোণে বসিয়া থাকিলে কখনও আয়ত্ত হইতে পারে না,—ভারতবর্ষরূপ বিরাট গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করিবার সামান্যতঃ ইচ্ছা থাকিলেও ভ্রমণরূপ ভাষা-পরিচয়ের মধ্য দিয়াই তাহার আরম্ভ হওয়া আবশ্যক।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যেরূপ সচিত্র ও সুন্দর সুন্দর ভ্রমণ-গ্রন্থ আছে, আমাদের বাঙ্গলাভাষায় এখনও সেরূপ হয় নাই,—ইহার কারণ আমাদেরই অলসতা এবং ভ্রমণের প্রতি অনাদর। আমি আমার এ ভ্রমণ-গ্রন্থকে পর্য্যাটকগণের চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য চিত্র ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং যাহাতে সর্ব্ব শ্রেণীর পাঠকেরই চিত্তাকর্ষক হয় সেজন্য যথাসাধ্য সরল ভাষায় দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি—জানি না কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমার এ গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য দু'টি—প্রথম যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভ্রমণ-স্পৃহা জাগরিত হয়, দ্বিতীয় যে সকল ধনীসন্তান, অর্থ, সময় ও সুবিধা থাকিতেও বিলাসব্যসনে কালাতিপাত করেন, যদি তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও, বৃথা অর্থ ব্যয় না করিয়া, দেশ ভ্রমণের ন্যায় মহৎ ও সুন্দর কার্য্যে অর্থব্যয়ের প্রবৃত্তি জন্মে, এ দু'টির একটীও সামান্যরূপে চরিতার্থ হইলে আমি আমার সমুদয় অর্থব্যয় ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমার ভ্রমণের যাহারা সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরলোক গমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমার বিশেষ বন্ধু স্বর্গীয় গগনচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্মৃতি আজ আমাকে ব্যথিত করিতেছে—এ গ্রন্থ-প্রকাশে তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল, আজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি আন্তরিক মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি। স্বর্গীয় গগন বাবু ব্যতীত আমার আজন্মের বন্ধু ভূতপূর্ব্ব গভর্মেণ্ট পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও আমার সঙ্গী ছিলেন—এগ্রন্থে তাঁহার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। এইরূপ দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ পুরুষ বর্ত্তমান রোগজীর্ণ ও নিরন্ন বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়—চিত্র হইতেই পাঠকবর্গ এ বৃদ্ধ বয়সেও তাহার যৌবনোচিত বলবীর্য্যের পরিচয় পাইবেন। এগ্রন্থ প্রকাশে আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাস"-প্রণেতা সাহিত্য জগতে সুপরিচিত সুলেখক শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকটও বহু পরিমাণে ঋণী, তাঁহার আন্তরিক সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে আমার ন্যায় বিষয়-কর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তির পক্ষে এত বড় গ্রন্থ প্রকাশ করা সহজ হইত না। প্রসিদ্ধ মডার্ণ রিভিউ এবং প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় দ্বারকা, প্রভাস ও এলিফেণ্টার কয়েকখানা ফোটোগ্রাফ প্রদান করিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। এই ভ্রমণ প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ 'সাহিত্য', 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'সুপ্রভাত' এবং 'জাহ্নবীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। মদীয় আসাম-ভ্রমণ-কাহিনীও লিখিত হইয়াছিল এবং তাহার ছবিও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু গ্রন্থের কলেবর আশাতীত বৃহৎ হওয়ায় উহা এগ্রন্থে সংযোজিত হইল না,—জনসাধারণের নিকট হইতে উৎসাহ পাইলে, মদীয় অন্যান্য ভ্রমণ-কাহিনীর সহিত উহাও মুদ্রিত হইবে। সাহিত্যের সুরভি-কুসুম-সুবাসিত মনোহর উদ্যান মধ্যে আজ আমি নির্গন্ধ কিংশুক কুসুম লইয়া উপস্থিত

হইয়াছি—যদি কেহ উহাকে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তবে আমার আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না, যদি ঘৃণাভরে আবর্জ্জনায় নিক্ষেপ করেন—তাহা হইলেও আমার বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইবে না—কারণ আমি নিজ অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা বেশ বুঝি।

কালীপুর ছোট তরফ,
১লা বৈশাখ, ১৩১৭ সাল।
পোঃ, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

সূচী।

উত্তরভারত।

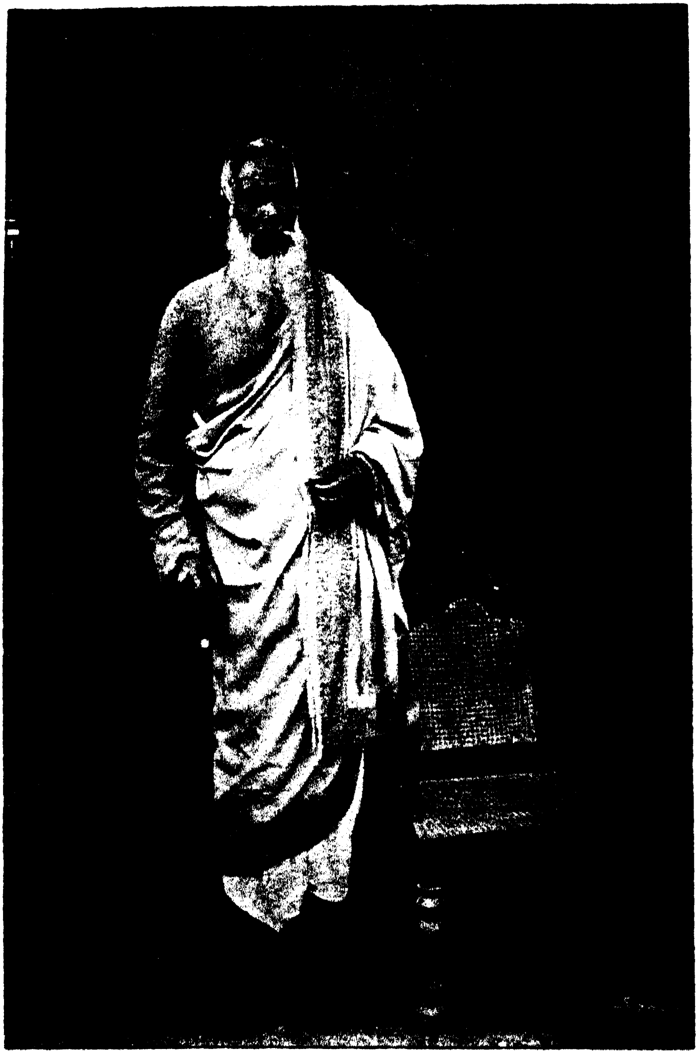
বর্ণানুক্রমিক সূচী।

চিত্র-সূচী।

——:o:——

চিত্রের নাম পৃষ্ঠাঙ্ক।

চিত্রের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক।



শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

কাশী।



কাশী

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা

ভারত-ভ্রমণ।

কাশী।

কতবার ৺কাশীধামে গমন করিয়াছি, তবু এই প্রাচীন তীর্থ আমার নিকট চিরনূতন। এমন মোক্ষদায়িনী পুণ্যময়ী নগরী ভারতবর্ষে অতি বিরল। বাংলার শ্যামল-প্রান্ত ছাড়িয়া বাষ্পীয়শকট যখন সাঁওতাল পরগণার গিরিবন-রঞ্জিত নির্ঝরবিধৌত প্রকৃতিসুন্দরীর উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্য্যরাজির মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, তখন নবীন পথিকের নিকট এক নবীন সৌন্দর্য্যের দ্বার মুক্ত হয়। কাশী যাইবার পথে দর্শনযোগ্য স্থান আরও অনেক আছে, সে

পথের কথা।

সকল বিষয় পাঠকগণের এত সুপরিচিত যে তাহাদের সম্বন্ধে কোনও কথা লিখিতে গেলে, তাহা কাহারও তাদৃশ প্রীতিপ্রদ হইবে না, অপরপক্ষে সময়ের উপরও অন্যায় দাবী করা হয়, সেজন্য সে সব বিষয়ে নিরস্ত হইলাম। মধুপুর, দেওঘর বা বৈদ্যনাথ, পাটনা, বাঁকিপুর ইত্যাদি সকলেরই চিরপরিচিত, অতএব বাক্যব্যয়ও নিষ্প্রয়োজন। বিহারের তালীবন-পরিশোভিত গ্রাম ও শ্যামল মাঠ পার হইয়া যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই প্রকৃতিসুন্দরীর 'সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং' মূর্ত্তি অদৃশ্য হয় এবং জননীর উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি—কোমলতার পরি-বর্ত্তে কঠোর সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিতে থাকে। সারারাত্রি পাঞ্জাব মেইল ঝড়ের মত ছুটিয়া প্রত্যূষে আসিয়া দানাপুর বা খগোল ষ্টেসনে দাঁড়াইল—এখান হইতে দানাপুর সহর প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। খগোল বেশ বড় ষ্টেসন,—এখানে বহু রেলওয়ে কর্ম্মচারী বাস করেন, ইহা একটী

রেলওয়ে ডিষ্ট্রীক্ট। রেলওয়ের ইংরেজ ও ইউরেশীয়ান কর্ম্মচারীদের পুষ্প-কাননবেষ্টিত সুন্দর ও ছোট বাংলোগুলি ছবির মত দেখা যাইতেছিল। দানাপুর ছাড়িয়া ডাক-গাড়ী যখন বক্সার পঁহু-ছিল, তখন বেলা প্রায় দশটা হইবে। বক্সার একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এইস্থানেই বাংলার শেষ নবাব প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মীরকাসিম আলিখাঁর সহিত ইংরেজবণিক্‌গণের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। বক্সারে বিশ্বামিত্রের আশ্রম, দুর্গ, রামরেখা ঘাট, সের সাহার সমাধি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য—এই সমাধি-হর্ম্ম্য নগর হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

বক্সার।

দেখিতে দেখিতে মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, ষ্টেসনের পর ষ্টেসন পার হইয়া মোগল-সরাই পঁহুছিলাম। মোগল-সরাই একটী প্রধান ষ্টেসন,—ইহা আউড্-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ের সংযোগস্থল; আমাদিগকেও গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত কোম্পানীর গাড়ীতে কাশী যাইতে হইবে। দুইদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত উষর মাঠ নীলিমার শেষপ্রান্তে মিলাইয়া গিয়াছে, গ্রামের কোনও চিহ্নই দৃষ্ট হয় না, আর মাঝখানে এই বিরাট ষ্টেসন আপনার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। ষ্টেসনের একপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ জটামাথায় দণ্ডায়মান, পথিকেরা সেখানে গাড়ীর প্রতীক্ষায় আরামে বিশ্রাম করিতেছে। কত পোট্‌লা-পুট্‌লী—তাহার সংখ্যা কে করে? ষ্টেসনের অপর দিকে গাড়ী প্রস্তুত ছিল, আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া কাশীর দিকে রওয়ানা হইলাম। মোগল-সরাই হইতে কাশী কেবল নয় মাইল দূরে অবস্থিত। মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল, দূরে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া দুই একখানা গ্রাম দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল। হৃদয় আনন্দে পূর্ণ, সাধের বারাণসী দেখিব। কিছুদূর হইতেই সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণমণ্ডিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জাহ্নবী-সলিল-বিধৌত মনোহর বারাণসীধামের মোহন সৌন্দর্য্য নয়ন-সমক্ষে বিকশিত হইল। কি সুন্দর! যেন একখানা সুন্দর ছবি কেহ নীলিম-গগনপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। দূরে উচ্চশীর্ষ বেণীমাধবের ধ্বজা যেন যাত্রীবৃন্দকে আহ্বান করিতেছে—"এস পাপ-তাপ-প্রপীড়িত ব্যথিত ক্ষুব্ধ পান্থ!

মোগল-সরাই।

এখানে এস।" কলনাদিনী হরজটাবিহারিণী সলিলরূপিণী তরঙ্গভঙ্গিনী পূতঃশীলা করুণা পুণ্যসলিলা ভাগীরথী যেন কল-কল্লোলে বলিতেছেন "আয়রে সবে, নরনারী, আয়, আমার স্নিগ্ধ-শীতল কোলে আয়, আমি তোদের অঙ্গ স্পর্শে শীতল করিয়া দিব।" গঙ্গাবক্ষে সৌধকিরীটিনী কাশীর শ্বেত প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল,—চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্—সে সৌন্দর্য্য-ছবির অতলতলে কোনও প্রগাঢ় রহস্য চিরলুক্কায়িত আছে কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? যিনি ডফ্‌রিনব্রিজের উপর হইতে কাশীর অনির্ব্বচনীয় শোভা অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন। পুলের অপর পারেই 'কাশী' ষ্টেসন। কাশীতে দুইটী ষ্টেসন, একটী কাশীনামে অভিহিত; অপরটিকে 'বেনারস কেণ্টনমেণ্ট' কহে। কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনটী খুব বড় ষ্টেসন, এখানে বি, এন, ডবলিউ রেল্‌ওয়ে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কাশী ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া আমরা এক্কাতে আরোহণ করিলাম।

কাশী। পশ্চিমাঞ্চলে এক্কাই সমধিক প্রচলিত। কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী ছোট মঞ্চের উপর চারিকোণে চারিটি দণ্ড, দণ্ডের উপরে রৌদ্রবৃষ্টি-নিবারণের নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র চাঁদোয়া খাটান, নিম্নে কাষ্ঠাসনের উপর একটী গদী, পশ্চাতে ছোট পর্দ্দা ঝুলান; এহেন অদ্ভুতাকৃতি দ্বি-চক্র-যানকে একটী ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যায়। কাশীকে বাঙ্গালীর সহর বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় না, এত অধিক বাঙ্গালীর বাস পশ্চিমের আর কোনও সহরেই দেখিতে পাওয়া যায় না; যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, সে দিকেই বাঙ্গালী দেখিতে পাইবে, তোমার মনে হইবে না যে বাংলা দেশ হইতে অপর কোনও স্থানে উপনীত হইয়াছ। আমাদের গাড়ী ছুটিয়া চলিল, রাস্তার দুইপার্শ্বে দোকানশ্রেণী, দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা, কোথাও পশ্চিমদেশীয়া প্রৌঢ়া রমণীগণ গম পিশিতেছে আর গান গাহিতেছে, কোথাও পানবিক্রেত্রী রূপলাবণ্যবতী যুবতী রমণী কাজল-অঙ্কিত চক্ষের নিপুণ কটাক্ষে কোনও যুবক পানক্রেতার মাথা ঘুরাইয়া দিতেছে! মন্দিরে মন্দিরে ছত্রে ছত্রে কাশীধাম সুশোভিত। যথা সময়ে বাসায় পঁহুছিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। নিদ্রার অভাবে ক্লান্ত শরীর অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত বোধ হইতেছিল, বিশ্রামাদির পরে আহারান্তে শয্যায় ঢলিয়া পড়িবামাত্রই

নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল, নিদ্রার কোমল অঙ্কে সমুদয় গ্লানি ও অবসাদ ত্যাগ করিয়া যখন গাত্রোত্থান করিলাম—তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে।

কাশীর কথা—
পৌরাণিক তত্ত্ব।

ভারতবর্ষের মধ্যে কাশী প্রধান হিন্দুতীর্থ। প্রাচীনকালে এই নগর অত্যন্ত বৃহৎ ছিল, প্রত্যেক পৌরাণিক গ্রন্থেই ইহার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে লিখিত আছে। সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে কাশীর অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—বারাণসী, বরাণসী, বরণসী, তীর্থরাজ্ঞী, তপস্থলী, কাশিকা, কাশী, অবিমুক্ত, আনন্দবন, আনন্দকানন, অপুনর্ভবভূমি, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান ও স্বর্গপুরী। এ সকল নামের মধ্যে কাশী, অবিমুক্ত এবং বারাণসীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। 'মৎস্য-পুরাণে' কাশীর সীমা এইরূপ লিখিত আছে যে ঃ—

"দ্বিযোজনন্তু তৎ ক্ষেত্রং পূর্ব্ব-পশ্চিমতঃ স্মৃতম্।
অর্দ্ধ যোজনবিস্তীর্ণং তৎ ক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরম্॥
বরণা হি নদী যাবদ্ যাবচ্ছুষ্কনদী তু বৈ।
ভীষ্মচণ্ডিকমারভ্য পর্ব্বতেশ্বরমন্তিকে॥"

অর্থাৎ "পূর্ব্ব পশ্চিমে দুই যোজন এবং উত্তর দক্ষিণে অর্দ্ধ যোজন পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। এই পুণ্যতীর্থ বরণা নদী হইতে শুষ্ক নদী পর্য্যন্ত এবং ভীষ্ম চণ্ডক হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত অবস্থিত।" কাশীধামের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বরণা অসী নামক দুইটি ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে বারাণসী কহে।

কাশীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে কেবল পুরাণেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা নহে, পুরাণের কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা জাবালোপনিষদে লিখিত কাশী-সম্পর্কিত বিবরণ পাঠ করিলে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কাশীরাজ্য প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০ লি) ও ইহার প্রধান নগরী বারাণসী দেড় ক্রোশ (১৮।১৯ লি) দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ ক্রোশ (৫।৬ লি) বিস্তৃত ছিল।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির নিকট কাশী অপেক্ষা পুণ্যপ্রদ পবিত্র তীর্থ

জগতের আর কোথাও নাই। এজন্যই প্রতি পুরাণগ্রন্থে ঋষিগণ প্রাণ ভরিয়া কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কত ধর্ম্মানুরাগী বৃদ্ধবৃদ্ধা, প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়াগণ যে 'শেষের সে দিনের' অপেক্ষায় এখানে বাস করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই; কারণ হিন্দুশাস্ত্রের মতে যে ব্যক্তির এ স্থানে দেহত্যাগ হয়, সে ব্যক্তি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে। কাজেই শেষ বয়সে অধিকাংশ হিন্দু নরনারী এ স্থানে বাস করেন। এক সময়ে হিন্দুর এই পবিত্র তীর্থেও যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও তাহার বহু চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কাশীর নিকটবর্ত্তী সারনাথে বহু বৌদ্ধকীর্ত্তি ছিল, এখনও তাহার বহু ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, আমরা সে বিষয় সারনাথ-প্রবন্ধে আলোচনা করিলাম। 'ললিতবিস্তর' নামক বৌদ্ধগ্রন্থ-পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য সময়ে বারাণসীর নিকটে ঋষিপত্তনে মৃগাদব নামক স্থানে শাক্যসিংহ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 'বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের' মতে কাশীরাজ বা কাশ্য নামক আয়ুবংশের সুহোত্রপুত্রই সর্ব্বপ্রথমে এ স্থানের সিংহাসনে আরোহণ করেন, খুব সম্ভব যে এই নৃপতির নাম হইতেই 'কাশী' এই নাম হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্যের পর পুনরায় যে কোন্ সময়ে বারাণসীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে যখন বারাণসীতে আগমন করেন, তখন তিনি এস্থানে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাবল্য দর্শন করিয়াছিলেন, তখন এস্থানে শতাধিক দেব-মন্দির ও প্রায় দশসহস্র দেব-উপাসক ছিল। শ্রীক্ষেত্রের 'মাদলাপঞ্জীর' মতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা যযাতিকেশরী ৺কাশীধামের দেবমন্দিরসমূহের অনুকরণেই ৩৯৬ শকে ভুবনেশ্বরে প্রধান শিব-মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অতএব ইঁহার পূর্ব্ব হইতেই যে কাশীধামে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান ছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাশীতে বহুতীর্থ বিরাজিত; কিন্তু বিশ্বেশ্বরই এখানকার প্রধান বিগ্রহ। ইনিই এস্থানের সর্ব্বপ্রধান লিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গের তুল্য শিবলিঙ্গ আর কোথাও নাই। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে "কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ

বৌদ্ধকীর্ত্তি।

'কাশী'-নামোৎপত্তি।

বিশ্বেশ্বর।

বারাণসী পুরী", অর্থাৎ কলিযুগে বারাণসী ক্ষেত্রই একমাত্র মোক্ষপ্রদ পুণ্যতীর্থ এবং বিশ্বেশ্বরদেবই একমাত্র দেবতা। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুঋষিগণ বিশ্বেশ্বররূপী এই ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। 'শিবপুরাণে' বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে লিখিত আছে যে ;—

"পঞ্চক্রোশ্যাঃ পরং নান্যৎ ক্ষেত্রঞ্চ ভুবনত্রয়ে।
অথবা পাপিনাং পাপস্ফোটনায় স্বয়ং হরঃ॥
মর্ত্ত্যলোকে শুভং ক্ষেত্রং সমাস্থায় স্থিতঃ সদা।
যথা তথাপি ধন্যেয়ং পঞ্চক্রোশী মুনীশ্বরাঃ॥
যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবো হ্যাগত্য সংস্থিতঃ স্বয়ম্।
যদ্দিনং হি সমারভ্য হরঃ কাশ্যামুপাগতঃ।
তদ্দিনং হি সমারভ্য কাশী শ্রেষ্ঠতরা হ্যভূৎ॥"

(শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৪৯ অঃ।)

অর্থাৎ "হে ঋষিবৃন্দ! ত্রিলোকের মধ্যে পঞ্চক্রোশবেষ্টিত এই স্থানের ন্যায় পবিত্রতম পুণ্যস্থান আর কোথাও নাই, নিজে পরমকারুণিক দেবাদিদেব মহাদেব পাপিগণের পাপ বিনাশ করিবার জন্য এই সুন্দর পুণ্যপ্রদ স্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। যে দিবস হইতে মহাদেব এই পুণ্য তীর্থে আগমন করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই বারাণসী শ্রেষ্ঠতম হইয়াছে।"

কাশীর প্রাচীনত্ব এই বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ হইতেও বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। প্রায় সাড়ে বারোশত বৎসর পূর্ব্বে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং যখন এস্থান দর্শন করিতে আইসেন, তখন তিনি এস্থানে শতহস্ত উচ্চ তাম্রমণ্ডিত বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাহার কোনও রূপ বিবরণই পাওয়া যায় না। কোনও পুরাতন গ্রন্থাদিতেও এইরূপ কোন বর্ণনা লিখিত নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ১১৯৪ সালে কাশী-নরপতি রাঠোর জয়চাঁদ যখন সাহেবউদ্দীন ঘোরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক পরাভূত ও নিহত হন, বোধ হয় সে সময়ে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সেই পবিত্র লিঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়াছে। কথিত আছে যে, মুসলমানেরা কাশীর প্রায় ১০০০ এক হাজার দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কাশীতে আকবরের সময়ের পূর্ব্বের কোনও



বিশ্বেশ্বরের মন্দির—কাশী ।

[কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা ।

দেব-মন্দির বিরাজিত নাই। বর্ত্তমান সুবর্ণকলস ও স্বর্ণচূড়া-বিলম্বিত বিশ্বেশ্বরের সুন্দর মন্দির মাত্র শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে মস্‌জিদ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে সেই স্থানেই বিশ্বেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান ছিল। সেই মস্‌জিদের পশ্চিমভাগের কারুকার্য্যাদি দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, এককালে ইহা হিন্দু দেব-মন্দির ছিল। বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির সমচতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। মিরঘাট ও জরাসন্ধঘাটের অদূরেই এই মন্দির। কোন্ মহাত্মা দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। চূড়াসমেত ইহা ৫১ ফুট উচ্চ। মহারাজা রণজিৎসিংহ মন্দিরের খিলান, চূড়া ও কলস ইত্যাদি তামার উপর স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। দীপ্ত সূর্য্যালোকে কাঞ্চনমণ্ডিত মন্দিরচূড়া পথিকের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দেয়। চূড়ার উপরে ত্রিশূল ও তাহার পাশে সর্ব্বদাই পতাকা উড্ডীয়মান। মন্দিরের খিলানের মধ্যস্থলে ৯টী বৃহৎ ঘণ্টা টাঙ্গান আছে। ইহার মধ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্ববৃহৎটী নেপালের মহারাজা প্রদান করিয়াছেন। যিনি এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন। ধর্ম্মের নির্ম্মল পবিত্রতা এখানে বিরাজমান। কি সুন্দর দৃশ্য, ভক্তির সুমধুর প্রীতির ভাব এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানের কতশত হিন্দুভক্তগণ বম্ বম্ রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ভক্তিভাবে বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ দর্শন করিতেছেন। সকলের মুখেই দেব-দর্শন-জনিত অপূর্ব্ব প্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ করযোড়ে সজলনয়নে ভক্তিবিকম্পিত কণ্ঠে স্তবপাঠে নিরত, কেহ মনের আনন্দে সুমধুর স্বরলহরীতে চারিদিকে সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়া বেদপাঠ করিতেছেন। ভক্ত হিন্দুর এমন অপূর্ব্ব মিলন অতি অল্পস্থানেই দৃষ্ট হয়। সন্ধ্যার সময় দেবাদিদেবের আরতি-দৃশ্যের বর্ণনা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। সুমধুর বেদধ্বনিতে ও বাদ্যরবে অপূর্ব্ব পুলক সমাবেশ, আর শত শত নরনারী ভক্তিগদগদচিত্তে একদৃষ্টে সেই মহান্ দেবতার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্মলাভের জন্য সর্ব্বসাধারণের

মধ্যে যে কতদূর ব্যাগ্রতা, তাহা যিনি কখনও কোনও তীর্থস্থানে যান নাই তাঁহার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই জ্ঞান-বাপী। 'কাশীখণ্ড' পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রুদ্ররূপী ঈশান ত্রিশূল দ্বারা এস্থানের ভূমি খনন করতঃ এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার জল পান করিলে মূর্খব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, যখন কালাপাহাড় কাশীর দেব-মন্দির-সমূহ ধ্বংস করেন, তখন বিশ্বেশ্বর ইহার মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। এখনও বহুযাত্রী এস্থানে দেবাদিদেবের পূজা করিয়া থাকে। জ্ঞান-বাপী একটী কূপ বিশেষ; ইহার উপরে একটী ছাদ আছে, উহা ৪০টী প্রস্তর নির্ম্মিত থামের উপরে সংস্থাপিত। গোয়ালিয়র-রাজ দৌলতরায় সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী বৈজবাই কর্ত্তৃক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়; এই ছাদের গঠন-নৈপুণ্য অত্যন্ত মনোহর। জ্ঞান-বাপীর জল অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গটী, বানলিঙ্গও মধ্যমাকৃতি, তিনি সর্ব্বদাই ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্তূপীকৃত ফুলবেলপাতায় এতদূর আবৃত থাকেন যে, সকল সময়ে তাঁহাকে দেখিতেও পাওয়া যায় না। তাঁহার মন্দিরসন্নিকটস্থ অন্নপূর্ণার মন্দিরে দেখিলাম দেবী অন্নপূর্ণা দর্ব্বিহস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেখিতে বড়ই সুন্দর! জানিনা কবে মা অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্ত্ত ভারতবাসীর ক্ষুধা দূর করিতে অগ্রসর হইবেন। কাশীতে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এখানে কেহই অনাহারী থাকে না। নানারত্নবিভূষণা করুণাময়ী জগন্মাতার কৃপায় দীনদুঃখী কাহাকেও অনাহারে ক্লেশ পাইতে হয় না। এই মন্দির প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে পুণার মহারাষ্ট্র-নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের একপার্শ্বে সপ্তাশ্বযোজিত রথের উপরে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। এতদ্ব্যতীত শনৈশ্চরেশ্বর, শুক্রেশ্বর, গৌরীশঙ্কর, গণেশ ও হনুমানের বিগ্রহাদিও দৃষ্ট হয়। শনৈশ্চর লিঙ্গের ঊর্দ্ধদেশ রজতমণ্ডিত এবং নিম্নাংশ পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা আবৃত। বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির নষ্ট করিয়া যে স্থানে ঔরঙ্গজেব মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন, তাহাকে এখনো ঔরঙ্গজেবের মস্‌জিদ কহে। মস্‌জিদের সম্মুখভাগে মুসলমানগণ একটী সিংহদ্বার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন;

জ্ঞান-বাপী।

অন্নপূর্ণার মন্দির।

কাশী-কর্ব্বট।

কিন্তু কোন মুসলমানই সেই তোরণ-দ্বার দিয়া মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে পারে না ;—ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এখন এই মস্‌জিদের ট্রষ্টি নিয়োজিত আছেন। এই মস্‌জিদের নিকটে আদিবিশ্বেশ্বরের প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হয় ; উহার সন্নিকটেই 'কাশী-কর্ব্বট' নামক একটী পবিত্র কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এইরূপ একটী বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ডুব দিয়া এই কর্ব্বট উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, এই অন্ধ-বিশ্বাসের গতিকে দুই একজন ডুব দিয়া মরার পর, গবর্ণমেণ্ট এই কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দেন, পরে পাণ্ডাগণের বহু আবেদনে প্রতি সোমবার কেবল একবার করিয়া ইহার মুখ খুলিয়া দেওয়া হয়।

আমরা বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেবালয়াদি দর্শন করিয়া কালভৈরবের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। উহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, ব্রহ্মার গৌরব হ্রাস করিবার নিমিত্ত মহাদেব নিজ কোপ হইতে এক ভৈরব পুরুষের সৃষ্টি করেন, তিনিই কালভৈরব। কালভৈরব বা ভৈরবনাথের মূর্ত্তি প্রস্তরে গঠিত ঘোর নীলবর্ণ, ইহাঁর চক্ষু দুইটী রজত নির্ম্মিত, তিনি স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, পার্শ্বে তাঁহার সারমেয়ের বিকট মূর্ত্তি। কালভৈরব কাশীর প্রহরীরূপে বিরাজিত আছেন। ভৈরবনাথের মন্দিরটী নানাবর্ণে সমলঙ্কৃত এবং দর্শনোপযোগী। প্রবেশ করিবার দ্বারের বামপাশে দশাবতারের মূর্ত্তি অতিশয় সুন্দর রূপে চিত্রিত আছে। কাল-ভৈরবের বর্ত্তমান মন্দির পুনার বাজিরাও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের বাহিরে কালভৈরবের প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্র-হায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি সারারাত্রি কালভৈরবের নিকট জাগরিত থাকে, তাহার সর্ব্বপ্রকার পাপ দূরীভূত হয়। ইহাঁর পূজা করিয়া যিনি যে কামনা করিয়া থাকেন তাহাই সিদ্ধ হয়। কাশীতে যে চারিটী শীতলা দেবীর মন্দির আছে, তন্মধ্যে এখানে একটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই শীতলাদেবীর মন্দিরে সপ্তভগিনীর মূর্ত্তি আছে। নব-গ্রহের মন্দিরও কালভৈরবের মন্দিরের নিকট বিদ্যমান। এখানে রবি,

কালভৈরব।

সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহের রীতিমত পূজা হইয়া থাকে। নবগ্রহের মন্দিরের পার্শ্বেই দণ্ডপাণির মন্দির।

দণ্ডপাণির মন্দির।

'কাশীখণ্ডে' লিখিত আছে যে "হরিকেশ নামক জনৈক যক্ষ তপস্যা দ্বারা মহাদেবের অনুকম্পা লাভ করে। মহাদেব তাহাকে বর দেন যে তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়তম ভক্ত, তুমি কাশীধামের দুষ্টগণের শাসক ও শিষ্টের পালক হইয়া দণ্ডপাণি নামে অবস্থিতি কর, কাশীধামে তোমার পূজা না করিলে কাহারও সুখলাভ হইবে না।" দণ্ডপাণির মূর্ত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত, উহা উচ্চে প্রায় তিন হস্ত হইবে, যাত্রিগণ প্রতি রবি ও মঙ্গলবারে ইহাঁর পূজা করিয়া থাকে। কালভৈরবের মন্দিরের

কালকূপ।

নিকটে কালকূপ অবস্থিত। যিনি এই তীর্থে ভক্তিসহকারে অবগাহন করেন, তাঁহার পিতৃলোকের তৎক্ষণাৎ উদ্ধার হয়। এই কূপটী এমনি সুকৌশলে নির্ম্মিত যে ঠিক্ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য্যের রশ্মি ইহার সলিল মধ্যে পতিত হয়, বহু লোক অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ সে সময়ে এখানে আগমন করে, মধ্যাহ্ন সময়ে যে ব্যক্তি ঐ কূপ-জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, ছয় মাসের মধ্যেই সে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটী বিশ্বাস দৃঢ়রূপে প্রচলিত দেখিলাম। কালকূপের অল্পদূরে 'বৃদ্ধকালেশ্বরের' মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণদেশস্থ নন্দি-

বৃদ্ধকালেশ্বর।

বর্দ্ধন গ্রামের বৃদ্ধকাল নামক জনৈক রাজা কর্ত্তৃক এই শিবলিঙ্গ স্থাপিত ও ইহার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপজনিত দরিদ্রতা দূর হয়। বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দিরের প্রাচীনত্ব অনেকেই স্বীকার করেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে কাশীতে এখন যতগুলি শিব-মন্দির আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। 'শিব-পুরাণে'ও বৃদ্ধকালেশ্বরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। পূর্ব্বে যে স্থানে বিখ্যাত এবং মোক্ষপ্রদ 'কৃত্তিবাসেশ্বরের' মন্দির অবস্থিত ছিল, এখন সে স্থানে আলমগীর মস্‌জিদ অবস্থিত। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই মাল মসলা দ্বারা ঔরঙ্গজেব এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন এই মস্‌জিদের নিকট

'রত্নেশ্বরের' মন্দির বিরাজিত। এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরের ভিত্তি খনন করিবার সময় মৃত্তিকা গর্ভ হইতে বহু ধন, রত্ন পাওয়া গিয়াছিল। 'কাশী খণ্ডে' এই শিবের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "যে ব্যক্তি রত্নেশ্বর দেবকে প্রণাম করিয়া দূরদেশেও প্রাণত্যাগ করে, সে ব্যক্তিও শতকোটি কল্প কাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়া থাকে।"

রত্নেশ্বর।

কাশীতে গঙ্গার তীরে যে কত ঘাট আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যখনি যে ঘাটে যাইবে, তখনি সে স্থান জনাকীর্ণ দেখিতে পাইবে। কোথাও সন্ন্যাসিগণের গগনভেদী হর্ হর্ রব, কোথাও সামবেদের মধুর স্বর-লহরী গগনে মিলাইয়া যাইতেছে, কোথাও সংসারত্যাগী ধ্যানমগ্ন যোগীপুরুষগণ যোগাসনে উপবিষ্ট, আবার কোথাও বা বর্ষীয়সী রমণীগণ পূজা নিরতা। পরমার্থ লাভের জন্য মানুষের ব্যাকুলতার দৃশ্য এখানে যেরূপ দৃষ্ট হয় পৃথিবীর অন্যত্র তাহা কল্পনাতীত। বাস্তবিক কাশীর গঙ্গাবক্ষস্থ দৃশ্য অতুলনীয়। আমরা এখানে প্রধান প্রধান কতকগুলি ঘাটের নামোল্লেখ করিলাম। যথা—অসিঘাট, লালামিশ্রঘাট, রাওসাহেবঘাট, আকরুলঘাট, শিবালয়ঘাট, দণ্ডীঘাট, হনুমানঘাট, মশানঘাট, লালীঘাট, কেদারঘাট, চৌকীঘাট, রাজাঘাট, নারদঘাট, সোমেশ্বরঘাট, পাঁড়েঘাট, নন্দঘাট, ছত্রঘাট, বাঙ্গালীটোলাঘাট, গুরুপান্ডঘাট, চৌষট্টিঘাট, রাণাঘাট, মুন্সীঘাট, অহল্যাবাই-ঘাট, শীতলাঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, প্রয়াগঘাট, মানমন্দিরঘাট, ঘোড়াঘাট, ভৈরবঘাট, মীরঘাট, ললিতাঘাট, নেপালঘাট, জরাসন্ধঘাট, কায়স্থঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, সিন্ধিয়াঘাট, ভীমকাঘাট, গণেশঘাট, ঘোসলাঘাট, রামঘাট, পঞ্চগঙ্গাঘাট, দুর্গাঘাট, বিন্দুমাধবঘাট, গোঘাট, ত্রিলোচনঘাট, মৈত্রঘাট, প্রহ্লাদঘাট, রাজঘাট, বরুণাসঙ্গমঘাট, পিশাচমোচনঘাট ও অগ্নীশ্বরঘাট। এ সমুদয় ঘাটের মধ্যে আবার শীতলাঘাট, প্রয়াগঘাট, বরুণাঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, চৌষাট্টযোগিনী, দশাশ্বমেধ ও মণিকর্ণিকা, অগ্নীশ্বর, অসিসঙ্গম ও কেদারঘাট প্রভৃতি প্রধান। মণিকর্ণিকা ঘাটের ন্যায় পবিত্রতম তীর্থ কাশীর আর কোথাও নাই। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক পুরাণেই বিশেষরূপে লিখিত আছে। 'সৌরপুরাণে' আছে যে :—

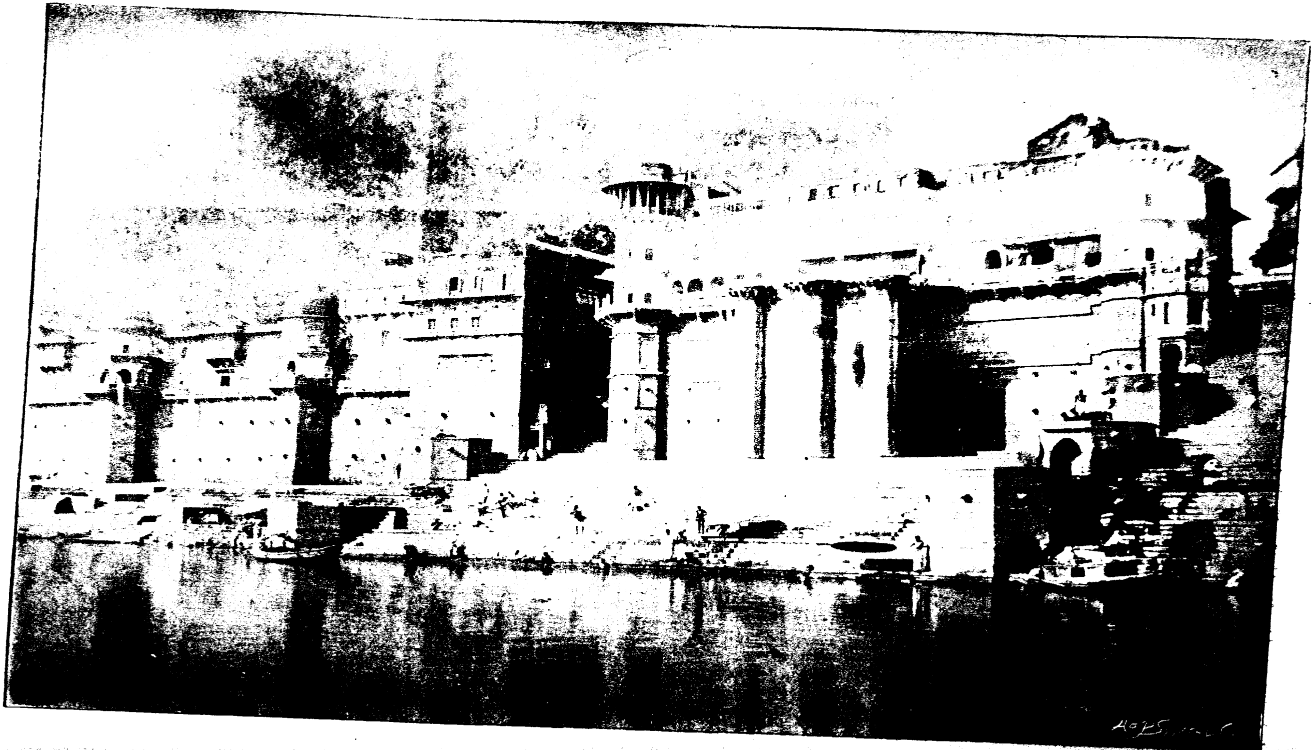
"নাস্তি গঙ্গাসমংতীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্ ॥

অর্থাৎ বারাণসীধামে গঙ্গারমত কোনও তীর্থ নাই, আবার বিশ্বেশ্বরের প্রিয় মণিকর্ণিকা তীর্থের তুল্যও কোন তীর্থ নাই। কথিত আছে যে প্রাচীনকালে এ স্থান ঘোরতর অরণ্যানীসঙ্কুল ছিল, সে সময়ে বিষ্ণু মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার কুন্তল হইতে একটী মণি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন —সে নিমিত্ত ইহার নাম মণিকর্ণিকাঘাট হইয়াছে, এ বিষয়ে আরও নানা-প্রকার কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়, – সে সকলের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানেই ঘাটের পার্শ্বে—

শ্মশানং ঘোর সন্নাদং শিবাশতসমাকুলং।
শবমৌলি সমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহুধূমকং ॥"

কাশীর মহাশ্মশান। এমন সময় নাই, যে সময়ে এখানে একটী না একটী চিতা না জ্বলে! হায়! মোহান্ধ মানব, এই তোমার শেষ পরিণাম! সুখ-পুষ্ট দেহের এই শেষ যজ্ঞ! সাধের লীলাখেলার শেষ যবনিকা এখানেই পতিত হয়! অই যে শবদেহ ভস্মীভূত হইতেছে—অই যে তাহার আত্মীয়বর্গ সজল নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে—একদিন সে আমাদেরি মত ছিল, আমাদেরি মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছে—আজ তাহার শেষ চিহ্ন চিরদিনের মত পৃথিবীর বুক হইতে অদৃশ্য হইতেছে। হায়! শ্মশান—সাম্যের ঘোষণা জগতে যদি কেহ করিয়া থাকে সে তুমি—যদি দীন দরিদ্র হইতে সম্রাটের মণি-রত্ন-মণ্ডিত মুকুটের প্রতিও দৃক্‌পাত না করিয়া বিজয় ঘোষণা কেহ করিয়া থাকে সে তুমি। সত্য সত্যই তুমি শিব-সুন্দর। শ্মশানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কত কথা ভাবিলাম, মুহূর্তের জন্য আত্মহারা হইতে হইয়াছিল। মণিকর্ণিকার সম্মুখেই তারকেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে যে এই তারকেশ্বর দেব অন্তিম সময়ে কাশীবাসী নরনারীগণকে তারকব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। এস্থানে এই পবিত্র তীর্থের পূত সলিল স্পর্শ করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের প্রত্যহ সমাবেশ হইয়া থাকে। এই ঘাটের উপরে বিষ্ণুর চরণপাদুকা দৃষ্ট হয়। কিম্বদন্তী এইরূপ যে ভগবান্ বিষ্ণু যখন মহাদেবের আরাধনা করেন

চরণ-পাদুকা।



সে সময়ের তাঁহার পদদ্বয়ের চিহ্ন এস্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে। একখানি মর্ম্মর প্রস্তরের উপর দুইখানি প্রায় ১॥০ হস্ত পরিমিত পদতলের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রিগণ কার্ত্তিক মাসে নানা স্থান হইতে এই চরণ-চিহ্ন পূজা করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। বরণাসঙ্গমের সম্মুখেও এইরূপ পদ-চিহ্ন আছে। মণিকর্ণিকার ঘাটের কিছু দূরে সিদ্ধি-বিনায়ক, সিদ্ধি এবং বুদ্ধিদেবীর মন্দির দৃস্ট হয়।

কাশীর উত্তর পশ্চিম দিকে নাগকুঁয় মহল্লা নামক মহল্লা আছে—

নাগকূপ তীর্থ।

এই স্থানকেই প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা বারাণসীর অতি প্রাচীন স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। এই কূপের ধাপের মধ্যে এক স্থানে তিনটী নাগমূর্ত্তি ও অপর একস্থানে একটী শিবলিঙ্গ দেখিলাম। প্রতিদিন নাগ ও নাগেশ্বর শিবের পূজা হইয়া থাকে। ইহার কিছুদূরে অস্টধাতুনির্ম্মিতা, সুবৃহৎ মুকুটপবিশোভিতা সিংহোপরি অধিষ্ঠিতা বাগীশ্বরী দেবী এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, নবগ্রহ, জ্বরহরেশ্বর প্রভৃতি বহু তীর্থ ও দেবমন্দির দর্শনান্তে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাট।

কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে যে পিতামহ ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবোদাসের সহায়তায় এস্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন—সেজন্য ইহার নাম দশাশ্বমেধ তীর্থ হয় এবং সেনামেই এখন পরিচিত।

কাশীর মধ্যে ইহা একটী মহাতীর্থ, এস্থানে প্রায় ৬৯২টী দেবমন্দির আছে। এস্থানে যেরূপ দেবমন্দির সমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট তদ্রূপ কাশীর আর কোথাও নাই। সারি সারি মন্দিরগুলি দেখিতে পরম রমণীয়। নগরের

পিশাচ-মোচন তীর্থ।

পশ্চিম সীমান্তে পিশাচ-মোচন তীর্থ অবস্থিত। 'কূর্ম্মপুরাণ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। পিশাচ-মোচনের মন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ মন্দির দুইটী রাণী মীরাবাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

সূর্য্যকুণ্ড বা সাম্বাদিত্য তীর্থ।

পিশাচ-মোচন তীর্থ দর্শনানন্তর আমরা সূর্য্যকুণ্ড দেখিতে আসিলাম। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সাম্ব সূর্য্যদেবের তপস্যা দ্বারা ব্যাধিমুক্ত হইবার আশায় কাশীতে আগমন করিয়া এ স্থানে একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ পূর্ব্বক

সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। সাম্ব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বিগ্রহ সে জন্য সাম্বাদিত্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহাঁকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিলে মানুষ সর্ব্বপ্রকারের পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সম্পদ লাভ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকে ইহাঁর সেবা করিলে সে কখনও বিধবা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এই তীর্থ সূর্য্যকুণ্ড নামেই খ্যাত। এই কুণ্ডের সম্মুখে একটী ছোট মন্দিরের মধ্যে অষ্টাঙ্গ ভৈরবের মূর্ত্তি বিরাজিতা আছেন, ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তির অঙ্গহীনতা সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার নিকটেই হরিভক্ত ধ্রুবের প্রতিষ্ঠাপিত ধ্রুবলিঙ্গ বা ধ্রুবেশ্বরের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে বারোমাস সমভাবে এখানে যাত্রীসমাগম হয়—আর এমন দেব-মন্দির দেখিতে পাইবে না যে স্থানে ভক্তনরনারীর সমাবেশ নাই—পুরুষ অপেক্ষা আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। বারাণসীর ঈশানগঞ্জ মহল্লা বিশেষ বিখ্যাত। এ স্থানে প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যে যোগেশ্বরীর মন্দির স্থাপিত। এই মহল্লার সন্নিকটেই কাশীপুর মহল্লার মধ্যে কাশীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী কাশীদেবীর মন্দির দর্শন করিলাম। ইহার নিকটে ঘণ্টাকর্ণ হ্রদ। হ্রদের তটপ্রদেশে একটী শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন তাঁহাকে সকলে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর কহে; জনপ্রবাদ এইরূপ যে ঘণ্টাকর্ণ নামক জনৈক গণ কর্ত্তৃক এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম ঘণ্টাকর্ণেশ্বর হইয়াছে।

ঈশানগঞ্জ মহল্লা।

আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত কাশীদেবীর মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে বিষম ভৈরবের মন্দির অবস্থিত। ইহাঁর মূর্ত্তি অত্যন্ত অদ্ভুত প্রকারের। এ স্থানে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বারগণেশ ও জগন্নাথের মূর্ত্তিই প্রধান। ইহার একপার্শ্বে দুইটি সতীর প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে—সধবা স্ত্রীলোকগণ সহমৃতা এই সতীপ্রস্তর দুইটির পূজা করিয়া থাকে। কাশীধামের ঠিক্ মধ্যস্থলে ত্রিলোচনের মন্দির অবস্থিত। ত্রিলোচন লিঙ্গ অত্যন্ত মোক্ষপ্রদ এবং কাশীর অন্যান্য শিবলিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাঁর উৎপত্তি সম্বন্ধে কাশী-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যে সময়ে মহাদেব

বিষম-ভৈরব।

ত্রিলোচনের মন্দির।



সাড়ির কারুকার্য্য—কাশী

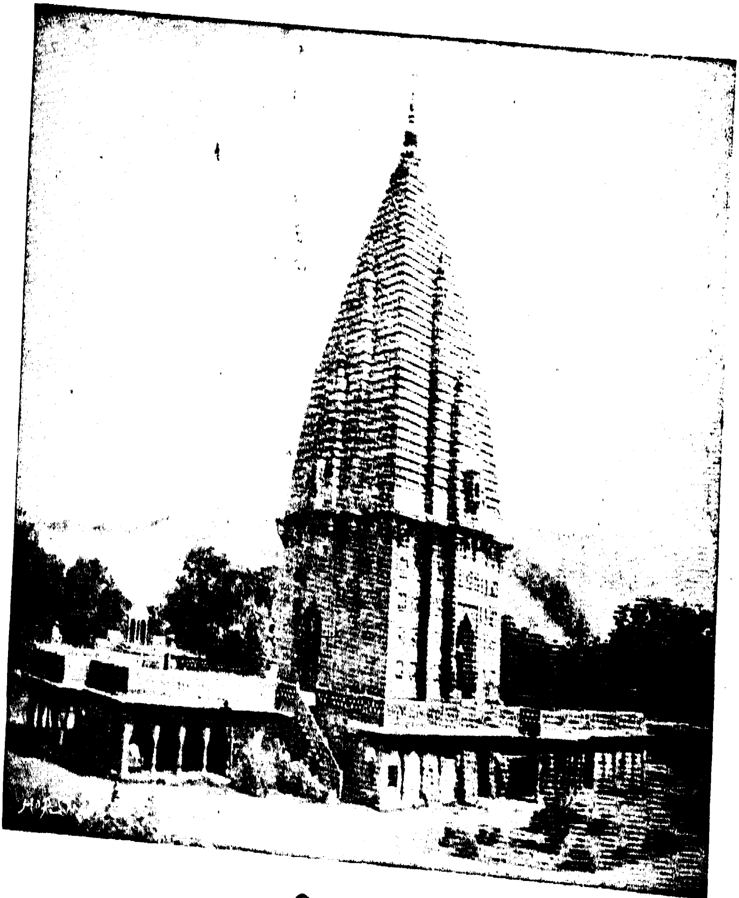
কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন প্রতিদিবস বিষ্ণু তাঁহাকে সহস্র পুষ্প দ্বারা পূজা করিতেন। একদিন বিষ্ণুর সংগৃহীত সহস্র পুষ্প হইতে মায়াবলপ্রভাবে মহাদেব একটী ফুল হরণ করিলেন—বিষ্ণু পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে সহস্রের মধ্যে একটী পুষ্প কম—তখন নিরুপায় হইয়া স্বকীয় নেত্রকমল উৎপাটিত করিয়া মহাদেবকে উৎসর্গ করিলেন, মহাদেবের কপালে সেই নেত্রটি পতিত হইবামাত্রই উহা চক্ষু হইল—এবং তদবধি তিনি ত্রিলোচন নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ত্রিলোচন দেবের বর্ত্তমান মন্দির নাথুবালা নামক পুনানগরীর জনৈক শ্রেষ্ঠ অধিবাসীকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের সীমামধ্যে অনেক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ছোট ছোট মন্দিরের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ত্রিলোচন-দেবের মন্দিরের বারান্দা আটটী সুন্দর সুন্দর লালবর্ণের থামের উপর স্থাপিত উহার ছাদ নানাবর্ণে অতিশয় সুন্দরভাবে চিত্রিত। প্রবেশ-পথের পার্শ্বদেশে একটী শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ বৃষভমূর্ত্তি দেখিলাম। এস্থানে নিপুণতার সহিত বহুদেবদেবীর চিত্র ও শিখগুরু নানকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এখানকার চিত্রাবলী মধ্যে একখানি চিত্র বড়ই সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। সেই চিত্রখানাতে নরক ও মৃত্যুনদীর দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। দেহাবসানে স্বীয় স্বীয় পাপানুষ্ঠানের জন্য মানবগণ কিরূপে দণ্ডিত হয়—অনন্ত প্রবহমানা—অনন্ত বেগশালিনী কালতরঙ্গিনীর পরপারে যাইবার জন্য মানবের কিরূপ ব্যাকুলভাব হয়, এই চিত্রে তাহা এরূপ স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত রহিয়াছে যে, আপনা হইতেই মনের মধ্যে নৈরাশ্যের ও মৃত্যুর কালোছায়া আসিয়া পতিত হয়,—মনে পড়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষ অভিনয়ের কথা—কে জানে জীবনাঙ্কের শেষ যবনিকা কখন পতিত হইবে! ত্রিলোচনঘাটের প্রাচীন নাম 'পিলিপিলা' তীর্থ।

কেদারেশ্বর ও কেদারঘাট।

এক দিবস কেদারেশ্বর দর্শন করিবার জন্য কেদারঘাটের দিকে গমন করিলাম। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় কেদারেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, এ অঞ্চলেই বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী, অধিকাংশ বাঙ্গালীই এ স্থানে বাস করেন। আমরা যখন এ স্থানে আসিয়াছিলাম, তখন তিমিরাবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যাসতী চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলিয়া-

ছিলেন, মন্দিরে মন্দিরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত হইতেছিল—ভক্তবৃন্দের আকুলকণ্ঠের ঘন ঘন হর হর বম্ বম্ ধ্বনি—ধূপ ধূনার পবিত্র সৌরভ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। কত লোক কেদারেশ্বরের আরতি দেখিবার জন্য যাইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। আমরা ধীরে ধীরে অন্যান্য তীর্থবাসী নরনারীর সহিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। কেদারেশ্বরের মন্দির গঙ্গার তীরে অবস্থিত। মন্দিরের বারান্দা লাল ও সাদা, এখানেও বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি ব্যতীত এস্থানে লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, নারায়ণ, গণেশ প্রভৃতি বহু মূর্ত্তি আছে। এই দেবমন্দিরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীর হইতে গঙ্গাবক্ষ পর্য্যন্ত পাষাণনির্ম্মিত ঘাট,—ঘাটের নিকট গৌরীকুণ্ড অবস্থিত, মন্দিরের নিকট হইতে গঙ্গাবক্ষে উঠিতে ও নাবিতে প্রাণান্ত হয়, কাশীর দিকে জাহ্নবীর পার অত্যন্ত উচু। মন্দিরের আরতি ও কেদারেশ্বরকে দর্শন করিয়া লোকের ভিড় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কেদারঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলাম—পলকমধ্যে জাহ্নবী-শীকর-সিক্ত শীতল পবনস্পর্শে সমুদয় গ্লানি ও অবসাদ দূরীভূত হইল, প্রাণে শান্তি আসিল। পাষাণ-সোপানোপরি উপবেশন করিলাম। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি—চতুর্দ্দিক ঘনঘোর তিমিরাবরণে ঢাকা,—আকাশে কোটী কোটী তারা-সুন্দরী নয়ন মেলিয়া চাহিয়া আছে। নিম্নে শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিমুখরিত মন্দিরসমূহ পরিবৃতা-বারাণসীতীর্থের জন-কোলাহল দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের নিকট হইতে কিছু দূরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানঘাটে একটা চিতা জ্বলিতেছিল। মনে হইল সুদূর অতীতে এমনি এক অন্ধকার নিশীথে—সে নিশি আরও ভয়ঙ্কর ছিল—এ অন্ধকারের চেয়ে আরও কোটীগুণ গাঢ়তর অন্ধকার সেদিন প্রকৃতিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল—জলদাবৃত গগনে সে রজনীতে মুহুর্মুহু ভীমভৈরব গর্জ্জন কাশীধামকে গাঢ়তর আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল—সকলেই নিজ নিজ গৃহে ভীতচকিত মনে নিদ্রামগ্ন; কেবল—এই শ্মশানভূমিতে এক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দান-বীর—শ্মশানে নিজ কর্ত্তব্যসাধন নিমিত্ত বসিয়াছিল, হায়! দাসত্ব—হায়! শৃঙ্খল—স্বাধীন পথের ভিখারীও সুখী, কিন্তু রাজপ্রাসাদ সম প্রাসাদোপবিষ্ট পরভৃত্যও সুখী নহে। চণ্ডালভৃত্য হরিশ্চন্দ্র ভাবিতেছিলেন নিজ শোচনীয়



দেবমন্দির—রামনগর

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

পরিণাম,—কোথায় প্রাণ-প্রিয়তমা পত্নী—কোথায় প্রাণের নন্দন রোহিতাশ্ব,—কোথায় রাজৈশ্বর্য্য—আর কোথায় তিনি আজ কদন্ন ভোজনে মৃতের কম্বলাহরণে দিন কাটাইতেছেন! সহসা পুত্র-শোকাতুরা রমণীর করুণক্রন্দনে সে শ্মশানঘাট প্রতিধ্বনিত হইল; হায়! হায়! এমন ভীষণা তামসী নিশীথে রাজরাণী শৈব্যা সর্পদষ্ট মৃতপুত্র রোহিতাশ্বের সৎকার করিবার জন্য আসিয়াছেন! কি ভীষণ দৃশ্য! প্রাচীনযুগের সে শোক-স্মৃতি হৃদয়ে আন্দোলিত হইতেছিল, আমি যেন অদূরস্থিত শ্মশান হইতে পুত্রহারা রমণীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতেছিলাম, "হা পুত্র—আমার সোণার রোহিতাশ্ব—কোথায় গেলি বাছা? এই না ছুটে ছুটে খেল্‌ছিলি?"

সে আজ কতদিনের কথা, এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা ও অতুল ধৈর্য্যশালিনী পতিসেবাপরায়ণা রাণী শৈব্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু এখনও সে কীর্ত্তিকাহিনী ভারতের নরনারী অতুল আগ্রহের সহিত শোনে ও পুত্রশোকাতুরা রমণীগণ শৈব্যার সেই শোকাশ্রুর সহিত—আপনাদের ব্যথিত নয়ন-জল মিশায়। যতদিন পৃথিবী থাকিবে—যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে—ততদিন পর্য্যন্ত এই কীর্ত্তি-গৌরব-কাহিনী মুছিবে না! সেই নিশীথে নীরবে দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর কলকলধ্বনির সহিত শুনিতেছিলাম "ধন্য রাজা হরিশ্চন্দ্র!"—এমন সময়ে সঙ্গী ডাকিলেন "বাসায় যাইবেন না?" আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল,—তখন মন্দিরে মন্দিরে আরতির ধ্বনি থামিয়া গিয়াছে—আকাশে তারাকুল নির্ণিমেষনয়নে তেমনি চাহিয়া আছে!

কেদারেশ্বর দেবের মন্দির হইতে উত্তরপশ্চিমদিকে কিয়দ্দূরে মান-সরোবর নামক একটী সুগভীর জলাশয় আছে। ইহা মান-সিংহ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল, এই সরোবরের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৫০টী মঠ আছে, সে সকল মঠের মধ্যে রাম লক্ষ্মণ ও দত্তাত্রেয় মূর্ত্তিই উল্লেখযোগ্য, ইহা ছাড়া প্রায় এক সহস্র দেব-মূর্ত্তি এখানে আছে। মান-সরোবরের অল্পদূরেই মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। মানেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমদিকে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির। মন্দির-মধ্যস্থ তিলভাণ্ডেশ্বর মূর্ত্তি প্রস্থে দশ হাত এবং উচ্চে প্রায় তিন হাত। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে

মান-সরোবর ও মঠ ইত্যাদি।

তিলভাণ্ডেশ্বর।

বিশ্বাস যে, ইনি প্রতিদিন তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি পান বলিয়াই ইহাঁর নাম 'তিলভাণ্ডেশ্বর' হইয়াছে।

কাশীধামের দুর্গাবাড়ী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন। 'কাশীখণ্ড' নামক গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান দুর্গামন্দির প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। দশপ্রহরণধারিণী দেবী দশভুজার নিকট প্রত্যহই ছাগবলি প্রদত্ত হয়। এখানকার জনসঙ্ঘ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন সময় নাই, যে সময়ে এস্থানে কোনও জনতা না থাকে। দূর দেশান্তর হইতে এখানে যে কত লোক আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যহ মঙ্গলবারে এবং প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারে দুর্গাবাড়ীর মেলায় লোক সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। দেবীর মন্দিরের কারুকার্য্যাদি প্রশংসনীয়—এখানেও নেপালের মহারাজার প্রদত্ত একটী ঘণ্টা দোদুলামান। মন্দিরের প্রাচীরসীমায় পবিত্র দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। দুর্গাবাড়ীতে বানরের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল, সাহেবেরা এ নিমিত্ত ইহাকে Monkey Temple নামে অভিহিত করেন।

দুর্গাবাড়ী।

কাশীর সহস্র সহস্র দেবমূর্ত্তির সংখ্যা করা ও দেবমন্দিরসমূহের বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। এমন গলি নাই যেখানে কোন না কোন দেবমূর্ত্তি না আছে। গঙ্গার তীরে যে সকল ঘাট আছে, প্রত্যেক ঘাটেই দেব-মন্দিরসমূহ দৃষ্ট হয়। একদিন আমরা "বেণীমাধবের ধ্বজা" দর্শন করিতে গমন করিলাম। পঞ্চগঙ্গাঘাটের উপরেই পূর্ব্বে বেণীমাধব বা বিন্দুমাধবের মন্দির বিরাজিত ছিল,—ঔরঙ্গজেব সে দেব-মন্দির ভগ্ন করিয়া সে স্থানে এই বৃহৎ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। মস্‌জিদের চারিকোণে চারিটী স্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে সম্মুখস্থ দুইটীই সমধিক উচ্চ, উহাই এখন (বেণীমাধবের ধ্বজা) বলিয়া পরিচিত। এই ধ্বজা কলিকাতার অক্টার্লনি মনুমেণ্ট হইতে অনেক উচ্চ। উহার উপর হইতে কাশীর চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যাবলী চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কাশীতে অনেক রাজা মহারাজা ও জমীদারগণের কীর্ত্তি আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর কীর্ত্তিই সংখ্যায় বেশী, কাশীবাসিগণ তাঁহাকে স্বয়ং অন্নপূর্ণার অংশসম্ভূতা বলিয়া বিবেচনা করেন। এই পুণ্যবতী রমণী

বেণীমাধবের ধ্বজা।

৩৬৫টী বাটী ব্রহ্মপুরী নির্ম্মাণ করিয়া (যে কোন ব্রাহ্মণ উহাতে বাস করিতে পারেন) ও একজন গৃহস্থের একবৎসরের প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যাদিসহ পূর্ণ করিয়া প্রতিদিন এক একজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। কাশীর পঞ্চক্রোশী রাস্তা ইহাঁরই প্রস্তুত; ঐ রাস্তার মধ্যে মধ্যে এক একটী কূপ, পান্থশালা ও ভারবাহী দীনদরিদ্রেরা যাহাতে বিনায়াসে মাথার ভার নামাইতে পারে, সেজন্য স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার নির্ম্মিত ছত্রের বাড়ী, দণ্ডীভোজনের বাড়ী, ভোগমন্দিরের বাড়ী, তোপখানার বাড়ী, গোপালের বাড়ী, জয়ভবানীর বাড়ী, কালীবাড়ী ও তারাবাড়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কাশীর হিন্দু-কলেজ আনিবেসেণ্টের আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও

হিন্দু-কলেজ।

অধ্যবসায়বলে স্থাপিত হইয়াছে। একজন বিদেশিনী রমণী হিন্দুর হিতার্থ যে কতটা স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন—তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় ও হৃদয় আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। এই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা অতিশয় সুন্দর। সম্মুখে সুন্দর মাঠ, নানাপ্রকার খেলার ও শারীরিক ব্যায়ামাদি করিবার সুন্দর বন্দোবস্ত। তথাকার ছাত্রাবাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১২০টী ছেলে থাকিতে পারে। বিদ্যাগারের উর্দ্ধতলের হলটি নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্র দ্বারা পরিশোভিত, হলের একপাশে একটী বেদী,—বেদীর উপরিস্থিত ছাদের নিকটের জানালায় জ্ঞান-বিদ্যা-প্রদায়িণী দেবী সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত, এই হলের পার্শ্বস্থিত কক্ষে সভাসমিতি ইত্যাদি হইয়া থাকে।

কুইন্স কলেজ একটী দেখিবার জিনিষ। মৃজাপুরের প্রস্তর দ্বারা নানাবিধ

কুইন্স কলেজ।

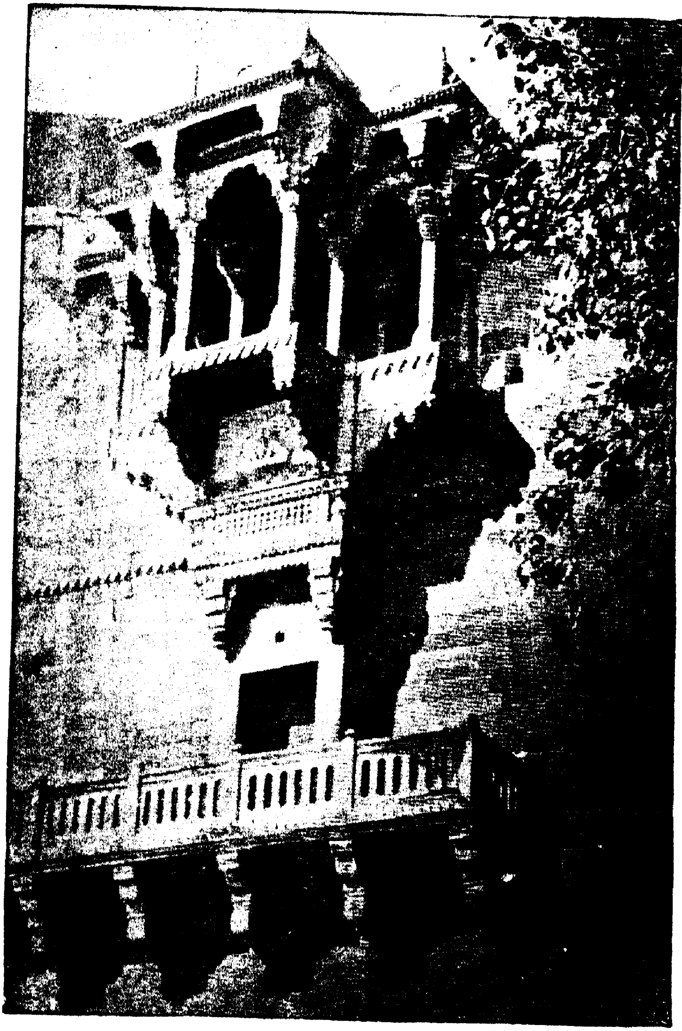
শিল্পকার্য্যাদি-পরিশোভিত এই বিদ্যাগারটী পরম রমণীয়। কলেজের ভিতরকার কাষ্ঠের কার্য্যাদি অত্যন্ত সুন্দর—মুক্ত প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে সুশোভিত সুন্দর কুসুমোদ্যান বিদ্যার্থীদের তৃপ্তিদায়ক। এখানে সারনাথ হইতে আনীত বহু বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং আরও নানাপ্রকার ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে।

কাশীর মান-মন্দির একটী প্রধান দর্শনীয় পদার্থ। কাশী যে কেবল ধর্ম্ম-স্থান বলিয়া খ্যাত তাহা নহে, শিক্ষা-দীক্ষায়ও ইহা সর্ব্বপ্রধান।

সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য ইহা চিরদিনই প্রসিদ্ধ। এক সময়ে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্যও যে এস্থান প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহের নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ মান-মন্দির দৃষ্টেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, অনেকেই ইহা মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। মহারাজা মান-সিংহ তীর্থযাত্রী এবং বিদ্যার্থীদের সুবিধার জন্য মান-মন্দির নামক প্রাসাদটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি মহারাজা সবাই জয়-সিংহের সময় স্থাপিত হয়। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ এক সময়ে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের যে কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, এই মান-মন্দির ইহার পূর্ণ পরিচায়ক। দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহের আদেশে নক্ষত্রের গতিবিধি নির্ণয় করিবার জন্য জয়পুর-রাজ জয়-সিংহ কাশী, দিল্লী, মথুরা, উজ্জয়িনী ও জয়পুর এই পাঁচ স্থানের পাঁচটী মান-মন্দিরে ব্যবহারের জন্য প্রাচীন আর্য্যজ্যোতিষের সাহায্যে "জয়প্রকাশ, রামযন্ত্র ও সম্রাটযন্ত্র" নামক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। মান-মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য এবং বাতায়নাদির গঠন-পদ্ধতি পরিদর্শন করিলে নির্ম্মাতার অপূর্ব্ব কলা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে ১১ × ৯০ বিস্তৃত একটী দেওয়াল, ইহার নাম ভিত্তিযন্ত্র; এই যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের নানাবিধ গতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই যন্ত্রের নিকটে গ্রহাদির গতি নির্ণয় করিবার জন্য একটী যন্ত্র—ঐ যন্ত্রের পরেই সামন্ত বা সম্রাটযন্ত্র। ইহার দেওয়াল ৩৬ × ৪॥ ফুট। এক দিক্ ৬ × ৪॥ ইঞ্চি, অপরদিক ২২ × ৩॥ ইঞ্চ উচ্চ। এই যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রবৃন্দের ঊর্দ্ধ এবং অধঃগতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। সামন্তযন্ত্রের সন্নিকটে আরো দুইটী ভিত্তিযন্ত্র আছে। এখানে জয়-সিংহের আবিষ্কৃত ভিত্তিযন্ত্র, চক্রযন্ত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি যন্ত্র আছে, জয়-সিংহ এ সকল যন্ত্রাদির সহায়তায়ই পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ হিপার্কাস, টলেমি প্রভৃতির যুক্তির ভ্রমপ্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মান-মন্দির।

কাশীর সিক্রোল নামক স্থানেই ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ বাস করেন এবং সেখানেই আফিস আদালতাদি প্রতিষ্ঠিত। রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও সুপরিষ্কৃত। এখানে সাত আটটার বেশী বড় রাস্তা নাই, অধিকাংশই গলি।



মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ—কাশী

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কাশী যে কেবল পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত তাহা নহে—ব্যবসাবাণিজ্যেরও ইহা একটী প্রধান কেন্দ্র। নানা দেশ-দেশান্তর হইতে বহু পণ্য দ্রব্যাদি এখানে আনীত ও বিক্রীত হয়। কাশীর রেসমী কাপড়, শাল, পিত্তলের দ্রব্যাদি, বারাণসী কাপড়, হীরা জহরতাদি জরির কার্য্য এবং নানাপ্রকার খেলনার জন্য ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক প্রধান প্রধান হিন্দুনরপতি এবং জমীদারগণের এস্থানে এক একটী করিয়া বাড়ী আছে এবং তাঁহারা অনেক সময়ে সপরিবারে এস্থানে বাস করিয়া থাকেন। দুর্গ, বারিক, বিশ্ববিদ্যালয়, রেলষ্টেসন, ডাকঘর, আদালত ইত্যাদি সমুদয়ই এখানে আছে। পূর্ব্বে ভারতের নানা স্থান হইতে বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আগমন করিতেন, এখনও আসেন কিন্তু পূর্ব্বের প্রসিদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছে। কাশ্মীরের মহারাজার বাড়ীতে একটী উত্তম সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে, সেখানে বহু বিদ্যাধ্যায়ীকে বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কাশীতে কলের জল হওয়ার পর হইতে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বিসূচিকা রোগ এখানে নাই বলিলেই হয়—মা জাহ্নবীর পবিত্র জলের এমনি অত্যাশ্চর্য্য শক্তি যে উহা পান করিলে কোনও রূপ পেটের পীড়া থাকিতে পারে না। এখানে যেমন অল্পব্যয়ে থাকা যায়—বঙ্গদেশের কোথাও তদ্রূপ সম্ভবপর হয় না। কাশীতে প্রত্যেক দ্রব্যই সস্তা, বিশেষতঃ ফলমূল, শাকসব্জীর ত কথাই নাই,—অনেক দীনাহীনা বিধবা কেবল মাত্র ২॥০, ৩৲ টাকা মাসিক ব্যয়ে এই পুণ্যতীর্থে বাস করিতেছেন। কাশীর একদিকে যেমন ধর্ম্মের পবিত্র স্রোত প্রবহমান, আবার অপরদিকে তদ্রূপ ব্যভিচারের স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; এমন পাপানুষ্ঠান নাই যাহা বর্ত্তমান সময়ে কাশীতে অনুষ্ঠিত না হয়। আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য এ স্থানে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

নানাকথা।

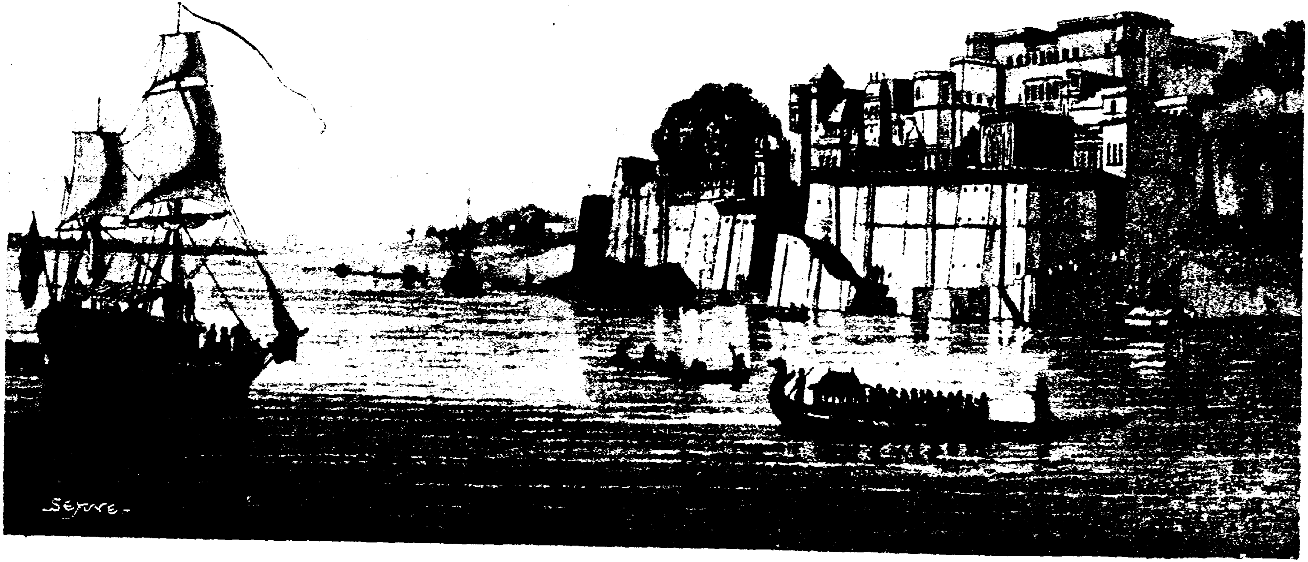
কাশীর অপর তীরে ব্যাসদেবের নির্ম্মিত ব্যাসকাশী অবস্থিত। আমরা একদিন প্রত্যূষে ব্যাসকাশী দেখিতে যাত্রা করিলাম। তরণী-যোগে নদী পার হইলাম। ভাগীরথীবক্ষ হইতে তরুণ রবির কনক-কিরণ-মণ্ডিত মন্দির-চূড়া ও কাশীর সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম বোধ হইয়াছিল। পরপারে উপনীত হইয়া বালুকাময় তটভূমি উত্তীর্ণ পূর্ব্বক

ব্যাসকাশী।

রামনগর বা ব্যাসকাশীতে উপস্থিত হইলাম। একদিকে কাশীর তটপ্রদেশ জাহ্নবীর গর্ভ হইতে যেমন পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ, আবার অপর দিকে রামনগরের দিকের তটপ্রদেশ একেবারেই নিম্ন। কাশীতে মৃত্যু হইলে মানুষ যেমন শিবত্ব লাভ করে—ব্যাসকাশীতে মৃত্যু হইলে আবার গর্দ্দভ-যোনি প্রাপ্ত হয়, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কবি ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গলে" ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণমহিমা এবং দেবী কর্ত্তৃক তাঁহার ছলা অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যাসকাশীতে দেখিবার কিছুই নাই—একটী সামান্য ছোট মন্দির কেবল ব্যাসদেবের কাশীনির্ম্মাণের গৌরব বা বিদ্রূপ ঘোষণা করিতেছে!

এই মন্দিরটীও বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। সম্মুখেই একটী পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর জল অত্যন্ত অপরিষ্কার, মন্দিরমধ্যে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত। রামনগরে কাশীর মহারাজার প্রাসাদ, মহারাজার উদ্যানবাটী, দীর্ঘিকা, মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত হাওয়া খাইবার ঘর ইত্যাদি সকলই সুন্দর। রামলীলার সময়ে এস্থানে খুব আমোদ হইয়া থাকে। ভাগীরথীর কল-কল্লোলমুখরিত সুরম্য তটপ্রদেশে রামনগরের কেল্লা, সেই কেল্লার মধ্যেই মহারাজার প্রাসাদ অবস্থিত। এই কেল্লা বহুকালের প্রাচীন, নদীর মধ্য হইতে ইহার দৃশ্য পরম রমণীয় বোধ হয়। মহারাজার সুসজ্জিত দরবার গৃহ এবং চিত্রশালা দেখিতে বড়ই সুন্দর। চিত্রশালায় বহু রাজবংশীয় নৃপতিগণের চিত্র আছে। নদীর দিকের বারান্দায় উপবেশন করিলে ক্লান্ত শরীর সজীব হয়—অদূরে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে, পরপারে কাশীর সুন্দর দৃশ্য—আর ভাগীরথীর শীতল-সলিল-সম্পৃক্ত সুমন্দ পবন উত্তপ্ত দেহকে সুশীতল ও স্নিগ্ধ করিয়া দেয়।

আমরা দ্বিপ্রহরের সময় কাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। কাশীর কথা পাঠককে নূতন করিয়া বলিব এমন শক্তি কোথায়? যে তীর্থ সকলের সুপরিচিত—যেখানে প্রতিদিনই শত শত হিন্দু আসিতেছেন ও বিশ্বেশ্বরের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছেন,—হিন্দুর সেই পবিত্রতম তীর্থের অনন্ত-কাহিনী লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব—তবু যাহা লিখিয়াছি তাহা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। কাশীর অনতিদূরে সারনাথ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের



রামনগরের দৃশ্য।

(কাশির অপর তীর

দেখিবার জিনিষ। এক সময়ে উহা জগতের ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল,—বুদ্ধদেব গয়া হইতে এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম-শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধগণের নিকট ইহা একটী মহাতীর্থ। তাঁহারা সারনাথকে গৌরবময় কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া বিবেচনা করেন। আমরা একদিন প্রভাতের প্রফুল্লতার মধ্যে সারনাথ দর্শনার্থ গমন করিলাম।

সারনাথ বা বৌদ্ধ-বারাণসী।

সারনাথ কাশী হইতে দুই ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। বৌদ্ধদিগের নিকট ইহা বুদ্ধগয়ার পর মহাতীর্থ বলিয়া বিবেচিত। আমরা যখন প্রথম সারনাথ দেখিতে যাই, সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা—তখন যাহা



বৌদ্ধস্তূপ সারনাথ।

দেখিয়াছিলাম, তাহা হইতে বর্ত্তমান সময়ে দেখিবার উপযোগী আরও অনেক

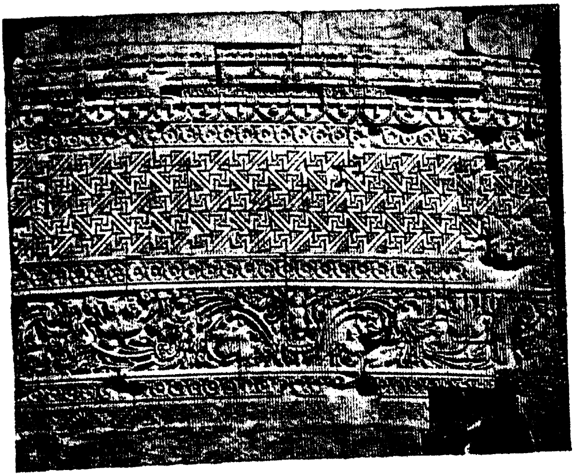
কীর্ত্তি মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সারনাথের নাম ছিল মৃগাদব। মেজরগ্রাণ্ট, কানিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের রিপোর্টে ইহা "Deer park" নামে উক্ত হইয়াছে। মুসলমান সম্রাটেরা যেমন হিন্দুদেব-মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া সেই ভগ্নাবশেষের উপর মস্‌জিদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হিন্দুরাও যে বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ লোপ করিবার জন্য বিহার ও চৈত্য প্রভৃতির উপর দেব-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, হিন্দুর পবিত্রতম তীর্থ কাশীর দেব-মন্দিরাদি হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়,—কাশীর অনেক দেব-মন্দিরই যে বৌদ্ধকীর্ত্তির শোধিত-সংস্করণ, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। যতই পুরাতত্ত্বের নানাবিধ অনুসন্ধান চলিতেছে, ততই বৌদ্ধযুগের প্রকৃত নূতন নূতন তথ্যসমূহ আবিষ্কৃত হইয়া ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইতেছে। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তু, তাঁহার বুদ্ধত্বলাভের স্থান বুদ্ধগয়া এবং তাঁহার দ্বারা সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র ঘূর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া সারনাথ ও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির জন্য কুশীনগর—এই স্থান চতুষ্টয় বৌদ্ধগণের নিকট মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এইস্থান দর্শন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বুদ্ধের সমসাময়িক কাশীর রাজা প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের যজ্ঞস্থল মৃগাদব বা ঋষিপত্তন বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন—তাহার পর হইতে মৃগাদব সঙ্ঘারাম নামে পরিচিত হয়। রাজা অশোক এবং পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্ব-সময়ে সারনাথ বা সঙ্ঘারাম বৌদ্ধকীর্ত্তি-প্রভাবে এবং তীর্থস্থল হইয়া এতদূর শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিল যে, ইহার জন্য হিন্দুর শ্রেষ্ঠতীর্থ চিরপ্রাচীন বিখ্যাত কাশীনগরীর কীর্ত্তি পর্য্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি বিলুপ্ত করিবার জন্য হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে দশাবতারের এক অবতার করিয়া লইয়া, সঙ্ঘারামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করতঃ সঙ্ঘেশ্বরের পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী—সঙ্ঘেশ্বর হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই পরম দেবতা। 'সাহিত্যপরিষদ্' হইতে প্রকাশিত 'কাশীপরিক্রমা' নামক গ্রন্থের একস্থানেও সঙ্ঘেশ্বর বা সারনাথের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

সারনাথের বিবিধ কথা।

"বরুণার পার, হৈয়া শুদ্ধাকার, অসংখ্য লিঙ্গেরে।
যত্নে তাহে পূজি, পরে গিয়া ভজি, দেব সঙ্গেশ্বরে।
কিঞ্চিদ্ধ্যান তথা, করিয়া সর্ব্বথা, কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিবে।
পরে পাশাপাশি, ক্ষেত্রমধ্যে জ্ঞানী, প্রবেশি পূজিবে।"

ইহা হইতেই পাঠকগণ আমাদের অনুমানের যথার্থতা অনুভব করিতে পারিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তি-কলাপাদি মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল,—বৌদ্ধদের সময়ে ইহার নাম 'বুদ্ধকাশী' ও 'ষাড়ঙ্গনাথ' ছিল।

সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন সারনাথের লুপ্তস্মৃতি কাশীর রাজা চেৎসিংহের সময়ে পুনরায় জাগরিত হয়। তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী জগৎসিংহের স্মরণার্থ জগৎগঞ্জ পল্লী-স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া স্থপতিগণকে এস্থানে প্রেরণ করেন, তাহারা পল্লী-নির্ম্মাণোদ্দেশে উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রায় অষ্টাদশ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নদেশে অশোকস্তূপ এবং তন্মধ্যস্থ ধনাগারের সন্ধান পাইয়া, ধনরত্নাদি গ্রহণ করে; দৈবক্রমে উহার মধ্যস্থ দগ্ধনরঅস্থি, মুক্তা, পদ্মরাগমণি, স্বর্ণপাত এবং নিম্নলিখিত বিবরণ সহ একটী বুদ্ধমূর্ত্তি ও হরিদ্বর্ণ মর্ম্মরসম্পূটক, ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বারাণসীর সে সময়কার রেসিডেণ্ট জোনীথান ডান্‌কান্‌ সাহেবের হস্তগত হয়। এই ঘটনার পর হইতেই পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতমণ্ডলীর ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয়। বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত প্রাপ্ত-বিবরণে লিখিত ছিল যে—"গৌড়াধিপতি খ্যাতনামা মহীপাল শ্রীধর্ম্মটির (বুদ্ধদেব) চরণ অর্চ্চনা করতঃ কাশীধামে ১০০ একশত ঈশান ও চিত্রঘণ্টা প্রস্তুত করেন। তাঁহার ভ্রাতাদ্বয় শ্রীস্থির পাল ও বসন্ত পাল বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিয়া সম্বৎ ১০৮৩ (১০২৬ খ্রীঃ) এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন।" জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৩৫—৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সারনাথে বিশেষরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করেন এবং মূর্ত্তি, অট্টালিকার ভগ্নাংশ, স্তম্ভ ইত্যাদি বাহির করিতে সমর্থ হন। কানিংহামের পরে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেজর কিটোও সারনাথ সম্বন্ধে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তিনি ইহার বহুস্থান খনন করাইয়াছিলেন এবং বহু মূর্ত্তি, স্তম্ভ ইত্যাদি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, সে সকল



ধমকস্তূপের কারুকার্য্য।

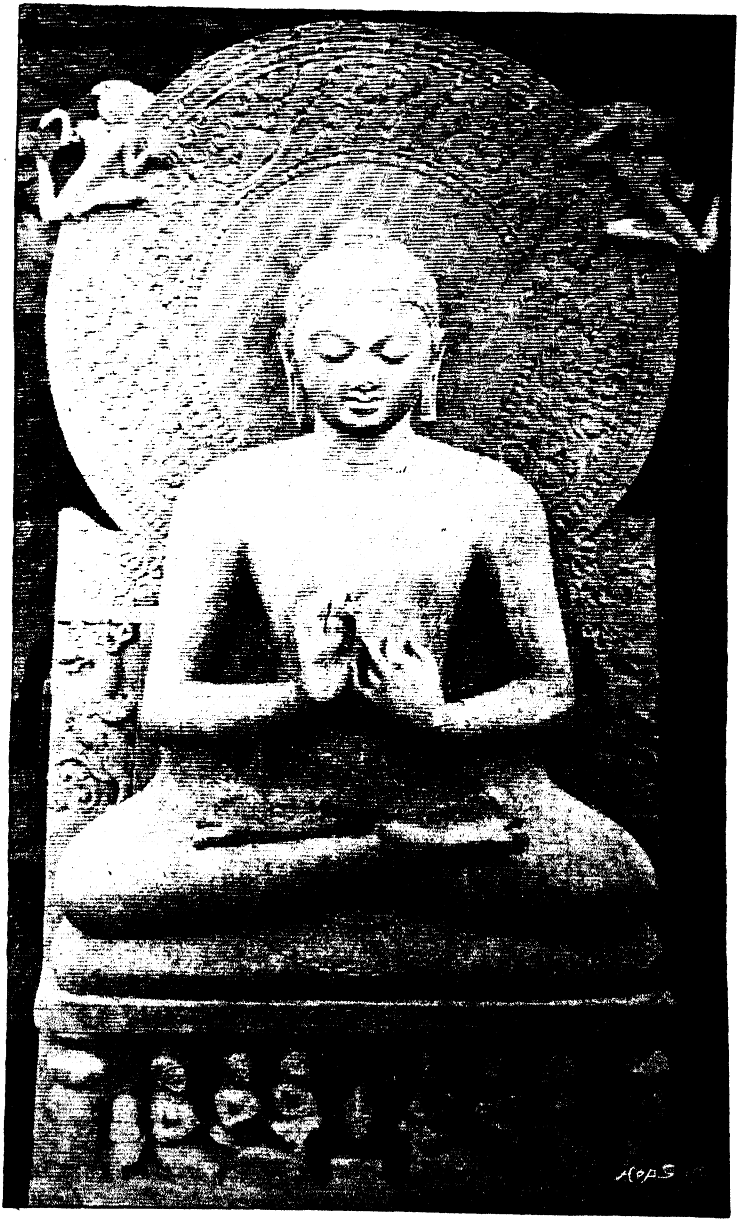
কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের পুরাদ্রব্যাগারে যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। কিটো তাঁহার রিপোর্টের একস্থানে লিখিয়াছেন "All has been sacked and burned—priests, temples, idols, all together; for in some places bones, iron, wood and stone, are found in huge masses and this has happened more than once." পূর্ব্বে যে সকল বৌদ্ধকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তন্মধ্যে ধমক বা ধর্ম্মউপদেশ নামক সুবৃহৎ প্রস্তরময় স্তূপ এবং 'চৌখাণ্ডি' নামক ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকাই প্রধান ছিল। পূর্ব্বে ধমক স্তূপের শীর্ষদেশে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ছিল, এখন তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই। এই ধমক স্তূপ মহারাজা অশোক-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফার্গুসন ইহার যে সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন—আমরা এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতে পাঠকগণ এই স্তূপের গাত্রস্থিত শিল্প-নৈপুণ্য এবং ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভব করিবেন, তিনি লিখিয়াছেন, "The building consists of a stone basement, 93 feet in diameter, and solidly built, the stones

being clamped together with iron to the height of 43 ft. Above that it is in brick work, rising to a height of 110 ft. above the surrounding ruins, and 128 ft. above the plain. Externally the lower part is relieved by eight projecting faces, each 21 ft. 6 inches wide, and 15 ft. apart. In each is a small niche, intended apparently to contain a seated figure of Buddha, and below them, encircling the monument, is a band of sculptured ornament of the most exquisite beauty. The central part consists * * * of Geometric patterns of great intricacy, but combined with singular skill; and above and bellow, foliage equally well designed, and so much resembling that carved by Hindu artists on the earliest Mahomedan



১৯০৫ সনের খননের পর সারনাথের সাধারণ দৃশ্য।

Mosques at Ajmir and Delhi, as to make us feel sure they can not be very distant date." (Fergusson's History



ধ্যানীবুদ্ধ —সারনাথ

কুন্তলীন প্রেস।

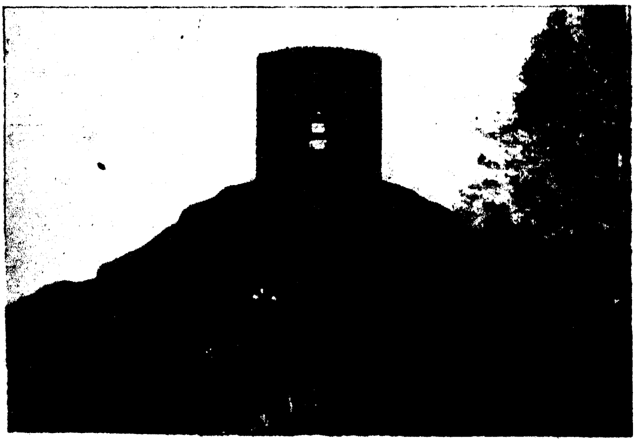
of Indian and Eastern Architecture, page 67.) পূর্ব্বে যে 'চৌখাণ্ডি' নামক ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকার বিষয় বলিয়াছি, উহার সহিত ৩০০০×১০০০ ফুট সারঙ্গতাল ও চন্দ্রাতপ বাহির হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার সহিত কোনও খোদিতলিপি বাহির হয় নাই।

জেনারল কানিংহাম ও কিটো প্রভৃতির অনুসন্ধানের পর সারনাথ সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান না হওয়ায়—তাঁহারা যে সকল দ্রব্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাও লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু বিগত ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্জ্জনের অনুমত্যানুসারে পুরাতত্ত্ব-বিভাগের মিঃ এফ্, ও, অর্টেলের তত্ত্বাবধানে সারনাথের বহুস্থান খনিত হইয়া যে সকল দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহা ভারত ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সারনাথে মহাত্মা শাক্যসিংহ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল,—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অশোকস্তম্ভ।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট্ অশোক এই ঘটনা চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য যে স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, অর্টেলের কৃপায় তাহা এখন লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। এই স্তম্ভটী ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, ইহার গাত্রে যে ৯ ছত্র অশোকলিপি খোদিত ছিল, তাহাও বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্রাট্ অশোক এই খোদিত-লিপিতে 'দেবানাম্ প্রিয়' বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন। এই অনুসন্ধানে, মহারাজা অশ্বঘোষের রাজত্বকালীন একখানা লিপিও পাওয়া গিয়াছে। ভগ্ন-স্তম্ভের শিরোভাগ উহার সম্মুখেই পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভাগ্রভাগের উপরে যে চারিটী সিংহমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক কালের প্রাচীন হইলেও এই সিংহগুলির গঠননৈপুণ্য—স্তম্ভগাত্রে খোদাই, সিংহের সেই তরঙ্গায়িত কেশর, চক্ষু ও মুখের স্বাভাবিক ভঙ্গীদর্শনে বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় শিল্পিগণও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় শিল্পিগণ এককালে যে স্থপতিবিদ্যায় কতদূর উন্নত ও বিচক্ষণ ছিলেন, এ সকল ভগ্নাবশেষ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট উদহরণ পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং সপ্তম শতাব্দীতে এই স্তম্ভ দেখিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা

হইতেই পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, সে সময়ে ইহার শিল্প-সৌন্দর্য্য কতদূর শ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "মহারাজা অশোকের স্তূপের কাছে জেড্ নামক মূল্যবান মর্ম্মর-প্রস্তরের আভাযুক্ত ৭০ ফুট উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে; উহার অভ্যন্তর হইতে একপ্রকার উজ্জ্বল আলো বাহির হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত এ স্থানে প্রার্থনা করে, সে তাহার অভীষ্টানুযায়ী সুফল এই স্তম্ভগাত্রে প্রতিবিম্বিত দেখে। এ স্থানেই বুদ্ধদেব সর্ব্বাগ্রে দিব্যজ্ঞানালোক লাভ করিয়া ধর্ম্মচক্র ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন।" এই স্তম্ভের সহিত একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত ছত্রদণ্ড ও একটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—এই উভয়ের গাত্রে যে খোদিতলিপি আছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টের জন্মের একশত বৎসর-পরবর্ত্তী রাজা কনিষ্কের রাজ্যশাসনকালে এ সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাও ঠিক্ করিয়াছেন যে, খরিপল্লন ও বানস্পর নামক দুইজন বৈদেশিক রাজা কর্ত্তৃক ইহা সংস্থাপিত হয়। ছত্রদণ্ডটার সম্মুখস্থ ভূভাগ খনন করিয়া ছত্রটীও পাওয়া গিয়াছে, এই ছত্রের বৃহত্ব ও



১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনস্তম্ভের নিম্নস্থ খনিত অংশ।

সৌন্দর্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহার অভ্যন্তর ভাগের বিবিধ কারুকার্য্যাদি ধর্ম্মের কোনও রূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী অনুমান করেন।

এখানে ছোট বড় বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধমূর্ত্তি উঠিয়াছে, কোন কোন মূর্ত্তির গাত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গুপ্তাক্ষরে লিখিত উৎসর্গ-লিপি ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সারনাথের নিকটস্থ গ্রামবাসিগণ এ স্থানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে যে,—"নয় লাখ্ দেনেছে নয় কোটি মিলে গা।" এ কথা একেবারে তাচ্ছিল্য করিবার নহে, কারণ দিন দিন যতই এ স্থান খোদিত হইতেছে, ততই নানা প্রকার প্রত্নতত্ত্ব-সম্পর্কীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতেছে। মহারাজা চেৎ সিংহের আমলে যে, এখান হইতে বহু ধন-রত্ন পাওয়া গিয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কে বলিতে পারে যে, এই রত্নগর্ভা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে আরও বহু ধন-রত্নাদি প্রোথিত নাই? এ স্থানের কিছুদূরে "ষাড়ঙ্গতাল" নামক একটী জলাশয়ও দৃষ্ট হয়। সারনাথের স্তূপ মাঠের মধ্যে অবস্থিত—অদূরেই বস্তি। লর্ড কর্জ্জনের কৃপায় এখানে একটী ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, পর্য্যাটকদের বিশ্রাম করিবার জন্য একটী কক্ষ আছে, অপরটীতে এ পর্য্যন্ত যে সকল দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার কতকাংশ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী যে মহান্ একতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ে ভারত ধন্য হইয়াছে! অমর বঙ্কিম সে সময়ের উন্নতির বিষয়ে ও জাতীয় একতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, '* * * তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। * * *' বৈষম্য-পীড়িত ভারতে এ মহামন্ত্র শুনিয়া হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল—বর্ণ-বৈষম্য কতকদূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট্ হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই একছত্রে শাসিত করিয়াছেন—অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি—এইকাল মধ্যেই তাঁহাদের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত বহুজনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধি-



১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের খননে প্রাপ্ত ভিক্ষুগণের প্রার্থনার ক্ষুদ্রাকৃতি বেদী।

শালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল—তদ্দেশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় সম্রাট্‌দিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া অর্দ্ধেক এসিয়াকে ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।" সারনাথ দেখিতে দেখিতে প্রতিমুহূর্ত্তে এই মহাজনবাক্য আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছিল—এই যে আমাদের নয়নসমক্ষে যে ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে, ইহারা কি সেই স্বার্থত্যাগী রাজসন্ন্যাসীর বিশ্বজনীন প্রেম ঘোষণা করিতেছে না? বস্তুতঃ



সারনাথ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বৌদ্ধযুগই ভারতের উন্নতির যুগ, সে সময়ে একতার পবিত্র-বন্ধনে ছোট-বড় সকলে এক ছিল বলিয়াই, প্রত্যেক বিষয়ে ভারতবাসীর উন্নতি হইয়াছিল; তাই ওড়িষ্যার সুদূর সীমান্ত হইতে গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত অশোকের স্মৃতি-স্তম্ভ দেখিতে পাই।

জৌনপুর।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে রাত্রি ৮।৯ ঘটিকার সময় বারাণসীধাম পরিত্যাগ করিয়া আউড এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে (Oudh and Rohilkhand Railway) জৌনপুরের টিকেট করিয়া রওয়ানা হইলাম। রজনীর স্তব্ধ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল, কিয়ৎকাল পরে গাছের আড়াল দিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়ার চন্দ্র হাসিতে হাসিতে সুনীল গগনতলে ভাসমান হইলেন। সে শুভ্রজ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতির যে শোভা দেখিলাম, তাহা যে বাংলা দেশ হইতে স্বতন্ত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; সবই শ্যামলা বঙ্গজননীর সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক রকমের। রেলপথের দুইপার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি চলে, সারি সারি শাল গাছ,—শাল গাছের পরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আপনার বিরাট শরীর শুভ্র জ্যোৎস্না-বরণে ঢাকিয়া সুপ্তিমগ্ন, গ্রামের কোনও চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় জৌনপুর পঁহুছিলাম। যেমন ষ্টেসনে অবতরণ করিয়াছি—অমনি ঝম্ ঝম্ করিয়া প্রবল বারিধারা পতিত হইতে লাগিল—আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি আকাশ ঘন-কৃষ্ণ-মসীমাখা-মেঘে ঢাকা, কাজেই ভিজিতে ভিজিতে বহুকষ্টে বাসা ঠিক্ করিয়া রজনী কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের সে ক্লেশের কথা আর অধিক বিবৃত করিয়া, পাঠকগণকে ক্লেশ দিতে চাহি না। তবে একটা কথা মুরুব্বিয়ানা-ভাবে না বলিয়াও থাকিতে পারি না, যিনি ভ্রমণের স্বর্গসুখ অনুভব করিতে চাহেন, তাঁহাকে বহু কষ্টও ভোগ করিতে হইবে। এই উপদেশ বাক্যটী স্মরণ রাখিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে বাহির না হইলে, দর্শনস্পৃহা চরিতার্থ করা সুকঠিন।

প্রত্যূষে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। পশ্চিমের অন্যান্য নগরের সহিত ইহার যে বড় বেশী পার্থক্য, তাহা নহে—জৌনপুরের খ্যাতি এস্থানের শর্কিরাজাদিগের নির্ম্মিত বহুসংখ্যক মসজিদ ইত্যাদির নিমিত্ত। জৌনপুর অতি প্রাচীন নগর, ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার প্রধান সহর। ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই একশত বৎসরকাল ইহা বুদাউন ও এতাবা

প্রাচীন ইতিহাস।

হইতে বেহার পর্য্যন্ত এক সুবিস্তীর্ণ ও সুসমৃদ্ধ স্বাধীন মুসলমান নৃপতিগণের রাজধানী ছিল,—এখনও এখানে প্রাচীন অট্টালিকা, মন্দির, মস্‌জিদ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিয়া সেকালের স্থপতিবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। এস্থানে মস্‌জিদের সংখ্যাই বেশী, স্বাধীন পাঠান শর্কি-অধিপতিগণ একদিকে যেমন অনেক সুন্দর মস্‌জিদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া নিজেদের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—অন্যদিকে আবার এস্থানের প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হ'ন নাই। বলা বাহুল্য যে অধিকাংশ মস্‌জিদ ইত্যাদি হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষ লইয়া গঠিত। পৌরাণিক যুগে ইহার কি নাম ছিল, তাহা ঠিক্ জানিবার উপায় নাই,—স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা জৌনপুরকে প্রাচীন জমদগ্নিপুর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন—এ সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতে পারেন, সে যাহাই হউক এখানকার হিন্দু অধিবাসীরা কিন্তু ইহাকে অদ্যাপি জৌনপুর না বলিয়া জমনপুর কহিয়া থাকে।

এ স্থানের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মতামত শুনিতে পাওয়া যায়। মুসলমানেরা বলেন যে, সম্রাট ফিরোজশাহ এই স্থান-দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিভ্রাতা জুনানের (পরিশেষে মোহম্মদ তোগলক) প্রীত্যর্থে ইহার নাম জৌনপুর রাখেন। হিন্দুরা বলেন, প্রাচীন জমনপুর নাম ফিরোজের তুষ্টির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া জৌনপুর হইয়াছে। সে যাহাই হউক জৌনপুর যে অতি প্রাচীন নগর তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে "জৌনপুর দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে যাইবার পথে অবস্থিত।" এখানকার জামি মস্‌জিদের দক্ষিণ দ্বারে একখানি শিলালিপি আছে, উহা খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর, এই শিলালিপিতে মৌখরি বংশীয় ঈশ্বর বর্ম্মার নাম লিখিত আছে; ইহা হইতে প্রমাণ করা যায় যে, মুসলমান-শাসনের বহুপূর্ব্বে এ স্থান একটী সমৃদ্ধিশালী হিন্দু-নগরী ছিল। জৌনপুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মস্‌জিদটী দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত। একটী খোদিতলিপি

কয়ার কোট দুর্গ, কয়ার বীরের মন্দির ও মস্‌জিদ।

হইতে জানা যায় যে এই মস্‌জিদটী ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মস্‌জিদটী আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র—উত্তরে ও দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ১০০ শত ফিটের অধিক হইবে না। মস্‌জিদের সম্মুখস্থ

স্তম্ভগুলি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত। ইহা যে প্রাচীন হিন্দু-মন্দির হইতে গৃহীত তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ;—ফাগুর্সন সাহেব এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The front rows of these pillars are richly sculptured, and were evidently taken from some temple that existed there, or in the neighbourhood, before the Moslem occupation, but they seem to have exhausted the stock, as no other such are found in any of the Mosques built subsequently." (p. 421, Furgusson's History of the Eastern and Indian Architecture.)

এই মস্‌জিদটী ব্যতীত জৌনপুরে আরও তিনটী মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জুম্মা মস্‌জিদই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শিল্পচাতুর্য্যময়। ইহার ভিত্তি অন্যান্য মস্‌জিদ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। এই মস্‌জিদের প্রস্তর ইত্যাদি দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা কোনও প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাংশ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

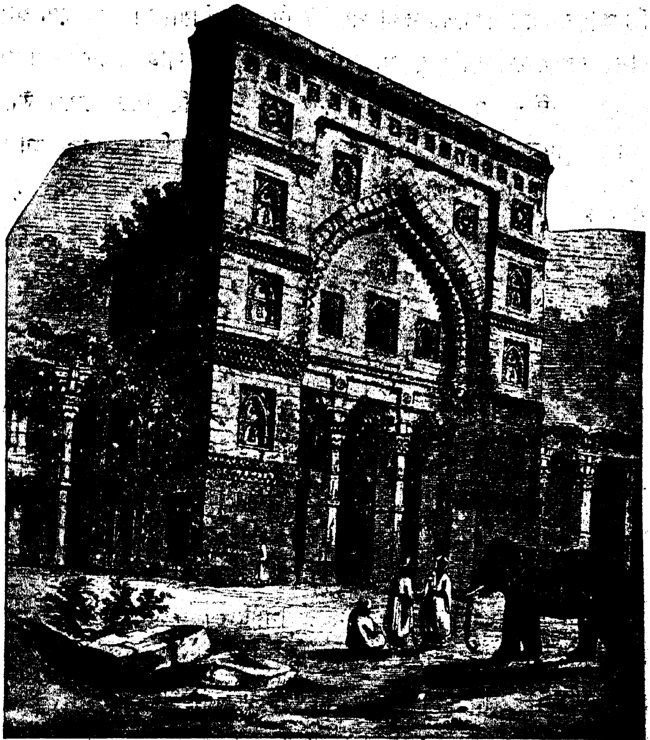
১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরাধিপতি সাহা ইব্রাহিম কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৪৫১—১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হামেনের রাজত্বকালে পরিসমাপ্তি হয়। এই মস্‌জিদের প্রাঙ্গণ ২২০×২১৪ ফিট, পশ্চিম দিকে একসারি অট্টালিকা আছে, উহার মধ্যস্থ অট্টালিকাটীর উপর একটী গুম্বজ আছে। ইব্রাহিম শাহের প্রতিষ্ঠিত অতলা মস্‌জিদটীও দেখিতে মন্দ নহে।

অতলা-মস্‌জিদ।

ফিরোজসাহ ১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবী অতলার মন্দিরের উপর ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম উহার কার্য্য শেষ করেন।* এই মস্‌জিদটীর গঠনাকৃতি বঙ্গদেশীয় স্থাপত্যের অনুরূপ। ইহার কারুকার্য্যাদি-সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য তেমন কিছুই নাই। খোদিতলিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজসাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বাক কর্ত্তৃক

ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বকের মস্‌জিদ।

* জৌনপুরে যে সকল মস্‌জিদ অবশিষ্ট আছে তন্মধ্যে অতলা মস্‌জিদই নানা কারুকার্য্য-বিভূষিত ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ফাগুর্সন সাহেব বলেন—"Of all the Mosques remaining at Jaunpore, the Atala Musjid is the most ornate and the most beautiful." প্রথম দৃষ্টিতে ইহা হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধমন্দির বলিয়া অনুমিত হয় ; মস্‌জিদটী ত্রিতল।



লালদরজা মস্‌জিদ।

নির্ম্মিত হইয়াছিল। মস্‌জিদ্ খালিস্ মুখলিস্ দরিবা ও চরঙ্গুলী নামেও ইহা অভিহিত হয়। ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের মন্দিরের উপর এই মস্‌জিদটী নির্ম্মিত হইয়াছে। নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে মাম্মুদ সাহের সহধর্ম্মিণী বিবিরাজি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লালদরজার মস্‌জিদ অবস্থিত। অন্যান্য মস্‌জিদাদির ন্যায় ইহার গঠনেও বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই—তবে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। আকারে এই মস্‌জিদটী নগরের অন্যান্য সকল মস্‌জিদ হইতে ছোট। এসকল মস্‌জিদ ছাড়া জৌনপুরে দ্রষ্টব্য আরও বহু মস্‌জিদ, মন্দির, সমাধি

মস্‌জিদ-খালিস-মুখলিস ও লাল দরোজা মস্‌জিদ।

প্রভৃতি আছে—সে সকলের কথা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। তন্মধ্যে হাকিম সুলতান মহম্মদের মস্জিদ্, মশিনখাঁর মস্জিদ্, শাহ্ কবীরের মস্জিদ্, জহিদ্খাঁর মস্জিদ্ ও সুলেমান-শাহের দর্গা প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। পুণ্যতোয়া গোমতীর উপরে প্রাচীন প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু আছে—তাহা এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ। পুলটি দৈর্ঘ্যে ৭১২ ফিট এবং যোড়ষটী খিলানবিশিষ্ট। এই সেতুটা মোগলসম্রাট্দিগের সময়ের তৈরি। ১৫৬৯—৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিমখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল—ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সেতুর উভয় পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীর বিপণিশ্রেণী দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমরা যে সকল মস্জিদ্ ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়াও প্রাচীন ধ্বংসাদি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়—সে সকল জৌনপুরের অপর তীরে অবস্থিত। জৌনপুর বাণিজ্য প্রধান স্থান। এখানকার আতর ও খয়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এখানে দেশীয় একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত, কিন্তু কলের প্রতি-যোগীতায় তাহা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গোমতীর উভয় তীরেই আউড এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর ষ্টেসন। গির্জ্জা, ডাকবাংলা, পুলিশলাইন, চুঙ্গি আফিস (গাড়ীর মালামালের শুল্ক আদায় হয়) আদালত ইত্যাদি দেখিতে বেশ—এ নগরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সারাদিন নগরভ্রমণান্তে ক্লান্তকাতর দেহে বাসায় ফিরিলাম ও উদরদেবকে শীতল করিয়া সে দিবস রাত্রি দুই ঘটিকার সময় জৌনপুর ছাড়িয়া ফৈজাবাদ বা অযোধ্যা রওয়ানা হইলাম।

গোমতীর সেতু।

অযোধ্যা—ফৈজাবাদ।

অতি প্রত্যুষে আসিয়া অযোধ্যা উপনীত হইলাম। পুণ্যতোয়া সরযূ (ঘাগরা) নদী ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিতা। অযোধ্যার ষ্টেসনটী খুব ছোট। দশরথের রাজধানী ও নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-কলেবর হিন্দুর চির আরাধ্য কমলা-পতি বিষ্ণুর অন্যতম অবতার শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া ইহা হিন্দু মাত্রেরই মহাতীর্থ। আমরা এখানে বিক্রমপুরবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরকান্ত মুখোপাধ্যায় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহোদয়ের বাসায় অতিথি হইয়াছিলাম,—ইঁহার আদর অভ্যর্থনা ও সদয় ব্যবহার চিরকাল মনে থাকিবে, বিদেশে এরূপ সদয়হৃদয় সুহৃদ পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত এই মহাত্মা যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার অধিক প্রশংসা করিতে গেলে রীতিমত স্তবের মত শুনাইবে বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। ভগবান্ ইঁহাকে সুখী করুন।

আহারাদির পর বিশ্রামান্তে নগর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। প্রাচীন-কাল হইতেই অযোধ্যার প্রসিদ্ধি। রামায়ণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে স্বয়ং মনু এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তখন ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১২ যোজন এবং প্রস্থে দুই যোজন ছিল। বাল্মীকির অযোধ্যা-বর্ণনা পাঠ করিলে যে মহিমাময় মহান্ নগরীর সমৃদ্ধ চিত্র মনে পড়ে, বর্ত্তমান অযোধ্যা দৃষ্টে তাহা অনুমিত হয় না। সূর্য্যবংশের শেষ রাজা সুমিত্র অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিলে ইহার অট্টালিকা সমূহ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া, কালবশে এ নগরী অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। সূর্য্যবংশের আধিপত্যের পরে এ স্থানে বহুদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধাধিপত্যের পরে খ্রীষ্টিয় ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমজিৎ নামক জনৈক হিন্দু-নৃপতি এই পতিত নগরের উদ্ধারকল্পে এবং রামায়ণের লুপ্তকীর্ত্তি সমূহের ধ্বংসোদ্ধারের জন্য অরণ্য কাটাইয়া পুনরায় ইহা নগরে পরিণত করেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি সরযূ নদীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির উদ্ধার করিয়াছিলেন,—বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের

প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

সময়ও ইহা বিনষ্ট হয় নাই। কথিত আছে যে রাজা বিক্রমজিৎ অযোধ্যাতে প্রায় ৩৬০টী দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু ৪২টীর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানাধিকারের সময় এ স্থানে তিনটী প্রসিদ্ধ মন্দির ব্যতীত আর কোনও মন্দির ছিল না।

মোক্ষদায়িকা সপ্ততীর্থের মধ্যে অযোধ্যাই প্রথম। এ সহরে রামচন্দ্রের প্রিয় অনুচর হনুমানবৃন্দের সংখ্যা খুব বেশী। অযোধ্যার দেব-মন্দির সমূহের কোনটীই বিশেষ প্রাচীন নহে। রামকোট অযোধ্যার বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র এ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গের চতুর্দ্দিকে বিশটী বুরুজ ছিল এবং হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বুবান প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ উহার উপরে থাকিয়া নগরের প্রহরাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সেই দুর্গের অভ্যন্তরে ৮টী রাজপ্রাসাদ ছিল—এখন কিন্তু সে সকল কেবল কল্পনার অন্তর্ভুক্ত। রামকোট স্থানটীর বর্ত্তমান দৈন্যদশা দেখিয়া চক্ষে জল আসিল,—কোথায় সেই রামের অযোধ্যা? বাল্মীকির অমর লেখনী যে স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে ক্লান্তি বোধ করে নাই, যে অভ্রভেদী অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ তৎকালীন শিল্পে ও সৌন্দর্য্যে ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, বর্ত্তমান সময়ে তাহার সামান্য চিহ্নটুকু বিদ্যমান নাই যদ্দারা আমরা সেকালের শ্রেষ্ঠত্বের সামান্য ইতিহাসও অনুধাবনা করিতে পারি।

রামকোট।

হনুমান-গড়।

অযোধ্যার দেব-মন্দির সমূহের মধ্যে "হনুমান-গড়" বা মহাবীর গড়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত ও তাহার বীরত্বের জন্য হনুমানের আদর এ অঞ্চলে খুব বেশী। যে স্থানে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্মস্থান এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেখানে প্রাচীন চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলাম না—এ স্থানে কোনওরূপ মূর্ত্তি নাই কেবল শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত-পদ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মস্থানের কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রাচীরের অপরভাগে একটী বৃহৎ মসিদ। উহার গাত্রস্থিত দুই খানা প্রস্তরের গায় ৯৩৫ হিজিরা (১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ) খোদিত আছে। বহু হিন্দু মন্দিরের মালমসলা দ্বারা ইহা নির্ম্মিত।

সম্রাটের মসিদ।

সম্রাট্ বাবর ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃগয়া করিতে আসিয়া কিছুদিন এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন সে সময়ে এই মসিদ প্রস্তুত হয়। রামচন্দ্রের জন্মমন্দিরস্থ কষ্টি পাথরের কয়েকটী স্তম্ভ অদ্যাপি বাবরের মসিদে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মন্দির ও মসিদ লইয়া খুব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইত, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধিকারের পর হইতে জন্মস্থান ও মসিদের মধ্যে রেলিং দেওয়া হইয়াছে, এখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও-রূপ গোলযোগ নাই।

মণিপর্ব্বত, সুগ্রীব-পর্ব্বত ও কুবের-পর্ব্বত।

অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেই নয়ন সমক্ষে মণিপর্ব্বত দৃষ্ট হয়। ইহা প্রায় ৪৪ হস্ত উচ্চ, রামায়ণের মতে লক্ষ্মণ শক্তি-শেলে পতিত হইলে, হনুমান বিশল্যকরণী চিনিতে না পারিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া যখন লঙ্কাভিমুখে যাইতেছিল, সে সময় অযোধ্যার উপর আসিলে, ভরত বাটুলাঘাত করেন, সেই বাটুলাঘাতে হনুমান ভূমিতে পতিত হইলে গন্ধমাদনের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—এই মণিপর্ব্বতকেই সেই ভগ্নাংশ বলিয়া অযোধ্যাবাসিগণ বলিয়া থাকেন। এই উচ্চ স্থানটী ইট, পাথর ও কঙ্করের পাহাড় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ ইহার কলেবর উহা দ্বারাই পরিপূর্ণ। এই স্তূপের নিম্নে যে খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে মগধরাজবংশীয় নন্দবর্দ্ধন নামক জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যায় সুগ্রীব-পর্ব্বত এবং কুবের-পর্ব্বত নামক আরও দুইটী স্তূপ আছে,—তন্মধ্যে প্রথমটী প্রায় ৬ হাত উচ্চ এবং কুবেরপর্ব্বত প্রায় ১৪ হাত উচ্চ। কোন কোন প্রত্ন-তত্ত্ববিদ ইহাদিগকে বৌদ্ধ-স্তূপ বলিয়া অনুমান করেন, এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মণিপর্ব্বতের নিকট দুইটী সমাধি দেখিলাম, উহার একটীতে সেথ এবং অপরটীতে জব নামক পৈগম্বর সমাহিত আছেন। এস্থানে সোমগিরি নামক যে দুইটী ছোট ছোট স্তূপ দেখিলাম তাহাদের সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। অযোধ্যাতে এখন প্রায় সর্ব্বশুদ্ধ ৯৬টী মন্দির আছে, ইহার মধ্যে ৬৩টী বিষ্ণু-মন্দির ও ৩৩টী শিব-মন্দির—আমরা প্রায় সকল গুলিই দেখিয়াছিলাম। সরযু-নদীর তীরে রামঘাট বা স্বর্গদ্বার, সীতাঘাট, লক্ষ্মণঘাট প্রভৃতি বহু ঘাট

আছে। সীতার মন্দিরটী নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাজ্ঞী অহল্যা-বাইয়ের দৃষ্টি পড়ায় ইহা সুসংস্কৃত হইয়াছে—সীতার ঘাটটীও তিনিই বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ বা লছ্মনঘাটেই ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-আজ্ঞায় সরযূ-সলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া অদ্ভুত ভ্রাতৃ-প্রেমের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-ভক্তি চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। রামঘাটে রামচন্দ্র ও জীবন-সর্ব্বস্ব ভ্রাতার পন্থানুসরণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। রামঘাটে আসিয়া যখন দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন হৃদয়ে যে কি এক মহান্ স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইতেছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। রামঘাট হইতে কিয়দ্দূরে সরযূর পশ্চিমদিকে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা কে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে অতিশয় প্রাচীন বলিয়াই বোধ হইল।

রামায়ণের প্রতিদৃশ্য নয়ন সমক্ষে অভিনীত হইতে দেখিতেছিলাম,—কিন্তু সে প্রাচীন-মহত্ত্ব এখন কোথায়! ধীরে সরযূ—আমাদের পদতলে বহিয়া যাইতেছিল—কিন্তু তাহার সেই কলনাদের মধ্যে ত মধুর রাগিণী বাজিয়া উঠিল না! সে যেন শোকাকুলিত চিত্তে অতি দুঃখে শোক-সঙ্গীতে সাগরাভিমুখে যাইতেছিল। একদিন সে রামচন্দ্রের পিতৃসত্যপালনার্থ বন-গমন দৃশ্য দেখিয়াছিল,—সে শোক-দৃশ্যের পরে পুনরায় রাম-রাজত্বের অপূর্ব্ব পুলকদৃশ্যও অভিনীত হইতে দেখিয়াছিল—কিন্তু আজ—কেবলই শোক-কাহিনী—কেবলি শ্মশান-ভস্ম বুকে করিয়া তাহাকে বহিয়া যাইতে হইতেছে। অযোধ্যায় রামচরিত্রের কতকগুলি মূর্ত্তি গঠিত আছে, শিল্প-নৈপুণ্যের তাদৃশ শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলেও এগুলি দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। কোথাও অভিমানিনী কৈকেয়ীসুন্দরী নিরাভরণা ও ধূল্যাবলুণ্ঠিতা, রাজা দশরথ অবনত বদনে মানিনীর মানভঞ্জন করিতেছেন, কোথাও শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ বল্কল বসনে দেহ আবৃত করতঃ বন-গমন করিতেছেন; আবার কোন স্থানে শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী, কিন্তু সাধ্বী সতী জনক-নন্দিনী বনবাসে, ওদিকে সস্ত্রীক না হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পাদিত হয় না সেজন্য সুবর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞে ব্রতী

হইয়াছেন; এসব দেখিতে দেখিতে অযোধ্যার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, কি ছিল কি হইয়াছে—অতুল-গৌরব-বৈভব-মণ্ডিত মহানগরী আজ শ্মশান! কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি—সে সকল প্রাচীন-কাহিনী চিন্তা করিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন? অযোধ্যার রামলীলা বিশেষ দর্শনীয়, দুঃখের বিষয় আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই। প্রতি বৎসর রামনবমীর সময় এ স্থানে মেলা হইয়া থাকে—মেলায় প্রায় ৫০,০০০০ লোক সমাগম হয়। নানাপ্রকার রাজবিপ্লবাদির পরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছে; অযোধ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার প্রায় সাতটী মঠ আছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একএকটী বিভিন্ন মঠ। হনুমান-গড়ে নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের মঠ আছে দেখিয়াছিলাম। এ নগরে জৈনদেরও ছয়টী মন্দির আছে—মন্দিরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। সরযূর তীরে বিশেষতঃ স্বর্গ-ঘাটেই যাত্রিগণ স্নান, দান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকেন। এই ঘাটটী পাকা করিয়া বাঁধান, তীরে মনোহর বৃক্ষ-শ্রেণী থাকায় এ স্থানের সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধতা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে।

সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অযোধ্যানগরী দর্শনান্তে, শেষ বেলা ফৈজাবাদ দেখিতে রওয়ানা হইলাম। অযোধ্যা হইতে ফৈজাবাদ ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তার ধূলি উড়াইয়া আমাদের অশ্ব-শকট প্রায় বেলা ৩৷৷০টা চারিটার সময় ফৈজাবাদ পৌছিল। উক্ত জেলার ইহাই প্রধান নগর ও

ফৈজাবাদ।

সেনানিবাস। অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে ফৈজাবাদ বিভাগ বিশেষ বিখ্যাত। এই সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদি দ্বারা সুশোভিত। ফৈজাবাদ বহুদিনের প্রাচীন নগর নহে, ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে মনসুর আলিখাঁ এ স্থানে আসিয়া অনেক দিবস অতিবাহিত করেন, তাহার পরে তদীয় বংশোদ্ভব সুজাউদ্দোলা কর্ত্তৃক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। ইহা যে একদিন মুসলমানের নগর এবং মুসলমান কর্ত্তৃকই স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এখানকার মস্‌জিদের সংখ্যাধিক্য দৃষ্টেই সহজে অনুভূত হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আসফ্‌উদ্দৌলা এ স্থান হইতে রাজদরবার লক্ষ্ণৌতে তুলিয়া নেওয়ার পর হইতেই ফৈজাবাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতে থাকে। বহুবেগমের সময়ও

এ নগরের সমৃদ্ধি ও শোভা বহু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বেগম সাহেবার মৃত্যু হইতেই—এই সহরের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফৈজাবাদের প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ, বহুবেগমের সমাধি ও তৎসংলগ্ন 'দেল-খুসি' নামক সুন্দর প্রাসাদ। অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে ফৈজাবাদের এই দেল-খুসি প্রাসাদ প্রধান দেখিবার জিনিষ। ফৈজাবাদের মস্‌জিদ্‌, প্রাচীন অট্টালিকাও দেলখুসি ইত্যাদি দর্শনান্তে ষ্টেসনে গমন করিলাম ও রাত্রি নয়টার সময় লক্ষ্ণৌ রওয়ানা হইলাম।

সেদিন রজনী অন্ধকারময়ী—অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল,—জানালার পাশে মুখ বাহির করিয়া বসিয়াছিলাম, বাতাস আসিয়া—উত্তপ্ত ও ক্লান্ত দেহ শীতল করিয়া দিল। আকাশে চিরপরিচিত তারার মালা দীপ্ত হীরার মত জ্বলিতেছিল—গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবিতেছিলাম—তাহার আদি ও শেষ কিছুই ছিল না। ভ্রমণ যে কি সুখের, তাহা যিনি কখনও ঘরের বাহির হ'ন নাই তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না। কত অনিদ্রা—কত ক্লেশভোগ করিতেছি, তবু দর্শন-স্পৃহার হ্রাস হইতেছে না। জগদীশ্বরের এমনি অপূর্ব্ব দয়া যে যেখানে যাইতেছি সেখানেই, প্রিয় সুহৃদ্‌ জুটিয়া যাইতেছে, সকলেই যেন কত আপনার। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আধ ম্লান আধ আলোর মাঝখানে যখন পূর্ব্ব গগনের অর্গল খুলিয়া উষা-সুন্দরী স্বীয় রূপপ্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, আমরা সে সময়ে আসিয়া লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে পঁহুছিলাম,—তখন লক্ষ্ণৌঠুংরিতে আমি যেন শুনিতেছিলাম "সাহাজাদে আলম্‌ তেরা লিয়ে।"



লক্ষ্ণৌ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌ সহর দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতেই আমার হৃদয় উৎসুক ছিল, কাজেই যে মুহূর্ত্তে গাড়ী হইতে ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম, তখন হৃদয়ে যে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষ্ণৌর বহির্দৃশ্য আরব্য-রজনীর কোনও অলৌকিক নগরের চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে অশ্ব-শকটে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পথের দুই ধারে ফুল ফলের ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর বাগান। ক্রমে সহরের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত পরিখার সেতু উত্তীর্ণ হইয়া, ফতেদাস বাবাজীর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

প্রাচীন ইতিহাস।

লক্ষ্ণৌ কলিকাতা হইতে ৬১০ মাইল দূরে অবস্থিত, ইহা অতি প্রাচীন সহর। নির্ম্মল-সলিলা গোমতী নদী নগরের পদধৌত করিয়া প্রবাহিতা। এই নগরের লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার। ভারতবর্ষের নগর সমূহের মধ্যে ইহা চতুর্থ স্থানীয়, কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতির পরেই ইহার সৌন্দর্য্য ও বৈভব-খ্যাতি। গোমতী নদীর উভয় তীরে নানাবিধ সৌধমালা বিরাজিত থাকায় লক্ষ্ণৌর সৌন্দর্য্য মনোহারিণী। মুসলমান রাজত্বের সময় ইহা উত্তর পশ্চিমের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, ইংরেজ রাজত্বেও আফিস আদালতাদি সমুদয় এখানে থাকায় ইহার পূর্ব্ব গৌরব কোন অংশেই হ্রাস হয় নাই। লক্ষ্ণৌর নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, রঘু-কুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনানন্তর ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে এ প্রদেশের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ গোমতীর তটবর্ত্তী এই সুরম্য প্রদেশকে মনোনীত করিয়া এস্থানে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন ও নিজ নামানুসারে ইহার নাম লক্ষ্মণপুর রাখিলেন, কালক্রমে লক্ষ্মণপুরই অপভ্রংশ হইয়া লক্ষ্ণৌতে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ পূর্ব্বে দিল্লীর মোগল সম্রাটের অধীন ছিল। মোগল সম্রাট্ মহম্মদসাহের শাসন-কালে সদৎখাঁ নামক জনৈক

খোরসানী বণিক দিল্লী-দরবারে উপস্থিত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় দক্ষতাগুণে প্রতিষ্ঠালাভ করতঃ সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হ'ন, সদৎখাঁ কর্ত্তৃকই লক্ষ্ণৌ অযোধ্যার রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। এই সদৎখাঁই নরপিশাচ নাদির সাহকে ভারতে নিমন্ত্রিত করিয়া লুণ্ঠনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন, কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে পুনরায় নাদির কর্ত্তৃক ভীষণরূপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সদৎখাঁই অযোধ্যার নবাববংশের পূর্ব্ব পুরুষ। ইঁহার মৃত্যুর পরে সদতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা সফদর জাঙ্গ সদৎ প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনকে দৃঢ়তর করিয়া রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে সুজাউদ্দৌলা নবাব হ'ন,—এই সুজাউদ্দৌলার সময়েই ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইংরাজাধিপত্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে। সুজার পরে তৎপুত্র আসফ নবাব হইলেন, লক্ষ্ণৌর অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য ইমামবাড়ী এই আসফদ্দৌলাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আসফের পর মির্জ্জাআলী, তৎপরে সদৎআলী প্রভৃতি অনেকেই রাজত্ব করেন; তৎপরে ১৮৪৭খৃঃ অব্দে ওয়াজিদআলী অযোধ্যার নবাব হন। ইনি অযোধ্যার শেষ নবাব। ১৮৫৬খৃঃ অব্দে ডালহৌসি ওয়াজিদআলীসাহকে কু-শাসন অপরাধে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ওয়াজাদ আলী সাহা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন—সুবিখ্যাত লক্ষ্ণৌঠুংরি ইঁহারই রচিত। বন্দী ওয়াজাদ আলীর শোক-সঙ্গীতে একদিন ভারত কাঁদিয়াছিল—তাঁহার বড় সাধের ছত্রমঞ্জিলে শোকের ঝড় বহিয়াছিল;—চির সুখাভ্যস্ত—চিরবিলাসী—ওয়াজাদ ইংরেজের বন্দীবেশে তাঁহার প্রিয়তম লক্ষ্ণৌ নগরীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় হৃদয়ের সুতীব্র যাতনা নিঃসৃত শোকাশ্রুর সহিত কাতরকম্পিতকণ্ঠে লক্ষ্ণৌঠুংরিতে গাহিয়াছিলেন—

"যবে ছোড় চলি লক্ষ্ণৌ নগরী
তেরা হালে আদ্‌ম প্যারা ক্যাগুজারি।
আদামা গুজারি, সাদমা গুজারি,
যব হাম্ গুজারি, দুনিয়া গুজারি।"

এ শোক-সঙ্গীতে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়াছিল, আজ এই দীপ্ত সূর্য্যালোকে অদূরস্থিত ছত্র-মঞ্জিলের কনক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে হতভাগ্য নবাবের শোক-সঙ্গীত হৃদয়ে বড় করুণ-তান তুলিয়া দিয়াছিল। এইরূপে মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে ১৮৮৭খৃঃ অব্দে তাঁহার জীবন-লীলা সাঙ্গ হইল। ওয়াজিদের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার একমাত্র কন্যা ও তাঁহার জামাতা জাহান কাদির মীর্জ্জা, গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া মেটিয়াবুরুজেই বাস করিতেছেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহী সিপাহীবর্গের একটী প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল ছিল। নানাস্থান হইতে আগত বিদ্রোহী সিপাহীবর্গ সমবেত হইয়া এখানকার রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছিল, সে সময়ে সুবিখ্যাত হেন্‌রি লরেন্স লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট ছিলেন, সেকালে ইঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ইংরেজদের মধ্যে কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি এ অঞ্চলের সমুদয় ইংরেজ নরনারীগণকে প্রায় ছয়মাস কাল পর্য্যন্ত পিশাচপ্রকৃতি বিদ্রোহী সৈনিকবৃন্দের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসভবন অদ্যাপি গোলাগুলির চিহ্ন বক্ষে করিয়া তদীয় বীরত্বের ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, সে গৃহের ছাদ ধসিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীর এখনও গোলাগুলির শত ছিদ্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীলোকগণকে তোষাখানাতে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু দৈবের অদ্ভুত-চক্রের অদ্ভুত গতি কে রোধ করিতে পারে? তোষাখানার ভিতরেও কোনওরূপে একটী গোলা প্রবেশ করিয়া জনৈকা রমণীর মস্তক উড়াইয়া দিয়াছিল। সেই হতভাগিনী রমণীর শোণিত-চিহ্ন, গোলার ভীষণ দাগ, এখনও দেওয়ালের গায়ে রহিয়াছে। হেন্‌রি লরেন্স যে স্থানে আহত হ'ন এবং যে স্থানে মৃত্যু আসিয়া এই মহিমামণ্ডিত পুরুষকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়—সে স্থান দুইটী এখনও চিহ্নিত রহিয়াছে। আমরা এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। তাঁহার সমাধির উপর লিখিত আছে—Here lies Henry Lawrence who tried to do his duty"—"স্বকীয় কর্ত্তব্য-সাধনপ্রয়াসী সার হেন্‌রি লরেন্স এই স্থানে চিরনিদ্রিত আছেন।" এখানে জেনেরলহ্যাবলক, মেজরআউটরাম, প্রভৃতি অনেকেই অনন্ত-শয্যায় নিদ্রিত।

সিপাহীবিদ্রোহে লক্ষ্ণৌ।

রাত্রিতে অনিদ্রাবশতঃ শরীর বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছিল, কাজেই মধ্যাহ্নে আহারাদির পর নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম,—এ স্থানে খাদ্য দ্রব্যাদি বিশেষ সুলভ। নিদ্রান্তে অপরাহ্নে নগর দেখিতে বাহির হওয়া গেল,—সুন্দর নগরী—দুই পার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা,—দেখিতে বেশ। রাজপথে অনেক বাঙ্গালী দেখিলাম —এ নগরে অনেক বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। প্রথমেই কৈসরবাগ দর্শন করিতে গমন করিলাম। রেসিডেন্সির পার্শ্বেই ইহা অবস্থিত।

কাইসর, কৈসর বা কেশরবাগ।

একটী প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ দ্বিতল অট্টালিকাশ্রেণী অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল গৃহে নবাব ওয়াজাদআলীর বেগমেরা বাস করিত, এই প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী প্রস্তর গঠিত সুবৃহৎ অট্টালিকা, ইহার নাম 'বারদ্বারী' বা বারদুয়ারী। বারদ্বারীর ছাদ বিস্তৃত খিলানের উপর স্থাপিত ও চিত্রলিখিত, দেখিতে বড়ই লোচনানন্দদায়ক। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার জন্য চারিদিকেই বড় বড় দরোজা আছে। এই সুন্দর রাজভবন নবাব ওয়াজিদআলী সাহা স্বকীয় বিলাসোপকরণ স্বরূপ আশী লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বারদ্বারীর চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পুষ্পের উদ্যান। ওয়াজিদআলি সাহ 'বারদ্বারী' ভবনকে প্রমোদভবন রূপে ব্যবহার করিতেন, এখন সেখানে জনসাধারণের সভা সমিতি হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব-দিকের দ্বারকে 'লাখীদরওয়াজা' কহে। এই দ্বার নির্ম্মাণ করিতে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার কবাট-গাত্রে মৎস্যাঙ্গনাযুগল রাজকীয় চিহ্নস্বরূপ অঙ্কিত রহিয়াছে। এখানকার চতুর্দ্দিকস্থ অট্টালিকার প্রকোষ্ঠ সমূহে নানা দেশীয়া অতুলনীয়া রূপসীবৃন্দ নবাবের পত্নীরূপে বাস করিতেন। খোঁজা ও স্ত্রীলোক ব্যতীত এখানে অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার ছিল না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ নবাব ওয়াজিদআলী তাঁহার প্রায় তিন শত পত্নীসহ সর্ব্বদা নানারূপ প্রমোদ বিলাসে দিনাতিপাত করিতেন—তাঁহাদিগকে লইয়া রাস, দোল প্রভৃতি সৌখীন ক্রীড়ায় মগ্ন থাকিতেন। হায়রে বিলাসিতা! আমরা কল্পনায়ও এরূপ অপূর্ব্ব বিলাসিতার কথা অনুভব করিতে পারি না। যিনি সর্ব্বদা এতদূর বিলাস-ব্যাসনে দিনাতিবাহিত করিতেন, তাঁহার রাজ্যনাশ

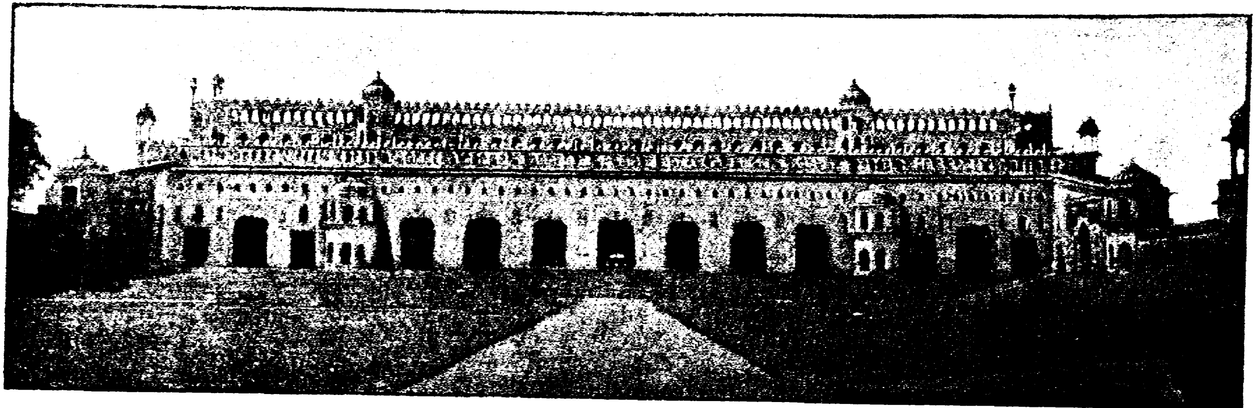
বিচিত্র নহে। রমণীগণের স্নানের হামাম এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত, উহার একদিকে একটী জল-প্রণালী ও তাহার উপরে একটী সেতু দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের প্রথম তারিখে যে মেলা বসিত তাহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল, তখন নগরের প্রায় সকলেই সমবেত হইয়া সেদিন অপূর্ব্ব আনন্দোৎসবে অতিবাহিত করিত। বর্ত্তমান সময়ে কৈসর-বাগের সে সৌন্দর্য্য আর নাই—চারিদিকেই যেন কেমন একটা নৈরাশ্যের ছায়া দেদীপ্যমান। যে স্থানে একদিন রূপসী ললনাকুল নিজ নিজ রূপপ্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিত, যেখানে লক্ষ্ণৌঠুংরির মধুর নিনাদে আনন্দ-লহরী নাচিয়া বেড়াইত, আজ তাহার কি পরিণাম! এখন প্রাঙ্গণস্থ উত্তরদিকের সৌধনিচয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে ভূমিসাৎ হইয়াছে,—একদিক ভাঙ্গিয়া ক্যানিং কলেজের কলেবর গ্রথিত হইয়াছে—অন্যদিকে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত 'লাখ্ দরওয়াজা' বা লক্ষ্মী-দরোজা এখনও বিদ্যমান। আমরা লাখ্-দরোজা পার হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরীর প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া দেখিতে চলিলাম, লাখ্-দরোজার বাহিরের পথের নিকট আসিবা মাত্রই সম্মুখে কাইসর-পছন্দ বা রোসন-উদ্দৌলা নামক একটী শোভাময় সৌধ দেখিয়াছিলাম। কৈসর বা কাইসরপছন্দ নামক সৌধের উপরিভাগ অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি ও স্বর্ণময় আবরণে আবৃত। এই অট্টালিকা নবাব ওয়াজিদ্ আলী শাহ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়তমা বেগম মস্তুক্-উষ-সুলতানাকে বাসের জন্য দান করিয়াছিলেন। ইহার সম্মুখভাগেই 'শের দরওয়াজা' নামক সিংহদ্বার, ইহা এখন 'নীল-দ্বার' নামে পরিচিত, এস্থানে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লাখী দ্বারের নিকট স্থাপিত একটা কামানের লক্ষ্যশূন্য গোলাতে সেনাপতি নীল আহত হইয়াছিলেন বলিয়াই এই দ্বারকে ইংরেজেরা 'নীল-দ্বার' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইমামবাড়া।

এই প্রসিদ্ধ অট্টালিকার সর্ব্বাগ্রস্থিত তোরণকে 'রুমি দরোজা' কহে, ইহা রুমদেশের অনুকরণে গঠিত প্রকাণ্ড তোরণ। এই তোরণ দ্বারের গঠনের সহিত গ্রীক্ এবং ইতালীয় গঠনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। রুমি দরোয়াজাই ইমামবাড়াতে প্রবেশ করিবার প্রকাশ্য পথ। এই তোরণ পার হইয়া গেলেই ইমামবাড়ার মুল তোরণের

নিকট পঁহুছা যায়। উহা উত্তীর্ণ হইলেই একটী প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট কক্ষ বিশিষ্ট প্রাচীর ; তাহার এক পার্শ্বে একটী সুন্দর মসজিদ দিবালোকে ঝলমল করিয়া সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছিল।

মসজিদ দর্শনান্তে আমরা প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বস্থিত, ইমামবাড়ার সম্মুখে আসিলাম। কি বিরাট দৃশ্য ! নবাব আসফ্ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক এই বিরাট ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় নবাব অন্নকষ্ট প্রপীড়িত নরনারীগণের সাহায্যার্থ এই সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, প্রজাবর্গ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিনিময়ে ইহা নির্ম্মাণ করিত, কথিত আছে যে অন্নকষ্ট প্রপীড়িত অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণে এই অট্টালিকার নানাবিধ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহারা রাত্রিতে আসিয়া আপনাদের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। ইমামবাড়ার অট্টালিকা দেখিতেও যেমন সুন্দর, ইহার গঠন এবং ভিত্তিও আবার তাদৃশ দৃঢ়। ইহার প্রাচীরের বেধ প্রায় ১২ ফুট, একটী প্রকোষ্ঠ ১৬৭ × ৫২ ফিট, এতাদৃশ বৃহৎ প্রকোষ্ঠ জগতের আর কোথাও নাই।* ঐ বৃহত্তম কক্ষের দুই পার্শ্বে দুইটী অষ্টভুজ কক্ষ আছে, উহার ব্যাস প্রায় ৫৩ ফুট হইবে। এই তিনটী প্রকোষ্ঠই মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভারে সুসজ্জিত ; কিন্তু একদিন যে সকল চারু-শিল্পকলায় গৃহ-প্রাচীর সুচিত্রিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে আমরা তাহার অতি ক্ষীণতর প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিতে পাই। কক্ষের উর্দ্ধভাগ লোহিত প্রস্তর-নির্ম্মিত বারাণ্ডা দ্বারা পরিশোভিত, ঐ সকল বারাণ্ডায় বসিয়া নবাবের বেগম সাহেবাগণ কোরাণ শ্রবণ করিতেন। সমগ্র দ্বিতলটী একটী গোলকধাঁধা, ইহাতে একবার প্রবেশ করিলে কোনও পথ-প্রদর্শক সঙ্গে না থাকিলে পুনরায় বাহির হইয়া আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলেই হয়। কথিত আছে যে নবাবের সহিত তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ এস্থানে লুকোচুরি খেলিতেন। কক্ষগুলি বহুমূল্য ঝাড়ে সুশোভিত। কোন ঝাড়ে ৬০, কোন ঝাড়ে ৮০, কোন ঝাড়ে ১২০টী বাতি আছে। সুবৃহৎ হলটীর মধ্যভাগেই নবাব আসফ্উদ্দৌলা অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন, তাঁহার সে সাধের ঘুম আর ভাঙ্গিবেনা। আজ আসফ্উদ্দৌলাই বা কোথায় তাহার রাজ্য সম্পদই বা কোথায় ! আসফ্উদ্দৌলা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দানশীলতার



এমামবাড়া — লক্ষ্ণৌ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কাহিনী লুপ্ত হয় নাই—এখনও লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—

যেস্‌কো নাহি দেয় মৌলা,
উস্‌কো দেয় আস্‌ফ উদ্দৌলা।

আর এই যে আমরা অদ্য পর্য্যাটকের বেশে হেথায় উপস্থিত—আমরা কি বলিতে পারি যে আগামী কল্য আমাদের কি হইবে? প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন ইত্যাদি দর্শন করিলে কেন জানি অজ্ঞাতভাবে হৃদয়ে একটা ম্লান মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়ে, এবং জগতের নশ্বরত্ব আপনা হইতে আসিয়া পরিস্ফুট হয়। এই সুবৃহৎ ইমামবাড়ার অনতি দূরে ছোট ইমামবাড়া অবস্থিত, ইহা আকৃতিতে ঠিক্ বড় ইমামবাড়ারই মত—এইটি ছোট হইলেও কারুকার্য্যাদিতে বড়টী হইতে শ্রেষ্ঠ। ছোট ইমামবাড়ার সম্মুখে একটী উদ্যান থাকায় এ স্থানের সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নবাব আসফ্ উদ্দৌলার সময়ে লক্ষ্ণৌ স্থাপত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল,—ইনি স্থাপত্যগৌরব বৃদ্ধি করিতে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। সে সময়ে ভারতের কোন নরপতিই জাঁক জমকে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। ছোট ইমাম-বাড়া সাধারণতঃ হোসেনাবাদ ইমামবাড়া নামে পরিচিত, ইহা মহম্মদ আলী-সাহেব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহার সংলগ্ন যে উদ্যানের কথা আমরা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহাতে বিশ্ব-বিখ্যাত তাজমহলের অনুকরণানুযায়ী একটী ক্ষুদ্র সৌধ আছে—তাজের ঠিক অনুকরণ যে হইতে পারেনা ইহা বলাই বাহুল্য। হোসেনাবাদ ইমামবাড়ার প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে একটী অট্টালিকা আছে—তাহার নাম ইমামবাড়া সৌধ। ইহার উপরের গিল্টিকরা গম্বুজটী দেখিতে খুব সুন্দর। মহম্মদ আলী শাহ এবং তাঁহার মাতা এখানে সমাহিতা আছেন। নশীর্ উদ্দিন হাইদার বহু অর্থব্যয়ে রাজ-অন্তঃপুরচারিণী-গণের বাসের নিমিত্ত কয়েকটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেটিতে তাঁহার বিবাহিতা পত্নীগণ বাস করিতেন তাহার নাম ছত্রমঞ্জিল। এই প্রাসাদ কৈসর-বাগের পার্শ্বেই বিরাজিত। প্রধান সৌধের শীর্ষদেশে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছত্র রহিয়াছে বলিয়াই ইহার নাম ছত্র-মঞ্জিল। ছত্রমঞ্জিল এখন Club House (ক্লাব হাউস) ও সাধারণের

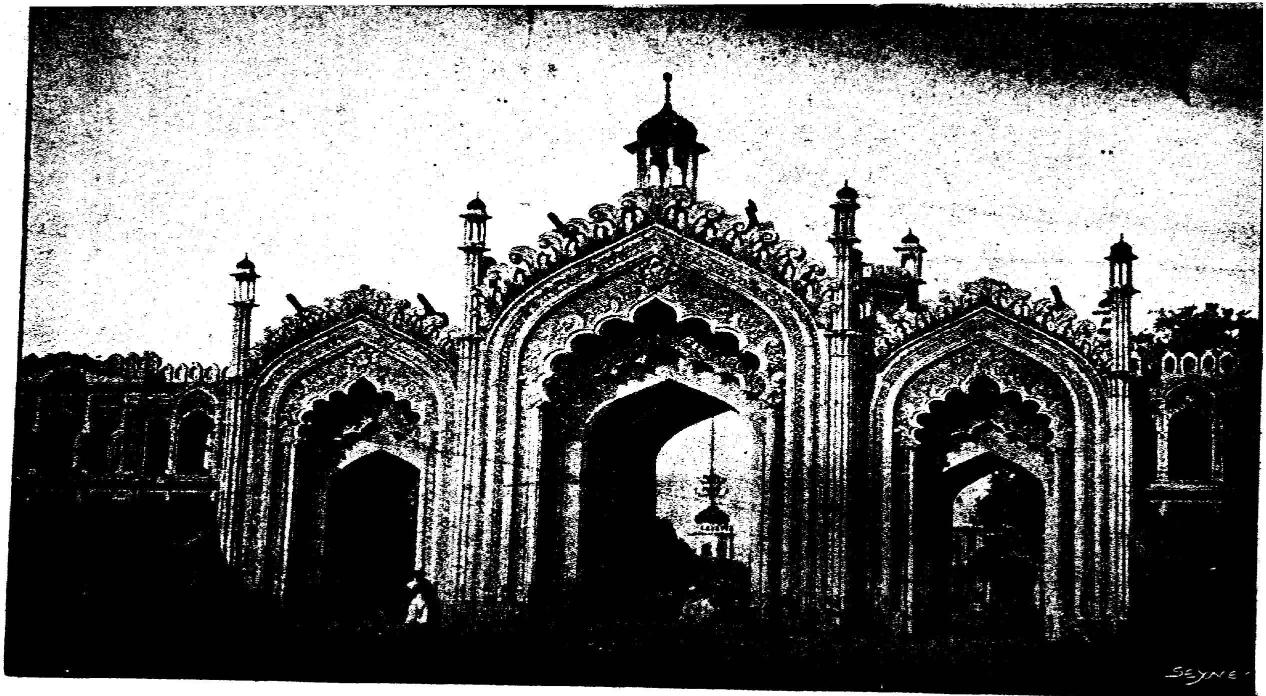
ছত্রমঞ্জিল।

পুস্তকাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নতলের কক্ষে পুস্তকালয় এবং ঊর্দ্ধতলে ক্লাবভবন। কি পরিবর্ত্তন! যে স্থানে নসীর উদ্দীনের সংগৃহীত বন্য-পশু সমূহ রক্ষিত হইত তাহার নাম ছিল শাহমঞ্জিল। নবাব নিজে 'ফারহাৎ-বক্স, হুজুর-বাগ, বিবিয়ারপুর প্রভৃতি প্রাসাদে বাস করিতেন। নবাব সয়াদৎ আলী খাঁ এই আনন্দোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যস্থিত প্রমোদ-ভবনে রাজপ্রাসাদ পরিবর্ত্তন করেন। সয়াদৎ নগরের বহির্দ্দিকে দিলখুস পর্য্যন্ত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নবাব ওয়াজিদ আলীখাঁ কৈসরবাগ এবং তাহার মধ্যস্থিত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর সৌধরাজি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ফারহাৎ-বক্স পরিত্যাগ করিয়া উহাই বাসভবনে পরিণত করিয়া লইলেন। তিনি নদী-তীরবর্ত্তী জেনারল মার্টিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কতকগুলি অট্টালিকা ও তদ্‌সংলগ্ন ভূমি ক্রয় করিয়া কসর-উল-সুলতান নির্ম্মাণ করেন। ঐ সুরম্য প্রাসাদাভ্যন্তরে শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল—উহা রাজকীয় দরবারাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। এই নবাববংশ ইংরেজরাজের অনুগত হইবার পর হইতে এইরূপ বিধি প্রচলিত হইয়াছিল যে কোনও নবীন নবাবের রাজ্যাভিষেক সময়ে ইংরেজ রেসিডেণ্ট আসিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতেন এবং ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যে তাঁহার শাসনভার গ্রহণে স্বীকৃত হইতেছেন তাহা জ্ঞাপন নিমিত্ত নজর প্রদান করিতেন। এই অট্টালিকা এখন যাদুঘর ও পোষ্টাফিস রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এখানে দিল্লীর বহু সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী ও নুরজাহান, জাহানারা, জীবনোন্নেসা, ঔরঙ্গজেব, আকবর প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি গজদন্তের উপর অতি সুন্দর রূপে অঙ্কিত আছে। লক্ষ্ণৌতে দেখিবার জিনিষ বহু আছে, আমরা যে সকল স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছি সে সকল ছাড়া নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রত্যেক ভ্রমণকারীরই অতি অবশ্য দর্শন করা উচিত। দেলখোসবাগ, মার্টিনিয়ার, রেসিডেন্সি, গোরস্থান, লৌহসেতু, সেকেন্দরবাগ, সানজফ বা নজফ আশ্রফ, উইঙ্গফিল্ডপার্ক, মচ্ছি-ভবন, সাতখণ্ড, আলমবাগ, হজরৎবাগ ইত্যাদি। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সকল গুলিরই বিবরণ প্রদান করিলাম।

ফারহাৎ-বক্স।

কসর-উল-সুলতান

দেলখোসবাগ—সুন্দর কুসুমোদ্যান মধ্যস্থিত একটী জীর্ণ অট্টালিকা উহার



হোসেঙ্গাবাদ বাজার তোরণ—লক্ষ্ণৌ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নাম ছিল 'দেলখোস', এই দেলখোস সৌধ হইতেই ইহার নাম হইয়াছিল 'দেলখোস' বাগ। নবাব সদৎআলী খাঁর ইহা শিকারাবাস ছিল। স্থানটি নগর হইতে কিয়দ্দূরে ও বিজনে অবস্থিত—প্রকৃতি এস্থানে আপনার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিবার একটু সুযোগ পাইয়াছে। নবাবের অন্তঃপুরচারিণী ললনা-কুল এস্থানে আসিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণাদি করিতেন। সদৎআলী নিকটবর্ত্তী জঙ্গলসমূহ বিশেষরূপে পরিষ্কার করিয়া এই স্থানটীকে সুন্দর পার্কে পরিণত করিয়াছিলেন—এবং ইহা নানা জাতিয় বন্যমৃগ ও পশুদ্বারা পূর্ণ করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় স্যার কলিন ক্যাম্বেল এই বৃক্ষবাটিকা ও এই প্রাসাদ আড্ডা রূপে ব্যবহার করিয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে বহুপরিমাণে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মার্টিনিয়ার—একটী অর্দ্ধবৃত্তাকার বৃহৎ অট্টালিকা, ইহাই মার্টিনিয়ার নামে অভিহিত। সাধারণতঃ ইহা 'মার্টিনকুঠি' নামেই সুপরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত, এখানে ইংরেজবালকগণ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। মার্টিনিয়ার দেখিতে হইলে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আদেশ গ্রহণ করিতে হয়। এখানে নানা প্রকার কৌশলসম্পন্ন মূর্ত্তি এবং গ্রীক্ দেশীয় পুরাণোক্ত নানারূপ দেবদেবীর ও বিবিধ ঘটনাসমূহ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুন্দর অট্টালিকাটী ক্লডমার্টিন নামক জনৈক ফরাসীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইনি সামান্য সৈনিকরূপে প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন, কিন্তু স্বীয় দক্ষতাগুণে অবশেষে সৈনিক বিভাগে মেজর জেনারলের পদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হ'ন। সেই অর্থোপার্জ্জনের ফলই এই বিচিত্র অট্টালিকা, মার্টিন সাহেব ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই পরলোকগমন করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই এই অট্টালিকা রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত না হইয়া বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। মার্টিনোর সমাধিও এখানেই ছিল, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সিপাহিগণ ইহা অহাদের আড্ডা করিয়া অট্টালিকার বহু অপচয় করে এবং—মার্টিনোর কবর ধ্বংস করিয়া—তাহার অস্থিসমূহ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। আত্ম-বিস্মৃত উদ্ধতপ্রকৃতি এই সকল পিশাচ সৈনিকেরা মৃতদেহাবশিষ্টের প্রতিও জঘন্য ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইল না!

গোরস্থান—রেসিডেন্সির নিকটস্থ গির্জ্জাঘরের (ক্রাইষ্টচার্চ্চ) প্রাঙ্গণ মধ্যেই সিপাহী-বিদ্রোহ সময়ে নিহত বীর-বৃন্দের স্মৃতিস্তম্ভসমূহ বিরাজিত। সমাধিস্তম্ভগুলির মধ্যে জেনারল হ্যাবলক (General Hablock) মেজর আউটরাম (Major Outram) ও জেনারেল নীল—এই বীরত্রয়ের সমাধিস্তম্ভ তিনটীই বিশেষ সুন্দর। তবে সমুদয় সমাধিস্তম্ভের মধ্যে আবার লরেন্স সাহেবেরটীই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও মনোরম। এখানে একটী শোকের ও স্তব্ধতার গাঢ় আবরণ ব্যাপৃত। স্মারকলিপিগুলির ভাষা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণও সে সকল পাঠ করিলে হৃদয়ে সান্ত্বনালাভ করে। একটী শিশুর সমাধিস্তম্ভে লিখিত রহিয়াছে—

"Weep not for me my parents dear,
For I am not dead but sleeping here
And await a while you shall be
In paradise along with me.

"কেঁদোনা আমার তরে জনক-জননী,
আমি ত মরিনি—হেথা নিদ্রায় মগন
কিছুদিন পরে দোঁহে ত্যজিয়ে অবনী—
আসিবে স্বরগে যবে হইবে মিলন।"

আরও যে কত সুন্দর সুন্দর সান্ত্বনাসূচক স্মারকলিপি আছে তাহার সংখ্যা নাই—এই স্মারক কবিতাটী আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছিল—তাই সযত্নে পকেটবুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। 'বেলিগার্ড' (Bailey Guard) দেখিলে হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়,—ইহাই প্রাচীন রেসিডেন্সি, ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেও দুই এক কথা লিখিয়াছি। আমাদের সদাশয় ও সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট প্রাচীন স্মৃতি জীবিত রাখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রায় হুবহু ভাবে রাখিয়া দিয়াছেন। গোলাগুলির চিহ্ন প্রভৃতি সব সুস্পষ্ট। যেস্থানে হেন্‌রি লরেন্স আহত হইয়াছিলেন, যেখানে উনিশ বৎসরের যুবক সুশানা পামার গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, সে সকল স্থান খোদিত-লিপি দ্বারা দর্শকের সমক্ষে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বহু দেশীয় প্রভুভক্ত বীরও



রেসিডেন্সির ধ্বংসাবশেষ—লক্ষ্ণৌ।

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

ইংরেজের নিমিত্ত প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাঁহাদের স্মরণচিহ্ন স্বরূপও একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে প্রবল বিদ্রোহানল একদিন ভারতভূমির প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার ভস্মাবশেষ লক্ষ্ণৌতে বহুপরিমাণ বিদ্যমান আছে।

লৌহসেতু—ক্ষীণকায়া গোমতী নদীর উপরে এই সেতুটী নির্ম্মিত;—গাজিউদ্দিন হায়দর ফরমাইস দিয়া ইহা ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করাইয়াছিলেন—কিন্তু বিধির বিপাকে তাঁহার ভাগ্যে এই লৌহসেতু-দর্শন-জনিত সুখ-সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, কারণ সেতুটী ভারতবর্ষে আসিয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সেকেন্দার বাগ—নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁ তাঁহার প্রিয়তমা বেগমসাহেবা সেকেন্দর মহলের বাসের নিমিত্ত ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেকেন্দর বাগের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এখন ইহা একটী ক্ষুদ্র উদ্যান মাত্র। চারিদিকে কতকগুলি বড় বড় গাছ। সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রায় দুই সহস্র বিদ্রোহী সৈন্য এই স্থান অধিকার করিয়া ইংরেজ সৈন্যের উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে হাইল্যাণ্ডার সৈন্যগণ কর্তৃক অবরোধিত হইয়া সমুদয় সিপাহিগণ কাল-কবলে নিপতিত হয়। লক্ষ্ণৌতে প্রাচীন অট্টালিকা এরূপ খুব কমই দেখা যায়, যাহার গায়ে সিপাহী-বিদ্রোহের কোন না কোন চিহ্ন না আছে!

সানজফ—অযোধ্যার প্রথম নবাব গাজি উদ্দিন হায়দার এখানে, অনন্ত-নিদ্রায় মগ্ন—ইহা তাহার সমাধি-বাটী। সানজফের অন্য নাম নজফ আশ্রফ। জনরব এই যে, ইহা মহম্মদের জামাতা আলীর যেরূপ সমাধি-হর্ম্ম্য নজফ নামক পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত আছে, তদনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেজন্যই ইহার নামও নজফআশ্রফ রাখা হইয়াছে। গাজিউদ্দিনের রক্ষিত অর্থ হইতেই ইহার সংস্কারাদিরও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। এ স্থানে অযোধ্যার রাজা ও রাণীদের হস্তাঙ্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

উইঙ্গফিল্ড পার্ক—জনৈক চীফ কমিশনারের নামানুযায়ী ইহার নাম হইয়াছে। উইঙ্গফিল্ড পার্ক একটী পরম রমণীয় উদ্যান—এখানে সুন্দর

সুন্দর শ্যামল সতেজ বৃক্ষ-বল্লরী শোভা পাইয়া স্থানটীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে—নানাবিধ মর্ম্মর-প্রস্তরমূর্ত্তি সকলও পর্য্যাটকের মন-মুগ্ধ করে, এ সকল মর্ম্মর-মূর্ত্তি 'কাইসরবাগ' হইতে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এই উদ্যান মধ্যে নানা শ্রেণীর হরিণ সংগৃহীত আছে।

মচ্ছিভবন দুর্গ—আসফ উদ্দৌলার প্রাচীন সেতুর বামভাগে মচ্ছিভবন দুর্গের সুবৃহৎ প্রাচীর ও প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত, ইহা এখনও উত্তম অবস্থাতেই আছে। এই দুর্গের প্রাচীরাভ্যন্তরে 'লক্ষ্মণটিলা' নামক প্রাচীন নগরাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় সুপ্রসিদ্ধ সার হেন্‌রি লরেন্স ইহা সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মচ্ছিভবনের নিকট হইতে জুমা-মসজিদের উন্নত-চূড়া বড়ই সুন্দর দেখায়।

সাতখণ্ড—ইহা একটী অসম্পূর্ণ অট্টালিকা। দিল্লীর জুমা-মসজিদ অপেক্ষাও বৃহত্তম মস্‌জিদ নির্ম্মাণোদ্দেশে মহম্মদ আদিল সাহ ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন, কিন্তু মানুষের ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা কখনও এক হয় না, মহম্মদেরও এই বাসনা পূর্ণ হইল না; তিনি এই অট্টালিকার কার্য্য শেষ হইতে না হইতেই পরলোক গমন করেন। কিম্বদন্তী এই যে এই সৌধ সপ্ততল উচ্চ হইবার কথা ছিল, কিন্তু চতুস্তল নির্ম্মিত হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে ইহার কার্য্য আর অগ্রসর হয় নাই।

আলমবাগ—সহর হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে কাণপুর যাইবার পথে আলমবাগ নামক রাজোদ্যান অবস্থিত, এস্থানে হেবলক সাহেব সমাহিত আছেন। নগর হইতে দূরে ও বিজনে বলিয়া ইহার সৌন্দর্য্য গ্রাম্য-সৌন্দর্য্য হইতে আর একপ্রকারে চিত্তবিনোদক। নানাজাতীয় সুগন্ধি কুসুম-বৃক্ষ-পরিশোভিত শ্যামলছায়া-শীতল এই স্থানটী প্রকৃতপক্ষেই শান্তিপ্রদ। এখানে নগরের কলকোলাহল শ্রবণে আইসে না,—মৃদুবায়ুবিকম্পিত পত্রাবলীর মর্ম্মরতান; বিহগকণ্ঠের সুমধুর হৃদয়োন্মাদকারী গান, পরিশ্রান্ত দেহেও মনে শান্তির সুবিমলধারা ঢালিয়া দেয়। চতুর্দ্দিকের গ্রাম্যসৌন্দর্য্যও বিশেষ-রূপে উপভোগ্য। মোটের উপরে ফলফুলভারাবনত শ্যামল-বৃক্ষরাজিসমাবৃত এ উদ্যানবাটিকা সাধারণের মনোরঞ্জক। লক্ষ্ণৌ স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরম রমণীয়। কাইসরবাগ-সম্মুখস্থ তারাওয়ালি কুঠির সম্মুখে যে

দ্বার-আছে উহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিলেই জিলৌখানা নামক প্রাসাদ-দ্বার-প্রাঙ্গণ, ঐ প্রাঙ্গণের পর চীনিবাগ পার হইলেই হজরৎবাগ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। লক্ষ্ণৌর অধিকাংশ অট্টালিকাই অযোধ্যার নবাবদিগের দ্বারা নির্ম্মিত, ইংরেজাধিকারে আসিবার পরে গোমতীবক্ষে মাত্র দুইটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ের দুইটী এবং ইংরেজের সময়ের দুইটী মোট চারিটী সেতু গোমতীবক্ষে শোভা পাইতেছে। লক্ষ্ণৌ দুর্গের প্রসিদ্ধ রূমি দরওয়াজা পার হইয়া গোমতীর তটপ্রদেশস্থ প্রশস্ত রাস্তা দিয়া ইমামবাড়ার বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ পশ্চিম দিকে দাঁড়াইলে, আসফউদ্দৌলার ইমামবাড়া, হুসেনাবাদের ইমামবাড়া প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জিলৌখানার প্রাসাদ-দ্বার অতিক্রম করিয়া কিছু দক্ষিণাংশে ফিরিয়া একটী পর্দ্দাবৃত দ্বার পার হইলে চীনিবাগে পঁহুছা যায়, ঐ স্থানে নানাপ্রকার চীন দেশীয় কাচপাত্রাদি সুশোভিত থাকাতেই ইহার নাম চীনিবাগ হইয়াছে। চীনিবাগের কিয়দ্দূরে একটী প্রবেশদ্বার, এই দ্বারে নানাপ্রকার নগ্ন রমণীমূর্ত্তি বিরাজমান। ইহা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিকৃতরুচির পরিচয়, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহ নাই। এই দ্বারের পরেই হজরৎবাগ। আমরা যে সকল সৌধাবলীর পরিচয় দিয়াছি, তাহা ছাড়াও লক্ষ্ণৌতে দেখিবার জিনিষ আরও বহু আছে, তন্মধ্যে চাঁদলক্ষ্মী ভবনের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অট্টালিকা নবাবের ক্ষৌরকার আজিম উল্লা খাঁ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, পরে নবাব ওয়াজিদ আলীখাঁ তাহার নিকট হইতে চারিলক্ষ মুদ্রা মূল্যে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন, এখানে নবাবের প্রধানা বেগম সাহেবা এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠতমা নবাব-মহিষীগণ বাস করিতেন। কথিত আছে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহার একজন বেগম সিপাহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া এই প্রাসাদে দরবার করিয়াছিলেন। চাঁদলক্ষ্মী প্রাসাদের পার্শ্বস্থ পথের ধারে যেখানে মর্ম্মর প্রস্তরে বাঁধান একটী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, মেলার দিবস নবাব ফকিরের বেশে সেখানে অবস্থান করিতেন।

হজরৎবাগ।

লক্ষ্ণৌ যে কেবল স্থাপত্য-শিল্পে এবং প্রাচীন গৌরবেই গৌরবান্বিত, তাহা নহে; শিল্পবাণিজ্যেও ভারতবর্ষের অন্যান্য বহুনগরী হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ।

এখানকার জরি, রেশম এবং জহরতের কাজ বিশেষ প্রসিদ্ধ। কয়েক বৎসর হইল কয়েকজন কাশ্মীরি বণিক্ এ নগরে শালের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এখানে কাচের বাসন তৈরির ও কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত সয়াদৎগঞ্জ, শাহগঞ্জ, চিকমণ্ডী প্রভৃতি স্থানের হাটে শস্য, তূলা, চর্ম্ম প্রভৃতি এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুত্তলিকা প্রচুর আমদানী হয়।

গীতবাদ্যের চর্চ্চা এ নগরে খুব বেশী; এস্থানে হিন্দুস্থানী ওস্তাদদিগের অধীনে বহু সঙ্গীত-বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। লক্ষ্ণৌতে মার্টিনিয়ার বিদ্যালয় ব্যতীত ক্যানিংকলেজ বিশেষ বিখ্যাত—এই কলেজের সভাপতি স্বয়ং বিভাগীয় কমিশনার সাহেব মহোদয়। ইহা ছাড়া আমেরিকান মিশনের অধীন ৭টী ও ইংলিস চার্চ্চ মিসনের অধীনে ৫টী বিদ্যালয় আছে।

লক্ষ্ণৌর সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য ইমামবাড়া;—এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ফার্গুসন সাহেব লিখিয়াছেন, "* * The great Imambara, which though its details will not bear too close an examination, is still conceived on so grand a scale as to entitle it to rank with the buildings of an earlier age." লক্ষ্ণৌ মাটির কাজের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুতুল, ও বাসন ইত্যাদি দেখিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। স্থানীয় মিউজিয়ামে (আজব-ঘরে) রেসিডেন্সির অবিকল মাটির চিত্র আছে।

বেরিলি।

লক্ষ্ণৌ হইতে বেরিলি যাই। রোহিলখণ্ডের মধ্যে বেরিলি একটী বিখ্যাত নগর। ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া রামগঙ্গা নদী প্রবহমানা। বেরিলি ষ্টেসনটী বেশ বড়, এবং একটী সংযোগস্থল। নগরের লোক সংখ্যা ১১০,০০০ তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু এবং অর্দ্ধেক মুসলমান। এই সহর যে কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা দুর্ল্লভ—কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের নগর সমূহের মধ্যে ইহা পঞ্চম স্থানীয়। যাঁহারা আলমোরা, নাইনিতাল, রাণীক্ষেত প্রভৃতি স্থানে যাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে এখান হইতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া কাঠগুদাম নামক স্থানে যাইতে হয়, বেরিলি হইতে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে লাইন আছে। অযোধ্যার নবাবের পক্ষ হইয়া ইংরেজগবর্ণমেণ্ট এই স্থান অধিকার করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বেরিলি বহুদিবস রোহিলাদিগের রাজধানীরূপে পরিগণিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে এই নগর ইংরেজাধিকারে আইসে। যখন ভারতের চতুর্দ্দিকে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রবল-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল—সে সময়ে সমগ্র রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহানলের কেন্দ্রস্থলই বেরিলি ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথমভাগে যখন ইংরেজ-সৈন্যেরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সমগ্র বিদ্রোহীসৈন্য এখান হইতে পলায়ন করিয়াছিল। বেরিলি সহর দুইভাগে বিভক্ত—একাংশের নাম নূতন বেরিলি অপর অংশের নাম পুরাতন বেরিলি। পুরাণো বেরিলিতে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়—উহা বরেল দেও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বেরিলিতে দেখিবার মধ্যে রামপুরের নবাবের একটী প্রাসাদ ও জুম্মা মস্‌জিদ ব্যতীত তেমন আর কিছুই নাই। নবাবের বাড়ী নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। জুম্মা মস্‌জিদ্‌টি ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার কয়েকটী বাজার বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাঘাটও দেখিতে বেশ সুন্দর। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে ইহার বেশ খ্যাতি আছে। এখানকার সৈনিকাবাসটী বিশেষ বিখ্যাত। খাদ্যদ্রব্যাদি খুব সুলভ।

মুরাদাবাদ।

মুরাদাবাদ বা মোরাদাবাদ, যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ডবিভাগের একটী জেলা। এই জেলার প্রধান নগর মুরাদাবাদ—ইহা ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের আদেশে রস্তম খাঁ কর্ত্তৃক যুবরাজ মুরাদবক্সের নামে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রস্তম খাঁ এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার নির্ম্মিত রামগঙ্গার তটপ্রদেশস্থ দুর্গটী এখনও ভগ্নদেহে বিরাজমান আছে। আমরা রামপুর যাইবার পথে এস্থানে অবতরণ করিয়াছিলাম। আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের সহিত এই জেলার বহু স্থান সংযুক্ত থাকায় বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। মুরাদাবাদ সহরটী ছোট খাট—রাস্তাঘাটগুলি দেখিতে বেশ মনোরম। সময় সময় রামগঙ্গা ও গঙ্গা নদীর বন্যায় এ জেলায় শস্যাদির খুব ক্ষতি হয়। সেইজন্য কয়েকবার দুর্ভিক্ষের দারুণ প্রকোপে মুরাদাবাদ জেলার অধিবাসীদিগকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছিল, এখন নদীবক্ষে চড় পড়িয়া উহা সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থবার দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল আক্রমণে এ জেলা উৎসন্নপ্রায় হয়। সে সময়ে বহুলোকে আমের আঁটি খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল; পুনরায় ১৮৬৮—৬৯ এবং ১৮৭৭—৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ ঘটে গবর্ণমেণ্টের শত চেষ্টাতেও সে সময় অনশন-ক্লিষ্ট নরনারীর অন্নকষ্ট নিবারিত হয় নাই—না হইবার প্রধান কারণ সে বৎসর রাজপুতনা প্রভৃতি দূরদেশের অন্নকষ্ট-পীড়িত নরনারীও আসিয়া এস্থানে সমবেত হইয়াছিল—কাজেই দুর্ভিক্ষ অতিশয় ভীষণাকার ধারণ করে—গবর্ণমেণ্ট আর কয়দিকে ইন্ধন যোগাইবেন?

ইতিহাস।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মোগলশক্তির অবসাদ হইলে কঠারিয়া বিদ্রোহিগণ কিছুদিন এস্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিল,—কিন্তু ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এই প্রদেশ ও নগর সম্রাট্ মহম্মদশাহ অধিকার করিয়া লন, এবং এখানে মোগলশাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইহার পর নাম মাত্র প্রায় এগার বৎসরকাল পর্য্যন্ত

ইহা মোগলের অধীনে থাকিলেও রোহিলাসর্দ্দারগণই প্রকৃতপক্ষে এস্থানে শাসন-বিধি পরিচালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মুরাদাবাদ অযোধ্যার উজীরের শাসনাধীন হয় এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ-সিংহের করতলগত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মজ্জু খাঁ নামক এক ব্যক্তি এস্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন—ইঁহার নেতৃত্বে বিদ্রোহানল এস্থানেও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। রামপুরের নবাব ইংরেজপক্ষ অবলম্বন করিয়া এ অনল নির্ব্বাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। পরিশেষে জেনারল জোন্সের অধীনস্থ ব্রিগেড সৈনিকবৃন্দ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এস্থানে উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপন করে। ইংরেজশাসনাধীনে আসিবার পর হইতে এস্থানের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

মুরাদাবাদ, জেলার প্রধান নগর ও সদর—রামগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এস্থানে দেখিবার মধ্যে জুম্মা মসজিদ ও আজমৎউল্লা খাঁর সমাধি-মন্দির। জুম্মা মসজিদটি ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজমৎউল্লা খাঁ এ প্রদেশের একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে সেণ্টপলের গির্জ্জাগৃহটিও দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে অন্যতম। রোহিলা প্রদেশের মধ্যে মুরাদাবাদের বাণিজ্য-খ্যাতি খুব বেশী। নগরের লোক সংখ্যা ৭৪,০০০। মুরাদাবাদ সদর ব্যতীত অম্‌রহো, চন্দৌসী, সম্বল, সরাইতরণী, হসনপুর, বছরাওন, মউনগর, সির্সা, ঠাকুরদ্বার, ধানওয়ারা, অঘবনপুর, মোগলপুর ও নরৌলীনগর প্রভৃতি স্থান বাণিজ্যের উন্নতিতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। চন্দৌসীর চিনির কারবার খুব বৃহৎ। মুরাদাবাদ ষ্টেসনের নিকটে একটী সুন্দর ডাকবাংলা আছে। এস্থানে পিত্তলের উপর অতি সুন্দর গিল্‌টির কার্য্য হইয়া থাকে। গিল্টির কার্য্যের জন্য এ স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এই ক্ষুদ্র নগরে দ্রষ্টব্য এবং উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। আমরা মুরাদাবাদ দর্শনান্তে সে দিবসই রামপুর পঁহুছিলাম।

রামপুর।

রামপুর রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটী দেশীয় সামন্ত-নৃপতির রাজধানী এবং উক্ত জেলার প্রধান নগর। রামপুর রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এস্থানে প্রদত্ত হইল, আশাকরি ইহা পাঠকগণের অতৃপ্তির কারণ হইবে না। খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংসে সাহ আলম এবং হসেন খাঁ নামক দুই সহোদর এদেশে আসিয়া বাস করেন, এবং মোগল-রাজসরকারে কার্য্য গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত করেন। মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সাহ আলমের পুত্র দাউদ খাঁ, বদাউনের নিকট হইতে এক জায়গীর লাভ করেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পোষ্যপুত্র আলী মহম্মদ নবাব উপাধি সহ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ প্রদেশই জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। জগতে একের উন্নতিদৃষ্টে অধিকাংশ স্থলেই অপরের হিংসা দেখা যায়, এস্থলেও তাহার বৈষম্য হইবে কেন? তৎকালীন অযোধ্যার সুবেদার সয়দরজঙ্গ আলী মহম্মদের এই উন্নতিতে বিষম ঈর্ষান্বিত হন এবং কৌশলে ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাদসাহের সরকার হইতে প্রদত্ত সমুদয় জায়গীর বাজায়াপ্ত করাইয়া আলী মহম্মদকে দিল্লীতে কারারুদ্ধ করাইয়া রাখিয়া দেন। ছয়মাস কাল কারারুদ্ধ থাকিয়া পরে ইনি সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা রূপে প্রেরিত হন। কমলার কৃপাকটাক্ষ যাহার উপর পতিত হয়, কিছুতেই তাহার সৌভাগ্য-সূর্য্য মেঘাবৃত করিয়া রাখিতে মানুষের সাধ্য হয় না; আলী মহম্মদের শুভাদৃষ্ট হইতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সরহিন্দে এক বৎসরকাল অবস্থিতির পরে, আহম্মদ সাহ আবদালীর আক্রমণে চতুর্দ্দিকে দারুণ বিশৃঙ্খলার উদ্রেক হয়, দিল্লীর সেই বিপ্লবের সময়ে সুযোগ বুঝিয়া আলী মহম্মদ পুনরায় ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রোহিলখণ্ডে আগমন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হন, সম্রাট মহম্মদ সাহের তনয় তাহাকে সবল দেখিয়া ঐ প্রদেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। আলী মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা রাজ্য ভাগ করিয়া লন। তাঁহার

প্রাচীন ইতিহাস।

বংশধরগণই এখন রামপুরের নবাব। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্য ইংরেজ-রাজের হাতে আইসে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এস্থানের নবাব মহম্মদ য়ুসুফ্ আলী খাঁ ইংরেজরাজের সবিশেষ সহায়তা করায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১২৮৫২০৲ টাকা রাজস্বের একটী জায়গীর, উপাধি এবং তোপ প্রদান করেন। য়ুসুফ আলি খাঁর পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র মহম্মদ কল্‌ব আলী খাঁ, জি, সি, এস্, আই, সি, আই, ই, উপাধিসহ রাজা হন, এবং তৎপরে নবাব মস্তফ আলী খাঁ রাজা হইয়াছেন।

নগরের কথা।

কোশিলা নাম্নী স্রোতস্বিনীর বামতটে রামপুর নগর অবস্থিত। এই সহর মুরাদাবাদ হইতে পূর্ব্বে ১৮ মাইল। রামপুর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন নগর—খেশ নামক রেশমী বস্ত্রের জন্য ইহা ভারতবিখ্যাত, খেশ এস্থানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সৌধাবলীর মধ্যে বিশেষ খ্যাতনামা এবং স্থাপত্য-শিল্প-চাতুর্য্যসম্পন্ন তেমন কিছুই নাই, তবে নবাবের সুবৃহৎ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন প্রাসাদ, জুম্মা মস্‌জিদ, সফদরগঞ্জ বাগান, দেওয়ান্-ই-আম্, খুর্শিদ-মঞ্জিল, মচ্ছিভবন ও জানানা প্রভৃতি ভ্রমণকারী মাত্রেরই দেখিয়া আসা উচিত। নবাব ফৈজ্‌উল্ল-খাঁর নির্ম্মিত দুর্গ ও তাঁহার সমাধি-মন্দির জীবিত থাকিয়া এখনও তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কোশিলা, নাহল ও রামগঙ্গা নদী রামপুর প্রদেশের নানা স্থান দিয়া প্রবাহিতা থাকায় স্বাস্থ্য ও শস্য উভয়তঃ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে। বেরিলি, মুরাদাবাদ, রামপুর প্রভৃতি এই ক্ষুদ্র তিনটী সহরে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই বলিয়া বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া পাঠকগণের সময় নষ্ট করিলাম না।

হরিদ্বার।

রামপুর ছাড়িয়া বাষ্পীয় শকটে যখন হরিদ্বারাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, তখন হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইয়াছিল ;—শুভ্র তুষার-কিরীট-মণ্ডিত হিমাদ্রির পাদমূলে সর্ব্ব-পাপ-তাপ-নাশিনী পূত-সলিলা জননী ভাগীরথীকে প্রবাহিতা দর্শন করিয়া ধন্য হইব—আহা ! কি আনন্দ ! দেখিতে দেখিতে দু'ধারের বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া বেগে ছুটিতে ছুটিতে বাষ্পীয় শকট আসিয়া লক্সর ষ্টেসনে পঁহুছিল, এখান হইতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া হরিদ্বার যাইতে হইবে ; হরিদ্বার লক্সর হইতে ১৬ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। আমাদের গাড়ী লক্সর ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। জানালার ভিতর দিয়া কি নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিলাম—গিরিরাজ হিমালয় উন্নতমস্তকে ধ্যানমগ্ন—কে জানে সৃষ্টির কোন্ যুগে এই মহাযোগীর ধ্যানভগ্ন হইবে। পাহাড়ের উপর পাহাড়—তাহার উপরে পাহাড় গৌরবে দর্শকের সমক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের মহান্ মহিমা প্রচার করিতেছে। প্রতি শৃঙ্গবিনির্গত নির্ঝর যেন বলিতেছে "আরে মুগ্ধ মানব, তৃণাদপি তৃণ হইয়া তোমার এত অহঙ্কার, কত ক্ষুদ্র তুমি সে কথা কি ভাব ?" যখন আসিয়া হরিদ্বারে উপনীত হইলাম তখন হৃদয়ে যে কি আনন্দ হইল তাহা বর্ণনাতীত। কি নয়ন-মন-মোহকর দৃশ্য ! গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর তাহারি পাদমূলে এই সুন্দর নগরী শোভা পাইতেছে। যিনি হরিদ্বার গমন করিয়াছেন তিনি প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলে লুক্কায়িত এই স্থান দর্শনে নিশ্চিতই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা আমাদের পাণ্ডার সমভিব্যহারে নির্দ্দিষ্ট বাসায় আসিয়া বিশ্রাম এবং আহারাদি সমাপন করিয়া শান্তি ও তৃপ্তি দুই-ই অনুভব করিলাম। আমাদের বাস-প্রকোষ্ঠের জানালা খুলিয়া দিলে, তুষার-মণ্ডিত ধবলগিরির রজতকিরীট দৃষ্টিপথে পতিত হইত—পার্ব্বত্য মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ আসিয়া ক্লান্ত শরীরে সঞ্জীবতা ও প্রফুল্লতা ঢালিয়া দিত।

গঙ্গার দক্ষিণতটে হরিদ্বার অবস্থিত। পুণ্য-সলিলা জননী জাহ্নবী এস্থানে শিভালিক পর্ব্বত হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন। হরিদ্বারের

অপর নাম কপিলস্থান, কারণ ঋষি কপিল এই স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা ইহাকে হরদ্বার নামে অভিহিত করে। হরিদ্বারে কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ ধনী সূর্য্যমল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার ধর্ম্মশালা আছে, সাধারণতঃ অপরিচিত পান্থগণ সেখানেই অবস্থিতি করেন। ষ্টেসন হইতে উহা প্রায় ১॥০ মাইল দূরে হইবে। সূর্য্যমল বাবু ঋষিকেশ হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী লছমন ঝোলার লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তীর্থযাত্রিগণের অশেষ উপকার করিয়াছেন; ধনের যিনি সদ্ব্যবহার করেন তিনিই ধন্য। যাত্রিগণ সাধারণতঃ এস্থানে স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন, উহাই এখানকার প্রধান কার্য্য।

আমরা পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গাদ্বার ঘাটে স্নান করিতে গমন করিলাম।

ব্রহ্মকুণ্ড বা গঙ্গাদ্বার ঘাট।

তখন তরুণ রবির কনক-কিরণ-মণ্ডিত গিরিশ্রেণী যে অনন্ত সৌন্দর্য্যে আপনাকে সুশোভিত করিয়াছিল, তাহা লেখনী-মুখে প্রকাশ হইবার নহে। হরিদ্বারে এই ঘাটেই গঙ্গা স্নান করা প্রশস্ত। হিন্দুস্থানী যাত্রিগণ ইহাকে 'হরি-কি-চরণ ঘাট' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ঘাটের উপর বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এস্থানেই গঙ্গা পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রথমে পতিত হইয়াছেন—ইহার প্রকৃত নাম মায়াপুরী। কুম্ভমেলার সময় যাত্রিগণ এই ঘাটেই স্নান করিয়া থাকেন—সে সময়ে এস্থানে নানা দেশদেশান্তর হইতে শৈব, বৈষ্ণব, দণ্ডী, পরমহংস, অবধূত প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সাধু এবং গৃহস্থগণ আগমন করেন, বিগত কুম্ভমেলায় হরিদ্বারে প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ সাধুসন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে মেলার সময় স্নান লইয়া অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এস্থানে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, তাহাতে গোস্বামী ও বৈরাগী এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় তাহাতে ১৮০০ শত লোক নিহত হইয়াছিল। আর একবার গোস্বামীদের সহিত শিখদের কলহ হয় তাহাতে প্রায় পাঁচশত গোস্বামী মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মান্ধতায় সময়ে সময়ে যে নানাপ্রকার বিপ্লব সংঘটিত হয় এসকলই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই ঘাটের উপরে মন্দিরা-ভ্যন্তরে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং পূর্ব্ববর্ণিত বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন বিরাজিত

আছে। কুম্ভমেলা যোগের সময় স্নান করিবার জন্য যাত্রিগণের মধ্যে একটা কোলাহল জাগিয়া ওঠে। পুলিশকর্ম্মচারিগণ নানারূপ চেষ্টা যত্ন করিয়াও কোনরূপেই শান্তিসংস্থাপন করিতে পারেন না। কত লোক যে ভিড়ের মধ্যে পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার ঠিক্ থাকে না। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪৫০ শত লোক ভিড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে কুম্ভমেলা হয়—তখন এই অল্প পরিসর স্থানে ধর্ম্মলিপ্সু লক্ষ লক্ষ যাত্রী অবগাহন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কুম্ভমেলার সময় এস্থানে স্নান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতেও এস্থানে মেলা হয় বটে কিন্তু কুম্ভমেলার মত তত লোক সমাগম হয় না। বার্ষিক মেলার সময় এখানে সহস্র সহস্র অশ্বাদির খরিদবিক্রয় হয়। ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যে দেশদেশান্তরের যাত্রিগণ মৃতদেহের অস্থি নিক্ষেপ করিয়া মৃতের পারলৌকিক মুক্তির পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দেয়। যাহারা হরিদ্বার আসিতে পারেন না তাহারা সচরাচর নিজ নিজ পাণ্ডাদের নিকট ডাকযোগে অস্থি ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন, পরে পাণ্ডাগণ উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে।

এখানে গঙ্গার নির্ম্মল সলিল মধ্যে বড় বড় মহাশৌল মৎস্যগুলিকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিলাম—হরিদ্বারে প্রাণীহত্যা নিষেধ। ইহাদের প্রতি কেহ কোনও অত্যাচার করে না বলিয়া মৎস্যেরাও মনুষ্য দেখিয়া কোনও রূপ ভীত হয় না—যাত্রীরা চিরা, মুড়ি, খই জলে ফেলিয়া দিতেছে আর শত শত মৎস্য নির্ভয়ে আসিয়া তাহা খাইতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! আমরা যে সেকালে তপোবনের চিত্রমধ্যে সমুদয় হিংস্রজন্তুর শান্তশিষ্ট স্বভাবের পরিচয় পাই, এই মৎস্যদের ব্যবহার দেখিলে তাহার সততা দৃঢ়ীভূত হয়, তুমি যদি হিংসা ভোল—তুমি যদি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শেখ তবে সে কেন ভালবাসিবে না? প্রেম দিলেই প্রেম পাওয়া যায়। আমরা ১৯ বৎসর পূর্ব্বে যখন এখানে আসিয়াছিলাম তখন এ স্থান গভীর জলপরিপূরিত ছিল—কিন্তু এখন চর পড়িয়া গিয়াছে এবং ঐ স্থানে অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইতেছে। স্নান করিয়া পুনরায় কুশাবর্ত্তঘাটে স্নান করিতে আসিলাম—ইহাই এখানকার রীতি।

কুশাবর্ত্তঘাটে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করা প্রশস্ত—কথিত আছে যেএখানে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে পিতৃগণ বিষ্ণুর ন্যায় হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পরম শান্তিলাভ করেন। কুশাবর্ত্তঘাটের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে একজন ঋষি এ স্থানে বসিয়া যখন যোগসাধনায় নিরত ছিলেন, সে সময়ে গঙ্গা গিরিরাজ হিমাদ্রি হইতে পতিত হইয়া বেগে ঋষির কুশা স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি তাঁহার কুশা দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই যোগ-শক্তি-প্রভাবে গঙ্গাকে আকর্ষণ করিলেন; গঙ্গা ঋষির আকর্ষণে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া কুশা প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বর দিলেন যে অদ্যাবধি এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত্তঘাট হইবে আর এ স্থানে যে কেহ স্নান তর্পণ করিবে, তাহার পিতৃগণ বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। কুশাবর্ত্তঘাটে আসিয়া দেখিলাম যে দলে দলে লোক এ স্থানে বসিয়া পিতৃলোকের তর্পণাদি করিতেছে—একদল যাইতেছে—আর এক দল আসিতেছে—আবার সে দল যাইতেছে—পুনরায় অপর দল কর্ত্তৃক সে স্থান অধিকৃত হইতেছে—বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—কি পবিত্র শ্রদ্ধার নিদর্শন। যাত্রিগণ সকলেই নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী যথাসাধ্য দান ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। গঙ্গার স্রোত এ ঘাটে অত্যন্ত প্রবল। ঘাটের সোপানাবলীর সহিত লৌহ-শৃঙ্খল সংযোজিত থাকা সত্ত্বেও অতিশয় সতর্কতার সহিত স্নান করিতে হয়, যদি কোনও রূপে হস্ত শৃঙ্খল হইতে পৃথক হইয়া যায় তবে যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা করাও অসম্ভব। গঙ্গার প্রশস্ততা এ স্থানে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। হরিদ্বারে সর্ব্বনাথ, মায়াদেবী, দক্ষেশ্বর, সীতাকুণ্ড, কনখল, নীলধারার ঘাট, চণ্ডীপাহাড়, বিল্বকেশ্বর প্রভৃতি বহু দেবমন্দির ও দ্রষ্টব্য স্থান আছে আমরা একে একে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

কুশাবর্ত্তঘাট।

সর্ব্বনাথ—সর্ব্বনাথের মন্দিরটি দেখিতে বেশ সুন্দর। মন্দির মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে শতচূড়ায় সুশোভিত হইয়া উচ্চশিরে এই মন্দিরটি বিরাজ করিতেছে—আঙ্গিনার চারিদিকে দ্বিতল অট্টালিকা সমুহ শোভমান। একটী সৌম্য শান্ত

গাম্ভীর্য্যের মহানুভাব ইহার চারিদিকে বিরাজিত। কুশাবর্ত্তঘাট হইতে স্নান-দানাদি করিয়া যাত্রিগণ সাধারণতঃ এ স্থানে আগমন করিয়া দেবাদিদেবের শ্রীচরণপ্রান্তে ভক্তিগদগদচিত্তে লোটাইয়া পড়ে। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ কানিংহাম সাহেব এই মন্দিরের অনতিদূরে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে পুরাতন মুদ্রা ও পুত্তলিকা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অনুসন্ধান দ্বারা উহা বেণরাজার দুর্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

মায়াদেবীর মন্দির—হরিদ্বারের মন্দিরসমূহ মধ্যে মায়াদেবীর মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহার চারিদিকে বন জঙ্গল ও ভগ্ন অট্টালিকাসমূহের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কানিংহাম সাহেব এই মন্দির দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত সিন্দূর-প্রলেপে মায়াদেবীর সর্ব্ব-শরীর আবৃত,—ঐ সিন্দূরের প্রলেপ হইতে তাঁহার প্রকৃতমূর্ত্তি আবিষ্কার করা সুকঠিন। আমাদের পাণ্ডা দেবীকে ত্রিমুণ্ডধারিণী, এবং চতুর্হস্ত শোভনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার এক হস্তে নৃমুণ্ড ধৃত, এক হস্তে চক্র, এক হস্তে সংহারকারিণী শিব-শক্তি-ত্রিশূল, অপর হস্তে অভয়প্রদা মা-জননী ভীতত্রস্ত সন্তানবর্গকে অভয় দানে উৎসাহিতা করিতেছেন। এই মন্দিরের দ্বারে একটী খোদিত লিপি দেখিলাম, কানিংহাম সাহেব এই শিলালিপি দৃষ্টেই মন্দিরের নির্ম্মাণসময় সম্বন্ধে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মায়াদেবীর মন্দির দেখিলেই ইহার প্রাচীনত্ব উপলব্ধি হয় উহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না।

দক্ষেশ্বর ও সতীকুণ্ড।

দক্ষেশ্বর মহাদেব ও সতীকুণ্ড হরিদ্বারের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ। এ স্থানে দক্ষ প্রজাপতি শিবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না করিয়া যজ্ঞ করেন এবং পতিগত-প্রাণা আদ্য শক্তি সতী পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সতী-বিরহে বিদগ্ধচিত্ত দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষের যজ্ঞ ভঙ্গ ও তাহার মুণ্ডচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহাতে অজমুণ্ড যোজনা করিয়াছিলেন। পরে দক্ষ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া এই শিব প্রতিষ্ঠাপিত করেন, তাহাই দক্ষেশ্বর শিবনামে পরিচিত। আর সতী যে স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ

করেন তাহা সতীকুণ্ড নামে অভিহিত। দক্ষেশ্বর শিবের মন্দিরটি বেশ বড়---কিছুদিন হইল ইহার সংস্কারসাধিত হইয়াছে, একবার একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ পতিত হইয়া মন্দিরের শীর্ষদেশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পাণ্ডাদিগকে কিঞ্চিৎ গোলাকার রজতখণ্ড দান করিলে সতীকুণ্ডে হোম করিতে দেয়। একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, যদি রমণীগণ সাত রবিবারে এই কুণ্ডে স্নান করেন তাহা হইলে তাঁহারা সতীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হ'ন।

কনখল—কনখলের নিকট গঙ্গা নীলধারা নামে কথিত, নিকটেই নীলপর্ব্বত। এ স্থানে জলের রং নীলাভ বলিয়াই ঐরূপ নাম হইয়াছে। নীলধারায় স্নান করা বিশেষ প্রশস্ত। নীলধারার তট-প্রদেশে বহুতর উদ্যান থাকায় স্থানটির সৌন্দর্য্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক। উদ্যানসংশ্লিষ্ট সোপাণাবলী জলে নামিয়াছে। প্রতি উদ্যান মধ্যেই এক একটী দেব-মন্দির। হরিদ্বার হইতে কনখল এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী। হরিদ্বার অপেক্ষা যে কনখল প্রাচীন স্থান তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, এস্থানের ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট ইত্যাদি দৃষ্টে তাহা আরও যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। মহাভারতেও কনখলের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত কালিদাসের মেঘদূতেও এস্থানের সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। অতএব ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য নহে। কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে এস্থান প্রজাপতি দক্ষের রাজধানী ছিল। হরিদ্বারের অপেক্ষা কনখলের বাটী ইত্যাদি উৎকৃষ্ট। এখানে সমস্ত বাটীই প্রস্তরনির্ম্মিত, পাণ্ডারাও এস্থানেই বাস করিয়া থাকে। সৌর-কিরণ-মণ্ডিত বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন নগাধিরাজের বক্ষস্থিত এস্থানটি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত—মনে হয় যেন চিরশান্তি এখানেই বিরাজমানা।

চণ্ডী-পাহাড়।

এস্থানে গঙ্গার অপর তটে চণ্ডী-পাহাড়ে একটা মন্দির আছে উহাতে চণ্ডী-দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। মন্দিরের নিকট হইতে চতুর্দ্দিকের একখানি মনোহর আলেখ্যের মত প্রতীয়মান হয়। জনপ্রবাদ এইরূপ যে পূর্ব্বে এস্থানে মহাদেবের একটা ত্রিশূল ছিল—পরে ঝড়ে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে তাহা কেহ জানেনা, আমরা কিন্তু কিছুই

দেখি নাই। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত নীলধারার ঘাটে দু'টী শিব বর্ত্তমান আছেন—তাহার একটীর নাম গৌরীশঙ্কর এবং অপরটির নাম বিল্বো-কেশ্বর।

বিল্বোকেশ্বর বা বিল্বকেশ্বর।

মায়াদেবীর মন্দিরের সন্নিকটে শিবালিক পর্ব্বতোপরিস্থ একটী শিখরোপরি বিল্বকেশ্বর দেব বিরাজিত আছেন। ইনি মায়াপুরী অর্থাৎ হরিদ্বারের ক্ষেত্রপাল দেবতা। রাজপথের কিছু দূরে বন-বেষ্টিত ভূভাগে এই দেবতার মন্দিরটি বিরাজিত। মন্দিরের সন্নিকটে একটী বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, এই বৃক্ষের সহিত শিবলিঙ্গের নামানুকরণের কোনও সম্বন্ধ নাইত? হরিদ্বারের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য ও তীর্থস্থলগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল, এতদ্ব্যতীত এখানে ভীমগদা বা ভীমঘোড়া, ও দশাবতারের মন্দির দেখিবার আছে। ভীম গদা বা ঘোড়ার সম্বন্ধে পাণ্ডারা নানারূপ বলিয়া থাকেন, কেহ কেহ বলেন যে ভীমের অশ্বের ক্ষুরাঘাতে এই গহ্বর বা কুণ্ড হইয়াছে—আবার কেহ এইরূপ বলেন যে স্বর্গারোহণ-কালে ভীম এই স্থানে তাঁহার গদা নিক্ষেপ করিয়া যাওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। সম্মুখে পতিত গদার আকৃতি এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডকেই তাহারা ভীমের গদা বলিয়া থাকে, উহার উপরে আঘাত করিলে এক প্রকার শব্দ হয়। ভীম ঘোড়া বা ভীম গদা নামক স্থানের পর্ব্বতগাত্রস্থ গহ্বরের ঠিক্ নিম্ন হইতে একটী ক্ষুদ্র উৎস নির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী কুণ্ডে পতিত হয় এবং সেখান হইতে একটী প্রণালী দ্বারা সেই সলিলরাশি গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে, ইহাই পাণ্ডারা গঙ্গা-নির্গমের স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করে। হরিদ্বার হইতে প্রায় বারক্রোশ দূরে পিহোড় নাথ নামক শিব আছেন, সেখানে যাওয়া বড়ই কষ্টকর; পথ নিতান্ত দুর্গম। দশাবতারের মন্দির মধ্যে বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন দশ অবতারের প্রস্তর-বিনির্ম্মিত মূর্ত্তি সমূহ স্থাপিত। মন্দিরটি জাহ্নবী-তীরে অবস্থিত থাকায় বড়ই সুন্দর দেখায়। ঋষিকেশ যাত্রীরা এখান হইতেই যাইয়া থাকে। উহা হরিদ্বার হইতে ১৪ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। সেখানেও যাত্রিগণকে স্নানতর্পণাদি কার্য্য করিতে হয়। ঋষিকেশ হইতে গঙ্গার দৃশ্য দেখিতে বড়ই সুন্দর। কল কল রবে তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া গঙ্গার পাহাড় হইতে অবতরণের দৃশ্য বড়ই মনোহর।

হরিদ্বারের নানা কথা।

এখন আমরা পাঠকবর্গের নিকট হরিদ্বার সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় বিবৃত করিব। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হরিদ্বার অত্যুত্তম স্থান। এখানকার গঙ্গার জল শীতল সুস্বাদু ও জীর্ণকারী—যতই আহার করনা কেন, জলের গুণে দেখিতে দেখিতে তাহা জীর্ণ হইয়া যাইবে। কয়েক বৎসর হইল কনখল ও হরিদ্বার লইয়া মিউনিসিপালাটি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে উহা দ্বারা যে এস্থানের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা মনে হয় না, কারণ রাস্তা ঘাট পূর্ব্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ও মল-মূত্রাদির দুর্গন্ধাদি বর্জ্জিত হইলেও তাহা আশানুরূপ নহে,—এরূপ তীর্থস্থলে যেখানে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রী-সমাগম হয় তাহার বন্দোবস্ত যে খুব ভাল হওয়া দরকার তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ষার সময় হরিদ্বারের স্বাস্থ্য খারাপ হয়, তখন জ্বরের প্রকোপে বড়ই বিব্রত করিয়া তোলে। পূর্ব্বে মেলার সময় এস্থানে ওলা-উঠার অত্যন্ত উপদ্রব হইত, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কৃপাকটাক্ষপাতে তাহা এখন বহুপরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। হরিদ্বারের নাম সম্বন্ধে নানাপ্রকার গোলযোগ পরিলক্ষিত হয়। হরিদ্বার নাম নিতান্ত আধুনিক বলিয়া সকলেই বলেন। কোনও কোনও প্রসিদ্ধ মুসলমান লেখকদের লেখাতে এস্থান কেবল 'গঙ্গাদ্বার' নামে উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন পুরাণাদি গ্রন্থে ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে কনখল, গঙ্গাদ্বার এবং কপিলস্থান ব্যতীত অন্য কোনও নাম দৃষ্ট হয় না, অতএব 'হরিদ্বার' নাম বেশীদিনের প্রাচীন নয়—এরূপ অনুমান করা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে অসঙ্গত কিংবা অযৌক্তিক হয় নাই। তীর্থ-যাত্রিগণ প্রায় সকলেই এস্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া থাকেন। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে এই পবিত্র তীর্থে যে ব্যক্তি ত্রিরাত্রি বাস করিয়া পুণ্য সলিলা জাহ্নবীজলে অবগাহন করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার পাপ তাপ দূরীভূত হয় এবং সে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করতঃ পরলোকে গমন করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। মহাভারতকার লিখিয়াছেন—

"ততঃ কনখলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপোষিতোনরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ বিন্দতি॥"

এহেন পবিত্র তীর্থে আগমন করিবার জন্য যে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হিন্দু নরনারীগণ ব্যস্ত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

প্রকৃতির এমন নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য অতি অল্প তীর্থ স্থলেই দৃষ্ট হয়। এখানকার গঙ্গাতীরবর্ত্তী দৃশ্য পরম রমণীয়, প্রভাতের সেই স্নিগ্ধ-শীতল নবীন সৌন্দর্য্য হইতে সন্ধ্যার ধূসরান্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে হিন্দু নরনারীগণ ধর্ম্মকার্য্যে নিরত। সকলেরি মুখে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিরাজমান—কি যেন এক সুদুর্লভ রত্ন তাহারা পাইয়াছে, তাই তাহাদের মুখে ত্রিদিবের হাসি—জগৎ সংসার তাহারা চায় না, তাহারা চায় সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ মহা সম্রাটের কৃপা। হরিদ্বার শান্তি প্রীতি ও ভক্তির পুণ্যসলিলে অভিষিক্ত। এখানে আসিলে সুদূর প্রাচীন ইতিহাসের কথা মনে পড়ে; মনে পড়ে সেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের পবিত্রতম স্তোত্র পাঠ ও ধর্ম্মনিরত ভাব। সন্ধ্যার সময় হরিদ্বারের শোভা অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয় হয়, তখন একদিকে গঙ্গাদেবীর আরতির মধুর ধ্বনি, সহস্র সহস্র কণ্ঠ-মিলিত-স্তোত্ররবে, সাধুমণ্ডলীর শঙ্খধ্বনিতে অপূর্ব্ব প্রীতির ভাব জাগিয়া উঠে, অন্যদিকে আবার নির্ম্মল-সলিলা কলুষ-নাশিনী কল-নিনাদিনী গঙ্গা-বক্ষে ও কি ফুটিয়া উঠিয়াছে?—এ কি স্বপ্নপুরী?—দেবাঙ্গনারা কি ভুলক্রমে মণি-রত্ন-মালা ফেলিয়া গিয়াছেন নাকি?—কেমন সুন্দর অসংখ্য দীপাবলি গঙ্গাবক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। আধম্লানান্ধকারাবগুণ্ঠিত প্রদোষান্তে গঙ্গার তটে দাঁড়াইয়া তন্ময়চিত্তে এ শোভা দেখিতে-ছিলাম—পর্ব্বতে পর্ব্বতে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইতেছে, আর ভক্ত-কণ্ঠোত্থিত স্তোত্রধ্বনি ঊর্দ্ধে—জানিনা কোন্ অনন্তের অনন্ত-প্রান্তোপবিষ্টের চরণসমীপে—গিয়া পঁহুছিতেছে! কবি গাহিয়াছেন 'কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?' সত্য সত্যই যখন নগাধিরাজের সৌর-কিরণ-মণ্ডিত শুভ্রতম ধবল-গিরির শিখরের দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, তখন উহা মনে পড়ে। আহা! কি শান্তি! অতি বড় পাপীর হৃদয়ও এখানে আসিলে ভক্তির পীযূষ-ধারায় সিক্ত হয়। মনে হয় না যে আবার সংসারে ফিরিয়া আসি। হায়! যদি এই গিরিপদতলে হর-জটা-বিহারিণী তরঙ্গ-অঙ্গিনী ভাগীরথীর পবিত্র তটে সেই অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় মহাপুরুষের ধ্যানে জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইয়া দিতে পারিতাম, না জানি তাহা কতই সুখের হইত।

হরিদ্বারে মাত্র দুইটী প্রধান রাস্তা--একটী ষ্টেসন হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর সূর্য্যমল বাবুর ধর্ম্মশালার নিকট দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, অপরটী বাজারের মধ্য দিয়া গিয়াছে, শেষোক্ত রাস্তাটী প্রস্তর দিয়া বাঁধান এবং উহার উভয় পার্শ্বে চারি পাঁচতালা বাটী সকল থাকায় উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ যাত্রিগণ এ সকল অট্টালিকার দ্বিতলেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাজারে সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যায়—দুগ্ধ ও ঘৃতই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; মৎস্য মাংস এখানে বিক্রয় হয় না। আমাদের হরিদ্বার দেখা শেষ হইলে,—সেখান হইতে সাহারাণপুর রওয়ানা হইলাম।

সাহারাণপুর।

সাহারাণপুর যুক্তপ্রদেশের একটী বিখ্যাত জেলা। মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব সময়ে সাহারাণচিস্তির নামানুযায়ী ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। মোগলশাসন সময়ে মোগলসম্রাটগণ এ স্থানে গ্রীষ্মের সময় বাস করিতেন—ইহা তাঁহাদের প্রিয়তম গ্রীষ্মাবাস ছিল। আমরা এ স্থানে পঁহুছিয়া প্রথমে বাজার দেখিতে চলিলাম, বাজারে নানা-প্রকার দ্রব্যাদির মধ্যে এখানকার ফুলকাটা বাক্স দেখিতে অত্যন্ত মনোহর—এই বাক্সের জন্য সাহারাণপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। পশ্চিমের অন্যান্য নগরের সহিত ইহার বিশেষ কোনও পার্থক্য অনুভব করিলাম না। এ স্থানের প্রাচীন স্থাপত্যচিহ্নের মধ্যে 'বাদসামহল' নামক প্রাসাদটি বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য, ইহা সম্রাট সাজাহানের গ্রীষ্মাবাসের জন্য আলীমর্দ্দন খাঁ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানকার গবর্ণমেণ্ট বোটানিকেল গার্ডেনের জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ, এই উদ্যানমধ্যে নানাশ্রেণীর দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া যত্নের সহিত সংগৃহীত আছে—এতদ্ব্যতীত কৃষিবাগান, ভৈষজ্যবাগান, দোয়াব ক্যানাল নার্শারি প্রভৃতির জন্যও এই স্থান বিখ্যাত। স্থানীয় নার্শারিতে চারা প্রস্তুত, বীজরক্ষার প্রণালী ও বাগান প্রস্তুত নিয়মাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ নগরের লোক সংখ্যা (৬৪,০০০) সাহারাণপুর জেলা বিশেষ উর্ব্বর—সেণ্ট্রাল কেনালের জন্য এই স্থানের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

এখান হইতে আমরা পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলাম—বাংলার শস্যশ্যামলা নয়নাভিরাম মূর্ত্তি আর এখন আমাদের নয়নপথে পতিত হয় না। একদিন এই পবিত্র পঞ্চনদবিধৌত স্থান ভারতের গৌরব স্থান ছিল—যতই আমাদের গাড়ী সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই নানা কথা মনে পড়িল। এই কি সেই রণজিৎসিংহের পাঞ্জাব? একদিন যাহার বীর-হুঙ্কারে পঞ্চনদ কম্পিত হইত, যাঁহার সুশাসনপ্রভাবে পাঞ্জাববাসী একতার সুমহান্ মঙ্গল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতের অতুল্য গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল—একদিন যে দেশের লোক শির দিয়াও শের রক্ষা করিয়াছিল—

এই সেই বীরত্বের লীলাভূমি স্বাধীনতার মহাতীর্থ বীরেন্দ্র শিখবৃন্দের সাধের জন্মভূমি। এখনও জ্ঞানী নানকের মহান্ উপদেশবাণী হিন্দুমুসলমান সকলকে একত্র করিতেছে—এখনও যেন শুনিতেছি দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া স্বাধীন বীরেন্দ্রবৃন্দ স্বদেশপ্রেমিক শিখগণ বলিতেছেন, "ওয়া গুরুজীকি ফতে।"

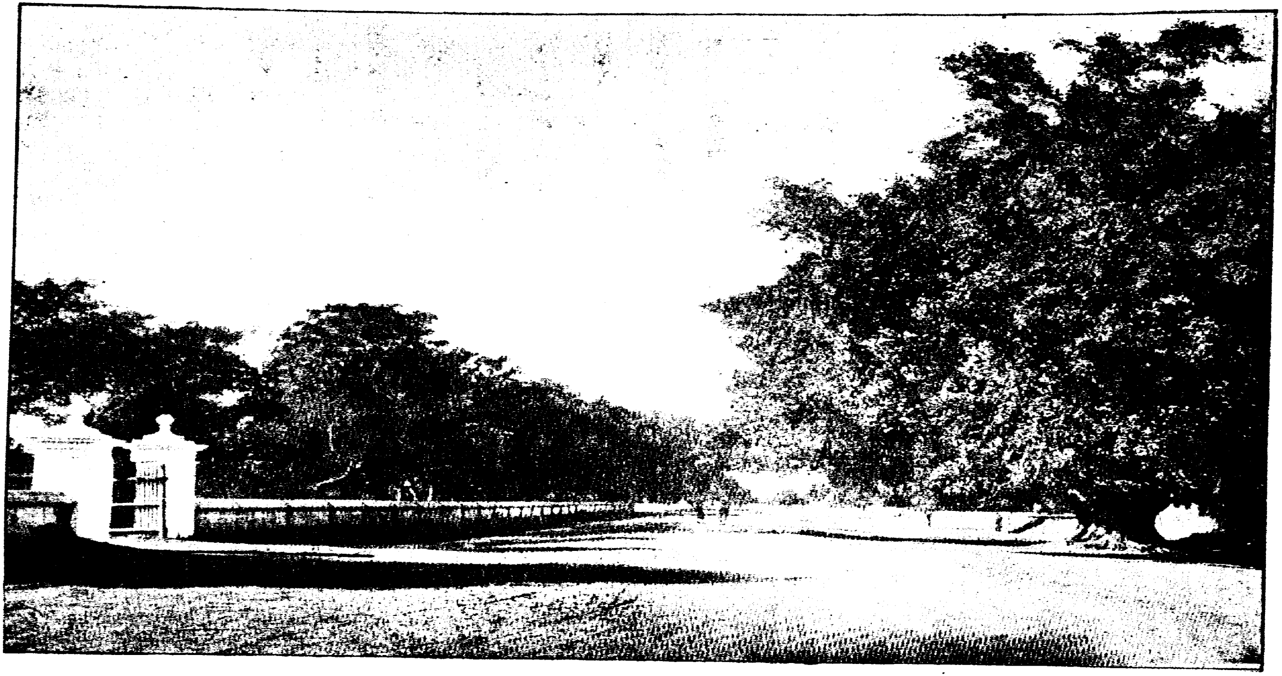
অম্বালা।

অম্বালা হইতেই আমাদের পঞ্জাবভ্রমণ আরম্ভ হইল। অম্বালা পঞ্জাব প্রদেশের একটী বিখ্যাত স্থান। ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইরূপ মত শুনিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অম্বা নামক জনৈক রাজপুত্র কর্ত্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম অম্বালা হইয়াছে। দ্বিতীয় মত এই যে, এস্থানে 'অম্বা' নাম্নী একটী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন; সেই দেবীর নাম হইতেই ইহার নাম অম্বালা হয়। পাঠকগণের যাহা অভিরুচি তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

অম্বালা পূর্ব্বে পাতিয়ালার মহারাজার অধিকৃত ছিল, তিনি প্রয়োজনানুরোধে ইহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছেন। এই নগর দুইভাগে বিভক্ত (১) কেণ্টনমেণ্ট (২) সিটি। পশ্চিমের প্রায় প্রত্যেক নগরই এইরূপ দুইভাগে বিভক্ত। সৈনিকাবাস বা ছাউনীই কেণ্টনমেণ্ট নামে অভিহিত, আর রাজকীয় বিচার-বিভাগ, আফিস আদালতাদি যেস্থানে অবস্থিত, তাহাই সিটি বা নগরাংশ নামে পরিচিত, আমাদের নিকট সহর অপেক্ষা ছাউনী-বিভাগই ভাল লাগিয়াছিল, উহা নগরাপেক্ষা প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। ছাউনী-বিভাগেও বাজার আছে এবং আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্য-সামগ্রীই সেখান হইতে সংগ্রহ করা যায়।

হিন্দুর অন্যতম প্রধান তীর্থ কুরুক্ষেত্রে এবং ইংরেজের প্রিয় শৈল বড়লাটের গ্রীষ্মাবাসেও এখান হইতে যাওয়া যায়। ভারত-ইতিহাসে অম্বালা একটী প্রসিদ্ধ স্থান। কুরুক্ষেত্র অম্বালার ২৯ মাইল দক্ষিণে এবং শিমলা ৯৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। আমরা যখন অম্বালা গিয়াছিলাম, তখন কুরুক্ষেত্র কিম্বা শিম্‌লা যাওয়ার পথে কাল্‌কা পর্য্যন্ত রেলওয়ে হয় নাই, এখন আর কুরুক্ষেত্র কিম্বা শিম্‌লা যাইতে কোনও কষ্ট নাই।

অম্বালার একদিকে পুণ্য-সলিলা বৈদিক নদী সরস্বতী এবং অপরদিকে দৃশদ্বতী প্রবাহিতা। এখান হইতেই হিন্দুধর্ম্মের প্রথম স্ফূরণ হয়,



মল—অম্বালা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

এখানেই একদিন আর্য্যগণের বেদ-ধ্বনি গগন-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল—এই পঞ্চনদই হিন্দুর অতীত-গৌরব-কাহিনী-ভূষিত পুণ্যতম প্রদেশ। সরস্বতীর পবিত্র-সলিলে অবগাহন করিবার জন্য প্রতিবৎসর এস্থানে বহুযাত্রী-সমাগম হয়। পূর্ব্বে এই নগর সর্দ্দার গুরুবক্সের পত্নী দয়াকুরের অধিকারে ছিল, পরে মহারাজ রণজিৎ সিংহ উহা অধিকার করিয়া লন। কিন্তু অক্টার্লনি সাহেব কৃপা করিয়া ইহা গুরুবক্সের পত্নী দয়াকুরকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে দয়াকুরের মৃত্যু হওয়ায় অম্বালা নগরী ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছে।

ইতিহাস।

এখানকার সৈনিকাবাসের অনতিদূরে একখানা কালীবাড়ী আছে। শুনা যায় যে ইহা রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক বাঙ্গালী মহাপুরুষের কীর্ত্তি। ইনি বিষয়-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করতঃ উত্তর-পশ্চিমে আসিয়া এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী, অম্বালা, রাউলপিণ্ডী, মুলতান, লাহোর, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে একএকটী কালী-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, এসকল কালী-মন্দিরের জন্য পর্য্যটকদিগের বিদেশভ্রমণের কষ্ট যে কত পরিমাণে লাঘব হইয়াছে, তাহা ভ্রমণকারী ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। অম্বালার কালীবাড়ীর বন্দোবস্ত অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। আমরা এখানকার কালীবাড়ীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তৎকালীন কালীর সেবায়ত পাতিয়ালার ভূতপূর্ব্ব রাজপণ্ডিত চাণক নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন শিরোমণি মহাশয়ের সদ্ব্যবহারে নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলাম। এই মহাত্মা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া জগন্মাতার শ্রীচরণ সেবাতেই অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিবেন বলিয়া ঠিক্ করিয়াছেন। ইনি জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ; প্রবাসী-বাঙ্গালী ভ্রমণকারীর পক্ষে ইঁহার সহায়তা বিশেষ প্রীতিপ্রদ। মাসিক চাঁদা এবং যাতায়াতকারী বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয়গণের প্রদত্ত দর্শনী হইতেই কালীবাড়ীর ব্যয়াদি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী পূজা প্রভৃতি পর্ব্বগুলি এখানে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পাদিত হয়। আমরা জগদ্ধাত্রী পূজার সময় এস্থানে উপস্থিত ছিলাম, জগন্মাতার পূজা দিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। স্থানীয় সমুদয় বাঙ্গালী ভদ্র-লোকদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল,

তাঁহারা প্রায় আশী জন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেদিন সুদূর প্রবাসে স্বজাতি-সঙ্গমে যে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা চির-জীবন মনে থাকিবে। বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে গীত-বাদ্যের মধুর ধ্বনিতে বাঙ্গালীর কণ্ঠে যখন বাঙ্গলা গান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এক-বারও মনে হয় নাই যে মাতৃ-ভূমির শ্যামলাঞ্চল ছায়া হইতে সুদূর পাঞ্জাবের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বিদেশে এতগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সমাবেশ বড়ই চমৎকার দৃশ্য হইয়াছিল—প্রবাসে বাঙ্গালী ভদ্র লোকদের সৌজন্যে বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাত্রেই আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করেন।

অম্বালা সহরের চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত। ইহার জনসংখ্যা প্রায় ২৬,০০০ হইবে। সেনানিবাসের জন্যই এই নগরের খ্যাতি বেশী। সহরের রাস্তাঘাট ধূলিধূসরিত ও অপরিচ্ছন্ন। এ স্থানের জলবায়ু শীতের সময় অত্যুৎকৃষ্ট—কিন্তু গ্রীষ্মের সময় সন্তোষজনক নহে। বাংলা দেশের মত

নানাকথা।

এখানে উৎকৃষ্ট মিঠাই পাওয়া যায় না। খাঁটি দুগ্ধ টাকায় বারো সের করিয়া বিক্রয় হয়। সচরাচর মৎস্য দুই আনা তিন আনা সের দরে বিক্রী হইয়া থাকে। কাঁটালের বৃক্ষ একেবারেই নাই, রাস্তায় মাঝে মাঝে দুই চারিটী আম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পান জিনিষটা অম্বালায় অত্যন্ত মহার্ঘ, পয়সায় দুই তিনটার অধিক বিক্রী হয় না। চিনিকে, বালি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এ দেশের স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত অপরিচ্ছন্নাবস্থায় থাকে।

অম্বালা প্রদেশের অন্তর্গত কোটাহী নামক স্থানের জঙ্গলাভ্যন্তরে দুইটী হ্রদ দ্রষ্টব্য, ঐ হ্রদের জল কখনও শুকাইয়া যায় না। সহর হইতে ১৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্রীমূর বা নহনরাজ্যে বাণ রাজার জঙ্গল দৃষ্ট হয়। এ প্রদেশে তাম্র, লৌহ, সীসা, লবণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

অম্বালা হইতে নয় ক্রোশ দূরে 'রাজপুরা' নামক একটী রেল ষ্টেসন আছে, সেখান হইতে অপর একটী রেল-বর্ত্ম বেটিণ্ডা নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে—রাজপুর হইতে বেটিণ্ডা ১০৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথেই পাতিয়ালার রাজধানী নাভায় যাইতে হয়—আমরা এই পথাবলম্বনে পাতিয়ালার রাজধানীতে আসিয়া পঁহুছিলাম।

পাতিয়ালা-রাজধানী।

নাভা।

অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে পাতিয়ালা-রাজধানীতে বাসস্থান ঠিক্ করা বিশেষ সহজ নহে অতএব যাওয়ার পূর্ব্বেই সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত ঠিক্ করা উচিত। আমরা এ সকল বিশৃঙ্খলতার কথা পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়া দুই খানা অনুরোধপত্রসহ রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলাম; একখানি মহারাজার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সাহেবের নিকট এবং অপর খানা সেখানকার কলেজের জনৈক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমীপে, শেষোক্ত বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়ের কৃপায় আমরা বাসস্থানের নিমিত্ত একখানা অতি সুন্দর বাটী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ভ্রমণকারিগণের পক্ষে এইরূপ সুবৃহৎ ও সুন্দর সৌধ পাওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। মন্মথবাবু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, কাজেই তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরোধসত্ত্বেও তাঁহার বাটীতে থাকিতে না পারায় বিশেষ ক্লেশানুভব করিয়াছিলাম।

আহার ও বিশ্রামাদির পরে—নগর দেখিতে বাহির হইলাম; প্রথমতঃ রাজভবন দেখিতে যাওয়া গেল। রাজভবন একটী সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। দ্বারপালগণ উলঙ্গ কৃপাণহস্তে দিবারাত্রি রাজভবনের প্রহরাকার্য্যে নিয়োজিত আছে; মহারাজার বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে রাজভবনে কাহারো প্রবেশাধিকার নাই। রাজভবনমধ্যেই রাজকীয় দপ্তরখানা এবং বিবিধ মূল্যবান পদার্থ প্রভৃতি সংগৃহীত আছে। এই সৌধমালার চতুর্দ্দিকেই বাজার; পাতিয়ালার লোকসংখ্যা খুব বেশী। হাটে ঘাটে মাঠে যেখানে যাইবে সেখানেই লোকারণ্য, রাজধানীর সর্ব্বস্থান সর্ব্বদাই জন-কোলাহল-মুখরিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অসংখ্য জন-মণ্ডলীর মধ্য দিয়া রাজকীয় অশ্বারোহিগণ অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে। এ নগরের পথসমূহ অধিকাংশই অপ্রশস্ত এবং ধূলিময়—পার্শ্বের ড্রেণ হইতে দুর্গন্ধ আসিয়া

পথিকের বিরক্তি উৎপাদন করে। ইহার মধ্যে আবার বাজারের প্রায় প্রতি গলিতেই বারাঙ্গনাগণের সংখ্যাধিক্য বড়ই বিরক্তিজনক। নগরের মধ্যে কেবল পাঁচটী রাস্তা সুপ্রশস্ত ও সুন্দর; বক্রী রাস্তাঘাটের অবস্থা দৃষ্টে এখানকার মিউনিসিপালিটীর তাদৃশ সুবিধাজনক সুব্যবস্থা নাই বলিয়াই মনে হয়। রাজধানীতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ দ্রষ্টব্য।

নূতন দেওয়ানখানা—এই গৃহটী একতল হইলেও যে ইহা একখানি সুরম্য হর্ম্ম্য তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কলিকাতার অস্‌লার কোম্পানীর নিকট হইতে আনীত লোহিত ও শ্বেতবর্ণের বিবিধ মূল্যবান ঝাড়, চারিটী কাচের ফোয়ারা, নানাপ্রকার ছবি এবং অন্যান্য বহুবিধ মনোহর সামগ্রীতে দেওয়ানখানা বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে—একবার এস্থানে প্রবেশ করিলে সহজে বাহিরে আসিতে ইচ্ছা হয় না।

পুরাতন দেওয়ানখানা—এই অট্টালিকাও বিবিধ সাজসজ্জায় বিভূষিত, কিন্তু নূতনের কাছে পুরাতনের আদর আর কিরূপে থাকিতে পারে? সুন্দর হইলেও ইহা মনোজ্ঞ নহে।

সর্দ্দা মহাল—এইটী একটী দ্বিতল অট্টালিকা; ইহার একাংশ মৃত্তিকার উপরে, অপরাংশ মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ঊর্দ্ধতল নানাপ্রকারের মনোজ্ঞ দ্রব্য-সম্ভারে সুচারুরূপে সুসজ্জিত। নিম্নতলে পাঁচটী সোপান অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সেখানকার একটী কক্ষ অবস্থানোপযোগী, উহাতে একটী বৃহৎ কূপ আছে। নিদাঘকালীন প্রখর আতপতাপের সময় মহারাজ বাহাদুর নিম্নতলে গিয়া বিশ্রাম করেন। শীতের নাম সর্দ্দা; তাই ইহার নাম হইয়াছে সর্দ্দা মহাল।

মতিবাগ—রাজভবন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে এই মনোহর বিস্তৃত উদ্যান অবস্থিত। এখানে নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীর ঘন-বিন্যস্ত সবুজ-সুন্দর পত্রাবলীর সৌন্দর্য্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক; বৃক্ষের মধ্যে আবার আম, কমলা ও অন্যান্য লেবুর বৃক্ষই বেশী। উদ্যানমধ্যস্থ বৈঠকখানাটী দেখিতে বেশ সুন্দর ও কারুকার্য্যময়। বৈঠকখানাসংলগ্ন শিস্‌মহালটীও দেখিতে বেশ। একটী কৃত্রিম নির্ঝরিণী বাগানকে যার পর নাই শোভাময় করিয়া তুলিয়াছে। উদ্যানের পশ্চাদ্‌ভাগে একটী বিস্তৃত সরসী, সুন্দর বাঁধান ঘাট দ্বারা

সুশোভিত। আমরা পঞ্জাবের কোথাও আর এত বড় বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাই নাই।

কালেজভবন—ইহা একটী লোহিত বর্ণের বিস্তৃত একতল অট্টালিকা, উপরে দুইটী স্তম্ভ (Tower) আছে, দূর হইতে এই দুইটী অতি সহজেই ভ্রমণকারীর চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। পাতিয়ালায় বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়, রাজধানীতে কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ এবং আমাদের পরিচিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর দ্বিতীয় বাঙ্গালী দেখি নাই। আমরা কোনও বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত হইলাম যে পূর্ব্ব মহারাজের রাজত্বকালে জনৈক বাঙ্গালী বাবু স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভাগুণে মহারাজের প্রিয় পাত্র হইয়া কোনও উচ্চ পদ লাভ করেন, কিন্তু পরিশেষে স্থানীয় ঈর্ষ্যান্বিত পাঞ্জাবী কর্ম্মচারিগণের ছলনায় পড়িয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। যদি ইহা সত্য হয় তবে বীরপ্রকৃতি পঞ্জাববাসিগণের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় বলিতে হইবে। বর্ত্তমান পাতিয়ালার মহারাজা বিশেষ সুশিক্ষিত ব্যক্তি। মৃগয়া এবং ঘোড়দৌড়ে ইঁহার অত্যন্ত সখ, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শিকারে যান। শিকারের নিমিত্ত তাঁহার কয়েকটী শিক্ষিত হস্তী এবং ঘোড়দৌড়ের জন্য শতাধিক সুশিক্ষিত অশ্ব আছে। অম্বালার ঘোড়-দৌড়ে তিনি নিজে অনেক বাজী জিতিয়াছেন। মহারাজা 'পলো' খেলাতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মহারাজা ইংরেজী ফ্যাসানটা বিশেষ ভালবাসেন—ক্রিকেট খেলায় ইনি একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়। তিনি দেখিতে কৃশকায়, সুশ্রী, চোখ মুখ জ্ঞান ও মহত্ত্বব্যঞ্জক।

রাজধানীর অপরিচ্ছন্নতানিবন্ধন এ নগর আমাদের নিকট তাদৃশ আরাম-দায়ক বোধ হইতেছিল না, জল বায়ুও যে খুব উৎকৃষ্ট তাহাও বোধ হয় নাই। খাদ্য-দ্রব্যাদি সমুদয়ই পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা তাদৃশ সুলভ কিংবা পরিষ্কৃত নহে। এস্থানে অনেকেই বাড়ীর ছাদের উপরে মল-মূত্র ত্যাগ করে, শুনিলাম পাঞ্জাবের সর্ব্বত্রই নাকি এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, কারণ "যস্মিন্ দেশে যদাচার।"

জলন্ধর।

আমরা পাতিয়ালা রাজধানী হইতে কয়েকটি ষ্টেসন এবং শতদ্রু (Sutleg) নদীর প্রসিদ্ধ বৃহৎ সেতু অতিক্রম করতঃ কিছু পরেই জলন্ধর ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। জলন্ধর নগরই এই জেলার প্রধান সহর। 'পদ্মপুরাণ' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে জলেন্দ্র নামক জনৈক দৈত্য কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হইয়াছে। আমরা এখানে পঁহুছিয়াই শুনিতে পাইলাম যে জলন্ধরে কোনও বাঙ্গালী নাই সে নিমিত্ত কোনও বঙ্গদেশবাসী পর্য্যটকের পক্ষে এখানে থাকার বিশেষ অসুবিধা। আমরা কিন্তু এইরূপ জনরবেও সাহসহীন না হইয়া একখানা অশ্বশকটে নবপ্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী অভিমুখে গমন করিলাম। সেখানে পেঁৗছিতে না পেঁৗছিতেই একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার বাসস্থানে লইয়া গেলেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গাঙ্গুলি, নিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সৈদপুরের পাশে। ইনি গোরাহাঁসপাতালের জিনিষরক্ষক। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বেঘের গাঙ্গুলি বলিয়া বংশমর্য্যাদায় ইঁহারা সুপরিচিত।

অল্প সময়ের মধ্যেই এস্থানে আরও দুইটী বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়ের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয়াদি হইল।

আমরা প্রথমে জলন্ধর ষ্টেসনে পঁহুছিয়া যেরূপ নিরাশা-সাগরে ভাসিয়াছিলাম, তদ্রূপ পরমদয়াল জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এখন আমাদের সর্ব্ববিষয়েই সুবন্দোবস্ত হইল।

জলন্ধরের প্রায় ১৬ মাইল অন্তরে প্রসিদ্ধ কর্পূরতলার রাজধানী। জলন্ধরের নগরাংশ অপেক্ষা ছাউনীর (সৈন্যাবাস) বিভাগ পরিষ্কৃত ও বিস্তৃত। রাস্তাগুলি সোজা, বাজারটী ক্ষুদ্র হইলেও অতি পরিপাটী। বাঙ্গালীর আহার্য্য মৎস্য, মাংস এবং দুগ্ধ এ স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে একটী আশ্চর্য্য নিয়ম প্রচলিত দেখিলাম, গো-স্বামিগণ প্রত্যহ দুই বেলা বৎসও গাভীসহ বাজারে উপস্থিত থাকে, খাঁটি দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে অমনি তাহা দোহন করিয়া দেয়।

টাকায় বারো সের দরে বেশ খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া যায়। দুগ্ধবতী গাভীও খুব সস্তা, এগার সের দুগ্ধ দেয় এইরূপ একটী গাভী ৪৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি।

জলন্ধরের জলবায়ুর শ্রেষ্ঠত্বের নিমিত্ত এখানে অনেক ইংরেজ বাস করিয়া থাকেন। সাহেবদের বাসের স্থানটি দেখিতে বেশ সুন্দর। প্রত্যেক বাংলো ও আফিসের সংলগ্ন এক একটী সুন্দর উদ্যান আছে। সুবিখ্যাত বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে ইহা রাজপুতদিগের রাজধানী ছিল। প্রাচীন ইতিহাসে জলন্ধরের নাম গৌরবের সহিত লিখিত থাকিলেও এ স্থানে দুইটী প্রাচীন পুষ্করিণী ব্যতীত অন্য কোনও প্রাচীন চিহ্ন কিংবা ভগ্ন প্রাসাদ ও মন্দিরাদি দৃষ্ট হয় না। জলন্ধরের প্রাকৃতিক দৃশ্য পরম রমণীয়। নগাধিরাজের চরণতলে শ্যামল বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন এই শান্ত-শীতল প্রদেশ সত্য সত্যই স্বাস্থ্য ও সুখপ্রদ। নীরবতার সঙ্গে সঙ্গে কমনীয়তা, কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধতা—এখানে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ্য। জলন্ধর হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ উত্তরে সুবিখ্যাত জ্বালামুখী তীর্থ অবস্থিত, পাঞ্জাবীরা সাধারণতঃ ইহাকে জ্বালাজী কহে।

জ্বালামুখী।

জলন্ধর হইতে আমরা জ্বালামুখীর দিকে গমন করিলাম। জ্বালামুখী হিন্দুদের মহাতীর্থ। এরূপ দুরারোহ ও দুর্গম পথ ভারতবর্ষের অতি অল্প তীর্থ স্থলে যাইতেই অতিক্রম করিতে হয়, ইহা সকল তীর্থযাত্রীর পক্ষে সুগম নহে। একান্ন মহাপীঠের অন্যতম পীঠ বলিয়াই ইহার বিশেষ খ্যাতি। এ স্থানে সতীর রসনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে তিনটী উচ্চ পর্ব্বতের চড়াই ও উতরাই শেষ করিয়া তবে জ্বালাজীতে পঁহুছিতে পারা যায়। এক্কা, ঘোড়া এবং ডুলিতে জ্বালামুখী যাইতে হয়। আমরা জলন্ধর হইতে এক্কাতে হুসিয়ারপুর পর্য্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে পুনরায় এক্কাযোগেই গমন করিয়াছিলাম। জলন্ধর হইতে হুসিয়ারপুর জেলা ২৪।২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। হুসিয়ারপুর পর্য্যন্ত রাস্তা বেশ সমতল ও প্রশস্ত। ইহার পর হইতেই পার্ব্বত্য পথ। কেহ কেহ গরুর গাড়ী, ডুলি, কিংবা টাটুতে চড়িয়াও জ্বালাজী গিয়া থাকেন।

হুসিয়ারপুরের ৩।৪ মাইল পর হইতেই পার্ব্বত্য পথ আরম্ভ হইল—রাস্তাগুলি এত সংকীর্ণ ও বন্ধুর যে পদে পদে বিপদাশঙ্কা করিতে হয়, যদি একবার কোনওরূপে পদস্খলিত হয়, তবে সহস্র সহস্র ফিট নীচে কোন্ সুদূর গর্ভে যে পতিত হইতে হইবে সে কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! হুসিয়ারপুর হইতে জ্বালামুখী প্রায় ৩০।৩১ ক্রোশ দূর হইবে; জ্বালামুখী জলন্ধরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

ধর্ম্মার্থী যাত্রিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত আড্ডায় আড্ডায় বিশ্রাম করিয়া প্রায় তিন দিবসে তথায় উপনীত হ'ন। দুই দিবস নানাপ্রকার বিপদাপদের মধ্য দিয়া—বনজঙ্গল বেষ্টিত শিলাকীর্ণ পার্ব্বত্যভূমির তরঙ্গায়িত ভীষণ সৌন্দর্য্য অতিক্রম করতঃ—যখন চিন্তাপূর্ণী পাহাড়ে আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন মনে হইল যে অদৃষ্টে জ্বালাজী দর্শন আছে; কারণ এখান হইতে জ্বালামুখী মাত্র এক দ্বিপ্রহরের পথ। যিনি এ পথে কোন দিন জ্বালাজী দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তিনিই জানেন যে কি দারুণ ক্লেশ সহ্য করিলে

তবে এই তীর্থস্থলে পঁহুছিতে পারা যায়। দুঃখের পরে সুখ এবং সুখের পর দুঃখ ইহা স্বাভাবিক। আমরাও কি এই ভীষণ পার্ব্বত্য পথে কোনও শান্তিই পাই নাই? ভীষণত্বের মধ্যে কি শান্ত-শীতল মধুর সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি জাগিয়া উঠে নাই? মনে পড়ে, প্রখর আতপ-তপ্ত দেহে এক্কার ভীষণ ঝাঁকুনি সহিতে সহিতে যখন আড্ডায় বিশ্রাম করিতে বসিয়াছি— তখনকার সে শান্তি, হে কল্পনাকুশল পাঠক! তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না? সেই কঠিনদেহ পর্ব্বত অঙ্গে শিলার উপরে বসিয়া মনে হইয়াছে কি শান্তি! ধীরে অতি ধীরে বন্য কুসুমসৌরভ চুরি করিয়া বাতাস আমাদিগকে উপহার দিয়াছে—মধুরকণ্ঠ বন্য-বিহঙ্গগণ সঙ্গীত বিলাইয়াছে। আর উপল-ত্বরিত-চরণা স্বাদুনীরা সৌম্যা নির্ঝরিণী সুন্দরী তাহার মধুর হৃদয়ের অনাবিলস্নিগ্ধ প্রেম-সঞ্জীবনী আকণ্ঠ ভরিয়া পান করাইয়াছে। সেই অনন্তবিস্তৃত নীলাম্বরতলে চারিদিকের প্রীতিবেষ্টনির মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ ও শান্তি পাইয়াছি—কই গৃহ-পিঞ্জরে ত, তাহা পাই নাই। সত্য সত্যই মুক্তি এক অপূর্ব্ব আনন্দ,—সে আনন্দ গৃহবদ্ধ জীবের পক্ষে সুদুর্লভ রত্ন। চিন্তাপূর্ণী হইতে প্রত্যুষে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া জ্বালামুখীতে পঁহুছিলাম। আহা! কি আনন্দ—এতদিনে মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। আমরা যে পথে জ্বালাজী আসিয়াছিলাম, সে পথ ছাড়া অন্য একটী পথেও জ্বালামুখী আসিতে পারা যায়, উহা পাঠান কোট ষ্টেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অমৃতসর যাইয়া সেখান হইতে পাঠান কোট ব্রাঞ্চ লাইনে গিয়া পাঠান কোট ষ্টেশনে নামিতে হয়। পাঠান কোট হইতে কাঙ্গরা হইয়া জ্বালামুখী। পাঠান কোট হইতে কাঙ্গরা দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে এবং কাঙ্গরা হইতে জ্বালামুখী দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। পূর্ব্ব রাস্তা হইতে এ রাস্তাটি অনেকটা সুগম।

জ্বালাজীর স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরটী দেখিতে পাইয়া প্রাণ জুড়াইল। যে ধনকুবের পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ ৺কাশীধামের বিশ্বেশ্বর দেবের মন্দির ও অমৃতসরের নানকগুরুজির মন্দিরটি সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন ইহাও সেই মহাপুরুষেরই কীর্ত্তি। হায়! আজ তাঁহার বংশধরগণের কি

দারুণ অবনতি! জ্বালাজীর মন্দিরের প্রাচীর মধ্যে কতকগুলি রন্ধ্র আছে, বায়ুকোণের রন্ধ্র হইতে অবিরত এক হস্ত দীর্ঘ অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, বত্রীগুলিকে প্রদীপ সংযোগ করা মাত্রই ধা করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া ওঠে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

ঐ অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে উহা দগ্ধ হয় না অথচ চাল, কলা প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিলে উহা দগ্ধীভূত হয় এইরূপ বহু প্রবাদবাক্য শুনিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই কিন্তু অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। তথাপি ইহা বলা আবশ্যক যে এস্থানে দৈবশক্তির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরমধ্যে ছয়টী জ্যোতি দেখা যায়, তন্মধ্যে মন্দিরের কোণে যে দ্বিহস্ত পরিমিত বৃহৎ অগ্নিশিখা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার নাম "হিঙ্গলার জ্যোতি"। দেওয়ালের অন্যদিকে গন্ধকের নীলবর্ণ আলোকের ন্যায় ও অপর একটী অগ্নিশিখা আছে। এ সমুদয় শিখাগুলি কখন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, কখনও নিবিতেছে, কখনও নামিতেছে, তাহাদের অদ্ভুত চঞ্চল নর্ত্তন ভক্ত মাত্রেই বিস্মিত ও স্তম্ভিতহৃদয়ে দর্শন করিয়া ভক্তিতে আপ্লুত হয়। শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এবং নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতায় আজকাল ভক্তির স্রোত বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিতেছে— শিক্ষিতেরা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই একটা অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করতঃ সরলবিশ্বাসী অজ্ঞ নরনারীর ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিরুদ্ধে 'কুসংস্কার কুসংস্কার' করিয়া যেরূপ চীৎকার তুলিতেছেন—ইহাতে এসকল তীর্থের মাহাত্ম্য যে আর কত কাল জীবিত থাকিবে তাহাই বিশেষ সন্দেহ স্থল। মন্দিরের পার্শ্বে একটী কুণ্ড দৃষ্ট হয়, ইহার জল এস্থানে জাহ্নবী-সলিলের ন্যায় পবিত্রতম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতগাত্র হইতে বারি নিঃসৃত হইয়া এই কুণ্ডে পতিত হয়। যাত্রিগণ কুণ্ডের জল দ্বারাই শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। নিশীথ সময়ে মন্দিরের চারিদিকে খদ্যোতের ন্যায় একরূপ উজ্জ্বল আলোক বিকশিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া দেয়। আশ্বিন ও চৈত্র মাসে এস্থানে মেলা বসে, তন্মধ্যে চৈত্র মাসের মেলাতেই বহু তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

জ্বালামুখীর মন্দিরমধ্যে কোনও প্রকার দেবমূর্ত্তি বিরাজিত নাই। মন্দিরটী পর্ব্বতপার্শ্বে একটী নির্ঝরিণীর উপরে নির্ম্মিত। চূড়া ও গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত এবং খড়গসিংহ প্রদত্ত, নানাপ্রকার কারুকার্য্যসম্পন্ন রজতনির্ম্মিত কপাটগুলি দেখিতে অতিশয় সুন্দর। এই কপাটের শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্টে লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব নিতান্ত সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন—এমন কি তিনি ইহার একটী আদর্শ পর্য্যন্তও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অন্যরূপ পৌরাণিক মতে জ্বালামুখীর এই অগ্নিশিখা জলন্ধর নামক দৈত্যের মুখনিঃসৃত বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে দেবাদিদেব মহাদেব জলেন্দ্র দৈত্যকে পরাভূত করিয়া পর্ব্বত চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন—ঐ দৈত্যের মুখ হইতেই অদ্যাপি অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে। বর্ত্তমান মন্দির ভগবতীর ও উহার অভ্যন্তরস্থ কুণ্ডদেবী উল্কাময়ী নামেই পরিচিত। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির, পান্থাবাস, ধর্ম্মশালা ও পাতিয়ালার মহারাজার নির্ম্মিত একটী সরাই আছে। দরিদ্র সন্ন্যাসী ও রামাউত তীর্থযাত্রিগণ এ সকল স্থান হইতেই আহারাদি প্রাপ্ত হ'ন।

মন্দিরের কথা।

এ স্থানে বহু গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, বহু ব্রাহ্মণ, অতিথি ও তীর্থযাত্রী বাস করেন। নগরাংশ বিশেষ পরিচ্ছন্ন নহে। জ্বালামুখীর বাজারটী বিশেষ বৃহৎ এবং সেস্থানে দেবমূর্ত্তি, জপমালা প্রভৃতি উপাসনার উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থানে একটী থানা—একটী ডাকঘর ও বিদ্যামন্দির আছে। পূর্ব্বে যে এই সুপ্রাচীন নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, বর্ত্তমান বিস্তর ধ্বংসাবশেষ হইতেই তাহা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। ইহা কাঙ্গড়া জেলার অন্তর্গত ডেরা তহশীলের অন্তর্ভুক্ত। জ্বালামুখী দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী প্রাচীন কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেবী ভগবতী কৃপা পরবশ হইয়া দক্ষিণ দেশবাসী জনৈক নিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তানকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া এখানে আসিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী সে ব্যক্তি এ স্থানে উপনীত হইয়া ভগবতীর পূজা করেন ও একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যান। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশজাত দ্রব্য সামগ্রী এই নগর দিয়াই বিনিময় হইয়া থাকে—কুলুর অহিফেনই রপ্তানীর মধ্যে প্রধান।

নানাকথা।

জ্বালামুখীর তীর্থ-খ্যাতি কোন্ সময় হইতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া পড়ে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে খ্রীষ্টিয় শতাব্দীর পূর্ব্বেও যে ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নগরের ছয় স্থানে ৬টা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, সে জল পান করিলে কোন কোন রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক তাঁহার পাঞ্জাবভ্রমণের মধ্যে একই পর্ব্বতে শীতল ও উষ্ণ জলের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কেহ কেহ তাহাকেই জ্বালামুখীর উষ্ণ প্রস্রবণ বলিয়া অনুমান করেন। হিন্দুদের মধ্যে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তোগলক জ্বালামুখী দেবীর পূজা ও দেবীকে দর্শন করিয়া কাঙ্গড়া প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য যে মুসলমানগণ ইহা বিশ্বাস করেন না।

জ্বালামুখীতে সিদ্ধনাগার্জ্জুন, উন্মত্তভৈরব, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি আরও কয়েকটী দেবমূর্ত্তি আছে। এস্থানে ময়দা পিষিবার একপ্রকার জাঁতাকল আছে, ঐ সকল কলের মধ্যে একটু নূতনত্ব দেখিলাম। পর্ব্বত হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বাহির হইয়া যে সকল স্থান দিয়া বহিয়া যাইতেছে, সেই সকল স্থানের প্রশস্ততা খুব অল্প, ঐ সকল স্থানের উপর সাঁকো দিয়া এক একখানা ঘর করিয়া ঐ ঘরে আটা বা ময়দা পিষিবার জাঁতা স্থাপিত হইয়াছে। জাঁতার নীচে জলের উপর একটী চাকার মত থাকায় জলের প্রবল স্রোতে সেই চাকা অনবরত ঘুরিতেছে, আর জাঁতা চালিত হইতেছে। বিনা পরিশ্রমে অনায়াসে কেবল স্রোতের সাহায্যে ময়দা প্রস্তুত হইতেছে। ঘরের ভিতর একটীমাত্র লোক বসিয়া থাকিয়া জাঁতায় গম দিতেছে।

এখনকার স্ত্রীলোকেরা দিব্য সুন্দরী। পাজামা পরিয়া পিরাণ ও ওড়না গায়ে দিয়া যখন ইহারা রাজপথে চলিতে থাকে, তখন সত্য সত্যই রূপের বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। এদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা খুব বেশী, পাণ্ডারাও বেশ ভদ্র। এখানকার তৈরি ভুট্টার আটার রুটি খাইতে বড়ই সুস্বাদ। এই ক্ষুদ্র স্থানের লোকসংখ্যা সহস্রাধিক হইবে না। জ্বালামুখীর সৌন্দর্য্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক,—জলবায়ুও খুব উৎকৃষ্ট।

অমৃতসর।

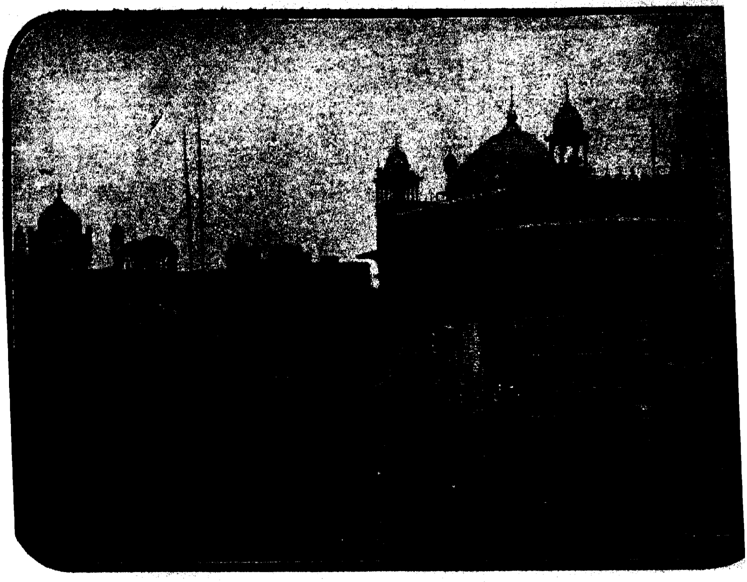
অমৃতসরের প্রাচীন নাম 'চক'। ইহা শিখদিগের একটী প্রধান তীর্থ-স্থান—বাণিজ্যের জন্যও বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই নগর একটী সামান্য পল্লীগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, সেই সময়েই ইহা চক নামে অভিহিত হইত। আকবর বাদশাহের শাসনসময়ে শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন এখানে বর্ত্তমান প্রকাণ্ড সরোবর খনন করাইয়াও ইহার চতুর্দ্দিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, এই স্থানকে শোভাময় করিয়া তোলেন, তখন 'চক' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এস্থানের নাম হইয়াছিল 'রামদাসপুর'। রামদাসের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অর্জ্জুন সিংহ এখানে শিখদিগের রাজধানী করিয়া, ইহার নাম 'অমৃতসর' রাখিলেন। তদবধি ইহা অমৃতসর নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এস্থানে শিখ, হিন্দু ও মুসলমান এই তিন জাতীয় লোক বাস করে। জনসংখ্যা ১,৩৭,০০০। হিন্দুর নিকট কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি যেমন মহাতীর্থ, মুসলমানের নিকট যেমন মক্কা, বৌদ্ধের পক্ষে যেরূপ বৌদ্ধ-গয়া, ইহুদী ও খ্রীষ্টানের নিকট যেমন জেরুজালেম পবিত্রতম স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়; শিখদিগের নিকট অমৃতসরও তদ্রূপ। উল্লিখিত রামদাস স্বামীর খনিত সরোবরের নামই অমৃতসর এবং তদনুসারে নগরের নামও অমৃতসর হইয়াছে। এই ধন, জন ও বাণিজ্যসম্পদপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরের একদিকে রাবী ও অন্যদিকে বিয়া (বিপাসা) নদী প্রবাহিতা থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

লাহোর নগরের ন্যায় অমৃতসরও প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। ইহাতে তেরোটী ফটক আছে। পূর্ব্বে ইহার চতুর্দ্দিকে পরিখা ছিল এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার বিবিধ ব্যবস্থা ও শিখদিগের নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। এখন সে দুর্গের কোনও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না; উত্তরদিকের গড়ের খাতও বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। এখন অমৃতসরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ গোবিন্দগড় নামক পরিখা দৃষ্ট হয়। তাহা এখনও কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া অক্ষতদেহে পঞ্জাব-

বীরকেশরীর গৌরব প্রকাশ করিতেছে। আহম্মদ শাহ্ (তুরাণী-নায়ক) এবং তাঁহার পুত্র তৈমুর কর্ত্তৃক অমৃতসরের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। ইঁহাদের অত্যাচারে তুই তিনবার নূতন করিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে হয়।

আহম্মদ শাহ্ তুরাণী এতদূর ভিন্ন-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন যে, কেবলমাত্র শিখদিগের এই মন্দির ভগ্ন করিয়াই তাঁহার সাধ মিটে নাই। তিনি নিতান্ত নৃশংসের মত দেবালয়-মধ্যে গো-হত্যা করিয়া তাহা অপবিত্র করতঃ মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। বীর শিখেরা নানাপ্রকার নির্য্যাতনের মধ্যেই ইহা সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আহম্মদ শাহের প্রস্থানের পর তাহারাও প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া আহম্মদ শাহের নির্ম্মিত সমুদয় মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া সেখানে শূকর হত্যা করিয়াছিল। বর্ত্তমান শিখমন্দির ইহার পরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

অমৃতসর সরোবরটি অত্যন্ত বৃহৎ। পুষ্করিণীটি চতুষ্কোণ ; এক এক দিক প্রায় ৩২৫ হস্ত দীর্ঘ হইবে। একটা প্রবাদ শুনিলাম যে, পঞ্জাব-নর-সিংহ রণজিৎ ১৭ ক্রোশ দীর্ঘ একটী খাত খনন করাইয়া ইরাবতী নদীর সহিত উক্ত পুষ্করিণীর সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা অনেক অনুসন্ধানেও ইহার নিশ্চয়তা বা খালের অস্তিত্ব অবধারণ করিতে সক্ষম হইলাম না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত প্রভৃতি প্রত্যেক ঋতুতেই ইহা জলপূর্ণ থাকে। সরোবরের ঠিক্ মধ্যস্থলে শিখদিগের দেবালয়টি অবস্থিত। দেবালয়ের ভিত্তিস্থান একটা সম-চতুষ্কোণ বেদী বা দ্বীপ। এই বেদীর উপরেই অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির। এই মন্দিরকে শিখেরা "গুরু-দরবার বা "দরবার-সাহেব বলেন।" সরোবরের চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। দরবারসাহেব মন্দিরটি দেখিতে অত্যন্ত বৃহদাকারের নয় ; উহা ত্রিশ হস্ত সমচতুষ্কোণ-বিশিষ্ট এবং উচ্চতায় প্রায় বিশ ফুট হইবে। মন্দিরের মধ্যদেশে উৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ, নিম্নে শিখগুরু নানকের ধর্ম্মপুস্তক। সরোবরের তীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত একটা ইষ্টক ও মার্ব্বেল প্রস্তর বাঁধান প্রশস্ত পথ আছে ; সরোবরের ধারে ধারেও শ্বেতপাথর বসান থাকায়, তাহা দেখিতে অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। সাধারণের মধ্যে একটা দৃঢ়বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এই মন্দিরটি স্বর্ণপাত দ্বারা মণ্ডিত ; এই জন্যই ইহার নাম 'সুবর্ণমন্দির'। ইংরেজ ভ্রমণকারি-



স্বর্ণ-মন্দির অমৃতসর।

গণও ইহাকে Golden Temple নামেই অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার নিকটস্থ দুইটী প্রধান রাস্তার সঙ্গমস্থলেও "To Golden Temple" অর্থাৎ "স্বর্ণমন্দিরে যাইবার পথ" বলিয়া লিখিত আছে। প্রকৃত পক্ষেই যে ইহা স্বর্ণপাত্র মণ্ডিত, তাহা নয়, মন্দিরের গুম্বজ এবং উহার কলেবর তামার পাতে মোড়া এবং তাহাই মোটা করিয়া স্বর্ণের হল করা। এই স্বর্ণ-রঞ্জন এত পুরু যে, সহজে উহার কৃত্রিমতা অনুভব করা যায় না। এই নিমিত্তই জনসাধারণের নিকট ইহা সুবর্ণমন্দির বলিয়া অভিহিত।

মহারাজা রণজিৎসিংহ এই মন্দিরটিকে এইরূপ ভাবে হল করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শিখেরাও জাহাঙ্গীর প্রভৃতি মোগলবাদশাহ্‌গণের সমাধিভবন হইতে বহুমূল্য প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। মন্দিরের স্বর্ণ-রঞ্জনে যে পরিমাণ সুবর্ণ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পৃথক্ করিলে তাহার মূল্য আজকালকার কত 'সাতরাজার ধন' হইত।

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে, সর্ব্বাগ্রেই অকালীদিগের 'ভুঙ্গ' নামক অট্টালিকা দেখিলাম, এস্থানে শিখগুরুদের বহু অস্ত্রশস্ত্র যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। এখানে বহু গায়ক ও বাদ্যকর বসিয়া থাকে। ইহারা প্রত্যহ ধর্ম্মসঙ্গীত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছে। মন্দিরের চারি কোণে যে চারিটী স্তম্ভ আছে, উহার উপর আরোহণ করিলে নগরের সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। 'দরবার-সাহেবে' প্রতিদিন অপরাহ্নে লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে। সে সময়ে বহু যাত্রীর সমাগম হয়, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক—পর্ব্বদিন হইলে ত আর কথাই নাই। আমরা যে দিবস মন্দির দর্শন করি, সে দিন একাদশী তিথি ছিল, কাজেই লোকারণ্য ভেদ করিয়াই আমাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! দেখিলাম, কোথাও নানকের আদিগ্রন্থ বা 'গ্রন্থসাহেব' পঠিত হইতেছে, কোথাও শ্রীমদ্ভাগবত, কোথাও রামায়ণ, কোথাও মহাভারত পাঠ হইতেছে, কোথাও বা সুমধুর রবে বাদ্য বাজিতেছে ও সুস্বরে ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হইতেছে। আমরা এই ধর্ম্ম-নিকেতনে ধর্ম্মালোচনা দেখিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলাম। যদিও ইহা হিন্দুদিগের তীর্থ নহে, তথাপি আমরা ভক্তিসহকারে এস্থানে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডাদিগকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলাম। চঞ্চল সিংহ নামক একজন পাণ্ডা আমাদের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয় আমা-দিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এরূপ মিষ্টভাষী পাণ্ডা তীর্থস্থলে পাওয়া দুর্লভ। তাঁহার সদ্ব্যবহারে তাঁহাকে একখানা প্রশংসাপত্র না লিখিয়া দিয়া পারিলাম না। উক্ত ব্যক্তির হস্তে আমাদের ময়মনসিংহের মহারাজা স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরেরও একখানা প্রশংসাপত্র দেখিতে পাইলাম। মন্দিরমধ্যস্থ গ্রন্থসাহেবকে প্রতিদিন পুরোহিতেরা পুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; গ্রন্থসাহেব প্রথম শিখগুরু নানকের বিরচিত। শিখদের নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জ্জুন, হরগোবিন্দ, হররায়, হরকৃষ্ণ, তেগ বাহাদুর এবং গোবিন্দসিংহ সর্ব্বসমেত এই দশজন গুরু। দর্শকেরা মন্দির মধ্যস্থ গ্রন্থসাহেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলে, পুরোহিতগণ তাঁহাদের হাতে এক একটী আশীর্ব্বাদী পুষ্প প্রদান করেন।

মন্দিরের অন্তর্ভাগের ও বহির্ভাগের উভয় দৃশ্যই বড়ই মনোহর।

অভ্যন্তরে স্বর্ণপাতের উপর বিচিত্র কারুকার্য্য খোদিত এবং স্থানে স্থানে বহুমূল্য হীরক পান্না প্রভৃতি প্রস্তর সুশোভিত। যখন মন্দির-শীর্ষে সূর্য্য-কিরণ পতিত হয়, তখন উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। মন্দিরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এতই মনোহর যে, দুইটী মাত্র চক্ষুতে যেন ধরে না।

অটল বা অতলেশ্বরের মন্দির।

অমৃতসরে অটলেশ্বরের বা অটলবাবার মন্দির, গোবিন্দ-গড় (দুর্গ), রামবাগ, নূতন কেশরবাগ, কলেজ, লাইব্রেরী এবং শাল ও গালিচা নির্ম্মাণের কারখানা দেখিবার যোগ্য। স্বর্ণ-মন্দিরের অনতিদূরে অটলেশ্বর সমাধি-মন্দির, ইহাও শিখতীর্থ। মন্দিরটি অতি উচ্চ, উহার উপরে উঠিয়া মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা 'বাবা-অটল' বা Atal Towar নামেই পরিচিত। ইহার গঠনপ্রণালী অত্যন্ত সুন্দর। বাবা-অটলের পার্শ্বেই কৌলসর নামক সরোবর। ইহা গুরুগোবিন্দ সিংহের বন্ধ্যা পত্নী কৌলের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। যাত্রিগণ মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই সরোবরের পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া থাকেন। এই সরসীর তীরে একটী বৃক্ষ, দেখিতে বেশ সুন্দর, উহা শাখা প্রশাখা মেলিয়া রহিয়াছে। উহার ডালে শত শত পক্ষবিশিষ্ট কাঠবিড়ালী (Flying-fox) ঝুলিতেছে। অমৃত-সরের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে প্রসিদ্ধ গোবিন্দগড়ের অভেদ্য দুর্গ অবস্থিত।

গোবিন্দগড় দুর্গ।

ইহাও মহারাজা রণজিতের নির্ম্মিত। এখন উহাতে কয়েকজন গোরা সৈনিক এবং সরকারি জিনিষ পত্রাদি থাকে। এস্থানে প্রতি বৎসর দুইটী করিয়া ধর্ম্মমেলা হয়। এই দুর্গেই এখানকার কমিশরিয়েট আফিসও অবস্থিত। রামবাগ একটী বিস্তৃত উদ্যান।

রামবাগ, কেশরবাগ, কালেজ ইত্যাদি।

উহার মধ্যবর্ত্তী পথসমূহ এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে গোলকধাঁধার ন্যায় বোধ হয়। বাগানে বহু-প্রকারের ফল, ফুল ও নানাবিধ বিটপীশ্রেণী আছে। উহাদের মধ্যে কতক-গুলি আমাদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইল। এখানকার কেশরবাগ লক্ষ্ণৌ নগরের সুপ্রসিদ্ধ কেশরবাগের নামানুকরণ মাত্র। ইহাতে তাহার কণাংশ সৌন্দর্য্যও বিদ্যমান নাই। কলেজে এফ, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়ান হয়।

এখানকার লাইব্রেরীর পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি পাঠে সকলেরই সমান অধিকার আছে। আমরাও অবসর মত অনেক সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মতি বাবুর সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকার' এ অঞ্চলে বিশেষ গৌরব। 'হিন্দীবঙ্গবাসী'ও ক্রমশঃই এদেশে সুপ্রচারিত হইতেছে। একদিন শাল ও গালিচার কারখানা দেখিতে গমন করিলাম,—কারখানায় বিস্তর লোক খাটিতেছে দেখিলাম। অমৃতসরের শাল, ধূসা, গরবী ও আলোয়ান প্রসিদ্ধ। আমাদের বঙ্গদেশের মহাজনেরা অনেক সময়ে এখানকার জিনিষকেই 'কাশ্মীরী' বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়ের সহিত আমরা শাল ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম; দুঃখের বিষয় বলিতে কি, আজকাল এস্থানেও প্রবঞ্চনা আরম্ভ হইয়াছে। বিক্রেতারা অনেক সময়ে সূতা ও পশম-মিশ্রিত কাপড়ও বিশুদ্ধ পশমী বস্ত্র বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। আবার বিলাতী আলোয়ানের গায়ে হাসিয়া দিয়াও অমৃতসরের জিনিষরূপে চালাইতেছে। এখানে শাল বুনিবার জন্য প্রায় ৫০০০ হাজার তাঁত আছে। এই সকল তাঁতীদের অধিকাংশই কাশ্মীরী। কাশ্মীরের দরিদ্র লোকেরাই এখানে আসিয়া মহাজনদিগের নিকট দাদন লইয়া তাঁতে শাল প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাশ্মীরের পশম অমৃতসরের পশম অপেক্ষা বহু শ্রেষ্ঠ। কাশ্মীরে পশমে কোনরূপ ভেঁজাল দেওয়ার প্রথা নাই; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ স্থানে ভেঁজাল দেওয়ার প্রথা খুব বেশী। তিব্বত প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের ছাগলের লোমেও এখানে শাল প্রস্তুত হয়। এখানে উত্তম রেশমও উৎপন্ন হইয়া থাকে। গড়ে প্রতিবৎসর এ নগরে প্রায় চারিকোটি টাকার দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হয়।

তারণ-তোরণ।

অমৃতসর সহরের সাত ক্রোশ দক্ষিণদিকে তরণ-তারণ অবস্থিত। ইহাও একটী প্রসিদ্ধ স্থান। শুনিলাম যে এখানে প্রায় ৬০০ শত হাত দীর্ঘ এবং ৫০০ শত হাত প্রশস্ত একটী সরোবর আছে। প্রবাদ আছে, যদি কোন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি সাঁতার দিয়া উহা পার হইতে পারে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নীরোগ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন অসুবিধা ঘটায়, এই দৈবশক্তি সম্পন্ন সুবৃহৎ দীর্ঘিকা দেখিতে যাইবার সুযোগ

ঘটে নাই। অমৃতসর একটী প্রাচীন সহর, উহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরগুলি এখন জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গভর্মেণ্ট একদিকের জীর্ণ-সংস্কার করাইয়া ব্যয়বাহুল্য ভয়ে অপর দিকের সংস্কারে ক্ষান্ত হইয়াছেন। নগরটি জনাকীর্ণ, পথগুলি পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত। এখানে খুব অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী বাস করেন। রেলি-ব্রাদার্সের বিস্তৃত কারখানা এবং সৈন্যের ছাউনীও (Cantonment) এস্থানের অন্যতম দ্রষ্টব্য। জলন্ধর হইতে অমৃতসর আসিতে মধ্যে বিখ্যাত সিন্ধুনদের অন্যতম শাখা বিপাসা নদী পাওয়া যায়। ইংরেজেরা ইহাকে Beas 'বিয়াস' কহেন। বিপাসার ২৭ মাইল অন্তরেই এই অমৃতসর নগর।

নানাকথা।

আমরা অমৃতসরে যে বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়ের নিকট অনুরোধপত্র লইয়া আসিয়াছিলাম, তাঁহার বাসায় স্থানাভাবে অবস্থানের অসুবিধা জানিয়া মহাত্মা লালা শান্তিরামের বাটীতেই বাসা স্থির করিয়াছিলাম। ঐ সদাশয় ব্যক্তি নবাগত বিদেশী ভদ্রলোকদের অবস্থানেব নিমিত্ত একখানা দ্বিতল বাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সম্মুখে উদ্যানসহ চতুষ্কোণ পাড় বাঁধান পুকুর। অতিশয় সুন্দর বন্দোবস্ত। বিনা ভাড়াতেই এই অট্টালিকায় বাস করিতে পাওয়া যায়। তবে ভদ্রলোকমাত্রেই প্রহরীকে কিছু না কিছু দিয়া থাকেন। শান্তিরামের ন্যায় এরূপ স্বার্থহীন, পরোপকারী, উদার-হৃদয়ের লোক জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

বাবা নানকের গ্রন্থসাহেবখানি মন্দির হইতে প্রত্যহ রজনী নয় ঘটিকার সময় সাজসজ্জার সহিত স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। পরে পুনরায় রজনীর শেষ-ভাগে সবিশেষ আড়ম্বরের সহিত তাহা আনয়ন পূর্ব্বক মন্দিরে স্থাপনা করা হয়। ইহাই প্রাত্যহিক নিয়ম। বাবা নানকের গ্রন্থসাহেবই শিখদিগের একমাত্র অর্চ্চনীয়। সাধারণতঃ দর্শকগণও এখানকার সুবর্ণমন্দিরই দেখিতে আসিয়া থাকেন। পঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অমৃতসরের জলবায়ু নাতি-শীতোষ্ণ, বিশেষতঃ শীতকালে ইহা একান্ত স্বাস্থ্যকর। ষ্টেসনের সন্নিকটেই ডাক-বাঙ্‌লা আছে। গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি সর্ব্বদাই ষ্টেসনে পাওয়া যায়।

লাহোর।

অমৃতসর হইতে লাহোর আসিলাম। লাহোর সকলেরই সুপরিচিত স্থান। যাহারা যুক্তপ্রদেশে কিংবা পঞ্জাবের দিকে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল, যিনি পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী এই সুন্দর স্বনামধন্য নগর দেখিয়া যান নাই। লাহোরে আসিয়া কিন্তু আমার নিকট ইহা সেকালের প্রাচীন খলিফাদিগের শাসনাধীন একটী কুহকময় নগরী বলিয়াই মনে হইয়াছিল। গম্বুজে, মিনারে, তোরণে, প্রাচীরে ইহা বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীতের কথাই অধিক স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতির সজীব দৃশ্য ও সহরের চঞ্চল কোলাহল সত্যসত্যই যেন সেকালের একটী নিত্য উৎসবময় প্রাচীন নগরে আনিয়া উপস্থিত করে। পঞ্জাবের উত্তপ্ত আতপ-তাপ এখানে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ্য লাহোর পঞ্জাবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও জনাকীর্ণ নগর। রাজধানীর বিশেষত্ব এখানে পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান। কলিকাতা হাইকোর্টের ন্যায় এস্থানেও একটী প্রধানতম বিচারালয় আছে, তাহার নাম চীফকোর্ট (Chief Court)। এতদ্ব্যতীত কমিশনার, ডেপুটি-কমিশনার প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগেরও কতকগুলি আফিস এখানে সংস্থাপিত আছে। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যাও বেশী। কাশী ও এলাহাবাদ ব্যতীত পশ্চিমের অন্যত্র আর কোথাও এত অধিক বাঙ্গালীর বাস নাই। লাহোর অতি প্রাচীন সহর। প্রাচীন কিম্বদন্তী এই যে, রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবকর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে যে এস্থানে চৌহান বংশীয় রাজপুতেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা হার্ডিঞ্জের সময় ইহা ব্রিটিশ-শাসন-ভুক্ত হইয়াছে। যখন এই নগর মোগলদিগের হাতে ছিল, তখনি ইহার সমধিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান নগরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর মহারাজা রণজিৎসিংহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মোগলের পরে তাঁহার অধিকারে আসিয়া পুনরায় ইহার পূর্ব্বগৌরব-বৈভব ফিরিয়া আইসে। এই প্রাচীরের চারিদিকে চারিটী তোরণ

আছে। নগর-প্রাচীর স্থানে স্থানে এখন ভাঙিয়া গিয়াছে, গভর্মেণ্টও জীর্ণ-সংস্কারে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। তাঁহাদের মতে প্রাচীর-বেষ্টিত নগর নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। এই প্রাচীর প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ।

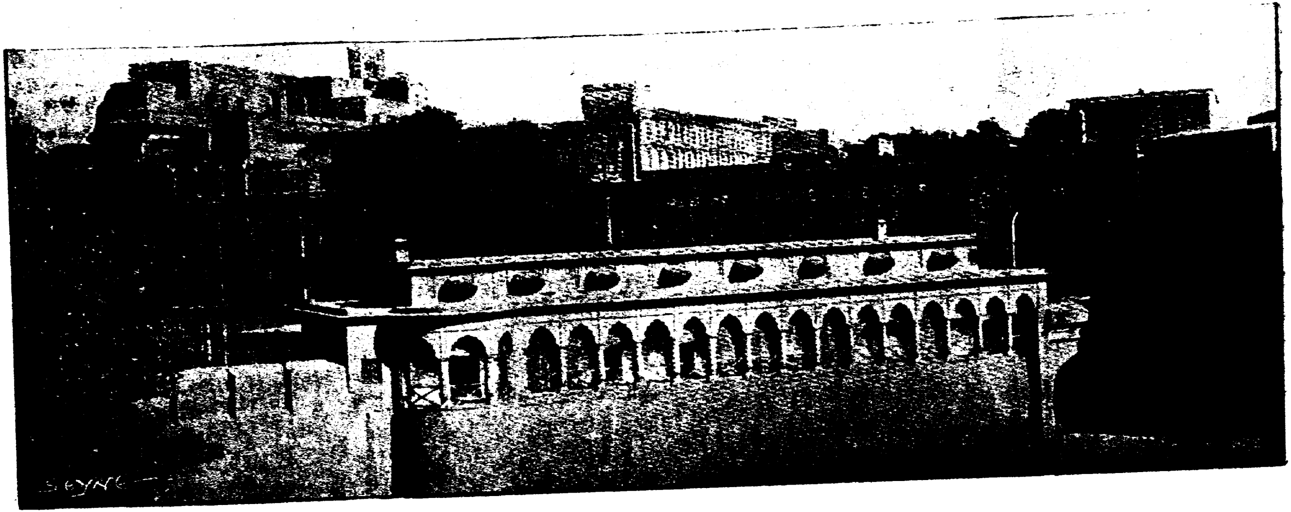
আমরা নগরের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিলাম। বাজারের দুইটী গলি ভিন্ন অপর সকল পথই কলিকাতার বড়বাজারস্থ গলির ন্যায় অপ্রশস্ত, গাড়ীতে যাতায়াত করা দুরূহ। এখানে জিনিষপত্র তত সুলভ নহে। কলিকাতা, দিল্লী ও বোম্বে হইতে জিনিষ-পত্রাদির আমদানী হইয়া থাকে। কাবুলী মেওয়া এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর দরও খুব সস্তা। লাহোরের পশ্চিম দিক্ দিয়া রাবী নদী প্রবাহিতা। আনার-কলি নামক স্থানটিই লাহোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। এই স্থানেই দেশীয় ও ইউরোপীয় লোকদিগের বড় বড় দোকান ও কারবার দর্শকগণের নয়নমন আকর্ষণ করিতেছে। এরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান লাহোরের আর কোথাও নাই। উচ্চ শ্রেণীর আফিস আদালতাদি সমুদয়ই এস্থানে অবস্থিত।

আনার-কলি।

আনার-কলির ইতিহাসটি বড়ই শোকোদ্দীপক। আনার-কলি নাম্নী একটী ইরাণদেশীয়া রূপসী ও ষোড়শী বাঁদীর সহিত সম্রাট্ আকবর বাদশাহের পুত্র সেলিমের প্রণয় হয়। সেলিম গোপনে এই সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই ঘটনা আকবর শুনিতে পাইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন এবং জীবিতাবস্থায়ই তাহাকে এই স্থানে কবর দিয়া বধ করেন। তদবধি এ স্থানের নাম আনার-কলি হইয়াছে। প্রণয়ের জন্য এইরূপ অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ জগতে অতি বিরল দৃষ্ট হয়। জাহাঁগীর দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আনারের সমাধিস্থানের উপর একটী সুন্দর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। উহা এখনও বর্ত্তমান আছে এবং উহাতে গভর্মেণ্টের রেকর্ড অফিস রহিয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত এই সমাধিমন্দিরই ইংরেজের গির্জ্জার কাজ করিয়াছে। এই অট্টালিকাটির মধ্যপ্রকোষ্ঠের উপরে যাহাতে স্মৃতিলিপি খোদিত আছে, তাহা একখানি তুষারধবল মর্ম্মর প্রস্তর। ইহার অক্ষরগুলি অতিশয় সুন্দর ও স্পষ্ট। এইরূপ মনোরম খোদিত লিপি ভারতবর্ষের আর কোনও সমাধিমন্দিরে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রস্তরখানির পাশে খোদার ৯৯টী নাম এবং তাহার নীচে 'মনজুন সলিম অকবর' অর্থাৎ

আকবরের পুত্র কামাতুর সলিম, এইরূপ লিখিত আছে। এই আনার-কলির নিকটেই চিত্রশালা (মিউজিয়াম) পশুশালা, জলের কল এবং ট্রামগাড়ীর আড্ডা ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। এ সকল কোন অংশেই কলিকাতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। মিউজিয়মের সম্মুখেই ঝম্-ঝম্ তোপ। ইংরেজদের সহিত যখন শিখদের যুদ্ধ হয়, তখন চিলেনওয়ালার যুদ্ধে শিখেরা এই তোপ ব্যবহার করিয়াছিল। তোপটি পিত্তলের তৈয়ারী, দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। নিকটেই সার জন লরেন্সের বীরত্বব্যঞ্জক প্রস্তরমূর্ত্তি অবস্থিত। তাঁহার এক হস্তে কলম ও অপর হস্তে তরবারি শোভমান। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইনি পঞ্জাবের লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। ইঁহার বুদ্ধি-প্রভাবেই পঞ্জাবের শিখগণ বিদ্রোহে যোগ না দিয়া ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। চিত্রশালাটি কলিকাতার চিত্রশালা হইতে অনেক ছোট, বিশেষ দেখিবার কিছুই নাই, তবে এখানে গান্ধার প্রদেশের অনেক সুপ্রাচীন ভাস্কর্য্য ও প্রাচীন হিন্দুরাজাদের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নৃপতিবৃন্দের নামাঙ্কিত মুদ্রাসমূহ দর্শনে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। পশুশালায় চারি-শৃঙ্গের ভেড়া এবং চিত্রশালায় একটা বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট ভেড়ার মস্তক দ্রষ্টব্য এবং চিত্তাকর্ষক বটে। লাহোরের দর্শনযোগ্য স্থানসমূহের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শাহ্‌দারাবাদ—মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখিয়া শাহ্‌দারাবাদ দেখিতে যাওয়া গেল। উহা লাহোরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটা বাদশাহী বাগান, রাবীর নৌসেতু পার হইয়া যাইতে হয়। ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াতের ভাড়া আমাদিগকে ১॥০ টাকা দিতে হইয়াছিল। বাগানটীর পূর্ব্বশ্রী কিছুই নাই। শেষ মুসলমানরাজগণের অযত্নে এবং শিখদিগের অত্যাচারেই এই স্থান বহু পূর্ব্ব হইতেই একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। গভর্মেণ্ট আধুনিক ফলফুলের তরুদ্বারা উদ্যানটির শোভা কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন বৃক্ষের মধ্যে দ্বাদশহস্ত পরিধিবিশিষ্ট একটী আম্র বৃক্ষ দেখিলাম। এই উদ্যান মধ্যে দিল্লীর খ্যাতনামা সম্রাট আকবরের প্রিয়তম পুত্র জাহাঁগীর বাদশাহের সমাধিগৃহ স্থাপিত। কথিত আছে যে, সুন্দরীকুল-শিরোমণি নুরজাহাঁ পতিভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

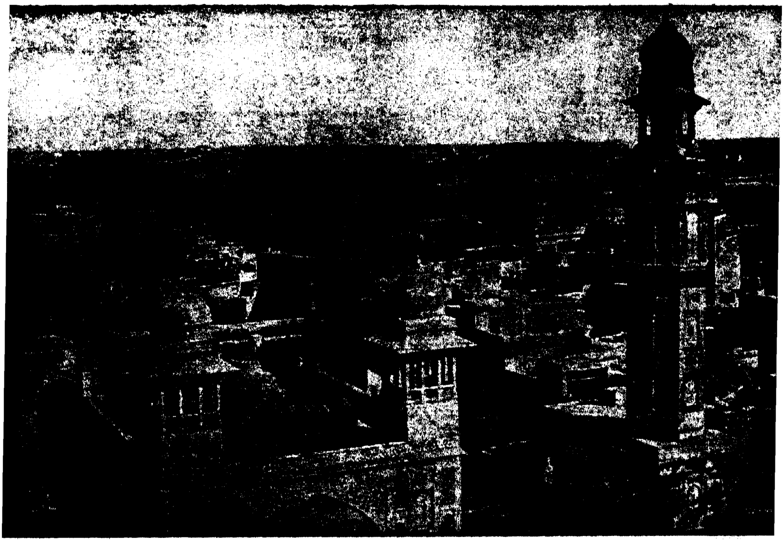


রণজিৎসিংহের প্রাসাদ ও দুর্গ—লাহোর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

ইহা দেখিলে, ইহাকে একটী সুন্দর ও সুবৃহৎ বৈঠকখানা-বাড়ী বলিয়া অনুমিত হয়, মুসলমানের সমাধিগৃহ বলিয়া অনুমিত হয় না। সমাধিমন্দিরটী লোহিত প্রস্তরদ্বারা অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। কবরের উপরিভাগ কেবল শ্বেত প্রস্তরে সুশোভিত। এই সমাধি ১১০৯ হিন্দী ও ১০৩৭ হিজরী সনে প্রতিষ্ঠিত। ইহার চারি কোণে বহুতল, কক্ষবিশিষ্ট, ৪৬ হস্ত পরিমিত উচ্চ চারিটী স্তম্ভ। উহার উপর হইতে দূরস্থিত লাহোরনগরের দৃশ্য ও কলনাদিনী রাবীর তটপ্লাবিনী তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে অতি সুন্দর। মার্ব্বল ও লোহিত প্রস্তর অনেক স্থান হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাহাতে বহুপরিমাণে সৌন্দর্য্য লোপ পাইয়াছে। এই সমাধির অনতিদূরে উজীর আমিন খাঁর বৃহৎ সমাধি।

সালেমার বাগ—ইহাকেই লাহোরের প্রধানতম দৃশ্য এবং গৌরব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লাহোর সহর হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে সালেমার বাগ অবস্থিত। সালমার অর্থে আনন্দ এবং বাগ অর্থে বাগান (আনন্দোদ্যান)। এরূপ সুরম্য উদ্যান ভারতের আর কোথাও নাই; দেখিতে যেমন বৃহৎ, সৌন্দর্য্যও তেমনি মনোহর। কথিত আছে যে, সম্রাট শাহ্জাহাঁ একদিন স্বপ্নে স্বর্গ দেখেন, পরে সেই স্বপ্নানুযায়ী ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমানদের স্বর্গ সপ্তস্তরবিশিষ্ট, সালেমার উদ্যানও সপ্তস্তরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংরেজ গভর্মেণ্ট উপরের চারি স্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কেবল নিম্নের তিন স্তর রক্ষা করিয়াছেন। সালেমার বাগ প্রায় অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত। ক্রম-নিম্ন তিনটী বেদীর উপর এই উদ্যান নির্ম্মিত। এমনি কৌশলে এই উদ্যানটি নির্ম্মিত যে ভাষাদ্বারা ইহার সঠিক সৌন্দর্য্যের কথা ব্যক্ত করা অসম্ভব। ক্রমান্বয়ে তিনটী স্তর মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে নামিয়া গিয়াছে। না দেখিলে, কেহই এই উদ্যানের প্রকৃত নির্ম্মাণ-কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। প্রথম স্তর জলপ্রণালী দ্বারা সুশোভিত; তাহার উভয় পার্শ্বে পথ, পথের দুইদিকে নানাবিধ শ্রেণীবদ্ধ ফলের বৃক্ষসমূহ বিদ্যমান। দ্বিতীয় স্তরে একটী কৃত্রিম সরসী ও বসিবার [illegible] আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর। সরোবরের দুই পার্শ্বে সুন্দর উপবন। [illegible]য় স্তরে আবার প্রথমস্তরের মত জলপ্রণালী ও উপবন। আমরা



ওয়াজির খাঁয়ের সমাধিস্তম্ভ হইতে লাহোরের দৃশ্য।

মোটামুটি গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে, এস্থানে ৪০০ চারিশতেরও অধিক ফোয়ারা উদ্যানটিকে যার পর নাই মনোহর ও সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে। নবরুচিসম্পন্ন গোলাপাদি তরুও উদ্যানের শোভাবৰ্দ্ধন করিতেছে। আম্রবৃক্ষের সংখ্যাই এখানে বেশী। জনরব এইরূপ প্রচলিত আছে যে, রণজিৎসিংহ এ স্থান ইহতে মার্ব্বল প্রস্তর খুলিয়া লইয়া অমৃতসরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ফোর্ট বা কেল্লা—ইহা সম্রাট জাহাঁগীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে স্থানে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ থাকিতেন, অদ্যাপি তাঁহার সেই প্রিয়তম শিখ-মহলের দুই তিন খানা বিচিত্র চিত্রিত গৃহ ব্যতীত দেখিবার আর কিছুই নাই। দুর্গের একটী গৃহে শিখদের ব্যবহৃত নানাপ্রকার ধাতু-বিনির্ম্মিত বর্ম্ম ও পৃষ্ঠত্রাণ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। উহার এক একটীর ওজন অর্দ্ধমণের ন্যূন হইবে না। এখানে প্রাচীন শিখদিগের নির্ম্মিত অস্ত্রাদি

ভারতের অতীত গৌরবকাহিনীর কথা মনে পড়িল। একদিন যে

সকল বীরেন্দ্র এই সকল বর্ম্মে চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া সুদীর্ঘ তরবারি ও বল্লম হস্তে রণক্ষেত্রে গমনাগমন করিত, আজ তাহারা কোথায়! তাহাদের চিরপ্রিয়তম অস্ত্রশস্ত্রের এখন কে ব্যবহার করে?

বাদশাহী মস্‌জিদ্—এই ভজনাগারটি লাহোর নগরের একটী ভূষণ-স্বরূপ; ইহা শাহ্‌দারা পল্লীতে নির্ম্মিত। ইহার সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, আকবর ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; আবার কেহ কেহ ইহাকে জাহাঁগীরের নির্ম্মিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। আমরা যতটা প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে, শেষোক্ত সিদ্ধান্তই যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। এই মস্‌জিদটি দর্শনে আমরা যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। মস্‌জিদটি লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত ও গুম্বজত্রয়ে ভূষিত। ইহার সম্মুখভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং চারিদিকে চারিটী অত্যুচ্চ স্তম্ভ। উহার উপরে উঠিলে লাহোর নগর দেখিতে বড়ই সুন্দর দেখায়।

রণজিতের দরবার—শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ছোট হইলেও উহার দৃশ্য মনোহর। এই গৃহে বসিয়াই মহারাজ রণজিৎ সিংহ বৈদেশিক ও সামন্তরাজগণের সহিত আলাপাদি কিংবা তাঁহাদের প্রেরিত দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই গৃহটিকে ইংরেজেরা বিশেষ আদরের চক্ষে দেখেন, কারণ এই গৃহে বসিয়াই রণজিতের পুত্র অভাগা দলীপ সিংহ ইংরেজ গভর্মেণ্টের হস্তে পঞ্জাবের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধি-মন্দির—এই সমাধি মন্দিরটির অভ্যন্তরে পঞ্জাবের চিরগৌরব, বীরকুলকেশরী রণজিৎ সিংহ চিরনিদ্রাগত। হায় পুরুষসিংহ! একবার আসিয়া দেখ, তোমার ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হইয়াছে—আজ ভারতের সর্ব্বত্রই লালের একাধিপত্য! ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সমাধিমন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার শ্রী বহুপরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন উহাতে বহু জ্ঞানী ও সুবিদ্বান পণ্ডিত বাস করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। আমরা জনৈক বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক লাহোর নগরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। তিনি এই নগরের অধিবাসিগণের প্রতি এতই অত্যাচার

করিয়াছিলেন যে, তাহারা নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর যখন ইংরেজাধিকারে আসে, তখন ইহার চতুর্দ্দিক ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল। পরে প্রতিবৎসর নূতন নূতন অট্টালিকাসমূহ বিনির্ম্মিত হইয়া নগরের নব-শ্রী সম্পাদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নগর ১৯২ বিঘা জমি লইয়া ব্যাপ্ত। উহা পূর্ব্বে ৩০ ফিট্ উচ্চ ইষ্টক-প্রাচীরে বেষ্টিত ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা ও নগর রক্ষণোপযোগী দুর্গ ও বুরুজাদিতে শোভিত ছিল। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের অধীনে আসিবার পর হইতে উহার পূর্ব্বতন ৩০ ফুট উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন হওয়ায় ১৬ ফুট উচ্চ প্রাচীর তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পরিখার পরিবর্ত্তে এখন নানা জাতীয় সুন্দর সুন্দর বিটপী-শ্রেণী সুশোভিত সুরম্য উদ্যানে নগরের সৌন্দর্য্য বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবল উত্তরদিকের অংশ এখনও খালি আছে।

নুরজাহাঁর সমাধি—জাহাঁগীরের সমাধি দেখিয়া ফিরিবার সময় পথে জাহাঁগীরের প্রিয়তমা মেহের-উন্নেসার (নারীকুলের চন্দ্র) সমাধি দেখিতে গিয়াছিলাম। যে অদ্বিতীয়া রমণীকে লাভ করিবার জন্য সম্রাট হইয়াও জাহাঁগীর আশ্রিত ও বীরশ্রেষ্ঠ শের আফগানকে অন্যায়রূপে বধ করাইয়াছিলেন, এই খানে সেই সকল সৌন্দর্য্যললামভূতা মেহের-উন্নেসার দেহাবশেষ নিহিত ছিল;—কিন্তু কই? তাহা ত আজ আর দেখিলাম না! রাবীর প্রবল স্রোতবেগে তাহার সমাধি-মন্দির,—সেই উচ্চ অট্টালিকা, এমন কি তাহার কবরের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত ভাসাইয়া গিয়াছে। এখানে দাঁড়াইয়া পদতল বাহিনী রাবীর সেই কলনাদের মধ্যে কি শুনিতেছিলাম? রাবী যেন বলিতেছিল—হে পান্থ! একবার রূপগর্ব্বিতা ভুবনমোহিনী মেহেরের কথা ভাব! যে শের আফগান বিবাহিতা পত্নীরূপে মেহেরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত—যে সেই রূপসীকে পাইয়া জগৎসংসারকে সুখাগার বলিয়া স্থির করিয়াছিল,—সেই বীরশ্রেষ্ঠ শের আফগানের মৃত্যুতে জাহাঁগীরের প্রেম-আবল্যে-মুগ্ধা, কালসাপিনী নুরজাহাঁ, প্রণয়ীর চরণতলে আত্মবিক্রয় করিয়া ভারতেশ্বরী হইল! এই বিবাহ দিবসে তাহার হৃদয়ে কি এক পলকের নিমিত্তও মৃত-পতির স্মৃতি জাগরিত হইয়া এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জনের

অবকাশ দেয় নাই! এই সংযোগ কাহারও সুখের হয় নাই। প্রথমে শের আফগান জ্বলিল, পরে মোগল সাম্রাজ্য জ্বলিল, শেষে সম্রাট্ জাহাঁগীরকে পঙ্গু করিয়া ফেলিল! কালে নুরজাহান গিয়াছে—জাহাঁগীরও গিয়াছেন—নুরজাহাঁর কবরস্থানটুকু পর্য্যন্ত কালবশে নদীস্রোতে লোপ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এই দুইজনে জগতে যে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কখনও লুপ্ত হইবে? সেই কলঙ্ক-রেখা মুছিয়া ফেলিতে কালের কি সাধ্য হইবে?

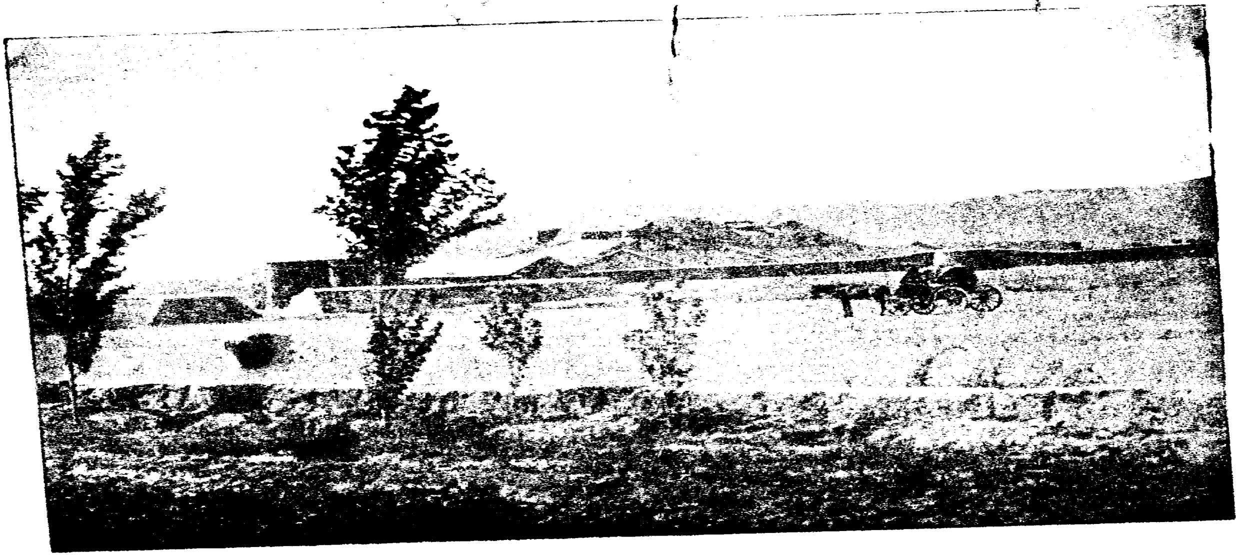
লাহোরের প্রাচীন দর্শনযোগ্য স্থানগুলি ব্যতীত বর্ত্তমান ইংরেজ গভর্মেণ্ট নির্ম্মিত চিফকোর্ট, গভর্মেণ্ট হাউস প্রভৃতি আরও কতকগুলি ইষ্টকালয় দর্শনযোগ্য। এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব ইউনিভার্সিটি ও সেনেট হল (ইহা দেশীয় রাজা ও নবাববৃন্দের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত), ওরিএণ্টেল কলেজ, লাহোর গভর্মেণ্ট কলেজ, মেডিকাল স্কুল, সেণ্ট্রাল ট্রেনিং কলেজ, ল-স্কুল, ভেটারিনারী স্কুল, লাহোর হাই স্কুল, মেও হাঁসপাতাল, এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি গৃহ প্রভৃতিও দেখিবার জিনিষ। এ স্থানের রেলওয়ে ষ্টেসনটি দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার দুই পার্শ্বে দুর্গের স্তম্ভের ন্যায় দুইটী স্তম্ভ আছে। উহার উপর হইতে ইচ্ছানুযায়ী গোলা-গুলি নিক্ষেপও করা যায়। লাহোরের অনতিদূরে সুপ্রসিদ্ধ মিঞা-মীরের ছাউনি। তথায় বহু সংখ্যক বিলাতী ও দেশীয় সৈন্য অবস্থান করে। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এখানকার সৈন্যদের একটী বিশেষ প্যারেড দর্শন করিতে পাইয়াছিলাম—সেদিন স্থানীয় লাট সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। লাহোরে বিষয়কার্য্য উপলক্ষে বহু বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যত্নে এখানে একটী কালীবাড়ী, একটী পুস্তকালয়, একটী বিদ্যালয় এবং একটী নাট্য-সমিতি আছে। আমরা কালীবাড়ীতেই দিব্য আরামের সহিত বাসা করিয়াছিলাম। অবসর সময়ে পুস্তকালয় সমূহ হইতে পুস্তক ও খবরের কাগজ ইত্যাদি পাঠ করিয়া প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াছি। বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা যাহাতে সুদূর পঞ্জাবেও একবারে মাতৃ-ভাষা বিস্মৃত না হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত। একদিন নাট্য-সমিতির অভিনয় দেখিলাম। সুদূর পাঞ্জাবে তাঁহাদের অভিনীত "মেঘনাদবধ"

মিয়ান মীরের ছাউনি।

নানাকথা।

আমাদের বিশেষ মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শুনিলাম আমাদের কলিকাতাবাসী নটকুলশেখর ৺ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ই যখন এখানে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে এই দূর প্রবাসে বাঙ্গালী যুবকগণের মধ্যে নাট্যামোদের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি এখানে অবস্থানকালে তাঁহারই নেতৃত্বে কাশ্মীর-রাজ-প্রাসাদে বাঙ্গালীরা নাট্যাভিনয় করিয়া আসেন। অর্দ্ধেন্দুবাবুই নিজে হিন্দীতে 'সীতার বনবাস' এবং গুরু-মুখীতে 'বুড়োশালিকের ঘাড়ের রোঁ'—'পাখণ্ড ভকত' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়া সেখানে অভিনয় করিয়া আসেন। ধন্য তাঁহার ক্ষমতা! এই সুদূর প্রবাসে আসিয়াও তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার এবং নাট্যামোদ-প্রতিষ্ঠা-রূপ একমাত্র ব্রতের সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইলাম। এখানকার লোকে এখনও কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। যেখানে অধিক বাঙ্গালী সে স্থানে দলাদলি থাকিবেই থাকিবে; লাহোরেও তাহার ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইল না। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা এইরূপ সামান্য বিষয় মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; সর্ব্বোপরি সময়াভাবও বটে। প্রবাসে বাঙ্গালীতে-বাঙ্গালীতে কোনওরূপ বৈরভাব থাকা সর্ব্বতোভাবেই অযৌক্তিক। লাহোরের জনসংখ্যা ১,৭৫,০০০। লাহোরের রাস্তাগুলি অধিকাংশ স্থলেই বক্র এবং সরু। অট্টালিকাসমূহ অধিকাংশই উচ্চ এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে বিনির্ম্মিত থাকায় নগরের তাদৃশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় নাই।

নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে লাহোরী দ্বারের সম্মুখভাগ হইতে যে রাস্তা বরাবর দক্ষিণমুখে গিয়াছে, উহাই সদর-বাজার রাস্তা বা আনার-কলির রাস্তা নামে পরিচিত। আনার-কলির পূর্ব্বদিকে প্রায় তিন মাইলব্যাপী স্থান ডোনাল্ড-টাউন নামে অভিহিত। এস্থানে লরেন্স-উদ্যান ও গভর্ণর্মেণ্ট হাউস এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় গভর্মেণ্ট কর্ম্মচারিগণ বাস করিয়া থাকেন। স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার ডোনাল্ড মাক্‌লাউডের নামানু-সারে এ স্থানের নাম ডোনাল্ড-টাউন হইয়াছে। এই ডোনাল্ড-টাউনের মধ্য দিয়াই মল (Mall) নামক সুপ্রশস্ত এবং সুন্দর রাস্তাটি আনার-কলি পর্য্যন্ত গিয়া মিলিত হইয়াছে।



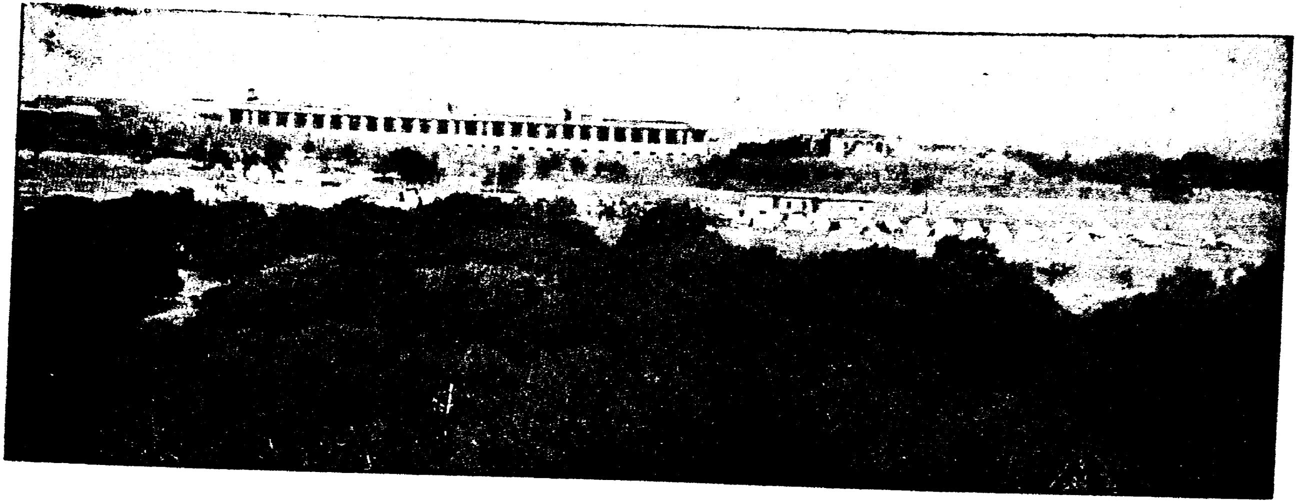
দুর্গ—কোয়েটা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

লাহোরের শিল্পকার্য্য উল্লেখযোগ্য। এখানকার রেশমীবস্ত্র, শাল, সোনালী ও রূপালী সাঁচ্চা জরী, পাথরের খেলনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে আধুনিক সভ্যতার যৌবন-শ্রী পূর্ণমাত্রায় বিরাজমানা। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, আগ্রা ব্যাঙ্ক, সিম্‌লা ব্যাঙ্ক, এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্‌ সিম্‌লা প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাঙ্কও এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাবলপিণ্ডি।

লাহোরের সংলগ্ন বাদামীবাগ ষ্টেশন হইতে রাবলপিণ্ডি রওয়ানা হইলাম। পথে উজিরাবাদ, লালামুসা, ঝিলম প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান এবং রাবী (ইরাবতী) চিনব (চন্দ্রভাগা) ও ঝিলম (বিতস্তা) প্রভৃতি পঞ্চনদের সুবিমল স্রোতস্বিনী সমূহের উপরিস্থিত সুন্দর সুন্দর সেতু দর্শনান্তর হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি ও কৌতূহল জনিত সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। উজিরাবাদ হইতে কাশ্মীর বা ভূস্বর্গে যাইবার রেলবর্ত্ম আরম্ভ হইয়া শিয়ালকোট দিয়া প্রসিদ্ধ জম্মু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে আর লালমুসা হইতে অপর একটী লাইন আরম্ভ হইয়া পিণ্ডদাদন খাঁ, বুখার, দেরাদিন-জানা, মজঃফর গড় ও সেরসা প্রভৃতি স্থান হইয়া মূলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই অভিনব লাইনকে 'সিণ্ড সাগর রেলওয়ে' কহে। লালামুসা অতিক্রম করিয়াই আমাদের বাষ্পীয় শকট পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। গাড়ীর ভিতর হইতে উভয় পার্শ্বের দৃশ্য পরম রমণীয় দেখাইতে-ছিল। নীরব গম্ভীর ভাবে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। তদ্‌গাত্রে শ্যামল বনরাজির অঙ্গে শোভমানা, রজত-ধারা-বাহিনী, উপলঘাতিনী, স্বাদুনীরা নির্ঝরিণীসমূহ উপবীতের ন্যায় দোদুল্যমান থাকায় প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিকশিত করিয়া দিতেছিল। আমাদিগকে এই পার্ব্বত্য পথে কখনও ঊর্দ্ধে, কখনও নিম্নে কখন বা সুরঙ্গ (টনেল) পথে যাইতে হইয়াছিল। বেলা ৭।৩৩ মিনিটের সময় বাদামীবাগ ষ্টেশন হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম আর রাত্রি ৮।১৩ মিনিটের সময় গাড়ী আসিয়া রাবলপিণ্ডি ষ্টেশনে উপনীত হইল। আমরাও গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ব্রেকভ্যান হইতে লেপ-তোষকাদি শীতবস্ত্রের ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বুঝিয়া লইয়া, রাত্রি প্রায় দশঘটিকার সময় একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরের দিকে রওয়ানা হইলাম। এখানকার কমিসারিয়েটের হেড্-এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজ-মোহন মিত্র মহাশয়ের নিকট আমাদের একখানা অনুরোধ চিঠি ছিল, কিন্তু এত রাত্রিতে একজন ভদ্রলোকের বাসায় গিয়া তাঁহাকে বিরক্ত



দুর্গ—রাবলপিণ্ডি।

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

করা অন্যায়-বোধে কালীবাড়ীর উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হইলাম। তথাকার মায়ের সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের আগমনে সসম্ভ্রমে গাড়ী হইতে লইয়া গেলেন এবং অবস্থানের ও শয়ন ভোজনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরাও সুদূর প্রবাসে এইরূপ সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও শান্তিলাভ করিয়া সেই অনন্তের উদ্দেশে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আহারান্তে নিদ্রার আরাম-দায়িনী শান্তিময় ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলাম।

রজনীতে মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। শীত ক্রমশঃই গাঢ় হইয়া উঠিল। আমরাও শীতবস্ত্র জড়াইয়া জড়সড় ভাবে প্রগাঢ় নিদ্রা গেলাম। পরদিবস গাত্রোত্থান করিতে বেলা প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। দ্বারো-দ্ঘাটন করিয়া দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সূর্য্যের সহিত দেখা নাই, অরুণদেব বরুণদেবের নিকট পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে উল্লিখিত ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং নানাবিধ সদালাপ করিতে করিতে কহিলেন, "আপনারা যে পরিমাণ শীতবস্ত্র লইয়া চলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বাঞ্চলের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলেও এদেশের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই, কারণ আপনারা এস্থান হইতে যতই পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইবেন, শীতের প্রকোপও ততই অধিক অনুভব করিবেন, অতএব এস্থান হইতে আরও কিছু শীতবস্ত্র (পশ্‌মী কাপড়) সংগ্রহ করিয়া লউন।" ব্রহ্মচারী মহাশয় বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ তাঁহার এই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইলাম না।

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে একখানা অশ্বশকটে আরোহণ করিয়া ছাউনী-বিভাগের সমুদয় স্থান দর্শন করিলাম, এখানকার ন্যায় বৃহৎ সেনাবাস ভারতের আর কোথাও নাই—নগরের নিকটে মধ্যে মধ্যে ছাউনি বসাইয়া ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইহা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। কেল্লার সম্মুখেই কয়েকজন হাইল্যাণ্ডার্স সৈনিক দেখিতে পাইলাম। আমরা মুরাদাবাদ ত্যাগ করিয়া এইরূপ হাইল্যাণ্ডার্স সৈন্য আর দেখিতে পাই নাই। এ অঞ্চলের লোকেরা সাধারণতঃ ইহাদিগকে লেংটা গোরা কহিয়া থাকে। বাস্তবিকই ইহারা নগ্ন; পায়ে ফুল মোজা পরিধান করে এবং

হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একটা গাউন দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া রাখে, কাজেই সহজে ইহাদিগকে উলঙ্গ বলিয়া অনুমান করা সুকঠিন। ইহারাই গভর্মেণ্টের প্রিয় অর্থাৎ শক্তিশালী সৈন্য।

মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে পুনরায় নগর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। প্রথমতঃ সুজন বাবুর মনোহর উদ্যান এবং তন্মধ্যস্থ তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্য দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বাজারে উপনীত হইলাম। সঙ্গে ব্রহ্মচারী মহোদয়ও আসিয়াছেন, তাঁহার শীতবস্ত্রের উপদেশটা মনে আছে। আমরা দোকানে যাইয়া কেহ কম্বল, কেহ ধূসা, কেহ কোট ও কেহ পট্টু ক্রয় করিলাম। পট্টু এক প্রকার পশমী বস্ত্র-বিশেষ, দৈর্ঘ্যে প্রায় বিশ হাত, প্রস্থে এক হাতেরও কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইহা কাশ্মীর অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বনাত ও কাশ্মীর প্রভৃতি গরম কাপড় অপেক্ষাও ইহা সমধিক উষ্ণ। ইহার এক একটী থানে এক একজন পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির একটা কোট, একটা পেণ্টুলান এবং একটা ওয়েষ্ট কোট হইয়া থাকে।

রাবলপিণ্ডি সাধারণতঃ 'পিণ্ডি' নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। এস্থানেই কাবুলের আমীরের অভ্যর্থনাসূচক বৃহৎ দরবার হইয়াছিল। বড়লাট ডফ্‌রিণই উক্ত দরবার আহ্বানের মূল এবং তিনিই স্বয়ং উঁহার অভ্যর্থনাকারী ছিলেন। দরবারের স্থলটি বিশেষ প্রশস্ত।

উজিরাবাদ হইতে কাশ্মীর যাইবার লাইন আরম্ভ হইয়াছে ও শিয়ালকোট হইয়া জম্মু পর্য্যন্ত গিয়া স্থগিত আছে। ইহার পর পর্ব্বতভেদ করিয়া কতদিনে কাশ্মীরে উপস্থিত হইবে, তাহা ভবিষ্যদগর্ভে নিহিত।

বর্ত্তমান সময়ে রাবলপিণ্ডি হইয়াই কাশ্মীর যাওয়া সুবিধা এবং ভ্রমণ-কারিগণ এই রাস্তাতেই গিয়া থাকেন। সেদিন কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহোদয়ও ঐ পথেই কাশ্মীর গমন করিলেন। ইনি কাশ্মীর-রাজসংসারের ডাক্তার এবং প্রবাসী বঙ্গবাসীর মধ্যে ইঁহার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কালী-বাড়ীতে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। এতদ্ব্যতীত গভর্মেণ্টেরও একটী উচ্চ-শিক্ষাদানোপযোগী বিদ্যালয় এখানে দেখিলাম। এখানে যে কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের

প্রায় সকলের সহিতই আমাদের সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয়াদি হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের বাসায় আসিয়া একান্ত সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রজ বাবু কমিসরিয়েটের বড় বাবু। ইঁহার ন্যায় নিরহঙ্কার ও অমায়িক লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থানে জলের কল থাকায় পানীয় জলের নিমিত্ত কোনও কষ্ট পাইতে হয় না। অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানই বেশী। মড়ী যাইতে এখান হইতে পাঁচ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। পঞ্জাবের মধ্যে রাবলপিণ্ডিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য-নিবাস। ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বারাক ও বাড়ী নির্ম্মিত হওয়ায় দেখিতে পরম রমণীয় হইয়াছে। যদিও রাবলপিণ্ডি ভারতের সীমান্তবর্ত্তী নগর নহে, তথাপি এইখানেই বহুসংখ্যক সৈন্য বাস করে। ইহার চতুর্দ্দিকেই পার্ব্বত্যজাতির উৎপাতের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শীত এখানে অত্যন্ত বেশী। এখানকার নদীর উপরে যে নৌ-সেতু আছে, তাহা অপর পারে আটক নগরের দুর্গ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। এখানকার সমস্ত সেনানিবাস সহরের কেল্লা ও আটকের কেল্লার মধ্যস্থলে হওয়ায় বিশেষভাবে সুরক্ষিত। ছাউনির নীচে নদীর নাম লেহ্। মড়ী এখানকার সৈন্যগণের রোগনিবাস। সেখানকার ব্রুয়ারী অর্থাৎ মদ-চোলাই করিবার কারখানা একটি দেখিবার বিষয় বটে, কিন্তু আমাদের যাওয়া ঘটে নাই। আটক পার হইয়া পেশোয়ার যাইতে হয়।

পেশোয়ার।

আমরা রাবলপিণ্ডি হইতে পেশোয়ার যাইবার পথে মহাভারতোক্ত অত্যাশ্চর্য্য শিল্পচাতুর্য্য বিশিষ্ট দুর্য্যোধনের একটী দুর্গ ও তন্নিম্নে পুণ্য-সলিল সিন্ধুনদ এবং নদোপরি ইংরেজের শিল্পনৈপুণ্যের চিহ্ন স্বরূপ সুদৃঢ় সেতু দর্শনে আপনাদিগকে যারপর নাই কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলাম। স্থানীয় প্রবাদ, আটকের দুর্গটী দুর্য্যোধনেরই নির্ম্মিত। সিন্ধুনদ দেখিয়া কত কথা মনে হইল; কি হিন্দু রাজত্বে, কি মুসলমানরাজত্বে এই সিন্ধু-তীরে কত যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই পথেই সর্ব্ব প্রথম আর্য্যসভ্যতার বিকাশ, সেই অতীত-কাহিনী স্মৃতি-পথারূঢ় হইয়া চিত্তকে যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ ও আক্ষেপে অভিভূত করিয়া তুলিল। সিন্ধুনদকে ভারতের দ্বারস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদিন এই পথেই দুর্দ্ধর্ষ তৈমুর ভারতে প্রবেশ করিয়া শোণিত-স্রোতে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল! নাদিরের প্রবলাক্রমণ এই পথ দিয়াই হইয়াছিল! এই পথেই সুলতান মামুদ বার বার লুণ্ঠনব্যপদেশে সোনার ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল! হায়! সিন্ধু,—তোমার প্রবলতরঙ্গ তখন কোথায় ছিল? তুমি কোন্ মায়াকুহকে বদ্ধ হইয়া এই সোনার মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলে? মনের দুঃখে কবি গাহিয়া গিয়াছেন,—

"একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন
সেভাব থাকিত যদি
পার হয়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন?"

এখন অতীতের শোকোচ্ছ্বাস বিড়ম্বনামাত্র। পেশোয়ারে উপনীত হইবার পূর্ব্বে অনেকেই আমাদিগকে নানারূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা নিখিল-শরণের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নেই তথায় উপনীত হইলাম। আমাদের নিকট কয়েকখানা অনুরোধপত্র ছিল, তাহা থাকা

সত্বেও আমরা কোনও বাঙ্গালী বাবুর বাসায় গমন না করিয়া কালীবাড়ীতেই আড্ডা লইয়াছিলাম। এ অঞ্চলে অর্থাৎ আম্বালা, সিম্‌লা, জলন্ধর, লাহোর, রাবলপিণ্ডি, পেশোয়ার ও মূলতানে এক একটী কালীবাড়ী সংস্থাপিত থাকায় নবাগত ভিন্নদেশবাসী পর্য্যটকগণের পক্ষে অবস্থানের জন্য কোনওরূপ অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে হয় না।

পেশোয়ার ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশস্থ সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। এস্থান হইতে কাবুল ও সোয়াট-(সুবাস্ত) নদীর সঙ্গমস্থল প্রায় ৬॥ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পেশোয়ারের তলদেশ-প্রবাহিণী নদীর নাম বারা—ইহা আকারে একান্ত ক্ষুদ্র।

পেশোয়ার জেলায় পেশোয়ারই প্রধান নগর এবং বিচার-বিভাগীয় সদর। এস্থান হইতে নয় মাইল পশ্চিমদিকে জামরুড নামক একটী দুর্গ আছে। এই জামরুড হইতেই কাবুল যাইবার 'খাইবার পাস' নামক সংকীর্ণ গিরিপথ আরম্ভ হইয়াছে। তথায় গভর্মেণ্টের একদল দেশীয় সৈন্য বাস করে। তাহাদিগকে Frontier Police কহে। জামরুড অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে, পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের পাস আবশ্যক। সঙ্গে রক্ষক লওয়াও প্রয়োজন এবং সে জন্য 'ফি'ও দিতে হয়। খাইবারের পথ নিতান্তই বিপজ্জনক। পেশোয়ার হইতে জামরুড যাইতে মহারাজ রণজিৎসিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ হরিসিংহের একটী দুর্গ পাওয়া যায়, দুর্গ টী সেরপুর নামক স্থানে স্থাপিত। দুর্গের পাদদেশে সেরাপা নামক একটী শুষ্ক নদ। জামরুড দুর্গও হরিসিংহের নির্ম্মিত; তথায় তাঁহার সমাধি আছে। দুর্গ টীকে এখন বিশেষরূপে সংস্কৃত এবং সুদৃঢ় করা হইয়াছে। আমরা জনৈক পাঞ্জাবী সৈন্যাধ্যক্ষের বিশেষ অনুগ্রহে উক্ত দুর্গের উপরিভাগে উঠিয়া চতুর্দ্দিকের নৈসর্গিক শোভা দর্শনে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছি। দুর্গের শিখরদেশে ব্রিটিশসিংহের গৌরব-নিশান উড্ডীয়মান রহিয়াছে। এই দুর্গ হইতেই খাইবার পাস রক্ষা হইতেছে।

পেশোয়ারই উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের পশ্চিম প্রান্ত। এই স্থানেই রেলের শেষ। আমরা জগদীশ্বরের অপার করুণাগুণে রেলবর্ত্মের প্রান্তসীমা দর্শনান্তর ভারতের বিশাল উত্তর পশ্চিম রেলপথের পশ্চিম সীমায় উত্তীর্ণ

হইয়া যার পর নাই আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। রেল যে এখানেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে, তাহা সম্ভবপর নহে—সময়ে নিশ্চয়ই আরও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। শুনিতে পাই এখন জামরুড পর্য্যন্ত রেলওয়েবর্ত্ম বিস্তৃত হইয়াছে।

পেশোয়ারেই প্রাচীন গান্ধাররাজ্যের রাজধানী ছিল, তখন ইহার নাম ছিল পুরুষপুর। সুদূর অতীতের সে সকল প্রাচীন চিহ্ন এখানে এখন কিছুই বিদ্যমান নাই; তবে পূর্ব্বে যে এস্থানে বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল, অদ্যাপি সে সকল বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নয়ন-গোচর হয়। নগরের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১০ দশ ফুট উচ্চ মাটীর প্রাচীর আছে। উহার মধ্যে মধ্যে নগর রক্ষকদের জন্য ঘাঁটিও বিদ্যমান আছে। এই মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীর শিখসর্দ্দার, অবিতাবিল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগর প্রবেশের নিমিত্ত ১৬টি দ্বার আছে। প্রতি দিবস রাত্রিতে দ্বার রুদ্ধ হইবার সময় তোপধ্বনি হইয়া থাকে। কাবুল গেটই দরজাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান—ইহা প্রায় পঞ্চাশফুট প্রশস্ত। কাবুল হইতে এই দ্বার পর্য্যন্ত বরাবর একটী সোজা রাস্তা আছে বলিয়াই ইহার নাম কাবুল গেট হইয়াছে। সহরের মধ্যস্থলে একটী গাঁথা পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত। ইহার জলই নগরবাসীর একমাত্র অবলম্বন। এই জল কাবুলের অন্তর্গত পার্ব্বত্য লেণ্ডুয়া নদীর ঝরণা হইতে আসে; এ নিমিত্ত গভর্মেণ্টকে প্রতিবৎসর এক নির্দ্ধারিত দিনে কাবুল-গভর্মেণ্টের প্রেরিত লোকের হস্তে—কয়েক হাজার টাকা কর দিতে হয়। পেশোয়ার অঞ্চলকে পাঠানদের আড্ডা বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় না। আটক হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত দীর্ঘ-কেশ-সগুম্ফদীর্ঘদাড়িবিশিষ্ট, সবল, সুন্দর, দীর্ঘ, গৌর-কান্তি, পায়জামা-পরিহিত পাঠান ভিন্ন অন্য কোনও অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা পুস্ত নামক এক প্রকার ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পেশোয়ারে দিবা দ্বিপ্রহরে পর্য্যন্ত ডাকাইতি হইত। পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য খাইবারিগণ নিম্নে আসিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া চলিয়া যাইত। গভর্মেণ্ট এস্থানে শান্তি-সংস্থাপনার্থ বহু অর্থব্যয় করিয়াও সম্পূর্ণরূপে সমুদয় উপদ্রব নিবারণ করিতে পারেন

নাই। কাবুল-গভর্মেণ্টকে ইংরাজ গভর্মেণ্ট প্রতিমাসে তুইলক্ষ টাকা করিয়া কর দিতেছেন, পার্শ্ববর্ত্তী খাইবারী প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে 'নবাব', 'সুবাদার' ইত্যাদি উপাধি দিয়া মাস মাস পাঁচশত করিয়া টাকা দিতেছেন; তবু কি তাহারা চুপ করিয়া থাকে? পার্ব্বত্য তুর্দ্ধর্ষ ও অসভ্য পাঠান জাতিরা সে প্রকৃতিরই নহে। পেশোয়ারে এখন বিশেষ কোন অত্যাচার না থাকিলেও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়।

পেশোয়ার কাবুলের রাস্তা। ইহা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান। এই নগরে এক লক্ষের বেশী পাঠান বাস করে, নগরের যে স্থানেই গমন কর, পাঠান ব্যতীত অতি অল্পই অন্য জাতীয় নরনারী তোমার দৃষ্টি-গোচর হইবে। পেশোয়ার সত্য সত্যই ম্লেচ্ছের নগর—মস্‌জিদে-মস্‌জিদে, দর্‌গায়-দর্‌গায়, মক্‌বরায়-মক্‌বরায় এবং গোরস্থানে ইহা সুশোভিত। এমন রাস্তা নাই যেখানে গো-হত্যা না হয় এবং গোমাংসের কোনও দোকান না আছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ইহা একেবারেই ম্লেচ্ছ দেশ। কোনও হিন্দু অধিবাসীর কোনও উৎসবাদি করিতে হইলে কিংবা মৃতব্যক্তির সৎকার করিতে হইলে হিন্দুগণ সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতভূমিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

পেশোয়ার নগর তুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগের নাম সহর (City) অপর ভাগের নাম ছাউনী (Cantonment)। ইংরেজ অধিবাসীরা কেহই সহরাংশে বাস করেন না, তাঁহারা ছাউনী বিভাগে বাস করেন। ইংরেজদিগের এখানে বড়ই উদ্বিগ্নচিত্তে বাস করিতে হয়; কারণ পাঠানগাজীরা ইংরেজের অত্যন্ত বিদ্বেষী। কোনরূপ সুযোগ পাইলেই ইহারা শ্বেতাঙ্গের বুকে ছুরি বসাইয়া দিতে পশ্চাৎপদ হয় না; এমন কি, ক্যাণ্টনমেণ্টের ভিতরে গিয়াও এই সকল উন্মত্ত গাজীরা সাহেবদিগকে নিহত করিয়া থাকে। প্রতিবৎসরই গাজীদের হাতে বহু শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়। রবিবার দিন ইংরেজকে হত্যা করিবার পক্ষে পাঠানদিগের বিশেষ সুযোগ ঘটে; কারণ সহরের মধ্যে পাঠানপল্লীর বেষ্টনীতে গির্জ্জাগৃহটি অবস্থিত। যখন দলে দলে নির্দ্দোষ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণীগণ উপাসনার জন্য ভজনালয়ে গমন করিতে থাকেন, সে সময়ে প্রতিহিংসালোলুপ

এই সকল পিশাচ-প্রকৃতির গাজীগণ সুযোগ বুঝিয়া কোনও হতভাগ্য সাহেবের হৃদয়ের শোণিতে অসি সুরঞ্জিত করে। রবিবার দিন ইংরেজেরাও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন; গির্জ্জার পথে উভয় পার্শ্বে বহু পুলীশ প্রহরী এবং ব্রিটিশসৈন্য শাণিত তরবারি হস্তে প্রহরায় নিযুক্ত থাকে।

পেশোয়ারের নগরভাগ হইতে ছাউনীর অংশ অধিক পরিষ্কৃত, সে স্থানে বহু সৈন্য বাস করে। তথায় মোমজামার কাপড়, সূতার কাজ, ছুরি, কাঁচি এবং বহু লৌহাস্ত্রও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে সুন্দর উদ্যান, রেস কোর্স (Race Course) রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা প্রভৃতি আছে। মিসন হাউসের মধ্যে একটী অতি সুন্দর লাইব্রেরী আছে।

মহারাজ রণজিৎসিংহের রাজত্বকালে খাইবার অঞ্চল উৎকৃষ্টরূপে শাসিত ছিল। হরিসিংহ বা হর্‌সিং নামক রণজিৎসিংহের সেনাপতি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহসী শিখসৈন্য দ্বারা পেশোয়ারীদিগকে এরূপভাবে দমন করিয়াছিলেন যে অদ্যাপি পেশোয়ারিগণ তাঁহার নামে শিহরিয়া উঠে। হিন্দু-নরনারী ও শিখদিগের প্রতি পাঠানেরা যেরূপ উপদ্রব করিত, হরিসিংহ তদ্রূপ দণ্ড দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার কঠিন-শাসনে এই দুৰ্দ্ধর্ষ পাঠানও মেষ-শাবকের মত নিরীহ হইয়া উঠিয়াছিল। ২৭ বৎসরের যুবক সেনাপতি হরিসিংহের এইরূপ অসাধারণ বীরত্ব ও কঠোর-শাসনের নিমিত্তই রণজিৎ-সিংহের শাসনসময়ে পাঠানগণ কোনও রূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই। হরিসিংহকে ভীষণ নৃশংসতার সহিত ইহাদিগকে দমন করিতে হয়। কথিত আছে যে, তাঁহার কঠিন আদেশে খাইবারিগণ গবাদি পশুর ন্যায় (জলাশয় হইতে) মুখ ডুবাইয়া জলপান করিত এবং শয়নকালে প্রথমতঃ বক্ষভাগ শয্যায় স্থাপন করতঃ (উবুড় হইয়া) শয়ন করিত, তরবারের মুষ্টি কাহারও রাখিবার অনুমতি ছিল না—কেহ রাখিতও না। খাইবারিগণ এখনও যেন হরিসিংহ জীবিত আছেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রথা সকল পরিত্যাগ করে নাই। পেশোয়ারের মধ্যস্থলে একটী স্থান আছে, তাহার নাম "হরিসিংহের মাতম্"—এস্থানে বীরেন্দ্র হরিসিংহের তরবারির আঘাতে সহস্র সহস্র পাঠান নিহত হইয়াছিল, অদ্যাপি পাঠানেরা এই মাতম্ দেখিলে দূর হইতেই ভয়ে ভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করে। শ্রীযুক্ত

হরিসিংহ যেরূপ ভাবে পাঠানদিগকে দণ্ডপ্রদান করিতেন, আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এস্থানে তাহার একটী লিপিবদ্ধ করিলাম। দলপতিদিগকে ধৃত করিয়া একত্র উপবেশন করাইয়া তাহাদের মধ্যস্থানে একটা বৃহদাকার মৃণ্ময়পাত্রে তপ্ত অঙ্গার রাখা হইত এবং সেই অঙ্গারপূর্ণ হাঁড়িতে শুষ্ক লঙ্কা-মরিচ নিক্ষিপ্ত হইত। পাঠানেরা সেই ধূমে কাসিতে কাসিতে প্রাণত্যাগ করিত। বড় বড় লম্বমান দাড়িযুক্ত পাঠানদিগের পরস্পরের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া তাহাদের মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইত। কাহাকেও বা উন্মত্ত সারমেয় বা শৃগালের দ্বারা দংশন করান হইত। কাহাকেও ঊর্দ্ধপদ এবং অধোশির করিয়া বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া শাণিত ছুরিক-দ্বারা তাহার গায়ের চর্ম্ম খুলিয়া ফেলা হইত।—এইরূপ ব্যবহার নৃশংসজনোচিত কি না, তাহার বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু নিরপরাধ শিখ ও হিন্দু পুরুষ এবং সতী স্ত্রীলোকদিগের উপরে পাঠানেরা যে সয়তানী ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা যে কঠোর দণ্ডের উপযুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানকার বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমুদয়ই পাওয়া যায়। মাংস এখানে খুব সস্তা। এস্থানের তণ্ডুল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, আমরা ১৫৲ পনের টাকা মণের একমণ তণ্ডুল ক্রয় করিয়া দেশে পাঠাইয়াছিলাম। তণ্ডুলের মণ ২০৲ কুড়ি টাকা পর্য্যন্তও এখানে আছে। আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌ ইত্যাদি ফল এখানে অত্যন্ত সস্তা। আমরা যেরূপ আঙ্গুরের বাক্স এবং কিস্‌মিস্‌ আমাদের দেশে দশ আনা বারো আনায় ক্রয় করিয়া থাকি, পেশোয়ারে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিষের মূল্য দুই আনা তিন আনার অধিক নহে।

পেশোয়ারে পলিটিকেল এজেণ্ট, কমিশনার প্রভৃতি কয়েকজন বিচারক আছেন। ফৌজদারি বিচার-সম্বন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫ আইন ব্যতীতও "ফ্রণ্টিয়ার ল" নামে আর একখানা আইন আছে। হননকারীর অনুকূলে যাহারা সহায়তা করে, তাহাদের প্রতিও গুরুতর দণ্ড বিধান হয়। পেশোয়ারে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব অল্প। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন সেখানে মাত্র তিন চারি জন বাঙ্গালী ছিলেন। আমরা এখানকার বাঙ্গালীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। কমি-

সার্জ্জিয়ন্টের বড় বাবু বিশেষ সদাশয় লোক, একবার তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়াদি হইলে, তাঁহাকে ভোলা যায় না। তিনি আমাদিগকে একদিবস তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা উত্তমরূপে সম্পাদিত করাইয়াছিলেন। পেশোয়ারের এই কালীমন্দিরটি অনেকদিনের প্রাচীন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে মুসলমানেরা এপর্য্যন্ত এই দেবীমন্দিরের প্রতি কোনওরূপ অত্যাচার করে নাই। পূর্ব্বে নাকি এখানে 'বঙ্গসাহিত্য সভা' ও একটী 'বাঙ্গালা পাঠাগার' ছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় এখন আর তাহা নাই। এই নগরে বড় ঘন ঘন ভূমিকম্প হইয়া থাকে,—সময় সময় মাসে পাঁচ সাতবার করিয়াও ভূমিকম্প হইতে দেখা যায়, বোধ হয় এইনিমিত্তই এখানকার অধিকাংশ গৃহ কাষ্ঠনির্ম্মিত। পেশোয়ার ব্যবসায়ের একটী কেন্দ্রস্থল। পারস্য পেশা শব্দ (ব্যবসায়) হইতে পেশোয়ারের নামোৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দী উচ্চারণ—'পেশাবর'।

রাত্রি দশঘটিকার পরে কাহারও আলোকব্যতীত পথে চলিবার অধিকার নাই। হাতে কোনওরূপ আলোক না থাকিলে কিংবা তিনবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিলে, অমনি প্রহরীদের হস্তে দণ্ডিত হইতে হয়, এমন কি গুলি পর্য্যন্ত করে। খাইবারিগণ কাষ্ঠাদি বিক্রয়োপলক্ষে পেশোয়ারে আসিয়া থাকে। আমরা একদিবস নগরভ্রমণকালে অনেকগুলি খাইবারীকে একত্র দেখিয়া কিছু শঙ্কিত হইয়াছিলাম। ইহারা নরাকার পশুবিশেষ—গারো, কুকী প্রভৃতি অসভ্যজাতি অপেক্ষাও ইহাদের ব্যবহার জঘন্য। পেশোয়ার নগরের একক্রোশ পশ্চিমদিকে এখানকার সুবিখ্যাত গোরাবাজার (Military Cantonment) অবস্থিত। ১৮৪৮।৯ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়। রেসিডেণ্ট সাহেব দুরানী সর্দ্দার আলীমর্দ্দান খাঁর উদ্যানবাটীতেই বাস করিয়া থাকেন—দপ্তরখানা, রাজকোষ প্রভৃতি এখানেই স্থাপিত—এই সৈনিকনিবাস তিনটী শ্রেণীতে সুসজ্জিত—সমগ্র ছাউনীর বেড় প্রায় ৮।৯ মাইল পরিমাণ হইবে—নৌসহর, জামরুড এবং চেরাটের দুর্গ এই প্রধান দুর্গের অধীন।

আমরা পূর্ব্বেই সংক্ষিপ্তভাবে এ নগরের ব্যবসাবাণিজ্যের খ্যাতি

বিবৃত করিয়াছি। ইহা এসিয়া মহাদেশের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র স্বরূপ। এস্থান হইতে যেরূপ

ব্যবসাবাণিজ্য।

শাল, চিনি, ঘৃত, লবণ, গম, তৈল, শস্যাদি, ছুরি, কাঁচি এবং বিলাতী বস্ত্র প্রভৃতি এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আবার কাবুল, বোখারা প্রভৃতি নানাদেশজাত অশ্ব, অশ্বতর, রেশম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, পশম, ওষধি, পুস্তিন্, চোগা, স্বর্ণমুদ্রা, সোনা-রূপার সূতা ও ফিতা ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য পেশোয়ার দিয়া কাশ্মীর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানী হইয়া থাকে। পেশোয়ারের জলবায়ু বিচিত্র রকমের, এখানে শীতের সময় এরূপ ভয়ঙ্কর শৈত্য অনুভূত হয় যে ইংলণ্ড, সুইজারলাণ্ড

জলবায়ু।

প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের শীতের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। এদিকে যেমন শীতের প্রকোপ অধিক, গ্রীষ্মের সময় তেমনি নিদাঘের খররৌদ্রের ভয়ঙ্কর উষ্মতাও উপলব্ধি হয়। তখন 'লু'র অত্যুষ্ণ প্রবাহে---প্রস্তরের উষ্ণতায়—পর্ব্বতের উষ্ণতায় প্রাণ ছট্‌ফট্ করে। বলা বাহুল্য যে, নবাগত অনভ্যস্ত পর্য্যটকের পক্ষে তাহা সহ্য করা অসম্ভব। মোটের উপরে পেশোয়ারের জল-বায়ু স্বাস্থ্য-প্রদ।

আমাদিগকে জামরূড হইতেই অন্যদিকে ভ্রমণের গতি ফিরাইতে হইয়াছিল। বড় ইচ্ছা ছিল কাবুল যাই, কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে যেরূপ আয়োজনের প্রয়োজন, তাহার কিছুই করিতে পারি নাই এবং হঠাৎ অপরিণামদর্শীর মত সে পথে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম না। জামরূড হইতেই 'খাইবার পাস' দেখিতে পাওয়া যায়। পাশের উভয় পার্শ্বে ছয়শত হইতে প্রায় সহস্র ফিট উচ্চ পাহাড়। ঐ পাহাড়ের পার্শ্বে আবার তদপেক্ষাও উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, ইহার মধ্য দিয়া যে সংকীর্ণ বক্রপথ প্রায় দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাই 'পাস' নামে অভিহিত। ইহা অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। পদে পদে এই পথে ডাকাইতি চুরি ও রাহাজানির ভয়। জামরূডের প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী কদম নামক গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী লেণ্ডুয়া নদীর জল নির্ম্মল ও সুমিষ্ট, এই জলই পেশোয়ারে আনীত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সরকারী ছাড় না লইয়া কেহই পাস দেখিতে

যাইতে পারেন না। জামরুড হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী আলি-মসজিদ পর্য্যন্ত গাড়ীতে যাওয়া যায়, তৎপরে লুণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত ঘোড়ায় যাইতে হয়। প্রতি মঙ্গলবার এবং শুক্রবার বণিকদিগের নিমিত্ত পাসের দরোজা খুলিয়া দেওয়া হয়। সে সময়ে শান্তিরক্ষার্থ ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের আফ্রিদী সৈন্যগণ নিষ্কাসিত কৃপাণহস্তে পাসের দ্বার রক্ষা করিয়া থাকে। মোট কথা খাইবারপাস দেখিতেও যেমন ভীষণ ইহার পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরাও তেমনি ভয়ঙ্কর। জামরুড হইতে যখন পেশোয়ার ফিরিয়া আসি, তখন আমার ভ্রমণাশক্ত চিত্ত বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল ;—সে যেন বলিতেছিল "অই যে তোমার নয়ন সমক্ষে তুঙ্গ গিরিশ্রেণীপরিশোভিত যবনিকা পতিত থাকিয়া দৃষ্টিপথরোধ করিতেছে, চল একবার দেখিয়া আসি উহার অভ্যন্তরে কোন্ অভিনব প্রদেশের পাত্রপাত্রিগণ অভিনয় করিতেছে! চল, যবনিকা ভেদ করি—প্রস্তুত হও।" বাস্তবিক সে সময়ে আমার কৌতূহল এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অতিকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া ফিরিতে হইয়াছিল। ভ্রমণের একটা আকর্ষণ শক্তি আছে—সহসা তাহার আকর্ষণ হইতে মুক্তি পাওয়া—তেমন ঘর মুখো লোক ছাড়া অপরের পক্ষে অসম্ভব। এ আকর্ষণী শক্তির হাত হইতে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদিগকে আমি হতভাগ্য বলি, কারণ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেবল ব্যসনাসক্তচিত্তেই দিন কাটাইলাম, —যদি জগৎপিতা জগদীশ্বরের বিভিন্ন রূপ-বৈচিত্র্য অনুভব না করিলাম এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী জনসাধারণের আচারপদ্ধতি, রীতি-নীতি না দেখিলাম, প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন না করিলাম, তবে জীবনধারণ করিয়া কি লাভ? ভ্রমণের ভিতর যে কি অপূর্ব্ব শান্তি-সুধা নিহিত আছে, তাহা যিনি কখনও পর্য্যটনে বাহির হন নাই, তাঁহাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পেশোয়ার ভ্রমণ শেষ হইলে, আমরা পুনরায় আমাদের গতি ফিরাইয়া মুলতানের দিকে ফিরিলাম। জামরুড হইতে মুলতান আসিতে যে সকল নদ নদী সেতু এবং প্রসিদ্ধ স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থ নিম্নে বিবৃত করা গেল।

নদনদী—সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী।

সেতু—উল্লিখিত কয়েকটি নদীর উপরেই সুদৃঢ় সেতু। তন্মধ্যে আটকের নিকট সিন্ধুনদের সেতু নিরবচ্ছিন্ন লৌহময়। চন্দ্রভাগার সেতুও অত্যন্ত বৃহৎ।

প্রসিদ্ধ স্থান—পেশোয়ার, নোসেরা, আটক, কেম্বেলপুর, হুসেন আবদুল, রাবলপিণ্ডি বা পিণ্ডি, ঝিলম, লালমুসা, গুজরাট, উজিরাবাদ, লাহোর, মিঞামীর, রেউণ্ড, মণ্টগমারী ইত্যাদি। লালমুসা হইতেই মুলতান পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে, এই রেলওয়ে লাইনের নাম "সিণ্ড-সাগর রেলওয়ে।" এই রেলপথে গমন করিলে হারাণপুর, পিণ্ডীদাদন্ খাঁ, বখার, দেরাদিন, পালা, মহম্মদকোট, মজঃফরগড়, সেরসা, দেরাইস্মাইল খাঁ প্রভৃতি বহুস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সেরসার নিকট সিন্ধুর আর একটি আশ্চর্য্য সেতু আছে। উজিরাবাদ হইতে শিয়ালকোট দিয়া কাশ্মীরের অন্যরাজধানী জম্মু পর্য্যন্ত এক শাখা রেলপথ গিয়াছে।

লাহোর হইতে মূলতান ও করাচি অভিমুখে যে পথ গিয়াছে, তাহার এক শাখা ফিরোজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আবার তথা হইতে রেল পরম্পরায় দিল্লী পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, ইহা বড়ই সুবিধাজনক রাস্তা। লাহোর হইতে মুলতান ২০৭ মাইল দূরে অবস্থিত। রেল বর্ত্মটি ইরাবতীর বিশাল সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া সরলভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। এইরূপ সরলরৈখিক সুবিস্তৃত রেলপথ ভারতের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ স্থল। মুলতান যাইবার পথ বড়ই বৈচিত্র্যময়, সে বিচিত্রতা বাংলা দেশে আমরা কোন দিন অনুভব করিতে পারি নাই; রেলপথের উভয় পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী প্রত্যেক বিষয়েই আমাদের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল—কোথাও দিগন্ত-বিস্তৃত বৃক্ষবল্লরীহীন তরঙ্গায়িত বালুকাময় ভূমি, উজ্জ্বল দিবালোকে ঝকমক্ করিয়া জ্বলিতেছে, কোথাও বা হরিদ্বর্ণ তৃণাবৃত বসুধাসুন্দরী শোভমানা—আবার কিছু দূরেই সে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। উভয় পার্শ্বে খর্জ্জুর-তরু-সমাকীর্ণ শ্যামল শস্পাবৃত প্রান্তরে গো, মেষ, মহিষাদি চরিতেছে। এরূপ দৃশ্যবৈচিত্র্যে হৃদয়ে যে অসীম আনন্দানুভব করিয়া-ছিলাম, তাহা কি ভাষায় ফুটিতে পারে? একটী সামান্য ফুলের অনবদ্য সৌরভ-সুষমার ভিতরে বিশ্বপতি জগদীশ্বরের যে মহিমা বিকাশ পাইতেছে—তোমার

আমার কি সাধ্য আছে যে, তাহা পরিব্যক্ত করিতে পারি? অই যে ঊষার শ্লথ-চরণ স্পর্শে পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে,—এমন চিত্রকর কে আছে যে, তাহা তুলিকাপাতে প্রতিফলিত করিতে পারে? অই যে সান্ধ্যগগনের ম্লান আভায় এখনও অস্তগামী সূর্য্যের বিদায়-চুম্বনের পাণ্ডুর চিহ্ন জাগিয়া রহিয়াছে,—কে আছ এমন কবি, যে ভাষার ঝঙ্কারে মানবের মানসপথে সে মহাসৌন্দর্য্যের একটা আংশিক বিকাশও করিয়া দিতে পার? সত্য সত্যই মানুষের এমন সাধ্য নাই যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক কণা সৌন্দর্য্যও নিজে বুঝিয়া অপরকে বুঝায়।

মূলতান।

আমরা অপরাহ্ণ ৪-২০ মিনিটের সময় মূলতান ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। এস্থান আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, সেজন্য এখানকার কমিসরিয়েট বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর কুণ্ডু মহাশয়ের নামে একখানা অনুরোধপত্র আনিয়াছিলাম। আমরা তাঁহার গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা কালীবাড়ীতে থাকাই উত্তম বিবেচনা করিয়া শকটারোহণে কালীবাড়ীতে উপনীত হইলাম। ইতিমধ্যে কুণ্ডু মহাশয় জানি না কিরূপে সংবাদ পাইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার বাসায় যাওয়ার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে আরও কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয় আসিয়া নিজ নিজ বাসায় লইয়া যাইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমরা তাঁহাদের এইরূপ স্বজাতিপ্রীতি ও যত্ন চেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পৃথকভাবে অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁহারা লাইব্রেরী গৃহটি খুলিয়া, থাকিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মূলতান দেখিবার জন্য আমাদের এতই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল যে অনশন ও রাত্রি জাগরণজনিত ক্লেশ পর্য্যন্তও আমরা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। বাসস্থানে তল্পী-তল্পা রাখিয়াই নগর দেখিতে বাহির হইলাম। মূলতান পঞ্জাব প্রদেশের একটী প্রধান নগর এবং উক্ত জেলার বিচার-সদর। ইহা অত্যন্ত প্রাচীন নগর। কথিত আছে যে দৈত্যকুলোদ্ভূত হিরণ্যকশিপুর পিতা কশ্যপ এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন ইহার নাম ছিল কশ্যপপুর,—প্রাচীন কশ্যপপুরের কোনও নিদর্শন এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাবীর আলেকজেণ্ডারের আক্রমণ হইতেই এই নগরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানিতে পারা যায়। তিনি মালবজাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এস্থান অধিকার করিয়াছিলেন পাঠান, মোগল ও শিখ প্রভৃতি নানা জাতির অধীনে বহুকাল থাকিয়া ১৮৪৯

প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরেজাধিকারে আসিয়াছে। ইংরেজাধিকৃত হইবার পর হইতেই এ নগরের বহু পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা প্রথমে কেণ্টনমেণ্ট দেখিতে যাই। উহা নগরাংশ হইতে প্রায় ৩॥ মাইল দূরে অবস্থিত। মূলতান সহরও নগর এবং ছাউনী এই দুই ভাগে বিভক্ত। নগরাংশ অপেক্ষা ছাউনীভাগ পরিষ্কৃত; তথায়ই অধিকাংশ বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণ বাস করিয়া থাকেন। নগরের একটী বাঙ্গালী ভদ্র লোক আদালতের প্রধান উকীল।

মূলতান নগরটি চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তা সঙ্গমের দেড়ক্রোশ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এ স্থানে একটী দুর্গ ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের তিন দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত—কেবলমাত্র দক্ষিণাংশে ইরাবতী নদীর প্রাচীন খাত নগর ও দুর্গের অভ্যন্তর দিয়া ক্ষীণধারায় মন্থর গমনে প্রবাহিত হইতেছে। মূলতানের আশে পাশে অনেক দেব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। আমরা প্রহ্লাদপুরীটি দেখিবার জন্য উৎসুকমনে তথায় উপনীত হইলাম। একটী সুবিশাল মন্দির মধ্যে হরিভক্ত প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপু এবং নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তির ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা থাকিলেই যে সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন—প্রহ্লাদের জীবনে তাহা পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়। যেখানে হিন্দুর দেব-মন্দির, প্রায় সেখানেই মুসলমানের কোনও মস্‌জিদ কিম্বা সমাধিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কাশী-বিশ্বেশ্বরের বাড়ীর, অযোধ্যায় রামের জন্মভূমির এবং অন্যান্য দেবস্থানের মস্‌জিদই তাহার উদাহরণ স্থল। প্রহ্লাদপুরীর মন্দিরসন্নিকটেও একটী মুসলমানের সমাধি আছে, উহাকে বাতুল হক সাহেব ফকীরের সমাধি কহে। একদা প্রহ্লাদ-পুরীর মন্দির অপেক্ষা তন্নিকটে মুসলমানগণ একটী উচ্চ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া হিন্দু পাণ্ডাগণের মহাক্রোধে পতিত হইয়াছিল। এমন কি তাহা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল দাঙ্গাও ঘটে। রাজকীয় বিচারে মুসলমানগণ পরাজিত হওয়াতে—উক্ত মস্‌জিদ আর নির্ম্মিত হইতে পারে নাই।

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত প্রহ্লাদপুরী দর্শন করতঃ যোগমায়ার মন্দির দর্শনার্থ তথায় যাই। সে দিন একাদশী ছিল, হিন্দুনরনারীগণ দলে দলে মন্দিরে উপনীত হইতে লাগিলেন। নানাজাতীয় বিধর্ম্মীর তীব্র অত্যাচারের মধ্য দিয়া ও হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ অক্ষয় স্থিতির কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। নানাপ্রকার অন্ধকারের ভীষণাবস্থার মধ্য দিয়া এখনও হিন্দুধর্ম্ম স্বীয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় চিরদীপ্তিশালী, ইহাকি হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-গরিমা জ্ঞাপক নহে? মন্দিরটি এবং তন্মধ্যস্থ প্রকোষ্ঠটি দেখিতে অতীব মনোহর। দিবা রাত্র দীপ শিখা এখানে প্রজ্জ্বলিত থাকে—এখানে সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি আরও কতিপয় হিন্দুতীর্থস্থল বিদ্যমান আছে।

আমরা এখানকার বাজার দেখিয়া পরিতোষলাভ করিয়াছিলাম—রাস্তাগুলি বিশেষ প্রশস্ত না হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিবিধ রেসমী ও পশমী বসনের জাঁকজমক পূর্ণ দোকানগুলি দর্শকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ফল মূলের দোকানের ত কোন অভাবই নাই। এখানকার স্ফটিকবৎ শুভ্র মিশ্রী এবং বিলাতী পোর্টমেণ্টোর মত টিনের বড় বাক্স গুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমরা শিশুকাল হইতেই মূলতানি হিঙ্গের কথা শুনিয়া আসিতেছি, তজ্জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া নানাস্থানে হিঙ্গের কারখানা দেখিবার উদ্দেশে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নগরের উপকণ্ঠে কিম্বা নগরমধ্যে কোন স্থানেই কিছু দেখিতে পাইলাম না। প্রকৃত পক্ষে মূলতানে হিঙ্গ প্রস্তুত হয় না। এখান হইতে বহুদূরে সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্থানের কোন কোন অংশে হিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া মুলতানে আসিত এবং এস্থান হইতে নানাস্থানে রপ্তানী হইত বলিয়া মুলতানি হিঙ্গ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এখানে হিঙ্গের বিস্তৃত কারবার ছিল, কিন্তু এখন সে সব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বন্যার সময় মুলতান নগরে জল প্রবেশ করে বলিয়া এখানকার স্থানে স্থানে বাঁধ দৃষ্ট হইল। গ্রীষ্মের সময় এখানে দারুণ উত্তাপ বোধ হয় বলিয়া এখানকার অনেক ধনী ব্যক্তি গোলাপের পাপ্ড়ীর উপর সূক্ষ্ম চাদর বিস্তৃত করতঃ আরামে শয়ন করিয়া থাকেন।

নানাকথা।

মূলতান হইতে ৬৪ মাইল দূরে বহাবলপুরের নবাবের বাড়ী। তাঁহার প্রধান তহশীল কাছারী মূলতানেই স্থাপিত। নবাবের কাছারী ও হাসপাতাল দেখিবার যোগ্য। কমিশনার আফিস, পোষ্টাফিস, টেলীগ্রাফ আফিস একটী বৃহৎ ও সুন্দর উদ্যান এবং তন্মধ্যস্থ লাইব্রেরি গৃহটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম। এখানকার প্রধান অট্টালিকা সমূহের মধ্যে আরব দেশবাসী মুসলমান সাধু বহাউদ্দীন ও রুকন্‌উল্‌ আলমের সমাধি মন্দির—বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য এবং পর্য্যটক মাত্রেরই অবশ্য দর্শনীয়—১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিকটবর্ত্তী দুর্গের বারুদখানায় আগুণ লাগায় ঐ সমাধি মন্দিরের নিকটবর্ত্তী আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত প্রহ্লাদপুরীর প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের কতকাংশ উড়িয়া গিয়াছে। দুর্গের মধ্যস্থলে সূর্য্যদেবের সুবৃহৎ মন্দিরটি অবস্থিত। হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষী মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেব উহা ধ্বংস করিয়া তদুপরি মস্‌জিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। যখন শিখদের প্রাধান্য হয়, তখন সেই জুমা মস্‌জিদ বারুদখানা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সে সময়ে আগুন লাগায় উহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মূলরাজ যখন বিদ্রোহী হ'ন সে সময়ে ভান্স এগনিউ ও লেফ্‌টনাণ্ট এণ্ডার্সন নামে দুইজন ইংরেজ সেনানী নিহত হওয়ায় তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুর্গ মধ্যে ৭০ ফিট উচ্চ একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহরের পূর্ব্বভাগে হিন্দু-শাসন কর্ত্তাগণের সময়ের নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ আমখাস্‌ (দরবার গৃহ) এক্ষণে তহশীল কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

জলবায়ু।

মূলতান উষ্ণপ্রধান স্থান। দ্বিপ্রহরের সময় কাহার সাধ্য নগরের বাহির হয় ? এ অঞ্চলে একটী প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে ধূলি, ভিক্ষুক ও কবর এই তিনটী মূলতানের বিশেষত্ব, প্রকৃত পক্ষেও তাহাই দেখিলাম, নগরের এমন অংশ অতি বিরল যে স্থানে কোন না কোন কবর না আছে। রাস্তায় ধূলি এত বেশী যে পদে পদে ধূলি-ধূসরিত হইতে হয়। লাহোর ও করাচীবন্দরের সহিত ইহা রেলওয়ে লাইন দ্বারা সংযোজিত থাকায় দিন দিনই এই নগরীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কান্দাহারবাসী বণিকগণ এখানে আগমন করিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া থাকে। মূলতানে যে কয়েকটি বাঙ্গালী বাবু আছেন, তাঁহারা সকলেই

একান্ত ভদ্রব্যক্তি, প্রায় প্রতি দিবসই আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সঙ্গীত-প্রিয় এবং কেহ কেহ সঙ্গীত-কলা-বিশারদও ছিলেন, আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গীত শ্রবণের জন্য গিয়া যারপর নাই প্রীত হইয়া ফিরিয়া আসিতাম। ইঁহাদের সহিত আমাদের এইরূপ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল যে মূলতান পরিত্যাগ সময়ে অশ্রুজল মোচন না করিয়া আসিতে পারি নাই। সেই সুদূর দেশের বিদায় কালীন শোক-দৃশ্যটি আজ কতকাল পরে এখনও মনে পড়িয়া চিত্ত ব্যথিত করিতেছে, এখন তাঁহারাই বা কোথায় আর আমরাই বা কোথায়! কিন্তু তবু যেন মানসচক্ষে মূলতান ষ্টেসনের সেই জনতার মধ্যে স্নেহ পরিপূর্ণ মধুর মুখ কয়খানি বাঙ্গালী সুলভ হৃদয়ভরা প্রীতি রাশির সহিত—বিদায়ের অশ্রুভরা সম্ভাষণ দেখিতে পাইতেছি, ইহাকেই না মায়ার বন্ধন বলে? যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল মুগ্ধের মত জানালার ভিতর দিয়া বন্ধুদের পানে চাহিয়া রহিলাম—তাঁহারাও যতদূর পর্য্যন্ত গাড়ী দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। নৈরাশ্য কাতর ব্যথিত নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রুবারি ঝরিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, চারিদিকে ম্লান অন্ধকার রাশি পুঞ্জীভূত হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল—আকাশের তারা সুন্দরীরা নয়ন তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিতেছিলেন। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকট কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মূলতান হইতে ৬৪ মাইল দূরবর্ত্তী বহাবলপুর নামক স্থানে উপনীত হইল। বহাবলপুরে একজন নবাব আছেন, ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। ইনি বাঙ্গালীর প্রতি বড় প্রীত নন। বিশেষ এখানে থাকার নানা অসুবিধার কথা শুনিয়া আমরা আর এখানে অবতরণ না করিয়া, বরাবর শিকারপুর হইয়া বেলুচিস্থান ট্রেন টারমিনাস কোয়েটা নামক কেণ্টনমেণ্ট দর্শনাভিলাষে রূক জংশন নামক ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। রূক জংশন হইতে এক রাস্তা করাচীতে এবং অপরটী কোয়েটাগিয়াছে; রূক জংশনে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এস্থানের দৃশ্যাবলী নয়নানন্দ দায়ক নহে। ষ্টেসনটী এক উচ্চ টিলার উপরে অবস্থিত। সমতল ক্ষেত্রে যে স্থানে আমরা বাসা করিয়াছিলাম (মোসাফিরখানা)

সেই স্থান হইতে রেল যাতায়াত দেখা বড়ই কৌতুকজনক। শুনিলাম রুকজংশন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের বহু অর্থব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রমের ফল।

রুকজংশনে আমার সহিস, পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যকে রাখিয়া অপর একটী আত্মীয় ও সহচর সহকারে কোয়েটাভিমুখে রাত্রি ১২ কি ১ টার সময় রওনা হইলাম। রাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের ট্রেনের অগ্রে এবং পশ্চাতে দুইখানা এঞ্জিন ছিল। ট্রেনে একজন Engineer এবং কতকগুলি কুলি ও Enginering অস্ত্রশস্ত্র থাকার নিয়ম। পার্ব্বত্য দস্যু কর্ত্তৃক ট্রেন আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য প্রত্যেক ট্রেনে এ ভ্রমণ করার নিয়ম। প্রাতে দেখিতে পাইলাম আমরা পাহাড়ের বাম পার্শ্ব দিয়া যাইতেছি। আমাদের বাম ভাগেই সেটা নদী। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় নদী খরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ট্রেনের অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকের নিকট শুনিলাম, বৃষ্টি না হইলে নদীটি শুষ্ক থাকে। আমরা নদীর অপর পার্শ্বস্থ পাহাড়েরপার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। এখান হইতে নদীর অপর পার্শ্বস্থ পাহাড়ের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম। গাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে দাঁড়াইল এবং সৈনিকগণও কুলীগুলা মিলিত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। আমরাও নামিয়া জনৈক সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এবং একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলাম যে দু'তিন খানা বড় পাথর পাহাড় হইতে বৃষ্টির বেগে ধসিয়া পড়িয়া রাস্তা বন্ধ করিয়াছে। ঐ সৈনিকগণ এবং কুলীগণও প্রথম শ্রেণীর আরোহী কয়েকটী সাহেবও গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কুলীদের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প সময় মধ্যে ঐ কয়খানা পাথর স্থানান্তরিত করিয়া লাইন পরিষ্কার (clear) করিয়া দিলেন। যে স্থলে পাথর ভাঙ্গা হইল, তাহার পরেই প্রায় ৫০।৬০ হাত লম্বা কাঠের সেতু, তৎপরেই টনেল। আমাদের ট্রেন ধীরে ধীরে পুল পার হইয়া টনেলে প্রবেশ করিয়া পুনরায় আর একটী পুল পার হইল আর একটী টনেলের মধ্যে হইতে এঞ্জিন বাহির হইয়াই আবার দণ্ডায়মান হইল। আমরা আবার কি ঘটিল, তাহা দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম এবং দেখিলাম পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া যে line গিয়াছে তাহার অপর পার্শ্বের অর্থাৎ নদীর

দিকের লাইনটার নীচের মাটী ধসিয়া যাওয়ায় গাড়ী আবার দাঁড়াইয়াছে। পুনঃ পুনঃ whistle দেওয়ায় ষ্টেশন হইতে ট্রলীতে কতকগুলা কুলী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাদের গাড়ীর পথে ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ মত সত্বর কতকগুলি পাথরের কুচি সেই লাইনের নীচে ভরিয়া দিয়া গেল তৎপরে ষ্টেশন হইতে একখানা ছোট এঞ্জিন আসিয়া ঐ ভগ্ন স্থানে লাইনের উপর দিয়া বারকতক যাতায়াত করিয়া পাথরের কুচিগুলি মাটিতে বসিয়া গেলে, আমাদের এঞ্জিনখানা আমাদের গাড়ী সহ ধীরে ধীরে ঐ স্থান পার হইয়া গেল। বেলা প্রায় ৩ টার সময় হইতেই অত্যন্ত শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল, সেদিন Christmas Eveএর পূর্ব্ব দিন। আমরা ক্রমে যতই উর্দ্ধ দিকে যাইতে আরম্ভ করিলাম শীত ততই অধিক বোধ হইতে আরম্ভ করিল। বেলা চারিটার সময় হইতেই তুষার (Snow) পড়িতে আরম্ভ হইল। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে যেমন মাঘমাসে কোন কোন দিকে নীহার পাত্র হইতে থাকে, তদ্রূপ কুয়াশা ঘন হইয়া নীহার-পাত হইলেই Snow পড়া বলে। আমরা একটা Station এ উপস্থিত হইয়া দেখি যে প্ল্যাটফরমের উপরে জিনিষ ঢাকা ত্রিপলের উপরিভাগে কতকগুলি তুষার পড়িয়া বরফ হইয়া আছে। আমরা যাইয়া সহাস্য কৌতুকে কৌতূহল বশতঃ উহার কতকগুলা একটা ঘটীর মধ্যে ভরিয়া আনিয়া আমাদের হুকায় জলের পরিবর্ত্তে উহা ভরিয়া ধুম্রপান করিলাম। গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করায় এবং Timetable দৃষ্টে কোয়েটা পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইবে বুঝিয়া, এতক্ষণ এস্থানে গাড়ী গৌণের কারণ জানিবার জন্য Station Master ও একটী ইউরোপীয়ানকে জিজ্ঞাস করিলাম। তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন "Look, Soldiers coming, Train must detain here for them, see what happened in their fate" আমরাও দেখিলাম বহু দূরে প্রায় দশবার জন দেশীয় Soldier বন্দুক হস্তে আসিতেছে, খুব snow পড়িতেছিল বলিয়া স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না। আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম যে, ক্রমেই যেন লোকসংখ্যা কমিতেছে। কেন যে সংখ্যা কম দেখিতে ছিলাম তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না। প্রায় এক ঘন্টার পরে একজন

দেশীয় সৈনিক ষ্টেসনে আসিবামাত্র তাহাকে Station Master ২।৪টা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহার হাতে ধরিয়া (যেন তাহাকে সাহায্য করিয়া) আমাদের গাড়ীতেই উঠাইয়া দিবামাত্র Train ছাড়িয়া দিল। ঐ সৈন্যটী বেঞ্চের উপর যেন মৃতবৎ পড়িয়া গেল। তাহার হস্তস্থিত বন্দুকটি Station Master নিজেই গাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। সৈন্যটি অস্পষ্ট ভাবে তাহার অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার দিতে থাকায় আমরা বুঝিতে পারিলাম, সিপাহিটী লক্ষ্ণৌর নিকটস্থ লোক হইবে। আমি অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করায় সিপাহিটী বলিল "বাবু আমাকে বাঁচাও," ইহা বলিয়াই সে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্রমশঃই যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। তখন আমরা সকলেই চেষ্টা করিয়া তাহার পরিধেয় পোষাক ইত্যাদি খুলিয়া আমাদের সঙ্গের কম্বল প্রভৃতি শীতবস্ত্র দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া তাহার নিকট কাঙ্গারা ধরিলাম, কাঙ্গারা একটা বেতের ছাউনি বিশিষ্ট একটা মাটীর হাঁড়ি, তাহাতে আগুণ থাকে ঐ হাঁড়ীটা ইচ্ছা করিলে কোটের মধ্যে রাখিয়া বক্ষে অগ্নির উত্তাপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা পিণ্ডি হইতে আনিয়াছিলাম। আমার সঙ্গের ডাক্তার বাবু দুই আউন্স No. 1 Exshaw পান করাইয়া দিলেন, তামাক খাইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় আমরা তামাক সাজিয়া উহাকে পুনঃ পুনঃ পান করাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সিপাহিটা উঠিয়া বসিয়া তাহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল আমরা তাহার দেশীয় লোক বলিয়া সে Platformএ আমাদিগকে দেখিয়াই তাহার আনন্দ এবং মনে কেমন একটা অলৌকিক ভাব উদয় হওয়ায় তাহার শরীর আরও অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সিপাহিটা আমাদিগকে দেখিয়াই সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশে কথা বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাক্‌রোধ হওয়ায় বলিতে পারে নাই। সিপাহিটী বলিল, তাহারা সরকারী কার্য্যোপলক্ষে উচ্চ পাহাড়ে ছিল। Snow পড়িয়া অত্যন্ত শীত পড়ায় তাহাদের Captain নীচে নামিবার জন্য উপদেশ দিয়া বিদায় দেওয়ায় তাহারা সদলে নীচে আসিতেছিল। রাস্তা ভ্রম করিয়া বিপথে পড়ায় তাহাদের এই বিভ্রাট। তাহারা ৫০।৬০ জন ছিল কিন্তু অনেকেই শীতে চলিতে অশক্ত হইয়া পড়ায়, পড়িয়া গেল। তখন তাহারা দৌড়িয়া রাস্তা অতিবাহিত করিতে



কোয়েটা।

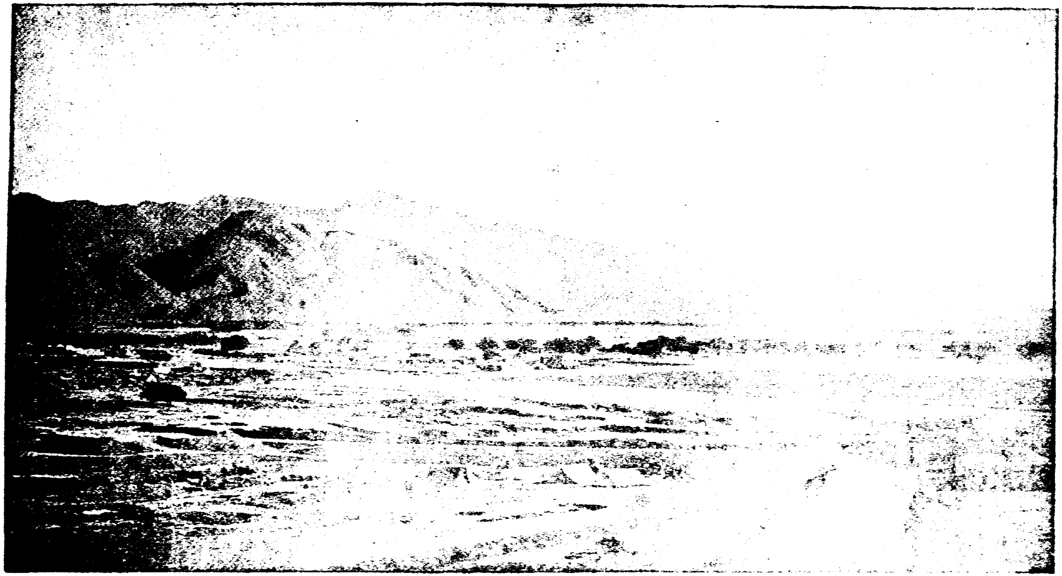
কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

লাগিল। প্রাতে গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহে ১৫।১৬ জন একত্র আসিতেছিল। ক্রমে Station নিকটবর্ত্তী হইলে কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া পথ-বিপথ না বাছিয়া ছুটিতে লাগিল। পরে এই লোকটা একা আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সঙ্গীদিগের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে বলিতে পারে না। আমি কোন্ সময় গাড়ীতে উঠিয়াছি, তাহাই মনে নাই। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে।" আমরা আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু খাদ্য ছিল, তাহাই সিপাহিটাকে খাইতে দিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমরা তাহার দেশীয় বলিয়া কত কথাই যে বলিল, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা সুদূর বঙ্গ প্রদেশের এক প্রান্তের অধিবাসী, আর লক্ষ্ণৌ তাহার বাড়ী, তবু সে আমাদিগকে একদেশবাসী অর্থাৎ এক ভারতবাসী বলিয়া কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল!

আমরা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, চারিদিকে পাহাড় শ্রেণী, উপত্যকা ও অধিত্যকার মধ্য দিয়া অগণিত স্রোতস্বিনীকুল কুলুকুলুরবে বহিয়া চলিয়াছে। আমরা কখনো ঊর্দ্ধে, কখনও নিম্নে, কখনো বা পর্ব্বতের পার্শ্বদিয়া, কখন নদীর উপরিস্থিত সেতুর উপর দিয়া, কখন বা টনেল (পর্ব্বতের সুরঙ্গ) দিয়া ভুজঙ্গের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে লাগিলাম। আমরা নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে উৎফুল্লমনে এবং বিপদাপদ শঙ্কায় শঙ্কিত চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে সূর্য্যদেব দিবসের কার্য্য সমাপনান্তে অস্তাচলশায়ী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন,—ম্লান-লোহিত জ্যোতি তরুশিরে লতা পল্লবে এবং দূরবর্ত্তী পর্ব্বত শেখরে নিপতিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতে লাগিল। আমাদের নয়ন-পথে বহু শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত পতিত হইতে লাগিল। হঠাৎ জব্বলপুরের নর্ম্মদার শ্বেত পাহাড় বলিয়াই ভ্রম হইয়াছিল। তুষারাবৃত এই পাহাড়গুলি দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল—যতই গাড়ী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই দেখিলাম যে পর্ব্বতের উপত্যকা, মাঠ, পথ সকলি বরফে শুভ্রাকৃতি ধারণ করিতেছে, দূর হইতে বিশাল সলিল-পূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। এক ইঞ্চি হইতে প্রায় এক ফুট পুরু বরফে ঢাকা রেলপথ দিয়া ট্রেণখানা চের চের শব্দে চলিতে লাগিল।

ঐ দিন (২৫শে ডিসেম্বর) খ্রীষ্টমাসডে (বড় দিন) ছিল। আরোহীদের মধ্যে কয়েকজন গোরা সৈনিক ছিল, তাহারা সুরাদেবীর সেবা করিয়া একেবারে মত্ত হইয়া উঠিল এবং পরবর্ত্তী কোন একটা ষ্টেসনে নামিয়া স্তূপাকার বরফের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি, ধরাধরি ও মারামারি করিয়া পাশবিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

আমরা হর্ষে ও বিস্ময়ে গাড়ীতে কাটাইয়া রাত্রি প্রায় দশঘটিকার সময় কোয়েটায় উপনীত হইলাম, পথে পূর্ব্বোক্ত দুইটী দুর্ঘটনা হওয়ায়ই এত বিলম্বের কারণ, নচেৎ সন্ধ্যার সময়েই পঁহুছিতে পারিতাম।



কোয়েটা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কোয়েটা।

অন্ধকারময়ী রজনীতে শীতের প্রকোপে কম্পান্বিত কলেবরে একখানা ফিটিং গাড়ী করিয়া কমিশারিয়েটের বড় বাবু শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় চলিলাম, সেখানে পঁহুছিয়া জানিতে পারিলাম যে চন্দ্রবাবু নিমন্ত্রণোপলক্ষে অন্যত্র গমন করিয়াছেন, বহির্বাটীর দ্বার রুদ্ধ। ভৃত্য বাড়ীতে সংবাদ দিল। কিন্তু জানি না কিরূপে তাঁহার সুশীলা সহধর্ম্মিণী তত্ত্ব পাইয়াছিলেন, আমরা কোথায় যাইবএবং নিশীথে এইরূপ অপরিচিত স্থানে কি করা কর্ত্তব্য এবম্বিধ চিন্তা করিবার পূর্ব্বে উক্ত পুণ্যবতী মহিলা আমাদিগকে স্বীয় বৈঠকখানায় অবস্থানের বিশেষ যোগাড় করিয়া দিলেন। কোয়েটাতে প্রতিগৃহেই অগ্নির চিম্‌নি আছে, আমাদিগকে শীতে নিতান্ত অভিভূত জানিয়া অগ্নির বন্দোবস্তও সুন্দররূপে করিয়া দেওয়াইলেন—এমনকি এই অতিথিবৎসলা ধার্ম্মিকা মহিলা অন্তঃস্বত্বা থাকা সত্ত্বেও প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এত রাত্রিতে স্বহস্তে রন্ধনাদি করতঃ আমাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এইরূপ বুদ্ধিমতী ও পরোপকারিণী রমণী ভ্রমণ-পথে অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমরা ভোজনান্তে শয়নের উদ্যোগ করিতেছি এইরূপ সময়ে চন্দ্রনাথ বাবু বাসায় আসিলেন এবং আমাদের পরিচয়াদি গ্রহণ পূর্ব্বক বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিলেন।

আমরা শয়নকালে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া ঘটিতে ও বাল্‌তীতে জল রাখিয়া দিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাত্রিশেষে জল আনিতে গিয়া দেখি জল বরফে পরিণত হইয়াছে। পরদিন বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় সূর্য্যদেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, এখানে সূর্য্যি ঠাকুরের 'নাইকো জারিজুরি'। আমরা কোনও প্রয়োজন বশতঃ বাজারে বাহির হইয়াছিলাম, দেখিলাম পথ, ঘাট, ঘরের ছাদ সমুদয়ই বরফাবৃত। আমা-দিগকে স্তূপাকার বরফের উপর দিয়া হাটিয়া যাইতে হইয়াছিল। অপরাহ্নে চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়বাবু নামধেয় অপর একটী ভদ্রমহোদয়ের

সহিত আফিস, ছাউনী এবং নগর পরিভ্রমণ করতঃ বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেদিকেই বরফ-বরফ-বরফ। রাত্রিকালে এস্থানের আরও দুই তিনটী বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়ের সহিত আলাপাদি হইল—তাঁহাদের প্রত্যেকের ভদ্রোচিত ব্যবহারে যার পর নাই সুখী হইয়াছি।

কোয়েটা অর্থে দুর্গ। খিলাতের আমীর এই দুর্গটি ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে অর্পণ করিয়াছেন। কোয়েটা অতি অল্প দিনের নগর। এখন পর্য্যন্ত ইহা পূর্ণ নাগরিক সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। আজি পর্য্যন্তও ইহা সম্পুর্ণরূপে নিরাপদ নহে, সময় সময় পার্ব্বত্য অসভ্য-অধিবাসীবৃন্দ আসিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়া থাকে। সেদিন ছাউনীর মধ্যগত কোন আফিসের দুইজন প্রহরীকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন পাহাড়িয়া লোকে কচ ষ্টেসনের সমস্ত অফিসার দিগকে খুন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে প্রায় সকলেই শিয়রে পিস্তল রাখিয়া নিদ্রা যায়। এস্থানে একজন মুন্সেফ ও তাঁহার অধীনস্থ অপর কয়েকজন ব্যক্তি বিচারার্থ নিয়োজিত আছেন। এজেণ্ট গভর্ণরই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা, তিনি কাহারও ধার ধারেন না, তাঁহাকে একরূপ হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি "ফ্রণ্টিয়ার ল" নামক আইনানুযায়ী বিচার করিয়া থাকেন। আদালত, ফৌজদারী ইত্যাদি যাবতীয় মোকদ্দমার আপীলই তাঁহার দরবারে হইয়া থাকে। ইঁহার অনুমত্যানুসারে ফাঁসী পর্য্যন্ত হয়। কোন আফিসেই উকীল মোক্তারের কারবার নাই, উকীল মোক্তার আনিতে এজেণ্ট সাহেবের ইচ্ছাও নাই।

আমরা শুনিতে পাইলাম যে, সীমান্ত প্রদেশে শাস্তিও অতিশয় গুরুতর। আমাদের দেশে খুন করিলে হন্তার ফাঁসী হইয়া থাকে, কিন্তু পেশোয়ার ও কোয়েটাতে হন্তারকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহায়তাকারীরও ফাঁসী হইয়া থাকে। এতদূর কঠোর শাসন ও দণ্ডপ্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পার্ব্বত্য অধিবাসীরা দৌরাত্ম্য করিতে নিবৃত্ত হইতেছে না। কাবুল যাওয়ার পথের মধ্যে "খাইবার পাস" পেশোয়ারের দিকে এবং "বোলান পাস" কোয়েটার দিকে।

কোয়েটা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের অন্তর্ভুক্ত একটী বিখ্যাত নগর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্যে ইহাই এখন সৈন্যের প্রধান ছাউনীরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কোয়েটার প্রাচীন রেসিডেন্সী ধ্বংস করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্মেণ্ট উক্তস্থানে নূতন রেসিডেন্সী এবং তাহার নিকটে নানাবিধ আফিস আদালতাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোয়েটার ক্লাব সৌধটি দেখিতে বেশ সুন্দর, উহার মধ্যে পুস্তকাগার, বিলিয়ার্ড খেলিবার কক্ষ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানোপযোগী কোন দ্রব্য সম্ভারেরই অভাব নাই। কোয়েটার চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট গিরি-শৃঙ্গস্থ দুর্গগুলি ব্রিটিশসিংহের অধিকারভুক্ত। এখানকার ইংরেজকর্ম্মচারিগণ প্রত্যেকই বিশেষ ভদ্র এবং আমাদের এই ভ্রমণ ব্যাপারে তাঁহারা আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত ও প্রশংসা করিলেন। আরও কতকগুলি দুর্গ আছে। কোয়েটার দুর্গে ব্রিটিশ সৈন্যগণের যেরূপ সর্ব্ববিধ সুযোগ ও সুবিধা আছে ভারতের অন্য কোথাও সেরূপ নাই। এই সুদূরবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশে সৈন্যগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত ইংরেজরাজের সর্ব্বপ্রকারের সুবন্দোবস্ত বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

কোয়েটার মধ্যগত বোটন ষ্টেসন হইতে একটী শাখা-রেলপথ বিস্তৃত হইয়া চামান পর্য্যন্ত গিয়াছে—উহাই গুলেস্তান হইয়া কান্দাহারে যাইবার প্রস্তাব হইতেছে। কান্দাহারের সহিত কোয়েটা রেলপথে সংযোজিত হইলে, এই নগর শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতিশালী হইয়া উঠিবে। কোয়েটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রমণীয় হইলেও শীতের অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ নবাগত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হইয়া উঠে না। এখানকার রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদ্বারা পরিশোভিত থাকায় পর্ব্বতপদ সংলগ্ন এই নগরীকে দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়। তুষারাবৃত সিতশুভ্র গিরিশ্রেণী এখানকার এক বিশেষ সৌন্দর্য্য। বাঙ্গালীর সংখ্যা এখানে নিতান্ত অল্প।

দিল্লী।

আমরা কোয়েটা হইতে ফিরিবার পথে শিবিওশিকারপুর হইয়া বরাবর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলাম। দিল্লী নগরীর দিকে বাষ্পীয় শকট যতই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই উভয় পার্শ্ববর্ত্তী শ্মশানের বিরাট ও ভীষণ দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। কত প্রাচীন মস্‌জিদ, কত প্রাচীন দেবালয়—কত বৃহৎ বৃহৎ বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। উভয় দিকের এই শ্মশানদৃশ্য হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও দুঃখের সঞ্চার করিয়া দিল। বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় আসিয়া দিল্লী ষ্টেশনে গাড়ী দণ্ডায়মান হইল। মনে ভাবিলাম এই কি সেই অতীতের সাক্ষী—প্রাচীন হিন্দু নরপতির পুণ্যশ্লোক-নামগৌরবের চরণ-রজলাঞ্ছিত সমৃদ্ধিশালিনী মহা-নগরী? ইতিহাস যাহার গৌরবকাহিনী দেশদেশান্তরে প্রচার করিয়াছে, মোগল বাদসাহগণের ভোগৈশ্বর্য্যের নিকেতন, গৌরবের একমাত্র তীর্থ-স্থল এই কি সেই দিল্লী? একদিন যাহার বক্ষে নাদের ও আবদালী-প্রমুখ কুলিশহৃদয় আক্রমণকারিগণের নিষ্ঠুর অত্যাচারে শোণিত-লহরী ক্রীড়া করিয়াছিল—উৎপীড়িত প্রজাগণের করুণ কণ্ঠধ্বনিতে যাহার গগন পরিপূরিত হইয়াছিল—এই কি সেই চিরলাঞ্ছিত ও চিরসমাদৃত ইতি-হাসের পুণ্যতীর্থ, ভাবুকের ভাবনিকেতন—কবির কাব্যের অপূর্ব্ব উপাদান কীর্ত্তিবৈভব-গৌরব-গর্ব্বিত মহিমামণ্ডিত মহানগরী? সত্য সত্যই দিল্লীতে পদার্পণ করিবামাত্র আমার হৃদয়ে নানাভাবের উদ্রেক হইল।

দিল্লীর ন্যায় প্রাচীন নগরী ভারতের আর কোথাও বিদ্যমান নাই এ কথা বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় বলিয়া মনে হয় না। দিল্লীর কাহিনী পাঠকবর্গের নিকট যথাযথরূপে বিবৃত করিতে পারি সে শক্তি আমার নাই—তথাপি যখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

দিল্লীর ষ্টেশনটিও অত্যন্ত বৃহৎ। গাড়ী ষ্টেশনে পঁহুছিবামাত্রই দলে দলে গাইড্ আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, আমরা কোনও সরাইয়ে

গমন না করিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট গাইডের সাহায্যে একখানা ভিন্ন বাসা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাতেই অবস্থান করিয়াছিলাম। প্রাচীন সমৃদ্ধি-লক্ষ্মী দিল্লীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও চিরবিলাসের নিকেতন দিল্লী হইতে সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও আরামপ্রিয়তা এখনও অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই। এই নগরে ভাল ভাল সরাইর কোনও অভাব নাই। সুন্দর সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ বিপণিশ্রেণী, ইউরোপীয় ও দেশীয় বড় বড় হোটেল, প্রশস্ত সরাই, স্নানাগার (Turkish Bath) প্রভৃতি দিল্লীর বর্ত্তমান শোভাসম্পদ এবং বিলাসিতার পরিচায়কও বটে। ষ্টেশনের সম্মুখেই কুইন্স গার্ডেন। বিনা বিশ্রামে অনবরত ঘুরিয়া ফিরিয়া শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাই বাসাতে যাইয়া সমুদয় ঠিক্‌ঠাক করার পর স্নানাহার করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল, কাজেই সে দিবস আর নগর দেখিতে বাহির হইলাম না।

পরদিবসে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নগর দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। দিল্লীর প্রাচীন ইতিহাস শিক্ষিত পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও অজ্ঞাত নাই, সেজন্যই এখানে আর সে বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করিলাম। 'দিল্লী'র নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতানুযায়ী জেনারল কানিংহাম বলেন যে খ্রীষ্টের জন্মের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে দিলু নামক এক নরপতি কর্ত্তৃক এই নগরী স্থাপিত হইয়া দিল্লী বা দিলুপুর এই নামোৎপত্তি হইয়াছে। রাজা দিলু হইতেই প্রথমেই দিল্লীর নামকরণ হয়, ইনি ইন্দ্রপ্রস্থের গৌতম-বংশীয় রাজগণের পরবর্ত্তী ময়ুর-বংশীয় শেষ নৃপতি। সে সময়ে দিল্লী নগরী বর্ত্তমান সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, এখন সে সকলেব কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই। মোটের উপর ইহা ঠিক্ যে, দিলুর কিংবা ক্ষত্রকুলগৌরব চন্দ্রবংশের মুখোজ্জ্বলকারী রাজা যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থধামের এখন কোনও রূপ প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নই বিদ্যমান নাই—প্রায় পঞ্চাশৎ বর্গমাইল পরিমিত সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডই এখন পুরাতন দিল্লীর ধ্বংসাবশেষরূপে পরিচিত। দিল্লীর নামোৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি প্রমাণ প্রয়োগ জানিতে পারা গিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটিকেই অনেকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করেন। তাহা

'দিল্লী' নামোৎপত্তি।

এই ;—খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথিতযশাঃ রাজা ধাব কর্ত্তৃক স্থাপিত যে লৌহস্তম্ভ বিদ্যমান আছে উহার গাত্রের পশ্চিমদিকে যে সংস্কৃত অনুশাসন গভীর রূপে খোদিত আছে তাহা এই—"রাজা ধাব যিনি নিজ ভুজবলে বহুকাল সমগ্র ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি স্বরূপ এই স্তম্ভ স্থাপিত হইল। এ সমুদয় খোদিতলিপি তাঁহার শাণিত অসি-ধারাঙ্কিত শত্রুগণের দেহের গভীর ক্ষতাঙ্কের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল ঘোষণা করুক।" এই লিপির পাঠোদ্ধার সর্ব্বপ্রথমে প্রিন্সেপ সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। কানিংহাম সাহেব অনুশাসনের লেখার ছাঁদ দৃষ্টে উহাকে গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের অনুশাসনের লেখা ও ইহার লেখা প্রায় একরূপ। এই লৌহস্তম্ভটি নিরেট, উহার ব্যাস ১৬ ইঞ্চ এবং দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট্। কিম্বদন্তীর সহিত কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মতের ঐক্য হয় না। জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে ইহার স্থাপয়িতা মহারাজা অনঙ্গপাল। যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে এই স্তম্ভ খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রোথিত হইয়াছিল এইরূপ বলিতে হয়। এইরূপ একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে "ব্যাস রাজাকে ঐ স্তম্ভ ভূগর্ভে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতে আজ্ঞা করেন এবং বলেন যে উহার দৃঢ়তার সহিতই তাঁহার রাজ্যের দৃঢ়তা স্থাপিত হইবে। তদনুসারে স্তম্ভ প্রোথিত হইল। ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, স্তম্ভ যথাস্থানে নিহিত হইয়াছে, ইহার পাদমূল ভূগর্ভে বাসুকির মস্তকে গিয়া ঠেকিয়াছে, সুতরাং স্তম্ভও অচল এবং রাজার রাজলক্ষ্মীও অচল। কিন্তু স্তম্ভমূল বাসুকীর মাথায় ঠেকিয়াছে তাহা রাজার বিশ্বাস হইল না। তিনি স্তম্ভ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। খনন হইলে উহার পাদদেশে বাসুকীর শোণিত দৃষ্ট হইল। রাজা ফাঁফরে পড়িলেন এবং নিজ সন্দিগ্ধতার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক ব্যাসকে পুনরায় আহ্বান করিয়া স্তম্ভ পুনঃস্থাপিত করিলেন। কিন্তু এবার আর কোন মতে স্তম্ভ সেরূপ অটল ভাবে প্রোথিত হইল না, 'ঢিলা' অর্থাৎ আল্‌গা রহিয়া গেল, সুতরাং তোমর বংশের রাজলক্ষ্মীও অচিরে পরহস্তগত হইল, এই ঢিল্লি অর্থাৎ ঢিলা স্তম্ভ হইতে নগরের নাম ঢিল্লি হইল।

"কিল্লিতো ঢিল্লি ভই
তোমর ভয় মত হিন।"

কিল্লি অর্থাৎ স্তম্ভ ঢিল্লি অর্থাৎ ঢিলা হইয়াছে, তোমরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।" ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন বা মহম্মদঘোরী যখন প্রথমবার আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করেন তখন তুয়ার ও চৌহান এই উভয় বংশের উত্তরাধিকারী বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বিরাজ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। এই স্বদেশ-প্রাণ ক্ষত্রবীর প্রথম আক্রমণ সময়ে বিশেষ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া মহম্মদঘোরীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া প্রায় ৪০ মাইল পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! পরিশেষে কনোজাধিপতি স্বদেশদ্রোহী জয়চাঁদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় দ্বিতীয়বারের আক্রমণে বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বিরাজ মুসলমান দস্যুর করে ধৃত ও বন্দী হন—দুর্দ্দান্ত মোস্‌লেম নরপতি বন্দীকৃত নিরস্ত্র সিংহকে নিঃসহায় অবস্থায় হত্যা করিয়া ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করিল।* সেই দিন হইতেই ভারত-রাজলক্ষ্মী যবনের অঙ্কশায়িনী হইলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া গেল, সেই দিন হইতেই সোনার ভারত অধীনতা-নিগড়-বদ্ধ হইয়া রহিল,—সেই দুর্দ্দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি মনের দুঃখে গাহিয়াছেন—

"অহো! কি কু-দিবসে গ্রাসিল রাহু
মোচন হইল না আরও।
ভাঙ্গিল চূর্নিল, উলটি পালটি
লুঠি নিল যা ছিল সারও।"

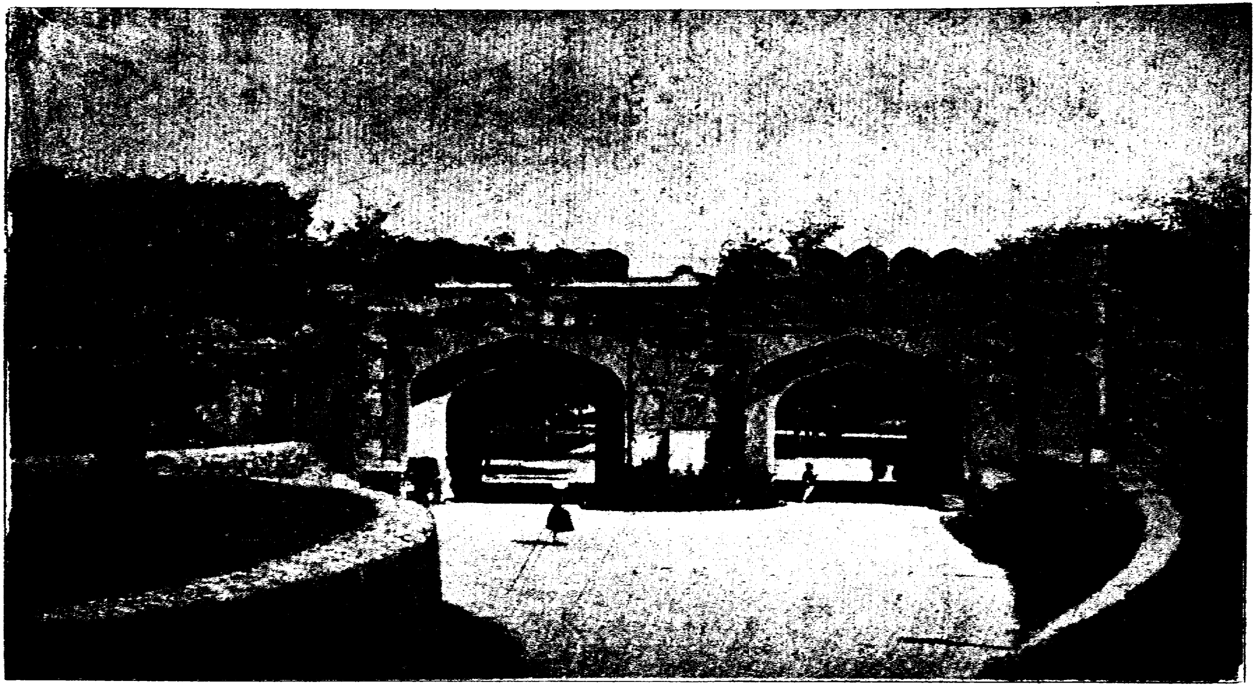
সেই মহম্মদঘোরীর প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন আইবকের সময় হইতেই দিল্লী মুসলমানগণের রাজধানী হয়। তৎপরে কাল ও যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাসবংশ, পাঠানবংশ, খিলিজিবংশ, মোগলবংশ প্রভৃতি বহু রাজবংশই এস্থানে বসিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ডলেকের সময় হইতেই দিল্লী একপ্রকার ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়। ঐ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে ইংরেজ সৈন্য কদলি-কা-সরাইয়ের যুদ্ধে

* Rambles and Recollections—Sleeman Vol II p. 155.

সিপাহীদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই গোলযোগ নিবারিত হইলেও কিছু দিন পর্য্যন্ত দিল্লীতে কঠোর সামরিক বিধান প্রচলিত ছিল—পরে শান্তি সংস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা রূপান্তরিত হইল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত-সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ কালীন ঘোষণা পত্র পাঠ করিবার জন্য এই নগরে এক বিরাট দরবার হইয়াছিল—ঐ দরবারে ভারতের প্রায় প্রধান প্রধান সমগ্র রাজন্যবৃন্দই উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লীনগরী 'প্রাচীন দিল্লী' ও নূতন দিল্লী এই দুই নামে অভিহিত। প্রাচীনকালে যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা এখন পুরাতন দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত। সেই প্রাচীন সমৃদ্ধি শালিনী নগরীর ধ্বংসাবশেষ নিরীক্ষণ করিলে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ই ব্যথিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতই দিল্লী এক মহাশ্মশান—আর তাহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ—শ্মশান-কঙ্কাল স্বরূপ বিদ্যমান।

বর্ত্তমান বা নূতন দিল্লী ধর্ম্মগতপ্রাণ ও প্রজাবৎসল সম্রাট সাহ্জান কর্ত্তৃক ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়, তিনি স্বীয় নামানুযায়ী এই নগরীকেও "সাহজাহানাবাদ" এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন—কিন্তু সাধারণের নিকট এই নাম গৃহীত না হইয়া "দিল্লী"ই সুপরিচিত হইয়া পড়ে। সাহ্জানের ন্যায় প্রজাবৎসল নরপতি দিল্লী সিংহাসনে অতি অল্পই উপবেশন করিয়াছেন। তিনি সত্যই সত্যই * * * "Who reigned not so much as a King over his subjects, but rather as a father over his family and children." দিল্লী নগরী যমুনার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ৯৫৫ মাইল দূরে ও সমুদ্রবক্ষ অপেক্ষা ৮০০ ফিট উচ্চে বিরাজিত। লোক সংখ্যা ২০৮,৫৭৫, তম্মধ্যে হিন্দু ১১৪,৪১৭; মুসলমান ৮৮,৪৬০ এবং খ্রীষ্টান ও অন্যান্য মতাবলম্বী ৫,৬৯৮। দিল্লীর প্রতি প্রাচীন সৌধাবলীর বৃত্তান্ত যদি সংক্ষেপেও বর্ণনা করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলেও একখানা স্বতন্ত্র বহি হইয়া পড়ে অতএব আমরা এখানে কেবলমাত্র প্রধান প্রধান রাস্তা ও অট্টালিকাদির বিবরণই লিপিবদ্ধ করিলাম। পূর্ব্বে যে দিল্লীনগরী ভারতের রাজধানীরূপে সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা পঞ্জাবের বিভাগীয় কমিশনরের হেড কোয়ার্টার



দিল্লী—কাশ্মীর গেইট।

রূপে পরিচিত, হায় রে যুগপরিবর্ত্তন! দিল্লীর চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর তাহার পরিধি প্রায় ছয় মাইল হইবে। এই প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে দ্বাদশটি 'গান প্রুফ' সিংহদ্বার ও দুইটি সাধারণ তোরণ বিদ্যমান আছে। আমরা এখানে সে গুলির নামোল্লেখ করিলাম;—(১) তোর্কমান (২) লাহোর (৩) মৌরী (৪) তিলি (৫) মুচি (৬) রাজঘাট (৭) কাবুল (৮) কাশ্মীর (৯) আজমীর (১০) মস্‌জিদ ঘাট (১১) নিগম্বা—বর্ত্তমান সময়ে উহার নাম কলিকাতা হইয়াছে। (১২) আগ্রা বা দিল্লী। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, রেলষ্টেশন, জামে মস্‌জিদ, চাঁদনী, বর্ত্তমান সৈনিকাবাস, রাণীবাগ প্রায় সমুদয়ই প্রাচীরের মধ্যগত; প্রাচীরের বক্ষে পূর্ব্বে যে নয়ন-মন-মোহকর-অনিন্দ্যসুন্দর শান্তিশীতল কুদ্‌শীয়া নামক প্রসিদ্ধ উদ্যান বিদ্যমান ছিল তাহা এখন ধ্বংসাবশেষ পরিপূর্ণ।

দিল্লী নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ও রাজপুতনা ষ্টেট্‌ এই তিনটী রেল পথের ষ্টেসন আছে—গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড এবং আরও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর রাজপথ দিল্লী হইতে চতুর্দ্দিকে গমন করায় ইহার সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। দিল্লীতে কি স্থলপথে, কি জলপথে উভয় পথেই বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা। বর্ত্তমান সময়েও ইহা কলিকাতা, বোম্বাই, রাজপুতনা প্রভৃতির সহিত বিস্তৃত বাণিজ্যের একটী কেন্দ্রস্থল। আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই এখানে হইয়া থাকে; আমদানীর মধ্যে নীলবড়ি, রাসায়নিক ঔষধাদি, তূলা, রেসম, সূত্র, গোধূম, সর্ষপাদি শস্য, ঘৃত, লবণ, নানাবিধ ধাতু, শৃঙ্গ, চর্ম্ম ইত্যাদি; আর রপ্তানীর মধ্যে তামাক, চিনি, তৈল, বিবিধ অলঙ্কার। ঝিন্দ, কাবুল, অন্‌বার, বিকানীর, জয়পুর, দোয়া প্রভৃতি পঞ্জাবের সমস্ত নগরে দিল্লীর সওদাগরগণ বাণিজ্য করিয়া থাকে। চাঁদনী চক্‌ কারবারের প্রধান আড্ডা ও দিল্লীর সর্ব্বপ্রধান রাস্তা। এখানকার শ্রেণীবদ্ধ বিপণিশ্রেণী ও নানাবিধ দ্রব্য সমূহ দর্শন করিলে হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। আমরা সর্ব্বপ্রথমে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ দর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম। ইহা যমুনার তীরে নগরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এই

রাজপ্রাসাদ।

প্রসিদ্ধ প্রাসাদ উত্তর দক্ষিণে ৩২০০ ফিট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৬০০ ফিট। স্থাপত্যকার্য্যে এই প্রাসাদ অতুলনীয়। ইহা "দেওয়ানে আম্‌" (সাধারণ দর্শকগৃহ) "দেওয়ানে খাস্‌" মতি মস্‌জিদ

(the mosque of golden domes) প্রভৃতি সুবিখ্যাত অট্টালিকা সমূহে বিভক্ত। 'দেওয়ানে আম রক্তপ্রস্তর-স্তম্ভ-সারির উপর একটী সুন্দর গৃহ। ইহার তিনদিক খোলা, একদিকে প্রাচীর ও তাহার পশ্চাতে কয়েকটি কক্ষ। ফার্গুসন সাহেব সাহাজাহান নির্ম্মিত এই প্রাসাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—* * "The palace at Delhi, is or rather was, the most, magnificent palace in the East—perhaps in the world—and the only one, at least in India, which enables us to understand what the arrangements of a complete palace were when deliberately undertaken and carried out on one uniform."* এই প্রাসাদের চারিদিক বেড়িয়া লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর বিদ্যমান। "দেওয়ানেআম" কক্ষের দেওয়ালে, মেজে, ও ছাদ যে সকল হীরক, মতী, চুনী প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত ছিল– এখন সে সকল কিছুই নাই। ইংরেজরাজ সে সকল প্রস্তর খচিত লতা পুষ্প ইত্যাদি এখন নানারঙ্গের কাচ খণ্ড দ্বারা শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। কক্ষটি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের কারুকার্য্যে খচিত। এই স্থানেই সাহাজাহানের ময়ূরসিংহাসন থাকিত এখানে বসিয়াই তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। সিংহাসনের নিম্নে যে একটী শ্বেতমর্ম্মর বেদী আছে, তাহার উপর উজীর উপবেশন করিতেন উজীর আবেদন পত্রাদি পাঠ করিয়া একটী স্বর্ণপাত্রে রাখিতেন--পরে তাহা রজত-শৃঙ্খলে উত্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট পঁহুছিত। কক্ষের পশ্চাত দিকে যমুনাতীরবর্ত্তী শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকাসমূহ শোভমান। কি সুন্দর দৃশ্য !

"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও!

ইহার পরে কেন্দ্রস্থলে "দেওয়ান-খাস" নামধেয় সুবিখ্যাত সৌধ বিরাজিত। এই অট্টালিকারও তিন দিক খোলা—যমুনার দিকে প্রস্তরের ছিদ্রবিশিষ্ট গবাক্ষ, স্তম্ভ সকল এবং উপরের ছাদ সুবর্ণ এবং নানাবিধ

* History of Indian & Eastern Architecture Ferguson P. 591.

বর্ণে সুরঞ্জিত ছিল। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকস্থ দেওয়ালে লেখা রহিয়াছে—

"আগার ফিরদৌস্ বা' রুয়ে জমিনাস্ত্
হামিনাস্তো হামিনাস্তো হামিনাস্তো।"

অর্থাৎ—

যদ্যপি স্বরগ থাকে মরতের মাঝে,
সম্ভব তাহলে তাহা হেথায় বিরাজে।

পূর্ব্বে এই লেখাগুলি কনক ফলকে শোভিত ছিল, ইংরেজরাজ তাহা স্থানান্তরিত করিয়া তৎস্থানে পিত্তলফলক স্থাপন করিয়াছেন। "দেওয়ানে আম্" ও "দেওয়ানে খাস" এই কক্ষ দু'টী সম্বন্ধে ফাগু্র্সন সাহেব অসঙ্কোচে লিখিয়াছেন, "They are the gems of the palace." এই উক্তির মধ্যে কোনওরূপ অতিশয়োক্তি নাই। পূর্ব্বে সম্রাটের সিংহাসনের নিকটে যে সুবর্ণনির্ম্মিত মানদণ্ড বিরাজিত থাকিত, এখন তাহা পিত্তল ফলকে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্ষুদ্রাকারে দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মানদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে আরবী অক্ষরে খোদিত আছে যে "মহাপ্রলয়ের দিবস স্বয়ং জগৎপাতা জগদীশ্বর মানদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক রাজা মহারাজা হইতে দীনহীন কুটীরবাসী ভিক্ষুকের অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ ও পাপ পুণ্যের বিচার করিবেন।" বর্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে রাজপ্রাসাদের যে মনোহর বর্ণনা করিয়াছেন এখন তাহা কল্পনাতীত। সাহজাহনের সেই ময়ূরসিংহাসন এখন কোথায়? উহা যে হীরক-প্রবাল-মণ্ডিত সুধা-ধবলিত মর্ম্মর বেদীর উপর স্থাপিত ছিল তাহা এখন লৌহশলাকাবৃত। হায় রে পরিবর্ত্তন! যে জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর একদিন ধূর্ত্ত নাদীর সাহ উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন ছলে দিল্লীর পরাজিত সম্রাট মহম্মদ সাহের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন—যাহা দিগ্বিজয়ী বীর আলাউদ্দীন মালওয়া রাজকে পরাভূত করিয়া হস্তগত করিয়াছিলেন, যে প্রদীপ্ত মহামণি ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মহামতি সম্রাট হুমায়ুনের হস্তগত হয় এবং যাহা কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত প্রজা-বৎসল মহাত্মা সম্রাট আকবরের সমাধিভূষিত করিয়াছিল—পরে যে অতুল্য রত্ন আওরঙ্গজেব প্রায় ছয় কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ভুবন বিখ্যাত ময়ূরাসনের

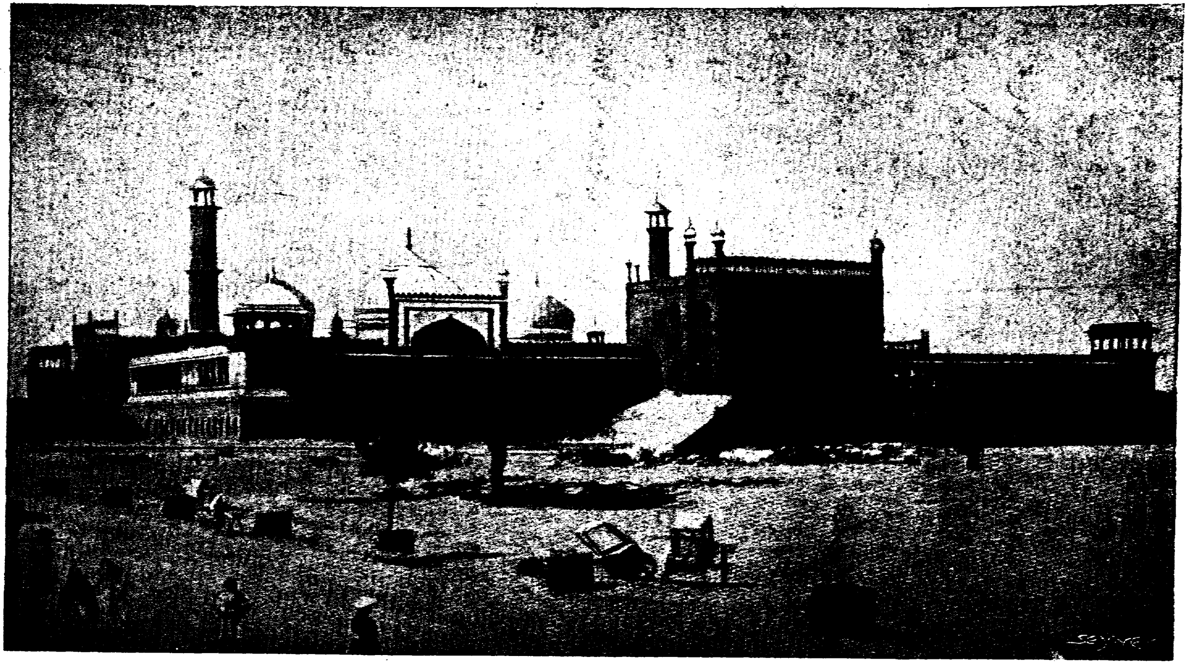
ঠোঁটে ভূষিত করিয়াছিলেন সেই কোহিনূর-ইতিহাস সত্য সত্যই আলোচনার যোগ্য। হায়! কোহিনূরের কাহিনীও কম আশ্চর্য্যের নহে। মোগল-সম্রাটগণের পরে ইহা পঞ্জাবের বীরকেশরী রণজিতের বক্ষও কিছুদিন পর্য্যন্ত শোভা করিয়া অবশেষে ১৮৫০ খৃষ্টীয় অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক স্বর্গীয়া মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হইয়া ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মুকুটের মধ্যমণি রূপে আপনার গৌরব আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। কোহিনূর এখনও আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে কিন্তু যাঁহারা তাহাকে করতলগত করিবার নিমিত্ত শত যত্ন, চেষ্টা এমন কি শোণিতপাতে ধরা বক্ষ কলঙ্কিত করিয়াছিল, হায়! জগদীশ্বর তাহারা এখন কোথায়? কোথায় তাহাদের সেই বীরদর্প ও ধনৈশ্বর্য্যের মোহ? কবি জগতের এই নশ্বরতা দেখিয়াই গাহিয়াছেন,—

"যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।"

দেওয়ানী আমের পশ্চাতভাগেই রাণী মহাল—এবং উহার উত্তর ভাগেই বাদশাহের শয়ন-গৃহ বা খোয়াব্‌গা। এখানে যে উৎকৃষ্ট মর্ম্মরপ্রস্তর জাল আছে তাহা অতুলনীয়। দেওয়ানী খাসের উত্তর পার্শ্বে স্নানাগার বা হামাম।

হামাম বা স্নানাগার।

এই স্থানের কক্ষগুলি অত্যন্ত মনোহর। এই কক্ষের প্রাচীর এবং ছাদ কাচে সুশোভিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। যখন নুরজাহান, মমতাজ, যোধবাই প্রভৃতি রূপসী বেগমগণ এই কক্ষে স্নান করিতেন না জানি তখন ইহা কত শোভাই ধারণ করিত। বুঝি চতুর্দ্দিকের দর্পণে নিজ নিজ সুঠাম দেহবল্লরীর শোভাময় প্রতিবিম্ব দর্শনে বুঝিতে পারিতেন যে কি কুহকে তাঁহারা দিল্লীর সম্রাটকে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখানে এক দিন যে সুর ললনাগণ মর্ম্মর সলিল ধারের সুরভি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আরাম অনুভব করিতেন আজ তাহারা কোথায়? কত গল্পে—কলহাস্যে তখন এ কক্ষগুলি মুখরিত হইত—সেই রসালাপ—সেই মদালসে উপবিষ্ট অনাবৃত দেহের কনক শোভা—নয়ন কোণে বিলোল কটাক্ষ—হায়! কল্পনায়ও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়। বৃহত্তম কক্ষের চারিদিকে আরও কতকগুলি



জুম্মা মস্‌জেদ—দিল্লী।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কক্ষ আছে—সে সমুদয়ের মধ্যে রূপসীগণ তৈল মর্দ্দনাদি করিতেন। তিনটী সুন্দর সুন্দর প্রকোষ্ঠে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসরাজি নির্ম্মল মেজের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে—তাহাদের কোনটির মধ্য হইতে উষ্ণ, কোনটির মধ্য হইতে শীতল জলের ধারা বহির্গত হইয়া জলাধারগুলি পূর্ণ করিত। সম্মুখের একটী কক্ষের মধ্যস্থলে পদ্মের মত একটী কুণ্ড আছে ইহাতে গোলাপজল রক্ষিত হইয়া কক্ষটিকে সুবাসিত রাখিত। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী কক্ষ দেখিতে পাইলাম সেগুলি যে কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত তাহা এখন কে নির্ণয় করিতে পারে? আর এক স্থানে একটী সংকীর্ণ মর্ম্মর পথ দেখিতে পাইলাম পূর্ব্বে এই পথে অন্তঃসলিলা রূপে যমুনার পূতবারি রঙ্গমহাল ও দেওয়ানী খাসের ভিতর দিয়া এস্থানে আনীত হইত। বহুকাল হইল সে স্রোত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মোগল সম্রাটগণ যে কতদূর বিলাসী ছিলেন বর্ত্তমান সময়েও তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহা সুন্দর রূপে অধ্যয়ন করিতে পারা যায়।

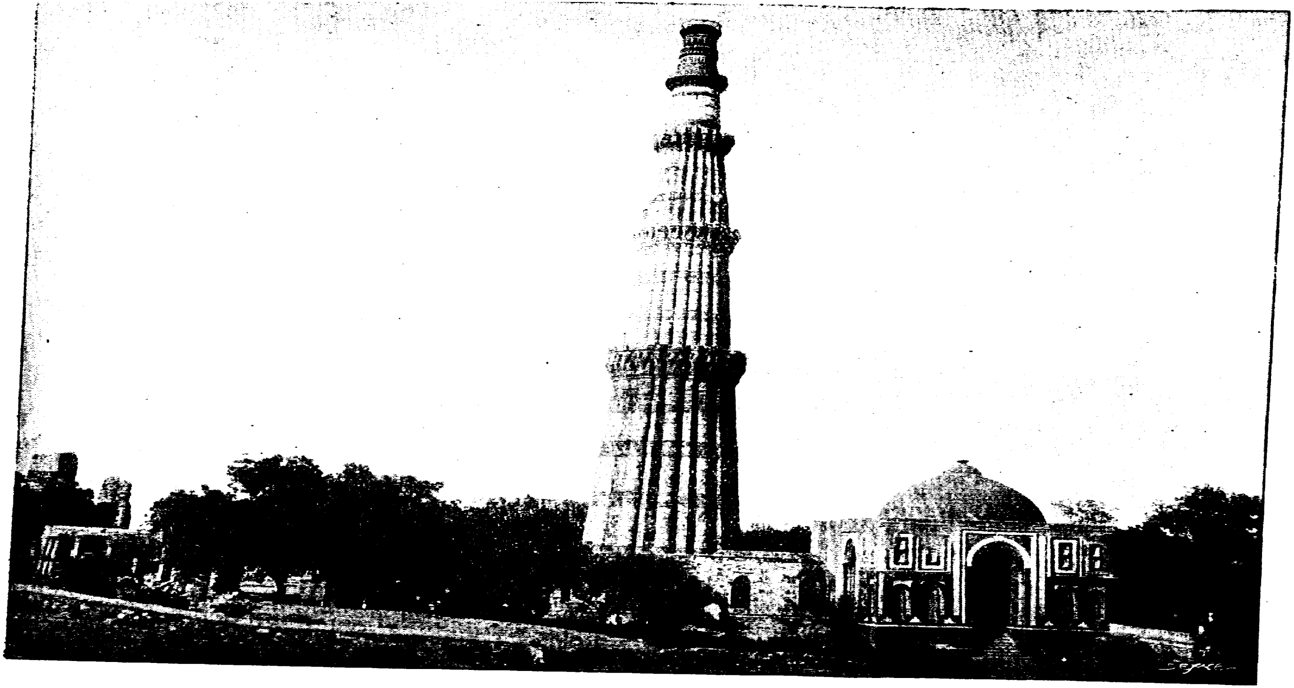
মতি মস্‌জিদ।

স্নানকক্ষের সন্নিকটেই "মতি মস্‌জিদ" (The mosque of golden domes) অবস্থিত। পুরমহিলাগণ ইহাতে পরমেশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত সমবেত হইতেন। ইহা শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত। আওরাঙ্গজেব কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল—আগ্রার মতি মস্‌জিদের সহিত তুলনায় ইহা হীন বিবেচিত হইলেও এই উপাসনা মন্দির ও উপেক্ষনীয় নহে। কোনও রূপ রঙ্গের কার্য্য ইহাতে নাই—কেবল শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের কারুকার্য্য দ্বারাই ইহা পরিশোভিত। এস্থানে সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া রাজঅন্তঃপুর-কামিনীগণ উপাসনা করিতেন। এখন এই মতি মস্‌জিদ নিরাভরণা হিন্দু বিধবা যুবতীর ন্যায় মলিন ও শ্রীহীন।

জামে মসজিদ।

দুর্গ প্রাচীরের বহির্ভাগে সুপ্রশস্ত উন্নত ভূমির উপরে জামে মস্‌জিদ অবস্থিত। তাজমহল নির্ম্মাতা সাহাজাহানের ইহা এক অতুল কীর্ত্তি। প্রতিদিন দশ সহস্রলোক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া আট বৎসর ছয়মাসে এই সুবৃহৎ উপাসনা মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়াছিল, ইহার নির্ম্মাণে প্রায় পনের লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল—অত্যুচ্চ বেদীর উপর অত্যুচ্চ ফটক শোভিত এই মস্‌জিদ দর্শকের

নিকট আপনার মহত্ত্ব সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই সমুদয় অতুল্য কীর্ত্তিরাশির শেষ প্রস্তরখণ্ড জগতের বুকে অনু পরমাণুর সহিত মিলাইয়া না যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত সাহাজাহানের অক্ষয় নাম কখনও ধরাবক্ষ হইতে মুছিয়া যাইবে না। "পাস" ব্যতীত হিন্দুগণ এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে অধিকারী নহেন। নিকটেই পাস পাওয়া যায়, আমরা 'পাস' গ্রহণানন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে তিনটী তোরণ আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের তোরণটীই উচ্চতায় এবং বিস্তৃতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্রমান্বয়ে ৪৫টী ধাপ অতিক্রম করিয়া এই দ্বারে পঁহুছিতে পারা যায়, স্বয়ং সম্রাটও নাকি এই দ্বার দিয়াই মন্দিরে উপাসনার্থ আগমন করিতেন। সিংহদ্বারের উপরিভাগে একটী কক্ষ আছে, উহাতে একটী বেদী দেখিলাম—ঐ বেদীর নাম "শাহ্ নিসিন" অর্থাৎ সম্রাটের উপবেশনের স্থান। শুনিলাম যে প্রতি শুক্রবার দিবস নমাজ শেষ হইলে সম্রাট আসিয়া এই বেদীর উপর উপবেশন করিতেন, আর নিম্নে চারিদিকে প্রজামণ্ডলী সমবেত হইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিত। এখন সেই 'শাহ্ন্সিন্'—ধূলি সমাচ্ছন্ন ও পরিত্যক্ত। মস্জিদের অঙ্গসংলগ্ন মিনার দুইটী উচ্চতায় প্রায় কলিকাতার "অক্টার্লনি মনুমেণ্টের" সমতুল্য হইবে—উহার উপরে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকের সৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। কি বৃহৎ ও সুন্দর,—কি বৃহৎ ও ভীষণ এই মহানগরী—তাহা ভাবিলেও মনোমধ্যে শোক-তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া ব্যাকুলিত করিয়া দেয়। মস্জিদের বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহাতে এক সঙ্গে এক লক্ষ লোক নমাজ পড়িতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও প্রতিদিন সান্ধ্যোপাসনার সময় প্রতি শুক্রবার এখানে প্রায় তিন সহস্রলোক সমবেত হয়। মস্জিদের অগ্নি কোণে একটী সূর্য্য ঘড়ী দেখিলাম। দিল্লীর Queen's Garden বা রাণীবাগ আকারে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের সমকক্ষ হইবে। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রাসাদদর্শনেই অতিবাহিত হইল, অপরাহ্ণে নগরস্থ প্রধান রাজপথ ধরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। ইচ্ছা



কুতব মিনার—দিল্লী।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

চাঁদনীচকের বক্ষ ভেদ করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে, প্রশস্ততায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাজবর্ত্ম হ্যারিসন রোড হইতে কোন অংশেই এই রাজবর্ত্ম কম নহে, বরং কোন কোন স্থলে অধিক বলিয়াই মনে হইল। চাঁদনীচকের এই রাজপথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ ও সুদর্শন বিটপীশ্রেণী পর্য্যটকের মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। কলিকাতা মহানগরীর সমগ্র আপন-শ্রেণী যদি এক স্থানে সমাবেশ হইত তাহা হইলে যেরূপ দৃশ্য হয় চাঁদনীচকে সেইরূপ মহান্ দৃশ্যই দৃষ্ট হয়, ভারতের আর কোনও নগরে এইরূপ প্রসিদ্ধ বিপণি শ্রেণীর সমাবেশই দর্শন করি নাই। এই প্রসিদ্ধ রাজপথের মধ্যস্থানেই ব্রিটিশ নির্ম্মিত বিরাট (Clock tower) ক্লক টাউয়ার বিরাজিত, ইহা ইংরেজ রাজের গৌরবময় কীর্ত্তি স্তম্ভ—কিন্তু জুম্মামসজিদ সংলগ্ন মিনার দ্বয় অপেক্ষা উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ নহে। "Travels of a Hindoo" নামক গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ভোলানাথচন্দ্র ইহার সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন "In all Delhi, the highest building is the Jumma Musjeed, towering above every other object, and seen from every part of the city."

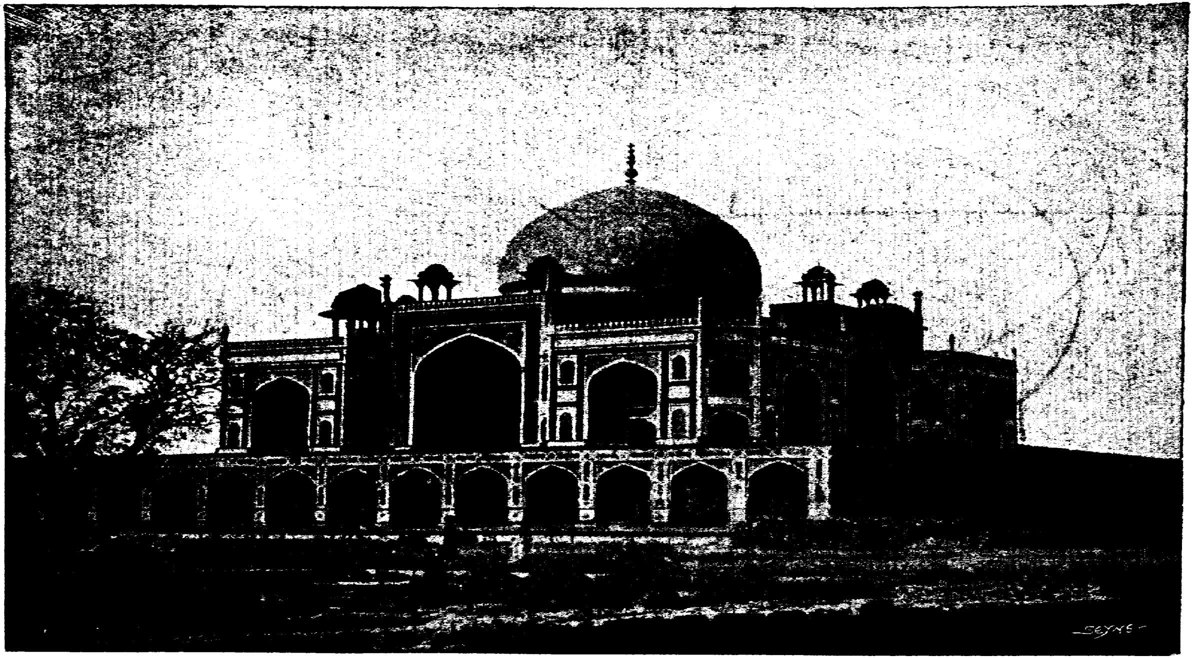
আগরা তোরণের সম্মুখ হইতে দক্ষিণ দিকে যতদূর দৃষ্টি ধাবিত হয়, কেবল শ্মশানের বিভীষিকা—সমাধির পরে সমাধি তারপরে সমাধি, ধ্বংসের ভীষণামূর্ত্তি এখানে প্রকটিত। যে স্থানে এক দিবস পাঠান রাজের রাজ-প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল, এখন তাহা ধ্বংসের বিভীষিকা চিত্র প্রকাশিত করিতেছে, এই ভগ্নস্তূপের উপরেই সম্রাট অশোকের স্তম্ভ স্থাপিত, ইহা সম্রাট ফিরোজ সাহ স্থানান্তরিত করিয়া আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন। যে দুর্গের শীর্ষদেশ হইতে সম্রাট হুমায়ুন পদস্খলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন—সেই দুর্গ এখনও কালের ভীষণ আক্রমণ হইতে কোনওরূপে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বিদ্যোৎসাহী সম্রাট হুমায়ুন যখন দুর্গ মধ্যস্থ পাঠাগারে বসিয়া গ্রন্থালোচনা করিতেছিলেন, সে সময়ে সান্ধ্যোপসনার 'আজান' ধ্বনি শ্রবণে দ্রুতপদে প্রাসাদোপরি হইতে অবতরণের সময় মর্ম্মর মণ্ডিত সোপানা-বলী হইতে পদস্খলিত হইয়া প্রায় পঞ্চবিংশ হস্ত পরিমিত উচ্চ স্থান হইতে মর্ম্মর মণ্ডিত প্রাঙ্গনে পতিত

হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই ভগ্নস্তূপের দক্ষিণদিকে সম্রাট

সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি।

হুমায়ুনের সমাধির তুষারধবল মর্ম্মর গম্বুজ গগন ভেদ করিয়া দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। হুমায়ুন মাকবারা বা হুমায়ুন বাদসাহের সমাধিমন্দির পতিভক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। ইহা হুমায়ুন পত্নী মহাত্মা আকবর জননী হামিদা বানু বেগম পতি-শোক কাতর হৃদয়ে মৃত স্বামীর স্মরণার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত এই সৌধ-মন্দির বিরাজিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত হামিদা-বেগমের প্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন জগতের বুকে ঘোষণা করিবে—সতীর কাতর-অশ্রুজলের পুণ্য শ্বেতমর্ম্মরে গঠিত বলিয়া এই সমাধিমন্দির মনোমধ্যে এক পবিত্রতার পুণ্য-স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছিল। কোথায় আজ হামিদাবানু—আর কোথায়ইবা সম্রাট হুমায়ুন, কিন্তু পতিপ্রেমের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিত আজও ধরা বক্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই, আগ্রা নগরীর জগদ্বিখ্যাত তাজমহল যেমন পতির প্রেমের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি মন্দির, তদ্রূপ 'হুমায়ুনমাকবারা' ও পত্নীর পতির প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির অমর নিদর্শন। কথিত আছে যে হামিদা বেগম পতির মৃত্যুর পরে হিন্দু বিধবা রমণীর ন্যায় ব্রতাচারেও ধর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বেগম সাহেবা ও প্রাণেশ্বরের সমাধিশয্যার পার্শ্বস্থ বাম প্রকোষ্ঠে চির নিদ্রিতা আছেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পনের লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল এবং ষোল বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়।* তাজমহল ও সেকেন্দ্রার আকবরের সমাধির ন্যায় এই সমাধি মন্দির ও একটী সুন্দর উদ্যান মধ্যে স্থাপিত। উদ্যানটি বড়ই মনোরম, লতাকুঞ্জের শ্যামল সৌন্দর্য্য—বিহগের সুমধুর গান—ফুলের প্রফুল্ল হাসি শ্মশান-মধ্যেও সৌন্দর্য্যের হাসি বিকাশ করিয়া দেয়। এই উদ্যানটি প্রায় ১৩২০ বর্গ ফিট, ইহার মধ্যস্থলেই ২০০ বর্গ মর্ম্মর গ্রথিত প্রাঙ্গণের উপর বিরাট গম্বুজ যুক্ত মন্দির শোভমান। বাদশাহ হুমায়ুনের এই পাষাণ মন্দির আজিও অভগ্ন এবং প্রিয় দর্শন—ইহার আভ্যন্তরিক প্রাচীরের কারুকার্য্য এখনও কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই।

*The Mausolenm was erected at the cost of fifteen lacs of rupees, in sixteen years, from 1554 to 1570, Travels of a Hindoo.



সম্রাট্ হুমায়ুনের সমাধি—দিল্লী।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নীরবতা ইহার চতুর্দ্দিক বেড়িয়া দেদীপ্যমান—এই বিরাট মন্দির এখন কপোত কপোতীর প্রেমাগার হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের প্রিয় কূজনে ইহার স্তব্ধতা এখন ভঙ্গ হয়। হুমায়ুন বাদসাহ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিচিত নহেন—বঙ্গদেশের গোলযোগে শেরর্খাকে দমন করিবার জন্য ইঁহাকে বাঙ্‌লা দেশেও আসিতে হইয়াছিল।

সমাধি মন্দিরের দ্বিতল গৃহটি গোলকধাঁধা বিশেষ, কোনও রূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারদেশে অঙ্কিত করিয়া না গেলে বাহিরে আসিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সাহাজাহানাবাদ বা নূতন দিল্লী হইতে ইহা প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। হুমায়ুনের বিরাট সমাধি মন্দির দর্শন করিয়া নৈঋত কোণে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়—এস্থানে অগণন সমাধির সমাবেশ, তন্মধ্যে নিজামদ্দীন নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ফকীরের সমাধি দর্শনীয়—এই মহাত্মার পূর্ব্ব জীবনীর সহিত রামায়ণ প্রণেতা প্রসিদ্ধ ঋষি বাল্মীকির (পূর্ব্বে রত্নাকর) পূর্ব্ব-কাহিনীর আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। নিজামদ্দীনের সমাধিটি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত ও বড়ই সুন্দর। গৃহটী দেখিতে সত্য সত্যই মনোহর। ফকীরের সমাধির অল্প দূরে এক প্রাঙ্গণ মধ্যেই কবি খসরুর সমাধি। ইহা ছাড়া দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদশাহ্ ও রাজপরিবারভুক্ত বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সমাধি বিদ্যমান আছে,—সে সকলের বিস্তারিত বর্ণনা অসম্ভব। সর্ব্বাপেক্ষা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ দুহিতার ক্ষুদ্র সমাধিটি। ক্ষুদ্র হইলেও উহার মধ্যে যে পুণ্য পবিত্রতার উজ্জ্বল স্মৃতি বিরাজিত রহিয়াছে, যে পবিত্র পিতৃভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত এই সমাধির অভ্যন্তরে নিহিত তাহা অতুলনীয় ও অপরিমেয়।

জাহানারার সমাধি।

জাহানারার ক্ষুদ্র সমাধিটি মহম্মদসাহার সমাধির নিকটেই অবস্থিত। ইনি সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ধার্ম্মিক দারার অতি স্নেহশীলা ভগ্নী। জাহানারার পবিত্র জীবন-কাহিনী মোগল ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন। বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে যখন ঔরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গের "নগিনামসজিদ" পার্শ্বস্থিত একটী কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তখন এই মহীয়সী রমণী

নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতা পিতৃসেবার নিমিত্ত বলি দিয়া জনকের সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে জাহানারা তদীয় কুমারী-জীবন দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনে নিয়োগ করেন। এই পুণ্যবতী কুমারীর সমাধিটি মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত, মধ্যস্থান শ্যামলদূর্ব্বাদলে পরিশোভিত। কবরের শীর্ষ স্থানে একটী শ্বেতমর্ম্মর ফলকে জাহানারার স্বরচিত একটী পারস্য শ্লোক লিখিত আছে।

"বেগায়র সাব্‌জা না পোশাদ্ কাসে মাজারে মারা
কে কবর্‌পোশী গারিবাঁ হামি গিয়াব সাস্ত্।"

"বহুমূল্য আভরণে করিওনা সুসজ্জিত
কবর আমার,
তৃণ শ্রেষ্ঠ আভরণ দীন আত্মা জাহানারা
সম্রাট কন্যার।"*

জাহানারার চরিত্র কেহ কেহ মলিন বর্ণে চিত্র করিয়া গিয়াছেন আমাদের মনে হয় যে এইরূপ পিতৃভক্তিমতী ধার্ম্মিকা রমণীর চরিত্র কখনও পাপের কলঙ্ক কালিমায় চিত্রিত হইতে পারে না। কিন্তু বার্ণিয়ার জাহানারা বা বেগম সাহেবের যে পাপ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় তিনি লিখিয়াছেন:—

"Concerning the two daughters, the eldest, Begum Saheb, was very beautiful, and a great wit, passionately beloved of her father. It was even rumoured, that he loved her to that degree as is hardly to be imagined. * * * * She stuck entirely to Dara, her eldest brother, espoused cordially his part, and declared openly for him which contributed not a little to make the affairs of Dara

* "Let no rich canopy cover my grave,
This grass is the best covering for the tomb poor in spirit.
The humble, the transitory Jahanara,
The disciple of the holy men of Chisht,
The daughter of the Emperor Shahajahan."
Rambles and recollections Vol I, p. 169.

prosper, and to keep him in the affection of his father ; or she supported him in all things, and advertised him of all occurrences: yet that was not so much, because he was the eldest son, and she the eldest daughter (as the people believed) as because he had promissed her, that as soon as he should come to the crown, he would marry her ; which is altogether extraordinary, and almost never practised in Indostan. * * * * Now it is reported that this princess found means to let a young gallant enter the seraglis, who was of no great quality, but proper, and of good mean. But among such a number of jealous and envious persons she could not carry on her business so prively, but she was discovered Chah Jehan, her father, was soon advertised of it, and resolved to surprise her, under the pretence of giving her a visit, as he used to do. The princess seeing him come unexpected, had no more time than to hide this unfortunate lover in one of the great chandrons made to bathe in ; which yet could not be so done, but that Chah Jehan suspected it. Meanwhile he quarrelled not with his daughter, but entertained her a pretty while, as he was wont to do ; and at length told her, that he found her in a careless and a less neat posture ; that it was convenient she should wash herself, and bathe oftner ; commanding presently, with somewhat a stern countenance, that forth with a fire should be made under that chandron, and he would not part thence, before the eunuchs had brought him word, that that unhappy man was despatched. Some time after she took other measures she chose for her *Kane-Saman*, that is her steward, a certain Persian called Nazerkhan, who was a young Omrah, the handsomest and most accomplished of the whole court ; a man of courage and ambition, the darling of all in so much that Chauesta Khan, uncle of Auren-

zebe, proposed to marry him to the princess: but Chah-Jehan received that proposition very ill, and besides, when he was informed of some of the secret intrigues that had been formed, he resolved quickly to rid himself of Nazer-kan. He therefore presented to him, as it were to do him honour, a betel, which he could not refuse to chew presently after the custom of the country. Betel is a little knot made up of very delicate leaves, and some other things, with a little chalk of sea-cockles, which maketh the mouth and lips of a vermillion colour, and the breath sweet and pleasing. This young lord thought of nothing less than being poisoned · he went away from the company very jocend and content, into his palky; but the drug was so strong, that before he could come to his house, he was no more alive."* ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক।

বার্ণিয়ারের লেখা হইতে জাহানারা বা বেগম সাহেবের যে চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না, কাহারও হইবে কি না তাহাই বিশেষ সন্দেহ স্থল। যে মহীয়সী রমণী যৌবনের সুখ-শান্তি ও ধনৈশ্বর্য্যের মায়া ছিন্ন করিয়া পিতার সেবার্থ কারাগারের কঠোর দণ্ড সহ্য করিতেও কুণ্ঠিতা হন নাই, যিনি শেষ জীবনে দরিদ্রের সুখ শান্তি ও দুঃখ মোচনকেই পরম পুণ্যব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে ঈদৃশ কলঙ্ক-কাহিনী যে বার্ণিয়ার কোন্ হিসাবে প্রচার করিলেন তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম। বার্ণিয়ার বোধ হয় ভ্রম ক্রমে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' ফেলিয়াছেন। বিল সাহেব তৎপ্রণীত Oriental Biographical Dictionary" নামক সংগ্রহগ্রন্থে ইঁহাকে যে দেবীরূপে চিত্র করিয়াছেন ইহাই যথার্থ। সুপ্রসিদ্ধ ভোলানাথ চন্দ্রের সহিত আমরাও বলি "Far from the remotest allusion being made to such conduct by Tavernier and Bernier, then living in India, their testimony to her amiable, accomplished, and pious

* Bernier's Travels in Hindustan. p. 11, (Bangabasi series.)

character of a Roman daughter, and in the reputation of a saint, better deserved than by many who have borne the name."

জাহানারার সমাধি আমাদের নিকট এক পুণ্যময় তীর্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই পিতৃভক্তিমতী জাহানারার পুণ্যসমাধির পার্শ্বে অজ্ঞাতে ভক্তিভরে শির নত হইয়া পড়িল। জাহানারার সমাধি দর্শনান্তে আমরা একে একে নিম্নলিখিত সমাধিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলাম।

মির্জা জাহাঙ্গীরের সমাধি—এই সমাধিটী প্রস্তরের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যে পরিশোভিত। মির্জা জাহাঙ্গীর দ্বিতীয় আকবর সাহার পুত্র, অপরিমিত মদ্যপানে ইহার অতি অল্প বয়সেই মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এই সমাধিমন্দির ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

পুরাণ কেল্লা—ইহা হুমায়ুন বাদসাহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর ইহার সে সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই। কিল্লার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যে প্রাচীর ছিল তাহার ধ্বংসাবশেষ ও একটী মাত্র তোরণ অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজমান আছে। প্রাচীরের বহির্দ্দেশে যে পরিখা ছিল, তাহা এখন অতি ক্ষীণ চিহ্নের মত দেখা যাইতেছে। প্রাচীন কিল্লার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে 'কিলা কি না মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ' ও সেরমঞ্জিলই সুপ্রসিদ্ধ। হুমায়ুন রাজ্যপ্রাপ্তির পরেই ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সেরশাহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলে পর সেরশাহ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন। ফিরোজাবাদের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ কেল্লার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানে রাজধানী প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম "দিল্লী সেরশাহী" রাখিয়াছিলেন।

সেরমঞ্জিল—ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই সৌধটীই সের শাহার রাজভবন। এই রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত ত্রিতল হর্ম্মটী সেরশাহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন এই রাজভবন জরাজীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় শেষের সে দিনের শেষ অপেক্ষায় বিরাজমান—সে সৌন্দর্য্যও নাই, সে বিপুল কলেবরও নাই।

আরব কি সরাই—একটী ক্ষুদ্রপল্লী—ইহা হুমায়ুন-পত্নী হামিদাবানু বেগম বা হাজি বেগম কয়েকজন আরবদেশবাসী মোল্লার বাসের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন এস্থানে আর কোনও আরবকে দেখা যায় না, কেবল মাত্র দুইটী সুন্দর তোরণ এককালে যে এস্থানে একটী সুন্দর পল্লী ছিল তাহার প্রমাণার্থ বিরাজিত আছে।

মোকরবা খাঁ খান্না—হুমায়ুনের সমাধির ঠিক্ বহির্ভাগে ইহা অবস্থিত। এই সমাধি-মন্দির বিরাম খাঁর পুত্র আবদুল রহিম খাঁ ওরফে খান্না কর্ত্তৃক তাঁহার পত্নীর সমাধির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাঁহার স্ত্রী সমাধি মন্দির মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত আছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একবিংশ বর্ষে বাহাত্তর বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তুষারধবল মার্ব্বেল প্রস্তরে ও লোহিত প্রস্তরের সম্মিলনে ইহা নির্ম্মিত হওয়ায় এক সময়ে এই সমাধি মন্দিরটী বস্তুতই দর্শন-যোগ্য ছিল, কিন্তু অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা খাঁ ইহার শ্বেত প্রস্তর সমূহ অপহরণ করিয়া লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাওয়ায় এই মন্দিরটীর এখন আর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিদ্যমান নাই। খাঁ খানান একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বাবরের আত্মজীবন চরিত তুর্কী ভাষা হইতে পার্সীতে অনুবাদ করিয়া যাওয়ায় পার্সী সাহিত্যে স্থায়ী নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

বেয়লী বা কূপ—এই কূপটী নিজামুদ্দীনের সমাধির নিকট অবস্থিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে ইহার জলে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ জ্বালাই নিবারিত হয়। এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া নিজামুদ্দীনের মেলা উপলক্ষে বহুলোক এই কূপজলে স্নান করিয়া থাকে।

চৌষাট খাম্বা—এই অতি সুন্দর অট্টালিকাটী নিজামুদ্দীন ও হুমায়ুনের সমাধির মধ্যস্থলে অবস্থিত। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এই অট্টালিকাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া ইহা সহজেই পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গৃহ চৌষাট্টিটী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত বলিয়াই ইহার নাম চৌষাটি খাম্বা হইয়াছে।

নীলভুজ—এই অট্টালিকাটি একজন পাঠান সম্রাট কর্ত্তৃক জনৈক

সৈয়দের সমাধির উপর নির্ম্মিত। পূর্ব্বে এই গৃহটি নীলবর্ণে চিত্রিত ছিল বলিয়া ইহার নাম নীলভুজ হইয়াছে।

লাল বাঙ্গ্‌লো—আকবর সরাই দর্শন করিয়া যখন পুরাণ কিল্লার পথে ফিরিতেছিলাম, তখন আমাদের গাইড এই সমাধিগৃহটি দর্শন করাইয়াছিল। গৃহমধ্যে লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটী সমাধি বিদ্যমান আছে—তাহার মধ্যে বৃহত্তমটি সম্রাট হুমায়ুন কর্ত্তৃক তদীয় এক মহিষীর সমাধির উপরে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যটি বাদশাহ শাহ আলমের পত্নী লাল কুয়রের (Lal Kawur) সমাধির উপরে নির্ম্মিত। লাল কুয়রের নামানুযায়ী ইহার নাম "লাল বাঙ্গালা" হইয়াছে।

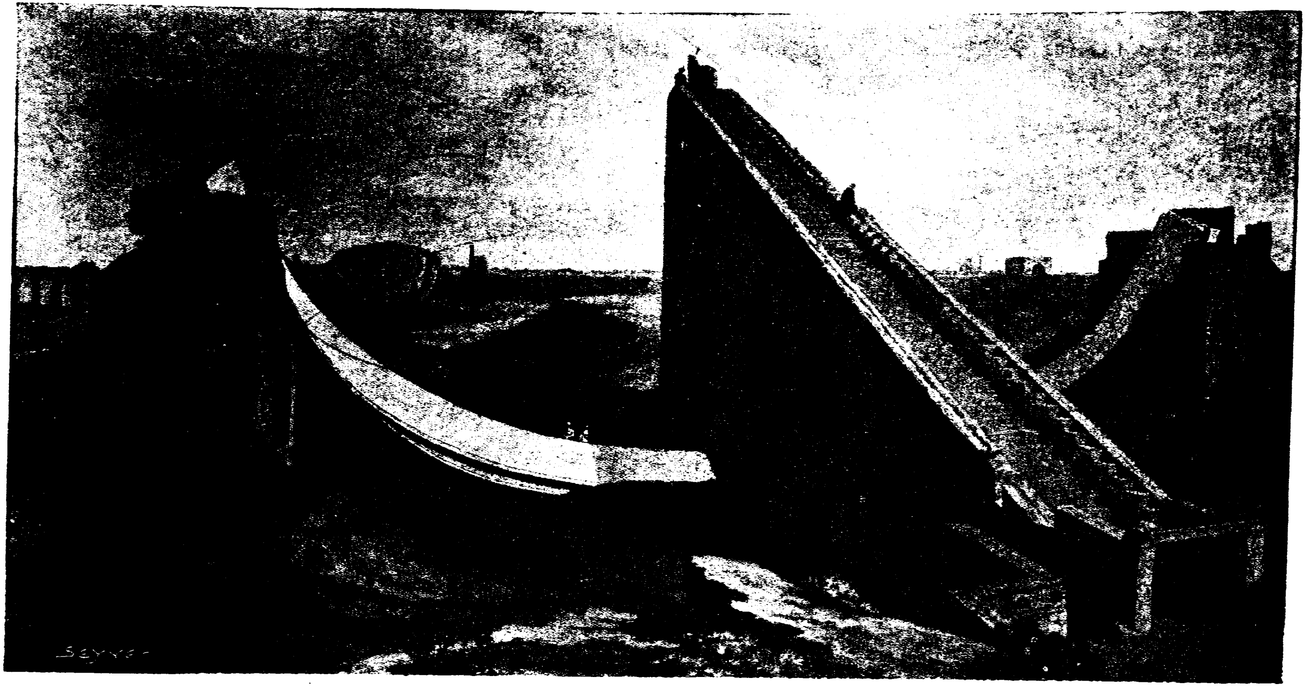
কালামহল—পুরাণা কিল্লার নিকটে ইহা অবস্থিত। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন ইহা ধ্বংসরাজ্যের পথে আপনাকে স্থাপন করিয়াছে। একদিন যে এই অট্টালিকাটি বেশ বড় ছিল—তাহা ইহার ভিত্তি দৃষ্টে সহজেই অনুমান করা যায়। তোরণদ্বারের ভগ্নাংশ সমূহ হইতেই ইহা অনুমিত হয় যে এককালে এই তোরণদ্বার অত্যন্ত সুন্দর ছিল। এ সকল ছাড়া গোরস্থানের চতুর্দ্দিকে আরও দেখিবার বহু সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে। গোরস্থানের চতুর্দ্দিকে সৌম্য শ্মশানের যে ভীষণ দৃশ্য দেদীপ্যমান, তাহা দর্শনে হৃদয়ে এক গম্ভীর শোকের ভাব উদয় হয়। কোথায় সেই ইন্দ্রপ্রস্থ—কোথায় সেই কুরুপাণ্ডব! কোথায় সেই রাজসূয়যজ্ঞের তুমুল কোলাহল? নানা দিগ্দেশাগত রাজন্যবর্গের অপূর্ব্ব সম্মিলন!—শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণের পদধৌতকরা—সে দৃশ্যের কথা মনে করুন! ধর্ম্মের জন্য—রাজ্য-সম্পদ পরিত্যাগ—বনগমন—সে কি এই দেশে এই স্থানে এই নগরেই সম্পাদিত হইয়াছিল? দুর্য্যোধন কি একদিন গর্ব্বিত ভাবে এস্থানের রাজপ্রাসাদে বসিয়াই বলিয়াছিলেন—"সূচ্যগ্র ভূমিও পাণ্ডবকে দিব না।" ভীষ্মের ভীষণ ধনুকটঙ্কারে—দ্রোণের অপূর্ব্ব নিপুণতায় কর্ণের অপূর্ব্ব ধৈর্য্যে—যখন কুরুক্ষেত্রে রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল—সেই এক দিন আর এই এক দিন! পাণ্ডবগণের বীরত্বে দুর্য্যোধনাদির পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় সংস্থাপিত হইয়া যে ধর্ম্মরাজ্য ভারতবক্ষে স্থাপিত হইয়াছিল—তাহার শেষ

স্মৃতি—শেষ চিহ্ন, এখন কেবলমাত্র ধ্বংসপুরী ইন্দ্রপ্রস্থের অণু পরমাণু ব্যতীত আর কোথাও দেদীপ্যমান নাই। মহাভারতের অক্ষরে অক্ষরে যে মহান্ কীর্ত্তিগরিমা গ্রথিত আছে তাহা কালের কি সাধ্য আছে যে মুছিয়া ফেলিতে পারে ?”

তগা খাঁর সমাধি-সৌধ—চৌষাট খাম্বার সন্নিকটে লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত এই সমাধিটি অবস্থিত। এই মন্দির মধ্যে তগা খাঁ মৃত্যুর শীতল-ক্রোড়ে শায়িত। শিশু আকবরকে দুগ্ধ পান করাইতেন বলিয়া ইঁহার নাম “তগা খাঁ” হয়—কিন্তু ইঁহার প্রকৃত নাম সমসুদ্দিন মহম্মদ খাঁ। আকবরের রাজত্ব সময়ে ইনি বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সম্রাট আকবরের ধাত্রীমাতার পুত্র আদম খাঁ বিদ্বেষ পরবশ হইয়া, ইনি যখন নমাজ পড়িতেছিলেন তখন হত্যা করে। (১৬৫১ খ্রীঃ অঃ) তগা খাঁর পুত্র ককুলতান খাঁ এই সমাধি-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তগা খাঁর সমাধি দর্শনান্তে আমরা কুতব মিনার দর্শন করিবার উদ্দেশে শকটারোহণে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের দিল্লীর ‘গাইড’ বদরীদাস, যাইতে যাইতে পথের মধ্যে একস্থানে গাড়ী থামাইয়া লোদীবংশীয় রাজন্যবর্গের কয়েকটি কবর—হর্ম্ম্য দেখাইল। এই হর্ম্ম্য চারিটী ও একটী মসজিদ ঠিক্ মাঠের মধ্যে অবস্থিত।

সব্‌দরজঙ্গের সমাধি-বাটিকা—এস্থানে সম্রাট আহামদ সাহের মন্ত্রী অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি মনসুর খাঁ সব্‌দরজঙ্গ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। মোগল সম্রাটের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইঁহাদের বংশধরগণকে রাজোপাধিতে বিভূষিত করিলেও দিল্লীর মুসলমানগণ ইঁহাদিগকে উজীর বলিয়াই সম্বোধন করে। নবাব সুজাউদ্দৌলা এই সমাধি-বাটিকা তদীয় জনকের সমাধির উপরে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সমাধি সৌধটি প্রায় ৩৫০ ফুট সমচতুষ্কোণ বৃক্ষাদিপূর্ণ উদ্যানের মধ্যে একটী উচ্চ বেদীর উপরে বিরাজিত। ইহার প্রত্যেক কোণে এক একটী দ্বিতল মিনার ; ছাদের মধ্যভাগে একটী সুশোভন গুম্বজ। লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর মধ্যে স্থানে স্থানে মর্ম্মর প্রস্তরের খিলান থাকায় দেখিতে বেশ সুন্দর বোধ হয়। প্রতিধারেই খিলান বিশিষ্ট প্রবেশের



মানমন্দির—দিল্লী।
(শতবর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত)।

রাস্তা আছে। গৃহের ঠিক মধ্যস্থলে একটী সুন্দর মর্ম্মর শবাধার—ইহা জওয়াব কবর ব্যতীত আর কিছুই নহে, প্রকৃত কবর মৃত্তিকা নির্ম্মিত এবং নিম্নস্থ একটী কুঠরীতে বস্ত্রাচ্ছাদিত রূপে দেখিলাম। এই আচ্ছাদন বস্ত্রের উপর প্রতি দিনই পুষ্পবর্ষিত হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর ঈদৃশ ভাবে পুষ্প বর্ষণ অতি সুন্দর ভাবজ্ঞাপক, ইহাদ্বারা মৃতব্যক্তির প্রতি আত্মীয় স্বজনের ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিকাশ হয়। জগতে ফুলের অপেক্ষা সুন্দর ও ক্ষণস্থায়ী আর কি আছে? এত শোভা ও এত ক্ষণস্থায়ীত্ব আর কার? হায়! মানুষও কি তাই নয়? দেখিতে দেখিতে জীবন-দীপ নিবিয়া যায়—দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে হাহাকার জাগিয়া ওঠে!

চিকি।

এখান হইতে অশ্ব-শকট যতই কুতবমিনারের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, ততই দূরে বামদিকে প্রাচীন স্থানের শত শত স্মৃতি চিহ্ন দর্শন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রাচীন দুর্গ, মস্‌জিদ, প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে বিরাজমান। এক সময়ে যে দুর্গ দৃঢ়তার সহিত শত্রুর আক্রমণ উপেক্ষা করিত এখন তাহা বিলুপ্তপ্রায়। দুর্গের ভিত্তি যে এক সময়ে বিশেষ দৃঢ় ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মস্‌জিদটী একটী উচ্চভূমির উপরে স্থাপিত। ইহা আকৃতিতে সমচতুষ্কোণ, দ্বিতল এবং প্রতি কোণে কোণে এক একটী ৫০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ বিদ্যমান। মস্‌জিদের উপরিভাগে ৮-টী নানা কারুকার্য্য-খচিত অলঙ্কৃত সুদৃঢ় গম্বুজ। এই বৃহৎ মস্‌জিদের নিম্নতলে ১০৪টী কুঠরী আছে—প্রত্যেকটী প্রকোষ্ঠ ৯ ফুট সমচতুষ্কোণ—ইহা ছাড়া প্রতি দ্বারের নীচেও এক একটী কুঠরী আছে এবং প্রতি স্তম্ভের নীচেও এক একটী কুঠরী আছে। উর্দ্ধতলে আরোহণ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে এক একটী পথ আছে, সে সকল পথের মধ্যে এখন কেবল উত্তর দিকেরটীই খোলা দেখিলাম। এই অট্টালিকাটি পাটলবর্ণের গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হওয়ায় কেমন যেন একটা মৌন গাম্ভীর্য্য—কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া ইহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিরাজিত রহিয়াছে।

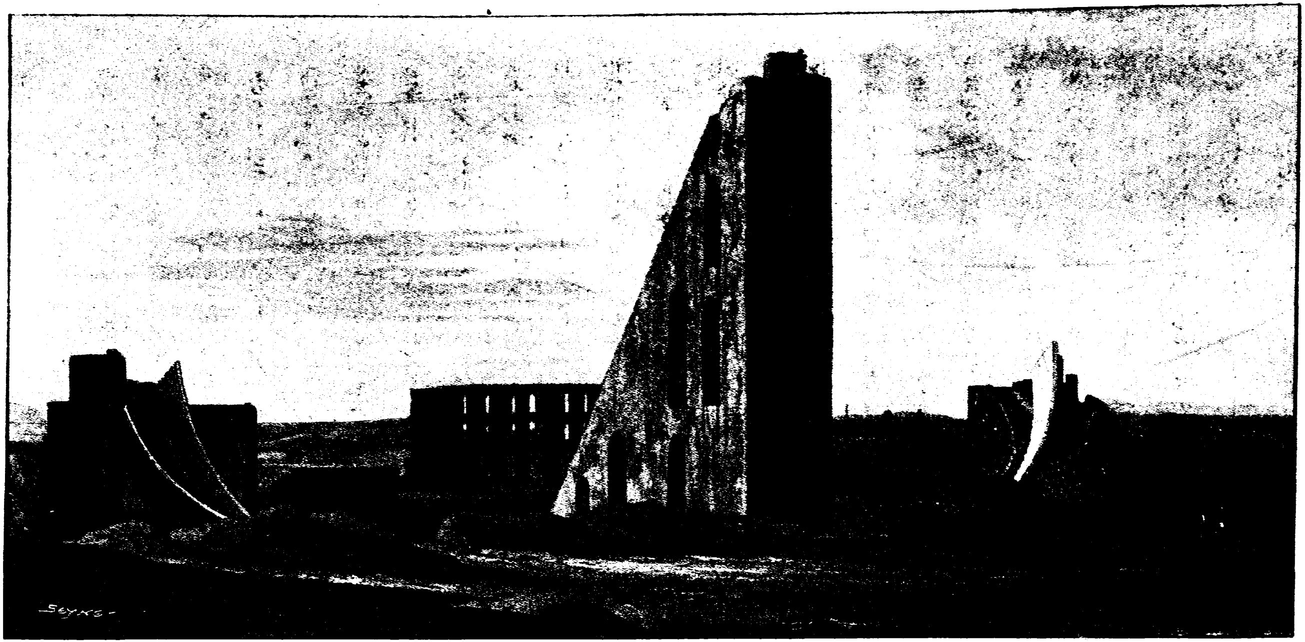
চিকি হইতে প্রায় একমাইল দূরে বেগমপুর অবস্থিত, এখানে পাঠান-স্থাপত্যের বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ফিরোজ সাহার

নির্ম্মিত চতুষ্কোণ ভগ্নস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ এখানে দর্শন করিলাম। ক্রমশঃ আমাদের অশ্বশকট কুতব মিনারের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা বর্ত্তমান দিল্লী নগরী হইতে এগার মাইল দূরে অবস্থিত।

কুতব মিনার।

সাহাজাহানাবাদ হইতেই কুতবের দৃশ্য আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়াছিল, এখন নয়ন সমক্ষে এই অভ্রভেদী স্তম্ভ দর্শনে অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিলাম। কুতবের চতুর্দ্দিকে প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে বিরাজিত। ভারতবর্ষের আর কোথাও এইরূপ উচ্চ স্তম্ভ বিদ্যমান নাই। কেহ কেহ ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভুল। ইহা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে। পাঁচটী সুদৃঢ় প্রচুর কারু-কার্য্য বিভূষিত ঝুলান বারান্দা দ্বারা ইহা পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত। এমনি সুকৌশলে এই বিরাট স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে যে, নিম্নভূমি হইতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহাকে স্বাভাবিক উচ্চতা অপেক্ষাও অধিকতর উচ্চ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার প্রথম দুই খণ্ড লোহিত প্রস্তরের ও পরের দুইখণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা সুগঠিত।

কুতব মিনারের উচ্চতা ২৪২ ফিট, নিম্নভাগের বেড় ১০৬ ফিট। কুতবের মধ্যভাগ ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত। মিনারের তিনখণ্ডের গাত্রে লম্বভাবে গভীর খাঁজকাটা—খাঁজগুলি আবার এক এক খণ্ডে এক এক প্রকারের। প্রথম খণ্ডের যে খাঁজগুলি আছে উহা অর্দ্ধবৃত্তাকার, পরেরটি সকোণ—দ্বিতীয় খণ্ডের খাঁজগুলি সমুদয়ই অর্দ্ধবৃত্তাকার এবং তৃতীয় খণ্ডের খাঁজগুলি সকলই সকোণ, বক্রী দুইখণ্ডের গাত্রে কোনও খাঁজ নাই। কুতবের উপরে উঠিবার ঘুরাণ ফিরান পথে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮০টি সিঁড়ি আছে। আবার সিঁড়ি হইতে বারান্দায় আসিবার জন্য প্রত্যেক তলেই পথ আছে। মিনারের ঊর্দ্ধাংশও শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়—আর উহার বহির্ভাগ খোদিত অক্ষরে চিত্রিত থাকায় দেখিতে অত্যন্ত মনোহর বোধ হয়। নিম্নতলের চারিদিকে ছয়টী চক্রাকার লেখা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের সর্ব্বোপরি যে চক্র আছে তাহাতে কোরাণের বয়ানে সুচিত্রিত। উহার নিম্ন চক্রে আল্লার নিরনব্বই নাম ও তৃতীয় চক্রে মহম্মদ ঘোরীর



মানমন্দিরের—অপর ভাগ।

(শতবর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত)।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

প্রশংসাবাক্য চিত্রিত। চতুর্থ চক্র কোরাণের বয়ানে এবং পঞ্চম চক্র সুলতান মহম্মদবিন মাসের প্রশংসাবাক্যে চিত্রিত।* সর্ব্ব নিম্ন চক্রের লিপিগুলি অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের দ্বারদেশের উপরেও এইরূপ খোদিত লিপি আছে। জেনারেল কানিংহাম ইহার উচ্চতা সম্বন্ধে এইরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথম খণ্ডের উচ্চতা ৯৪ ফুট ১১ইঞ্চি; দ্বিতীয় খণ্ডের ৫০ফুট ৮ইঞ্চি; তৃতীয় খণ্ডের ৪০ ফুট ৯ইঞ্চি; চতুর্থ খণ্ডের ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চি; পঞ্চম খণ্ডের ২২ ফুট ৪ ইঞ্চি; সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৪ ফুট—পূর্ব্বে ইহা আরও ৬০ ফুট উচ্চ ছিল কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে সে অংশটুকু মৃত্তিকামধ্যে প্রথিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় তলের দ্বারদেশে লিখিত আছে যে "সম্রাট আলতামসে"র আদেশানুসারে ইহার কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল। তৃতীয় তলের দ্বারদেশে সম্রাট আলতামসের প্রশংসা-বাদ খোদিত আছে। চতুর্থ-তল বা খণ্ডের দ্বারদেশে লিখিত আছে যে সম্রাট আলতামসের রাজত্বকালে মিনার নির্ম্মাণের আদেশ হয়। পঞ্চম খণ্ডের দ্বারের উপর লিখিত আছে যে বজ্রপাতে মিনার নষ্ট হওয়ায় ৭৭০ হিজারি অর্থাৎ (১৩৬৮ খ্রীঃ অঃ) সম্রাট ফিরোজসাহ কর্ত্তৃক ইহার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। কুতবের ইতিহাস অনুধাবন যোগ্য। এই

কুতবের ইতিহাস।

সুপ্রসিদ্ধ মিনারটি হিন্দুদিগের কি মুসলমানদের নির্ম্মিত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্লিম্যান সাহেব এ সম্বন্ধে বলেন "A foolish notion has prevailed among some people ever fond of paradox, that this tower is in reality a Hindu building, and not, as commonly supposed, a Muhamedan one" হিন্দুদের এ দাবী সম্বন্ধে স্লিম্যান সাহেব যাহাই বলুন না কেন সে

* Around the first story there are five horizontal belts of passages from the Koran, engraved in bold relief, and in the Kufic Character. In the second story there are four, and in the third three. The ascent is by a spiral staircase within, of three hundred and eighty steps ; and there are passages from this staircase to the balconies, with others here and there for the admission of light and air.

Rambles and recollections P. 149 Vol. II.

সম্বন্ধেও কোনরূপ প্রমাণ কিংবা জনরব না থাকিলে কখনই এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত হইতে পারিত না। প্রথমতঃ ইহার দ্বারদেশ উত্তরদিকে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় আকবর সাহার সভাসদ সৈয়দ মহম্মদ নামক জনৈক মুন্সী লিখিয়াছেন যে "কোনও হিন্দু নরপতি তদীয় কন্যার প্রতিদিন যমুনা দর্শনের সুবিধার জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" যদি তাহাই হয় তাহা হইলেও কুতবের অবস্থা দৃষ্টে এবং মুসলমান শিল্পীগণের কারু-কার্য্যাদি দর্শনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মুসলমানগণের হস্তেই ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। কুতবমিনারের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস যতটা জানিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় যে ইহা ১২০০ খ্রীঃ অব্দে বা প্রায় তৎকালে আরব্ধ হইয়া ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সামসউদ্দীন আলতামস কর্ত্তৃক পরিসমাপ্তি হয়। মিঃ বেগলার সাহেব আর্কিয়লজিকেল সার্ভের এক বার্ষিক বিবরণে কুতবকে হিন্দু-নির্ম্মিত বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার গাত্রস্থ অলঙ্কার সমূহের মধ্যে হিন্দু শিল্পিগণের ভাবনৈপুণ্য ও হিন্দুরীতি অনুযায়ী নির্ম্মিত বলিয়া কেহ কেহ বলেন যে কুতবের প্রধান শিল্পী মুসলমান ছিলেন এবং অন্যান্য শিল্পিগণ হিন্দু ছিলেন কাজেই হিন্দুভাবের আধিক্য ইহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চিতোরের জয়স্তম্ভ বা (Tower of victory) ব্যতীত ভারতের আর কোথাও এইরূপ বিরাট স্তম্ভ দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে যে প্রায় ২৭টী ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু-মন্দিরের উপাদান লইয়া কুতব মিনার নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় ৬০০ বৎসর হইল কুতব এমনি করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। সে অতীতের কত কি দৃশ্য অবলোকন করিয়াছে। কত রণজয়নাদ, কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন তাহার নয়নসমক্ষে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সে তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। কত দেশের কত জাতির কত বিভিন্ন শ্রেণীর পরিব্রাজক ইহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল, কত কবি, কত চিত্রকর নিজ নিজ কবিতায় নিজ নিজ চিত্রে ইহার মহিমান্বিত গৌরব-ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এখন তাহারা কোথায়? কালসাগরের তরঙ্গাঘাতে সে সমুদয় বিলীন হইয়া গিয়াছে। অসির ঝনঝনায় কামানের ভৈরবগর্জ্জনে লেলিহান জিহ্বা প্রসারণ করিয়া দিল্লীতে যখন



আকবরের দরবার

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

অট্টহাসিনী রণরঙ্গিণী সমরে নর্ত্তন করিয়াছিলেন সেদিন এখন কোথায়? কুতবের পদতলে বসিয়া তাহার ঐ গগনভেদী শুভ্রমস্তকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার মন সুদূর অতীতের কোন্ অজ্ঞাতে স্বপ্নরাজ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল তাহা আর খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এখনত আর কোন মুসলমান সন্ধ্যায় ইহার উপর হইতে উচ্চে প্রার্থনার আহ্বান করে না? এখনত আর কোনও রাজকন্যা যমুনা-দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদে ইহার মস্তকোপরি আরোহণ করে না! চারিদিকের ধ্বংসের মধ্যে কুতব বজ্রাহত তরুর ন্যায় কালের দারুণ কষাঘাত সহিয়া এখনও অটল দেহে দাঁড়াইয়া আছে।

কুতবের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলী মন মুগ্ধ করিতেছিল। দূরে সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বল নীলবসনা যমুনাসুন্দরী রজতরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল—আর চতুর্দ্দিকের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া সৌধশ্রেণীর পর সৌধশ্রেণী তারপরে সৌধশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া দিল্লীর নাগরিক সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে বড়ই ক্লেশ বোধ হইয়াছিল, প্রত্যেক তলে উঠিয়াই আমরা বিশ্রাম করিয়া লইয়াছিলাম। উপরে বহুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম, মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ আসিয়া আমাদের পরিশ্রান্ত কপোলদেশে স্নেহময়ী জননীর স্নেহাশীর্ব্বাদের মত সুকোমল ভাবে বীজন করিতেছিল। চারিদিকে রৌদ্রের প্রখর কিরণ, তার মধ্যে কি এক শীতলতা! কি এক শান্ত ও উদার সৌন্দর্য্য!

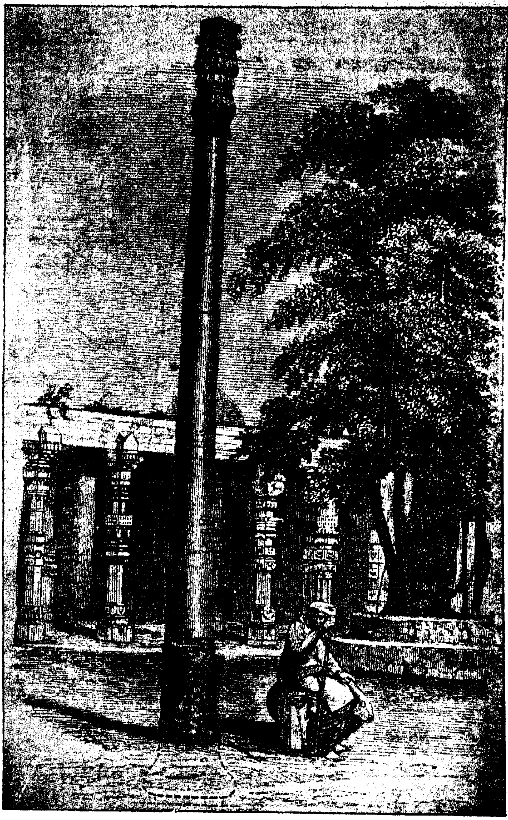
মস্‌জিদ কুয়তুল ইস্‌লাম।

কুতবের নিম্নে এবং তাহার অতি নিকটে আর একটী মিনারের ভিত্তি দর্শন করিলাম। ইহার ভিত্তি কুতবের ভিত্তির প্রায় দ্বিগুণ হইবে। প্রচলিত হিন্দু জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে পৃথ্বিরাজ স্বীয় কন্যার গঙ্গা সন্দর্শনার্থ ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানের আক্রমণে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মুসলমানেরা বলেন যে ইহাও আলাউদ্দীন কর্তৃকই নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয় কিন্তু তিনি পীড়িতাবস্থায় পতিত হওয়ায় তাহা আর শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মিনারের পাদদেশে "মস্‌জিদ কুয়তুল ইস্‌লাম। অর্থাৎ

ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বর্দ্ধক এই ভজনালয়টি অবস্থিত। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল ও গঠন নৈপুণ্যাদি ভারতের কোনও শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা হইতেই ন্যূন নহে। এই মস্‌জিদের সম্মুখভাগের প্রাচীরের বেধ প্রায় ৮ ফুট, উহাতে সাতটী বৃহৎ খিলান পথ—মধ্যের খিলান ২২ ফুট, প্রশস্ত এবং উচ্চতায় প্রায় ৫৩ ফুট, হইবে। আর উভয়দিকের খিলান কয়েকটির প্রত্যেকে ১০ ফুট প্রশস্ত এবং ২৪ ফুট উচ্চ। পাঁচ সারি দীর্ঘতম এবং অত্যুৎকৃষ্ট নানাবিধ খোদাই পূর্ণ হিন্দু স্তম্ভ এই গৃহের ছাদ রক্ষা করিতেছে। এই সুন্দর মস্‌জিদের সম্মুখভাগ ১৪৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৯৬ ফুট প্রশস্ত একটী প্রাঙ্গণ দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে বিস্তৃত, ইহার প্রস্থের দিক দুই সমভাগে বিভক্ত। পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলেই দিল্লীর বিখ্যাত "লৌহস্তম্ভ"। লৌহস্তম্ভের চারিদিকে *নানাবিধ কারুকার্য্য পরিপূর্ণ বহু হিন্দুস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম।*

কুতব মিনারের উত্তর পশ্চিম দিকে সুলতান আলটামসের সমাধি অবস্থিত। এই সমাধি মন্দির ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সামসুদ্দীন আলটামসের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান রৌকিউদ্দীন ও তাঁহার কন্যা সাম্রাজ্ঞী রিজিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমাধি-মন্দিরের উপরে কোনও ছাদ নাই, পাছে ছাদে বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া মৃতের আত্মা স্বর্গে গমন করিতে না পারে তদুদ্দেশ্যেই ইহার ছাদ নির্ম্মিত হয় নাই। এই সমাধিমন্দিরের নিকটে কয়েকটা বৃহৎ কূপ দৃষ্ট হয়, এ সকল কূপের মধ্যে বৃহত্তমটি দ্বিতীয় অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। লৌহস্তম্ভ সম্বন্ধে এখন আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। 'দিল্লীর' নামোৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা প্রথমেই ইহার সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই স্তম্ভটি নরম পেটা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার শিরোভাগ বৌদ্ধ অনুশাসন সমূহের স্তম্ভের শিরোভাগের ন্যায় পল কাটা। উপরে একটী গর্ত্ত আছে,—বোধ হয় কোনওরূপ মূর্ত্তি স্থাপনোদ্দেশ্যেই ঐরূপ গর্ত্ত করা হইয়াছিল,—কিংবা হয়ত ইহার উপরে কোনও রূপ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, পরে মুসলমান রাজগণের অত্যাচারে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। ফার্গুসন সাহেব এই অদ্ভুত স্তম্ভটি দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া

আলটামসের সমাধি।



দিল্লীর লৌহস্তম্ভ।

লিখিয়াছেন "Taking A. D. 400 as a mean date—and it certainly is not far from the truth—it opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been forged even in Europe up to a very late

date, and not frequently even now. * * * It is almost equally starting to find that, after an exposure to wind and rain for fourteen centuries, it is unrusted, and the capital and inscription are as clear and as sharp now as when put up fourteen centuries ago."

(History of the Eastern and Indian Architecture P. 568).

এই স্তম্ভের অপূর্ব্বত্ব সম্বন্ধে ফার্গুসন সাহেবের এই মন্তব্যের অধিক আর বলিবার কি আছে। যখন সুসভ্য ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দেরা এমন ভাবে লৌহদণ্ড নির্ম্মাণ করিতে জানিত না—তখনও হিন্দুগণ এইরূপ বৃহদাকার সুন্দর লৌহদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। * * আর এও কি কম আশ্চর্য্যের বিষয় যে ১৪০০ চৌদ্দশত বৎসরের ঝড় বৃষ্টি সহিয়াও ইহা এখন অকলঙ্ক রহিয়াছে! শিরোভাগের পল গুলি এবং গাত্রস্থ লিপি উভয়ই এখন নূতনের ন্যায় সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ রহিয়াছে। হায়! ভারতে ছিল সবই কিন্তু কালবশে সকলই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সে গৌরব—সে প্রতিভা—সে বিদ্যা সে মহত্ব সমুদয়ই এখন ধ্বংসের পথে গমন করিয়াছে।

আলাউদ্দীন দুর্গ ও আলাই দরজা।

আলাউদ্দীন দুর্গ ও আলাই দরজা এই দুইটী কুতবমিনারের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত। আলাই দরওয়াজাটি প্রায় ৫৬॥ ফুট সমচতুষ্কোণ; প্রাচীরের বেধ প্রায় ১১ ফুট প্রত্যেক পার্শ্বেই অশ্বখুরের খিলানানুযায়ী উচ্চ প্রবেশের পথ আছে। এই দরোজার অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে কানিংহাম অতি সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার মতে পাঠান স্থপতি-কার্য্যের সমগ্র আদর্শের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। প্রবেশের পথ তিনটীর ঊর্দ্ধদেশে আরবীয় অক্ষরে আলাউদ্দীনের সেকেন্দর সানি উপাধি সম্বলিত নাম এবং কাল ৭১০ হিজরি (১৩১০ খৃষ্টাব্দ) পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে। এই দরজার অপর পার্শ্বে আলাউদ্দীনের প্রাচীন দুর্গের ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান। একদিন এই দুর্গ অত্যন্ত বিশাল ও সুদৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত ছিল। আলাউদ্দীন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির নরপতি ছিলেন ইনি নিরক্ষর ও নৃশংস উভয়ই ছিলেন।

আলাই দরজা দর্শনান্তে আমরা আদমখাঁর সমাধি-মন্দির দর্শন করিলাম। আলাই দরজার পূর্ব্ব পার্শ্বে আদম খাঁর সমাধি অবস্থিত।

আদমখাঁর সমাধি।

এই উদ্ধত সেনাপতিই তগাখাঁকে বিদ্বেষ বশতঃ হত্যা করিয়াছিল। সমগ্র মন্দিরটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ঊর্দ্ধে একটী সুন্দর গুম্বজ, আর চারিদিকে অষ্টভুজ সুন্দর বারান্দা। এই মন্দিরের সোপান শ্রেণী অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের সহিত বিরচিত; অর্থাৎ ইহার যে সিঁড়ি উপরের দিকে গিয়াছে তাহা ধরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে নিম্নে নামিতে হয়, আর নিম্নাভিমুখে যে সিঁড়ি গিয়াছে তাহা ধরিয়া নামিতে আরম্ভ করিলে উপরে উঠিতে হয়। এই কৌতূহলজনক ভ্রমের জন্য ইহা "ভুলভুলিয়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখন এই সমাধি-ভবন বিশ্রামাগাররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এস্থানে বিশ্রাম করিতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে উজীর সামসুদ্দীনকে অন্যায়রূপে হত্যা করার অপরাধে ইনি দুর্গ-প্রাচীরের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিহত হন। এই সমাধি-মন্দিরের সন্নিকটে সম্রাট আকবরের পালক পিতা মহম্মদ কুলি খাঁর সমাধি দেখিতে পাইলাম। এ সমাধি-মন্দির ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে মেটকাফ্হাউস কহে, কারণ সার চার্লস থিউফিলাস যখন দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন সে সময়ে তিনি এস্থানে বাস করিতেন বলিয়াই ইহার নাম মেটকাফ্ হল বা হাউস হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে বিলাতী হোটেল বলিলেই যথার্থ নামে অভিহিত করা হয়।

কুতব হইতে ফিরিবার পথে প্রাচীন হিন্দু দিল্লী জয়সিংহের যন্ত্র মন্ত্র ও টোগলকাবাদ দর্শন করিয়া আসিলাম। টোগলকাবাদ

টোগলকাবাদ।

১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে টোগলকগাজী কর্ত্তৃক আরম্ভ হইয়া ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইহা একটী গণ্ড শৈলোপরি নির্ম্মিত। কুতব হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩॥০ মাইল হইবে। দুঃখের বিষয় যে তোগলক সাহ এই নগরের নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কার্য্যারম্ভের এক বৎসর পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নগর প্রাকার দর্শনে অনুমিত হয় যে ইহাও বর্ত্তমান দিল্লীর

মতই বৃহত্তম ছিল। দেখিবার মধ্যে তোগলকাবাদের দুর্গ সত্য সত্যই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। দুর্গের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বভাগ পরিখা দ্বারা সুবেষ্টিত। ইহার দক্ষিণ প্রান্তে যেদিকে পাহাড় কাটিয়া ফেলিয়া খাড়া করা হইয়াছে তাহারি দক্ষিণধারে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় অবস্থিত। এই সরোবরের সমতল হইতে প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৯০ ফুট হইবে। দুর্গের দক্ষিণাংশে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের দিকে যে একশ্রেণী গুম্বজযুক্ত ছোট ছোট ঘর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ বাস করিত। দুর্গ প্রবেশের নিমিত্ত ত্রয়োদশটী তোরণ, এবং দুর্গাভ্যন্তরস্থ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী দ্বার এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গাভ্যন্তরে সাতটী সরোবর এবং তোগলক সাহের সমাধি-মন্দির, জামেমস্‌জিদ, বুজমন্দর প্রভৃতি বহু সৌধমালা বিরাজিত আছে। এ সকলের মধ্যে তোগলক সাহের সমাধি-মন্দিরটী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য এবং একমাত্র প্রধান দর্শনীয় একথা বলিলেও কোনরূপ অত্যুক্তি হয় না। আমরা প্রথমে তাহার বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিলাম। তোগলক সাহার সমাধি-মন্দির তাঁহার পুত্র মহম্মদ তোগলক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তোগলক সাহার এই সুন্দর সমাধিমন্দিরটী তোগলকাবাদের দক্ষিণদিকের প্রাচীরের বাহিরে সরোবর মধ্যে পঞ্চভুজ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা এবং প্রায় ৬০০ ফুট দীর্ঘ একটী প্রস্তর নির্ম্মিত পুল দ্বারা তীরের সহিত সংলগ্ন। পুলটী ২৭টী খিলানের উপর রক্ষিত। সরোবরের মধ্যে এই সমাধি-মন্দির অবস্থিত থাকায় দেখিতে অত্যন্ত মনোহর বোধ হয়। কবরের মন্দিরের বহির্ভাগ দৃঢ় অথচ মনোহর। ম্লান অথচ উজ্জ্বল কেমন যেন এক সৌন্দর্য্য ইহার সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত। মন্দিরের মধ্যে তিনটী কবর, একটীতে তোগলক সাহ নিজে বসুন্ধরার স্নেহময় কোলে চিরনিদ্রিত, আর একটী তদীয় মহিষী মখদুমে জাঁহা অর্থাৎ জগন্মান্যা, তৃতীয়টীতে তোগলক সাহার পুত্র মহম্মদ সাহ পিতামাতার স্নেহময় কোলে নিদ্রিত রহিয়াছেন। এক সময়ে এই সমাধিত্রয় শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে পরিশোভিত ছিল, কিন্তু এখন তাহা দেখিতে পাইলাম না। সমাধি-মন্দিরের উপরিস্থিত শ্বেতমর্ম্মরের বৃহৎ গম্বুজটী



আবুজাকার সেরাজুদ্দীন বাহাদুর সা দিল্লীর শেষ বাদশা ও বিবি জিন্নত মহেল।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সূর্য্যালোকে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছিল, আর তাহার ধবল ছবি সরোবরের নির্ম্মল সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বড়ই মনোহর দেখাইতেছিল। মানবজীবনের একি বিচিত্রতা! চারিদিকে মৃত্যুর বিকট গ্রাসের মধ্যে রহিয়াও তাহারা আপন জীবনের প্রতি উদাসীন। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন,

"Death is here and death is there,
Death is busy every where."

এই সুন্দর তুষারধবল গুম্বজটীর বহির্দ্দিকের ব্যাস ৪৪ ফুট, উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট এবং আভ্যন্তরিক ব্যাস ৩৪ ফুট। মন্দিরের সমগ্র উচ্চতা ৮০ ফুট, কারণ মন্দিরের প্রাচীর ৩৮॥০ ফুট উচ্চ, উহার নিম্নের বেধ ১১॥০ ফুট আর ঊর্দ্ধের বেধ ৪ ফুট। গম্বুজের ঊর্দ্ধে লোহিত প্রস্তরের টোপর ও তদূর্দ্ধে চূড়া থাকায় দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হয়। যে মহম্মদ সাহ তোগলক জীবনে নানাবিধ নির্ম্মম ও পৈশাচিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া জনসাধারণের নিকট কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়া গিয়াছেন, যাঁহার অত্যাচার অবিচার সহিয়া লোকে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুকামনা করিত, সেই গুরুতর পাপী মহম্মদ তোগলক সাহ আজ কোথায়? কোথায় তাহার সেই দম্ভ? কোথায় তাহার সেই নিষ্ঠুরতা? তিনি আজ মৃত্যুর কবলে নিপতিত বটে কিন্তু কই তাহার পাপরাশিত মুছিয়া যায় নাই! লোকে যখন পাপকার্য্যে ব্রতী হয় তখন সে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ভাবে না যে মৃত্যুর বিকট গ্রাস তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, যদি তাহা ভাবিত, তাহা হইলে বুঝি পৃথিবী হইতে পাপ নাম উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে বুঝি জগতে নৃশংসতা বলিয়া কিছুই থাকিত না। মহম্মদ তোগলক আজ তুমি কোথায়? কই এখনত তোমার সেই নামের বিভীষিকা নাই, কেহইত আর তোমার নামে ভীত নহে। হায়!

"Imperious Caesar, dead, and turn'd to clay,
Might stop a hole to keep the wind away:
Oh, that the earth which kept the world in awe,
Should patch a wall to expel the winter flow!"

কথিত আছে যে মহম্মদ সাহার মৃত্যুর পরে ফিরোজ সাহ তোগলক সম্রাট হইয়া মহম্মদের পাপরাশি ক্ষালনার্থ তাহার উৎপীড়নে মৃত ব্যক্তির বংশধরগণকে বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া এবং সাধু ও পণ্ডিতবর্গের স্বাক্ষরযুক্ত ও মোহর সম্বলিত এক মার্জ্জনা পত্র একটী বাক্সে পুরিয়া মহম্মদ তোগলকের সমাধির গর্ত্তে নিহিত করিয়াছিলেন। দিল্লীতে আমাদের বর্ণিত স্থান সমূহ ছাড়া আরও বহু দেখিবার আছে, আমরা সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া এখানে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম। হাজার সতুন, আদিলাবাদ, মন্দিরকস্কা, রোসন চিরাগ, সুলতান বল্লোল লোদির সমাধি, সাতপাল্লা বাঁধ, খিড়কি মস্‌জিদ, দর্গা যুসুফ কোটাল, দর্গা সেখ সলাউদ্দীন, পাঁচবুরুজকাঞ্চন সরাই, নঙ্গর খাঁর সমাধি, বস্তিবাউঁড়ি, খিজিরের গুম্বজ ওকলা, বড় পাল্লা, দরজা মন্দি, দর্গা নিজামুদ্দীন, খিজর খাঁর মস্‌জিদ্, সির মন্দিল, কুশাকশিকার, চৌবুরুজী, ভূভূলিঙ্গ, কোশমিনার, কুশাক সবুজ, ইমাম্‌জামিনের মহম্মদ কুলিখাঁর সমাধি, রাজন-কা-বাইন, মৌলানা জমালের সমাধি ও মস্‌জিদ, গায়সউদ্দীন বল্‌বনের সমাধি, সামসিহৌজ ও তাহার নিকটস্থ মন্দির, দর্গা কুতবউদ্দীন, বখতিয়ার কাফি ও মস্‌জিদ, কিল্লা রায় পিথোরা, হাজিবাবা রোসেবির সমাধি, সুলতান গারির সমাধি, কিস্ত বায়েন্, মহীপালপুর, মাল্‌চা মদিমঞ্জিল, মস্‌জিদ বেগমপুর, তিরহোন্‌জা, পুবারকপুর, কোতোলা সমাধি, বুরুজকাসা হজরত ফতেশা, খয়েরপুরের সমাধি, সেকেন্দর লোদির সমাধি, কদমশরিফী, মহলডুলি ভাতিয়ারী, মস্‌জিদ সরহিন্দি, নিগমবোধ ঘাট, দিল্লী দুর্গের অন্তর্ব্বর্ত্তী সৌধ সমূহ, জমা মস্‌জিদ, জিনৎ উল্ মস্‌জিদ, শরিফউদ্দৌলার মস্‌জিদ, ফতেপুরী মস্‌জিদ, ফক্‌র-উল-মস্‌জিদ, গাজীউদ্দীনের মাদ্রাসা, ঔকপুর, সূর্য্যাকুণ্ড, জাঁহাপানা—ইত্যাদি দিল্লীর অগণন সৌধাবলীর কত নাম করিব? ভারতের ইতিহাস এখানে আপনাকে মূর্ত্তিমানরূপে বিরাজিত রাখিয়াছে। মস্‌জিদে, হর্ম্মে, পথে, মাঠে, সমাধিতে হে পর্য্যটক, যে দিকেই কেন দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না, সে দিকেই দেখিতে পাইবে যে ইতিহাস তোমায় আহ্বান করিতেছে। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ—পৃথ্বিরাজের দিল্লী—টোগলক সাহার টোগলকাবাদ—সাহজাহানের সাহজাহানাবাদ—সকলি দিল্লী এই সাধারণ নামে পথিককে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিল্লী নগরে যে পৈশাচিক লীলাখেলা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসপাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন।

পাঠক! বুড়ো বয়সে এ কেমন ভুল,—'দিল্লীকা লাড্ডুর' কথা বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছি। এ অতি উপাদেয় পদার্থ, যাহার নাম শৈশব হইতেই শুনিয়া শুনিয়া রসনায় জলের সঞ্চার হইত, আজ সেই প্রিয়তম জিনিষটিকে দেখিতে পাইয়া উহার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম এবং যখন উহা ক্রয় করিয়া আস্বাদ করিলাম—সে কথা—সে পস্তানের বিষয় আর উল্লেখ করিয়া উপহসিত হইতে চাহি না। প্রচলিত জন প্রবাদ "দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া ওবি পস্তায়া—যো নেই খায়া ওবি পস্তায়া এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। লাড্ডুর আকার অত্যন্ত বৃহৎ এক পয়সায় একটী করিয়া বিক্রয় হয়, বাহিরে মোয়ার মত—ভিতরে তুষ, করাতের গুড়া ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। দিল্লী নগরী দর্শনান্তে আমরা আজমিরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। দিল্লীতে অপরিচিত বাঙ্গালী পর্য্যটকের থাকিবার কোনওরূপ অসুবিধা নাই, বহু সরাই, হোটেল ও বাঙ্গালী বাবু থাকায় যেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই আদর যত্ন ও সম্বর্দ্ধনা মিলে। দিল্লী ছাড়িতে ছাড়িতে মনে হইল,

এই কি সে প্রাচীনের গৌরব কেতন
সৌধমালা সুশোভিত সুন্দর নগরী,
কোথা সেই ইন্দ্র প্রস্থ? কোথা দুর্য্যোধন,
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির—যার স্বর্ণ পুরী
একদিন দেশে দেশে করিত প্রচার
হিন্দুর বীরত্ব গর্ব্ব—বীর্য্য—অহঙ্কার!
নাই—নাই—কিছু নাই—শুধু দীর্ঘশ্বাস
বাতাস বহিয়া আনে অতীতের কথা,
শ্মশানের চারিদিকে একি অট্টহাস,
কালের ভীষণ মূর্ত্তি—এ কি নশ্বরতা!
পাঠান-মোগল-কোথা? কোথায় নাদির,
হাহাকারে পরিপূর্ণ দিল্লীর গগন,

ছুটিছে নদীর মত তরঙ্গ-রুধির
দলিত মথিত যত পুরবাসিগণ!
এ বুঝিগো! শুধু-স্বপ্ন—অলীক কাহিনী!
চিরজয়ী সময়ের ক্ষণিকের খেলা,
বুদ্বুদ মিশিয়া গেছে—নাহি আর ধ্বনি
বিদ্যুতের হাসি সম মানবের লীলা।

হায়! সত্য সত্যই অতীতের মহিমা-গৌরব-মণ্ডিত, প্রাসাদময়ী দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হৃদয় যেন কেমন শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দিল্লীর প্রতি ধূলিকণায় কতনা ইতিহাস লুক্কায়িত। কবি দিল্লীকে লক্ষ্য করিয়া যথার্থই গাহিয়াছেন;—

"O *Delhi*! My country city of the soul!
The orphans of the heart must turn to thee,
Lone mother of dead empires! and control
In their shut breasts their petty misery.
What are our woes and sufferance? come and see
They cypress, hear the owl, and plod your way
O'er steps of broken thrones and temples, ye
Whose agonies are evils of a day
A world is at our feet as fragile as our clay.

* * * *

The *Pandava's* tomb contains no ashes now;
The very sepulchres lie tenantless
Of their heroic dwellers: dost thou flow,
Old *Jumna* through a marble wilderness?
Rise, with thy *azure* waves, and mantle her distress."

নয়নের জল মুছিতে মুছিতে দিল্লী ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

আজমীর।

দিল্লী হইতে আমরা আজমীর আসিলাম। পর্ব্বতময় বন্ধুর স্থান দিয়া গাড়ী আসিয়া আজমীরে পঁহুছিয়াছিল। রাজপুতানার মধ্যে আজমীর একটী প্রসিদ্ধ স্থান—সমগ্র রাজপুতানার ব্রিটিশ হেড্ কোয়ার্টার বলিয়াও এখানে বহু ইংরেজ রাজপুরুষ বাস করিয়া থাকেন। মহাভারতেও আজমীরের উল্লেখ আছে যথা

"তৈঃ সৎকৃতঃ স চতানাজমীরো যথোচিতং পাণ্ডুপুত্রান্ সমেয়াৎ।

মহাভারত বনপর্ব্ব।

অর্থাৎ আজমীরের রাজা বিদুর পাণ্ডবগণদ্বারা সমাদৃত হইয়া, তাঁহাদিগের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকটই আজমীর তীর্থরূপে পরিগণিত। প্রতি-দিবস ভারতের নানা দেশ হইতে এস্থানে অগণিত যাত্রী সমাগত হইয়া থাকে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এখানকার প্রসিদ্ধদরগা অর্থাৎ মৈনুদ্দীন চিস্তীর সমাধিকে ভক্তির সহিত অবলোকন করিয়া থাকেন। আজমীর রাজপুতানার মাড়বার বিভাগের প্রধান সহর। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যবংশীয় অজমীঢ় রাজা সর্ব্বপ্রথমে এই নগর নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম আজমীর হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে মহাভারতের বনপর্ব্বোল্লিখিত বিদুর রাজারই এই রাজ্য ছিল। পরে কালবশে নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া উহা ধ্বংস হইলে ১৪৫ খ্রীঃ অঃ অজয় পাল নামক জনৈক চৌহান রাজা উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

প্রাচীন ইতিহাস।

আজমীরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা যোগ্য বিবেচনায় আমরা সংক্ষেপে এস্থানে তাহার উল্লেখ করিলাম। আজমীরের চৌহান রাজারা অগ্নিবংশ সম্ভূত, এই বংশের প্রথম নৃপতির নাম অন্হল—ইঁহার অপর নাম অগ্নিপাল। ইনি বিক্রমাব্দেরও ৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই অগ্নিপাল রাজার রাজত্ব সময়েই তুরস্কবাসী তুর্কীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। অগ্নিপালের মৃত্যুর পর ক্রমশঃ

এই বংশে সুবাচমল্ল, গুলনসুর, ধোলারায়, মাণিকরায়, হর্ষ রায়, বীর-বিলন্দু নামক রাজগণ রাজত্ব করেন। গজনীর মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণে আসিলে এই বীর বিলন্দুই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীরবিলন্দুর পরে বিশালদেব, সারঙ্গদেব, অনহ, জয়পাল, অজয়দেব, বিশালদেব প্রভৃতি রাজা হন। তাহার পর আবার নানা অবস্থান্তরের পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর ও মাড়বার ইংরেজ-রাজের হস্তগত হইয়াছে।

আজমীর ষ্টেসনে নামিবামাত্রই একজন মুসলমান ছুটিয়া আসিয়া আমাদের হস্তে একটী পুষ্প প্রদান করিল,—ইহারা পাণ্ডা। হিন্দুতীর্থে যেমন পাণ্ডাঠাকুরেরা যাত্রীদিগকে নিজ নিজ করতলগত করিতে যথাসাধ্য সাধ্যসাধনা, বাক্যব্যয় ও ভীতিপ্রদর্শনাদি করিয়া থাকেন, এখানকার দরগার মুসলমান পাণ্ডারা তদ্রূপ না করিয়া, এই পুষ্প দান করিয়া যাত্রীককে বরণ করিয়া লয়েন। পুষ্প দানের অর্থ এই যে 'আমিই তোমাকে আজমীর দরগার দর্শকরূপে বরণ করিয়া লইলাম, তুমি অন্য কাহারও সহিত আর দরগায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, দেনা-পাওনা ইত্যাদি আমার সঙ্গেই করিতে হইবে, ষ্টেসনে নামিবামাত্রই এইরূপ পুষ্প দানে আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম, পরে আমার পাণ্ডা মহাশয়ের প্রমুখাৎই সমুদয় অবগত হইলাম। বর্ত্তমান আজমীর নগর মোগল-রাজত্বের মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেকালের নগর-সমূহের ন্যায় ইহাও একটী দুর্গবন্ধ সহর, এখনও প্রাচীন পরিখার চিহ্নসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সহরেও পাঁচটী তোরণ আছে—যথা দিল্লী, আগ্রা, মাদার, ঔশ্রী ও ত্রিপলী দরওয়াজা। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ পুষ্কর আজমীরের অনতিদূরে বিরাজিত—

পুষ্কর তীর্থ।

মাত্র সাত মাইল ব্যবধান। পার্ব্বত্য পথে হাঁটিয়া কিংবা একা-আরোহণে তথায় পঁহুছিতে পারা যায়। পার্ব্বত্য পথের পৌরুষ সৌন্দর্য্য ভ্রমণকারীর চিত্ত-সুখ-উৎপাদন করিয়া থাকে। যাত্রিগণ পুষ্কর হ্রদে স্নান করেন। হ্রদে কয়েকটী কুম্ভীর আছে, কিন্তু কোনও যাত্রীর কোনওরূপ অনিষ্ট করিয়াছে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। আজমীর ষ্টেসনেই বহু হিন্দু পাণ্ডার সমাগম হইয়া থাকে, তাহারা সেখান হইতেই যাত্রী-শিকার ধরিয়া আনেন। পুষ্কর তীর্থে অবগাহন করিয়া পরে

যাত্রিগণ ব্রহ্মার মন্দিরে ও সাবিত্রী পাহাড়ে সাবিত্রী ও সরস্বতী দেবীর মন্দিরে তাঁহাদের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। সাবিত্রী পাহাড়টি খুব উচুঁ নহে; পাহাড়ের উপর হইতে কানন-কুন্তলা প্রকৃতি দেবীর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য হৃদয় ও মন বিমোহিত করিয়া ফেলে। অন্যান্য তীর্থ স্থানের সহিত এস্থানেরও বিশেষ পার্থক্য নাই, সেই একঘেয়ে ভাব—যাত্রিগণের গোলমাল—ধূলিধূসরিত পথ, স্বল্প জলপূর্ণ শুষ্কপ্রায় সরোবর, পাণ্ডাদের হৈ-চৈ সবই এক। নানা দেশের নানা শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ ধর্ম্মকামনায় এখানে আগমন করিয়া স্নানতর্পণাদি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা এ স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মার মন্দিরই সর্ব্বাগ্রে দর্শনীয়। আমরা পুষ্করের কথা বলিতে বলিতে আজমীরের কথা ভুলিয়া গিয়াছি।

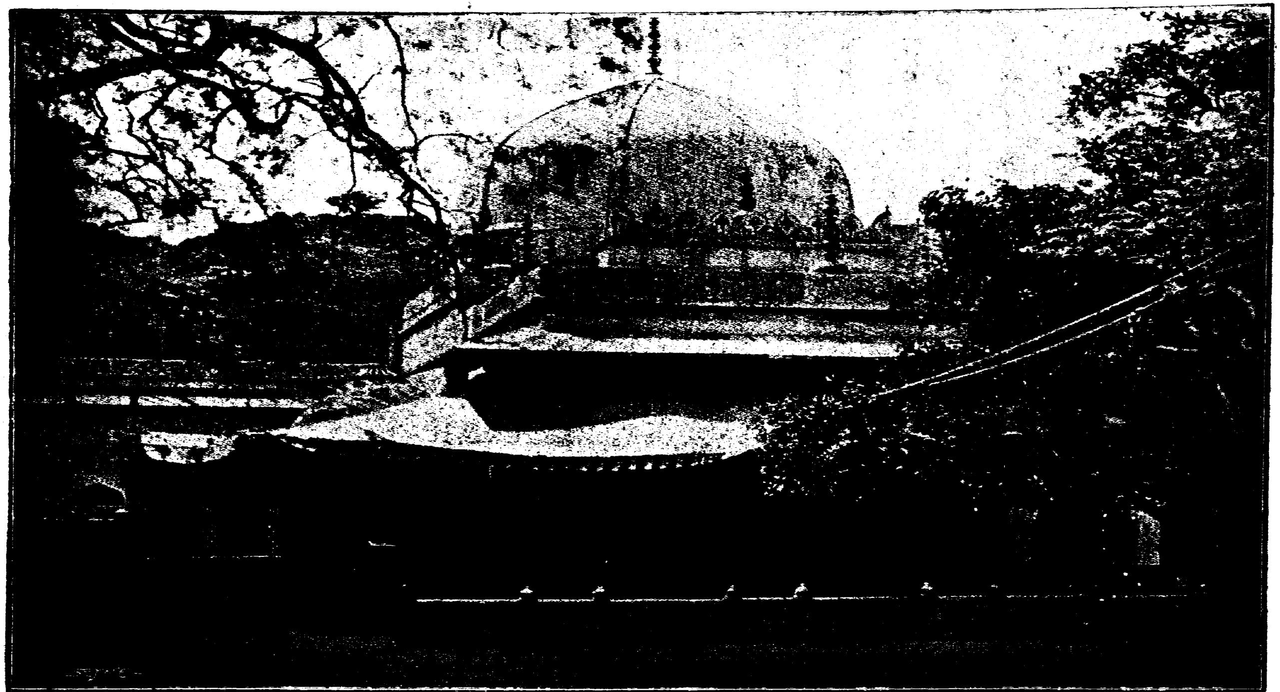
আজমীরে আমরা ঠিকা বাসা ঠিক করিয়া এক দিবস তথায় অবস্থান করিয়াছিলাম। এখানকার সরাইগুলিও খুব সুন্দর। দিল্লী ও আগ্রা ব্যতীত ভারতের আর কোথাও এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সরাই দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এখানকার সরাই ঘর মৃত্তিকানির্ম্মিত নহে, প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা। এক একজন যাত্রীর জন্য এক একটী ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। এইরূপ সুন্দর সুন্দর ঘরগুলির তুলনায় ভাড়াও অতি অল্প, দৈনিক দুই আনা হইতে চারি আনামাত্র। ঘরে জিনিষ-পত্রাদি রক্ষা পূর্ব্বক ভৃত্যকে রাখিয়া কিংবা তালা চাবি লাগাইয়া গেলে কোনওরূপ আশঙ্কার কারণই থাকে না। এক সময়ে আজমীর যে প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তিকলাপ সমূহ দ্বারা ভূষিত ছিল, এখনও তাহার বহু চিহ্ন বিদ্যমান আছে। আজমীরের প্রাচীন নাম ইন্দ্রকোট। নগরের চতুর্দ্দিকে মনোহর পর্ব্বতশ্রেণী শোভমান থাকায় বড়ই সুন্দর দেখায়। এ স্থানে বহু মন্দির ও মস্‌জিদ বিদ্যমান। আমরা সন্ধ্যার সময় আজমীর পঁহুছিয়াছিলাম, রাত্রিতে আর কোথাও বাহির হইলাম না। পরদিন প্রত্যূষে নবোদিত অরুণের লোহিত কিরণ-সম্পাতে যখন চারিদিক হাসিতেছিল—সে সময়ে আমরা নগর দেখিতে বাহির হইলাম। আজমীর সহরটি অতি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহিত ইংরেজরাজের কৃত্রিম শোভা-সম্পদের সংমিশ্রণে ইহা পরম রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছে। সর্ব্ব-

প্রথমে আমরা আড়্ঢাই রোজ্‌কা ঝুপ্‌ড়ি বা ঝম্‌প্রা' নামক মস্‌জিদটি দেখিতে গমন করিলাম। এই মস্‌জিদটী দেখিতে বড়ই সুদৃশ্য। এক সময়ে যে ইহা হিন্দুমন্দির ছিল এবং হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ইহার আভ্যন্তরিক কারুকার্য্যাদি অবলোকন করিলেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। মুসলমানগণও ইহা হিন্দুকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সুলতান আলতামসের রাজত্ব সময়ে ১২০০ খ্রীঃ অব্দে আরব্ধ হইয়া ১২১১-১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু প্রচলিত জনপ্রবাদ এইরূপ যে, আড়াইদিনের মধ্যে এই মস্‌জিদের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হওয়ায় ইহার নাম 'আড়াই দিনকা ঝম্‌প্রা' হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় মুসলমান পাণ্ডা বলিল যে, ইহা চৌহানকুল-ভূষণ পৃথ্বিরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে নাকি প্রত্যহ এস্থান হইতে ১৮০টী ঘণ্টা একসঙ্গে ধ্বনিত হইত, কিন্তু মুসলমানের হস্তে পড়িয়া মস্‌জিদের আকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে। বত্রিশটী কারুকার্য্যময় উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ দ্বারা ছাদটি সুরক্ষিত। মস্‌জিদের দ্বারে ও গাত্রে কোরাণের বহু বয়েৎ আরবী অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ইহার ছাদ এখন ভগ্নপ্রায়। ঝম্‌প্রায় প্রবেশের পথপার্শ্বে একটী কক্ষে বহু সুন্দর সুন্দর খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি অবলোকন করিলাম। এগুলি যে প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আড়াই দিনকা ঝম্‌প্রা।

ঝম্‌প্রার অনতিদূরে সহরের দক্ষিণদিকে মৈনুদ্দীন চিস্তীর দরগা অবস্থিত। এই দরগাটি বৃহৎ ও মনোরম। মোগল সম্রাটগণের মধ্যেও কেহ কেহ ইহার চত্বর মধ্যে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া ইহার শোভাসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। মোগল-কুল-তিলক আকবর ও শাহ্‌যান নির্ম্মিত শ্বেত-প্রস্তরের দুইটী মস্‌জিদ উল্লেখযোগ্য। আঙ্গিনায় প্রবেশের ফটকের উপর সুবৃহৎ দুইটী নহবৎ স্থাপিত আছে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, আকবর শাহ্ চিতোর বিজয়ের পর এই প্রস্তর নির্ম্মিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় নহবৎখানা দুইটী চিতোর রাজপ্রাসাদ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই দরগা হইতে প্রতিদিন ৬০/৭০/ মণ চাউল সিদ্ধ হইয়া দরিদ্রগণকে অন্নদান

মৈনুদ্দীন চিস্তীর দরগা।



আড়াইদিনকা ঝুপ্‌ড়ী—আজমীর।

করা হইয়া থাকে। ফটকের পর এক আঙ্গিনা, তাহা পার হইয়া আসিলেই সম্মুখে নানা কারুকার্য্যময় সমাধিমন্দির পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাধিমন্দিরের দুই পার্শ্বে যে দুইটী ছোট মন্দির আছে, উহার একটী শাহ্‌হান এবং অপরটি ঔরঙ্গজেব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বহুমূল্যদ্রব্যাদিখচিত সমাধিমন্দির ভারতে আর অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। সমাধিস্থলের চারিদিকে রৌপ্যনির্ম্মিত রেলিং; তদূর্দ্ধে জরির কাজ করা পরম সুন্দর চন্দ্রাতপ। সমাধিটি স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা মণ্ডিত। এ স্থানের কপাটগুলি সমুদয়ই রৌপ্যমণ্ডিত। নানাদেশের মুসলমান ভূপতিগণের অকাতর অর্থব্যয়ে ইহা একটী পরম রমণীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর আমরা দুর্গ দেখিতে গমন করিলাম। উহা তারাগড় নামে খ্যাত। এই দুর্গ একটী পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। দুর্গের নামে এখন পাহাড়টিও তারাগড়ের পাহাড় নামে খ্যাত। তারাগড় পাহাড়টি আজমীর নগরীর দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। অজয়পালের সেই অজয় মেরুদুর্গের এখন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেলেও নাম এখনও মানবের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। প্রাচীন দুর্গের চিহ্নের মধ্যে এখন একটী তোরণের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তোরণটি ওমানজী সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। আজমীরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে মেয়ো কলেজ, বাগান, ঘণ্টাস্তম্ভ, দৌলতাবাদ ইত্যাদি বিখ্যাত। মেয়ো-কলেজ রাজপুতানায় রাজকুমারদিগের পাঠের নিমিত্ত। ইহা ছাড়া আর একটী কালেজ আছে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণেই অধ্যয়ন করিতে পারে। দৌলতাবাদ সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি এই পরম সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া বাস করিতেন। প্রাচীন সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইলেও, দৌলতাবাদ বর্ত্তমান সময়েও পর্য্যটকের মনোমুগ্ধ করিয়া থাকে। আজমীরে চারিদিকে নীল পর্ব্বতশ্রেণী সুন্দর তরুলতা পরিশোভিত।

তারাগড় দুর্গ।

আজমীর অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। সহরে জলের কল আছে, খাদ্যদ্রব্য ও ভৃত্য ইত্যাদি অত্যন্ত সুলভ। স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তনেচ্ছু বাঙ্গালীর

পক্ষেও এস্থানটি অত্যন্ত মনোরম। সমুদ্রগর্ভ হইতে আজমীর ৩০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

আনা-সাগর অর্থাৎ 'অন্ন-সাগর'। নগরের পশ্চিমাংশে আনা সাগর নামক একটী বৃহৎ হ্রদ বিরাজিত ইহা—প্রস্থে ১০০ গজ এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০০ গজ হইবে। হ্রদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ পরম রমণীয়। এই পর্ব্বতবেষ্টিত স্বাস্থ্যকর স্থানটি দেখিতেও যেমন সুন্দর, থাকিবার পক্ষেও তদ্রূপ সুবিধাজনক। লোক সংখ্যা প্রায় ৬৮,০০০ হইবে। আমাদের নিকট আজমীর বড়ই ভাল বোধ হইয়াছিল। আজমীর হইতে আমরা চিতোর গমন করিলাম।

চিতোর।

আজমীর হইতে চিতোরে আসিলাম। যখন চিতোরগড় ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে—শীতে কাঁপিতেছিলাম, চারিদিক অন্ধকার, কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না—শুধু অন্ধকারের রাজ্য! চিতোরগড় ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল! ষ্টেসনের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম যে প্রভাত না হইলে নগরে প্রবেশ করা সুবিধা হইবে না। বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ না করিয়া ফার্ষ্টক্লাস Waiting Roomএর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেঞ্চে ঢলিয়া পড়িলাম। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে প্রভাত হইল। প্রভাতের নবীন আলোতে নয়ন সমক্ষে ভগ্ন-দুর্গ-কিরীটিনী চিতোরগড়ের সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়া উঠিল। স্টেসন হইতে চিতোর নগর প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু স্টেসন হইতে বোধ হয় যেন অর্দ্ধ মাইলের অধিক ব্যবধান হইবে না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে দেখিতে চিত্ত ব্যথিত হইয়া গিয়াছিল। ভারতের মানচিত্রে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করিবে, সেদিকেই ধ্বংসের পর ধ্বংস শ্মশানের পর শ্মশান দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। বাল্যকাল হইতে যে চিতোরের বীর-গাথা শুনিয়া আসিয়াছি, যে চিতোরের বীরগণের আত্ম-বিসর্জ্জন-কাহিনী সমগ্র জগৎবাসী বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করে, আজ সেই চিতোরে আমি উপস্থিত! হায়! এই কি সেই চিতোর? একদিন যাহার উদ্ধারের জন্য সহস্র সহস্র রাজপুতবীর মরণকে বরণ করিয়া লইয়াছে, একদিন যাহার কল্যাণের জন্য রাজপুত যোষিদ্বৃন্দ জহরব্রতের আয়োজন করিতে কুন্ঠিত হয় নাই;—সেই চিতোরের পাদ-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে দাঁড়াইয়া আমার কত কথা মনে পড়িল,—মনে পড়িল সেইদিন, যেদিন ঐ গিরিদুর্গে বাস করিয়া রাজপুতবীরগণ দিল্লীর সম্রাট-দিগকেও কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, মনে পড়িল ভুবনমোহিনী পদ্মিনীর কথা, যাহার রূপ-প্রলোভনে সম্রাট আলাউদ্দীন নিজ অস্তিত্ব ভুলিয়াছিলেন—কত বীর, কত বীরাঙ্গনা, কত চারণ, কত বিশ্বাসী মন্ত্রী—ইহার বক্ষে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ইহার প্রাচীন ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, আজ

একে একে তাঁহাদের স্মৃতি আমার হৃদয়কে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। পাঠক! রাণাপ্রতাপের প্রিয় জন্মভূমি এই সেই চিতোর,—সে দেশ প্রেমিক সন্ন্যাসীর-হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আমার হৃদয়ে অনুভব করিলাম। চিতোরের মৃত্তিকায় মাথা ছোঁয়াইয়া নগরের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম।

পর্ব্বত ও ষ্টেসনের মধ্যস্থলে তরঙ্গায়িত বিশাল প্রান্তর,—ষ্টেসন হইতেই পর্ব্বতবক্ষে অবস্থিত দৃঢ় প্রাচারবদ্ধ দুর্গ এবং তাহার সিঁড়িগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরের ও স্তম্ভের উচ্চ শেখরগুলি আমাদিগকে দ্রুত গমনে প্রলুব্ধ করিতেছিল। চিতোর পাহাড়ের নিম্নস্থ এই মাঠটি বিরাট ও বিশাল। পূর্ব্বে এই প্রান্তর মধ্যেই মুসলমান নৃপতিরা তাঁবু গাড়িয়া চিতোর অবরোধ করিতেন। এখনও এখানে যুদ্ধে নিহত মুসলমান সৈন্যগণের সমাধি বিদ্যমান আছে। চিতোর নগর ৫০০ পাঁচশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ে উঠিবার মাত্র একটী পথ, কাজেই সহজে কেহ এই দুর্গ অধিকার করিতে পারিত না। সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাবীর রামচন্দ্রের বংশধর বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাও এই নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য তরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইয়া ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপ বেষ্টিত লোকালয় পার হইয়া ক্রমশঃ আসিয়া দুর্গের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। হৃদয় শোকে দুঃখে হর্ষে বিষাদে স্পন্দিত হইতেছিল। বাদলের জন্মভূমি, কুম্ভরাণার রাজধানী শত শত বীর প্রসবিনী চিতোর নগরী আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত! দেখিলে কাহার মন বিষাদভরে ম্রিয়মাণ না হইয়া থাকিতে পারে? যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়—সেদিকেই ভগ্নাবশেষ—সেদিকেই হাহাকারের তীব্র প্রতিধ্বনি, সেদিকেই হিন্দুর গৌরবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ নেত্রপথে পতিত হয়। চিতোর তুমি কি সেই চিতোর? একদিন যাহার গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষণ সমরানলে রাণা লক্ষ্মণ সিংহ বংশরক্ষার নিমিত্ত একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করিয়া একাদশটি পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন?

গর্ব্বে যাহার উন্নত শির
ছিল এ ভারতভূমি,
এ কি সেই ওগো! চিরগৌরবের
সোণার চিতোর তুমি?

যদি তুমি হিন্দু হও, যদি তুমি প্রাচীন বীর-কাহিনী ভালবাস, তবে একবার এখানে এসে নয়নজল ফেলিয়া যাইও!

বহু দেবালয় ভগ্নমন্দির উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গমূলে পঁহুছিলাম, গেটের পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্র দপ্তর গৃহ, একটী লোক এখান হইতে পর্য্যটকগণকে পাশ দেয়, আমরা তাহার নিকট হইতে পাশ গ্রহণ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলাম। চিতোর নগরের আকৃতি একটী বিশাল আয়ত ক্ষেত্রের ন্যায়, ইহার চারিদিকেই দুর্গসংলগ্ন প্রাচীর। চিতোর নগরের যাহা কিছু দেখিবার সে সকলই পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, যখন ইহার সমৃদ্ধি ছিল তখন রাণারা ইহার উপরিভাগে দুর্গ-প্রাসাদ, মন্দির, দীর্ঘিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করায়ই বোধ হয় এরূপ হইয়াছে। নিম্নস্থ নগরকে 'তলহাটি' কহে। প্রাচীন শিলাফলক ইত্যাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে উক্ত নগর চিত্রকুট এবং পাহাড়ের নাম চিত্রকূটাচল। চিতোরের এই বিখ্যাত দুর্গ নগরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩।৪ মাইল দীর্ঘ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। গড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৭৩৫ গজ ও বিস্তার ৮৩৬ গজ, দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীর কালের কঠোর আক্রমণের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনও অক্ষত দেহে বিদ্যমান। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেক জলাশয় আছে। সর্ব্বোত্তর ভাগের দুর্গ-প্রাচীর ১৭৬১ ফিট ও সর্ব্ব দক্ষিণ ভাগের ১৮১৯ ফিট উচ্চ। দুর্গপথে সাতটী বিরাট এবং সুদৃঢ় দ্বার আছে তাহাদের নাম যথাক্রমে পটলপোল, ভৈরবপোল, হনুমানপোল, গণেশপোল জরলাপোল, লক্ষ্মণপোল ও রামপোল। রামপোলের প্রাচীন শিল্পকলানিপুণতা এখনও কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান আছে। দুর্গ প্রবেশের তিনদিকের তিনটী দ্বারই আবার এ সকলের মধ্যে প্রধান। ঐ সকল দ্বারি পর্য্যন্ত যাইবার জন্য তিনটী পথও রহিয়াছে, তন্মধ্যে আবার পশ্চিম দিকের রাজপথটিই শ্রেষ্ঠ, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে। আমরা প্রথম তোরণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া সম্মুখে একদল সশস্ত্র প্রহরী দেখিলাম,—তাহারা আমাদের নিকট হইতে পাশখানা গ্রহণ করিল। পথগুলি ঢালুভাবে নির্ম্মিত, ক্রমশঃ উপরে উঠিতে হয় স্থানে স্থানে প্রস্তর গঠিত। প্রায় একমাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক তবে দুর্গের শেষ ফটকের নিকট উপনীত হইলাম। পথের দুই

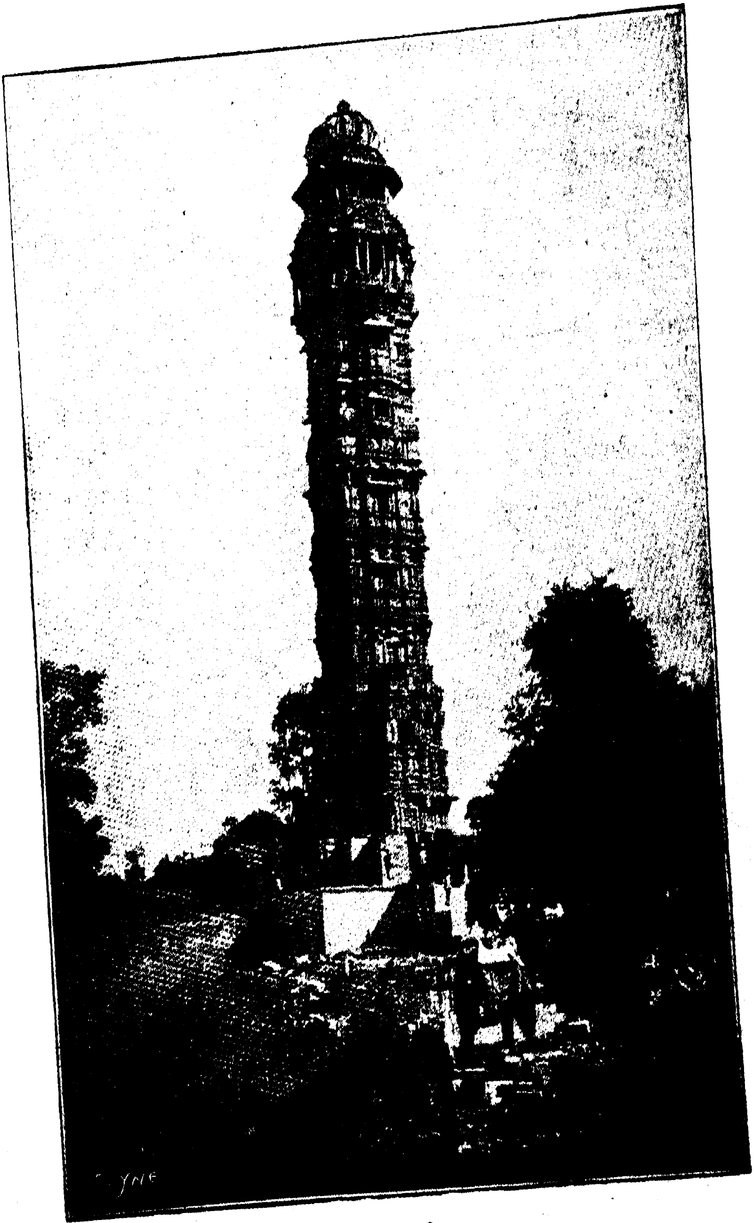
চিতোর দুর্গ।

পার্শ্বে শ্মশানের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছিলাম—দুর্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল স্তূপের পর স্তূপ—ভগ্নস্তূপের রাশি। দুর্গের উপরে জলাভাবের কোনও কষ্ট নাই কারণ উপরে বত্রিশটী সরোবর আছে এবং পর্ব্বত-নিম্নে একটী নির্ঝরিণী প্রবাহিতা থাকায় নগরবাসীর পানীয় নির্ম্মল সলিলের জন্য কোনও অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। আমরা একে একে রাজপ্রাসাদগুলি দর্শন করিলাম। চিতোর গড়ের অবস্থান এতদূর সুন্দর যে বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যেও ইহার গায়ে গোলা বর্ষণ করিতে পারা যায় না। ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাও এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই সকলের বিশ্বাস। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগরে তাঁহার বংশধরগণ বাস করিয়াছিলেন, পরে চিতোর গড় সম্রাট আকবর বাদশাহ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে তৎকালীন রাণা উদয়সিংহ উদয়পুর নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

চিতোরে প্রাচীন দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে কুম্ভরাণার কীর্ত্তিস্তম্ভ, খোবাসিন স্তম্ভ, মোকলজির মন্দির, শিঙ্গার চৌরী প্রভৃতিই প্রধান। নগরের ঠিক্ মধ্যস্থলে রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভটি অবস্থিত। রাণাকুম্ভ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে মালব ও গুর্জ্জরের সুলতান মহম্মদকে পরাজিত করিয়া এই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করেন, এই স্তম্ভ চিতোরের হিন্দুগৌরবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহার উচ্চতা ১২২ ফিট এবং প্রস্থ নিম্নদেশে ৩৫ ফিট ও উর্দ্ধভাগে ১৭॥০ ফিট মাত্র। স্তম্ভটি নবতল। প্রত্যেকতল সুস্পষ্ট এবং চতুর্দ্দিক বাতায়ন সমন্বিত। স্তম্ভের গাত্রে হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি ও নানাবিধ সুন্দর সুন্দর প্রস্তর খোদিত কারুকার্য্য আছে। 'রাজস্থান' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টড সাহেব কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রস্থিত খোদিত শিলালিপি পাঠে ইহা ১৫১৫ সংবতে অর্থাৎ ১৪৫৮ খৃঃ অঃ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, "In Samvat 1515, the temple of Brimba was founded and this year, Vrishpatwar (Thursday), the 10th……on the immoveable chutterkote, this Kheerut Stambha was finished* আবার সুবিখ্যাত

রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ।

* Tod's Rajasthan, Vol. II. p. 657.



বিজয়স্তম্ভ—চিতোর।

শিল্পশাস্ত্রবিৎ ফার্গুসন সাহেবের মতে ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে এই জয়স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। হাণ্টার সাহেবের মতে "The chief object of interest is the Khimt Khumb, the pillar erected in 1450 by Rana Kumbha, to commemorate his defeat of the combined armies of Malwa and Gujrat in 1439,* 'বিশ্বকোষের' নগেন্দ্র বাবুর মতে ১৫০৫ বিক্রম সম্বতে মাঘ মাসে ইহা নির্ম্মিত হয়। নগেন্দ্র বাবু বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগের সহিত এবং যুক্তির সহিত তাঁহার এ মত সমর্থন করিয়াছেন। টড্ সাহেবের মতে এই স্তম্ভ দিল্লীর কুতবমিনার হইতেও শ্রেষ্ঠ। স্তম্ভে উঠিবার সোপানশ্রেণী অতি অপ্রশস্ত এবং দ্বারগুলিও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহার নির্ম্মাণ বিষয়ে চিতোরে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাণাকুম্ভের পত্নী পরম ভক্তিমতী রাজ্ঞী মীরার কথা সকলেই অবগত আছেন। তিনি নানা তীর্থাদি পর্য্যটন করণান্তর পুনরায় চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্বারকা দেখিবার বাসনা করেন, তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য রাণাকুম্ভ ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এজন্য ইহার অপর নাম মীরাবাই স্তম্ভ। এই স্তম্ভের পার্শ্বে একটী ছোট স্তম্ভ আছে তাহার নাম ছোট কীর্ত্তন, এই স্তম্ভ এখন পতনোন্মুখ, পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। পদ্মিনীর প্রাসাদ দেখিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলাম না। যে হ্রদের তীরে ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর প্রাসাদ অবস্থিত

পদ্মিনী প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান।

সেই হ্রদ এখন শুষ্কপ্রায়,—হ্রদের মধ্যস্থলে পদ্মিনীর বিশ্রাম ভবন, সেই ভবনের চতুর্দ্দিকে এখনও অল্প অল্প জল আছে, যখন ইহা গভীর জল পরিপূরিত ছিল তখন ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষ চিত্তহারী বলিয়া বোধ হইত। একদিন যে গৃহ ভুবনমোহিনী পদ্মিনী সুন্দরীর অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত নূপুর-শিঞ্জিত চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইত আজ তাহা নীরব ও নিস্তব্ধ। আমরা একে একে চিতোরের বহু মন্দিরাদি দর্শন করিয়া অবশেষে মোকলজী-কা-মন্দির ও শিঙ্গার চৌরী নামক মন্দিরদ্বয় দর্শন করিলাম। জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে রাণা কুম্ভ তাঁহার পিতা মোকলজীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই মোকল-জী-কা মন্দির নির্ম্মাণ

* Dr. Hunter's Imperial Gazetteer (2nd ed.) Vol. VII, p. 431.

করাইয়াছিলেন। আবার কাহারও কাহারও মতে স্বয়ং মোকলজী ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭২ ফিট দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ৫০ ফিট বিস্তৃত। মধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ আছে, উহার উপরের ছাদ খিলান করা এবং ক্রমান্বয়ে উহা গোলাকার ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে চূড়ায় শেষ হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে একটী ক্ষুদ্র গর্ভ-গৃহ আছে তাহা অত্যন্ত অন্ধকারময়, এমনকি দিবাভাগেও বর্ত্তিকার সাহায্য ব্যতীত উহার অভ্যন্তরস্থ কোন দ্রব্যই দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দিরের উত্তর দক্ষিণে ও পশ্চিমদিকে তিনটী দরদালান এবং প্রবেশ দ্বার আছে। মন্দিরের সর্ব্বত্র প্রস্তর খোদিত বহুসংখ্যক মূর্ত্তি, সেগুলি বড়ই সুন্দর, কোথাও কুম্ভ কাখে করিয়া কোনও মহিলা জল আনয়ন করিতে যাইতেছে, কোথাও কোন বীরপুরুষ রণজয় করিয়া যুদ্ধ হইতে আগমন করিতেছেন, কোথাও বিচারক অপরাধীর বিচার করিতেছেন এইরূপ বহুবিধ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে।

একে একে সমুদয় মন্দির ইত্যাদি দর্শন করিয়া অবশেষে আমরা সেই স্থানে আসিলাম, যেখানে একদিন রাজপুত ললনাগণ সতীত্ব রক্ষার্থ আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পর্ব্বতের গায়ে একটী ক্ষুদ্র মন্দির, পর্ব্বতের অঙ্গ হইতে নিরত স্ফটিক-ধারা সদৃশ জলধারা নির্গত হইয়া মন্দির মধ্যস্থিত মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হইতেছে—এই প্রস্রবণের জলের সাহায্যে সম্মুখস্থ একটী বাঁধান পুষ্করিণী সর্ব্বদা জল-পরিপূর্ণ থাকে। ইহার দক্ষিণ দিকে অদ্যাপিও একটী সুড়ঙ্গ পথ রহিয়াছে, শুনিলাম যে চিতোরের সুখসমৃদ্ধির দিনে চিতোরের স্বাধীনতার শুভক্ষণে রাজকুমারিগণ এই পথ দিয়া এখানে আসিয়া শিবপূজা ও মনের আনন্দে স্নানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট আকবর অসংখ্য সৈন্য লইয়া চিতোর নগর আক্রমণ করিলে দুর্গস্থিত রাজপুত বীরগণ প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে যখন আর কিছুতেই দুর্গ রক্ষা করিতে পারিলেন না তখন তাঁহারা একে একে রণক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন—অবশেষে যখন শেষ আশা, শেষ ভরসা—বীরশ্রেষ্ঠ জয়মল্লও

সম্মুখ রণক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন, তখন অবশিষ্ট রাজপুত যোদ্ধাগণ সংখ্যায় মোট এক সহস্র হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সাধের জন্ম-ভূমির ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে চিরজন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া একে একে রণক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন। বীরাঙ্গণা রাজপুত-মহিলাগণও এই স্থানে দলবদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। এই সেই পুণ্যক্ষেত্র, মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীতের সমুদয় দৃশ্যাবলী বাস্তবের ন্যায় প্রতিভাত হইল। সংসারে আজ কত পরিবর্ত্তন। সেই নীরব নিভৃত প্রদেশে বাতাস যেন গাহিতেছিল,

"দেখ্‌রে জগত, মেলিয়ে নয়ন, দেখ্‌রে চন্দ্রমা, দেখ্‌রে গগন,
স্বর্গ হ'তে সবে দেখ দেবগণ, জলদ অক্ষরে রাখগো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দেখ্‌রে, সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত-সতী আজিকে কেমন, সঁপিছে পরাণ অনল শিখে।"

চিতোরে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে কুক্কুরেশ্বর মন্দির, অন্নপূর্ণা-দেবীর মন্দির, রত্নেশ্বর সিংহের প্রাসাদ, নব লক্ষ ভাণ্ডার প্রভৃতি আরও অনেক মন্দিরাদি এবং সূর্য্যকুণ্ড ও মাতাজিকুণ্ড প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর জলাশয় আছে। চিতোর ভারতের গৌরব, ভারতবাসীর অনন্ত অশ্রুর—অনন্ত আধার, আমাদের থর্ম্মাপালী—ম্যারাথন। কোথায় সেই দিন চলিয়া গিয়াছে, আজ কোথায় তাঁহারা ? সেই সৌন্দর্য্য—সেই কঠোর ও কোমলের একত্র সমাবেশ, সেই স্বদেশ প্রীতির গৌরবকেন্দ্র চিতোর আজ শ্মশান। শ্মশানে কি দেখিলাম, দেখিলাম—শুধু অস্থি—শুধু ভস্ম—শুধু হাহাকার—শুধু যন্ত্রণার মর্ম্মভেদী দহন।

চিতোর তুমি কি ? তুমি আমাদের হৃদয়ের রক্ত, ভারতের মুকুটমণি! কালের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে তোমার একবিন্দু গৌরব কণারও যে হ্রাস হইবে না চিতোর! তুমি অজর—তুমি অমর—তুমি অক্ষয়—তুমি শ্মশান—আবার তুমিই আনন্দ-কানন।

জয়পুর।

ওগো! পুরসুন্দরী জয়পুরনগরী জানি না কেমন করিয়া তোমার শোভা সম্পদ—কেমন করিয়া তোমার মঠমন্দিরারামসৌধকীর্ত্তির বর্ণনা করিব। সত্য সত্যই তুমি—

"জয়সিংহ জয়পুরী চারুদেশ,
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ-বিশেষ।"

প্রকৃতপক্ষেই এমন অনিন্দ্যসুন্দর অমরাবতীতুল্য নগরী আর কোথাও দেখি নাই।* নীল-গগন-তলে শ্রেণীবদ্ধ শিল্পালঙ্কৃত লোহিতরাগমণ্ডিত সৌধাবলী —প্রশস্ত রাজপথ, হাট, বাজার, মন্দির, অলিন্দ সকলই যেন চিত্রের ন্যায় নানাবর্ণে মনোহরভাবে বিরাজিত। সত্য সত্যই জয়পুরনগরী আমার নিকট একখানা স্বপ্নদৃষ্ট ছবির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। আজ কয়েক বর্ষ হইল দেখিয়াছি; কিন্তু এখনও তাহার অনিন্দ্যসুন্দর ছবি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজিশূন্য পর্ব্বতমালা—আর তাহারই পাদদেশে সুরসুন্দরী নগরী আপনাকে লজ্জাবতী বধূর ন্যায় লুক্কায়িত রাখিয়াছে। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী; কাজেই ষ্টেসন হইতে সহরের কোনওরূপ অস্তিত্বই অনুভূত হয় না; তাহাতে আবার জয়পুর নগর উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত (Fortified)!

আমরা বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় ষ্টেসনে পঁহুছিয়া একখানা শকটারোহণে নগরের দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিতে দেখিতে অশ্বশকট একটী প্রকাণ্ড তোরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, দ্বাররক্ষক আমাদের

* Sawai Jeysingh was the founder of the new capital named after him Jeypur or Jeynugger, which became the seat of science and art, and eclipsed the more ancient Amber. Jeypur is the only city in India built upon a regular plan with streets bisecting each other is at right angles. The merit of the design and execution is assigned to Vidyadhara, a native of Bengal, one of the most eminent coadjustors of the prince in all his scientific pursuits both astronomical and historical.—*Lieut. Col. James. Todd.*

নিকট উপস্থিত হইয়া, বিক্রয়োপযুক্ত কোনও দ্রব্যাদি আছে কিনা এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি আছে কিনা দেখিয়া সসম্ভ্রমে নগরে প্রবেশের পথ ছাড়িয়া দিল। এই উচ্চ ফটকের নাম চাঁদপোল। ফটকের পরে একটী ক্ষুদ্র আঙ্গিনা—ইহা চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুবেষ্টিত। এই নগরে এইরূপ আরও ছয়টী তোরণ আছে। ষ্টেসনের নিকট যে সকল ধর্ম্মশালা আছে, তাহার একটীও সুবিধাজনক নহে, সে নিমিত্তই আমরা নগরের বাহিরে না থাকিয়া নগরের মধ্যেই অন্য এক বাসা ঠিক করিয়া, তাহাতে বাস করিয়াছিলাম। যদিও এখানে ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্বর্গীয় সংসার বাবুর পুত্রগণ, মেঘনাদ বাবু প্রভৃতি খ্যাতনামা বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করেন এবং প্রায় সকল বাঙ্গালী-পর্য্যটকই এখানে আসিলে তাঁহাদেরই অতিথি হন, তথাপি আমরা ইচ্ছা করিয়াই ভিন্ন বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলাম। মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ এই নগরের স্থাপয়িতা। ভারতবর্ষের কোথাও এইরূপ পরিপাটী সহর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার আবর্জ্জনা রহিত রাজপথ-গুলি উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব্ব পশ্চিমে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত, যেস্থানে এই রাজপথগুলি পরস্পরে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই এক একটী চকের সৃষ্টি হইয়াছে—প্রতি চকের মধ্যেই প্রস্তরগঠিত কৃত্রিম সরোবর ও তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ উৎস সমূহ স্থাপিত রহিয়াছে। জয়পুর নগরী বিদ্যাধর নামক পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী জনৈক বহুশাস্ত্রবিদ্ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে সবাই জয়সিংহ নিজনামে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করিয়াছেন। কথিত আছে যে, একটী শুষ্ক হ্রদগর্ভের মধ্যে এই নগরী স্থাপিত। ইহার তিন দিকে সুন্দর নীল গিরিশ্রেণী উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া নগরের প্রহরাকার্য্যে রত রহিয়াছে। জয়পুর নগরী দৈর্ঘ্যে তিন মাইল এবং প্রস্থে দুই মাইল। পূর্ব্বে আমরা যে সাতটী তোরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক দ্বারের উপরিভাগেই দুইটী করিয়া বিশ্রামকক্ষ ও তোপ রাখিবার স্থান আছে। নগরের ঠিক্ মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। নাগরিক সর্ব্ববিধ শোভাসম্পদেই ইহা গরীয়ান্। জয়পুর নগরী রাজ-পুতানার মধ্যে বৃহৎ ও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যের স্থান। দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-প্রধান স্থানে এখানকার উৎপন্ন বহু জিনিষের

নগরের কথা।

রপ্তানী হইয়া থাকে। সোণা, রূপা ও পাথরের কার্য্যের জন্য ইহা চির-প্রসিদ্ধ।

দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ বিপণিশ্রেণী ও সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাসমূহ দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া পঁহুছিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে ফুটপাথ—আর মধ্য দিয়া গাড়ী-ঘোড়া চলিতেছে। এই ফুটপাথগুলি কলিকাতার রাজপথ হইতে দৃঢ় ও সুপ্রশস্ত, রাজপথগুলিও অধিকাংশ স্থলেই ভারত-রাজধানীর রাজপথকেও হার মানায়। এই প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ নগরের প্রায় একাংশ লইয়া বিরাজিত। মনোহর হর্ম্ম্যাবলী পরিশোভিত রাজবাটীর প্রকৃত বর্ণনা করা অসম্ভব। তোরণ ছাড়িয়া প্রবেশ করিলেই এক পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বিচারালয় ও কার্য্য-গৃহ সমুদয় বিরাজিত। প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের শাসন-প্রণালী কিরূপ সরল ও সহজভাবে নিষ্পন্ন হইত, তাহা এখানকার বিচারাদি দর্শন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জয়পুরের মহারাজা নিজেই নিজরাজ্যের প্রজাবৃন্দের দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার সকলই তাঁহার ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে—তবে তাহা যথেচ্ছার সম্পন্ন নহে; তাহার জন্য জয়পুর রাজ্যের নিজের আইন আছে। শাসন-শৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ চারিটী বিভাগ আছে; যথা—আইন আদালত, রাজস্ব, সৈনিক ও বহির্ভাগ। রাজ্য-শাসনের ভার তাঁহার অধীনস্থ আটজন সচিবের উপরে নির্দ্ধারিত আছে। জয়পুরের প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ মহারাজ আবকারীর দ্রব্যাদি ব্যতীত আর সকল পণ্যদ্রব্যের মাশুল তুলিয়া দিয়াছেন। হিন্দুর হিন্দুত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা প্রজাবাৎসল্য ও বিচারপদ্ধতি দর্শন করিয়া সেকালের হিন্দুরাজত্ব ও নৃপতিমণ্ডলীর কথা মনে পড়িল; বর্ত্তমানের শোচনীয় পরিণামে আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না! দিল্লী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদের মত এখানেও দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস প্রভৃতি শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত তুষারধবল অট্টালিকা-সমূহ সাজ-সজ্জায় শোভাবর্দ্ধন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভ, অলিন্দ প্রভৃতি কারুকার্য্যময় ও শোভা-সম্পদে শ্রেষ্ঠতম। দেওয়ান-গৃহ দুইটীর সাজ-সজ্জা দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, মোগলদের সময়ে তাহাদের

রাজপ্রাসাদ।

এই গৃহগুলি কিরূপ সুন্দর সুন্দর সাজ-সজ্জায় সুশোভিত থাকিত। রাজবাটীর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাজার আবাস ভবন "চন্দ্রমহল" নামক সুন্দর প্রাসাদটি বিরাজিত। এই অট্টালিকাটি ত্রিতল এবং ইংরেজী স্থাপত্যানুসারে নির্ম্মিত—গৃহটি ইংরেজী উপকরণে সুসজ্জিত। অট্টালিকার পশ্চাতে প্রশস্ত ও মনোহর পুষ্পকানন, জলপ্রণালী ও ফোয়ারা ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম শোভায় ইহা দর্শকের মন মুগ্ধ করিয়া থাকে। শ্রেণীবদ্ধ তরুশ্রেণী, নানাজাতীয় প্রস্ফুটিত কুসুমবৃক্ষনিচয়, লতাকুঞ্জ, মখমলের ন্যায় বিস্তারিত সবুজ-সুন্দর ঘাস,—প্রত্যেক দৃশ্যই যেন সুন্দর ও মনোহর। অনেক সময় স্বভাবকেও কৃত্রিমতার সাজে সাজাইলে কতদূর যে নয়নমন মুগ্ধ করে, তাহা এই উদ্যান দর্শন করিলে, সহজেই অনুভূত হয়। এই উদ্যানের অপর প্রান্তে 'গোবিন্দজীউ'র মন্দির বিরাজিত—ইঁনি বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়া এস্থানে স্থাপিত আছেন। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, দেখিতে মন্দ নহে তবে ইঁহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে লোকমুখে যতটা শুনিয়াছিলাম—চক্ষে ততটা দেখিলাম না। ভক্ত নহি, ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারি নাই, তাই কি গোপিনী-মনোমোহন আপনার সৌন্দর্য্যটুকু আমার নয়ন হইতে মুছিয়া লইয়াছিলেন? গোবিন্দজীর মন্দিরের নিমিত্ত জয়পুর হিন্দুমাত্রেরই মহাতীর্থ স্থান। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আবালবৃদ্ধবণিতা গোবিন্দজীর আরতি দর্শনার্থ গমন করেন। সে এক রমণীয় দৃশ্য। গোবিন্দজীর নিত্য পূজার দৃশ্য আরো মনোহর। আমরা এস্থানে গোবিন্দজীর উদ্দেশে বিরচিত একটী সঙ্গীত প্রকাশ করিলাম। এই সঙ্গীতটী বর্ত্তমান মহারাজা দ্বিতীয় মাধব সিংহজীর বৃদ্ধ পিতামহ মহারাজ প্রতাপসিংহ-কর্ত্তৃক বিরচিত। গানটি এই,—

"আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো, নেনন ভর ভর রূপ নিহারো।
শ্যামলি সুরত মাধুরী মুরত, চঞ্চল উছল জোবন মতবারো॥
আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো।
নাভি গভীর, উদর-রোমাবলী, কুস্তুভ মণি নকবেসর বারো।
মোর মুকুট পীতাম্বর সোহে শ্রুতি কুণ্ডল মকরাকৃতি বারো।
আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো, রাজা প্রতাপসিংহ স্মরণ তিহারো।
তন মন ধন চরণ পর বারো, আজ মিল মোহে গোবিন্দ প্যারো॥"

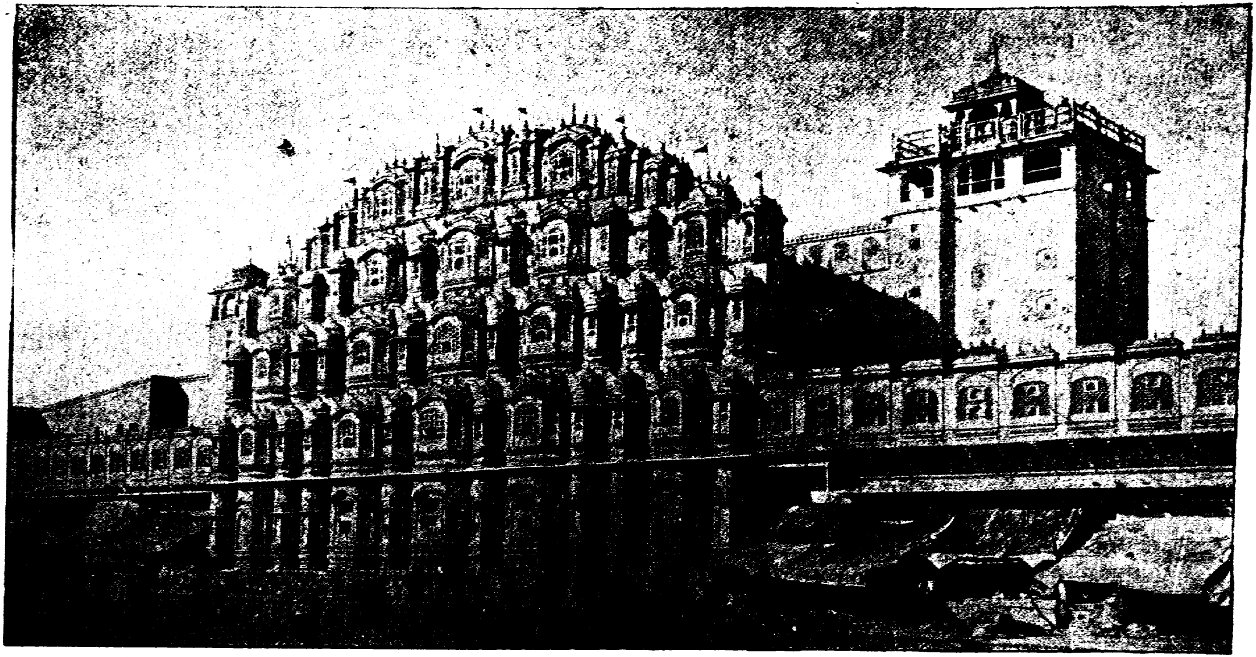
আমরা পূর্ব্বে যে গোবিন্দজীউর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার পুরোহিত একজন বাঙ্গালী, তিনি আমাদের সহিত নানা বিষয় আলাপ করিলেন—স্বদেশী লোকের পরস্পরের প্রতি যে কতটা সৌহার্দ্দ্য থাকে, তাহা পরস্পর নিকটে থাকিয়া অনুভব করা যায় না। এই দূরপ্রবাসে সমুদয় বাঙ্গালীই এক।

গোবিন্দজীউকে দর্শনান্তে মৃত মহারাজ রামসিংহের বৈঠকখানা ও 'বাদলামহল' ইত্যাদি দর্শনান্তে 'হাওয়া-মহল' দর্শন করিলাম।

হাওয়া মহল।

হাওয়া-মহলের সৌন্দর্য্য দূর হইতে পরম উপভোগ্য। দূর হইতে ইহাকে একটা রথের মত দেখায়। তলের উপর তল, তার উপরে তল, এইরূপভাবে ক্রমশঃ মন্দিরাকারে অট্টালিকার বিস্তৃতি চতুর্দ্দিকে কমাইয়া ছোট করিয়া তোলা হইয়াছে। উন্মুক্ত দ্বারপথে বায়ু প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদা কক্ষগুলিকে শীতল করে বলিয়াই ইহার নাম হাওয়া-মহল হইয়াছে। ইংরেজ ও অন্যান্য বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এক মহল হইতে আর এক মহলে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত ইহার মধ্যে ললিতভঙ্গিমায় বহু বক্রপথ বিদ্যমান রহিয়াছে। গঠনে, সৌন্দর্য্যে ও নৈপুণ্যে ইহা অতুলনীয়। ইহার উপর হইতে নগরের সৌন্দর্য্যও কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহার নিম্নস্থ রাস্তাটি সুপ্রশস্ত ও সুন্দর—নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উঁচু, রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিবার নিমিত্ত এই রাস্তা বহুদূর হইতেই ঢালু করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। রাস্তার মধ্যস্থলটি প্রস্তরমণ্ডিত। পথের সেই উন্মুক্ত স্থলে ধীর মলয়ানিল সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে থাকে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে হইলে 'পাশ' লওয়ার প্রয়োজন। হাওয়া-মহল সপ্ততল—এখন পাঠকবর্গ হয় ত সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশে শুষ্ক হ্রদগর্ভে ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে কতটা দৃঢ়তা ও স্থাপত্য-কৌশল নিহিত রহিয়াছে। মহারাজের এই সপ্ততল হাওয়া-মহল সত্যসত্যই এক অলৌকিক প্রস্তরগৃহ, বহুদূর হইতেই ইহার অভ্রভেদী উচ্চচূড়া দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

প্রধান ফটকের সম্মুখে মুদ্রাযন্ত্রাগার। প্রধান তোরণের সম্মুখে "স্বর্গশূল



হাওয়ামহল—জয়পুর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মিনার” এবং রাজা ঈশ্বরী সিংহ নির্ম্মিত ‘ঈশ্বরী মিনার’ অবস্থিত। উভয়ই দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। জয়পুরের আর্টস্কুল একটী দেখিবার জিনিষ, এ স্থানের শিল্পজাত ও কারুকার্য্য দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। এক কলিকাতা আর্টস্কুল ব্যতীত ভারতের আর কোন শিল্পবিদ্যালয়ই ইহার সমকক্ষ নহে। এই শিল্প-বিদ্যালয়টি মৃত মহারাজ রাম-সিংহের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। ছাত্রগণকে চিত্র, কাষ্ঠ, পিত্তল ও পাথর ইত্যাদির দ্বারা নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যের নির্ম্মাণ শিক্ষা-দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষকগণও প্রত্যেকে এক একজন খ্যাতনামা শিল্পী। রাজা মহারাজগণ প্রতিষ্ঠাপিত এ সমুদয় শিল্পবিদ্যালয়দ্বারা ভারতবর্ষের লুপ্তপ্রায় শিল্প-গৌর-বের যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে, তাহা এখানকার ছাত্রগণের নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যাদি দর্শন করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শিল্পের অবনতির নিমিত্তই যে আমাদের দেশের এই দারুণ অবনতি সংঘটিত হইতেছে, তাহা আর নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক। আমরা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচে গ্রন্থি দিতেছি—তাই দুর্দ্দশাও দূর হইতেছে না—দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর বিকটগ্রাস হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। এখানে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত গাভী ও বাছুর দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

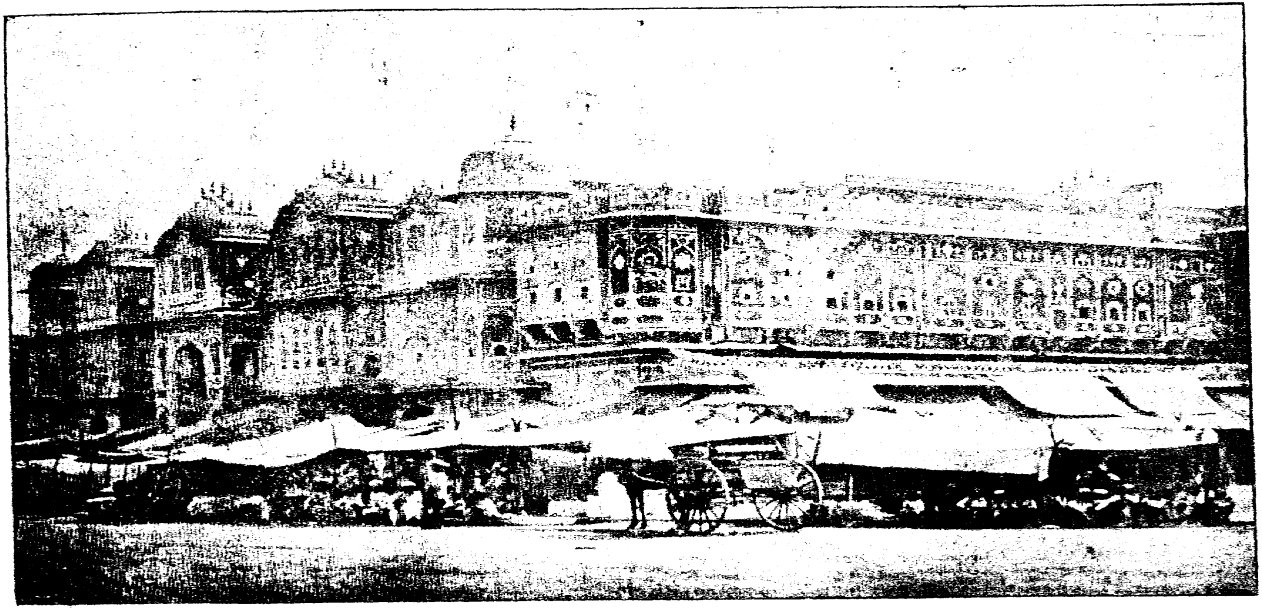
আর্টস্কুল।

রাজপ্রাসাদ দর্শনের পর, বাসায় আসিয়া আহার ও বিশ্রামাদির পরে আমরা মহারাজ রামসিংহের সাধের “রামবাগ” নামক উদ্যান দর্শন করিতে গমন করিলাম। এত বড় এবং এমন সুন্দর কারুকার্য্যময় উদ্যান ভারতবর্ষের অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। উদ্যান-মধ্যে লর্ড মেওর একটী সুন্দর মূর্ত্তি আছে। নানাজাতীয় বৃক্ষলতায় সুশোভিত সবুজ-সুন্দর দূর্ব্বাদলে সজ্জিত এই উদ্যানটি পর্য্যাটককে একেবারে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। কোথাও লতাকুঞ্জবনে লাল সাদা ও হলুদ রঙ্গের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও কৃত্রিম সরিৎ দিয়া জল নির্গত হইতেছে—কোথাও জলস্রোতের উপর ক্ষুদ্র সেতু এবং কোথাও বা জীবিতবৎ কৃত্রিম প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত। উদ্যানের একপার্শ্বে সুদৃশ্য নানারূপ মূল্যবান প্রস্তরাদি গঠিত ‘এলবার্ট হল’ বিরাজিত। এই সুন্দর সৌধখানি নির্ম্মাণ করিতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। অট্টালিকার মধ্যে দরবার গৃহ ও

রামবাগ।

চিত্রশালা আছে, উহা দুইটী সুন্দর ও বৃহৎ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে অবস্থিত। ইহার সম্মুখস্থ বারান্দায় জয়পুরের পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের চিত্র-সমূহ অঙ্কিত রহিয়াছে। একটী সুপ্রশস্ত দ্বিতল উচ্চ হল এবং তাহার তিন পার্শ্বে কক্ষের সারি, তাহার পার্শ্বে একটী সুন্দর প্রাঙ্গণ, তাহার চারিদিকে প্রকোষ্ঠ সমূহ অবস্থিত। হলের উপরিস্থিত গবাক্ষে, কাচে নানা বর্ণে নলদময়ন্তী, সীতা-বর্জ্জন, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক দরায়ুর পরাজয়, হনুমানের লঙ্কাদহন এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি আলেখ্য-সমূহ বর্ণ-বিচিত্রতায় এবং চিত্রনৈপুণ্যে মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এই সুসজ্জিত দরবার ঘরের পরেই মিউজিয়ম বা চিত্রশালা দর্শন করিলাম। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশালার আকৃতির তুলনায় ইহা হীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও কোন কোন অংশের গুণে ইহাকে হীন বলিয়া মনে হয় না। এস্থানে শ্বেতপ্রস্তরের নানা সূক্ষ্মকার্য্য-সমন্বিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি, ধাতব অস্ত্র-শস্ত্র ও ক্রীড়া-পুত্তলিকাদি দর্শন-যোগ্য। রামবাগ মধ্যে যে মনোহর উদ্যান এবং সুন্দর সুন্দর অট্টা-লিকা বিরাজিত, শুনিলাম যে কেবল সেইগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতেই মহারাজার বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে! আমরা যখন মিউজিয়ম ও এলবার্ট হল ইত্যাদি দেখিয়া বাহির হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, আকাশে তারকামালা ফুটিয়াছে ও ব্যাণ্ডের মধুর বাদ্যে চারিদিকে একটা হর্ষ-কোলাহল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আলোতে, বাঁশীতে, বাতাসের শীতল-স্পর্শে ক্লান্তি দূরে গমন করিল—প্রাণে শান্তি ও সুখের উদয় হইল।

জয়পুরে অন্যান্য দর্শনীয় স্থান-সমূহের মধ্যে মেও-হাঁসপাতাল মহারাজের কলেজ ও নগর-প্রাচীরের বাহিরে গেথুরে মহারাজাদিগের সমাধি দর্শন-যোগ্য। এই সমাধি স্থানের সাধারণ নাম ছত্রী—ইহার চতুর্দ্দিকেও সুন্দর বাগান। উহার মধ্যে জয়সিংহের ছত্রীই দেখিতে অত্যন্ত মনোহর। জয়পুর হইতে দেড় মাইল দূরে পাহাড়ের উপর সূর্য্যদেবের একটী বৃহৎ মন্দির আছে, তাহাও উল্লেখ যোগ্য। এই দেবমন্দিরের নাম গুল্‌তা, এখানে একটী প্রস্রবণ হইতে ৭০ ফিট নিম্নে অনবরত জল পতিত হয়। হিন্দুদের নিকট এই জলও অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। ডাকঘর,



মহারাজার কলেজ—জয়পুর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

অতিথিশালা, ইংরেজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয়, কলেজ, শিল্পবিদ্যালয়, চিত্রশালা, কারাগার, টাঁকশাল ইত্যাদি সমুদয়ই জয়পুরে আছে।

জয়সিংহের মান-মন্দির এখানে দ্রষ্টব্য স্থানের প্রধান মধ্যে গণনীয়।

জয়সিংহের মানমন্দির।

এখানে হিন্দু-জ্যোতিষিক প্রাচীন যন্ত্রসমূহ এখনও বিদ্যমান আছে। জয়পুরে এই মান-মন্দিরকে 'যন্ত্রগৃহ', মানমণ্ডল ও তারাকোঠিও বলিয়া থাকে। মহারাজা সবাই জয়সিংহ বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি নানাপ্রকারের জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া তৎ-সময়ের প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ দে লা হায়র (De la Hire)এর জ্যোতিষীগণনার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই মান-মন্দির প্রাসাদভূমির অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা এখন চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও অট্টালিকা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, জয়সিংহজীর রাজত্ব সময়ে এরূপ ছিল না। জয়সিংহজীর নির্ম্মিত যন্ত্রসমূহের কয়েকটির নাম আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম—এ সমুদয় যন্ত্রদ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহাদির দূরত্ব এবং পর্ব্বতাদির উচ্চতা নিরূপিত হইত। সাধারণতঃ যন্ত্র-সম্রাট্, ভিত্তিযন্ত্র, রাশিবলয়, যন্ত্রজয়প্রকাশ, ভিত্তি গোলনাড়িযন্ত্র, যন্ত্ররাজ, কড়াযন্ত্র বা চক্রযন্ত্র, কপালযন্ত্র, গোলযন্ত্র, নাড়ীবলয়, ধ্রুবনল, রামযন্ত্র, কৃষ্ণযন্ত্র, দিগংশযন্ত্র বা সৌরযন্ত্র, অরুণযন্ত্র প্রভৃতি আরও কত যন্ত্র আছে।

জয়পুরের লোকসংখ্যা ১৫৪৯০৫, ইহার মধ্যে হিন্দু ১০৯৮৬১, মুসলমান ৩৮৯৯৫৩, জৈন ৯৭৮০। এখানকার জলবায়ু উৎকৃষ্ট। জয়পুর-রাজের বর্ত্তমান আয় প্রায় এক কোটি টাকা হইবে। পূর্ব্বে জয়পুর রাজগণ বহু ব্রহ্মোত্তর ও জায়গীর দান করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল জায়গীর ও ব্রহ্মোত্তরের আয়ও প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জয়পুর মহারাজের বহু সৈন্য ছিল এবং তাহারা বীর ও সুদক্ষ যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; এখন আর সে দিন নাই, সেই বীর্য্যবত্তা কালবশে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন মহারাজের অধীনে ২৯টী সুরক্ষিত পার্ব্বত্য দুর্গ, ১৩৫৭৮ জন অশ্বারোহী, ৯৫৯৯ পদাতি, ৭১৬ গোলন্দাজ, ৮৫টী কামান আছে। রেসিডেন্টের বাটী, তাহার কার্য্যালয়,

টেলিগ্রাফ আফিস ও ইংরেজদিগের বাসস্থান নগরের বাহিরে অবস্থিত। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে প্রতি বৎসর মহারাজের চারি লক্ষ টাকা কর দিতে হয়। নগরস্থ টাঁকশাল হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে,—এই সমুদয় মুদ্রাই জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত। বাঙ্গালী অধিবাসিদের মধ্যে স্বর্গীয় সংসারচন্দ্র সেনের ভ্রাতা ও পুত্রগণ পর্য্যাটকগণের একমাত্র সহায়। আপদে বিপদে তাঁহারাই বাঙ্গালী ভ্রমণকারিগণের প্রধান অবলম্বন। আমরা এখানে জয়পুর রাজগণের একটা নামের তালিকা প্রদান করিলাম।

১। ঢুহ্লারাও ১০২৩ সম্বতে অভিষেক।
২। কঙ্কাল (ধুন্ধররাজ্য) উদ্ধার কর্ত্তা)
৩। মাদলরাও
৪। হনুদেব
৫। কুণ্ডল
৬। পূজন
৭। মল্লসিংহ (মালসিংহ)
৮। বিজলী
৯। রাজদেব
১০। কল্যাণ
১১। কুন্তল
১২। জোয়ানসিংহ
১৩। উদয় করণ
১৪। নরসিংহ
১৫। বনবীর
১৬। উদ্ধারণ
১৭। চন্দ্রসেন
১৮। পৃথ্বিরাজ
১৯। ভাম (পিতৃঘাতী)
২০। অষ্টীশকর্ণ (পিতৃহন্তা)
২১। বাহারমল্ল
২২। ভগবান দাস
২৩। মানসিংহ
২৪। ভবসিংহ
২৫। মহাসিংহ
২৬। জয়সিংহ
২৭। রামসিংহ
২৮। বিষ্ণুসিংহ
২৯। সাবই জয়সিংহ
৩০। ঈশ্বরীসিংহ
৩১। মধুসিংহ
৩২। পৃথ্বিসিংহ
৩৩। প্রতাপসিংহ
৩৪। জগৎসিংহ
৩৫। মোহনসিংহ
৩৬। জয়সিংহ
৩৭। রামসিংহ
৩৮। মাধোসিংহ (দত্তক)

জয়পুর দর্শনান্তে আমরা অম্বর রওয়ানা হইলাম। অম্বর জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এতদ্দেশবাসিগণ সাধারণতঃ ইহাকে 'আমের' কহে। জয়পুর হইতে অম্বর পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। অম্বর পথাভিমুখী ফটকের নাম 'আমেরকা দরওয়াজা'—আমরা সে দরওয়াজা দিয়া এক্কা-আরোহণে অম্বর চলিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী। এ সকল পাহাড়ে বৃক্ষলতা একপ্রকার নাই বলিলেও কোনরূপ অত্যুক্তি হয় না। ধীরে ধীরে বক্রগতিতে আমাদের যান ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ হইতে আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বে পুরাতন আমেরের দুর্দ্দশা দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। জগতে স্থায়ী কি? হায়! মানবের চেষ্টা, যত্ন উদ্যোগ সমুদায়ই ধরাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। মাতঃ বসুন্ধরে, তুমি কি দয়াবতী না রাক্ষসী? নিজ সন্তানকে নিজেই আবার গ্রাস করিতেছ— যে ফুলটি তোমার বুকে ফুটিয়া উঠে, যে পাখীটি তোমারি কোলে গান গায়, যে কবি তোমার মহিমার তান ধরে—তুমি সর্ব্বনাশী কিনা আবার তাহাকেই গ্রাস করিয়া ফেল। জানি না, মা তোর এ কেমন বিশ্বগ্রাসী নীতি—সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিকটলীলায় প্রাণ অহরহঃ আকুল-ক্রন্দনে ব্যাকুল—তবুও পাষাণী—তবুও রাক্ষসী, তুই তাহা শুনিস্ না। হায়! জগতে কি এমন কেহই নাই, যিনি মানবের এ দুঃখমোচন করিতে পারেন? কে করিবে? হায় মূঢ় আমি!—ইহা যিনি করিতে পারেন, এ যে তাঁহারই লীলা!

অম্বর।

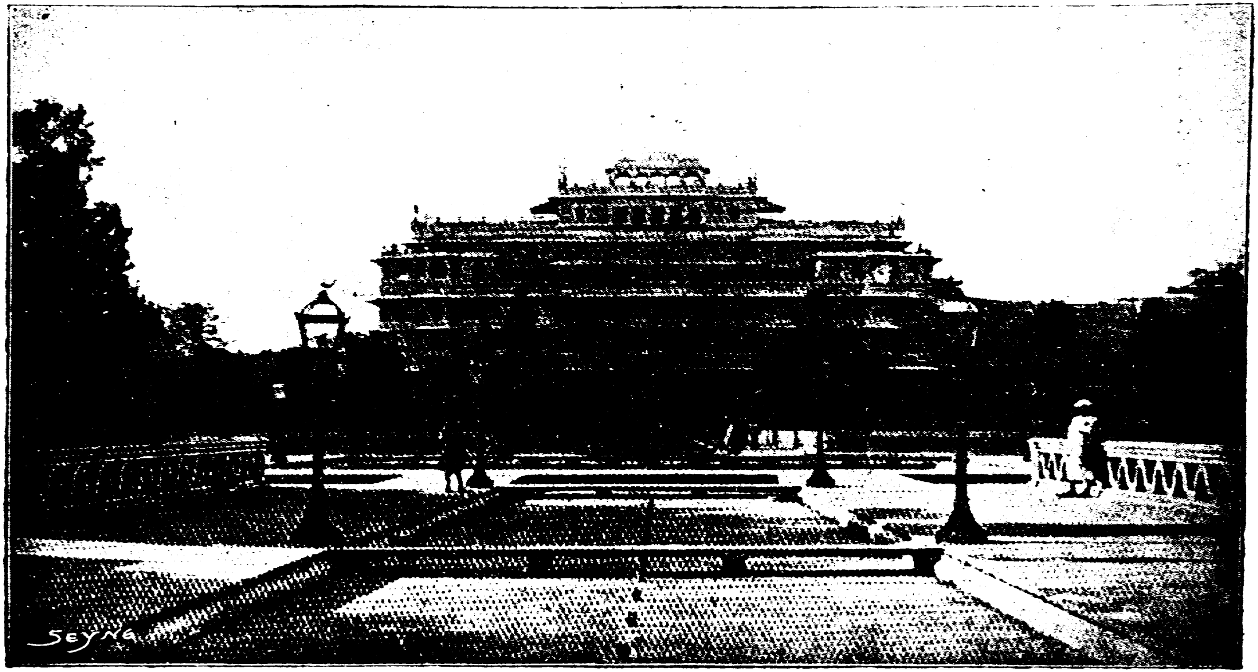
বেলা প্রায় এগার বারটার সময় আমরা অম্বর পঁহুছিলাম, নির্জ্জন নিভৃত স্থানে এই মনোহর নগরটী অবস্থিত। অম্বরের যাহা কিছু শোভাসম্পদ সে সমুদয় মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইয়াছিল। অম্বরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কাহারও কাহারও মতে, অম্বাদেবীর নাম হইতেই সহরের নামোৎপত্তি হইয়াছে, আবার কাহারও কাহারও বিশ্বাস, অম্বরে যে অম্বকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার নাম হইতেই অম্বর নামের উৎপত্তি। এ সমুদয় জনপ্রবাদ যাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনিই তদ্রূপ বিশ্বাস করিতে পারেন। অম্বর আসিতে হইলে জয়পুর হইতে পাশ

অম্বর নগর।

আনিতে হয়, আমরাও পাশ লইয়া আসিয়াছিলাম। নীল গিরিশ্রেণীর ধূসর বক্ষে অম্বর সহর আপনার লুপ্ত সৌন্দর্য্য বুকে করিয়া বিরাজিত। বর্ষার সময়েই এখানকার গিরিসমূহ নবীন নধর বিটপী সমূহের শ্যামল পত্রপল্লবে পরিশোভিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে। গিরি-শ্রেণীর পাদমূলে অম্বর সহর স্বীয় প্রশান্ত শোভায় বিরাজিত। উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের নিম্নস্থলে একটী প্রকাণ্ড হ্রদ—হ্রদের তীরে সমতল ভূমিখণ্ডের উপর অম্বরের দুর্গ ইত্যাদি বিরাজিত। হ্রদের স্বচ্ছ সলিল-মধ্যে তীরের সৌধাবলীর ছায়া পতিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুষমাই না ধারণ করিয়াছে! আমরা ক্রমে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া অম্বর দুর্গের তোরণে প্রবেশ করিয়া দুর্গে আরোহণ করিতে লাগিলাম। বাহির হইতে ইহার শোভা যেরূপ অতুলনীয়, ভিতরেও তাহা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইহার ঐশ্বর্য্য ও গঠন-নিপুণতা দেখিয়া আগ্রা ও দিল্লীর প্রাসাদাবলীর কথা মনে পড়িল। অম্বর দুর্গের পাদদেশস্থিত উদ্যানটি সুন্দর ও মনোহর এবং নানাবিধ ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। প্রথমেই একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, দেখিবার স্থানগুলির মধ্যে দেওয়ানী-আম, জয়মন্দির, যশোমন্দির, সোহাগমন্দির, রঙ্গমহল, দেওয়ানী-খাস, অন্দরমহল ও শিলাদেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। আমরা একে একে সে সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

অম্বর দুর্গ।

(১) দেওয়ানি-আম—যদিও দিল্লী এবং আগ্রার দেওয়ানী-আমের সহিত ইহার তুলনা হয় না—তথাপি সৌন্দর্য্য-গরিমায় ইহার স্থান একেবারে নীচে নহে। কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভনিচয় এবং মধ্যস্থলের ষোলটী মার্ব্বেল স্তম্ভের শোভা সত্যসত্যই অতুলনীয়। স্তম্ভনিচয়ের ঈষদ্ নীলাভ সৌন্দর্য্য অম্বরের স্থপতিগণের গৌরববিকাশক। দেওয়ানী-খাসের পাশেই বর্ত্তমান মহারাজের বিলিয়ার্ড খেলিবার স্থান। দেওয়ানী-খাস, অন্তঃপুর মহল প্রভৃতি দিল্লীর অনুকরণে সুসজ্জিত ও শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত। অন্দরমহলের চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত প্রাচীর—প্রাচীরের ফটকের নাম গণেশপোল। কপাট পিত্তল-নির্ম্মিত, তাহার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের একটী প্রতিমূর্ত্তি



রাজপ্রাসাদ—জয়পুর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

অঙ্কিত আছে বলিয়াই ইহার নাম গণেশপোল হইয়াছে। অন্দরমহলের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। রাজপুত শিল্পিগণের অপূর্ব্ব শিল্পনিপুণতা এখানে বিদ্যমান। নানাবিধ বিচিত্র সৌন্দর্য্যে, ভাস্করের অনিন্দ্যসুন্দর অলঙ্কারে ইহা অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত। একদিন যে কক্ষগুলি নানাদেশের সুন্দরীগণের কলহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত, কত আমোদ কত উল্লাস যেখানে অহরহঃ ক্রীড়া করিত, এখন তাহা নীরব ও ব্যাঘ্রের আবাসস্থল। যে মানসিংহের বীরদর্পে, যাহার অসির ঝনঝনায় সুদূর কাবুল হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল—সেই মোগলের বীর্য্যবত্তার স্রষ্টা মোগলের খ্যাতিপ্রতিপত্তির মূল মানসিংহের অন্দরমহল কিনা বিজন ও ব্যাঘ্রাবাসে পরিণত, হায়রে দুর্দ্দৈব! মানব কত ক্ষুদ্র তুমি! কবির ভাষায় মানবের এ অনিত্যতা দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—

"বিধাতা হে আর করো না সৃজন
এমন পৃথিবী, এমন জীবন;
কর যদি প্রভু ধরা পুনর্ব্বার
মানব সৃজন করো নাক আর;
আর যেন, দেব, না হয় ভুগিতে
জীবাত্মার সুখ—না হয় আসিতে,
এ দেহ এমন ধারণ করিতে,
এরূপ মহীতে কখন আর।"

(হেমচন্দ্র)

পূর্ব্বে যে সুন্দর উদ্যানের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বামদিকে "দেওয়ান খাস" অবস্থিত—ইহার অপর নাম "জয়মন্দির"। এই ঘরে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী কক্ষ, প্রত্যেকটির ছাদ ও ভিতরকার দিকের প্রাচীর মুকুর-খণ্ড সংযোগে অতি সুন্দর ভাবে সুশোভিত—উহা দেখিলে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। প্রাচীন কারুকার্য্যগুলি এখন বিলুপ্তপ্রায়।

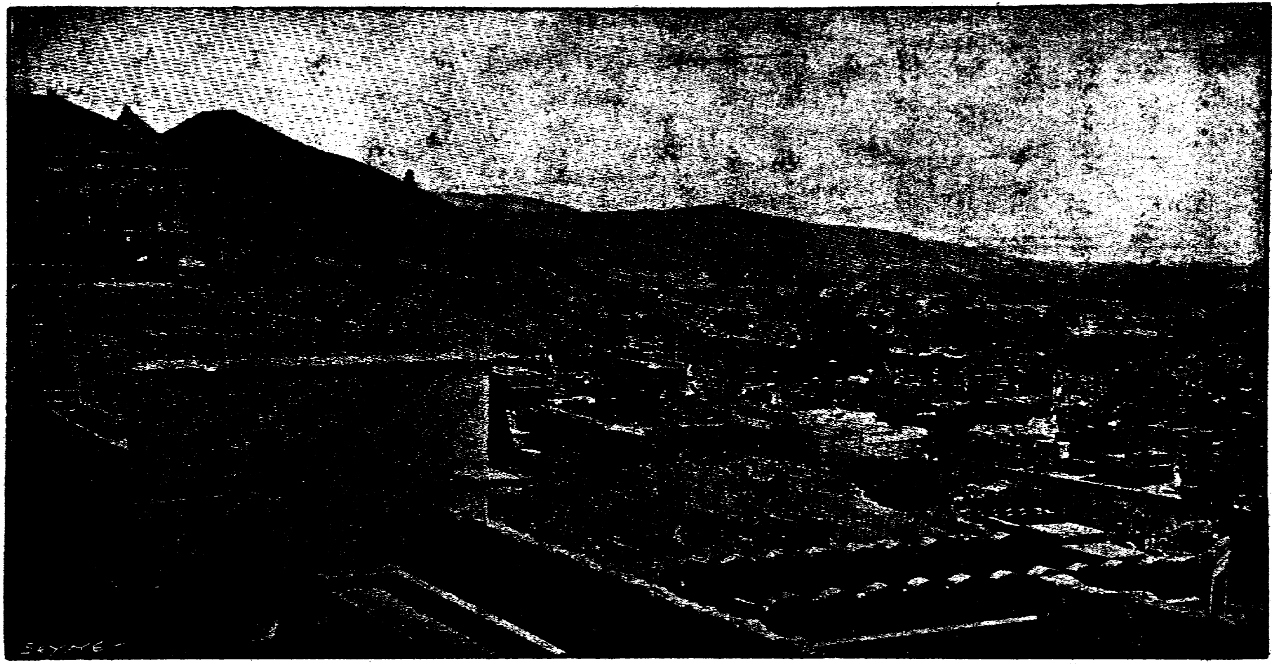
অতঃপর আমরা স্নানাগার এবং সোপানাবলি আরোহণ করিয়া দেওয়ান খাসের উপরিস্থিত 'যশোমন্দির' দর্শন করিলাম, উহাতে মাত্র দুইটী কক্ষ, একটী বৃহৎ ও অপরটী ছোট—আভ্যন্তরিক প্রাচীরগুলি 'জয়মন্দিরের ন্যায়'

মুকুর খণ্ডের দ্বারা সুসজ্জিত। গৃহের দুই পার্শ্বে দুইটী গুম্বজ, মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষুদ্র দেহ। এ স্থান হইতে উর্দ্ধের জয়গড় কেল্লার দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ইহার পরে 'সোহাগ মন্দির', এই কক্ষের বহির্ভাগস্থ প্রাচীরগুলি শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত। গৃহের উভয় পার্শ্বে আরও দুইটী ছোট ছোট ঘর তাহাদের উপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্বজ—ভিতরে ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর-জানালা—কক্ষের মধ্যেও এইরূপ প্রস্তর-জানালা দৃষ্ট হইল। বোধ হয় সে কালের পুরস্ত্রী-বর্গ এই জানালার অন্তরাল দিয়া দেওয়ানখাসের কার্য্যাবলী অবলোকন করিতেন। কারুকার্য্যময় শিল্পালঙ্কৃত প্রাচীরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর।

রাজবাটীর কিয়দ্দূরে উচ্চ পর্ব্বতোপরি প্রাচীন কুন্তলগড় অবস্থিত, ইহা প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন। এখন আর সে সৌন্দর্য্য নাই—চারিদিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। এখন বন্য শূকর ও ব্যাঘ্রের ইহা লীলাভূমি। এই কুন্তলগড়ের আরো উর্দ্ধে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। এই ভূতেশ্বর যে কতদিনের প্রাচীন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। উত্তর দিকের প্রাচীরের নিকট একটী মস্‌জিদ দেখিলাম, কথিত আছে যে, আজমীর হইতে গমনাগমনের সময় জনৈক মুসলমান সম্রাট্ এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এখন অম্বর যেন উপকথার এক নিদ্রিত নগরী। চারিদিকে কেমন যেন এক গভীর নিস্তব্ধ ভাব ইহার সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত। সেই ঢল ঢল ছল ছল লাবণ্য নাই বটে, কিন্তু তবু সে রূপরাশির হ্রাস নাই। একদিন যে হাটবাজার লোকজনে পূর্ণ ছিল, এখন তাহা বিজন। পূর্ব্বে এস্থানে উৎকৃষ্ট বন্দুক ও বিবিধ অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমান সময়ে অম্বরের শিল্পিগণ জয়পুরে বাস করিতেছে। জয়সিংহ কেন যে এমন সুন্দর সুরক্ষনগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়পুরে সমতল-ক্ষেত্রে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

শিলাদেবীর মন্দির।

অন্দরমহল ও এদিক ওদিকের সমুদয় মহল প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমরা অম্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিলাদেবীকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই দেবীকে প্রত্যেক বাঙ্গালী পর্য্যটকেরই ভক্তি সহকারে দর্শন করা কর্ত্তব্য।



প্রাচীন অম্বর নগর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

এই শিলাদেবী একদিন বঙ্গের বারভূঁইয়ার অন্যতর ভূঁইয়া চাঁদরায় ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর নগরীতে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বাস করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু পরিশেষে মানসিংহ কর্ত্তৃক কেদার রায় পরাজিত হইলে, তিনি এই অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি অম্বরে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন। এতদিন পর্য্যন্ত উহা প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী বলিয়াই পরিচিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বিশেষ প্রমাণ সংযোগে উহা বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় ও কেদার রায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া ঠিক্ করিয়াছেন। আমরা এখানে দেবীর বর্ণনা দিলাম। দেবী অষ্ট ভুজা, মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঘাঘরায় ঢাকা, সেজন্য নিম্নস্থ সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। আর একটী হস্তে ব্রাহ্মণেরা এখন ফুলের তোড়া দিয়া থাকেন, বোধ হয় পূর্ব্বে ঐ হস্তে চক্র ছিল। দক্ষিণ হস্তে খড়গ, তীর ও ত্রিশূল; অপর হস্তে যে অস্ত্র আছে, তাহা চিনিতে পারিলাম না। বোধ হয়, দেবী ঐ হস্তে বর ও অভয় দিতেছেন। পূর্ব্বে নাকি প্রতিদিন এস্থানে একটী করিয়া নরবলি হইত, এখন তৎপরিবর্ত্তে ছাগ ও পর্ব্বোপলক্ষে মহিষ বলি হইয়া থাকে। দেবী যেরূপ ভীষণা তাঁহার মন্দিরও তেমনি ভীষণ; দৃঢ়প্রস্তর নির্ম্মিত দৃঢ়প্রাচীরবদ্ধ। আমার সেই ভীষণার ভীষণমূর্ত্তি দৃষ্টে প্রাচীন ইতিহাস মনে পড়িয়া গেল। একদিন যে বঙ্গদেশ বাসী বীরেন্দ্র কেদার বীরত্বে ও শৌর্য্যে মোগলসম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—তাহারি প্রতিষ্ঠিত সেই রণরঙ্গিণী দেবী আজ সুদূর রাজপুতানার নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত।

আমরা অম্বর হইতে যখন জয়পুরের দিকে রওয়ানা হইলাম তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে—চারিদিকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা ও নীরবতা অবতীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই নির্জ্জন গিরিপথে—প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল,—আমার মন আর সে সমুদয় বাহ্যিক দৃশ্যের প্রতি নিয়োজিত ছিল না—আমি ভাবিতেছিলাম—অতীতের সেই সমৃদ্ধি—অতীতের সেই গৌরবকাহিনী—সেই বীরত্ব—সেই মহত্ত্ব—আজ তাহা কোথায়? যেদিন যায় সেদিন আর আসে না কেন? যদি

আর নাই আসিবে তবে তাহা যায় কেন? এই কি সেই দেশ একদিন যাহা—

“জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি!
বুদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে, সুধন্য জগতী-তলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি!

একবার, বুঝি এই শেষবার—যখন পশ্চাৎদিকে অম্বর দুর্গের দিকে তাকাইলাম—তখন উহা অস্তগামী তপনের স্তিমিত-রশ্মিতে মিলাইয়া যাইতেছিল।

আগ্রা।

আগ্রা ভারতের আর একটী গৌরব স্থল। একদিন ইহার স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যও যে সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, এখনও তাহার চিহ্ন-সমূহ বিদ্যমান। জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা আগ্রা বহুবার দেখিয়াছি; কিন্তু তথাপি যখনি পশ্চিম ভ্রমণে বাহির হইয়াছি তখনি এস্থান দর্শন না করিয়া ফিরিতে পারি নাই। এবারেও আগ্রা দেখিতে চলিলাম। দ্বিপ্রহরের অব্যবহিত পরে আমরা টুণ্ডলা ষ্টেসনে পঁহুছিলাম, ইহা একটী খুব বড় ষ্টেসন, এখানে মিঠাই, চানাচুর, দুধ, রাবড়ী ইত্যাদি বহু খাদ্য-দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। টুণ্ডলায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া এক শাখা লাইনে আগ্রার অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। আগ্রা টুণ্ডলা হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। আগ্রা ষ্টেসনে গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্ব হইতেই সুবিখ্যাত তাজমহলের শ্বেত গম্বুজ নীলাকাশে আপনার উন্নত শোভা একখানি স্বপ্নের ছবির ন্যায় দর্শকের নয়ন সমক্ষে ফুটাইয়া তুলে। সে অনির্বচনীয় শিল্প-সৌন্দর্য্য যিনি দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝাইতে যাওয়া অসম্ভব। ক্রমে আমরা যমুনার সেতু অতিক্রম করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম। ষ্টেসনের অনতিদূরেই আগ্রা-দুর্গের লোহিত-প্রস্তর-নির্ম্মিত বিশাল প্রাচীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহার অপর দিকে নয়ন-মুগ্ধকর জুম্মা মসজিদ অবস্থিত। আগ্রা ষ্টেসনটি খুব সুন্দর ও জাঁকজমক সম্পন্ন, ইহা একটী রেলওয়ে সংযোগস্থল। এখান হইতে দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার, জয়পুর, যোধপুর, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে যাওয়া যাইতে পারে। ইণ্ডিয়া মিডল্যাণ্ড (I. M. Ry) রেলে ঢোলপুর, গোয়ালিয়র, ঝান্সী এবং ভূপাল হইয়া রাজপুতানা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ যাইতে পারা যায়। ষ্টেসনের একদিকে E. T. R. ও G. J. P. ও ইহার অন্য দিকে R. M. Ryএর গাড়ী অপেক্ষা করিয়া থাকে।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেই অসংখ্য সরাইওয়ালা আসিয়া নবাগত পথিককে স্ব স্ব সরাইয়ের গুণবর্ণনা করিয়া তথায় লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতে থাকে। আমাদের আগ্রা নগরের ২।১ জন খ্যাতনামা

বাঙ্গালী বাবুর সহিত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকা উত্তম বিবেচনা না করিয়া ষ্টেসনের সন্নিহিত শ্যামলাল নামক এক ব্যক্তির একখানা দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতেই অবস্থান করিতে লাগিলাম।

আহারাদির পর বিশ্রামান্তে আমরা নগর দেখিতে বাহির হইলাম; আগ্রার দর্শনীয় প্রাচীন হর্ম্ম্যরাজির বর্ণনার পূর্ব্বে, আমরা এস্থানে সংক্ষেপে উহার প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করিলাম; আশা করি, তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার অতৃপ্তির কারণ হইবে না। আগ্রা নগর আগ্রা জেলার অন্তর্গত। ইহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটী বিভাগ বিশেষ। এই জেলার পরিমাণ ১৮৫০ বর্গ মাইল। আগ্রা অগ্রবন শব্দের অপভ্রংশ।

প্রাচীন ইতিহাস।

ইহার উত্তরে মথুরা ও ইটা; পূর্ব্বে ইমনপুরী এবং এটোয়া; দক্ষিণদিকে ঢোলপুর এবং গোয়ালিয়র, পশ্চিমে ভরতপুর। আগ্রা সমুদ্রগর্ভ হইতে ৬৫০ ফিট ঊর্দ্ধে অবস্থিত, কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৮৪১ মাইল। এই বাণিজ্য-প্রধান নগর নীল-সলিলা যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বহুদিন পর্য্যন্ত আগ্রা মুসলমানদের রাজধানী রূপে বিখ্যাত ছিল। মোগল-বাদ্‌শাহ্ সম্রাট্ আকবরের পূর্ব্বে এখানে লোদীবংশীয় পাঠান সম্রাট্‌গণ অবস্থান করিতেন। সেকন্দর লোদীর রাজত্ব কালেই সর্ব্বপ্রথমে আগ্রা রাজধানী রূপে পরিগণিত হয়, তখন নগরাংশ যমুনার বামকূলে অবস্থিত ছিল, এই নিমিত্ত বামকূলে এখনও বহুতর প্রাচীন হর্ম্ম্য ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সমাধি দৃষ্ট হয়। মোগল সাম্রাজ্য সংস্থাপক মহাত্মা বাবর আগ্রায় রাজত্ব করেন, কিন্তু তৎপুত্র হুমায়ুন কর্ত্তৃক ইহা পরিত্যক্ত ও রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। পরে হুমায়ুন-নন্দন জগদ্বিখ্যাত আকবর ১৫৬৬ অব্দে পুনরায় রাজধানী দিল্লী হইতে আগ্রায় লইয়া আসেন। সম্রাট্ আকবর আগ্রা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার নাম আকবরাবাদ রাখেন, তাঁহার সময়েই ইহার সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শেখরে আরোহণ করিয়াছিল।

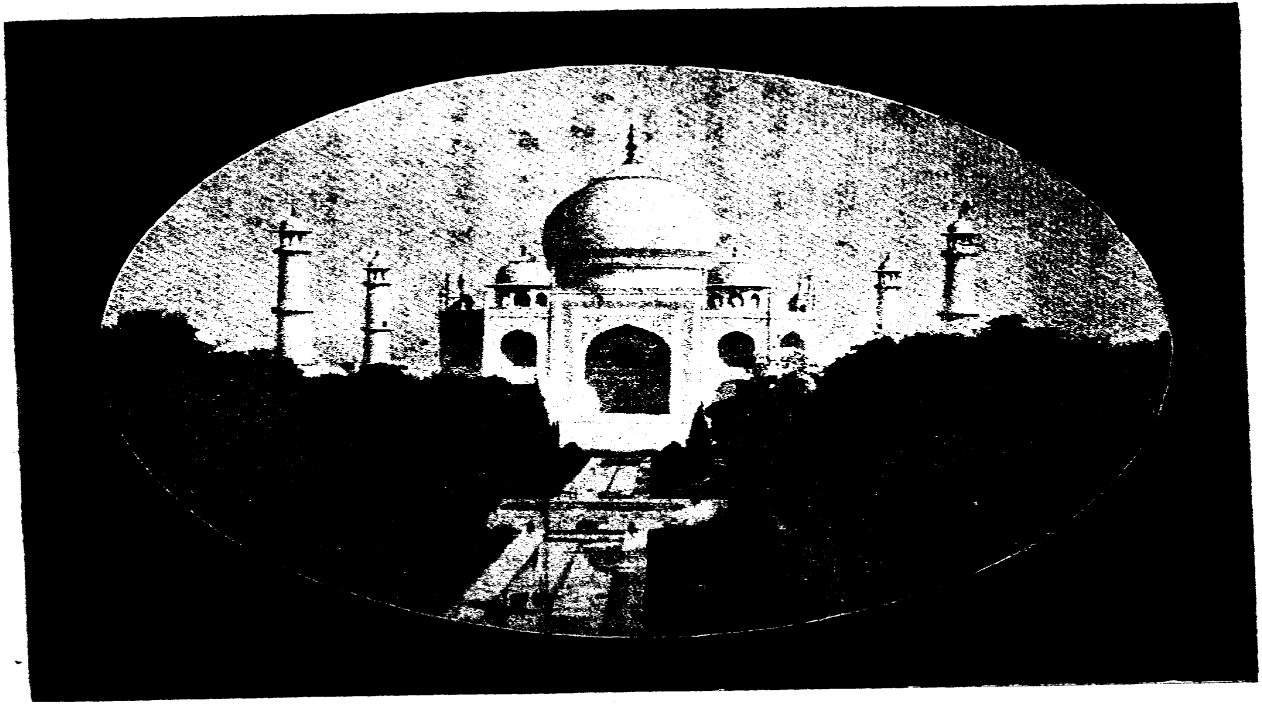
তিনি এই নগরে কেল্লা ও অনেকগুলি মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আগ্রা-ষ্টেসনের নিকট অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ লোহিত-প্রস্তর-

নির্ম্মিত দুর্গ আকবরই নির্ম্মাণ করেন। ১৫৭০ অব্দে আগ্রা হইতে ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী ফতেপুর-সিক্রী নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তনোদ্দেশে তথায় বহু সুন্দর সুন্দর সৌধাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পূর্ব্বে আগ্রা নগরী প্রাচীরবদ্ধ ছিল—এখন তাহা নাই। মহাত্মা আকবরের সময়ে আগ্রা নানা সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও অট্টালিকায় যেমন সুশোভিত ছিল তদ্রূপ ইহার জলবায়ুও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া খ্যাত ছিল। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আকবরের সমকালীন একজনপ্রধান গ্রন্থকারের কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে তৎকালীন আগ্রা নগরীর এইরূপ বিবরণ আছে;—"আগরা বৃহৎ সহর। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। আগরায় যমুনা নদীর উভয় তীর সুদৃশ্য অট্টালিকা ও উদ্যানে শোভিত। সকল দেশের লোকই এখানে বাস করিয়া থাকে। বাদশাহ্ এখানে রক্তপ্রস্তর দ্বারা একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, এমন সুন্দর দুর্গ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্গের মধ্যে পাঁচশত প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ আছে, সেই সকল গৃহ মনোহর কারুকার্য্যে শোভিত। * * * পূর্ব্বে আগ্রা একটী গ্রাম ছিল, বাদশাহ্ তথায় তাঁহার এই সমৃদ্ধ নগরী স্থাপিত করিয়াছেন। * * * আগ্রা মহা সমৃদ্ধি-শালী রাজধানী। বড় বড় আমীর-ওমরাহ্গণের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় সমুদয় রাজধানী সুসজ্জিত। এখানে নানা শ্রেণীর শিল্পকর সর্ব্বদাই বাস করে; সুতরাং এখানে অনেক উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।" সম্রাট্ আকবরের পরে জাহাঁগীর ও শাহ্জাহাঁর রাজত্বকালে আগ্রার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। আগ্রার দুর্গ মধ্যস্থিত "জাহাঁগীর-মহাল" নামক যে অংশ দেখিতে পাওয়া যায় উহা সম্রাট্ জাহাঁগীরের নির্ম্মিত। যে স্থাপত্য-শিল্প-গৌরবের নিমিত্ত আগ্রা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত সেই মহিমান্বিত 'তাজমহাল' সম্রাট শাহ্জাহাঁ নির্ম্মাণ করেন; ইঁহার সময়েই আগ্রার শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উন্নতি হয়। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্জাহাঁ, পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং আগ্রারই দুর্গমধ্যে কারারুদ্ধ হ'ন। তিনি বন্দী অবস্থায় সাত বৎসর জীবিত ছিলেন। আওরঙ্গজেব উক্ত অব্দে রাজধানী আগ্রা

হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন, এ সময় হইতেই আগ্রা নগরের পতন আরম্ভ হয়। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইহা সিন্ধিয়ার হস্তগত হয় ও পরিশেষে ১৮০৩ সালে লর্ড লেক ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। তদবধি ইহা ইংরেজরাজের অধীনেই আছে। বর্ত্তমান সময়ে পেশোয়ার যেমন ইংরেজ রাজ্যের সীমান্ত বলিয়া পরিচিত, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে তেমনি আগ্রাই ইংরেজ রাজ্যের সীমান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। যখন আগ্রা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ইংরেজ রাজধানী ছিল, তখনও ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজধানী আগ্রা হইতে উঠিয়া এলাহাবাদে আসার পর হইতে চঞ্চলা রাজ-শ্রী আগ্রা নগরীকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই সমৃদ্ধি—সেই প্রাচীন গৌরববৈভব এখন আর আগ্রায় কিছুই নাই। হায়! একদিন যেখানে আকবর, জাহাগীর, শাহ্জাহাঁ প্রভৃতি মোগল সম্রাট্গণের বিজয়-বৈজয়ন্তী গৌরবে উড্ডীন থাকিত, এখন সেই আগ্রায় তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তিরাশির চিহ্ন-ব্যতীত আর কিছুই নাই। কালের অমিত তেজপ্রভাবে মোগল রাজ-শক্তি চিরঅন্তর্হিত হইয়াছে। আগ্রায় আসিয়া কত কি ভাবিলাম। অতীতের জনকোলাহল-মুখরিত উজ্জ্বল আলোকমালাবিচ্ছুরিত আমোদ-উচ্ছ্বাস-পরিপ্লুত মহিমমণ্ডিতা প্রাচীন আগ্রা ও বর্ত্তমান হত শ্রী আগ্রায় কত প্রভেদ! জগতের প্রত্যেক পদার্থই প্রতি মুহূর্ত্তে অজ্ঞান মানবকে 'যমুনা-লহরীর' মতই উপদেশ দিতেছে "কাল প্রবল চির দিন ও"।

বর্ত্তমান সময়েও আগ্রা একটী বাণিজ্য প্রধান সহর। এস্থান হইতে ভারতের নানাদিকে বহু রেলওয়ে লাইন যাওয়ায় নানা স্থানের পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ এস্থানে আনীত হইয়া থাকে। আগ্রার পণ্যজাত দ্রব্যের মধ্যে জরির ফিতা, সতরঞ্চি, নানাবিধ প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত ও সুন্দর। রোহিলখণ্ডের চিনি সর্ব্ব প্রথমে এখানে আনীত হইয়া পরে অন্যান্য প্রদেশে প্রেরিত হয়।

আগ্রা নগরী প্রাচীন সুন্দর সুন্দর সৌধাবলীতে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সৌধগুলি প্রত্যেক ভ্রমণকারীরই দর্শন করিয়া আসা কর্ত্তব্য।



তাজমহল—আগ্রা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

(১) বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল (২) দুর্গ (৩) দেওয়ানী-খাস (৪) দেওয়ানী-আম (৫) জেনানা (৬) মতি মস্‌জিদ (৭) নগাদা মস্‌জিদ (৮) শিশ মহল (৯) সেকেন্দ্রা (১০) এতিমাদ্‌-উদ্দৌলার কবর (১১) আরাম বাগ, ইত্যাদি। আমরা আহারাদির পর বিশ্রামান্তে একখানা শকটারোহণে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। রাস্তা, ঘাট, সুপ্রশস্ত, উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণি-শ্রেণী। একটী রাস্তা প্রস্তর দিয়া বাঁধান, উহার উপর দিয়া গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি সমুদয়ই যাতায়াত করিয়া থাকে। আগ্রা আসিয়া সাধারণতঃ সকলের মনেই সর্ব্বাগ্রে বিশ্ব-বিখ্যাত তাজমহল দর্শন করিবার বাসনা বলবতী হইয়া থাকে, আমাদেরও তাহাই হইয়াছিল। কতক্ষণে সেই সৌন্দর্য্য-ময়ী সৌধ-সুন্দরীকে দেখিব কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম,—গাড়ী দ্রুত চলিতেছে, কিন্তু মনে হইতেছিল যে আরও দ্রুত চলিলে ভাল হয়। হৃদয়ের সে ব্যগ্রতা, সে ঔৎসুক্য ভাষায় প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। কল্পনায় এতদিন যে অনবদ্য সৌন্দর্য্যের ধ্যান করিয়াছি,—প্রেমের অপূর্ব্ব-প্রীতির অনির্ব্বচনীয় নিদর্শনের স্মৃতি যে চিত্র ফলকে অঙ্কিত করিয়াছি, আজ তাহা নয়ন-সমক্ষে দেখিতে পাইব, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? বুঝি তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোকেরাও তীর্থে পঁহুছিয়া দেব-দর্শনের জন্য এত উৎসুক হয় না। কুহকিনী কল্পনা-বলে মানস-মধ্যে যে অনিন্দ্য শিল্প-চাতুর্য্যের মহিমাময় গৌরবছবি দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলাম—যে মুহূর্ত্তে আমাদের অশ্ব-শকট আসিয়া তাজের বহির্দ্বারে দাঁড়াইল সেই মুহূর্ত্তে পূর্ব্বের কল্পনার ছবি—অতি ক্ষুদ্র অতি দূষণীয় বলিয়া অনুভূত হইল! মানস-সৃষ্ট তাজের ছবি লজ্জায় হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনেক সময়ে মানব-কল্পনার এমনি দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে! তাজের বিশাল দ্বারটি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বহির্দ্বারের উপরে হিন্দুস্থানের অভ্যর্থনা-সূচক "রাম রাম" এই হিন্দী বাক্য দুইটী লিখিত রহিয়াছে। বহির্দ্বার অতিক্রম করিয়া ক্রমে আমরা প্রধান সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। বাহির হইতে এই সিংহদ্বারের সৌন্দর্য্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। ইহা লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। দ্বারের গাত্রদেশ নানাবিধ বর্ণের প্রস্তরের মিশ্রণে অতি সুন্দর কারুকার্য্যে মণ্ডিত। ইহাকে দ্বার না

তাজ-মহল।

বলিয়া স্বতন্ত্র একটী হর্ম্ম্য বলিলেই ঠিক্ হয়,—সাধারণ প্রবেশ দ্বারের সহিত ইহার কোনও তুলনা হয় না। প্রবেশপথের এই সৌধের উপর হইতে তাজ বড়ই সুন্দর দেখায়! এই দ্বারের সম্মুখেও একটী প্রস্তরে লিখিত আছে যে "হে পথিক! যদি তুমি তাজ দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে এই সিংহদ্বারের উপর হইতে একবার ইহা দর্শন কর।" আমরা নির্ম্মাতার এ অনুরোধ রক্ষা করিলাম। ত্বরিত-পদে সিংহদ্বারের উপরে উঠিয়া যাহা দেখিলাম, সেই ভুবন-মন-মোহন সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি ভাষায় হওয়া অসম্ভব! শিল্প-সৌন্দর্য্যের এক মহান্ দৃশ্য এতদিনে নয়ন-সমক্ষে উন্মুক্ত হইল। শিল্পের কি রমণীয় সৃষ্টি! কি পরিষ্কার, কি পরিচ্ছন্ন! সুরুচির এমন চরমোৎকর্ষ-এমন আশ্চর্য্য কল্পনার জীবন্ত ছবি দর্শনে হৃদয়ে যে আনন্দ ও প্রীতির উদয় হইয়াছিল, ভাষায় এমন শব্দ নাই যে তাহা প্রকাশ করিতে পারি। এই সিংহদ্বারের উপরিভাগ হইতে তাজের অতুল্য সৌন্দর্য্য এককালে দৃষ্টিগোচর হয়,—ইহার সম্মুখস্থ উদ্যানের শোভা, চারি পার্শ্বস্থ চত্বরের শোভা, পার্শ্বস্থ দুই সিংহদ্বারের শোভা চারি কোণের চারি স্তম্ভের শোভা ও অদূরস্থ যমুনার নীল-লহরী-লীলার শোভা এককালে হৃদয় ও মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। আমরা কিয়ৎকাল সিংহদ্বারের ছাদের উপরিভাগে দাঁড়াইয়া দিগন্তব্যাপী প্রকৃতি-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-তরঙ্গের যেন একটা প্রগাঢ়-কম্পন হৃদয়ে অনুভব করিলাম,—ধীরে অতি-ধীরে যমুনার শীতল-শীকর-সিক্ত সমীরণ আসিয়া আমাদের শ্রম-ক্লান্ত তপ্ত ললাটে জননীর স্নেহ-চুম্বনের ন্যায় শান্তি দিতেছিল। একদিকে তাজের অনবদ্য গৌরবময় সৌন্দর্য্য, অপর দিকে প্রান্তর ও সৌধকিরিটিণী মোগল-গৌরব-বৈভবের পরিত্যক্ত-স্মৃতি আগ্রা নগরী দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়া, মনে যুগপৎ শান্ত ও গম্ভীর ভাবের উন্মেষ করিয়া দিতেছিল। তৎপরে সিংহদ্বারের উপর হইতে অবতরণ করিয়া আমরা নীচে আসিয়া উহার পার্শ্বস্থ একটী কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলাম, ঐ গৃহে নানা দেশের নানা প্রাচীন দ্রব্যাদি সংগৃহীত আছে, তন্মধ্যে বৌদ্ধ এবং জৈন কীর্ত্তিই অধিক, এতদ্ব্যতীত যমুনাগর্ভে প্রাপ্ত একটী সুন্দর কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখিলাম। একটী প্রস্তর মধ্যে রাজ্ঞী যোধবাইয়ের নয় লক্ষ টাকার হারের গড়নের ছবি দেখিলাম। তাজের দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী মস্‌জিদ—পূর্ব্বে ও

পশ্চিমে অবস্থিত। পশ্চিমদিকেরটি মস্‌জিদের অনুকৃতি মাত্র। সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেই একটী প্রস্তর নির্ম্মিত পথ, এই পথের সম্মুখেই ভুবনমোহিনী তাজ-সুন্দরী আপনার সৌন্দর্য্য-বিপণি খুলিয়া দণ্ডায়মান। পথের দুইধারে ঝাউ গাছের সারি, — মৃদু-পবনে ঝাউগাছের সোঁ সোঁ শব্দের মধ্য হইতে নৈরাশ্যের একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস শ্রবণে প্রবেশ করিতেছিল। সিংহদ্বারের চত্বর হইতে অবতরণ করিলেই সম্মুখে মনোহর উদ্যান, উহার মধ্যস্থলে একটী প্রস্তর বাঁধান কৃত্রিম ঝিল। তন্মধ্যে সুবর্ণ-বর্ণের মৎস্য-দিগকে ক্রীড়া-পরায়ণ দেখিলাম; একবার তাহারা বাহিরে আসিতেছে পুনরায় শৈবাল মধ্যে লুকাইয়া যাইতেছে! ঝিলের উভয় পার্শ্বে মনোহর ফুলের গাছ ও গাছের সুদর্শন কেয়ারী। তরুরাজির শীতল ছায়া, যমুনা-সলিল-শীকর-শীতল বিবিধ-কুসুম-সৌরভ সুরভিত সমীর-উচ্ছ্বাস আর সম্মুখস্থ মানবশিল্পের অপূর্ব্ব ও চূড়ান্ত নিদর্শন তাজের মৌন-সৌন্দর্য্য এক-কালে দর্শককে বিস্ময়-মুগ্ধ করিয়া ফেলে। তাজ একটী প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ বৃহৎ বেদীর উপরে নির্ম্মিত। যদিও কোন সরকারী হুকুম নাই, তথাপি তাজের বহিশ্চত্বরে উপবিষ্ট জনৈক মুসলমান আমাদিগকে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া তাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। আমরাও বিনা আপত্তিতে তাহা মানিয়া লইলাম। পার্থিব-প্রণয়ের অপূর্ব্ব নিদর্শন—শিল্পের চরমোৎকর্ষ—তাজের প্রস্তর-গাত্রে ও পাদুকার পদাঘাত হৃদয়হীনতার কর্ম্ম মনে করিয়াই আমরা পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। নশ্বর জগতে প্রেমের অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিবার যত্ন—এক তাজ ব্যতীত জগতের অন্যত্র আর নাই। যে বেদীর উপরে তাজ নির্ম্মিত, উহা ৮ ফুট উচ্চ ও লোহিত প্রস্তরে গঠিত, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯৫০ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩৩০ ফুট। এই বেদীর উপরে আরেকটি বেদী আছে, উহা মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত। উহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩১৩ ফুট এবং উচ্চতা ১৮ ফুট হইবে। এই বেদীর উপরেই তাজ নির্ম্মিত। এবং ইহারই চারি কোণে চারিটী মর্ম্মর নির্ম্মিত মিনার বা উচ্চ শোভা-স্তম্ভ আছে। এই মিনার বা শোভা-স্তম্ভ চারিটী ত্রিতল, ত্রিতলের উপরে প্রত্যেক স্তম্ভের উপর এক একটী গম্বুজ। এই

গম্বুজগুলিকে চতুর্থ তল বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারা যায়। এখানে উহাদের উচ্চতা দেওয়া গেল।

প্রথম তলের উচ্চতা—৩৮ ফিট
দ্বিতীয় " " —৩৫ "
তৃতীয় " " —৩৯ "

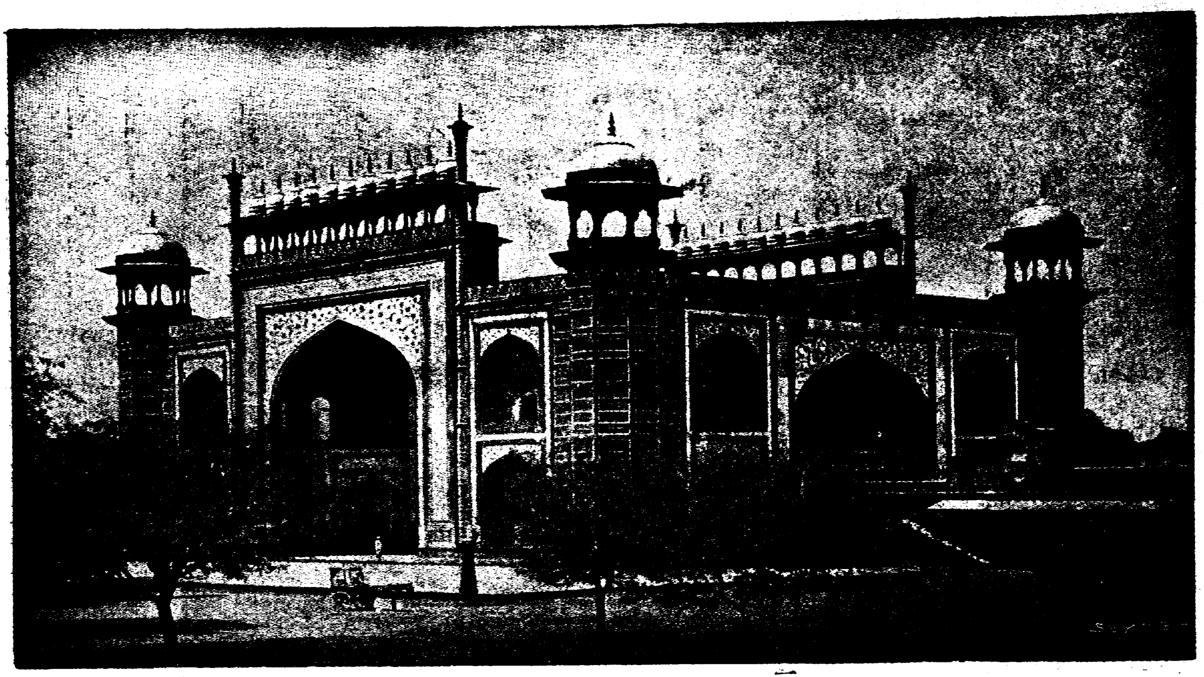
যে লোহিত প্রস্তরের বেদীর উপরে তাজ সংস্থাপিত উহার উপর হইতে মিনার বা স্তম্ভের উচ্চতা ১৩৩ ফিট; আর ভূমিতল হইতে মিনারের চূড়ার অগ্রভাগ ১৬২ ফিট উচ্চ। স্তম্ভগুলির প্রত্যেক তলেই এক একটী অপ্রশস্ত বারাণ্ডা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। মিনারের বহিরাবরণ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত, কিন্তু উহাদের সিঁড়িগুলি লোহিত প্রস্তরে প্রস্তুত।

আমরা তাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম, সেখান হইতে একটী মর্ম্মর প্রস্তরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বরাবর একটী ক্রমনিম্ন পথ ধরিয়া সম্রাট শাহ্জাহাঁ ও তৎপ্রিয়তমা মহিষী মমতাজ-ই-মহালের সমাধি প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলাম। এই ঘরটি একটু অন্ধকার। এ প্রকোষ্ঠে কোনও বিশেষ শিল্প-চাতুর্য্য নাই! কিন্তু প্রেমের যে অতুল্য দেবমূর্ত্তি-দ্বয় এখানে সমাহিত আছেন, তাঁহাদের প্রেমের নির্ম্মল সুরভিতেই ইহা সুরভিত ও অনাবিল শুচিতাও সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে এই প্রকোষ্ঠে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না।* তখন বৎসরের মধ্যে এক দিনমাত্র মহাসমারোহে ইহা খোলা হইত। এখন আর সে দিন নাই। এখন কি ইউরোপীয়, কি এদেশীয় খৃষ্টানগণ পাদুকাসহ গর্ব্বিত-পদ-চালনায় এই সমাধি-প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন না। খৃষ্টান-ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীই এখানকার রক্ষকের বিনীত অনুরোধ পালন-করাকে অপমানজনক মনে করেন না। আমাদের মনে হয়, খৃষ্টানদিগের এইরূপ ঔদ্ধত্য সহকারে সমাধিমন্দিরের

---

* * * * * a little chamber inclosing sepulchre, which I have not seen within, it not being opened but once a year, and that with great ceremony not suffering any Christian to enter, for fear (as they say) of propensing the sanctity of the place.

Bernier's travels in Hindustan, Page 280,



তাজমহলের তোরণ—আগ্রা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

পবিত্রতা বিনষ্ট করা বিকৃতরুচির পরিচায়ক। তাজ দ্বিতল। ঊর্দ্ধতলেও নিম্নতলের ন্যায় শাহ্‌জাহাঁ ও মমতাজ-ই-মহালের কৃত্রিম সমাধি আছে। এই কৃত্রিম কবর প্রস্তরময় সুন্দর পর্দ্দা দিয়া ঘেরা। এই কক্ষের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া একটী পার্শ্ব-গৃহ আছে, এই গৃহের কারুকার্য্য দর্শনে হৃদয়ে যে আশ্চর্য্য-ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। এ গৃহের প্রতি কার্য্যই সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। শ্বেত প্রস্তর খুদিয়া এমন সুন্দর সুন্দর প্রস্তরের ফুল ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে যে তাহা কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না—প্রতি পাপ্‌ড়ির নির্ম্মাণে স্বভাবের পূর্ণ সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত! প্রাচীরের ধারে নানা বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর ছোট প্রস্তরের সারি অতি নিপুণতার সহিত সুসজ্জিত—যে যে স্থান হইতে সে সকল প্রস্তর অপহৃত হইয়া গিয়াছে, সে সকল স্থান অন্য প্রস্তর দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের হানি হওয়ায় শিল্প-জ্ঞান-হীন সাধারণ দর্শকের নিকটেও অতি বিষদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পার্শ্ব-গৃহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্য দর্শনান্তে আমরা মধ্যস্থ কবরের নিকট আসিলাম—এই কবর যে কি সুন্দর,—কি সুন্দর প্রস্তর-কুসুমে সুসজ্জিত, তাহা ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস হাস্যজনক। নানাদেশ-দেশান্তর হইতে আনীত নানা বর্ণের প্রস্তরের মিশ্রণকার্য্য বা মোজেয়িক শিল্পে এই সকল ফুল, লতা, পাতা অঙ্কিত। কবর ব্যতীত অনেক স্থলেই এই শ্রেণীর কারুকার্য্য বর্ত্তমান। সমাধি-গৃহের সম্মুখের দ্বার ভিন্ন তাজের অন্যান্য সমস্ত দ্বারই মর্ম্মর প্রস্তরের জাফ্‌রি বা জাল্‌তি দ্বারা আবদ্ধ। অন্য সমস্ত কবাট ও চৌকাঠ চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত। কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই সুন্দরী অর্জ্জুমন্দ বানু বেগমের কথা মনে ভাবিলাম। ধন্য তুমি! না জানি রূপসী, তুমি কতই সুন্দরী ছিলে যে বাদশাহ্‌ তোমার সমাধির উপর সে সৌন্দর্য্যের সম্মান রক্ষার্থ এই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যময় সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন!

তাজমহলের উৎপত্তির ইতিহাসটি অতি সুন্দর। কথিত আছে যে, একদিন মমতাজ বেগম ভারতেশ্বর শাহ্‌জাহাঁর সহিত শতরঞ্চ ক্রীড়া করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "জাঁহাপনা, যদি আমি আপনার পূর্ব্বে

পরলোকগমন করি, তাহা হইলে, "আপনি আমার কিরূপ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন ?" সম্রাট্ সাম্রাজ্ঞীর এই বাক্যে ব্যথিত চিত্তে কহিলেন, "প্রিয়তমে, সত্য সত্যই যদি বিধাতা তোমাকে আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলে, আমি তোমার সমাধির উপর এমন এক সৌধ নির্ম্মাণ করিব, যাহাতে তোমার ও আমার প্রেমের স্মৃতি চিরদিন জগতের বুকে অমর হইয়া থাকিবে।" বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে সাম্রাজ্ঞী অর্জ্জমন্দ বানু বেগম ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দে একটী কন্যা প্রসব করিয়াই দুই ঘণ্টা পরে চিরদিনের জন্য নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে মমতাজ গর্ভ মধ্যেই গর্ভস্থ শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। মমতাজ মৃত্যু সময়েও তাঁহার স্বামীকে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই। শাহ্জাহাঁ মমতাজকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন,—তিনি মহিষীর মৃত্যুতে একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। শাহ্জাহাঁ স্বীয় প্রতিজ্ঞা-রক্ষণে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হইলেন না। মমতাজের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তিনি এই জগদ্বিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। মমতাজের মৃত্যুর পরে, শাহ্জাহাঁ প্রায় ৩৫ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।—তাঁহার চরিত্রের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, মমতাজের মৃত্যুর পর তিনি আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাজের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া, দ্বাবিংশতি বৎসর ধরিয়া বিংশতি সহস্র শিল্পী ও মিস্ত্রীর সাহায্যে শেষ হয়। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে আনুমানিক ৪,১১,৪৮,৪২৬ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাজ নির্ম্মাণের সময় অন্যান্য রাজা-মহারাজারাও নানাবিধ বহুমূল্য উপকরণ-দ্বারা শাহ্জাহাঁকে সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়পুরের মহারাজা তাজের সমুদয় শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর সরবরাহ করিয়া বিশেষরূপে সম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার নির্ম্মাণের জন্য ওড়িষ্যা, পঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের নানা দেশ ও তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি ভারতের বহির্দ্দেশ হইতেও বহুবিধ উপকরণ, শিল্পী ও স্থপতি আনীত হইয়াছিল। ইহাদের বেতন সাধারণতঃ একশত হইতে পঞ্চশত মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

তাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের নাম—ইসা মহম্মদ।



সাজাহান ও মুমতাজমহেল।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

তাজের প্রধান চিত্রকরের নাম—অসরনদ্ খাঁ।
" " রাজ মিস্ত্রীর নাম—মহম্মদ হানিফ।

ইঁহারা প্রত্যেকেই মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেন। এখন পাঠক! একবার ইহার নির্ম্মাণের অপূর্ব্ব আয়োজন ও উৎকর্ষতার বিষয় চিন্তা করুন। তাজমহলের উপরে গৃহভিত্তিতে পারস্যভাষায় সমাহিত পতিপত্নীরও ইহার নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে যে সকল লিখিত বিবরণ আছে, আমরা এখানে সে সকলের সার-সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

অর্জ্জুমন্দ বানু বেগম যাঁহার উপাধি ছিল 'মম্‌তাজমহাল' তিনি এই সমাধি নিম্নে তাঁহার প্রিয়তম পতি বাদশাহ্ শাহ্জার সহিত চিরনিদ্রামগ্ন আছেন। ১০৪০ হিজরায় রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়।

ইঁহারা "রিদ্‌উন ও খুন" নামক দুই স্বর্গের অধিবাসী। তারকাখচিত আকাশ- সিংহাসনে উপবিষ্ট "শাহ্জাহাঁ বাদশাহ্ গাজী" এই স্থানে সমাহিত আছেন। ১০৭৬ হিজ্‌রায় রজবের ষড়্‌বিংশতি দিবসে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইহার পরে কারিকরগণের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়,—প্রধান কারিগর ইসা মহম্মদ এক সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন পাইতেন, প্রধান চিত্রকর অসরনদ্ খাঁ সিরাজ হইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহারও মাসিক বেতন এক সহস্র মুদ্রা ছিল। এতদ্ব্যতীত তুরস্ক, পারস্য, দিল্লী, পাঞ্জাব ও কটক হইতে বহু শিল্পী আনীত হইয়াছিল। জয়পুর ও রাজপুতনা হইতে শ্বেত মর্ম্মর, নর্ম্মদা-তীর হইতে পীত মর্ম্মর (ইহার প্রত্যেক বর্গ গজ ৪০ টাকা), "চারকো" বা চারপাহাড়" হইতে কৃষ্ণ মর্ম্মর (ইহার প্রত্যেক বর্গ গজ ৯০৲ টাকা), চীন হইতে স্ফটিক মর্ম্মর (ইহার প্রতি বর্গ গজ ৫৭০৲ টাকা) আসিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব হইতে সূর্য্যকান্তমণি, বোগদাদ্ হইতে পদ্মরাগমণি, তিব্বত হইতে নীলকান্তমণি, সিংহল হইতে "লেপিস্‌লাজুলি" নামক বহুমূল্য প্রস্তর আরও দেশ দেশান্তর হইতে বহু মণি আনীত হইয়াছিল।

সাধে কি তাজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে! তাজের শীর্ষস্থ গম্বুজ ৮০ ফুট উচ্চ। উহার ব্যাস ৫০ ফুট। ভিত্তিস্কন্ধের যে স্থান

হইতে গম্বুজ উঠিয়াছে, ভূমিতল হইতে তাহার উচ্চতা ১৩৯ ফুট। অতএব গম্বুজের শীর্ষদেশ ভূমিতল হইতে ২১৯ ফুট। গম্বুজের উপরে আবার স্বর্ণোজ্জ্বল পিত্তলের চূড়া রহিয়াছে, উহার উচ্চতাও ৩০ ফুট, মোটের উপরে ভূমিতল হইতে তাজের চূড়ার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ২৪৯ ফুট উচ্চ। তাজের মধ্যস্থ এই বৃহৎ গম্বুজ বেষ্টন করিয়া হর্ম্ম্যের উপরিভাগে চারিকোণে আবার চারিটী গম্বুজ আছে। এপর্য্যন্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেশান্তর হইতে কত লোক আসিয়া তাজ দর্শন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের প্রকৃত বর্ণনা করিতে সমর্থ হন নাই। কথিত আছে, যে পূর্ব্বে তাজমহলে প্রবেশ করিবার দ্বারদেশে একযোড়া রজত নির্ম্মিত কবাট ছিল, উহার নির্ম্মাণে ১,২৭,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। যখন জাঠেরা আগ্রা আক্রমণ করে, তখন তাহারা এই কবাট জোড়া লইয়া যায় এবং পরে উহা গলাইয়া ফেলে।* পূর্ব্বে তাজে যে সমস্ত বহুমূল্যবান রত্নসমূহ ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। সেগুলি কোথায় গেল, সে অনুসন্ধানের মর্ম্মভেদী বিবরণ আমরা প্রকাশ করিব না।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত তাজের শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের জাল্‌তির (Trellis work) কার্য্যে হানি-সাক্‌ল (Honey-Suckle) পুষ্পের খোদাই দর্শনে, ইহা ইটালীয় আদর্শ মনে করেন এবং তাজের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অষ্টিন (Austin De Bordeaun) নামক জনৈক ফরাসীকে ইহার শোভা সম্পাদনের নেতা মনে করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য মনে করেন। ইহা নিতান্ত ভুল। ঐতিহাসিক কিনও এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ইহাতে ইটালীয় শিল্পের বা আদর্শের কোনও সৌসাদৃশ্যই বিদ্যমান নাই। তিনি বলেন যে ইহার বহিরাকৃতির কল্পনা সম্রাট্ হুমায়ুনের সমাধিসৌধ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।† তাজমহলের সৌন্দর্য্যবর্ণনা এ দীন লেখকের লেখনী দ্বারা পরিস্ফুট হওয়া অসম্ভব। কর্ণেল স্লিম্যান সাহেব তাজ দর্শনান্তে তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি তাজ কেমন দেখিলে?" তদুত্তরে তাঁহার পত্নী বলিয়াছিলেন যে "আমি ইহা দেখিয়া

* *Vide* Hand book of Agra—Keene p. 29.

† *Vide* Keene's Hand book of Agra p. 25, 26,

হৃদয়ে যে ভাব অনুভব করিতেছি, তাহা তোমাকে বলিতে পারিব না, আর এইরূপ মহান্ সৌধের সমালোচনা আমার সাধ্যাতীত। তবে আমার হৃদয়ের কথা তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি যে যদি আমার সমাধির উপরে এইরূপ একটী অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়—তবে আমি কল্যই মরিতে প্রস্তুত আছি। * একজন ফরাসী শিল্পী তাজ দর্শনে বলিয়াছিলেন "তাজ যেন ঠিক্ একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক, দূর হ'তে তাকে যত ইচ্ছা নিন্দা কর, কিন্তু কাছে এলে মুগ্ধ হইতে হইবেই।" কবিকুলতিলক টেনিসন তাজকে 'Tears in marble' 'মর্ম্মরীভূত অশ্রু' বলিয়া গিয়াছেন। তাজের অভ্যন্তরের প্রতিধ্বনি বিশেষ উপভোগ্য, সামান্য মৃদু শব্দও গভীর নির্ঘোষে উহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে।

তাজ দর্শনান্তে আমরা তাহার এক কোণের একটী স্তম্ভের উপর আরোহণ করিলাম,—তখন সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন,—লোহিত কিরণ-রাশি যমুনার নীল-বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছে। একটা মৌন স্তব্ধতা চারিদিক বেষ্টন করিয়া সমাধি-স্থলের বিজনতা প্রকাশ করিতেছে, চারিদিক শান্ত-শোভায় সুন্দররূপে উদ্ভাসিত। স্তম্ভের শিরোদেশে যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে বসিয়া চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিলাম। আগ্রা যে কত বড় সহর, তাহা এই স্থান হইতেই বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। একদিকে অট্টালিকার পর অট্টালিকা-শ্রেণী নয়ন-পথে পতিত হইতে থাকে আর অপর দিকে সুদূরস্থ মথুরানগরীর কোন কোন উচ্চ দেব-মন্দির গাঢ়-ধূমময় মন্দিরের মত বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের মধ্য দিয়া দৃষ্টি পথে পতিত হয়। কথিত আছে যে এই স্থান হইতে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দূরস্থ মথুরার গোবিন্দজীর মন্দিরের শিখরস্থ আলোক দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দেব-মন্দির ভূমিসাৎ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

---

* I asked my wife, when she had gone over it, what she thought of the building? "I can not" said she, "tell you what I think, for I know not how to criticise such a bulding, but I can tell you what I feel. I would die to-morrow to have such another over me."

Vide Rambles and recollections p. 382 VOL II by—Colonel Sleeman

Vide Keene's Hand book to Agra p. 29.

চারিদিকে যখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যখন হীরকোজ্জ্বল তারকা রাজি গগনমণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছিল, তখন আমরা একবার যমুনার দিকে ফিরিয়া উপবেশন করিলাম। নীল যমুনা-জল সন্ধ্যার আঁধারে আরো ঘোরালো দেখাইতেছিল। মৃদু-সমীরে যমুনার নীলজলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-রাজি উঠিতেছিল পড়িতেছিল—তাহার সেই করুণ কলনাদের ভিতর কতযুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অশ্রুরাশি রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যমুনা সত্য সত্যই একদিন সুরসুন্দরীরূপে গর্ব্বিতা ছিল—এখন সেদিন আর নাই!—

'আজি সব নীরব রে যমুনে সব
গত যত বৈভব কালেও।'

আমরা এস্থানে তাজ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করিবার লোভ-সংবরণ করিতে পারিলাম না, তিনি লিখিয়াছেন;—
"The Taj stands on the bank of the Jumna, rather more than a mile to the eastward of the Fort of Agra. It is approached by a handsome road cut through the monds left by the ruins of ancient palaces. Like the tomb of Akbar it stands in a large garden, inclosed by a lofty wall, arched galleries around the interior, and entered by a superb gateway of sandstone, inlaid with ornaments and inscriptions from the Koran, in white marble. Outside of this grand portal, however, is a spacious quadrangle of solid masonry, with an elegant structure, intended as a caravan serai on the opposite side. Whatever may be the visitor's impatience, he can not help pausing to notice the fine proportions of these structures, and the rich and massive style of their construction. The gate to the garden of the Taj is not so large as that of Akbar's tomb, but quite as beautiful in design. Passing under the open demi-vault, whose arch hangs high above you, an avenue of dark Italian cypress appears before you. Down its centre sparkles a long row of fountains, each casting up a

single slender yet. On both sides, the palm, the banyan, and a fealthey bamboo mingle their foliage ; the song of birds meets your ears, and the odour of roses and lemon flowers sweetens, the air. Down such a vista and over such a fore ground rises the Taj."*

আমরা এই দেশেরলোকে ইহাকে 'তাজ-মহাল' বলি, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা ইহা 'তাজবিবিকা-রওজা' বলে।

পরদিন প্রত্যুষে আমরা এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলার কবর দর্শন করিতে গমন করিলাম। ইহা যমুনার পরপারে অবস্থিত। আমাদের শকট যমুনার ভাসা-পুলের উপর দিয়া চলিল,—যমুনা নিতান্ত প্রশস্ত নদী নহে, দেখিতে দেখিতে আমরা উহা উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম। এহ্‌তমাম্‌- উদ্দৌলার একটু ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলার পূর্ব্ব নাম গায়েসউদ্দীন। ইনি সম্রাট্‌ জাহাঁগীরের সভায় উজীর ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ব-নিবাস পারস্য দেশান্তর্গত তিহারান নগরে ছিল। অদৃষ্ট-পরীক্ষার্থ স্ত্রী-পুত্র কন্যাসহ ভারতবর্ষে আসিয়া, ইনি সর্ব্ব-প্রথমে সম্রাট্‌ আকবরের বিশেষ অনুগ্রহলাভ করিতে সমর্থ হন। সম্রাট্‌ ইঁহার কার্য্যে ও ব্যবহারে প্রীত হইয়া ইঁহার গায়েসউদ্দীন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলা নাম রাখেন। সুন্দরী-কুল-শিরোমণি ভারতেশ্বরী নূরজাহাঁ এই গায়েসেরই দুহিতা, আর ইঁহার পুত্র আসফখাঁর কন্যা অর্জ্জমন্দবানু বেগম মম্‌তাজ-ই-মহাল নামেই শাহ্‌জাহাঁর বেগম হন।

এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলা।

১৬২২ খ্রীঃ অব্দে এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে নূরজাহাঁ তাঁহার পিতার সমাধির উপরে ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে এই সুন্দর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া দেন,—এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলার নামানুযায়ী সমাধি-হর্ম্ম্য সাধারণতঃ ও এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলা নামেই পরিচিত। এই হর্ম্ম্য মধ্যে গায়েস ও তাঁহার পত্নী উভয়েই চির নিদ্রা মগ্ন আছেন। গায়েস বেগ একজন সুকবি ও কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, আলস্য তাঁহাকে কখনও পরাজয় করিতে পারে নাই।

এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলার কবরের দ্বারদেশে গাড়ী পৌঁছামাত্রই 'গাইড্‌'রা দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু আমাদের গাইডের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

* Bayard Taylor.

এই সমাধি মন্দিরটি বড়ই সুন্দর। কথিত আছে যে, নূরজাহাঁ তাঁহার পিতার সমাধি রৌপ্যদ্বারা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিল্পিগণের আপত্তিতে তাঁহাকে সে বিষয়ে নিরস্ত হইতে হয়। সমাধি-মন্দিরের সম্মুখেই প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত তোরণ; সমগ্র সমাধি-মন্দির, অঙ্গন ও উদ্যানটী প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রাচীরের কোণে কোণে একেকটী গম্বুজওয়ালা সুন্দর সুন্দর সৌধ। আমরা প্রথমে অঙ্গন ও উদ্যানের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণান্তর পরিশেষে সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সমাধিস্থলটি যমুনার তীরে অবস্থিত, ইহা শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রথমেই গায়েস ও তাঁহার পত্নীর সমাধি-কক্ষে প্রবেশ করিলাম, এই কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ২২ ফিট—গৃহভিত্তিতে বহুকুলুঙ্গি আছে, এ সকল নানা সুন্দর সুন্দর পুষ্প ও পুষ্পপাত্র দ্বারা সুন্দর রূপে চিত্রিত। দেওয়ালে মিনের (enamal) কার্য্য আছে। সমাধি-মন্দিরের চারিকোণে চারিটী ৪০ ফিট উচ্চ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মিনার আছে—এই সকল মিনারের উপর আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম বোধ হয়। সমাধি-হর্ম্ম্য এক সুপ্রশস্ত রক্ত প্রস্তরের বেদীর উপরে নির্ম্মিত, বেদীটি অধিক উচ্চ নহে। কর্ণেল স্লিম্যান, হাণ্টার, ফার্গুসন প্রভৃতি প্রত্যেকেই এই সমাধি মন্দিরকে স্থাপত্যের একটী বিশেষ ঐশ্বর্য্য বলিয়া উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই।*

যমুনার তীরে 'চিনি-কা রওজা' নামক আরএকটী সমাধি দৃষ্ট হয়, তাহা তেমন দর্শনীয় নহে বলিয়া এস্থানে আর উল্লেখ করিলাম না। 'এহ্‌তিহাস্‌-উদ্দৌলা' চলিত কথায় এস্তমাজ্‌-উদ্দৌলা' ইতিমাৎ-উদ্দৌলা' ইত্যাদি নাম পাইয়াছে। এহ্‌তমাম্‌-উদ্দৌলার সমাধি মন্দির দর্শনান্তে রামবাগ বা আরাম বাগ দর্শন করিতে গেলাম। আরাম বাগের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে

রামবাগ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে একটু বেশ আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহার নাম রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন, আবার

---

* The tomb known as that of Itimad-ud-daula, at Agra, *** can not be passed over, not only from its own beauty of design, but also because it marks an epoch in the style to which it belongs. (Indian and Eastern Architecture, ed. 1876, p. p. 558.)

বাবারমত পতে হইা পাসা আরামবাগ* শব্দই পরে লোকমুখে রামবাগে পরিণত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইহা যে সম্রাট্ বাবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। আকবরের সময়ে আরামবাগ উদ্যানের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সুন্দরী-কুল-শিরোমণি নূরজাহা বেগম এস্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। নগরের কোলাহল হইতে দূরে এই স্থানটি বিজনতার সুন্দর জীবন্ত ছবি। প্রাচীনের চিহ্ন বর্ত্তমানে কিছুই নাই, কেবল কতকগুলি ফলের বৃক্ষ বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। বর্ত্তমান উদ্যানটি নিতান্ত আধুনিক, কিন্তু বড়ই সুন্দর। এ স্থানে লোকে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আসিয়া থাকে। আরামবাগ ঠিক্ যমুনার কূলে অবস্থিত থাকায়—ইহার শীতলতা বড়ই তৃপ্তিপ্রদ। বাগানের পার্শ্বস্থ একটী সিঁড়ি দিয়া মৃত্তিকা নিম্নস্থ একটী বহু প্রাচীন অন্ধকার ঘরের মধ্য দিয়া যমুনার তটস্থ এক ভগ্ন ঘাটে উপনীত হওয়া যায়। আরামবাগের তরুশ্রেণীর ছায়ায় উপবেশন করিয়া যমুনা-শীতল-শীকর-সিক্ত সমীরণ উপভোগ করা বড়ই তৃপ্তি ও শান্তি প্রদায়ক।

আগ্রার দুর্গ।

এখন আগ্রার বিখ্যাত দুর্গের কথা বলিব। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া এহ্‌তিমান্-উদ্দৌলা ও আরামবাগ দর্শন করিয়াছিলাম; মধ্যাহ্নে আহারাদির পরই দুর্গ দেখিতে যাত্রা করিলাম। দুর্গ দেখিতে হইলে "পাস" সংগ্রহ করিতে হয়, আমরা পূর্ব্বাহ্নেই পাস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম।

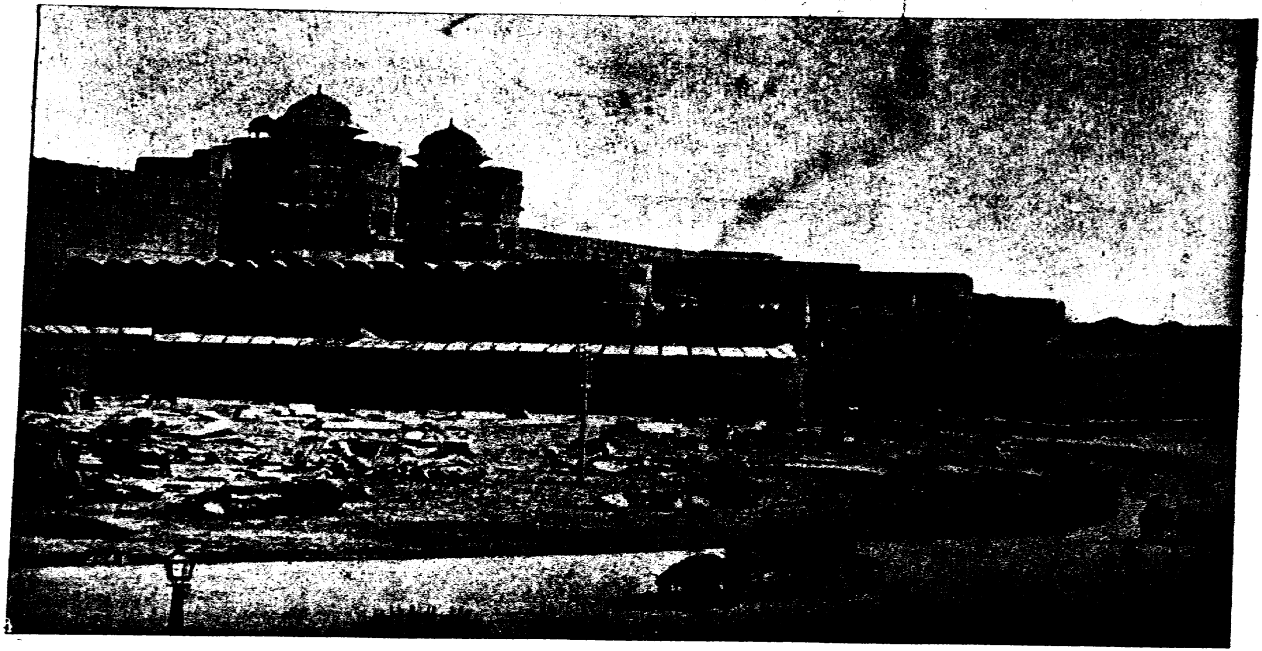
আগ্রার দুর্গকে দুর্গ বলিলে যাহা বুঝায় তাহা ভ্রম, কারণ ইহা আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত দুর্গ নহে। ইহাকে একটী পরিখা-বেষ্টিত প্রাচীর বদ্ধ প্রাসাদ বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। আমরা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে—পুড়িতে পুড়িতে দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলাম, সেখানে একজন গোরা সৈনিক পাহারা দিতেছিল। তাহাকে পাশ দেখাইবামাত্র সে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদিগকে দুর্গে প্রবেশের পথ ছাড়িয়া দিল। সম্রাট্ আকবর এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তবে দুর্গ মধ্যস্থ সমগ্র

* 'আরাম' সংস্কৃতেও আছে, তাহার অর্থ 'উদ্যান।' সে অর্থে আরাম-বাগ শব্দে পুনরুক্তি দোষ হয় কিন্তু এরূপ অনেক দেখা যায়।

সৌধাবলী তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ, ১॥ মাইল দৈর্ঘ্য লোহিত প্রস্তরের প্রাচীরদ্বারা দুর্গ বেষ্টিত। অন্যান্য দুর্গ যেমন সুরক্ষিত-দেখিতে পাওয়া যায় ইহা তদ্রূপ কিছুই নহে—প্রকৃতির সাহায্যেও ইহা সুরক্ষিত নহে।

আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করিবার দুইটী দ্বার আছে। একটীর নাম "দিল্লী গেট" বা দিল্লী দরওয়াজা, ইহা জামে মসজিদ ও ষ্টেসনের নিকটে, দ্বিতীয় দ্বারের নাম "অমর সিংহকা ফটক" বা কা দরওয়াজা অমর সিং নামে পরিচিত। সম্রাট শাহ্‌জাহাঁ মাড়ওয়ারবংশোদ্ভব অমরসিংহ নামক জনৈক সেনানীর শৌর্য্যে বীর্য্যে প্রীত হইয়া ইঁহার স্মৃতি সংরক্ষণার্থ এই ফটকের নামকরণ করিয়াছিলেন,—"অমর সিংহকা ফটক"। আমরা এই অমর সিংহকা ফটক দিয়া Draw bridge পার হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আগ্রার এই দুর্গটিকে স্বতন্ত্র একটী নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে খাসমহল, দেওয়ানী আম্, দেওয়ানী-খাস্, জেনানা, মতি মস্‌জিদ, নগ্‌দা মস্‌জিদ, জাহাঁগীর-ই-মহাল ও শিশা-মহাল প্রভৃতি বহু স্থান দেখিবার আছে। আমরা একে একে সে সকলের বর্ণনা করিলাম।

দেওয়ানী আম বা দরবার গৃহ,—এই সুবিশাল কক্ষে উপবেশন করিয়াই সম্রাট্ জনসাধারণের আবেদনাদি শুনিতেন, এই প্রকোষ্ঠের আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৯২ × ৬৪ ফুট। বর্ত্তমান সময়ে দেওয়ানী আমের-প্রাচীন সৌন্দর্য্য কিছুই বিদ্যমান নাই। ইংরেজ রাজের পূর্ত্ত-বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ ইহার সংস্কার করিতে গিয়া প্রাচীন সৌন্দর্য্য এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। জাহাঁগীরের রাজ-সভার-ইংরেজ দূত সার টমাস রো (Sir Thomas Roe) দেওয়ানী-আমের যে মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না। এই কক্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে সম্রাটের সিংহাসনের মঞ্চ ; মঞ্চটি মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত। এই সিংহাসনের সম্মুখে লোহিতবর্ণের প্রস্তরের রেলিং, এই রেলিংএর বহির্ভাগে ওমারহ্‌বৃন্দ উপবেশন করিতেন। এই কক্ষটির নির্ম্মাণের মধ্যে তাদৃশ শিল্প-কৌশল বা কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হইল না। দেওয়ানী-আমের ছাদ প্রস্তর স্তম্ভ দ্বারা রক্ষিত। এইরূপ একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই সিংহাসন



দুর্গ—আগ্রা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মঞ্চোপরি অন্য কেহ উপবেশন করিলে তখনি তাহার মুখে রক্ত উঠিয়া মৃত্যু হইবে। এসব জনপ্রবাদে কোনও সত্য নিহিত আছে কি না এবং তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিলাম না। নিজেও পরীক্ষা করিবার কৌতূহল দমনই করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে দরবার-গৃহের উপরিভাগ নাকি সুবর্ণ-খচিত ছিল, এখন কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই। একদিন যে গৃহ আমীর ওমরাহদ্বারা পরিবৃত থাকিত, যেখানে মহিমান্বিত মোগল সম্রাটগণ উপস্থিত থাকিয়া প্রজার আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করিতেন, এখন তাহা নীরব নির্জ্জন ও পরিত্যক্ত। কোথায় বা সেই মোগল সম্রাট্—কোথায় বা সেই আমীর ওমরাহ্! এখন কেবল মাত্র অতীতের চিহ্ন স্বরূপ 'দেওয়ানী আম' বিদ্যমান আছে, নচেৎ তাহার পূর্ব্ব সজীবতার কিছুই নাই। কালের কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন!

মচ্ছিভবন।

দেওয়ানী আমের পূর্ব্বদিকেই মচ্ছিভবন অবস্থিত, মচ্ছিভবনকে একটী লোহিত প্রস্তর বিনির্ম্মিত দ্বিতল সৌধ বলিলেই ঠিক্ হয়—ইহার প্রশস্ত অঙ্গন মধ্যে পূর্ব্বে জলাশয় ছিল এবং মচ্ছিভবনের বারাণ্ডায় উপবেশন করিয়া সম্রাট্ ও বেগমেরা মৎস্য-শিকার করিতেন। ইহার ঠিক্ উত্তর পশ্চিম কোণে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী মস্‌জিদ আছে উহা ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে বেশ সুন্দর, উহার নাম "নাগিনা মস্‌জিদ্।" দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ইহা ৩০ × ১৮ ফিট, ইহার কারুকার্য্য এতদূর সুন্দর ও গঠনের এমনি নৈপুণ্য যে দেখিলে বোধ হয় যেন ইহা অতি অল্প দিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদে হেরেমের মহিলাগণ নমাজ পড়িতেন, ইহার উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ অপূর্ব্ব দীপ্তিমাখা, ক্ষুদ্র হইলেও সৌন্দর্য্যে যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব খুব বেশী তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মস্‌জিদের সম্মুখে গোলাপ জলের ফোয়ারা ও ইহার সন্নিকটেই মিনাবাজার নামক বেগমদিগের বাজার অবস্থিত, কথিত আছে যে এই বাজারেই বেগমগণ পছন্দানুযায়ী দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিতেন, বাজারের গৃহস্থ কক্ষগুলি লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত। একজন গাইডের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে এই মিনাবাজারের কোনও স্থান হইতে মৃত্তিকা নিম্ন দিয়া দুইটী পথ গিয়াছে

একটী তাজ পর্য্যন্ত, অপরটি দিল্লী পর্য্যন্ত—দুঃখের বিষয় যে আমাদের গাইড সে পথ দুইটী আমাদিগকে দেখাইতে পারিল না, এ উক্তি আমাদের নিকট নিতান্ত মিথ্যা বলিয়াই প্রতীতি হইল।

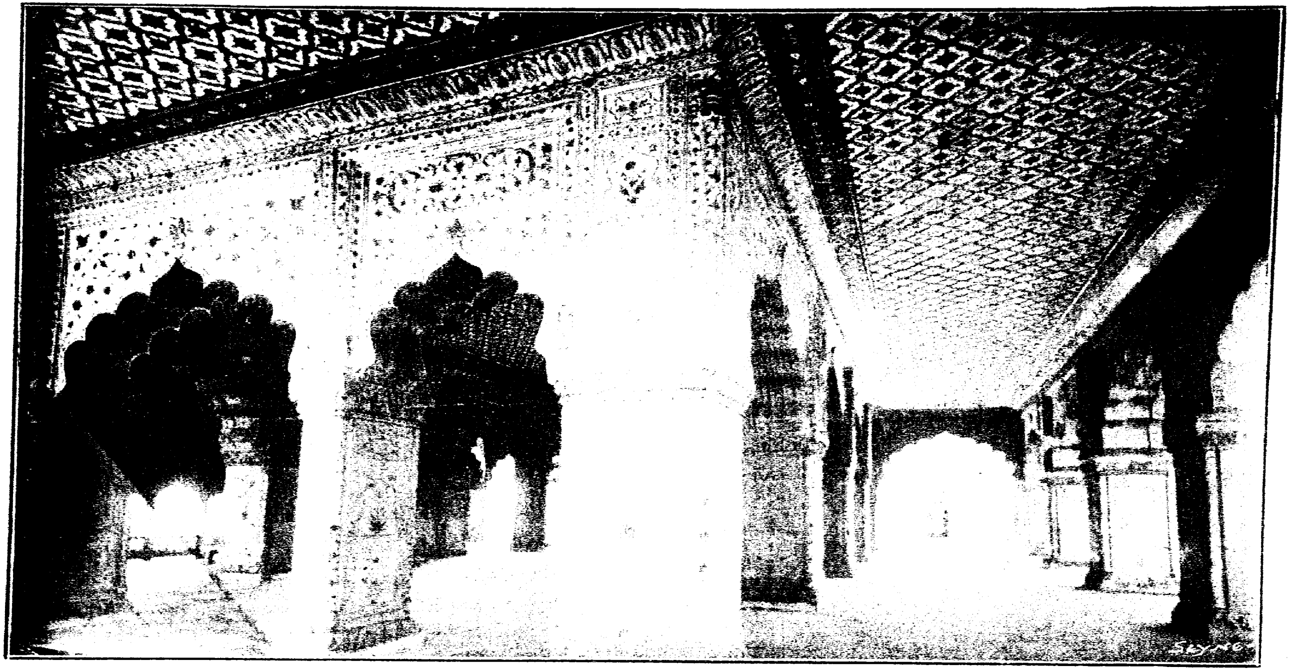
মচ্ছিভবনের সম্মুখস্থ ছাদের উপরে যে দিকে যমুনা প্রবাহিত, সে দিকে দুই খানি তক্ত বা প্রস্তরাসন আছে। উহার একখানি কৃষ্ণবর্ণ, অপরখানি শ্বেতবর্ণ। এই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরাসন খানি একটী দেখিবার জিনিষ। কথিত আছে যে সম্রাট্ নিশীথে এই কৃষ্ণবর্ণ শিলাসনের উপরে স্বয়ং উপবেশন করিতেন এবং অপর খানার উপরে মন্ত্রী বীরবল বসিয়া সম্রাট্ আকবরের সহিত নানাবিধ বাক্যালাপে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেন। এখান হইতে যমুনার সৌন্দর্য্য লোচনানন্দদায়ক। কোথায় সেই ভারতবিজয়ী সম্রাট্ আর কোথায়ই বা সেই রহস্যালাপে নিপুণ বীরবল! কালচক্রের বিঘূর্ণনে তাঁহারা কোন্ অদৃশ্য জগতে চলিয়া গিয়াছেন তাহা কে জানে? কিন্তু অদ্যাপিও তেমনি বিশীর্ণা যমুনা কল-কল্লোলে বহিয়া যাইতেছে, তেমনি করিয়া প্রকৃতির সমুদয় বিচিত্র-লীলা সম্পাদিত হইতেছে—কিন্তু তাঁহারা আর নাই! এই ত সেই প্রস্তরাসন—এই ত সেই যমুনা—এই ত সেই আগ্রা দুর্গ—সেই প্রাচীন মস্‌জিদ সমূহ, কিন্তু হায়! তাঁহারা কোথায়! সোঁ সোঁ শব্দে সমীরণ একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে জগতের নশ্বরতা প্রচার করিয়া গেল—যমুনাও করুণ কলনাদে তাঁহারি প্রতিধ্বনি গাহিতে গাহিতে হৃদয়ে নৈরাশ্য জাগাইয়া দিল! হায়! বসুন্ধরা--মানবের শান্তি-সুখ কি তোমার সহে? এইমর্ম্ম দুঃখেই বুঝি কবি গাহিয়াছেন;—

"মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।"

বাদশাহ যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরাসনের উপর উপবেশন করিতেন তাহা মধ্যস্থল দিয়া ফাটিয়া গিয়াছে, উহা শ্লেটজাতীয় প্রস্তর বলিয়া পণ্ডিতগণ ঠিক্ করিয়াছেন।

দেওয়ান খাস।

এস্থানে বাদশাহের গুপ্ত দরবার বসিত। এই কক্ষটি দেখিতে পরম রমণীয়। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ইহা ৬৪ ফুট ৯ ইঞ্চি ও ৩৪ ফিট, উচ্চতা ২২ ফিট। এককক্ষে বসিয়া আকবর বাদশাহ মহারাজা মানসিংহ, টোডরমল প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ সংক্রান্ত ও রাজস্ব সং-



দেওয়ান ই খাস—আগ্রা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

ক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেন, আবার এই কক্ষই সঙ্গীতকলা-বিশারদ তানসেনের সুমধুর সঙ্গীত-রবে প্রতিধ্বনিত হইত। আজ সে সমুদয়ই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

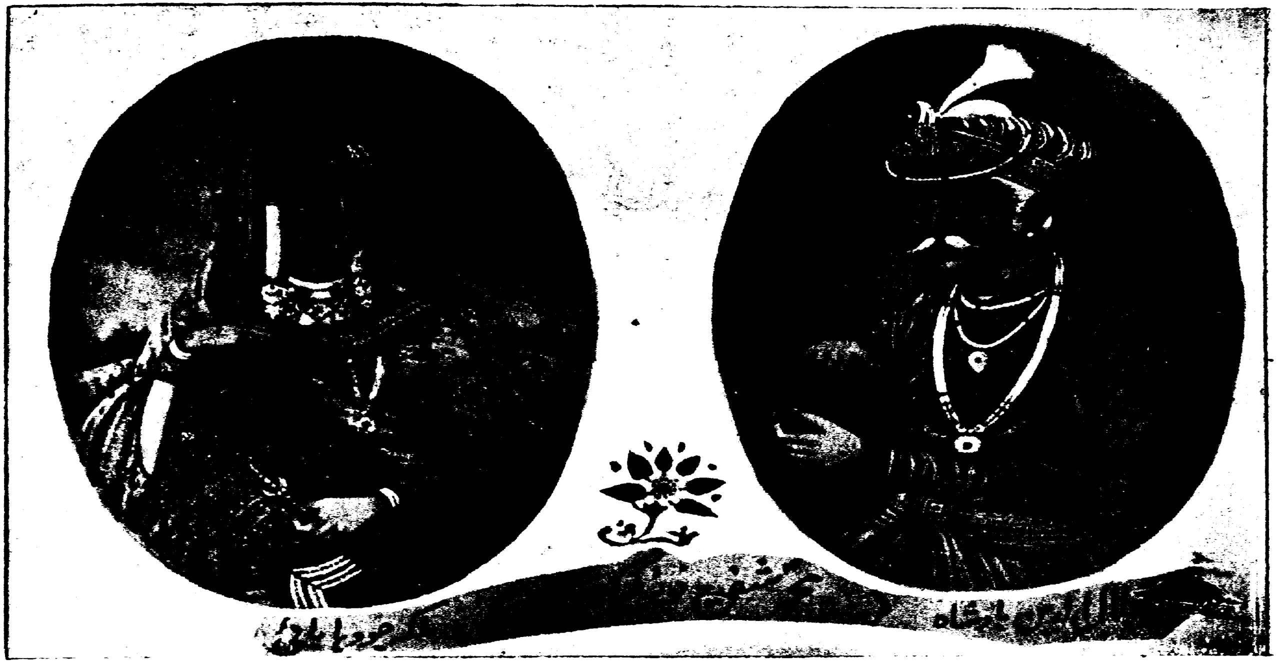
খাস-মহল।

খাস-মহলের কক্ষগুলি ক্ষুদ্র কিন্তু সমুদয়ই শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। প্রকোষ্ঠ সমূহ যমুনার ধারে নির্ম্মিত বলিয়া ইহাদের সৌন্দর্য্য শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। খাস-মহলের ঠিক্ পূর্ব্বদিক দিয়া নীলকায়া যমুনা-সুন্দরী প্রবাহিতা। কাবুল, পারস্য, ইরাণ, কাশ্মীর ও তুর্কীস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-দেশান্তর হইতে আনীত চম্পক-গৌরী সুন্দরীবৃন্দের কল-হাস্যে একদিন এই সমুদয় কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইত এবং সিরাজীর ফেনোচ্ছলিত-ঢল-ঢল তরল তরঙ্গে একদিন ইহাদের চতুর্দ্দিক উদ্বেলিত হইত। নর্ত্তকীর নুপূর-শিঞ্জনে, যৌবনের উন্মত্ত-উচ্ছ্বাসে মন্মথের ফুলধনু এখানে দিবস-যামিনী দৌরাত্ম্য করিত, কিন্তু আজ সেই সুন্দরীগণের পদরজে আবরিত স্থান মহামৌনতার বিজন-শ্মশান। চিড়িয়ার কলগানে, সিরাজী-শিথিল-মধুরকণ্ঠের উচ্ছ্বাসে, নুপূরের রুণু-রুণু ঝুনু-ঝুনু রবে এ প্রাসাদ এখন আর মুখরিত হয় না। খাস-মহলের সংলগ্ন-অঙ্গুরিবাগ নামক উদ্যান অবস্থিত। পূর্ব্বে এ স্থানে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল, এখন সে পুরাতনের আর বিন্দুমাত্রও চিহ্ন বিদ্যমান নাই। এক সময়ে ইহাই বাদশাহের অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাগণের প্রমোদোদ্যান ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজ সৈন্যগণ সপরিবারে এই স্থানে বাস করিয়াছিল এবং এই স্থানেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্ত্তা কল্‌ভিন সাহেব জীবন-লীলা সম্বরণ করেন। খাস-মহলের একটী বারাণ্ডাতে প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দিরের কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিশাল দ্বারদ্বয় দেখিলাম। ইহা বিশেষ কারুকার্য্য পূর্ণ। দ্বারদ্বয়ের সম্মুখে কাষ্ঠ-ফলকের উপরে ইহার সংক্ষিপ্ত-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আফ্‌গান যুদ্ধের শেষে ইংরাজগণ গজনী নগরস্থ মামুদের সমাধি-হর্ম্ম্য হইতে এই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্বার দুইটী লইয়া আসেন এবং ইহাই সোমনাথ মন্দিরের প্রাচীন দ্বার বলিয়া ঘোষণা করেন, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফার্গুসন সাহেব এই মত ভ্রান্ত বলিয়া ঠিক্ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ইহাতে হিন্দু শিল্পের আদর্শ বিদ্যমান নাই,

দ্বিতীয়তঃ সোমনাথ মন্দিরের দ্বার চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বলিয়া কথিত, কিন্তু এই দ্বারের অতি সূক্ষ্মতম অংশ অনুবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষায় ইহা পাইন জাতীয় দেবদারু কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সোমনাথের প্রাচীন দ্বার অগ্নিসাৎ হইলে তৎপরে ইহা সেই পুরাতন দ্বারে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

শীশ-মহল।

শীশ-মহল বা আয়নার প্রাসাদ, ইহা বেগমদিগের স্নান-হর্ম্ম্য—এইটি দেখিতে অতিশয় সুন্দর, শীশ-মহলের প্রাচীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণ দ্বারা পরিশোভিত, এ স্থানে একটী মাত্র আলোক প্রজ্জ্বলিত করিলে প্রাচীর গাত্রে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ ঝলসিত হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাহির হইতে কক্ষটির অভ্যন্তর একটু শীতল বোধ হইল। এ স্থানে তপনালোক উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া ইহা কিঞ্চিৎ অন্ধকার। প্রাচীরের এক অংশ দিয়া যমুনার সুশীতল বারি আসিয়া তীর্য্যক্ ভাবে অবস্থিত প্রস্তরের উপর দিয়া পড়িয়া একটু ঢালু মেজের উপর দিয়া এক মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ জলাধারে পতিত হইত। পাঠক! একবার অতীত-কাহিনী কল্পনা কর, যখন নুরজাহাঁ, মমতাজ, যোধবাই প্রভৃতি রূপসীগণ এই কক্ষে স্নান করিতেন, তখন তাহাদের বরাঙ্গতনুর মনোহর ছবি দর্পণ সমূহে প্রতিফলিত হইয়া না জানি কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিত। তাঁহাদের কলহাস্যে আপন আপন সৌন্দর্য্য-কিরণে রূপের যে তড়িৎ-শোভা বিকশিত হইত, এখন তাহা কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। দর্পণে আপনাদের অবেণী-সম্বদ্ধ কেশভার, চম্পক-কুসুম-সন্নিভ দেহকান্তি ও অর্দ্ধবিমুক্ত বেশের অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য যখন তাঁহারা পরস্পর বিলোল কটাক্ষে দর্শন করিতেন ;—তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা উল্লাসে উৎফুল্ল হইতেন ও বুঝিতে পারিতেন যে এই অপ্সরনিন্দিত-সৌন্দর্য্যের জন্যই জাহাঁগীর, শাহ্জাহাঁ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা শত শত রমণীবৃন্দের আনন্দ-কোলাহলে যে কক্ষ একদিন মুখরিত হইত, এখন তাহা নীরব ও নির্জ্জন। জলাধারটি এখনো বিদ্যমান আছে, উহা আকারে এতটা বৃহৎ যে অনায়াসে একজন ব্যক্তি সেই কৃত্রিম জলাশয়ে অবগাহন করিতে পারে।



আকবর ও যোধাবাঈ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মতি-মস্‌জিদ্,—(Pearl Mosque) এই অনিন্দ্য-সুন্দর মস্‌জিদের গম্বুজত্রয় দুর্গের বাহির হইতেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মতি-মস্‌জিদ দেখিতে অতিশয় মনোজ্ঞ, মসৃণ শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়াই ইহার নাম মতি মস্‌জিদ হইয়াছে। এই মস্‌জিদের তুষার-শুভ্র সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে, ইহাকে সহসা মতি অর্থাৎ মুক্তা-নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত হয়। একটী উচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীর উপরে ইহা অবস্থিত। যদিও ইহার নির্ম্মাণে তাদৃশ আড়ম্বর নাই এবং তাজ ও অন্যান্য সমাধি-মন্দিরের ন্যায় ইহাতে নানাবিধ বর্ণের প্রস্তরের মিশ্রণে কোনও কারুকার্য্য না থাকিলেও ইহার শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরাবলী প্রস্তরের অপূর্ব্ব সমাবেশ এক অভিনব সৌন্দর্য্যের উদ্ভব করিয়াছে। মস্‌জিদের মধ্যস্থ অঙ্গনটি চতুরস্রাকৃতি, ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৫৮ ফিট ও প্রস্থে ১৫৪ ফিট। অঙ্গনের মধ্যে একটী জলাধার ও তাহার তিন দিকে সুদীর্ঘ বারাণ্ডা এবং পশ্চিমদিকে মস্‌জিদটি অবস্থিত। মস্‌জিদের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৫০ × ৫৬ ফিট। এই সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জিদটি তিনটী ভিন্ন ভিন্ন সৌধে বিভক্ত, দালানগুলির স্তম্ভের উপরে সাতটী করিয়া সুপ্রশস্ত খিলান, এ সমস্ত খিলানগুলি মুসলমান স্থপতিগণের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। মস্‌জিদের তিনটী দালান পুরুষদিগের উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং একটীতে স্ত্রীলোকেরা উপাসনা করিতেন। এই মস্‌জিদটি ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্‌জাহাঁকর্ত্তৃক তিনলক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে সাতবৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণ তারিখ লইয়া নানাপ্রকার বিভিন্ন মত শুনিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব ইহা ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহাঁকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কর্ণেল স্লিম্যান সাহেব মস্‌জিদের শিলালিপি দৃষ্টে ইহাকে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "It was built by Shah Jahan, entirely of white marble; and completed, as we learn from an inscription on the portico, in the year A. D. 1656. * * * * It is a chaste, simple, and majestic building, and is by some people admired even more than the Taj,

মতি-মস্‌জিদ।

because they have heard less of it, and their pleasure is heightened by surprise."* মতি-মস্‌জিদে এমনি একটী পবিত্র-ভাব নিহিত আছে যে, সহজেই ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় দর্শকের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। টেলার সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন "The Moti Musjid can be compared to no other edifice that I have ever seen. To my eye it is absolutely perfect. While its architecture is the purest saracenic, which some suppose can not exist without ornament, it has the severe simplicity of Doric art. It has in fact nothing which can properly be called ornament." ইহার পবিত্রতা মাখানো সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "It is a sanctuary so pure and stainless, revealing so exalted a spirit of worship, that I felt humbled, as a Christian, to think that our noble religion has never inspired its architects to surpass this temple to God and Mahomed." মতি-মস্‌জিদের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই একমতাবলম্বী, আমরা এস্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলাম না। ফার্গুসন সাহেবের মতে মতি-মস্‌জিদ "One of the purest and most elegant buildings of its class to be found anywhere, * * the moment you enter by the eastern gate-way the effect of its courtyard is surpassingly beautiful. * * I hardly know, anywhere, of a building so perfectly pure and elegant."†

জাহাঁগীর মহল।

এস্থানের অট্টালিকাগুলি সম্রাট্ জাহাঁগীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তেমন কারুকার্য্য সম্পন্ন ও নয়ন-মন-মোহকর না হইলেও জাহাঁগীরের নির্ম্মিত অট্টালিকাগুলির বিশেষত্ব এই যে এসব প্রাসাদে খিলান নাই, আর আয়তনের বিশালতা এবং জটিলতা নাই

* *Vide* "Rambles and Recollections by Colonel Sleeman p. 388 VOL. I.

† Indi and E. Arch p. 599,600.



আকবরের সোয়ারী বা নগরভ্রমণ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বলিয়া অন্য মোগল-স্থাপত্যের সহিত এগুলির বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এইগুলিতে একটী গাম্ভীর্য্য ও শৌর্য্যও বর্ত্তমান আছে,—ইহা বেশ অনুভূত হয়। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, খাসমহলের নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া এক অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইয়া, এক গর্ত্তের নিকট পঁহুছিয়াছিলাম, উহার নিম্নপ্রদেশের কিছুই দৃষ্ট হইতেছিল না, তবে গর্ত্তের ৫।৭ ফুট উপরে একটা বৃহৎ কাষ্ঠ দেখিতে পাইলাম, আমাদের প্রদর্শক বলিল যে এই কাষ্ঠ হইতে লম্বমান রজ্জুর সাহায্যে সম্রাট্গণ রাজান্তঃপুরচারিণী দ্বিচারিণী-গণকে ফাঁসী দিতেন, শুনিতে পাইলাম যে এই গর্ত্তের সহিত যমুনার সংযোগ আছে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দেখিলাম—এগুলি নাকি গুরু অপরাধে অভিযুক্তা পুরবাসিনী রমণীবৃন্দের কারাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হইত। এ সমুদয় দেখিয়া মোগল সম্রাট্গণের কঠোর অন্তঃপুর-শাসনের বিষয় চিন্তা করিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল!

অতঃপর আগ্রা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আমরা বাসার দিকে চলিলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন-কুহকে এতদূর মুগ্ধ ছিলাম যে, সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার সূক্ষ্ম-ব্যাপ্ত অনুভব করিতে পারি নাই, এখন চাহিয়া দেখি সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ—নিস্তেজ লোহিত কিরণ-রশ্মি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পশ্চিমাকাশ গোলাপি-আভার মেঘে বিভূষিত।

আমরা দুর্গ হইতে বাহির হইবার সময় দিল্লী গেট দিয়া আসিলাম। এই দ্বারের সন্নিকটে ইংরেজ সেনানিবাস অবস্থিত। প্রাঙ্গণে প্রফুল্ল-কুসুমের মত ইংরেজ বালকবালিকাগণ ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের বদনে স্বাধীনতার জীবন্ত চিহ্ন প্রতিফলিত। বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করি-বার সময় পথে জামে-মসজিদ দেখিয়া আসিলাম। ইহা আগ্রা দুর্গ ষ্টেসনের অনতিদূরেই অবস্থিত। এই মস্‌জিদটিও মতি মস্‌জিদ প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ বেদীর উপরে নির্ম্মিত। যদিও ইহা সৌন্দর্য্যে ও শিল্প-নৈপুণ্যে মতি-মস্‌জিদের ন্যায় নহে, তথাপি ইহা উপেক্ষণীয় নহে। দূর হইতেই ইহার শ্বেত ও লোহিত-প্রস্তর-নির্ম্মিত গুম্বজ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মস্‌জিদের শিলালিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সম্রাট্ শাহ্‌জাহাঁর রাজত্বকালে তাঁহার সেবাপরায়ণা

জামে-মস্‌জিদ।

ভক্তিমতী প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা বেগমের জন্য ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসন সাহেব ইহাকে পাঠান ও মোগল স্থাপত্যের মিশ্রণে নির্ম্মিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অবসন্ন দেহে ও অবসন্ন মনে সে দিনের মত বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সহৃদয় দর্শকের নিকট তাজমহল হইতেও আগ্রাদুর্গ অধিকতর হৃদয়-দ্রবকারী। প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের জীবন্ত প্রাচীন স্মৃতি ইহার প্রতি প্রস্তরকণায় জড়িত রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ে মোগলের সেই বীরত্বগৌরব ও শৌর্য্যবীর্য্যের কথা মনে পড়িয়া দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইল। কোথায় বা সেই জয়দীপ্ত মোগল সৈন্যের উল্লাসধ্বনি, কোথায় বা ভুবন-মন-মোহিনী রমণীবৃন্দের নিটোল যৌবন ও বিলোল কটাক্ষ, আর কোথায়ই বা সম্রাট্‌গণের শাসন-বিলাসের উচ্ছৃঙ্খলতা। 'নশ্বর জগতে হায়! সকলি নশ্বর।'

সেকেন্দ্রা।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মহামতি আকবরের সমাধিস্থল সেকেন্দ্রা দেখিতে যাত্রা করিলাম। উহা আগ্রা নগরী হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। তখন কেবলমাত্র সূর্য্যদেব কিরণ-বিকীরণে ধরণী হাস্যময়ী করিতে ছিলেন। চারিদিকে তখনও পূর্ণ জাগরণের আভাষ পাওয়া গেল না। সুন্দর নির্ম্মল প্রভাত! আকাশ মেঘশূন্য গাঢ় নীল—আর সেই গাঢ় নীল-সাগরে সূর্য্যদেব জ্বলন্ত প্রভান্বিত দীপ্ত মণি। প্রস্তর মণ্ডিত চকের রাস্তা দিয়া আমাদের গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল; এ রাস্তা বিশেষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন,—তখনও চকে ভাল করিয়া লোক জমে নাই। তখনও বিপণিতে ক্রেতার দল আসিয়া বেশী পরিমাণে ঝোঁকে নাই, তবু কিন্তু চক জন-কোলাহলে-মুখরিত। চকের পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া লোহিত প্রস্তর-নির্ম্মিত সুবিশাল "দিল্লী দরওয়াজা" নামক দ্বার উত্তীর্ণ হইলাম, পূর্ব্বে আগ্রা প্রাচীরবদ্ধ নগরী ছিল, এই দরওয়াজা তাহারি একটী দ্বার, দিল্লী, লাহোর ও কাশ্মীর যাইতে হইলে পূর্ব্বে এই পথে যাইতে হইত। বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় আমরা সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি-সৌধের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই দ্বারের কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাকে

একটী স্বতন্ত্র হর্ম্ম্য বলিলেও কোনওরূপ অত্যুক্তি হয় না। দ্বারদেশ লোহিত প্রস্তরনির্ম্মিত এবং নানাবিধ বিভিন্ন বর্ণের মোজেয়িক কার্য্যদ্বারা পরিশোভিত। দ্বারের চতুর্দ্দিকে কোরাণের বয়েদ্‌গুলি এমনি কৌশলে লিখিত হইয়াছে যে, দ্বারদেশের উর্দ্ধদেশস্থ অক্ষরগুলি এবং নিম্নের অক্ষরগুলি যেন একই আয়তনের বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেকেন্দ্রার চারিদিকে একটী সৌম্য নীরবতা বিরাজিত, শ্মশানের গাম্ভীর্য্য এখানে পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান। নগরের জন-কোলাহল এখানে শুনিতে পাওয়া যায় না।

সেকেন্দ্রার ইতিহাস। লোদীবংশীয় সেকেন্দর লোদীর সমাধি পূর্ব্বে এই নগরে ছিল বলিয়াই ইহার নাম সেকেন্দ্রা হইয়াছে। তাঁহার সমাধি পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। আমরা যে হর্ম্ম্যের কথা বলিতেছি, তন্মধ্যে মহাত্মা আকবর শায়িত রহিয়াছেন। একটী উচ্চ বেদীর উপরে আকবরের সমাধি-হর্ম্ম্য বিরাজিত। বেদীর চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান। সমাধি-সৌধ পঞ্চতল-বিশিষ্ট।

প্রথম তল	দৈর্ঘ্যে	৩২০ ফুট	প্রস্থে	৩২০ ফুট	উচ্চতা	৩০ ফুট
দ্বিতীয় তল	,,	১৮৬ ,,	,,	১৮৬ ,,	,,	১৪-৯
তৃতীয় তল	,,	১৮৬ ,,	,,	১৮৬ ,,	,,	১৫-২
চতুর্থ তল	,,	১৮৬ ,,	,,	১৮৬ ,,	,,	১৪-৬
পঞ্চম তল	,,	১৫৭ ,,	,,	১৪৭ ,,	,,	(ছাদশূন্য)

সমুদয় তলগুলিই রক্তবর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, পঞ্চম তলের চতুর্দ্দিকে মর্ম্মর প্রস্তরের জাফ্‌রিকাটা প্রাচীর—উপরে কোনও ছাদ নাই। এই ছাদের উপরে নিম্নস্থ আকবরের কবরের অনুরূপ একটী কবর রহিয়াছে—ইহাকে সাধারণতঃ "জওয়ার কবর" কহে। জওয়ার কবরের ঠিক্ নিম্নে প্রথমতলে সম্রাট্ আকবর বাদশাহের কবর অবস্থিত। কথিত আছে যে, এই জওয়ার কবরের সম্মুখস্থ অনতি উচ্চ মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ ও তাহার উপর যে একটী প্রস্তরের পাত্র আছে উহাতে জগদ্বিখ্যাত "কোহিনূর" হীরক রক্ষিত ছিল। পঞ্চমতলের উপরিস্থিত জাফ্‌রীকাটা প্রাচীরের অভ্যন্তর দিয়া নিম্নস্থ উদ্যান ও চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য আলেখ্যবৎ প্রতীয়মান হয়। এই পঞ্চতলের প্রতি তলের চারি কোণেই

লোহিত প্রস্তরের স্তম্ভের উপর গম্বুজওয়ালা প্রকোষ্ঠ আছে, দূর হইতে এগুলি বড়ই সুন্দর দেখায়। সেকেন্দ্রার মিনার বা শোভাস্তম্ভও কলিকাতার অক্টার্লোনী মনুমেণ্ট হইতে কম উঁচু নহে। প্রথম তলের সমাধি-হর্ম্ম্যের সম্মুখস্থ প্রশস্ত দ্বার দিয়া একটী প্রশস্ত কক্ষে উপনীত হওয়া যায়, কক্ষের উপরিস্থ ছাদ গিল্টিকরা, দুঃখের বিষয় যে এখন তাহার প্রাচীন সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই কক্ষ হইতে একটী ক্রমনিম্ন পথে অবতরণ করিলে যে কক্ষে পঁহুছান যায় ঐখানেই আকবর সমাহিত রহিয়াছেন। এই কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩৫ ফুট ও চতুরস্রাকৃতি—একটু অন্ধকার—ইহাতে আলোক তেমন প্রবেশ করে না। এস্থানে আসিলে হৃদয়ে কেমন এক প্রশান্ত ভক্তির ভাবের উদয় হয়। আমরা আকবরের মহত্ত্ব ও গৌরব স্মরণ করিয়া ভক্তিপ্লুত চিত্তে নতজানু হইয়া অবনত মস্তকে সমাধির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলাম।

আগ্রা আসিলে প্রত্যেকেরই সেকেন্দ্রা দর্শন করা উচিত। প্রকৃত পক্ষেই ইহা হিন্দু ও মুসলমানের মহাতীর্থ স্থল। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি-হর্ম্ম্যের প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে আরও দুইটী সমাধি আছে, একটী আকবরের দুহিতা আরামবন্নুর এবং অপরটি জাহাঁগীরের কন্যা আকবরের পৌত্রীর। লর্ড নর্থব্রুক আকবরের সমাধি আচ্ছাদিত রাখিবার জন্য একখানা বহুমূল্য আবরণ বস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা উহা দেখিতে পাইলাম না—শুনিলাম উহা অপহৃত হইয়াছে। সেকেন্দ্রায় আরও অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য ও সমাধি আছে, কিন্তু মহাকালের দারুণ কষাঘাতে সে সমুদয় সমাধির অবস্থা অতীব শোচনীয়। কোথাও মন্দির ভগ্ন, কোথাও সমাধি-শয্যা চূর্ণীকৃত, চারিদিকে শ্মশানের ধ্বংসের চিহ্ন বিদ্যমান। হৃদয়ে একটা ঔদাস্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। মন এক ভীষণ হাহাকারে পূর্ণ হইয়া গেল। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ধ্বংসাবশেষের পর্য্যালোচনা করিতে গেলে বলিতে হয়—"নাই নাই কিছু নাই" এখন "ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লী ভয় পায়।" বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় নিতান্ত বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মৃত্যুর বিভীষিকা ও জগতের নশ্বরতা কিছুক্ষণের জন্য হৃদয়কে গাঢ়রূপে

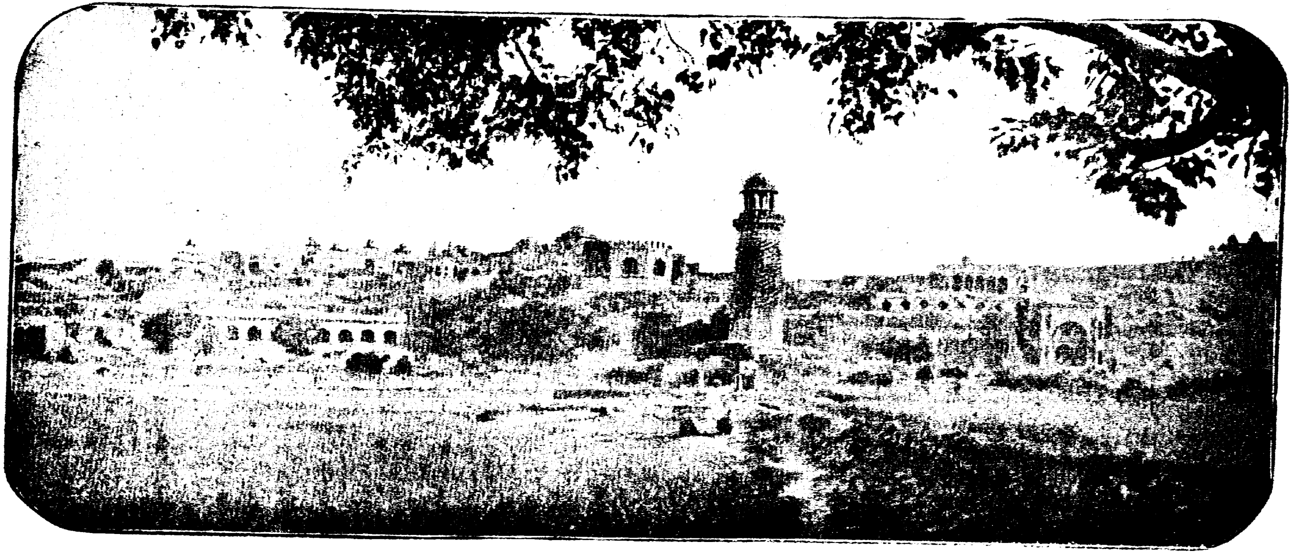
মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে দিবস আর বাসার বাহির হইলাম না, পরদিবস প্রত্যূষে ফতেপুর-সিক্‌রি দর্শনে যাত্রা করিলাম। আগ্রা হইতে ফতেপুর-সিক্‌রি ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী। এই পথটুকু উটের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও এক্কায় যাইতে হয়, এক্কা অপেক্ষা ঘোড়ার গাড়ীর ব্যয় অনেক বেশী। সাধারণতঃ লোকে উটের গাড়ীতে বা এক্কাতেই গমন করিয়া থাকে। উটের গাড়ীর কথা বাঙ্গালী পাঠকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিলেও এস্থানে তাহা বিশেষ প্রচলিত। উটের গাড়ীতে একত্র ৮।১০ জন লোক যাতায়াত করিতে পারে। ঘোড়ার গাড়ীতে ৫।৬৲ টাকা করিয়া ভাড়া পড়ে। এসব ছাড়া আর এক উপায়ে এবং কথঞ্চিৎ অল্প অর্থব্যয়েও ফতেপুর যাওয়া যাইতে পারে। R. M. R. রেল লাইনের ২০ মাইল দূরবর্ত্তী আইসনারা ষ্টেসনে অবতরণ পূর্ব্বক যাওয়া যায়, এস্থান হইতে ফতেপুর ১৩।১৪ মাইল দূরমাত্র। এক্কাও ষ্টেসনেই পাওয়া যায় এবং উহার ভাড়াও অল্প, আর রেলভাড়া এত সামান্য যে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। সে যাহা হউক আমরা প্রত্যূষে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর মধ্যাহ্ন ভোজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ফতেপুরে রওয়ানা হইলাম।

ফতেপুর-সিক্‌রি যাত্রা।

ফতেপুর-সিক্‌রী।

আগ্রা শাহ্‌গঞ্জের রাস্তা ধরিয়া সিক্রি অভিমুখে আমাদের অশ্ব-শকট চলিতে আরম্ভ করিল। এই রাস্তাই সোজা। শাহ্‌গঞ্জের পুলিশষ্টেসন পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই লোকের বসতিহীন দুই দিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তর পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা যে পথে অগ্রসর হইতেছি তাহা বেশ সুপ্রশস্ত এবং উহার উভয় পার্শ্বেই বড় বড় গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্র-ঝলসিত প্রান্তরের একঘেয়ে উদাস দৃশ্য পথিককে কিছুকাল পর্য্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলেও শীঘ্রই তাহা দূর হইয়া যায়। কারণ ফতেপুর সিক্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রাস্তা অতিক্রম করিলেই কেরনির আড্ডায় পৌছান যায়, এই বসতিটি বেশ বড়, এখানে বাজারও আছে, সাধারণতঃ পথিকেরা এখানেই বিশ্রাম করিয়া থাকেন। আগ্রা হইতে কেরনি প্রায় দেড়ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টার রাস্তা। ফতেপুর-সিক্রী যাইতে আগ্রা হইতে পানীয় জল লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, কারণ রৌদ্রের আধিক্যের সহিত পিপাসা বৃদ্ধি পাইলে জল পাওয়া সুকঠিন, বিশেষতঃ রাস্তার লোনাজল গলাধঃকরণ করা অসাধ্য ব্যাপার।

কেরণি ছাড়িয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণীর অনুচ্চ দেহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন হইতে সিক্রি পঁহুছিবার জন্য হৃদয়ে একটা ব্যস্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়, কারণ ক্রমে আমরা সিক্রিতে আসিয়া উপনীত হইলাম। ফতেপুর-সিক্রীর বহির্ভাগে অদ্যাপিও স্থানে স্থানে বহু সুন্দর সুন্দর উদ্যানের ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান থাকিয়া এক সময়ে যে এখানে বহুধনী আমীর ওমরাহ্‌ বাস করিতেন, তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। নগরের প্রাচীর দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রই এক বিরাট শ্মশানের দৃশ্য আমাদের নয়ন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল। এই দূর হইতেই পর্ব্বতোপরি ফতেপুর-সিক্রির বিরাট উচ্চ প্রাচীর দৃষ্টি পথে পতিত হয়। বহু দূর বিস্তৃত এই প্রাচীরও স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা আগ্রার দিকের প্রাচীরের দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলাম। এই



ফতেপুর সিক্রির সাধারণ দৃশ্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

দ্বারদেশ হইতে জনস্থান আধুনিক সহর ফতেপুর-সিক্রি ও দর্শনীয় সৌধাবলী আরও প্রায় দুই মাইল দূরে। আমরা গাড়ীতেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম—আগ্রা হইতে এস্থান ২২ মাইল। প্রকৃত পক্ষে এইস্থান হইতেই আকবর শাহের প্রাচীন ফতেপুর-সিক্রি আরম্ভ, এই পথের উভয় পার্শ্বেই উদ্যানাদির ভগ্নাবশেষ এবং স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত লোহিত প্রস্তরখণ্ড সমূহ অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ বিদ্যমান। এখান হইতে দুই দিকে দুইটী রাস্তা গিয়াছে, দক্ষিণ দিকের রাস্তাটি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইলে সহজেই ভগ্নাবশেষসকলের বামদিকের রাস্তার নিকটে পঁহুছিতে পারা যায়, আর বামদিগের রাস্তা অবলম্বন করিলে, ডাকবাঙ্‌লার নিকট যাওয়া যায়। সাধারণতঃ সাহেবরা ডাকবাঙ্‌লার দিকের রাস্তায়ই গমন করিয়া থাকেন। আমরা ভগ্নাবশেষ সমূহ দেখিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র হইয়াছিলাম যে, তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া পাহাড়ের পাদদেশস্থিত বুলন্দ-দরওয়াজার নিকট আসিয়া উপনীত হইলাম। বর্ত্তমান সময়ে বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের আদেশে সিক্রির যেরূপ নবশ্রী হইয়াছে—আমরা ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহাকে দর্শন করিয়াছিলাম, তখন তাহার কিছুই ছিল না। সে সময়ে প্রস্তরখণ্ড সমাকীর্ণ পর্ব্বতোপরিস্থিত ভগ্নস্তূপরাশি ও চতুর্দ্দিকের অরণ্যময় বিজনতা হৃদয়ে এক দারুণ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। বুলন্দ-দরওয়াজায় প্রবেশ করিলেই দর্শকের নয়ন সমক্ষে এক অপূর্ব্ব নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য পতিত হয়। তোরণের সম্মুখে পর্ব্বত পদতলে ক্ষুদ্র ফতেপুর সহর কতকগুলি কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি লইয়া বিরাজমান, এখান হইতে একটী হিন্দুস্থানী যুবক আমাদের গাইডরূপে সঙ্গ লইল। আকবর শাহ্ যে ফতেপুর সহরকে সর্ব্বপ্রকারে সৌন্দর্য্যে ও শিল্পকলায় বিভূষিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার এই পরিত্যক্ত অবস্থাও প্রায় শ্মশানের ন্যায় বিজনতা, বস্তুতঃই ঔদাস্যজনক। বুলন্দ-দরওয়াজার তোরণ অতিক্রম করিলেই এক বহুদূর বিস্তৃত প্রস্তরমণ্ডিত প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার চতুর্দ্দিকে উন্নত সৌধশ্রেণী, মধ্যস্থলের চত্বরের উত্তরাংশে শ্বেত মর্ম্মরের বেদীর উপর নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র একটী দর্গা অবস্থিত, ইহাই সেলিম চিস্তির দর্গা নামে প্রসিদ্ধ। এই ক্ষুদ্র

সেলিমচিস্তির দর্গা।

অনিন্দ্য সুন্দর দর্গাটি আকবর শাহ্ ও জাহাঁগীর বাদশাহের সেলিম-চিস্তির উপরে তাহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অপূর্ব্ব নিদর্শন স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই দর্গাতেই সলিমচিস্তির কবর স্থাপিত। অদ্যাপি হিন্দু ও মুসলমান বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণ সন্তান লাভাকাঙ্ক্ষায় এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন।

মুসলমানেরা এবং হিন্দুরা সকলেই সেলিমচিস্তির দর্গার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বহির্ভাগ হইতে সেলিমচিস্তির দর্গা সমস্তই শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। চতুর্দ্দিকের প্রাচীরের ঝিল্লীকাটা (trellis work) থাকায় দূর হইতেই বড় মনোরম বোধ হইয়া থাকে। কবর-প্রকোষ্ঠের বারেন্দা ও বারেন্দার উপরে ঘরের চালার মত হেলান কার্নিস বিদ্যমান। বাহিরের প্রাচীর-গাত্রে কোরাণের বচন-সকল অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রায় ৪ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে ও বাকী অংশ লোহিত প্রস্তর দ্বারা গঠিত। সেলিম-চিস্তির কবরের উপরে চারিটী আবলুস কাষ্ঠের থামের উপর ঐ কাষ্ঠেরই নির্ম্মিত একটী চাঁদোয়া আছে, ঐ চাঁদোয়ার মধ্যে ও তাহার পায়ায় যে সমুদয় ঝিনুকের কারুকার্য্য আছে, তাহা অতীব সুন্দর, বিশেষতঃ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে আধ-আলোক ও আধ-অন্ধকারের সম্মিলনে সর্ব্বপ্রথমে উহা দৃষ্টিতে পড়ে এবং আমরা তাহা দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে তাহা বর্ণনাদ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। সেলিম চিস্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই দর্গা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। এই দর্গার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী চৌবাচ্চা আছে এবং তাহার অল্প পূর্ব্ব-উত্তরে সেলিমচিস্তির পরিবারস্থ রমণীবৃন্দের সমাধি-স্থান। উহার পার্শ্বেই চিস্তিসাহেবের পৌত্র জাহাঁগীর বাদশাহের রাজত্বকালে বাঙ্লার শাসনকর্ত্তা ইসলাম খাঁর সুন্দর সমাধি সৌধ বিরাজিত। দর্গার উত্তরাংশে আকবর শাহের চির সহচর ও অকৃত্রিম বন্ধু আবুল-ফজল ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকবি ফৈজির বাসস্থান। আজকাল তাঁহাদের বাস-ভবনে ইংরেজী-স্কুল হইয়াছে। চত্বরের পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া উত্তরাংশে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই যোধবাই

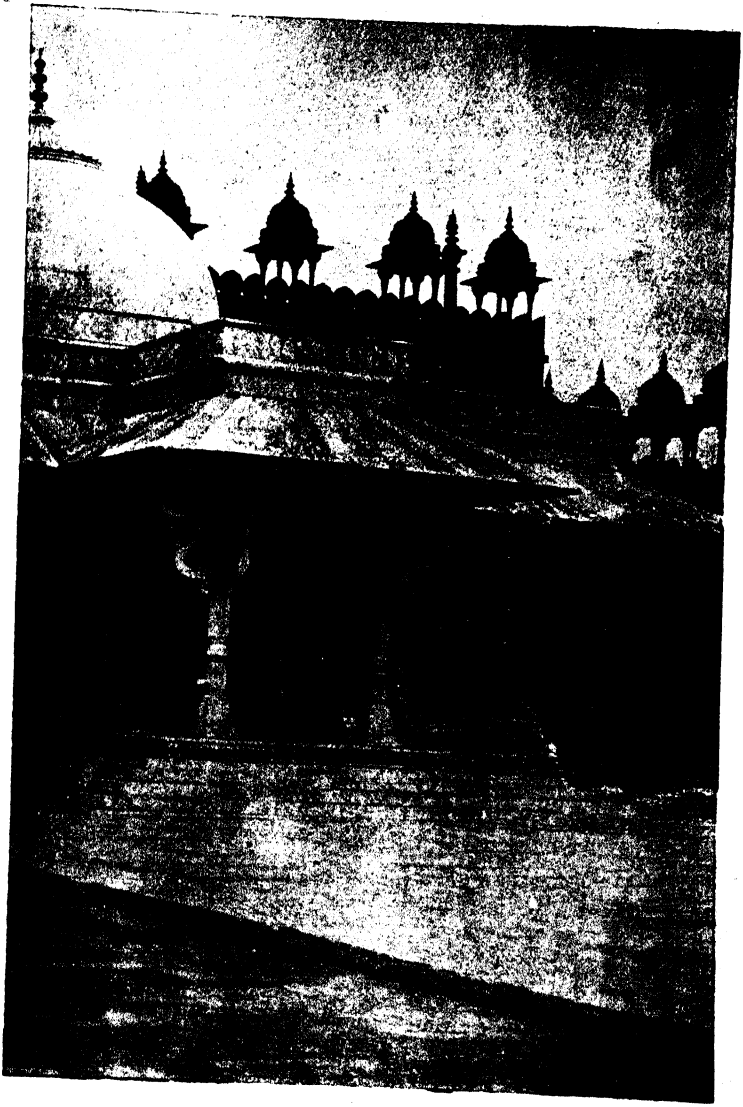
মহাল অবস্থিত, মহালের নাম কেন যোধবাই মহল হইল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যোধবাই জাহাঁগীর বাদশাহের পত্নী ছিলেন, তাঁহার মহাল আগ্রা দুর্গে দেখিয়া আসিয়াছি; তবে কি এই মহাল আকবরের পরে জাহাঁগীর বাদশাহ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল? কিন্তু তাহারও ত কোন প্রমাণ নাই। যোধবাই মহালই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাল। মধ্যস্থ চতুষ্কোণ চত্বর, দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১৭৭ × ১৫৭ ফুট। চত্বরের চতুর্দ্দিকেই বারেন্দা, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের বারেন্দার উপরে আবার প্রকোষ্ঠও আছে। নীচে-উপরের এই সকল প্রকোষ্ঠের ছাদই নীলবর্ণে মীনাকরা পাথরের টালিতে প্রস্তুত। এই মহলটিকে (Hand book to Agra) নামক গ্রন্থ প্রণেতা কীন সাহেব আকবর বাদ্‌শাহের খুল্লতাত হিন্দনের দুহিতা তাঁহার প্রধানা মহিষী সুলতানা বেগম রুকিয়ার গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* এই মহলের পশ্চিম দিকের ঘর বিবিধ হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তি, চিত্র ও নানা সুন্দর সুন্দর হিন্দু কারুকার্য্য দ্বারা পরিশোভিত।

মহালের উত্তর দিকস্থ দ্বিতলের বহির্ভাগস্থ প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকের লাল প্রস্তরে ঝিল্লিকাটা; (trellis work) এখান হইতে বাহিরের দৃশ্য দেখিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা সম্রাটের বিশ্রামাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। এই মহালের সম্মুখেই অশ্বশালা। অশ্বশালার ঠিক্ উত্তর দিকে এবং যোধবাই মহালের উত্তর-পশ্চিম-কোণে রাজা বীরবলের প্রাসাদ অবস্থিত। এই প্রাসাদটি পরম রমণীয়। তিন শত বৎসরেরও বেশী কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু অদ্যাপিও ঠিক্ নূতনই আছে। প্রাচীর গাত্রের কারুকার্য্য অদ্যাপিও সুস্পষ্ট এবং সুন্দর। কীন সাহেব এই প্রাসাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রশংসার সহিত লিখিয়াছেন "It seems as if a Chinese ivory worker had been employed upon a byclopean Monument."† প্রকৃত পক্ষেই দৃঢ় প্রস্তর গাত্রে এইরূপ চারুকার্য্যাবলী বিস্ময়ের উদ্রেক করে এবং তাহা দানবীয় কার্য্য বলিয়া মনে হয়। রাজা

* Hand book of Agra P. 64.

* Hand book of Aym p. 65.

বীরবলের কৌতুক রহস্য ভারতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহার সম্বন্ধে দেশে নানাবিধ গল্প ও প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। চঞ্চলা অদৃষ্ট দেবী যে কখন কাহার উপরে সন্তুষ্ট হ'ন বলিতে পারা যায় না। দরিদ্র ভাট ব্রাহ্মণের তনয় হইয়া যেরূপ প্রতিভাবলে বীরবল বাদশাহ আকবরের মনোরঞ্জন করিয়া বাদশাহের নর্ম্মসচিব হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। বাদশাহ বীরবলকে এতদূর বিশ্বাস করিতেন, ও ভাল বাসিতেন যে কি যুদ্ধে, কি অবসর কালে, সর্ব্বদাই বীরবলকে সঙ্গে রাখিতেন। রাজা বীরবলের সম্রাটের উপর এইরূপ প্রাধান্য দেখিয়া অন্যান্য আমীর-ওমরাহ্‌গণ ইঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। আকবর শাহের একান্ত বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন বলিয়াই বীরবলের বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াও কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বীর-বল বাদশাহের বিশ্বস্ত দূতরূপে নানা দেশে প্রেরিত হইতেন। আকবর বাদশাহ বীরবলকে এতদূর স্নেহ করিতেন যে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে সম্রাটের নিকট পঁহুছিলে তাহা তিনি রাজার কোনও শত্রুর ছলনা বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। পরে প্রকৃত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যার পর নাই ম্রিয়মান হইয়াছিলেন, এমন কি বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার শোক হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে ইউসুফজাই আফগানদিগকে দমন করিতে গিয়া উহাদের ছলনা-বশে পথভ্রষ্ট হইয়া ইনি মৃতুমুখে পতিত হন। এই দ্বিতল অট্টা-লিকার উপরে ও নীচে চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠ। নীচের প্রত্যেক কক্ষটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৫ × ১৫ ফুট। উপরের তলার কক্ষগুলিও এই মাপেরই। আগ্রার কালেক্টার সাহেবের অনুমতি লইয়া দর্শকগণ এ স্থানে অবস্থান করিতে পারেন, তদ্রূপ বন্দোবস্তাদিও আছে। বীরবলের প্রাসাদের নিকটে, বাদশাহের অশ্বশালা ও হাতীয়া-দরওয়াজাও দর্শন যোগ্য। অশ্বশালার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহা তেমন দর্শনীয় ও উল্লেখ যোগ্য নহে। এখন হাতীয়া-দরওয়াজা বা হাতীপুল-দরওয়াজার কথা বলিব। যোধবাই মহালের উত্তর দিকে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের মস্‌জিদ ও প্রমোদোদ্যান, তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে একটী ছোট চৌবাচ্চা। এ



সলিমের সমাধি।

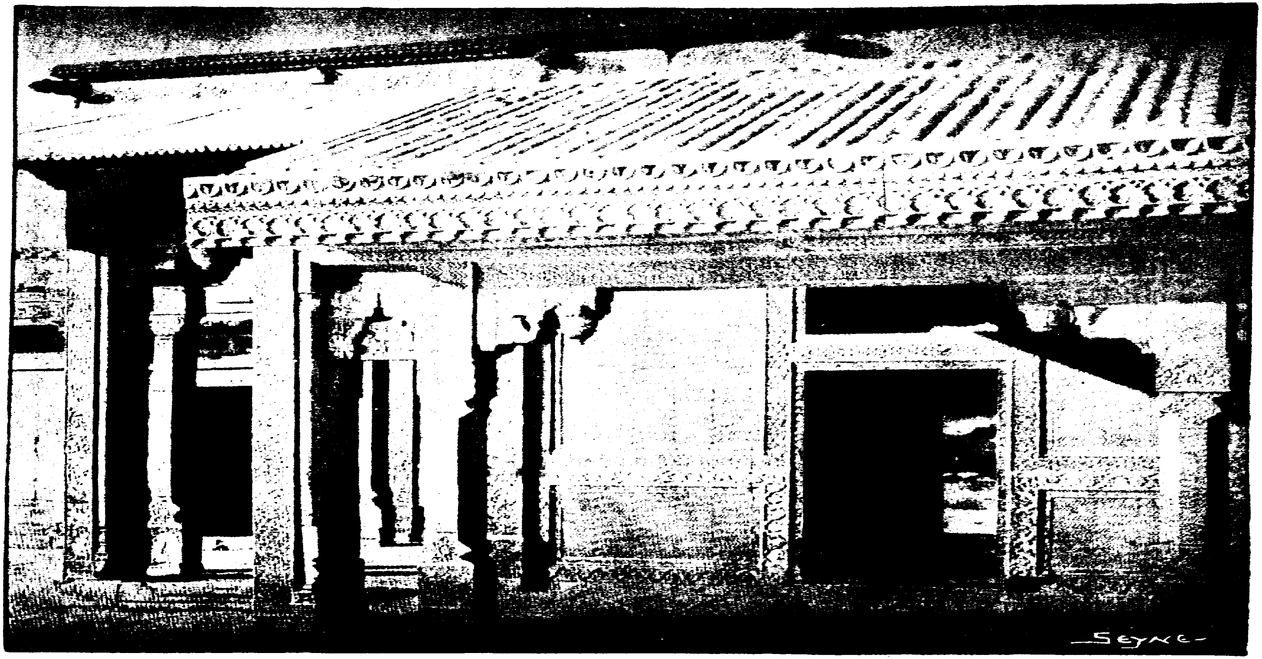
কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সকলের পরে বহুদূরব্যাপী ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তর-স্তূপ, এ সকল স্তূপাকার প্রস্তরের শেষ প্রান্তে পর্ব্বতের একটু নীচে হাতীপুল-দরওয়াজা বিরাজিত। বীরবলের প্রাসাদের অনতিদূরে ইহা অবস্থিত। এই দরজার খিলানের দুই পার্শ্ব হইতে দুইটী প্রকাণ্ড প্রস্তরময় হস্তী বিরাজিত আছে, বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রোষানলে পতিত হইয়া ইহারা এখন মস্তকহীন দেহে বিদ্যমান। এই দরওয়াজা দ্বারা প্রাসাদের উত্তর দিকস্থ কারবনসরাই ও হিরণমিনারে উপস্থিত হইতে পারা যায়। হাতীপুল পার হইলেই "সঙ্গিন বুরুজ"। ইহা দুর্গপরিধির একটী ভগ্নাবশেষ। এই ভগ্নাবশেষের নিকটেই সরাইয়ের ভগ্নস্তূপ ;—যখন ফতেপুর-সিক্রির গৌরব বিদ্যমান ছিল, যখন ইহা জন-কোলাহল-মুখরিত সুন্দর নগরীরূপে দেশ-দেশান্তরে পরিচিত ছিল, সে সময়ে এ স্থানে বিভিন্ন দেশাগত বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ আসিয়া আশ্রয় লাভ করিত। পূর্ব্বে অন্তঃপুর হইতে হাতীপুল পর্য্যন্ত অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের যাতায়াতের নিমিত্ত একটী সেতু-পথ ছিল—এখন তাহার ক্ষীণ অস্তিত্বও বিদ্যমান নাই। সে যেন এক স্বপ্ন-কাহিনী। আমার নিকট প্রতিপদ বিক্ষেপে ইহাকে একটী উপকথার ঘুমন্ত পুরী বলিয়া মনে হইতেছিল। প্রতি তোরণে, প্রতি মিনারে, প্রতি বিজন-প্রাসাদের নীরব কক্ষে এমনি এক গভীর স্তব্ধতা বিদ্যমান যে, তাহা দর্শনে হৃদয়ে আপনা হইতেই এক গভীর বিষাদের ছায়া আসিয়া নিপতিত হয়। কোথায় সেই 'সোণার কাঠি রূপার কাঠি'? যাহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে পুনরায় এ ঘুমন্তনগরী জাগিয়া উঠিবে!

এস্থান হইতে অল্পদূরে "হিরণমিনার" অবস্থিত। ইহা একটী ছোট প্রস্তর স্তম্ভ। কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারা যায়—যে এই স্তম্ভটি আকবর শাহের কোনও প্রিয়তম হস্তীর কবরের উপর নির্ম্মিত। এই কিম্বদন্তী একেবারে অসত্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহার চিহ্নস্বরূপ স্তম্ভের চতুর্দ্দিক হইতে হস্তীদন্তের আকৃতির অনুরূপ বহুসংখ্যক প্রস্তরদণ্ড বাহির হইয়াছে। আমাদের গাইড বলিল যে আকবর শাহ এই মিনারের উপর হইতে শিকার খেলিতেন।

যোধবাই মহালের উত্তর পশ্চিমকোণে বিবি মরিয়মের প্রাসাদ অবস্থিত।

এই প্রাসাদে খ্রীষ্টধর্ম্মের নানা চিহ্ন বিদ্যমান আছে বলিয়া ইহাকে সকলেই আকবর শাহের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী মহিষীর গৃহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই প্রাসাদের অবস্থা সন্তোষজনক। মরিয়ম বিবি পর্ত্তুগীজদেশবাসিনী মহিলা ছিলেন। কেহ কেহ এই প্রাসাদটিকে "সানেরি মহোল" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কারণ এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, এই মহালের সর্ব্বত্রই বহুমূল্য সুবর্ণালঙ্কারে পরিশোভিত ছিল। এই গৃহে পারস্যকবি ফারদুসির শাহনামায় বিবৃত ঘটনাবলীর বহু চিত্র দ্বারা ও ফৈজি-রচিত কবিতা-সমূহ দ্বারা সুরঞ্জিত ও সুশোভিত ছিল বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন সে সমুদয় লুপ্ত হইয়াছে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিবি মরিয়ম কে ছিলেন? তাহা কেহই প্রকৃতভাবে বলিতে পারেন না, কেহ কেহ ইহাঁকে পর্ত্তুগীজদেশবাসিনী রমণী বলিয়া নির্ণয় করেন, কিন্তু কীন সাহেব এ মতের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে ইনি জাহাঁগীরের জননী ছিলেন। এই গৃহে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় উভয়বিধ চিত্রেরই অতি ক্ষীণ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বিবি মরিয়মের প্রাসাদের পূর্ব্বদিকেই খাস-মহাল অবস্থিত, ইহার মধ্যস্থ চত্বরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২১০ × ১২০ ফুট। এই চত্বরের মধ্যে একটী প্রশস্ত চৌবাচ্চা—চৌবাচ্চার চারি তীর হইতে প্রস্তর নির্ম্মিত সেতুদ্বারা সংলগ্ন—চৌবাচ্চার মধ্যস্থলে বসিবার খানিকটা যায়গা আছে। এই প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে খোয়াব-'গা-হ্' নামক ত্রিতল অট্টালিকা বিরাজিত। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয়তলে দেখিবার কিছুই নাই—প্রস্তর স্তম্ভের উপর প্রস্তর ছাদ সুশোভিত, চতুর্দ্দিকেই বাতাস খেলিতে পারে। ত্রিতলের উপরিস্থিত একটীমাত্র প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে বারেন্দা, বারেন্দার চারিধারে চালার মত হেলান প্রস্তরের ছাদ। প্রকোষ্ঠটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪ ফুট করিয়া, বারেন্দা প্রস্থে ৯৷৷০ ফুট। এই কক্ষের চারিদিকে চারিটী দ্বার, দ্বারের উপরে ছোট ছোট জানালা ও তাহার উপরে প্রস্তরের ঝিল্লিকাটা আবরণ। পূর্ব্বে এই প্রকোষ্ঠটি নানাবিধ সুন্দর চিত্রাবলীতে পরিশোভিত ছিল। মধ্যে প্রায় সমুদয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্মিথ সাহেব কোন কোন চিত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। কোথাও জলবিহারের চিত্র, কোথাও বা নিসর্গের প্রাণারাম



আকবরের তুরস্কদেশ বাসিনী সাম্রাজ্ঞীর বাসগৃহ—ফতেপুর সিক্রি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

দৃশ্যের অবতারণা, কোথাও শিকার দৃশ্য ;—সবগুলিই স্বাভাবিক ও সুন্দর, কিন্তু হায়! কালের প্রভাবে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে। একটী চিত্র বুদ্ধদেবের। প্রকোষ্ঠের দ্বারোপরি আকবর বাদশাহের প্রশংসা-সূচক নানাবিধ কবিতা দেদীপ্যমান, এসকল কবিতার রচয়িতা ফৈজী। একটী দ্বারের উপরিস্থিত কবিতার ভাবার্থ এইরূপ যে "স্বর্গের দেববালাগণ এই কক্ষের দ্বারদেশস্থ ধূলিকণা নেত্রের কজ্জল রূপে ব্যবহার করিতে পারেন।" অপর একটীতে আছে, "এই প্রাসাদ স্বর্গের অনুরূপে প্রস্তুত। ইহার প্রাঙ্গণকে স্বর্গের দ্বার-রক্ষকগণ দর্পণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। আকবর বাদশাহ এই প্রাসাদ শয়ন-মন্দির রূপে ব্যবহার করিতেন। এস্থান হইতে—আমরা বেগম মহল দেখিতে অগ্রসর হইলাম। এখানকার সুন্দর সৌষ্ঠব সম্পন্ন সৌধ-নিচয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এক সময়ে আকবর বাদশাহ ইহাই আপনার পরিবারবর্গের বাসস্থান রূপে স্থির করিয়াছিলেন। এস্থানে বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ অবস্থিত। সমস্তটা মহলই লোহিত-প্রস্তর-গঠিত। একটী বৃহৎ আঙ্গিনার চতুষ্পার্শ্বে অন্তঃপুরের গৃহশ্রেণী সুন্দর শোভা পাইতেছে। অলিন্দে, স্তম্ভে ও কক্ষের সুন্দর নয়ন-মন-মোহকর কারু-কার্য্যাবলী দর্শককে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। খাসমহলের ঠিক্ উত্তর পূর্ব্ব কোণে রুমি বেগমের প্রাসাদ অবস্থিত, রুমি বেগম কে ছিলেন তাহার কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ বিশদরূপে কেহই উল্লেখ করিতে পারেন নাই। এই প্রাসাদের সংলগ্ন স্তাম্বুলি বেগমের প্রাসাদটি একতালা হইলেও ইহার কথা উল্লেখযোগ্য, ইহার প্রকোষ্ঠের ভিতর ও বহির্ভাগ সুন্দর প্রস্তর-কার্য্য দ্বারা সুশোভিত। প্রকোষ্ঠের প্রস্তর প্রাচীরে খোদিত পশু পক্ষী ইত্যাদি সকলই মস্তকহীন—এই সব মূরতগুলি সকলই স্বাভাবিক—কিন্তু ধর্ম্মান্ধ মোগল সম্রাটের রোষানলে পতিত হইয়া সে সমুদয় সকলই মস্তক বিহীন হইয়া বিগত-শ্রী হইয়াছে। খাস মহলের উত্তর-পশ্চিম

পাঁচমহাল।

কোণে অন্তঃপুরস্থ ছেলে মেয়েদের পাঠশালা দেখিয়া আমরা পাঁচমহাল দেখিলাম। পাঁচমহালের গঠনাকৃতি অন্যান্য সৌধাবলী হইতে একটু ভিন্ন রকমের। ইহা নিম্নতল হইতে ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে—

আর ইহার চতুর্দ্দিকই খোলা। নিম্নস্থ ছাপ্পান্নটী স্তম্ভ, আর সর্ব্বোচ্চ তলায় অর্থাৎ পঞ্চম তলায় মাত্র পাঁচটী স্তম্ভ। এসমুদয় স্তম্ভগুলির আবার প্রত্যেকটিই বিভিন্ন প্রকারের শিল্পকার্য্য দ্বারা খোদিত। কোন্ উদ্দেশে এই প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকের নৈসর্গিক দৃশ্য নিচয় বড়ই সুন্দর দেখায়। এই প্রাসাদের এক পার্শ্বে উত্তর দিকের চত্বরে দশপঁচিশ বা পচিশি খেলার সুবৃহৎ গৃহ অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে একএকটী সুন্দরী রমণী সুসজ্জিতা হইয়া গুটির স্থান অধিকার করিতেন এবং স্বয়ং আকবর বাদসাহ বীরবলের সহিত এ সমুদয় গুটি চালনা করিয়া ক্রীড়া করিতেন। পাঠক, একবার সেই অপূর্ব্ব বিলাস-রঙ্গের মোহিনী ক্রীড়ার কথা চিন্তা কর।

পঁচিশি ঘরের অপর দিকে দেওয়ানী খাস বা এক থাম্বা। বহির্ভাগ হইতে এই প্রাসাদটিকে দ্বিতল বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে শীঘ্রই সে ভ্রম দূরীভূত হয়। ঘরের ঠিক্ মধ্যস্থল হইতে একটী বৃহদায়তন স্তম্ভ উঠিয়াছে, ঐ স্তম্ভের মধ্যস্থলে বসিবার একটী প্রস্তরাসন নির্ম্মিত আছে, উহাতে পঁহুছিবার জন্য চারিদিক হইতে চারিটী ১০ ফুট লম্বা প্রস্তর-সেতু আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উহা আবার চারি পার্শ্বের বারান্দার সহিতও সংলগ্ন। স্তম্ভের উপরিস্থিত সম-অষ্টকোণ বসিবার স্থানে বাদসাহ আকবর স্বয়ং উপবেশন করিতেন এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বারান্দায় মন্ত্রী ও আমীর ওমরাহগণ উপবেশন করিতেন বলিয়া কথিত আছে। এক থাম্বার প্রকাণ্ডদেহ একটীমাত্র প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে,—ইহা দেখিবার বটে। দক্ষিণ দিকের বারেন্দা হইতে দূরস্থিত ফতেপুর-সিক্রীর বস্তির দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়। দেওয়ানী খাসের পশ্চিমে আঁখিমিচোনি বা আঁখমিচোনি (Ankh Michani) অবস্থিত। জন-প্রবাদ এইরূপ যে আকবরসাহ এস্থানে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের সহিত লুকোচুরি খেলিতেন। কিন্তু কীন সাহেব ইহার দৃঢ় গঠন ও অন্তঃপুর হইতে ইহার দূরত্ব দেখিয়া ধনাগার বলিয়া অনুমান করেন।* আঁখিমিচনির

দেওয়ানী খাস বা এক থাম্বা।

* Keene's Hand Book to Agra P. 70.



হস্তীস্তম্ভ (এলিফেণ্টা মিনার)—ফতেপুর সিক্রি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা আছে, ইহাতে মকরমুখাকৃতি কারুকার্য্যাদি আছে; কথিত আছে যে এস্থানে একজন বৈষ্ণব সাধু বাস করিতেন। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসন সাহেব ইহার মকরমুখাকৃতি কারুকার্য্যাদি দর্শনে ইহাকে জৈনভাবের অট্টালিকা বলিয়া অনুমান করেন। আগ্রা দুর্গের যে যোধবাই মহল দেখিয়া আসিয়াছি তাহাও ঈদৃশ মকরমুখাকৃতি কারুকার্য্য রাশিদ্বারা পরিশোভিত, তাহা বলিয়া কি ঐ অট্টালিকাকেও জৈন প্রভাবের বলিতে হইবে? অনেক সময় অনুমান অসত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। পাঁচিশি ঘরের পূর্ব্বদিকে "দেওয়ানী আম" নামধেয় দ্বিতল অট্টালিকাটি বিরাজিত। কথিত আছে যে, এই দ্বিতল অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে প্রকাশ্যভাবে উপবেশন করিয়া সম্রাট্ বিচারাদি করিতেন।

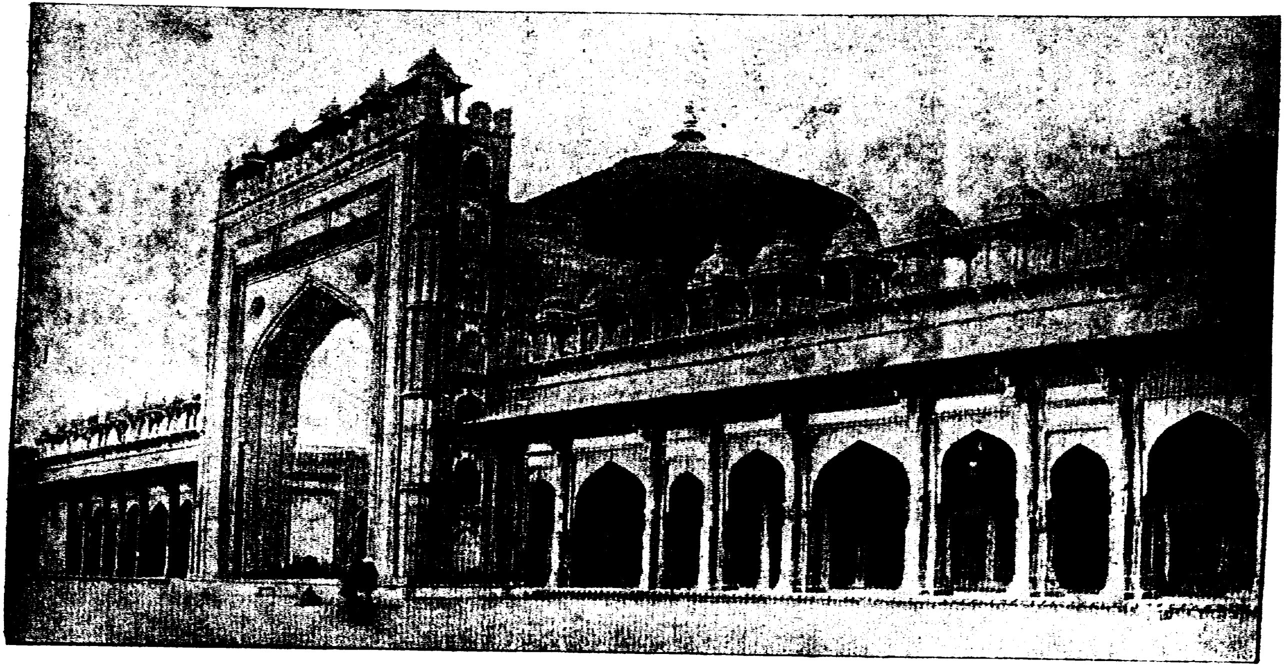
আঁখি মিচনি।

যে কক্ষে বসিয়া তিনি বিচারাদি করিতেন তাঁহারি সম্মুখভাগে নিম্নে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩৬০ × ১৮০ ফুট একটী চত্বর। এই চত্বরের চতুর্দ্দিকে বারেন্দা, যে স্থানে বাদসাহ বসিয়া বিচার করিতেন, সে স্থানে যাইবার তেমন কোনও সহজ পথ নাই। দেওয়ানী আমের চত্বরের উত্তর পূর্ব্বদিকে ডাকবাংলার রাস্তা, সেই রাস্তার উত্তর পার্শ্বে টাঁকশালের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাই যে টাঁকশাল ছিল তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ বিদ্যমান নাই। খোয়াবাগের অল্পদূরে হামাম বা স্নানাগার। এক সময়ে এই ভগ্ন তমসাবৃত গৃহ নানারূপ সুন্দর সুন্দর চিত্রে পরিশোভিত ছিল এবং ইহা বিলাসিতার অপূর্ব্ব নিকেতন ছিল, কিন্তু আজ ইহার সৌন্দর্য্য লুপ্ত, কক্ষ ধূলিধূসরিত ও নীরবতার আধার। যেখানে একদিন বিলাসিনী সুন্দরীগণের বিলাস-স্রোতে ও কলকণ্ঠের মধুর বাক্যালাপে আনন্দ-লহর নৃত্য করিত, এখন তাহা শৃগাল কুক্কুরের চরণ-লাঞ্ছিত ও আরাম নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। সংসার, এই কি তোমার লীলা! এই কি ক্ষুদ্র মানব জীবনের চরম সুখ?

খোয়াবাগের দ্বিতল অট্টালিকাটি একদিন নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্রদ্বারা পরিশোভিত ছিল, এখনও সে সকলের অস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে ইহা সম্রাট্ আকবরের শয়ন-গৃহ ছিল। বেগমমহল বা

খাসমহলের অধিকাংশ দ্বারই এই শয়ন গৃহের সহিত গুপ্তদ্বার পথে সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া শুনিলাম, কিন্তু আমরা তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। একটী প্রাসাদকে আমাদের গাইড বীরবলের কন্যার প্রাসাদ বলিয়া উল্লেখ করিল—বীরবলের কোনও কন্যা সন্তান ছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই। আমাদের বোধ হয় এই সৌধটি বেগমমহলের অতি নিকটে স্থাপিত বলিয়াই ঈদৃশ নামাকরণ হইয়াছে। আমরা বহুদূর বিস্তৃত ধ্বংসাবলীর মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে পুনরায় বুলন্দ দরওয়াজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বুলন্দ দরওয়াজার বাম পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড বাঁধান ইন্দারা দেখিলাম, ইহার জল এখন দুর্গন্ধযুক্ত ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই দরওজাজার দক্ষিণে দৃঢ় এবং সুপ্রশস্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী নিম্নে নামিয়াছে। বর্ত্তমান সিক্রি ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। আমরা আমাদের বর্ণিত স্থান সমূহ দর্শনান্তে যোগী-কা-ছত্রী, নাগিনা মস্‌জিদ, ইস্তাম্বুল বেগমের প্রাসাদ ইত্যাদি দর্শন করিলাম। ফতেপুর-সিক্রীর বিস্তৃত দেহের স্তব্ধভাব হৃদয়ে একটা বিষাদের ছায়া ফেলিয়া দেয়। যে সিক্রি একদিন দেশ-দেশান্তরের শিল্পিগণের ও জনসাধারণের কল-কোলাহলে দিবারাত্রি মুখরিত থাকিত, এখন তাহা পরিত্যক্ত। পূর্ব্বে যে স্থান বাণিজ্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এখন সে স্থান কেবল পাহাড়ের প্রস্তরের জন্য বিখ্যাত। পূর্ব্বে ফতেপুর-সিক্রির উত্তরাংশে একটী বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল, উহা দৈর্ঘ্যে ছয় মাইল এবং প্রস্থে দুই মাইল ছিল—হ্রদের উত্তর দিকে পর্ব্বত এবং দক্ষিণাংশে উচ্চ বাঁধ ছিল। 'আইন-ই-আকবরী' পাঠে জানিতে পারা যায় যে পূর্ব্বে কখন কখনও হ্রদের জল বাঁধ ছাড়াইয়া চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া ফেলিত—এবং যথেষ্ট ক্ষতি করিত। এই হ্রদের জল দ্বারাই ফতেপুর-সিক্রির বিভিন্ন স্থানের চৌবাচ্চাসকল পূর্ণ করা হইত, এখনও সে সমুদয় শিল্প-চিহ্নের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন শিল্পীগণের শিল্পের চরমোৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মৈসন সাহেবের শাসন সময়ে ইহার জল সেচন করিয়া ফেলা হইয়াছে, তদবধি ইহার শুষ্কদেহে কৃষকগণ চাষবাস করিয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত

খোয়াবাগ।



প্রধান মস্‌জিদ—ফতেপুর সিক্রি।

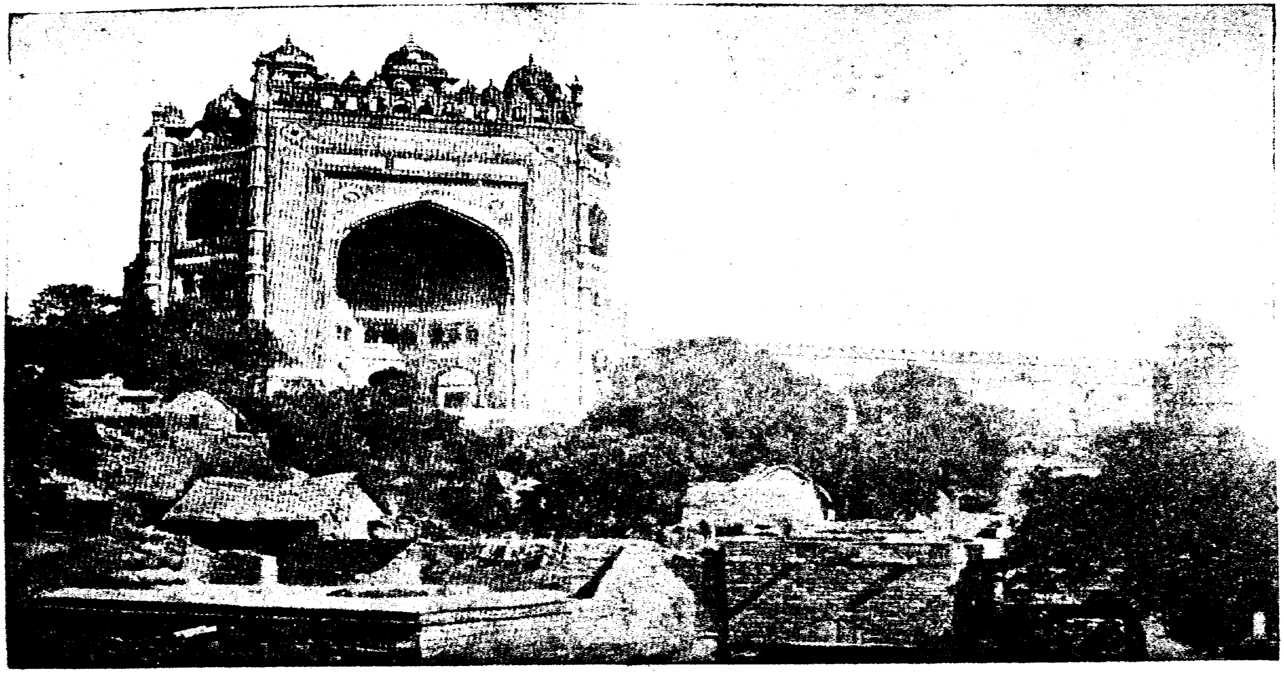
কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বুলন্দ-দরওয়াজার নিকটস্থ চত্বরের পশ্চিমাংশে একটী মস্জিদ অবস্থিত, ফার্গুসন সাহেব এই মস্জিদটিকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, তিনি বলেন "The glory, however, of Futtehpore Sikri is its mosque, which is hardly surpassed by any in India." (History of Indian Architecture P. 580) এই জুম্মা মস্জিদটিও অন্যান্য প্রাসাদাদির ন্যায় লোহিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। প্রস্তরের প্রাচীরের উপরে মুসলমানধর্ম্ম-বিগর্হিত হইলেও এমন সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলী ও কারুকার্য্য দ্বারা পরিশোভিত যে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে ভাষা দ্বারা পাঠকের নয়ন সমক্ষে সঠিক চিত্র অঙ্কিত করিতে পারা যায় না। এই মস্জিদটি হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই মস্জিদেই সম্রাট্ আকবর বাদশাহ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ইমাম ধর্ম্মের প্রচলনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন—আর এস্থানেই 'আইন-ই-আকবরী' প্রণেতা আবুলফজলের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মস্জিদের খিলানের উপর ইহা "দ্বিতীয় স্বর্গ" এইরূপ লিখিত আছে। মস্জিদের সাঙ্কেতিক লিপি দৃষ্টে বোধ হয় ইহা ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে আকবরসাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এখন আমরা ফতেপুর-সিক্রির উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কথিত আছে যে আকবর বাদশাহ দুইটী পুত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুতে বড়ই ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় নানা চিন্তার মধ্যে বড়ই বিরস ভাবে কালাতিপাত করিতে থাকেন, সে সময়ে সিক্রিপাহাড়ের নিভৃত গুহাভ্যন্তরে পারস্যদেশের বিখ্যাত ফকির মৈনুদ্দীন চিস্তির শিষ্য সেলিমচিস্তি নামধেয় জনৈক ফকির বাস করিতেন—সভাসদ্‌বর্গের উপদেশে আকবর সাহ এই ফকিরের কৃপাপ্রার্থী হইলেন, তখন সিক্রিতে সামান্য বসতি ছিল এবং চারিদিকে জঙ্গলাবৃত ছিল—ফকির জন-কোলাহল হইতে দূরে এই নিভৃত স্থানে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন।

সম্রাট্ পূর্ব্বেও এই ফকিরের মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন, এখন সভাসদ্-গণের উপদেশে এবং এই ফকিরের অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশেষরূপে

অবগত হইয়া ইঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদসাহ উজবেক আমীরদিগকে দমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিক্রিতে ফকিরের নিকট স্বীয় মনঃকষ্টের কারণ ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু ফকির সাহেব বাদসাহের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অস্বীকার করায়, তিনি যখন মনের দুঃখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন ফকির সাহেবের ছয় মাস বয়স্ক শিশু নিজ জীবনদানে বাদসাহকে পুত্র-বর প্রদান করেন। জগদীশ্বরের কৃপায় সেই বৎসরই নিঃসন্তান আকবর বাদসাহের পুত্রের জন্ম হয়। কথিত আছে যে অম্বর রাজকুমারী গর্ভাবস্থায় এস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এখানেই জাহাঁগীর ভূমিষ্ঠ হ'ন। অদ্যাপি জনসাধারণে জাহাঁগীরের আঁতুড় ঘর দেখাইয়া থাকে। আকবর সাহ ফকিরের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ফকিরের নামানুকরণে পুত্রের নামও সেলিম রাখেন। কুমারের জন্মের পর হইতেই সিক্রীতে রাজকীয় বাসস্থান ইত্যাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়—এবং ক্রমে ইহা সুন্দর সুন্দর সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া মনোহর নগরের আকার ধারণ করে। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদসাহ গুজরাট প্রদেশস্থ মির্জাহোসেনের বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তাঁহার এই নূতন রাজধানীর নাম ফতেপুর রাখেন। ক্রমে ইহা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সর্ব্ব প্রকারে সুরক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে আকবর বাদসাহ ফতেপুর হইতে পুনরায় রাজধানী আগ্রাতে পরিবর্ত্তন করেন। তিনি কেন এই ভাবে ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন এ সম্বন্ধে নানা প্রকার জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ বলেন যে নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নিকট কোনও স্রোতস্বিনী প্রবাহিত না থাকায় নগরে জলের বিশেষ কষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে এই নগরী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল,—একথা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত হ্রদের বিবরণী পাঠেই পাঠক তাহার অযৌক্তিকতা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। দ্বিতীয় প্রবাদ বাক্যই আমাদের নিকট যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ফকির সেলিমচস্তি রাজধানী হওয়ায় দিবারাত্র জন-কোলাহলে ঈশ্বর চিন্তার ব্যাঘাত হয় দেখিয়া আকবর বাদসাহকে ফতেপুর-সিক্রি হইতে রাজ-



ফতেপুর সিক্রির তোরণদ্বার।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

ধানী পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন, বাদসাহ ও তদনুযায়ী কার্য্য করেন—তদবধি ক্রমশঃ ইহা জনশূন্য হইয়া নীরবতার পূর্ণ আধার হইয়া পড়ে। জাহাঁগীর বাদসাহের আত্মজীবনী হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার রাজত্বে ফতেপুর সিক্রির মধ্য দিয়া যাতায়াত বিশেষ ভয়-সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। ফতেপুর সিক্রির নির্জ্জন প্রাসাদাবলী ও ইহার চতুর্দ্দিকের ধ্বংসাবশেষ দেখিবার বটে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের আদেশে এই সমুদয় প্রাসাদাবলীর পূর্ণ জীর্ণ-সংস্কার হইয়া এবং ইহাদের লুপ্ত প্রায় চিত্র সমূহের পুনরুদ্ধার হইয়া এখন ইহা নব-শ্রী ধারণ করিয়াছে। বুলন্দ দরওয়াজার সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। ফার্গুসন সাহেবের মতে পৃথিবীতে ও এইরূপ উচ্চ খিলান আছে কিনা সন্দেহ এবং ইহা ভারতে অদ্বিতীয়; উচ্চ ভূমির পৃষ্ঠে ইহার বিরাট প্রস্তর দেহ অদ্যাপিও নব-যৌবনের দৃঢ়তায় বিরাজিত। ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা ১৩০ ফুট। ইহার উপর হইতে আগ্রার তাজমহল দেখিতে পাওয়া যায় এবং চারিদিকের দৃশ্যাবলী বড়ই সুন্দর দেখায়। বুলন্দ দরওয়াজার বিশাল দেহের নিকট ফতেপুর সিক্রির অন্যান্য প্রাসাদাবলী নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচিত হয়। ফতেপুর সিক্রির বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, এখানকার সমুদয় প্রাসাদই আকবর বাদসাহের নির্ম্মিত, এখানে অন্য কোনও সম্রাটের নির্ম্মিত কোনও সৌধ ইত্যাদি নাই। একস্থানে একটী কূপকে Jumping well কহে—এই বৃহৎ কূপের বা ইন্দারার মধ্যে ছোট ছোট ছেলেরা যুবকেরা এমন কি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধেরাও প্রত্যেকে দুই আনার পয়সা লইয়া অত্যুচ্চ প্রাসাদ-শিখর হইতে লাফ দিয়া পতিত হয়—ইহা দেখিবার বটে; কূপের মুখের ভাগ একটী ছোট পুকুরের ন্যায় বৃহৎ হইবে।

বুলন্দ দরওয়াজা।

আমাদের ফতেপুর সিক্রির চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে এক ভগ্ন উদ্যান মধ্যে বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম ও মধ্যাহ্ন ভোজ সমাপন করিয়া লইয়াছিলাম—কারণ আমরা আগ্রা হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে ফতেপুরে খাদ্য দ্রব্যাদি ও পানীয়ের নিতান্ত অভাব,—এখানে আসিয়াও তাহাই দেখিলাম। সুবুদ্ধির

মত খাদ্য দ্রব্যাদি ও পানীয় সঙ্গে করিয়া আনায় এখন এখানে গুরুতর শ্রমের পরে দিব্য একটু আরাম ভোগ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা সিক্রি পরিত্যাগ করিলাম—একটী গভীর নৈরাশ্যের ছায়া হৃদয় ব্যাপিয়া ফেলিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, হীরক খণ্ডের ন্যায় তারকামালা গগনে প্রকাশিত হইল—সোঁ সোঁ রবে গাছের পাতা কাঁপাইয়া নৈশ-বায়ু ছুটিয়া চলিল। আমরা সকলে নীরব—কাহারও মুখে কথাটি নাই, সারা দিবসের পরিশ্রমে ও রৌদ্রের নির্য্যাতনে শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—কোন রকমে ক্ষুদ্র ঘোড়ার গাড়ীতেই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। যখন আগ্রা পঁহুছিলাম তখন রাত্রি প্রায় দশটার অধিক। জনপূর্ণ রাজবর্ত্ম—নীরব ও নিস্তব্ধ। বাসায় পঁহুছিয়া সে রাত্রিতে আর আহারাদি না করিয়াই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, সমুদয় দিবসের ক্লান্তি ও অবসাদ স্নেহময়ী নিদ্রাদেবীর স্নেহ-কর-স্পর্শে দূরীভূত হইল। হায়! সংসার, হায়! নশ্বর জগত,—চারিদিকে বিরাট ধ্বংসের মূর্ত্তি তুমি বিস্তার করিয়া রাখা সত্ত্বেও মহামোহে বদ্ধ মানব আমরা, কালের ভীষণ দুন্দুভিনাদ শ্রবণ করিতে পারি না—তবুও বুঝি না—আমাদের ধন জন—আমাদের আশা ভরসা কত ক্ষুদ্র—কত ক্ষণিক।

ঢোলপুর।

ঢোলপুর মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুর রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যটি ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং ১৬ মাইল প্রস্থ। ইহার উত্তর সীমা আগ্রা, দক্ষিণে চম্বলনদী এবং পশ্চিমদিকে করৌলি ও ভরতপুর। ঢোলপুরই এই রাজ্যের প্রধান নগর, এস্থানে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের Political Agent বাস করিয়া থাকেন। ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র ভূ-খণ্ডের একমাত্র অধিপতি—ইঁহার অধীনস্থ জমিদারগণ এবং মাতব্বরগণ প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। এস্থানের শাসনকর্ত্তাগণ জাটবংশীয়, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাচীন সময়ে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী গোহাদ নামক স্থানের জমিদার ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ঢোলপুরের মহারাণারা সম্মানার্থে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের নিকট হইতে পনেরটী তোপ পাইয়া থাকেন, এস্থানে ৬০০ শত অশ্বারোহী, ৩৬৫০ পদাতিক, ১০০ শত গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টী কামান আছে। এই ছোট সহরটিতে দর্শনীয় তেমন কিছুই নাই। ঢোলপুর নগরী আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড গিয়াছে তাহার ৩৪ মাইল দক্ষিণে এবং গোয়ালিয়র নগরের ৩৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমান ঢোলপুর—নূতন ঢোলপুর। রাজা ঢোলনদেবের নির্ম্মিত ঢোলপুর একেবারে চর্ম্মন্বতী নদীর তটদেশে অবস্থিত ছিল, পরে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর ইহা অধিকার করিলে তৎপুত্র হুমায়ুন প্রাচীন ঢোলপুর নগরী চর্ম্মন্বতী নদীর কুক্ষিগত হওয়ার অশঙ্কায় উহা আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট্ আকবর এস্থানে একটী উচ্চ ও সুরক্ষিত সরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরের নূতন অংশ ও রাজপ্রাসাদ রাণা কিরাতসিংহ নির্ম্মাণ করেন।

রাজ্যের কথা।

এই ক্ষুদ্র সহরে এক রাজবাটী ব্যতীত দর্শনীয় কিছুই নাই, রাজবাটীতেও তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছুই দেখিলাম না। প্রাচীন রাজবাটী নরসিংহবাগে, একটী বৃহৎ কূপ একমাত্র দর্শনীয় বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই কূপের চারিদিক প্রস্তরমণ্ডিত ও জলের কিছু উপরেই দেয়াল-সংলগ্ন সারি সারি গ্যালারী। এক পার্শ্বের সুপ্রশস্ত সোপান-পথের সাহায্যে এ সকল গ্যালারীতে অবতরণ করা যায়। কূপের সলিলরাশির সহিত একটী বৃহৎ চৌবাচ্চা সংযোজিত আছে এবং মৃত্তিকার উপরে দ্বিতল অট্টালিকা সমূহ বৃত্তাকারমুখে চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে এস্থানে পনের দিন ধরিয়া একটী মেলা হইয়া থাকে—সেই মেলায় ভারতের নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক অশ্ব, গবাদি পশুসমূহ ও আগ্রা, দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্য-দ্রব্যাদি আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। ঢোলপুর নগরের তিন মাইল পশ্চিমে মুচুকুন্দ হ্রদ নামক একটী অতি রমণীয় হ্রদ আছে, এই হ্রদ প্রায় ১২৫ বিঘা বিস্তৃত ও অত্যন্ত সুগভীর। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ গিরি-বন-রাজি-বেষ্টিত প্রাকৃতিক শোভা নয়ন-মন-মুগ্ধকর। শ্যামলা-ধরিত্রী জননী যে কত বিচিত্র সৌন্দর্য্যপূর্ণা, তাহা যিনি কখনও বিভিন্ন দেশাদি পর্য্যটন করেন নাই তাহার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। চতুর্দ্দিকস্থ গিরিসমূহ হইতে বৃষ্টির জল আসিয়া এই হ্রদের কলেবর পরিপুষ্ট রাখিতেছে। একদিকে নির্জ্জনতা ও অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা এই স্থানটি বড়ই রমণীয়। হ্রদের তীরে চতুর্দ্দিকে প্রায় ১১৪টী দেবালয় আছে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্রমাসে এস্থানে দুইটী মেলা হয়, সে সময়ে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া এখানে স্নানদানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া থাকে।

আকবরের নির্ম্মিত সরাইয়ের নিকট একটী অতি সুন্দর মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, মস্‌জিদটির কারুকার্য্যও নির্ম্মাণ-কৌশল অত্যন্ত মনোহর, ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আগ্রার ইতিমদউদ্দৌলা মস্‌জিদের সহিত ইহার বাহ্যাকৃতির কতকটা সাদৃশ্য অনুভূত হইল।

এতদ্ব্যতীত পর্ব্বত-পদতলস্থ ফকীর সাহা সারাকবদলের সমাধি ও মুনি সিদ্ধি নামক জনৈক হিন্দু সিদ্ধ-পুরুষের বাসস্থান ও ঢোলপুরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। সীমান্ত-সংগ্রামে যোগ দিয়া ঢোলপুরের মহারাণা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের নিকট হইতে বিশেষরূপে

সম্মানিত হইয়াছেন। এ স্থানের বার্ষিক রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না। বিচার এবং শাসনভার সম্পূর্ণরূপে রাজার হস্তেই ন্যস্ত আছে।

ঢোলপুর স্থানটি বড়ই স্বাস্থ্যকর, খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ, দুধ সাধারণতঃ প্রতি সের চারি পয়সা হিসাবে বিক্রী হইয়া থাকে। মাংসের সের দুই আনার অধিক নহে—নানা প্রকারের তরি তরকারীও এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলে; দু'চারি ঘর বাঙ্গালীও এ নগরে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়া থাকেন, প্রবাসী বাঙ্গালীর স্বাভাবিক সৌজন্যতা ও অতিথি-সেবা হইতে ইহারাও পরাঙ্মুখ নহেন।

ঢোলপুরের তিন মাইল দক্ষিণে রাজঘাট নামক স্থানে চম্বল বা চর্ম্মন্বতী নদীর উপরে একটী নৌ-সেতু আছে— উহা পহেলা নভেম্বর হইতে পনেরই জুন পর্য্যন্ত খোলা থাকে, বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেয়া নৌকা দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়।

ঢোলপুরের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিয়াই আমরা এ স্থানের সহিত বিদায় গ্রহণ করিব। এ রাজ্যের শ্বেত ও রক্তবর্ণ বালুকা প্রস্তরের খিলান এবং নানা বিভিন্ন আকৃতির বাতায়ন প্রভৃতি দেখিতে অতিশয় মনোহর, কারুকার্য্যের তারতম্যানুসারে মূল্যেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এ স্থানের পিত্তল-নির্ম্মিত বিবিধ চিত্রালঙ্কৃত হুকোকে কল্লি কহে, এগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। ঢোলপুরের কাষ্ঠ নির্ম্মিত খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি—বড়ই মনোহর, এখানকার বার্ণিশ করা দ্রব্যাদির ও বিশেষ খ্যাতি আছে।

গোয়ালিয়র।

ঢোলপুর হইতে গোয়ালিয়র আসিলাম। এই পথের উভয় পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলীর মধ্যে কোনও রূপ বিশেষত্ব নাই, ভূমি অসমতল এবং বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে মাঝে উচ্চ উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ ও শ্যামল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৰ্জ্জিত তৃণশস্যাদির হরিৎ সুষমা বিরহিত রুক্ষ পর্ব্বতশ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই দ্রষ্টব্য ছিল না, যাহাতে বঙ্গজননীর শ্যামলাঞ্চল ছায়ায় বর্দ্ধিত বাঙ্গালী পরিব্রাজকের মনোরঞ্জন করিতে পারে।

গোয়ালিয়র যখন পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় এক ঘটিকা হইবে, প্রখর সূর্য্য-কিরণে চতুর্দ্দিক ঝলসিত, গরম বাতাস হুহু করিয়া প্রবাহিত হইয়া শরীরে অগ্নির কণা ছড়াইয়া দিতেছিল। দূর হইতেই এখানকার সুবিখ্যাত প্রাচীন দুর্গ দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছিল। এই দুর্গটি গোপগিরি নামক একটী দেড় মাইল দীর্ঘ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। গোয়ালিয়রের এই প্রাচীন দুর্গ কচ্ছপবংশীয় সর্দ্দার সূরাজ সেন ২৭৫ খ্রীঃ অব্দে গোয়ালিয়র নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ইহা সুরক্ষিত করিবার জন্য প্রস্তুত করেন, কথিত আছে যে গোপিল নামক জনৈক সন্ন্যাসী সর্দ্দার সুরাজের দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করার পরে তাঁহার সম্মানার্থ তিনি এই দুর্গ, সূর্য্য-মন্দির ও সুরাজ কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। কত কাল চলিয়া গিয়াছে, কাল তরঙ্গের কত ভীষণ আক্রমণ ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, ভারতের কত উত্থান পতন দেখিয়াছে—কিন্তু আজিও সে বহুকালের স্মৃতি বহন করিয়া আপনার অস্তিত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, প্রতি প্রস্তর খণ্ডে অতীতের কত জীবন্ত ইতিহাস প্রকটিত, কিন্তু হায়! আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা সেই জড় ইতিহাস পাঠ করি। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইহা নৃপতিগণের একটী সুদৃঢ় আশ্রয় স্থল ছিল—সুলতান মামুদ বহুচেষ্টা করিয়াও ইহা অধিকার করিতে পারেন নাই, ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গ সর্ব্ব প্রথমে মহম্মদঘোরীর করতলগত হয়, কিন্তু তিনিও দ্বাদশ বৎসরের অধিক ইহা আপনার অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন নাই। ইহা উত্তরদিকে গোয়ালিয়র নগর হইতে ত্রিশ ফিট

উচ্চ, কিন্তু এই দুর্গের সর্ব্বপ্রধান দ্বার ২৭৪ ফিট উচ্চ। গোয়ালিয়র নগরী দুই ভাগে বিভক্ত, এই দুর্গের পাদদেশের উত্তরাংশে প্রাচীন গোয়ালিয়র নগর এবং দক্ষিণাংশে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে নূতন গোয়ালিয়র বা লস্কর নগর অবস্থিত। যে স্থানে সর্ব্বপ্রথমে দৌলতরায় সিন্ধিয়া আসিয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করেন সেই স্থানই বর্ত্তমান সময়ে লস্কর বা স্কন্ধাবার নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, এই নগরীর দিন দিন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গোয়ালিয়রের সমৃদ্ধি হ্রাস হইয়া যাওয়ায় ইহাই এখন সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়াছে। এই দুইটী নগরকে এক বিবেচনা করিলে ইহা একটী বহুজনাকীর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিতে হয়, এস্থানে জন সংখ্যা দুই লক্ষের উপর এবং গৃহ সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার হইবে।

গোয়ালিয়রের দুর্গ।

গোয়ালিয়রের এই প্রাচীন দুর্গ মহম্মদঘোরীর হস্তচ্যুত হইলে পর সুলতান আল্‌তামাসের হাতে আইসে, তৎপরে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা পুনরায় নরসিংহ রায় নামক জনৈক হিন্দু রাজা আলতামসের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লয়েন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা হিন্দুর অধিকারেই থাকে; এই নর সিংহের বংশধর মান সিংহের রাজত্ব সময়ে নগরের বহু পরিমাণে উন্নতি সংসাধিত হয়, তাঁহার নির্ম্মিত মানসিংহ-প্রাসাদ অদ্যাপি দুর্গ মধ্যে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান পাঠান সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদির হস্তগত হয় এবং উহার কয়েক বৎসর পরে মোগল সম্রাট্ বাবরের হস্তে আইসে ও সময়ের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ুন, সেরসা, আকবর, প্রভৃতির অধিকার ভুক্ত হয়। মোগল রাজত্বের শেষাবস্থায় গোহাদের জাট সর্দ্দার গোয়ালিয়র অধিকার করেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই উহা হস্তান্তরিত হইয়া মহারাষ্ট্রদিগের হাতে আইসে, ইহার পরে ইংরেজ, মারহাটা ও রাজপুতদিগের মধ্যে যে ইহা উপর্য্যুপরি কতবার হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

গোয়ালিয়রের ইতিহাস।

বর্ত্তমান সময়ে যে রাজবংশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে তাহার আদি পুরুষ মহারাষ্ট্রবীর রণজী সিন্ধিয়া। পুরুষের ভাগ্য নির্ণয় করা যে সুকঠিন, এই শাস্ত্রীয় প্রবাদ বাক্য অতি সত্য, মানুষের অদৃষ্ট যে কখন কোন্ শুভ-

লগ্নে অত্যাশ্চার্য্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না, রণজী সিন্ধিয়ার জীবন-বৃত্তান্ত হইতে আমরা এই সত্যকে আরও দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিতে পারি। ইনি সুবিখ্যাত বালাজী পেশবার পাদুকা-বাহক মাত্র ছিলেন এবং ইঁহার পিতাও কোন ও গ্রামের সামান্য পাটেল মাত্র ছিলেন, কিন্তু ভাগ্য-লক্ষ্মীর স্নেহ-দৃষ্টিতে ইঁহার দিন দিন গৌরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইনি গোয়ালিয়র রাজ্যের অধিকারী হন, ইঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধাজী সিংহাসন অধিকার করেন, ইনি নামে মাত্র পেশবার অধীন থাকিয়া স্বাধীন ভাবেই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইনি যথেষ্ট বীরত্বের ও যুদ্ধ-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতার পৌত্র দৌলতরাও রাজ্যাধিকার করেন, দৌলতের মৃত্যুর পরে মুগতরাও নামক একটী বালককে তাঁহার স্ত্রী বাইজার দত্তকরূপে গ্রহণ করেন, ইনি জনকজী নামে অভিহিত ছিলেন। জনকজী অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে পর তাঁহার বিধবা পত্নী বাজিৎরাও নামক এক অষ্টমবর্ষীয় শিশুকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের অনুমোদনে এই বালক বাজিরাও সিন্ধিয়া নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার সময়েই গোয়ালিয়র রাজ্যে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রবল বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা তান্তিয়াতোপী আপমন করিলে বাজিরাও সিন্ধিয়া সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মন্ত্রী দিনকর রাওয়ের সহিত আগ্রা নগরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। পরে সার হিউরোজ গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া মহারাজকে স্বকীয় প্রাসাদে স্থাপন করিয়া যান। গভর্মেণ্ট বাজিরাও সিন্ধিয়ার কার্য্যাবলী দৃষ্টে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ৩০০০০০৲ টাকা আয়ের একটী সম্পত্তি, দত্তক গ্রহণের আদেশ এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রদান করেন। মহারাজ ইংরেজ সৈন্যের একজন প্রধান সেনাপতি হইয়া K.G.C.B. ও K.G.C.S.I. উপাধি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে সিন্ধিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে ১৯টী এবং নিজরাজ্যে ২১টী তোপ প্রাপ্ত হইতেন।

গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার ইতিহাস।

বর্ত্তমান সিন্ধিয়া একজন নব্যশিক্ষিত আদর্শ হিন্দু নরপতি। এইরূপ সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ কর্ম্মপ্রিয় উৎসাহী নরপতি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য্য-সম্পদে ও পরাক্রমে ইনি ভারতের শ্রেষ্ঠতম দেশীয় নৃপতি মণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম হইলেও—এই অল্প বয়স্ক রাজা নিজেই নানারূপ কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। প্রজার হিতসাধনে ইহার চেষ্টা ও যত্ন অসাধারণ, ইনি নিজ রাজ্যের কল্যাণার্থ যে সমুদয় লোক-হিতকর কার্য্য করিয়াছেন তন্মধ্যে একটী শত মাইলব্যাপী লাইট রেলওয়ে ও প্রথম শ্রেণীর কলেজের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। গোয়ালিয়র রাজ্যের আয় প্রায় দুই কোটী টাকা। এই রাজ্য ৩৩১১৯ বর্গ মাইল বিস্তৃত এবং ইহাতে প্রায় ১০৪৩৬টী সমৃদ্ধ পল্লী ও নগর আছে।

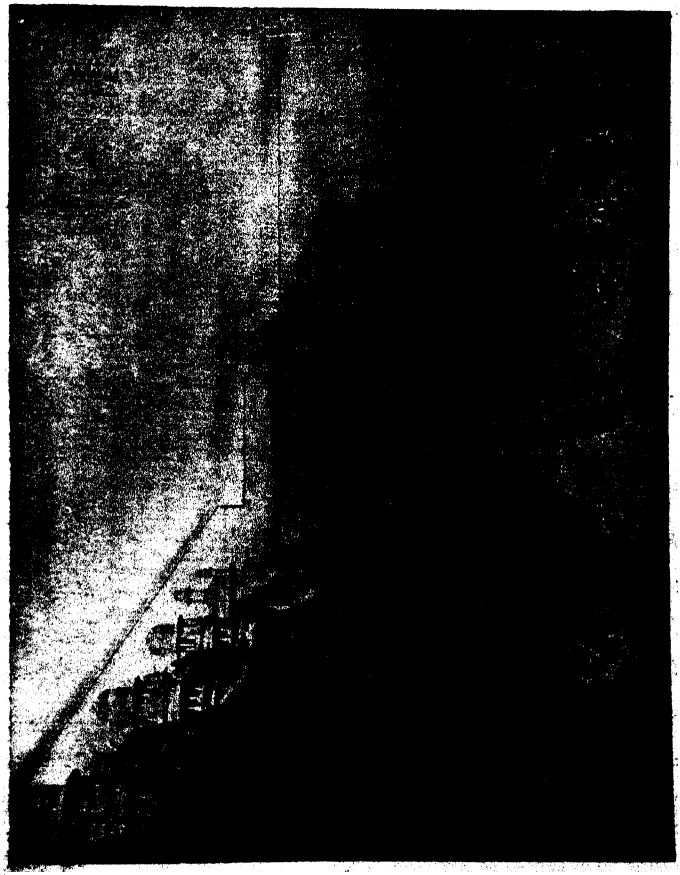
আমরা ধর্ম্মশালা বা মুসাফিরখানায় অবস্থান করতঃ আহারাদি সমাপনান্তে একটু বিশ্রামের পর নগর দেখিতে বহির্গত হইলাম। এই নগরে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে, হিন্দু ও জৈন শিল্প কার্য্যের জন্য ইহার নিপুণতার খ্যাতি অনেক দিন হইতেই প্রচলিত আছে। প্রথম দুর্গ দেখিবার জন্য একারোহণে অগ্রসর হইলাম, দুর্গ দর্শন করিতে হইলে রেসিডেন্সি আফিস বা মহারাজার মুসাফির খানার অধ্যক্ষের নিকট হইতে পাশ লইতে হয়। গোয়ালিয়রের একাগুলিকে পশ্চিমের অন্যান্য স্থানের একা হইতে একটু আরামপ্রদ ও উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত দেখিলাম। এখানকার একাগুলির উপরে বসিবার ছাদ আছে এবং ভিতরকার বসিবার আসন গুলিও দিব্য আরামপ্রদ।

গোয়ালিয়র দুর্গ।

যখন একা আসিয়া দুর্গমূলে দাঁড়াইল, তখন পাষাণময় পাহাড়ের উপর উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত এই দুর্গের অটল, অচল ভৈরব মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ের ভাব উদয় হইল। কি বিরাট দেহ, কি দুর্ভেদ্য গঠন, আর পর্ব্বতই বা কেমন সরল, অনেক পাহাড় দেখিয়াছি, কিন্তু এইরূপ সরল ও উন্নত ভূধর আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, ইহার গাত্র একটু ও ঢালু নহে। চতুর্দ্দিকে প্রায় ৩৫ ফুট উচ্চ প্রাচীর, প্রাচীরের নিম্নস্থ সমুদয় পাহাড়ই ঢালু। ছয়টী বৃহৎ তোরণ পার হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়। পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, ও উত্তর-পূর্ব্ব

হইতে তিনটী সুনির্ম্মিত রাস্তা আসিয়া বক্রগতিতে দুর্গোপরি উত্থিত হইয়াছে। দুর্গের সর্ব্ব নিম্ন তোরণের নাম আলমগিরি, ইহা ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঔরাঙ্গজেবের নামানুসারে মোতামিদ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়; ইহার পরে (২) হিন্দোলাফটক, মানসিংহের মাতুল বাদলসিংহের নামানুযায়ী ইহার নামাকরণ হইয়াছে, এই ফটকের দক্ষিণাংশে মহারাজা মানসিংহের পত্নীর জন্য নির্ম্মিত "গুজারি-প্রাসাদ" নামক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী দ্বিতল অট্টালিকা (৩০০ × ২৩০ ফুট) (৩) বানসুর, উঁরো বা বাঁসোরপুর ফটক, ইহা মহারাজা মানসিংহের সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল; (৪) গণেশপুর ফটক; এই ফটকের নিকটে গলিপের মন্দির নামক একজন সন্ন্যাসীর একটী মন্দির আছে, কথিত আছে যে এই গলিপের নামানুসারেই এ স্থানের নাম গোয়ালিয়র হইয়াছে। ইহার বহির্ভাগে কপোতখানার মধ্যে (৬০ × ৩৯ × ২৫ ফুট) সুরসাগর নামক একটী দীঘী আছে। (৫) লক্ষ্মণপুর ফটক; (৬) হাতীয়াপুর বা গণেশ ফটক; এই দুই ফটকের মধ্যস্থলে চতুর্ভুজ মন্দির নামে একটী বিষ্ণু-মন্দির আছে, মন্দিরের সন্নিকটে একটী সরোবর ও তাহার অপর তীরে ইব্রাহিম লোদির অন্যতম কর্ম্মচারী তাজ নিজাম নামক একব্যক্তির সমাধি অবস্থিত। আমরা আলমগির ফটক দিয়া প্রবেশ করিলাম, এই ফটক সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত, যে রাস্তার মধ্য দিয়া আমরা দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহার একদিকে পাষাণমণ্ডিত পর্ব্বত-গাত্র, অপর দিকে দুর্গের উন্নত প্রাচীর, প্রাচীর-শিখরে আরোহণ না করিলে বাহিরের কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই। যুদ্ধকালে প্রাচীরের উপরে আরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র পরিচালনার নিমিত্ত সিঁড়ি আছে, পথ এত উচ্চ যে আরোহণ করিতে করিতে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলে হস্ত পদ অবশ হইয়া যায়। পর্ব্বত-গাত্রে ও প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য খোদিত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমাদের পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মণ ফটকের নিকটে প্রায় ১৫। ফুট উচ্চ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর একটী বরাহবতারের মূর্ত্তি আছে, গোয়ালিয়রের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মূর্ত্তি। ইহার ভাস্কর-কার্য্য দেখিলে অতি সহজেই ইহার প্রাচীনত্ব

অনুভূত হয়। রাজা তুঙ্গড় সিংহ কর্ত্তৃক ১৪২৪—১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গণেশপুর দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণপুর ফটকের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে কচ্ছবাহরাজ বজ্রদামা তাহার পিতা লক্ষ্মণের নামানুসারে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ফটকের উপরে



গোয়ালিয়র দুর্গ

কতকগুলি শিবলিঙ্গ, হরগৌরী, গণেশ প্রভৃতির পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হাতীয়ারপুর ফটক গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে এস্থানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ হস্তী

ছিল, তাহার পৃষ্ঠের উপরে সম্মুখভাগে মাহুত এবং তাহার পশ্চাতে মহারাজা মানসিংহের মূর্ত্তি সমাসীন ছিল, আবুল ফজল, বাবর প্রভৃতি ইহার ভাস্কর-নিপুণতার জন্য বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং এই হাতী হইতেই এই ফটকের নাম হাতিয়ারপুর হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান সময়ে সেই হাতীর কোনওরূপ ভগ্নাবশেষের চিহ্নও দৃষ্ট হয় না, কেহ কেহ অনুমান করেন যে মোতামিদ খাঁ উহার ধ্বংস সাধন করেন। হাতীয়ারপুর ফটকটি জয়সিংহ নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ মান-মন্দিরের অংশ বিশেষ, এই প্রাচীন অট্টালিকাটী শিল্প-নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব চমৎকারিতায় অদ্যাপি দর্শকের মনাকর্ষণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃই ইহার শিল্প-নৈপুণ্য এত সুন্দর ও নয়ন-রঞ্জক যে সমগ্র উত্তর ভারতে উপমা অতি বিরল। মান-মন্দির দুই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন মহলে বিভক্ত। ছোট ছোট সিঁড়ি-পথ দিয়া এই সকল মহলে প্রবেশ করিতে হয়, প্রত্যেক মহলেই অসংখ্য তল, মৃত্তিকার নিম্নেও কতকগুলি মহল আছে, পূর্ব্বে ঐ সকল মহলে আলো প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পর্ব্বত-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খোদিত ছিল, এখন সে সকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং অব্যবহার্য্য ঘরগুলিও ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। এই পুরীতে প্রবেশ করিবার দ্বার সমূহ বিশেষ ক্ষুদ্রাকৃতি। হিন্দু শিল্প-নৈপুণ্যের পূর্ণ পরিচয় এখান হইতেই পাওয়া যায়, প্রস্তরের উপর খোদিত লতা, পাতা প্রভৃতি বড়ই মনোহর। উত্তর-পশ্চিমাংশের দ্বারের নাম ঘরগর্জ্জপুর দ্বার, এ স্থানেও বহু প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। দুর্গটি যদিও দৈর্ঘ্যে প্রায় ১॥ মাইলের উপরে হইবে কিন্তু ইহার প্রশস্ততা তাদৃশ অধিক বলিয়া মনে হইল না। এই সুবৃহৎ দুর্গটির তুল্য দুর্ভেদ্য দুর্গ উত্তর ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গোয়ালিয়রের এই দুর্গ মধ্যে বহুতর প্রাসাদ ও দেব-মন্দিরাদি আছে, তন্মধ্যে করণমন্দির, মানমন্দির, পূজারণিমন্দির, বিক্রমমন্দির, শেরমন্দির ও শাহজাহান মন্দির প্রধান, এতদ্ব্যতীত আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ ও দেব মন্দিরাদি বিদ্যমান আছে, সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গোয়ালিয়র দুর্গের বিশেষত্ব এই যে ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত অবরোধিত

মানসিংহ-নির্ম্মিত মান-মন্দির।

থাকিলেও জলাভাব ঘটেনা, কারণ এই দুর্গ মধ্যে সুরাজকুণ্ড, ভুকোনিয়া, জহোরা, সহস্রবাহু, গঙ্গোলা, ধোবি-সরোবর এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য সরোবর ও দীর্ঘিকাদি বিদ্যমান আছে। উত্তর ভারতের কালঞ্জর ও অজয়গড়ের দুর্গও দুর্ভেদ্য বটে, কিন্তু তাহা বহুদিন বিপক্ষ পক্ষ কর্তৃক অবরোধিত হওয়ায় জলাভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু এই দুর্গে কখনও জলাভাব ঘটে নাই।

আমরা পূর্ব্বে যে সকল মন্দির ও প্রাসাদাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি সে সকল ছাড়া জয়ন্তিথোরা, তেলিরমন্দির, শ্যামমন্দির প্রভৃতি প্রধান। জয়ন্তিথোরার মন্দির ১২৩২ সালে আলতামাস কর্তৃক বিনষ্ট হয়। তেলিকামন্দির গোয়ালিয়রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহার সিংহদ্বারের উপরিভাগে গরুড়ের মূর্ত্তি আছে, পূর্ব্বে ইহা বিষ্ণুমন্দির ছিল; কিন্তু এখন উহা শৈব-মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে ধ্বংসস্তূপ বলিয়া উল্লেখ করিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাসবহুর মন্দিরটীকে কেহ কেহ শাশুড়ী ও বধূর অর্থে শাসবহু এইরূপ নাম হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহার নাম সহস্র বাহু, সে যাহা হউক যদিও এই অট্টালিকা দুইটী অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে, তথাপি ইহার গাত্রস্থিত অপূর্ব্ব শিল্প-চাতুর্য্যে বিস্ময়াভিভূত না হইয়া থাকা যায় না। ইহা ১০০ × ৬৩ ফুট বিস্তৃত ও ৭০ ফুট উচ্চ, কিন্তু পূর্ব্বে ১০০ ফুট উচ্চ ছিল। হিন্দু-গৌরব ধ্বংসকারী মুসলমানদের দ্বারা এই মন্দিরের উপরিভাগ চুণাবৃত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের অনুকম্পায় উভয় মন্দিরই মেরামত হইয়াছে। Keith সাহেব নামক একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির উপর এ সকল ভারার্পিত ছিল, তিনি মন্দির-দ্বারে যে প্রস্তর ফলক গ্রথিত করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ আছে :—

তেলিকামন্দির ও শাসবহু মন্দির।

This temple
Was cleaned and stripped
Of the Chuna,
With which the Mehamedans
Had defaced it
For centuries.

এই ফলকের পার্শ্বদেশেই আর একটী প্রস্তর ফলকে নানা কথা লিখিত আছে, কিন্তু সে ভাষা আমাদের অনধিগম্য বলিয়া পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইলাম না।

মান-মন্দিরের উত্তরাংশে অদ্যাপিও জীর্ণশীর্ণাবস্থায় বাদশাহদিগের প্রাসাদমালা সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভালরূপে দেখা অসাধ্য। দুর্গের উপর হইতে অদূরবর্ত্তী সৌধমালা বিভূষিত লস্কর নগরী বড়ই মনোরম দেখায়।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাসায় ফিরিয়া আসিবার পথে এস্থানের একমাত্র মুসলমান কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন এবং তাঁহার গুরু গায়স-উদ্দীন বা মহম্মদ ঘাউসের কবর ও তৎসংলগ্ন জামে মস্‌জিদ দেখিয়া আসিলাম, নানা দূর দেশ হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়কগণ তানসেন ও তাঁহার গুরুর সমাধি দেখিতে আগমন করিয়া থাকেন। সমাধি মন্দিরটী কারুকার্য্য সম্পন্ন, ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর মন্দিরের নীচে সঙ্গীতাচার্য্যের দেহ প্রোথিত রহিয়াছে। একদিন যার সুমধুর রাগিণী ঝঙ্কারে ভারতেশ্বর আকবর বাদশাহ মোহিত হইতেন, আজ সে কোথায়? কোথায় সেই সম্রাট্ আক্‌বর, আর কোথায়ই বা তাঁহার সঙ্গীতাচার্য্য? আজ রাজা—প্রজা উভয়েই মৃত্তিকালীন। এখানে একটি তেঁতুল গাছ আছে, সমাধিদ্বয় হইতেও ইহার আদরই বেশী।

তিন্তিড়ী বৃক্ষ।

জনসাধারণের মধ্যে একটী বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে এই তেঁতুল গাছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠস্বর সুমধুর হয় এবং সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যায়। হায়রে অন্ধ বিশ্বাস! এই নিমিত্ত অনেক গায়ক ও গায়িকা এই তেঁতুল গাছের পাতা খাইবার জন্য আসিয়া থাকে, আমরাও কয়েকটি পাতা চিবাইলাম ও মহম্মদ গায়েসের মন্দিরের কিছু ধূলি খাইলাম, কই সঙ্গীতজ্ঞ ত হইলাম না এবং স্বরও ত পরিবর্ত্তিত হইল না! পূর্ব্বে যে গাছটি ছিল তাহা এইরূপ উৎপাতে মরিয়া গিয়াছে, এ গাছটি নূতন গজাইয়াছে, যেরূপ পাতা খাওয়ার উৎপাৎ তাহাতে যে এগাছটিও জীবিত থাকে তাহার আশাও অতি অল্প।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে দুর্গের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ঢুণ্ডুপুর ফটকের উপরেই গোয়ালিয়রের কারাগার অবস্থিত, ইহা "নয়চোকী" বা নয় গুহা নামে পরিচিত। এই কারাগারেই প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতৃগণকে এবং কূটবুদ্ধি ঔরঙ্গজেব তাঁহার পুত্র মহম্মদ এবং দারা ও মোরাদের পুত্রদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কারাগারে আলোক ও বায়ু প্রবেশের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর।

আমাদের গন্তব্য পথের পার্শ্বে মহারাজা সিন্ধিয়ার Guest House দেখিতে পাইলাম, এই অট্টালিকাটি হিন্দু আদর্শানুযায়ী নির্ম্মিত এবং নানা সুন্দর সুন্দর সাজসজ্জায় সুসজ্জিত, ইহাতে রাজ-অতিথিগণ আসিয়া বাস করিয়া থাকেন।

লস্কর নগরের দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে ডফরিণ সরাই, ভিক্টোরিয়া কলেজ, জায়জিরাও মেমোরিয়াল হাঁসপাতাল, নূতন মন্দির এবং নূতন রাজপ্রাসাদ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই সহর মধ্যস্থ বণিকদিগের মহল্লার রাস্তা অতিশয় মনোহর। সুরভি কুসুমোদ্যান মধ্যে নূতন রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত, সাধারণের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই, দূর হইতেই দেখিয়া নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধন করিতে হয়।

নগরে লোক সংখ্যা (৮৮,০০০)। মতিমহল রাজপ্রাসাদটিও অতিশয় মনোহর। সন্ধ্যার একটু পরে সরাইয়ে ফিরিয়া বিশ্রাম লাভ করিলাম। রাত্রিতে আর ঢোলপুর যাওয়া উচিত বিবেচনা করিলাম না, কাজেই পরদিন প্রত্যূষে ঢোলপুর যাওয়ার মনস্থ করিয়া ষ্টেসনে আসিলাম। যদিও তখন পর্য্যন্ত বেলা অধিক হয় নাই, কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

ঝান্সী।

গোয়ালিয়র হইতে ঝান্সী আসিলাম। ঝান্সীতে পঁহুছিয়া তৃণ-গুল্মবিহীন উপলখণ্ডময় পর্ব্বতাদি দৃষ্টে মনে হইল, এই কি সেই ঝান্সী? একদিন যে দেশের বীর্য্যবতী রাজ্ঞী লক্ষ্মীবাই পৌরুষ-কণ্ঠে ব্রিটিশ সিংহকে বলিতে কুণ্ঠিতা হ'ন নাই যে, "মেরা ঝান্সী নেহি দেয়ঙ্গা" ইহাই কি সেই ঝান্সী নগরী? প্রকৃত পক্ষেই ঝান্সীতে পদার্পণ করিয়া হৃদয়ে যুগপৎ নানা ভাবের সঞ্চার হইল। ঝান্সী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীনে একটী জেলা ও বিভাগ। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে ঝান্সী এক বিখ্যাত স্থান অধিকার করিয়াছিল, সে কথা পরে বলিব। ঝান্সী ষ্টেসনটী অত্যন্ত বৃহৎ, এ স্থানে আগ্রা ও টুণ্ডলা, কাণপুর, এলাহাবাদ ও মাণিকপুর প্রভৃতি ভিন্ন স্থানের রেলওয়ে লাইনের সংযোগ আছে। এই নগরেই বিদ্রোহী সিপাহিগণ শেষবারের জন্য ইংরেজের গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ন্যায়ের নিকট অন্যায়ের কি কখনো জয় হয়? তাই পাশব-বলে উত্তেজিত নীচ প্রকৃতি সিপাহীদিগকে ইংরেজের হস্তে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। ঝান্সী নগরী ঝান্সী বিভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই জেলার চতুর্দ্দিকে অনুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী শোভমান,—এ সকল পাহাড়ের অধিত্যকা প্রদেশ তৃণাদির দ্বারা সুশোভিত এবং ইহাদের সানুদেশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। ঝান্সী জেলার উত্তরাংশের ভূ-ভাগ অধিকাংশ স্থলেই সমতল—এবং শস্যক্ষেত্রাদিতে পরিপূর্ণ। এজেলার ছোট ছোট পাহাড়ের উপর সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ অনেক বড় বড় সরোবর আছে, ইহাদের অনেকগুলি আবার তিন দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত এবং একদিক প্রস্তরাদি দ্বারা পাকা গাঁথনির সহায়তায় দৃঢ়বদ্ধ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্ণয় করিয়াছেন যে এ সকল সরোবরের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ৯০০ নয় শত বৎসর পূর্ব্বে মহোবার চন্দেল রাজগণের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঝান্সী নগরীর প্রায় দ্বাদশ মাইল পূর্ব্ব দিকে বারোয়া-সাগর নামক একটী সুবৃহৎ সরোবর ও উহার প্রায় আট মাইল পূর্ব্বদিকে

অর্জর সরোবর এবং অর্জর সরোবরের প্রায় আট মাইল পূর্ব্বে কাচ্‌নেয়া নামক একটী বৃহৎ সরোবর আছে—এই সমুদয় সরোবর গুলির চতুস্পার্শ্ব-বর্ত্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেরূপ মনোরম, তদ্রূপ ইহাদের নির্ম্মল ও সুশীতল বারিরাশি সুপেয় এবং স্বাস্থ্যপ্রদ।

ঝান্সীর চতুর্দ্দিকে পাহুক, বেতবা বা বেত্রবতী এবং ধসান নামক তিনটী নদী প্রবাহিতা আছে, সময়ে সময়ে এসকল নদীতে বন্যা আসিয়া বহু সমতল ভূ-ভাগ প্লাবিত করিয়া দেওয়ায় ঝান্সীর অন্যান্য স্থানের সহিত যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। বেত্রবতী নাম্নী স্রোতস্বিনীর তীর এবং ঝাঁ... অন্যান্য ভূ-বিভাগে গভর্মেণ্টের প্রায় ৭০০০০ হাজার বিঘা পরিমাণ জঙ্গল আছে, উহা হইতে গভর্মেণ্টের বহু পরিমাণ অর্থাগম হইয়া থাকে। এই সকল অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, তরক্ষু, হরিণ, বন্য কুক্কুরাদি বাস করে, কড়ি-কাঠ হইবার উপযোগী বৃক্ষ সকলও এ অরণ্যে বহু পরিমাণে আছে। ঝান্সীর অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, কেবল শতকরা চারি জন মুসলমান।

প্রাচীন ইতিহাস।

ঝান্সীর প্রাচীন ইতিহাস অবধান যোগ্য। সর্ব্ব প্রথমে কোন্ হিন্দু-জাতি এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে অনেকে এইরূপ অনুমান করেনযে পরিহার রাজপুতেরাই এখানে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন, তৎপূর্ব্বে ইহা আদিম অসভ্য জাতিদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও পরিহারগণ ঝান্সীর প্রায় চাব্বশটী গ্রাম দখল করিয়া আসিতেছেন।

চন্দেল বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব সময় হইতেই ঝান্সীর ইতিহাস অধিক-তর সুস্পষ্ট, এবং উর্চ্ছা রাজ্যের অধিনায়ক বীর সিংহের অধিনায়কত্বের পর হইতে ইহার ইতিহাস প্রকৃতরূপে সাধারণের গোচরীভূত। এই বীর সিংহ আকবরের রাজত্ব সময়ে যুবরাজ সেলিমের প্ররোচনায় সম্রাট্ আকবরের প্রিয়তম ও সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত মন্ত্রী বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আবুলফজলকে অন্যায় রূপে নিহত করিয়া সম্রাটের কোপানলে নিপতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে জাহাঁগীরের রাজ্য প্রাপ্তির পর হইতে পুনরায় স্বকীয় রাজ্য প্রাপ্ত হ'ন ও সম্রাট্ জাহাঁগীরের বিশেষ প্রিয় পাত্র হন। ইনিই খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর

প্রারম্ভে ঝান্সীর অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহাঁ সিংহাসনারোহণ করিলে বীরে সিংহ বিদ্রোহী হন—কিন্তু তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, সম্রাট্ সাজাহাঁ তাঁহাকে মার্জ্জনা করিলেও তিনি স্বীয় স্বাধীনতা আর ফিরিয়া পান নাই। পরিশেষে অরাজকতার সময় এই রাজ্য নানাপ্রকার অবস্থান্তরের পরে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও পেশোয়ার হাতে আইসে, তাঁহার সেনাপতি ঝান্সী নগর স্থাপন করিলেন, এবং উর্চ্ছা রাজ্যের লোক দ্বারা ইহা অধিবাসিত করিয়া একটী জন-কোলাহলপূর্ণ সুন্দর নগরে পরিণত করেন,—ইহাই ঝান্সী নগরের উৎপত্তির ইতিহাস।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার ভুক্ত হইবার পর হইতে ইহা প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার ভুক্ত ছিল।

ইহার পরে সুবাদারগণ এক প্রকার স্বাধীন ভাবে এই রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার রামচাঁদের মৃত্যু হইলে ইংরেজ গভর্মেণ্ট তাঁহার খুল্লতাত রঘুনাথ রাওকে রাজত্ব প্রদান করেন, ইনি অত্যন্ত বিলাসী ও অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন, স্বকীয় বিলাসিতা ও অমিতাচারিতা দোষে রঘুনাথ রাজ্যের অধিকাংশ গোয়ালিয়র এবং উর্চ্ছা রাজের নিকট বন্ধক দিয়া ফেলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বহু ঋণ রাখিয়া ইনি প্রাণত্যাগ করেন। রঘুনাথের কোনও প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকায় চারি ব্যক্তি রাজ্যের স্বত্ব দাবী করেন, ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট অবশেষে কমিশনারের সাহায্যে রঘুনাথ রাওয়ের ভ্রাতা গঙ্গাধর রাওকে রাজ্য প্রদান করেন। গঙ্গাধর নামে মাত্র রাজা হইলেন, কারণ বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেন্সী দ্বারাই সমুদয় রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত, রাজা কেবল নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতেন মাত্র,—ইংরাজের শাসন গুণে ঝান্সীর রাজস্ব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর রাওকে শাসনভার প্রদত্ত হয়, গঙ্গাধরও সুশাসন গুণে প্রজাদের প্রিয় হইয়াছিলেন এবং রাজস্ব ইত্যাদিও নিয়মিতরূপে আদায় করিতেন—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর হইতে ঝান্সী প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইল. ইহাতে তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের উপর অত্যন্ত বিরক্ত

হন, বিরক্ত হইবার আর একটী কারণ এই যে তাঁহাকে দত্তকগ্রহণ করিতে গভর্মেণ্ট অনুমতি দিলেন না। তিনি সন্ধির নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত ও দত্তকগ্রহণের বহু কারণাদি দেখাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় ইংরেজ গভর্মেণ্টের এইরূপ অবিচারে নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। বীর্য্যবতী রমণীর হৃদয়গত ব্যথা করুণক্রন্দনে পর্য্যবসিত না হইয়া দারুণ ক্রোধানলে পরিণত হইল, ইনি ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বীরদর্পে কহিলেন "মেরি ঝান্সী দেঙ্গে নেহি," বীরাঙ্গনার এরূপ দৃঢ়তায় ও বজ্র-গম্ভীর স্বরে ব্রিটিশ এজেণ্টও আশ্চর্য্য হইলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রবল-বহ্নি যখন ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যখন কাণপুর, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান সমূহের সঙ্গে সঙ্গে বুন্দেলখণ্ড ও তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল, সে সময়ে এই তেজস্বিনী রমণী, কামিনীর কমনীয় বেশ পরিহার পূর্ব্বক পুরুষ বেশে লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারার্থ বিদ্রোহী-গণের সহিত যোগ দিলেন—তাঁহার চিরসঙ্গিনী এক ভগিনীও তাঁহার সহায়-কারিণী হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ রণকৌশল প্রভাবে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পুরুষ-বেশে সজ্জিত, বর্ম্মাচ্ছাদিত সৌন্দর্য্য লীলাময়ী ললনার অপূর্ব্ব বীরত্ব—স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গ ভারতের চির গৌরবের, ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া যদিও আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে পারিতেছিনা—কিন্তু তাঁহার অসামান্য বীরত্বের মহিমা গানে আমরা বিমুখ হইতে পারি না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জুন গোয়ালিয়রের নিকট ইংরেজ সৈন্যের সহিত ইনি শেষ যুদ্ধ করেন, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তদ্রূপ জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ্মীবাই কখনও সৈন্যগণের পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন না, তিনি এবং তাঁহার ভগিনী সর্ব্বদাই সৈন্যদলের অগ্রভাগে থাকিয়া অশ্বারোহণে সৈন্য পরিচালনা করিতেন ও যুদ্ধ করিতেন। সার হিউ রোজ Sir Hugh Rose) এই সংগ্রামে লক্ষ্মীবাইয়ের অসাধারণ পরাক্রম দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন, যদি ও ইনি রমণী, তথাপি বিদ্রোহী সৈন্যগণের মধ্যে ইঁহারাই সাহস

রাজ্ঞী লক্ষ্মীবাই।

ও রণ-কৌশলতা অধিক।” গোয়ালিয়রের এই ঘোরতর যুদ্ধ শেষে যখন লক্ষ্মীবাই এবং তদীয় ভগিনী রণভূমি হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সে সময়ে বিপক্ষ তুরুক-সোয়ারের গুলির আঘাতে উভয়ের প্রাণবিয়োগ হয়। আপনার স্বাধীনতা রক্ষার্থ এই বীর রমণী যেরূপ বীরত্বের ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত থাকিবে। লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঝান্সীতে নানাবিধ বিপ্লববাদি উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে ইহা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদিগের অধিকারে আসিয়াছে।

দ্রষ্টব্য স্থানাদি।

ঝান্সীতে বর্ত্তমান সময়ে তেমন দর্শনীয় কিছুই নাই, বীরসিংহের দুর্গ এখনও অতীতের চিহ্ন স্বরূপ বিরাজমান আছে, ইহা গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, প্রবল শত্রুর পক্ষেও এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করা দুঃসাধ্য। দুর্গের চতুর্দ্দিকে ১২ ফুট গভীর ও ১৫ ফুট প্রশস্ত বিস্তৃত গড়খাই রহিয়াছে। ঝান্সীর মিলিটারি ষ্টেসনটি দেখিতে বেশ, তবে তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছুই দেখিলাম না। ইণ্ডিয়া মিডল্যাণ্ড রেলওয়ের একটী আফিস থাকায় ষ্টেসনটির গৌরব একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই আফিসে প্রতিদিন সহস্র লোক কার্য্য করিয়া থাকেন—আমরা ঝান্সী হইতে ভবতপুর গমন করিলাম।

ভরতপুর।

ভরতপুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা জয়পুর হইতে ১১৬ মাইল দূরে এবং আগ্রা হইতে মাত্র ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ভরতপুর সহর, ভরতপুর রাজ্যের রাজধানী। ভরতপুর রাজ্য রাজপুতানার মধ্যে বিরাজিত। ইহা জাঠবংশীয় মহারাজ সিন্ধিয়ার রাজধানী ও অন্যতম মিত্ররাজ্য। এখানে বর্ত্তমান সময়ে রাজপুতানা রাজ্যের পলিটিকেল এজেণ্ট গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধানাদি করিয়া থাকেন। আমরা আগ্রা হইতে ভরতপুর আসিয়াছিলাম পথের উভয় পার্শ্বে রাজপুতানার সেই উষর প্রান্তর—তৃণ-গুল্মাদি এবং বিটপী বর্জ্জিত শিলা সমাকীর্ণ—রুক্ষ গিরি, দুই একটী ক্ষীণকায়া গিরি-তরঙ্গিণী ও রাজপুতানার প্রখর সূর্য্যের প্রখর কিরণ ও উত্তপ্ত বালুকারাশির তীব্র আস্ফালন ব্যতীত তেমন মন ভুলানো বা প্রাণ জুড়ানো নৈসর্গিক শোভা সম্পন্ন দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। ভরতপুরের রাজা সূর্য্যমল্লের সহিত ইংরেজ রাজের তুমুল সংগ্রামের নিমিত্ত ইহা ইতিহাসের বক্ষে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। ভরতপুর রাজ্যের উত্তরে গুরগাঁও জেলা, পূর্ব্বে মথুরা ও আগ্রা জেলা, দক্ষিণ-পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় ঢোলপুর, কেরলী ও জয়পুর, এবং ইহার পশ্চিম সীমায় ঢোলপুর, কেরলী, জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৮ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৩১ ক্রোশ।

পুরাবৃত্ত।

ভরতপুর রাজ্য কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে ভরত রাজার নাম হইতেই ভরতপুর সহরের নাম হইয়াছে এবং এই ভরতপুর সহর হইতেই ভরতপুর রাজ্যের নাম হইয়াছে।* ভরতপুরের ভীষণ দুর্গ ভরতপুর নগর মধ্যে অবস্থিত। এই দুর্গ এবং তৎসংলগ্ন প্রাচীর ও পরিখাদি ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে জাঠ নরপতি মদনসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

* Hunter's Imperial Gazeteer of India Vol II, p. 376.

হইয়াছিল। ভরতপুরের রাজবংশ জাঠজাতীয়—এ স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীই জাঠ, জাঠ ব্যতীত এখানে মুসলমান, জৈন, প্রভৃতি আরও ভিন্ন ভিন্ন বহু জাতির বাস আছে। জাঠজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ সুন্দর সুন্দর কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী প্রচলিত। ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক-গণেরও বংশপরম্পরা বিশ্রুত কাহিনী গুলি বড়ই মনোরম। ইঁহারা কেহ কেহ বলেন মহাদেবের জটা হইতে জাঠদের জন্ম, তাই ইহারা জাঠ নামে খ্যাত, কেহ বলেন যদুবংশ হইতে ইহাদের উদ্ভব, যদু এবং যাদব শব্দের অপভ্রংশই জাঠ। আবার কাহারও মতে জাঠজাতি চন্দ্রবংশীয়। অধ্যাপক লাসেন প্রমুখ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মত এই যে, জাঠজাতি মহাভারতের লিখিত জার্ত্তিক জাতি। রাজপুত সমাজে ইহাদের যথোচিত সম্মান নাই—তাহারা ইহাদিগকে তাহাদেরি কোন নিম্ন শ্রেণীর রাজপুত শাখা হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন—আমাদের নিকট এ যুক্তিই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর পক্ষে ৩৬টী রাজপুত বংশের মধ্যে জাঠজাতিরও উল্লেখ আছে।

জাঠদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর প্রবাদ আছে। একদিন একটী গুর্জ্জর দেশবাসিনী রমণী মাথায় একটী জলপূর্ণ কলসী লইয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে একটা ছিন্ন-রজ্জু মহিষ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালাইতে-ছিল, সেই রমণীটী স্বীয় পদদ্বারা উক্ত মহিষের ভূ-লুণ্ঠিত দড়ি এমন জোরে চাপিয়া ধরিল যে মহিষ আর একপদও অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল না। অনতিদূর হইতে একজন রাজপুত নৃপতি স্ত্রীলোকটীর এইরূপ অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন। এই রাজপুত নৃপতির এবং গুর্জ্জরজাতীয়া রমণীর সংমিশ্রণে যে একটী নূতন জাতি গঠিত হইল তাহাই উত্তরকালে জাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। জাঠগণ তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই বিবরণই বলিয়া থাকে। জাঠেরা পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে বাস করে। ইহারা সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী নহে—ইহাদের মধ্যে শিখ, হিন্দু, মুসলমান সকলই আছে। উত্তর-পশ্চিম ও সিন্ধু দেশবাসী জাঠগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও ইহাদের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। এই শ্রেণীর

জাঠদের মধ্যে একটী বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে দেবী ভগবতী এক জাঠ কন্যারূপে ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসানুযায়ী তাহারা ভবানীর আরাধনা ব্যতীত অন্য কোনও দেবদেবীর আরাধনা করে না। ইহারা একেশ্বরবাদী, পৌরাণিক অতিরঞ্জিত গল্প-কাহিনী সমূহের প্রতি ইহাদের বিশ্বাস ও ভক্তি একরূপ নাই বলিলেও চলে। জাঠেরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, কোন কোন শ্রেণীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পরে তাহার পত্নীকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে—ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প, বোধ হয় সে নিমিত্তই এবম্বিধ প্রথা প্রচলিত। এইরূপ বিবাহকে "চাদর চলন" কহে।

ভরতপুরের জাঠেরা হিন্দু। এস্থানের জাঠবংশীয় রাজাদের ইতিবৃত্ত আমরা এখানে মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা হইতে সংকলন করিয়া দিলাম। এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষেরা পঞ্জাবে সিন্ধুনদের অপর তীরে বাস করিত। তাহারা বলশালী ও সাহসী, পূর্ব্বে ইহারা লুণ্ঠন ইত্যাদি কার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। পরে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্ব-প্রথমে মূলতানের দক্ষিণভাগে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকে। ১০২৬ খ্রীঃ অঃ মহম্মদ গজ্‌নী যখন গুজরাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন তিনি জাঠদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদ গজ্‌নীর সহিত সেই ক্ষুদ্র সংগ্রামে ইহাদের অধিকাংশই হত হয়। ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ যখন দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বহু নিহত করেন। ১৫২৫ খ্রীঃ অব্দে বাবর যখন পঞ্জাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন তখন জাঠগণ অতিশয় সাহস ও বিক্রমের সহিত তাহাকে আক্রমণ করে, সেই আক্রমণে বাবরকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এইরূপে ধীরে ধীরে জাঠগণ আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে জাতিয় ভাবও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটগণের কঠোর শাসনে জাঠগণ মাথা তুলিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেবের দেহাবসানের পর জাঠসর্দ্দার চূড়ামণ মোগল সম্রাট্ আলমগীরের দাক্ষিণাত্যগামী সেনাদলকে লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করে, সেই

অর্থের সাহায্যে ইহারা খুন্, সিন্‌সিনিবার ও ভরতপুরের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সদলে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল।

চূড়ামনের ভ্রাতা বদনসিংহ জাঠদলকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদের সাহায্যে 'ঠাকুর' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক দিগমগর নামক স্বতন্ত্র স্থানে রাজ্যপাট স্থাপন করেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহ ও কুতব-উল-মুল্ক সৈয়দ আবদুল খাঁর সহিত যুদ্ধে চূড়ামন পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার পুত্র বদনসিংহ ভরতপুর রাজ-সিংহাসনে সমাসীন হন। এই বদনসিংহের পুত্র সূর্য্যমল্লের রাজত্ব সময়ে ভরতপুর বীরত্ব প্রভাবে ভারতের ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জয়পুর রাজের সহায়তায় সূর্য্যমল্ল দিগরাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সূর্য্যমল্লের পৌত্র রণজিত সিংহের সহিত ইংরেজ রাজের যে রণাভিনয় হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে জাঠ বীরগণ যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তদ্রূপ বীরত্ব বর্ত্তমানযুগে আর কোথাও কেহ দেখাইতে পারেন নাই। রাজা রণজিত সিংহের সহিত ইংরেজ রাজ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, কারণ যখন ইংরেজ রাজ সিন্দে রাজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন, তখন রাজা রণজিত নিজ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা সেনাপতি লর্ড লেকের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইংরেজরাজও ভরতপুরের নৃপতির এইরূপ মহানুভবতা দর্শনে তাঁহাকে মিত্রতার বিনিময় স্বরূপ সাত লক্ষ টাকা রাজস্বের পাঁচখানি জেলা এক সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করেন। কিন্তু যখন হোলকারের সহিত যুদ্ধ বাধে, তখন ভরতপুরের রাজা ইংরেজের সহিত মিত্রতা ভুলিয়া যাইয়া হোলকারের সেনাদল যখন রণে ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, সে সময় দিগের দুর্গ হইতে ইংরেজ সেনাগণের উপরে গোলা বর্ষণ করেন, ইহাতে লর্ড লেক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দিগ অধিকার পূর্ব্বক ভরতপুর আসিয়া উক্ত নগর চারিবার বিষম বিক্রমের সহিত আক্রমণ করেন, কিন্তু বারবার চারিবারই পরাভূত হ'ন, কিছুতেই ইংরেজ সৈন্য নগর প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ হ'ন নাই। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি পলায়ন করিতে পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়াছিলেন।

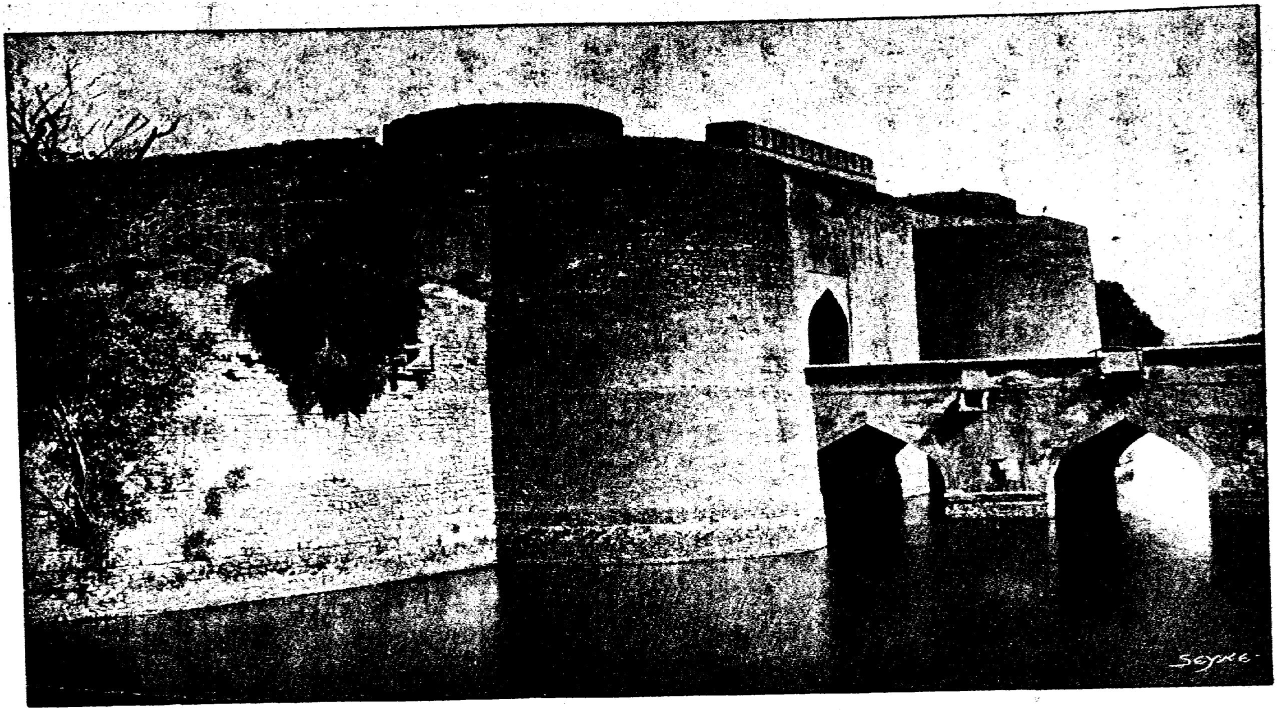
এদিকে রাজা রণজিত জয় লাভ করিয়াও শান্তিবোধ করিলেন না—তিনি শান্তির জন্য প্রস্তুত হইলেন, পরে ইংরেজরাজের সহিত ভরতপুর রাজের সন্ধি সংস্থাপিত হইল, রাজা রণজিত যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ইংরেজ রাজের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রণধীর ১৮ বৎসর এবং তৎপরে মধ্যম বলদেব সিংহ ১৮ মাস। বলদেবের দেহাবসানের পরে তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিংহ সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু রণজিতের পুত্র দুর্জ্জনশাল অন্যায় করিয়া ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুর দুর্গ অধিকার করিয়া বলবন্তকে কারারুদ্ধ করেন্। এই অন্যায় ব্যবহারের যথোচিত বিধান করিবার জন্য লর্ড কম্বারমিয়ার (Lord Combermere) পঁচিশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্যসহ ভরতপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনিও লর্ড লেকের মত ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ গোলা বর্ষণে ভেদ করিয়া জয়লাভ করা অসম্ভব বোধে দুর্গ-প্রাকারের তলদেশে সুড়ঙ্গ কাটাইয়া ১৮ই জানুয়ারী সেই রন্ধ্র-পথে ইংরেজ সৈন্য প্রবেশ করাইয়া দুর্গাধিকার করতঃ দুর্জ্জনশালকে বন্দী করেন। ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ খাত প্রস্তুত হইতে সময় লাগিয়াছিল। এই যুদ্ধই ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় ভরতপুরের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

ইংরাজরাজ বালক বলবন্তকে সিংহাসনে সমাসীন করিয়া তাঁহার মাতাকে রাজকার্য্যের পরিদর্শক রূপে নিযুক্ত করিয়া প্রস্থান করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বলবন্ত নিজ হস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বলবন্তের দেহাবসানের পরে তদীয় একবর্ষ বয়স্ক শিশু পুত্র যশোবন্তসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন, তাঁহার নাবালকাবস্থায় রাজকার্য্য সমূহ ইংরেজের রাজকীয় কর্ম্মচারী ও—সাতজন সামন্ত রাজ গঠিত এক সভা দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। ১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ যশোবন্ত উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। ভরতপুর রাজ ইংরেজ রাজের নিকট হইতে সম্মানসূচক ১৭টী তোপ প্রাপ্ত হন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কর্জ্জন সাহেব, রাজার কোনও অবাধ্যতায় বীতরাগ হইয়া যশোবন্তকে রাজাসন হইতে অপসারিত করিয়া তৎপুত্রকে

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই রাজার সেনা বিভাগে ৮৫০০ পদাতি, ১৪৬০ অশ্বারোহী ও ২৫০টী কামান আছে এবং ইহা ছাড়া প্রায় ৩৮৫০ জন প্রহরী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রহরা-কার্য্যে নিয়োজিত থাকে।

আমরা ভরতপুরে আসিয়াছিলাম—এখানকার প্রসিদ্ধ দুর্গটি দেখিবার জন্য। এই নগরটি দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। ভরতপুর রাজ্যের চতুর্দ্দিকে শৈলশ্রেণী শোভমান থাকিলেও নগরটি একটী সমতল ভূভাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

সহরের সমগ্র পরিধি চারিক্রোশ হইবে। সুন্দর ও সতেজ শ্যামল তরুশ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত হইয়া এই নগরটি সহজেই ভ্রমণকারীর চিত্ত আকর্ষণ কর। নগরের পশ্চিমদিকের ভূ-ভাগ নিম্ন, তৃণ-গুল্ম-বিহীন ছোট ছোট গিরিশ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত। দুর্গটি এমনি কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যে ইহা উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহার চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, ইহা চতুষ্কোণ ও সুদৃঢ়—গোময় মৃত্তিকা দ্বারা এই প্রাচীর গঠিত, প্রাচীরের পার্শ্বদেশে সবস্থানেই বৃহৎ গোময়-তৃণ-মৃত্তিকা লিপ্ত কাষ্ঠের বেষ্টন সমভাবে উত্থিত হইয়াছে এবং উহার সর্ব্বত্রই কামান রাখিবার উচ্চ মৃত্তিকার চত্বর—উহা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৪টী হইবে। এই নগরে বাহির কেল্লা ও মধ্য কেল্লা নামক দুইটী কেল্লা আছে—মধ্য কেল্লার মধ্যস্থলে মহারাজার প্রাসাদাদি বিরাজিত। মধ্য কেল্লায় প্রবেশ করিবার জন্য দুইটী ফটক আছে। মহারাজার প্রাসাদ ও বাগান দেশী ও বিলাতি উভয় ফ্যাসানেই সুসজ্জিত; দক্ষিণদিকে চৌবর্জ্জ ও উত্তরে আসল দুর্গ। ঠিক্ তাহারি সন্নিকটে বদনসাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুরাতন প্রাসাদ। এতদ্ব্যতীত, গঙ্গাকিমন্দির, বৃহৎ বাজার, নূতন মস্‌জিদ ও লক্ষ্মণজির মন্দির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এখানে উৎকৃষ্ট চামর প্রস্তুত হয়, ঐ চামর, চামরীর পুচ্ছে নির্ম্মিত না হইয়া, হস্তী-দন্ত বা চন্দন কাষ্ঠের ঝুরি দ্বারা প্রস্তুত হয়, বাৎসরিক মহামেলার সময় ঐ সকল দ্রব্যের প্রচুর আমদানী হইতে দেখা যায়। নগরের জনসংখ্যা (৬৬,০০০)। স্থানীয় অধিবাসিগণ অধিকাংশই কৃষ্ণ ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে বিহারী নামে পূজিত হন। সাধারণ লোকে এ স্থানকে বৃন্দাবনের ন্যায়



দুর্গ—ভরতপুর।

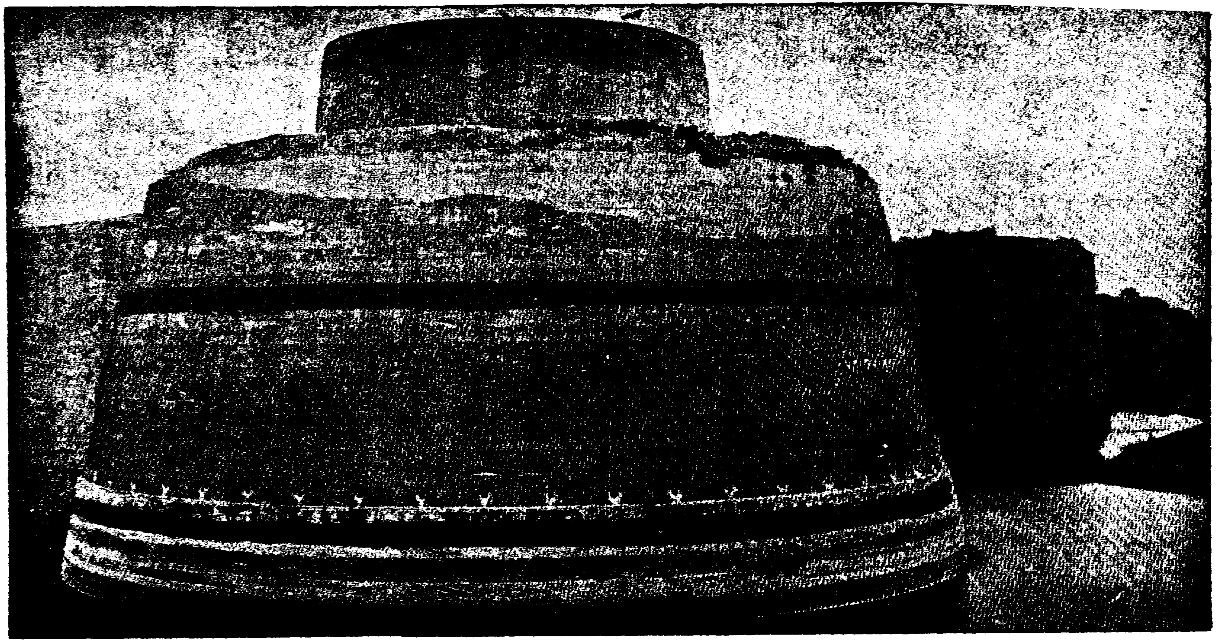
কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

ব্রজপুরী কহে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে এ স্থান ৫৭৭ ফিট উচ্চ। রাজপুতানার রাজকীয় রেলপথ বিস্তৃত থাকায় এখানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা। ভরত-পুরের পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা এবং শস্যশালিনী ;—সহরের কিঞ্চিৎ দূরে কমান নামক নগরের শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বিশেষ পবিত্র ও পূজনীয় বিগ্রহ বলিয়া স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের বিশ্বাস। কুম্ভার নামক নগরের নিকটেও বলদেব, রোহিণী, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির মূর্ত্তি বিরাজিত আছে।

ভরতপুরের প্রাচীন ইতিহাস এবং ব্রিটিশ রাজ-শক্তির সহিত ভীষণ যুদ্ধের জন্যই 'ভরতপুর' সহর পর্য্যাটকগণের দর্শন-স্পৃহা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বন্ধুর শৈলরাজি পরিবেষ্টিত সুশ্যামল তরুরাজি পরিশোভিত এই সুন্দর নগরীটি দেখিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। জাঠগণ যে বিশেষ বীরজাতি তাহা তাহাদের আচার, ব্যবহার ও রীতি নীতি ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়।

ডিগ।

আমরা ভরতপুর হইতে ডিগ যাই। ভরতপুর হইতে উহার দূরত্ব প্রায় বাইশ তেইশ মাইল হইবে। প্রকাণ্ড মাঠ,—মাঠের মধ্যে কাশ, খড়, প্রভৃতির বিরাট বিস্তার, মধ্য দিয়া পথ। এই প্রকাণ্ড মাঠটীকে ভরতপুর রাজের গোচারণ-মাঠ বলিলেই সঙ্গত হয়, কারণ এখানে রাজার যত গরু, মহিষ প্রভৃতি নিরাপদে চরিয়া বেড়ায়, মাঠের মাঝে মাঝে উহাদের থাকিবার জন্য আড্ডা ঘর আছে, সেখানে উহাদের সেবকগণ পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। হরিণের সংখ্যাও প্রচুর, আমাদের গাড়ীর পাশে পাশে অগণন হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছিল, রাজাজ্ঞায় এখানে কেহ কোনও পশু-শিকার করিতে পারে না, করিলে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হয়,—রাজাদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে ফাঁড়ী আছে, ফাঁড়ী হইতে প্রহরিগণ সমুদয় স্থানের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করে। আমরা প্রভাতে ভরত-পুর হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম, ডিগে পঁহুছিতে বেলা প্রায় ১১টা হইয়াছিল। ডিগ ভরতপুরের অন্তঃর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর—দেখিবার মধ্যে এখানকার দুর্গই প্রধান। আমরা নগরে পঁহুছিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়াই দুর্গ দেখিতে বাহির হইলাম। ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে এই দুর্গের খ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইত, অনেকেই ইহাকে অজেয় বলিয়া মানিতেন। নগরের চারিদিকে জলাভূমি, কাজেই বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই ইহা শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ডিগ নগর বহু প্রাচীন, কারণ পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থেও ইহার নামের উল্লেখ আছে। সর্ব্ব প্রথমে ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে নজাফ খাঁ এই নগর জাঠদিগের নিকট হইতে অধিকার করেন, কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় উহা জাঠদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরাজের সহিত হোলকারের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হোলকার পরাজিত হন, হোলকারের সৈন্যেরা পলায়ন করিতে থাকিলে, ইংরেজ সৈন্যগণ তাহাদের অনুসরণ করে, অনুসৃত হইয়া হোলকারের বহু সৈন্য ডিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জেনারেল ফ্রেজার (General



দুর্গ—ডিগ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

Fraser) পরিচালিত ইংরেজ সৈন্যগণ প্রায় মাসাধিক কাল দুর্গ অবরোধ করিয়া অবশেষে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে এখানকার দুর্গ ও নগর অধিকার করিতে সমর্থ হন। এখন আর ডিগের দুর্গের সেই পূর্ব্বগৌরব বৈভব কিছুই নাই।

দুর্গ দেখিয়া আমরা রাজ-প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম। রাজ-প্রাসাদটির নাম বনবন, ইহা সৌন্দর্য্যে ও শিল্প-নৈপুণ্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। রাজা সূর্য্যমল্ল কর্ত্তৃক এই রাজপ্রাসাদগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভরতপুর রাজ্যের বালুকা প্রস্তর দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। একটী সুন্দর বাগানের মধ্যে রাজপ্রাসাদটি অবস্থিত—বাগানটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪৭৫ × ৩৫০ ফিট। রাজা সূর্য্যমল্ল ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার কার্য্য আরম্ভ করেন কিন্তু ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নজাফ খাঁর সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় আরব্ধ কার্য্যের পূর্ণাঙ্গ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদাবলীতে এই সুবিশাল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত। উত্তরদিকে দরবার মহলটি অবস্থিত, ইহা ৭৬ ফিট ৮ ইঞ্চি × ৫৪ ফিট ৭ ইঞ্চি। এখানকার শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত হলটি বড়ই সুন্দর। গোপাল ভবন নামক রাজার বাস অট্টা-লিকাটিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ফার্গুসন সাহেব রাজপুতানার অন্যান্য রাজন্যবৃন্দের প্রাসাদাবলীর সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে "It wants, it is true, the massive character of the fortified palaces of other Rajput States, but for grandeur of conception and beauty of detail it surpasses them all". (Ferguson's Eastern and Indian Architecture, p. 482).

ডিগের রাজপ্রাসাদটী প্রকৃত পক্ষেই অতুলনীয়। সৌন্দর্য্য, স্থপতি নৈপুণ্যে কল্পনা বিচিত্রতায় ইহা অসাধারণ। মুসলমান স্থাপত্যানুকরণে ইহা নির্ম্মিত হইলেও একেবারে তাহার অনুকরণ বলা যায় না, কারণ ইহার অধিকাংশ অংশই স্বাধীন চিন্তা ও শিল্পীর অগাধ অধ্যবসায়ের ফল। ডিগ ছোট সহর, অধিকাংশ বাড়ী ঘরই প্রস্তর নির্ম্মিত, রাস্তাগুলি অধিক প্রশস্ত না হইলেও খুব সংকীর্ণ নহে। চারিদিকে জলাভূমি, বর্ষার প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সহরে ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার

অধিবাসিগণের মধ্যেও জাঠের সংখ্যাই খুব বেশী, তবে জৈন, মুসলমান ও অন্যান্য রাজপুত্র শ্রেণীর অধিবাসীও আছে। খাদ্য দ্রব্যাদি এখানে সুলভ, জল বায়ু উত্তম। মোটের উপর আমরা ডিগ নগরের প্রাচীন বিখ্যাত দুর্গ ও রাজপ্রাসাদাবলী দেখিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। ডিগের দুর্গ রাজা বদন সিংহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মথুরা।

ভরতপুর, ডিগ প্রভৃতি দর্শনান্তে আমরা আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তথায় একদিন বিশ্রাম করিয়া মথুরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। শৈশব হইতে যে মথুরার নাম শুনিয়া আসিতেছি—যাহার সহিত কোন্ সুদূর অতীতের অপূর্ব্ব প্রেম-লীলার মধুর কাহিনী সংশ্লিষ্ট—আজ সেই মথুরাপুরী দেখিতে পাইব বলিয়া হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। মথুরা অতি প্রাচীন নগরী, ইহা আগ্রা নগর হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে যমুনার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। এক সময়ে যে এ স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল তাহা রামায়ণ, পুরাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্র "ললিত বিস্তর" ইত্যাদি হইতে আভাস পাওয়া যায়। বাল্মীকির (রামায়ণে) ও মনুর গ্রন্থে এ স্থানের নাম 'শূরসেন' দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্যযুগ, জৈনযুগ ও বৌদ্ধযুগের উত্থান পতন দর্শন করিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানাপ্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ও পতনে এ স্থানে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ও বহু দেব-মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান রাজন্যবৃন্দের হস্তে মথুরার যে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে—সে কাহিনীর উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীন ইতিহাস।

৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ানচয়ঙ্ যখন মথুরা দর্শন করেন, তখন এ স্থানে হিন্দু-মন্দিরমাত্র পাঁচটী আর বৌদ্ধ মঠ প্রায় কুড়িটী ছিল এবং উহাতে প্রায় দুই সহস্র বৌদ্ধ যতি বাস করিতেন। সে সময়ে একজন বৌদ্ধ রাজা এ স্থানের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। সেকালের প্রাচীন ভগ্ন চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে।—দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দু প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সহিত ইহার পূর্ব্বগৌরব বিনষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যলোপের কিয়ৎকাল পরে হিন্দুধর্ম্মের ক্রমোন্নতির সহিত এই নগরীর সমৃদ্ধিও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন ইহা অতুলনীয় শোভা সম্পদে

ভারতের এক প্রধান নগররূপে পরিচিত হইয়াছিল এবং নানা দেশ দেশান্তরে ইহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন শত শত নয়ন-মন-মোহকর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত অভ্রভেদী দেবমন্দির সমূহের স্বর্ণচূড়া বৈদেশিক ভ্রমণকারীর নয়নে অমরার অনির্ব্বচনীয় বৈজয়ন্ত ধামের মধুর আলেখ্যের ছায়া-চিত্র বিকাশ করিয়া দিত। মথুরার ধনৈশ্বর্য্য ও চরম উন্নতিই ইহার বর্ত্তমান অবনতির প্রধান কারণ। জনশ্রুতি এই সুন্দরী নগরীর অতুল্য শোভা সম্পদ দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়া দিলে—বৈদেশিক নরপতিগণ ক্রমান্বয়ে ইহার লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সুলতান মামুদ, সেকেন্দার লোদী, ঔরংজেব, আমেদ সা দুরাণী প্রভৃতি কর্ত্তৃক ইহার অতুল বৈভবরাশি ও দেবমন্দিরাদির অনিষ্ট হইতে থাকে,—এবং পুনঃ পুনঃ লুন্ঠিত হইয়া ইহার পূর্ব্ব সম্পদ গরিমা পূর্ণমাত্রায় অন্তর্হিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-লাঞ্ছিত মথুরা নগরী চির সৌন্দর্য্যময়ী এবং চির মনো-মোহিনী। মানবের হস্ত দ্বারা ইহার বহু অনিষ্ট সাধিত হইলেও প্রকৃতি-সুন্দরীর স্নেহ হস্ত দ্বারা সুসজ্জিত নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সুষমায় ইহা চির সুষমাময় ও চিরশান্তিময়, কাহার সাধ্য সে শান্তির ও প্রীতির মধুর শোভাটুকু এখান হইতে হরণ করিয়া লইতে পারেন? পার্থিব ধন সম্পত্তি গিয়াছে বটে—কিন্তু যাহা চিরস্থায়ী তাহা ত কেহই হরণ করিতে পারে নাই? হায় মা ভারতভূমি, কেন তুমি জগতের কিরীট-মণি হইয়া সজ্জিত হইয়াছিলে? যদি তুমি কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয়বিধ শোভাসম্পদে অতুল্য না হইয়া চির তুষারাবৃত লাপল্যাণ্ড ভূমি কিংবা উত্তপ্ত বালুকাকীর্ণ সাহারা মরুভূমি হইতে তাহা হইলে কখনই তোমাকে চিরদাসত্বের কলঙ্ক বোঝা বহন করিতে হইত না। এক্ষণে মথুরা নগরীর চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক রাশি ও বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরস্তূপ দর্শন করিলে ইহার অতীত সমৃদ্ধি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়; কেহ কেহ এই সমুদয় স্তূপ গুলিকে স্বভাবজাত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ এ সমুদয় স্তূপ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এক সময়ে এ সকল বৌদ্ধ মঠ ছিল। শীতল-ঘাটের অদূরস্থিত স্তূপের উপর মথুরার প্রাচীন দুর্গ এবং কাট্‌রার মধ্যবর্ত্তী

আরেকটী স্তূপের উপর ঔরংজেবের মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কয়েক বৎসর হইল আনন্দ টিলা ও বিনায়ক টিলা নামক দুইটী বৃহৎ স্তূপ খনন করিয়া বহু প্রাচীন বৌদ্ধ-কীর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মথুরার চতুর্দ্দিকেই প্রাচীন বৌদ্ধ-কীর্ত্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বিদ্যমান। জামালপুর ও কঙ্কালী বা জৈনটিলা ও কাট্‌রা স্তূপ হইতে বহু বৌদ্ধ নিদর্শন ও শিলালিপি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, ইহা হইতেই ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়.। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ানচয়ঙ যে সমস্ত বৌদ্ধসঙ্ঘের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কানিংহাম, ফুরার, বার্গেস প্রভৃতির যত্নে সে সকল স্তূপ নিহিত শিলা ফলক্ হইতে যশোবিহার, উপগুপ্তবিহার, সঙ্ঘমিত্রসদ বিহার, হুবিস্ক বিহার ও কুণ্ডশুক বিহার ইত্যাদির নাম পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মথুরার যে স্থানে এখানকার সুবিখ্যাত কেশবদেবের মন্দির বিরাজিত ছিল এবং যাহা সম্রাট্ ঔরংজেব কর্ত্তৃক ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান সময়ে "কাট্‌রা" নামে সুপরিচিত। ঔরংজেব কেশবদেবের মন্দিরের উপর এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন অদ্যাপি সেই মস্‌জিদ গাত্রস্থ ১৭১৩ ও ১৭২০ সম্বতের নাগরী লিপি হইতে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়।

মথুরা যমুনার তটদেশে অনিন্দ্য শোভায় বিরাজিত। এই চির সমৃদ্ধি-শালিনী নগরী হিন্দুর পুণ্যতীর্থ ও চির মধুময় স্থান। ইহা ভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাণ প্রিয়তম পুণ্যভূমি, কারণ এই নগরের অনতিদূরে পোতরকুণ্ড বা কংসের কারা-গড়ে, বন-কুসুম-ভূষণ, গোপিনী-মন-মোহন, ভক্ত-বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনার তীরের প্রাচীন ঘাটগুলি কতদিনের পুরাণ-স্মৃতির মধুময় কাহিনী হৃদয়ে আনয়ন করিয়া চিত্ত তন্ময় করে! আমরা যখন মথুরায় পঁহুছিলাম—তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইবে, প্রখর আতপ তাপে চারিদিক প্রপীড়িত, আর নয়ন সমক্ষে অনন্ত বিস্তারিত নীলাকাশতলে নগরের সুদৃশ্য অট্টালিকা শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ষ্টেসনে বহু পাণ্ডা দাঁড়াইয়াছিল, ওখানে আমার পৈত্রিক নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডা সহকারে যমুনার তীরে একটী সুন্দর স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া

তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। তল্পী-তল্পা রাখিয়া বিশ্রাম ও স্নানাহার করিতেই বেলা প্রায় শেষ হইয়া গেল। মথুরার খাদ্য দ্রব্যাদি বড়ই রসনা তৃপ্তিকর। নানাবিধ মিষ্টি ও আটার লুচি, দুধ এবং মালাই এখানে যথেষ্ট পরিমাণ মিলে। সন্ধ্যার প্রাকালে নগর দেখিতে বাহির হইলাম, তখন সূর্য্যদেবের প্রদীপ্ত প্রখরতা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। প্রদোষের শীতল সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। শান্তিপূর্ণ চিত্তে নগরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। বহু জনাকীর্ণ নগরের রাজপথে বহু লোক বিচরণ করিতেছে। চারিদিকে একটা ধর্ম্মের ও পুণ্যের অপূর্ব্ব পবিত্রতা প্রতি দেবমন্দিরে বিরাজমান। 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী' রমণীবৃন্দ হসিত মুখে দ্রুত গমনে চলিয়াছে, কেহ বা পার্শ্বস্থ সঙ্গিনীর সহিত মধুর কণ্ঠে আলাপ করিতেছে, কোথাও বা ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইতেছে, তাহাদের সুগৌর তনু, যৌবনের দীপ্ত সৌন্দর্য্য, মন্থর গমনে ধীর মদালসতা—হাসিতে মনের আনন্দ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়া বহুদিনের সেই গোপ যুবকের মধুর বাৎসল্য ও প্রেম-কাহিনীর মধুর-চিত্র হৃদয়ে উদয় হইতেছিল।

মথুরার কেল্লা হইতে যমুনা-বাগ পর্য্যন্ত যমুনা বক্ষে সর্ব্ব সমেত প্রায় ২৪টী স্নানের ঘাট আছে,—এ সকল প্রত্যেকটিই কোন না কোন প্রাচীন ইতিহাসের সহিত বা পৌরাণিক তত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। আমরা এখানে প্রধান প্রধান কয়েকটি ঘাটের নামোল্লেখ করিলাম। উত্তরে গণেশঘাট, মানস ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, চক্রতীর্থ ঘাট, কৃষ্ণগঙ্গা ঘাট, কালিঞ্জরেশ্বর, মহাদেব মন্দির, সোমতীর্থ বা বাসুদেব ঘাট, ব্রহ্মালোক ঘাট, ঘণ্টাভরণ ঘাট, ধারাপতন ঘাট, সঙ্গমনতীর্থ ঘাট বা বৈকুণ্ঠ ঘাট, নবতীর্থ ঘাট ও অসিকুণ্ড ঘাট, আর দক্ষিণভাগে অবিমুক্ত ঘাট, বিশ্রান্তি ঘাট, প্রয়াগ ঘাট, কনখল ঘাট, তিন্দুক ঘাট, সূর্য্য ঘাট, চিন্তামণি ঘাট, ধ্রুব ঘাট, ঋষি ঘাট, মোক্ষ ঘাট, কোটি ঘাট ও বুদ্ধ ঘাট। কথিত আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিয়া বিশ্রান্তি ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এ স্থানে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে যমুনা গর্ভস্থ কচ্ছপ সমূহ আসিয়া তাহা ভক্ষণ করে। যমুনাতে কচ্ছপের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, ইহাদের বিরাট বপু দেখিলে ভয় করে, সুখের বিষয় এই যে যমুনা-নীরে স্নানের

সময়ে ইহারা স্নানার্থীগণকে কোনও রূপ উপদ্রব করে না। বিশ্রান্তি ঘাটের নিকটে একটী খাত আছে, তাহাকে কংসখাঁড়ি কহে, প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে, তাহার মৃতদেহ সৎকারার্থ এই পথে যমুনাতীরে আনীত হইয়াছিল। নীলসলিলা সুন্দর তটশালিনী যমুনার লহরী-লীলা মথুরায় উপভোগ্য বটে। সন্ধ্যার ধূসরছায়া চারিদিকে ব্যাপৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যমুনা-তীরে আমাদের বাসার সন্নিকটস্থ ঘাটে উপবেশন করিলাম। প্রদোষের শীতল সমীরণ যমুনার শীকর-সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শীতলতা ঢালিয়া দিতেছিল,—আকাশে অগণন তারকা-স্তবক বিকশিত হইয়া যমুনার নীলবক্ষে তাহাদের প্রতিবিম্ব দেখিতেছিল,—নগরের দেব-মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার মধুর নিনাদে হিন্দু ধর্ম্মের নিত্য-উৎসবময় ভাব ব্যক্ত করিতেছিল। যমুনা ক্ষীণকায়া, ইহার পূর্ব্ব বিস্তৃতি ও সৌন্দর্য্য এখন আর নাই। যমুনা-বক্ষ হইতে মথুরার সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। বুঝি এমন শান্তিময় ও প্রীতিপ্রদ নগর ভারতে আর অতি অল্পই আছে। একদিকে নগরের কল-কোলাহল, অপরদিকে শান্তির স্তব্ধ নীরবতার একত্র সমাবেশ ভারতের অতি অল্প নগরেই দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্যতীর্থ বারাণসীর গঙ্গা-তটশোভাও মনোমুগ্ধকর বটে এবং তাহার ঘাটগুলিও উচ্চ পাষাণ-নির্ম্মিত বটে, কিন্তু শৃঙ্খলা, মন্দিরাদির সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা, মথুরার ঘাটগুলির বাহার আরও বেশী। যমুনাবক্ষে প্রতি-ফলিত মন্দিরগুলির প্রতিবিম্ব যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বিস্ময়-পুলকিত-নেত্রে মথুরা-নগরীর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ৺কাশীধামের ঘাটের সহিত মথুরার ঘাটের তুলনা করিয়া ভোলানাথ চন্দ্র যথার্থই লিখিয়াছেন ;—"In Mathura the Ghuts are light and graceful; in Benares they are severe and simple" মথুরায় বহু ঘাট আছে—সে সকলের কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি—এ সমুদয়ের মধ্যে তীর্থযাত্রিগণের নিকট ধ্রুব ঘাট ও বিশ্রাম ঘাটই বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দুই ঘাটেই তাহারা স্নান ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদির কার্য্য করিয়া থাকেন। সেই নীরব সন্ধ্যায় যমুনার শীতল-শীকর-সিক্তসমীরণ সেবনে বিশ্রাম ঘাটের পাশে বসিয়া অতীত ভারতের

যমুনা ও ঘাটের কথা।

মধুময় স্বপ্ন কাহিনীর কথা মনে পড়িল,—সেই রাখাল বালকের পুণ্যময় মধুর কাহিনী, মনে পড়িল, যশোদার বাৎসল্য—মনে পড়িল,—এক ঘোর অন্ধকার নিশীথে ঝঞ্ঝার প্রবল পীড়নের মধ্য দিয়া রাজা কংসের ভয়ে পুত্র প্রাণরক্ষায় ভীত নবজাত শিশু কৃষ্ণসহ বসুদেবের সচকিত পলায়ন, —সেদিন ভীষণ নাদে জলদ-মালা গর্জ্জন করিতেছিল—প্রবল উচ্ছ্বাসে নৈশ-বায়ু ছুটিতেছিল, আর অবিশ্রান্ত ঝম্ ঝম্ রবে বিরহ-বিধুরা প্রকৃতি সতী অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছিল, আর যমুনা প্রবল তরঙ্গ-পীড়নে ভীষণা নিশীথিনীর ভীষণত্ব বৃদ্ধি করিয়া বেগে ছুটিতেছিল—যমুনার সেই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে পুত্র-প্রাণ বসুদেব যমুনা পার হইবার দুরাশায় উন্মত্ত ভাবে বিচরণ করিতেছিলেন এমন সময়ে একটী শৃগালকে যমুনা উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিলেন! সেই পুরাতন কাহিনী আজ নূতন ভাবে আমার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতেছিল। এই কি সেই যমুনা? এই কি সেই ভারতবর্ষ? এই কি সেই প্রাচীন সমৃদ্ধিশালিনী মথুরা-নগরী? আর আমরা কি সেই ভারতবাসী? যমুনা বক্ষে মৃদু সমীরণান্দোলিত বীচিমালার নর্ত্তন দর্শনে কবির কথা মনে পড়িল,—কবি যথার্থই গাহিয়াছেন:—

"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
সুন্দর তট শালিনী যমুনেও!
কত কত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষিও।
পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ-অঙ্গনও॥
যুগ যুগ বাহি প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনাও।
তব জল বুদ্বুদ সহ কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইলও।
কল কল ভাবে বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে পুরাতনও।

স্মরণে আসি মরম পরশে কথা
ভূত সে ভারত গাথাও ॥”

ক্রমে যখন রাত্রি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—জন-কোলাহল হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির মধুর ধ্বনি নীরব হইয়া গেল, তখন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় বিশ্রাম ঘাটের আরতি অতিশয় উপভোগ্য—সে সময়ে দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষ এ স্থানে সমবেত হইয়া আরতি দর্শন করে, তখন সেই অল্প পরিসর স্থানে এত লোকের সমাবেশ হয় যে, স্ত্রী-পুরুষের সেইরূপ ঠেশাঠেশিটা একটু অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ঘাটের মধ্যস্থলে একটী বিপুলকায় ঘণ্টা আছে—আরতির সময় উহার ঘন ঘন নিনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। বিশ্রাম ঘাটের সান্ধ্যশোভা যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনি জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বিস্তীর্ণ সোপানাবলীর ভিতর চত্বরের পর চত্বর এবং তাহার পার্শ্বস্থ দেবালয় গুলি বড়ই রমণীয়। বিশ্রাম ঘাটের মত রমণীয় স্থান মথুরায় অতি অল্পই আছে, এখানে উপবেশন করিলে, সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হয়। এ দৃশ্যের কথা কেমন করিয়া পাঠককে বুঝাইব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। উর্দ্ধে অগণ্য তারকামণ্ডিত অসীম নীলাকাশ, আর নিম্নে অগণ্য-প্রদীপ শিখামণ্ডিত যমুনা, তীরে সহস্র-সহস্র কণ্ঠ-বিনিস্মৃত উল্লাস জড়িত হরি-ধ্বনি! সমুদয়ই সুন্দর ও শান্তিময়। চারিদিকের শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে হৃদয়ের শোক-দুঃখ দূরে চলিয়া যায়, শত শোক-কাতর হৃদয়ও বুঝি এখানে শান্তিলাভ করিয়া থাকে। যিনি সংসারের শোক-যাতনায় জর্জ্জরিত হইয়া শান্তিহীন হইয়াছেন—একবার তিনি এই মধুময় স্থানে আসিয়া উপবেশন করুন, নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবেন। যমুনা-বক্ষে ব্রজবাসিনী রমণীগণের প্রদীপ ভাসান দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। একটী দুইটী করিয়া একে একে যখন অসংখ্য প্রদীপমালা মৃদুপবনান্দোলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা বিক্ষোভিত যমুনা বক্ষে দোলায়মান ভাবে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়—তখন তাহা দেখিতে বড়ই মনোমুগ্ধকর। যাহাদের প্রদীপগুলি না ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তাহারা বিশেষ আনন্দ সহকারে ঘরে

ফিরিয়া যাইতে লাগিল, আর যাহাদের প্রদীপ নিবিয়া ও ডুবিয়া যাইতেছিল, তাহারা ভবিষ্যতের একটা বিপদাশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়া পরস্পরে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল। এই বিশ্রাম ঘাটের সন্নিকটে যমুনার তীরে একটী মন্দির দেখিলাম, ইহার নাম সতীবুরুজ। কথিত আছে যে মহারাজ কংস কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাহার প্রিয়তমা মহিষী এই স্থানে বসিয়া পতির সহিত সহগমন করেন। তদবধি ইহার নাম সতীবুর্জ্জ হইয়াছে। কিন্তু সেই সতীকীর্ত্তির পরম মহিম মণ্ডিত পুণ্য স্থানের উপর এই উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভটি ইষ্টক নির্ম্মিত হইলেও গঠন কৌশল সম্পন্ন ও সুদর্শন। মথুরার অতি প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির সহিত সমকালে ইহা নির্ম্মিত নহে। প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ এই যে, ইহা অম্বরাধিপতি মানসিংহের পিতা ভগবান দাসকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী সুন্দর স্তম্ভ; তবে ইহা হইতে পারে যে, রাজা ভগবানদাস জনশ্রুতি-বিশ্রুত কংস-মহিষীর দেহত্যাগ-স্থলে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সতী বুর্জ্জ।

রাত্রিতে কোনও রূপে উৎসুক ভাবে নিদ্রায় কাটাইয়া পরদিন প্রত্যুষে পুনরায় নগর দেখিতে বাহির হইলাম। মথুরার রাজপথগুলি সুপ্রশস্ত ও জনাকীর্ণ। রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ অট্টালিকা শ্রেণী নীল আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান। শ্রেণীবদ্ধ পণ্যবীথিকাগুলি শোভা-সম্পদে অতুলনীয়। মথুরার রাজপথগুলিও ৺কাশীধামের পথের ন্যায় প্রস্তর নির্ম্মিত ও উঁচুনীচু। আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সর্ব্বপ্রথমে নগরের মধ্যস্থিত জামে মস্‌জিদটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহা সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে ১০৭১ হিজরায় হিন্দুকীর্ত্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষের উপরে আব্‌দুন্‌নবি খাঁ নামক জনৈক বিখ্যাত মুসলমান কাজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের একপ্রান্তে আর একটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা মনোহরপুরের সম্রাট্ মহম্মদ শাহার রাজত্ব কালে নির্ম্মিত হয়। জামে মস্‌জিদটির চারিটী মিনার বা স্তম্ভ দূর হইতেই হিন্দু নগরের মধ্যে ইহার বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিয়া দেয়। প্রত্যেক মিনারটি ১৩০ ফুট উচ্চ। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে

জামে মস্‌জিদ।

মথুরা নগরে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এই নগরের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অট্টালিকা-সমূহের মধ্যে যমুনাবাগের ছত্রি, যাদুঘর, মথুরার তোরণ-দ্বার, গির্জ্জা, হোলি-দরজা, তেগুাখেরায় রাধাকৃষ্ণের মন্দির, সাতঘরার বিজয়-গোবিন্দ মন্দির, কংসখেরার বলদেব মন্দির, লোহারের ভৈরবনাথের মন্দির, স্বামী ঘাটের মদনমোহন মন্দির, শেঠকুশালের গোবর্দ্ধন নাথ মন্দির, স্বামীঘাটের বিহারীজীর মন্দির, নিকার্চির গোবিন্দদেবের মন্দির, বলদেব মন্দির, সাতঘরার মোহনজী মন্দির, অসিকুণ্ডের মদনমোহন মন্দির, কংসখাড়ের গোবর্দ্ধননাথ মন্দির, দীর্ঘ বিষ্ণু মন্দির, জামে মস্‌জিদ, লছমিচাঁদের বাস ভবন প্রভৃতি অবশ্য দর্শনীয় এবং বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য।

আমরা প্রথমে কংসালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গমন করিলাম, আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর যে সমুদয় ভগ্নস্তূপ ইত্যাদি কংসালয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, উহা আমাদের নিকট বৌদ্ধ মঠ ইত্যাদির ভগ্ন স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই মনে হইল না। সরল বিশ্বাসী হিন্দু নরনারীগণ উহা নিজ নিজ ধর্ম্মান্ধতার সহিত কংসালয় বলিয়া মানিয়া লইলেও শিক্ষিত পর্য্যটকগণ তাহা কখনও মানিয়া লইতে পারিবেন না। নানা রাজ-পরিবর্ত্তন ও বিধর্ম্মীর অভ্যুদয়ে বিবিধ বিপ্লবের মধ্য দিয়া বৌদ্ধযুগেরও বহু প্রাচীন সেই পৌরাণিক কালের কীর্ত্তি-চিহ্নগুলি যে এখনও বিদ্যমান আছে, ইহা আমাদের বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হইল না। যে স্থানটিকে আমরা কৃষ্ণের জন্মভূমি বলিয়া দর্শন করিলাম, উহা যে একটী প্রাচীন-বৌদ্ধ-মঠের ধ্বংসাবশেষ হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে প্রাচীন মহাভারতীয় যুগের কোনও চিহ্নই যে এই সুপ্রাচীন নগরে বিরাজিত নাই, একথা বলিতে গেলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। নানা ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে—মন্দিরাদির বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইলেও প্রাচীন স্মৃতি চিহ্নটুকু একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কে বলিতে পারে, প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলিই পরিবর্ত্তিত হইয়া বৌদ্ধ স্তূপমঠাদিতে পরিণত হয় নাই। কংসালয় দর্শন করিয়া আমরা কাট্‌রার নিকটস্থ ভূতেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দির ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভগ্নাবশেষ সমূহ নিরীক্ষণ করিলাম। এই ভূতেশ্বর মন্দিরের বিশেষত্ব এই,

—ইহা মথুরার কি প্রাচীন বৌদ্ধ, কি আধুনিক মন্দিরাদির স্থাপত্যের সদৃশ নহে। মন্দিরের মধ্যভাগ অতি বিস্তৃত, সুপরিষ্কৃত। লিঙ্গটীর কুণ্ডটী অতি পরিষ্কার। ভূতেশ্বর লিঙ্গের লিঙ্গ ভাগ অতি দীর্ঘ যেন একটী ক্ষুদ্র স্তম্ভাকার। তাহার গাত্রে বিরাট গুম্ফ বিশিষ্ট ও ত্রিলোচন মুখে খোদিত আছে। এই কুণ্ড মধ্যেই আর এক ক্ষুদ্র লিঙ্গ আছে,—তিনি 'ব্রজেশ্বর' বা 'কৃষ্ণেশ্বর'—পাণ্ডারা বলেন শ্রীকৃষ্ণ নিত্য পূজার জন্য নিজ প্রাসাদে যে লিঙ্গ স্থাপন করেন, ইহা সেই মূর্ত্তি, অপরে বলেন, ইহা অনিরুদ্ধ পুত্র মহারাজ বজ্রের স্থাপিত লিঙ্গ। 'ভূতেশ্বর'ই এই তীর্থের অধিপতি, যদিও মথুরা বৈষ্ণব তীর্থ বৈষ্ণবধর্ম্মের এক প্রধান ক্ষেত্র তথাপি শ্রীকৃষ্ণ এখানকার ক্ষেত্রপতি নহেন। তীর্থযাত্রিগণকে স্থানকাল উল্লেখ সঙ্কল্প করিবার সময় জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে ভগবল্লীলাক্ষেত্রে মথুরামণ্ডলে ভুতেশ্বর সমীপে বিশ্রাম ঘাটের বলিতে হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে শৈব-বৈষ্ণবের আচার গত সম্প্রদায় গত দ্বন্দ্ব থাকিলেও উভয় দলের আচার্য্যেরা কেমন সুন্দরভাবে সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কাশীতে তীর্থকার্য্য করিবার সময়ও শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকাম হইয়া করিতে হয়। এইরূপ বৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিবের নামে সঙ্কল্প পড়িবার নিয়ম আছে। বৃন্দাবনের গোপেশ্বর মাহাত্ম্য মথুরার ভূতেশ্বর মাহাত্ম্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। উভয়েই ক্ষেত্রপতি বলিয়া বৈষ্ণবগণেরও বিশেষরূপে পূজ্য হইয়া আছেন। এমন কি চৌরাশী ক্রোশ গণনাও এই শিবস্থান হইতেই আরম্ভ করা হয়, এই ক্ষেত্রপতির নিকট সঙ্কল্প করিয়া ইহারই নিকট প্রতিজ্ঞা যাত্রা করিতে হয় এবং এইখানে আসিয়াই শেষ করিতে হয়। কাশীর কাল ভৈরবের ন্যায় এই ক্ষেত্রপতিই এখানকার তীর্থফল দাতা। যাঁহার মহিমার তীর্থ, তিনি উপাস্যমাত্র তীর্থ-ফলদাতা নহেন। ভুতেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বে বলভদ্রকুণ্ড নামক একটী পুণ্য-সলিলা পুষ্করিণী বিদ্যমান—এ স্থানের নিকট বহু প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি সমূহ বিরাজিত থাকিলেও চিরদিনই এখানে হিন্দুকীর্ত্তি বিঘোষিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় এ স্থানে একটী মেলা হয়, সে সময় বহু জন সমাগম হইয়া থাকে। বলভদ্রকুণ্ডের প্রায় একমাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চৌবাড়া বা চৌরাশি স্তূপ হইতে এক সময়ে একটী হস্তি দন্তের কারুকার্য্য

বিমণ্ডিত স্বর্ণ কৌটা পাওয়া গিয়াছিল। বোধ হয় মথুরারপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলে আরও বহু প্রতিমূর্ত্তি, ভগ্ন স্তম্ভ ইত্যাদি পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন অবশ্যাম্ভাবী। মথুরায় ইহা বেশ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়।

যে কেশবজীর মন্দির একদিন মথুরার গৌরব স্থল ছিল, আজ সেই কেশবজী একটী মাত্র সামান্য মন্দিরে নিতান্ত দীন-হীনের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। হায়রে! কাল বিপর্য্যয়! অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক উক্ত দেব-মন্দির ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে বর্ণিয়ার সাহেব, উহা দেখিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা এ স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহাতেই পাঠকবর্গ উহার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাইবেন। তিনি লিখিয়াছেন "The Pagoda of Muttra in one of the most sumptuous edifices of India, once a place of great resort for pilgrims, who now go there no more; the heathen having lost their devotion for the place since the Jumna has removed its bed to half a league away. For after bathing it takes them now too long to return to the temple, and they might encounter something which would render them impure upon the road.

"The building * * * * very elevated and magnificent, built of a red stone quarried near Agra, and used in most of the buildings of that city and of New Delhi.

The Pagoda, then, is seated on a great platform of actagonal shape with revetments of hewn stone surrounded with two bands of sculptured animals, chiefly apes, one being 2 feet above the ground, the other as high as the platform. Two stair cases of 15-16 steps each lead to the top, the steps only broad enough for one person to mount at a time. The Pagoda only fills half the platform, the rest being an open place in front. It is cruciform like other buildings of the sort, and in the middle is a great dome, with two smaller ones at the sides. From top to

bottom the exterior is covered with figures of rams, apes, and elephants hewn in the stone, interspersed with niches containing monsters, and windows reaching up to the springing of the domes with balconies to each capable of holding four persons covered by little vaults supported on columns."*

কিন্তু হায়! বর্ত্তমান মন্দিরের সহিত অতীতের সেই সুমহান দেব মন্দিরের তুলনা করিতে গেলে হৃদয়ে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকে। ধর্ম্মান্ধতায় লোককে যে কিরূপ উন্মত্ত করিয়া তোলে আওঙ্গজেবের হিন্দু-মন্দিরাদি ধ্বংসই তাহার উৎকৃষ্ট পরিচয়। ইহাকেই 'আঙ্গিকেশব' বলা হয়। ইহাদ্বারা জানা যায় যে মথুরা-মণ্ডলে 'কেশবজীর' ন্যায় প্রাচীন দেবমূর্ত্তি আর নাই।

কেশবজীর মন্দির হইতে কংসের বসতবাটী কিছুদূরে অবস্থিত, সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহুতর স্তূপরাশি ব্যতীত তেমন দ্রষ্টব্য আর কিছুই নাই। এ স্থানে একটী ক্ষুদ্র শিব মন্দিরে কংস-প্রভু শিব বিরাজিত আছেন, কথিত আছে যে মহারাজ কংস ইঁহাকে স্থাপিত করিয়া সর্ব্বদা ইঁহার পূজা করিতেন। ইহা বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ, চারি পাশে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ষাঁড় ও গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি স্থাপিত। (R. M. Ry.) রেল ষ্টেসনের নিকটে একটা স্থান 'রণভূমি' মামে পরিচিত। পাণ্ডা ঠাকুরের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে এই খানেই কৃষ্ণ কংসকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সে জন্য ইহার নাম রণভূমি হইয়াছে। আমরা এই মৃত্তিকা স্তূপের উপর আরোহণ করিয়া স্থানটির চতুর্দ্দিক অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিলাম, এখানে প্রাচীন চিহ্নের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কেবল এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে মৃত্তিকার উপরে কংসের নিধন দৃশ্যগঠিত রহিয়াছে।

সারাদিন জনাকীর্ণ নগরীর পথে পথে ঘুরিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শনান্তর বাসায় আসিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বিশ্রাম ঘাটের অনতিদূরস্থ শেঠের দেবালয়ের দ্বারকানাথের মন্দিরে সন্ধ্যারতি

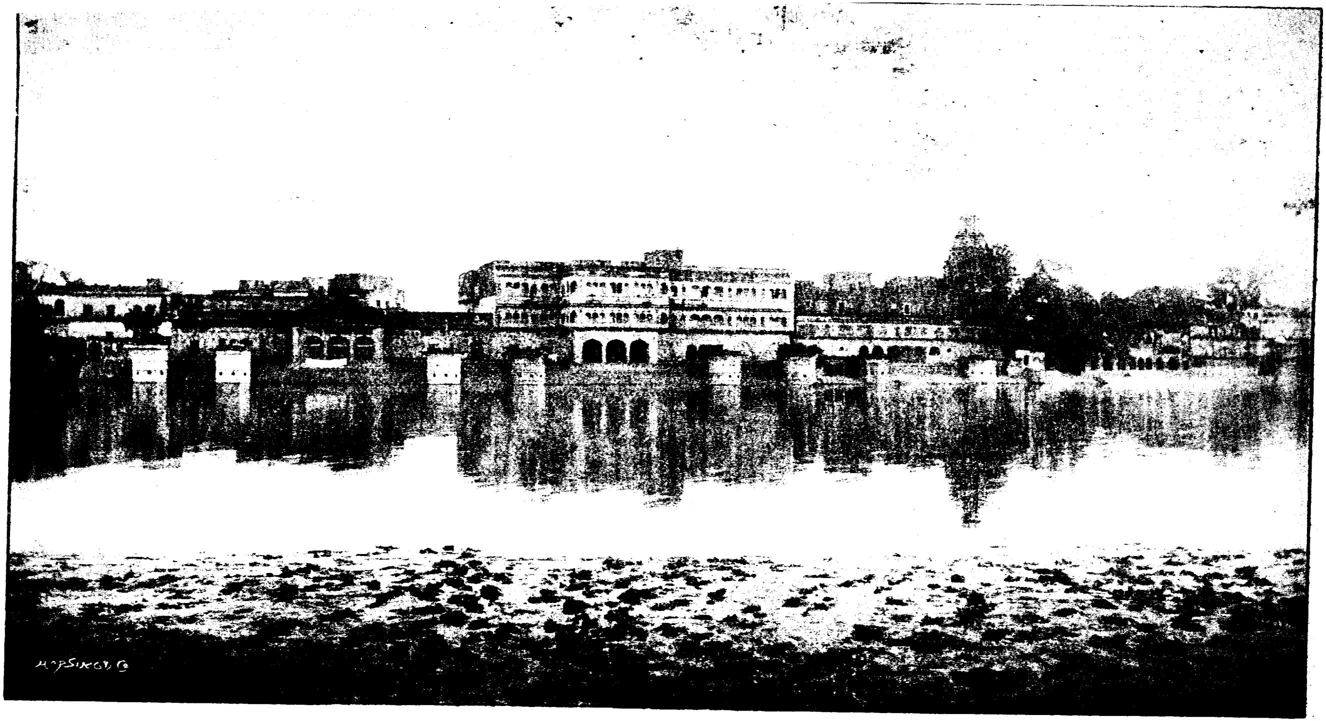
* Bernier's Travels in Hindusthan, (The Bangabashi adition.)

দেখিতে গমন করিলাম। বহু আড়ম্বরের সহিত এখানকার আরতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। মথুরা-নগরবাসী নরনারীগণ প্রায় প্রত্যহই এ স্থানে দেবদর্শনার্থ সমাগত হইয়া থাকেন। দ্বারকানাথের মন্দিরটি দেখিতে বেশ সুন্দর, বিশেষতঃ ইহার সম্মুখস্থ নাট মন্দিরটি বড়ই মনোহর। সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত পুষ্পাদি হস্তে ভুবনমোহিনী মথুরাবাসিনী রমণীগণ যখন একে একে মন্দিরে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের উজ্জ্বল রূপ-প্রভায় আমাদের চক্ষে মন্দিরের উজ্জ্বল আলোকাবলীও নিষ্প্রভ বোধ হইতেছিল! একদিন যে নবীন জলধর শ্যামসুন্দর এই নগরের একটী কুব্জা রমণীকে দেখিয়াও কেন মুগ্ধ হইয়াছিলেন আজ কত যুগ-যুগান্তর পরে এই নগর-বাসিনী সুন্দরীগণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহা অনুভব করিতে পারিলাম! সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ বঙ্কিম যথার্থই গাহিয়াছেন "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যাম বিলাসিনী রে।" আরতির মধুর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা ভক্তির অতুল্য আনন্দ-কোলাহল নৃত্য করিতেছিল, আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তবৃন্দের সেই আনন্দ উৎসব অবলোকন করিলাম ও একে একে মন্দির মধ্যস্থিত দ্বারকানাথ, মথুরানাথ, ব্রজনাথ, যমুনামাই ও বারান্দায় নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতির মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলাম। এই মন্দিরের বহির্ভাগেই শেঠদিগের বহুদূর বিস্তৃত একটী মনোরম অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটিও উল্লেখ যোগ্য বটে। ইঁহাদের যমুনাবাগ নামক একটী মনোরম প্রমোদ-কাননও আছে, উহা সহরের এক প্রান্তে যমুনার কূলে অবস্থিত।

মথুরায় যমুনার উত্তর সীমায় একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণে উহাকে "কংসকা কিল্লা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে জন-প্রবাদ এইরূপ যে সম্রাট্ আকবর শাহের বিখ্যাত সেনানী জয়পুর-রাজ মানসিংহ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কালবশে উহাই ধ্বংসে পরিণত হইয়া ঈদৃশ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহের বংশধর অম্বরেশ্বর সবাই জয়সিংহ যখন সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্কর্ত্তৃক এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, তখন তিনি এ স্থানে

স্বীয় অভ্যস্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনার নিমিত্ত একটী মান-মন্দির (observatory) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান সময়ে তাহার চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই। প্রাচীন কীর্ত্তি ও দেব মন্দিরসমূহ ব্যতীত বর্ত্তমান নূতন মিউজিয়ম, জেল, পাবলিক গার্ডেন প্রভৃতিও দর্শন যোগ্য। যমুনা নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়ায় বহু প্রাচীন তীর্থ ইত্যাদি যে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা নগরীর মোট লোকসংখ্যা ৬০,০০০, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৮,০০০, মুসলমান ১০,০০০, খ্রীষ্টান ২,০০০। আমরা মথুরা দর্শনান্তে বৃন্দাবনাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। মথুরা হইতে বৃন্দাবন কেবল ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে রেলে, গরুর গাড়ীতে, কি ঘোড়ার গাড়ীতে কিংবা একায় যাইতে পারা যায়। রেলের ভাড়া /০ এক আনা মাত্র।

অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ষ্টেসনে আসিলাম, ষ্টেসনটি নগরের এক প্রান্তে অবস্থিত। গাড়ী যখন মথুরা ষ্টেসন ছাড়িল, তখন শ্যামল বৃক্ষলতার মাথার উপর দিয়া দুই একটী মন্দির চূড়া ও শুভ্র অট্টালিকা উঁকি দিয়া দেখিতে দেখিতে আমাদের নেত্রপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।



বৃন্দাবন—যমুনার অপর তীর হইতে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বৃন্দাবন।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথ বড়ই মনোহর। আমাদের দক্ষিণ দিক দিয়া কবিতারূপিণী সুর-সুন্দরী যমুনা নদী ধীর-গমনে প্রবাহিতা, আর বাম পার্শ্বে শ্যামল প্রান্তর-মধ্যস্থ বনভূমির অপূর্ব্ব শোভা! এ শ্যামল শোভাময় স্বভাব-সুন্দর কাননগুলির মধ্যে অকুতোভয়, হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জিত শিখিকুলের রমণীয় পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়কে এক অপূর্ব্ব আনন্দে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছিল। একদিন যে বৃন্দাবনধামে আসিতে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইত, মৃত্যু স্থির নিশ্চয় মনে করিয়া গৃহ হইতে বিদায় লইতে হইত, সেই নানা বিপদ-সঙ্কুল—দস্যু তস্করের ভয়যুক্ত বৃন্দাবনের পথ এখন সহজ ও সুগম। সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তলীন শ্যামল বঙ্গ জননীর স্নেহের কোল হইতে আমরা কতদূরে চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কই আমাদের ত কোন বিষয়েই কোনরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই! কালের পরিবর্ত্তনে সকলি অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আজ আমরা বৃন্দাবনে। এই কি সেই মধু বৃন্দাবন? একদিন যাহার বনে বনে যশোদার নয়ন-মণি চঞ্চল রাখাল বালক খেলিয়া বেড়াইত? যাহার বাঁশীর উন্মাদ আহ্বানে যমুনা উজান বহিত ও গোপ-রমণীগণের হৃদয় মধ্যে প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া ব্যাকুলা করিয়া তুলিত! তেমনি করিয়া কলনাদিনী যমুনা বহিয়া চলিয়াছে, তেমনি আগের মত গোপ-যুবতী স্নান রত, তেমনি কানন, তেমনি সৌন্দর্য্য, তেমনি ময়ূর ময়ূরী কেকা রবে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু হায়! যশোদার নয়ন-মণি—রাধিকার হৃদয়-রত্ন—ভক্তের কল্পতরু—পাপীজনের একমাত্র গতি- -কোথায় সেই পীতাম্বর? কোথায় সেই বাঁশীর তানে আকুল করে প্রাণ! গোপ যুবতীরা গাগরী কক্ষে জল আনিতে যায়, কিন্তু কদম্বতলায় আর সেই বসন-চোরা দাঁড়াইয়া নাই—সব শূন্য—সব খালি!

পথের কথা।

বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া হৃদয়ে যে আনন্দের উদ্রেক হইল—তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। পলক মধ্যে সুদূর অতীতের নানা-কাহিনী

মধুর কল্পনালোকে হৃদয় মধ্যে ক্রীড়া করিয়া গেল। ষ্টেসনে পঁহুছিবা মাত্রই পাণ্ডা ঠাকুরেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং খাতা খুলিয়া তাহাদের মধ্যে আমাদের প্রতি কাহার দাবী তাহা প্রমাণ করিয়া লইলেন। শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা ও এ সকল খাতার নাম ধামগুলি ব্রজবাসিগণের নিকট অধিকতর সুপরিচিত। আমাদের নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডা ঠাকুরকে সহ ময়মনসিংহ গোলকপুরের অন্যতম প্রসিদ্ধ দানশীল জমিদার কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর পিতা শম্ভুচন্দ্র চৌধুরীর কুঞ্জ ঠিক্ করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তর দেব দর্শন ও নগর দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্র, যত কিছু তাঁহার লীলা খেলা তাহা এখানে হইয়াছিল বলিয়া ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট বিশেষরূপে আদরণীয় তীর্থ। বৃন্দাবনের একটী বিশেষত্ব এই যে এখানকার বাসাবাড়ী মাত্রই "কুঞ্জ" বলিয়া অভিহিত। কুঞ্জ অর্থে শ্যামল-বল্লরী শোভিত কোনও বিহার-কানন বলিয়া যাহা আমাদের বিশ্বাস, তাহা নহে। বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে চৌরাশী ক্রোশ পরিধির মধ্যে মথুরা, গোকুল, মহাবন, ডিগ, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, পুষ্করিণী, নন্দগাঁও, বর্ষান ও সাঙ্কেতিক পুষ্করিণী ব্রজপুরীর অন্তর্গত।

আমরা যখন রাস্তায় বহির্গত হইলাম, তখন বেলা প্রায় এক প্রহর হইবে, নির্ম্মল নীলাকাশে সূর্য্যদেব খরতর কিরণ বিকীরণ করিতেছেন। পথে এত অধিক বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম যে সময়ে সময়ে মনে হইতেছিল যে আমরা বুঝি মায়াবলে পুনরায় মুহূর্ত্ত মধ্যে বাঙ্‌লা দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। পশ্চিমের এই সুদূর প্রান্তে স্বদেশীয় নর নারীর আধিক্যে মনে বড়ই আনন্দ জন্মিয়াছিল। বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক বলিয়া এবং সর্ব্বদা তাহাদের সহিত মিলামিশা করিতে করিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। স্থানীয় নরনারীগণ ও তাহাদের স্বরচিত একপ্রকার অদ্ভুত বঙ্গভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। বৃন্দাবন তেমন বৃহৎ নগরী নহে, তবে ইহা সমৃদ্ধিশালী বটে। এখানকার দেব-মন্দির সমুহের মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, মদনমোহনের মন্দির, গোপেশ্বর মহাদেব ও রবখণ্ডি মহাদেব। এই পাঁচটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন, আধুনিক মন্দির সমুহের সংখ্যা অসংখ্য। হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষ ঔরংজেব গোবিন্দদেবের মন্দিরের

কতকাংশ ধ্বংস করেন, তাহা হইলেও ইহার কারুকার্য্য এবং গঠন এত সুন্দর যে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। গোপীনাথের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, আধুনিক মন্দির সমূহের মধ্যে শেঠ রাধাকৃষ্ণ, বঙ্কবিহারী ও রাধাবল্লভের মন্দির, গোবিন্দদাসের, ব্রহ্মচারীর (গোয়ালিয়রের) এবং লালা বাবুর মন্দির দেখিতে বেশ সুন্দর ও উল্লেখ যোগ্য। বৃন্দাবনের সমৃদ্ধি ভক্তি। ভারতের এমন প্রদেশ অতি অল্পই আছে যেখানকার কোন না কোন ধনী এ স্থানে কোনও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই। অধিকাংশ বঙ্গদেশবাসী বৈষ্ণবগণই জীবনের শেষ দশায় চির মধুময় বৃন্দাবনে বাস করিয়া দেহপাত করাকে চির আকাঙ্ক্ষিত বিবেচনা করেন বলিয়াই—বাঙ্গালী বৈষ্ণবের সংখ্যা এখানে খুব বেশী। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশবাসী ছিলেন বলিয়া বাঙলাদেশে বৈষ্ণবের সংখ্যা যত বেশী ভারতের অন্য কোথাও তদ্রূপ পরিলক্ষিত হয় না, আর বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের পদ-রজ-লাঞ্ছিত বৈষ্ণব তীর্থ, কাজেই বঙ্গবাসী বৈষ্ণবগণ ও বৃন্দাবনকে চির পুণ্যময় ভূমি জ্ঞানে এখানে আসা শ্রেষ্ঠতর মোক্ষপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিয়া এস্থানে আগমন করেন।

নগরের কথা।

বৃন্দাবনের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে, তাহার একটী এই যে পূর্ব্বকালে কেদার রাজের কমলার অংশরূপিনী বৃন্দা নামে এক কন্যা ছিল। ইনি অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণা ছিলেন, দুর্ব্বাসা মুণি ইঁহাকে হরিমন্ত্র প্রদান করিলে বৃন্দা গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া সেই হরিমন্ত্র সাধন করেন। বৃন্দার ঐকান্তিক ভক্তিপূর্ণ তপস্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া বর দিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিলে বৃন্দা শ্যামসুন্দরকে পতিরূপে প্রার্থনা করেন, কৃষ্ণও তথাস্তু বলিয়া বৃন্দার সহিত সেই নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করেন। বৃন্দা দেবী যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেস্থানই বৃন্দাবন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। অপর সিদ্ধান্তটি এই যে, পুরাকালে কুশধ্বজ নামক রাজার বেদবতী ও তুলসী নামে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণা দুই কন্যা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হন এবং নিজ নিজ পুণ্য প্রভাবে

প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

বেদবতী নারায়ণকে এবং তুলসী হরিকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করা সত্ত্বেও দুর্ব্বসার শাপে শঙ্খাসুরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন, কিন্তু পরে পুনরায় কমলাকান্তকে স্বামীরূপে লাভ করেন। এই পুণ্যবতী তুলসী হরির শাপে বৃক্ষরূপা এবং তুলসীর শাপে হরি শালগ্রাম শিলারূপে পরিণত হন। তুলসীর নামান্তর বৃন্দা, তিনি ঐ স্থানে তপস্যা করেন সেই জন্যই ইহার নাম বৃন্দাবন হইয়াছে। বৃন্দাবনের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অপর আরেকটী প্রবাদ এই যে শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা নাম ও একটী, তাহারই রম্য ক্রীড়া-কানন বলিয়াই ইহার নাম বৃন্দাবন হইয়াছে। পুরাণ-কারগণের মতে বৃন্দাবন অতি মনোহর স্থান। বৃন্দাবনকে আমরা মানস-নয়নে যে মনোহর রম্য কাননরূপে দর্শন করিয়াছিলাম, প্রত্যক্ষ দৃষ্টে তাহাতে নিরাশ হইতে হইল। "পদ্মপুরাণে" পড়িয়াছিলাম ঃ—

"প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাঁহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ।
ভদ্রশ্রী লৌহভাণ্ডীরমহাতালখদীরকাঃ॥
বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা।
দ্বাদশৈতা বনসংখ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে॥

(পদ্ম পুঃ পাতাল খণ্ড, ৩ অঃ।)

আজ কোথায় সেই ভদ্রবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, আর কোথায়ই বা খদীর, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু প্রভৃতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বাদশ বিহার কানন ভূমি? যে স্থানে একদিন নবীন জলধর শ্যাম নটবর লুকোচুরি খেলিতেন, আজ তাহা সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্যমালায় পরিশোভিত হইয়া মনোহর নগরে পরিণত হইয়াছে। যে কাননভূমি মুখরিত করিয়া একদিন বাঁশী বাজিয়া রাধিকার হৃদয়—আকুল করিয়া দিত, আজ সেখানে কবিত্ব বিহীন অতি কঠোর গভর্মেণ্টের আফিস ও কাছারী বসিয়াছে।

সময়ের এমনি পরিবর্ত্তন বটে। পুরাণবর্ণিত বৃন্দাবন এখন কোনও অদৃশ্য স্বপ্নরাজ্য বলিয়াই মনে হয়। এখন আর সেই

"বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচিত্র মৃগদ্বিজম্।
গায়ন্ময়ুর ভ্রমরং কূজৎ কোকিলশাবকম্॥"



শিশু-কৃষ্ণ—বৃন্দাবন।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কাহারও নয়ন পথে পতিত হয় না। জয়দেবের মধুর লেখনী নিঃসৃত সরল সুন্দর বসন্ত শোভা এখন আর বৃন্দাবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৌরাণিক বর্ণনা বৈভবের সহিত বর্ত্তমানে কোনও সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত না হইলেও— এখনও যে হিন্দু নরনারীর নিকট শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম পুণ্যময় মহাতীর্থরূপে পরিগণিত তাহার কোনও সন্দেহ নাই। প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানদের অত্যাচারে সত্য সত্যই বৃন্দাবনধাম অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, গজনীর সুলতান মামুদের নিদারুণ অত্যাচারে বৃন্দাবনের সমগ্র তীর্থই প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল, সে অত্যাচারের দিনে বৈষ্ণবগণ প্রাণভয়ে কেহই আর বৃন্দাবনধামে আসিতে চাহিতেন না। যে পুণ্যভূমি একদিন চির বসন্তের মধুময় হর্ম্যে শ্বেত সৈকত মধ্যবর্ত্তী যমুনার কল-সঙ্গীতে মধুকর নিকরের সুমধুর গুঞ্জনধ্বনিতে চির মধুময় ছিল, একদিন যাহার প্রতি কুঞ্জকুটীরে নন্দদুলালের মধুর মোহিনী সঙ্গীতে নরলোকে বৈকুণ্ঠধাম-রূপে পরিচিত ছিল, যাহার সহস্র সহস্র দেবালয় ভক্তবৃন্দের প্রেমাশ্রুতে প্রক্ষালিত হইত, সত্য সত্যই উহা সুলতান মামুদের পৈশাচিক উৎপীড়নে বন্যশ্বাপদের আবাসস্থল বিজন কাননে পরিণত হইয়াছিল। মুসলমান দাসরাজগণ যখন ভারত-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তখন দুই একজন ব্রজবাসী ভিন্ন কেহই এই নিভৃত স্থানে বাস করিতেন না, তখন দ্বাদশ যোজন ব্যাপী এই পুণ্যতীর্থ সত্য সত্যই ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। সে সময়ে পথের দুর্গমতা, মুসলমানের অত্যাচার ও দস্যুভয় ইত্যাদির নিমিত্ত গৃহী তীর্থ যাত্রিগণ কেহই এখানে আসিতেন না। দাসরাজগণের অধঃপতনের পরে ক্রমশঃ মোগল বংশের সাম্রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণের অত্যাচার ও অবিচার হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ধার্ম্মিক হিন্দুগণের চেষ্টা যত্নে বৃন্দাবনের উদ্ধার হয়। বৈষ্ণব কবি মুরারী গুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্যে ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে জ্ঞাত হইতে পারা যায় যে কিরূপে পুনরায় ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থান সমূহের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রথমে এই পুণ্যময় তীর্থে আগমন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলাস্থান বাহির করিতে না পারিয়া

কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, পরে স্বকীয় অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ও তাঁহার পার্ষদ শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর সহায়তায় উহা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব ও রূপসনাতনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কিরূপে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ স্থল সমূহ উদ্ধার পাইয়াছিল আমরা এস্থানে বৈষ্ণব কবিগণের মধুর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম।

"বৃন্দাবনে আচার্য্য শ্রীরূপ সনাতন।
প্রভু মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুইজন॥
লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে।
শ্রীরূপ গোসাঞিঁর এক চিন্তা হৈল চিতে॥
শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রকুমার।
সদা যোগ পীঠে স্থিতি শাস্ত্রে এ প্রকার॥
হেন শ্রীগোবিন্দদেবে না পাই দর্শন।
গ্রামে গ্রামে বনে বনে করএ ভ্রমণ॥
ব্রজবাসী ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি।
যমুনার তীরে রহে ধৈর্য্য পরিহরি॥
একদিন এক ব্রজবাসী অকস্মাৎ।
শ্রীরূপ গোস্বামী আগে হইল সাক্ষাৎ॥
পরম সুন্দর তেঁহ মধুর বচনে।
শ্রীরূপে কহত্র স্বামী দুঃখী দেখি কেনে॥
তাঁহার মধুর বাক্যে চিত্ত আকর্ষিল।
শ্রীরূপ গোস্বামী ক্রমে সব নিবারিল॥
ব্রজবাসী কহে চিন্তা না করিহ মনে।
গোমা টীলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে॥
তথা কোন গাভী শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন সময়।
দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস হৃদয়॥
শ্রীগোবিন্দদেব আছেন গোপনে।
এত কহি রূপে লৈয়া গেল সেইখানে॥

স্থান জানাইয়া তেঁহো অদর্শন হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িল ভূমিতে॥
কতক্ষণ পরে রূপ পাইলা চেতন।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী কোটি সমুদ্র গভীর।
প্রভু রহস্য জানি হইলেন স্থির॥
মনের উল্লাসে কহে ব্রজবাসিগণে।
শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এখানে॥
শুনি ব্রজবাসী প্রেমে বিহ্বল হইলা।
বালবৃদ্ধ আদি সবে গোমাটিলা আইলা॥
কেহো কার প্রতি কহে সহাস্য বদনে।
গোমাটিলা যোগপীঠ জানিনু এখনে॥
যত্নে যোগপীঠ ভূমি খননের কালে।
কৈল বলরাম আজ্ঞা দেখ মধ্যস্থলে॥
যোগপীঠ মধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
হইল সাক্ষাৎ কোটি কন্দর্প মোহন॥
শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে॥"

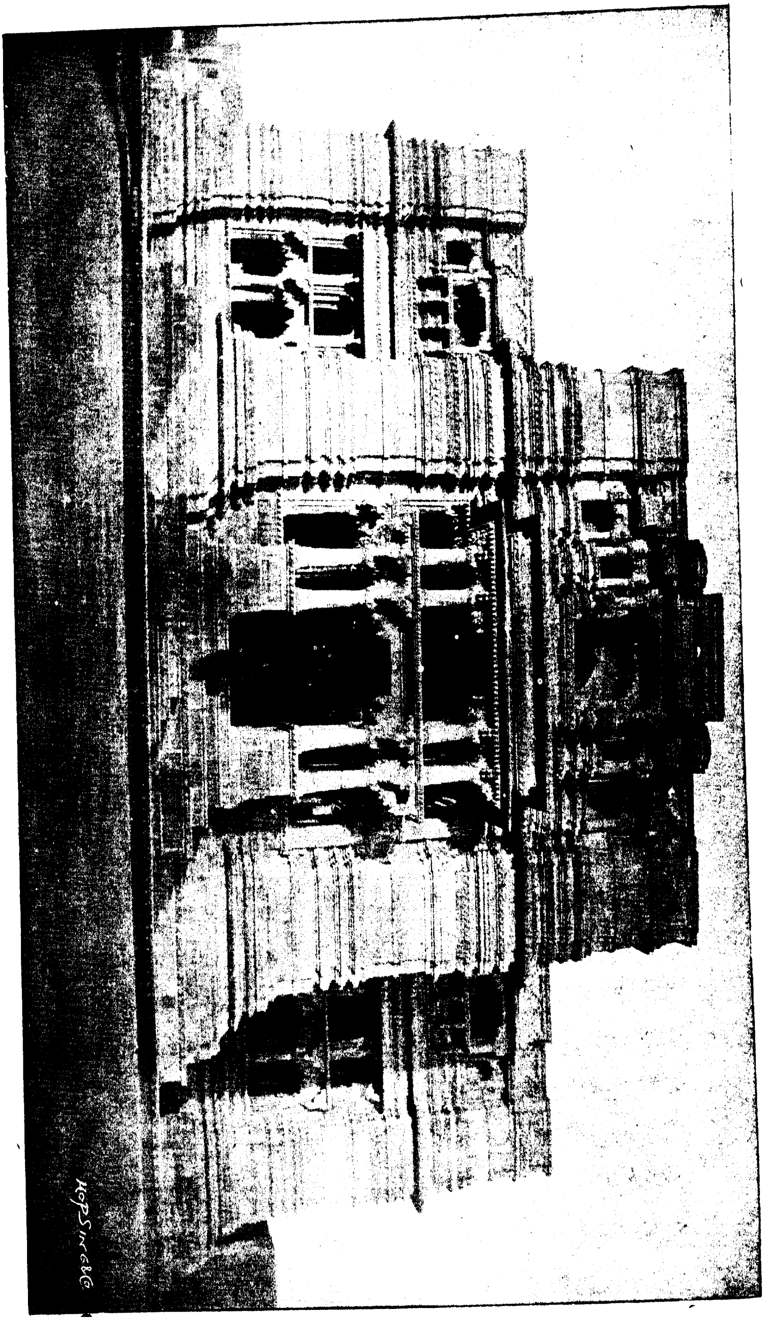
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়।

এইরূপে গোস্বামী প্রবর রূপ, সনাতনের চেষ্টায় বৃন্দাবনের অধিকাংশ তীর্থ সমূহই উদ্ধার হইয়াছিল। সে সময়ে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ, রঘুনাথ, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয় পণ্ডিতগণের অবস্থানে বৃন্দাবন বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। কথিত আছে যে সে সময়ে বৃন্দাবনধাম হইতে এ সকল পণ্ডিতগণের জ্ঞান-গৌরব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সামন্ত রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রূপ সনাতনের মুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের সারতত্ত্ব শুনিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যার ও এ স্থানের অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দর্শনে এতদূর

মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার সঙ্গীয় সামন্ত রাজগণের অনুরোধে এই পবিত্র ক্ষেত্রে দেবালয় ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এইরূপে ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য লীলা-কৌশলে পুনরায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য বিস্তার ও ক্রমশঃ অধিকাংশ লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের সহিত পূর্ব্ব গৌরব বৈভব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আমরা এখন আর পাঠকদিগকে প্রাচীন ইতিহাসের নিরস অংশ বিবৃতি দ্বারা অধিক পরিমাণে ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না। চলুন এখন আমরা গোবিন্দজীর মন্দির দেখিয়া আসি। আমরা বৃন্দাবনে সর্ব্বপ্রথমেই সুবিখ্যাত গোবিন্দজীর মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। এই সুবৃহৎ মন্দির রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, স্থাপত্য শিল্পে ও বৃহত্ত্বে ইহাই বৃন্দাবনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবমন্দির। গোবিন্দজীর মন্দিরস্থ একখানি অস্পষ্ট শিলাফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে আকবর শাহের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে শ্রীরূপ সনাতনের তত্ত্বাবধানে অম্বরাধিপতি মানসিংহ এই গোবিন্দজীর মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে গোবিন্দজীর মন্দির পঞ্চ চূড়ায় সুশোভিত ছিল—তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি বহুদূর হইতেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, কথিত আছে যে এক দিবস ঔরঙ্গজেব দিল্লীর রাজপ্রাসাদে বসিয়া উক্ত চূড়ার আলোক দেখিতে পাইয়া উজীরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে ইহা বৃন্দবনের হিন্দুদিগের দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া, দেবদ্বেষী ঔরঙ্গজেব অবিলম্বে সেই উচ্চ চূড়া ভঙ্গ করিয়া তদুপরি একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মন্দিরের পুরোহিত নিরুপায় দেখিয়া গোবিন্দজীকে লইয়া অম্বরে পলায়ন করিলেন, এদিকে মুসলমানেরা মন্দির চূড়া ভগ্ন করিয়া তাহারি মাল মসলাতে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিল, ঔরঙ্গজেবও একদিন আসিয়া উক্ত মস্‌জিদে নমাজ পড়িয়া গেলেন। এ ঘটনার পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত গোবিন্দদেব জয়পুরেই আছেন। জয়পুরের গোবিন্দদেবের সেবাইতগণই এখানকার গোবিন্দদেবের সম্পত্তির অধিকারী। গোবিন্দজীর এই প্রাচীন মন্দির সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেই একটী দর্শনীয় সামগ্রী, অপূর্ব্ব শিল্পালঙ্কৃত, প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্য বিদ্যার আশ্চর্য্য নিদর্শন, এরূপ বিশাল সৌধ আর্য্যাবর্ত্তে

গোবিন্দজীর মন্দির।



আর নাই। ঔরাঙ্গজেবের কঠোর আদেশে যদিও এই অভ্রস্পর্শী পাষাণ সৌধের উর্দ্ধভাগ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও যাহা আছে—তাহার অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্য দর্শন করিলেও বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়। প্রতি প্রস্তর গাত্রে কি নিপুণতা—কি গঠন শ্রেষ্ঠতা—তাহা না দেখিলে কেবল বলিয়া বুঝান যাইতে পারে না। এখনও এই ভগ্ন প্রস্তর স্তূপরাশি দর্শন করিবার নিমিত্ত শত শত বৈদেশিক প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণ আগমন করিয়া থাকেন এবং শতমুখে ইহার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষেই গোবিন্দজীর এই অপূর্ব্ব মন্দির "is the most impressive religious edifice that Hindu art has ever produced." এই দেবমন্দির সম্বত ১৬৪৭ অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভগ্ন মন্দিরের পশ্চাদভাগেই বর্ত্তমান গোবিন্দদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। আমরা অতি প্রত্যূষে গোবিন্দজী ও রাধারাণীকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম, তখন কেবল মাত্র প্রভাত তপনের কনক কিরণ রশ্মি মন্দির চূড়ায় শোভা পাইতেছিল, আর বিহঙ্গম কুলের সুমধুর স্বর-লহরীতে চারিদিক মুখরিত, সে মধুর ললিত তানে মধুর বৃন্দাবন জাগিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে লোকারণ্য, যাত্রিগণ কেহ কেহ 'জয় গোবিন্দজীকী জয়' রবে উচ্চনাদ করিতেছিল, কেহবা মধুর সংকীর্ত্তণে প্রেমময়ের প্রেম-কাহিনী গাহিতে ছিল, একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব সুমধুর কণ্ঠে অপেক্ষাকৃত একটু নির্জ্জনে বসিয়া গাহিতেছিল ঃ—

"অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন,
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন ॥"

আমার নিকট বৈষ্ণব কবির এই মধুর গীতখানি যেন মূর্ত্তিমতীরূপে আসিয়া হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল। আহা! কি সুন্দর সুমধুর সঙ্গীত উচ্ছ্বাস—ভক্তির ও প্রেমের কি অপূর্ব্ব বিকাশ! বুঝি এমন দীনভাব হৃদয়ে পোষণ না করিলে 'অখিলের নাথের' কৃপা পাওয়া যায় না। আমরা নব প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের দ্বার উম্মুক্ত হইলে জনতার মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া সেই

বিশ্বজনমনোমোহন গোবিন্দজীর ও রাধারাণীর যুগলমূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রীতি ও তৃপ্তির ভাব অনুভব করিলাম। শিল্পীর দৃষ্টিতে মূর্ত্তি-যুগলের সৌন্দর্য্য তাদৃশ মনোরঞ্জক না হইলেও ভক্তের নেত্রে তাহা পাপতাপহারী শ্রীমধুসূদনের সাক্ষাৎ সজীব মূর্ত্তি ও সেরূপের আর 'নাহি কোন তুল।' কি সুন্দর দৃশ্য! শত শত নরনারী দর্শন মাত্রেই ছিন্ন-কদলী বৃক্ষের মত মস্তক নত করিল। সেই বিশ্বপতির দর্শনে ভক্তি গদগদচিত্তে করযোড়ে করুণা ও ভক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিল। অনেকের মুখে পুণ্যের কনক কিরণ-ছটার উজ্জ্বল দীপ্তি, নয়নে অনুতাপাশ্রু ও আনন্দাশ্রু সম্মিলিত হইয়া গণ্ড বাহিয়া পতিত হইতেছে--সে যে কেমন এক শান্তি ও পবিত্রতার পুণ্যসম্মিলন তাহা হৃদয়ঙ্গম ব্যতীত লেখনীমুখে বিকাশ অসম্ভব। এখানে ছোট বড় ভেদ নাই—ধনী নির্ধন ভেদ নাই জাত্যাভিমান নাই—সকলি সমান। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট পার্থিব রাজা মহারাজার গর্ব্বোন্নত শির আপনা হইতেই ধূল্যাবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। এ জ্ঞানরাজ্যে—এ ভক্তিরাজ্যে—সব সমান। নিখিলব্রহ্মাণ্ডপতির গৌরবময় বিকাশের নিকট মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র সুখ শান্তি যে কত নগণ্য অন্ত তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম।

গোবিন্দজীর মন্দির দর্শনান্তে আমরা মদনমোহনের মন্দির দেখিতে অগ্রসর হইলাম। এই সুন্দর ও সুগঠিত দেব-মন্দির মূলতান নগরবাসী কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের উচ্চতা ২২ ফিট্। ইহার অন্তর্মধ্যভাগ দৈর্ঘ্যে ৫৭ ফিট, তৎসঙ্গে নাটমণ্ডপটি ২০ ফিট চৌড়া। এই মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ১০১০০৲ টাকা। ঔরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে মদনমোহনের শ্রীমূর্ত্তি জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়—তদবধি এই মন্দিরে এখন আর মদনমোহনের মূর্ত্তি নাই। জয়পুরের রাজা সে সময়ে মদনমোহন বিগ্রহকে আপনার শ্যালক কসৌলির রাজা গোপাল সিংহকে দান করেন, গোপাল সিংহ তাঁহার রাজধানীতে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মদনমোহনের এই প্রাচীন মন্দিরটী নদীকূলে উচ্চমৃত্তিকাস্তূপের উপর স্থাপিত, এখন ইহার আর সে প্রাচীন সৌন্দর্য্য নাই—তথাপি ইহার ভগ্ন ও শ্রীহীন সৌন্দর্য্যের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ-

মদনমোহনের মন্দির।

রূপে অধ্যয়ন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে একদিন স্থাপত্য শিল্পনৈপুণ্যে ইহা কত দূর গরীয়ান ছিল। গোবিন্দজী ও গোপীনাথজীর ন্যায় ইহারও প্রতিনিধি মূর্ত্তি নূতন বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মদনমোহনের মন্দির ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমার বসু নামক বড়ু-নিবাসী জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মদনমোহনের বাটীর অনতিদূরেই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমাধিমন্দির ও তাঁহার প্রধান শিষ্য সনাতন গোস্বামীর আশ্রম। ইহার কিছুদূরেই কালিয়দহ ঘাট ও গোপাল ঘাট দর্শন করিলাম। ঘাটগুলি পাষাণনির্ম্মিত, কিন্তু নদী ইহাদের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, কাজেই প্রাচীনকালের সেই লোচনানন্দদায়ক নীল যমুনালহরীর নীল সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান নাই। কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ এই 'কালিয়দহেই' কালিয় নামক সর্পরাজকে দমন করিয়াছিলেন। ঘাটের উপরে একটী ছোট মন্দির আছে, উহার মধ্যে সহস্রবদন কালিয় সর্পরাজের মাথার উপরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত। এই মন্দিরের নিকটে একটী প্রাচীন বৃক্ষ বিরাজিত,—পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন যে এই বৃক্ষের উপর হইতেই শ্রীকৃষ্ণ যমুনাগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। গোপালঘাটে নন্দ ও যশোদার বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণদেব কালিয়দমনার্থ যমুনাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িলে স্নেহময়ী যশোদাদেবী "হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ" রবে কৃষ্ণের জীবনভয়ে ভীত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "গোপাল ঘাট" হইয়াছে। কালিয়দহ ঘাট ও গোপাল ঘাট ইত্যাদি দর্শনান্তে নৃসিংহ ঘাট ও কেশী ঘাট ও বস্ত্রহরণ ঘাট দর্শন করিলাম। কেশী ঘাটের উপরে যুগলকিশোর দেবের মন্দির স্থাপিত। এই মন্দিরটী ১৬২১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে ইহা কচ্ছবাহ ঠাকুর রায় সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নোন্‌করণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটী এখন ভগ্ন জীর্ণ ও পরিত্যক্ত এবং কপোত ও চটককুলের অতি প্রিয়তম আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। ইহার গর্ভগৃহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নাটমণ্ডপের খিলানে এখনও সেকালের বহু স্থাপত্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ

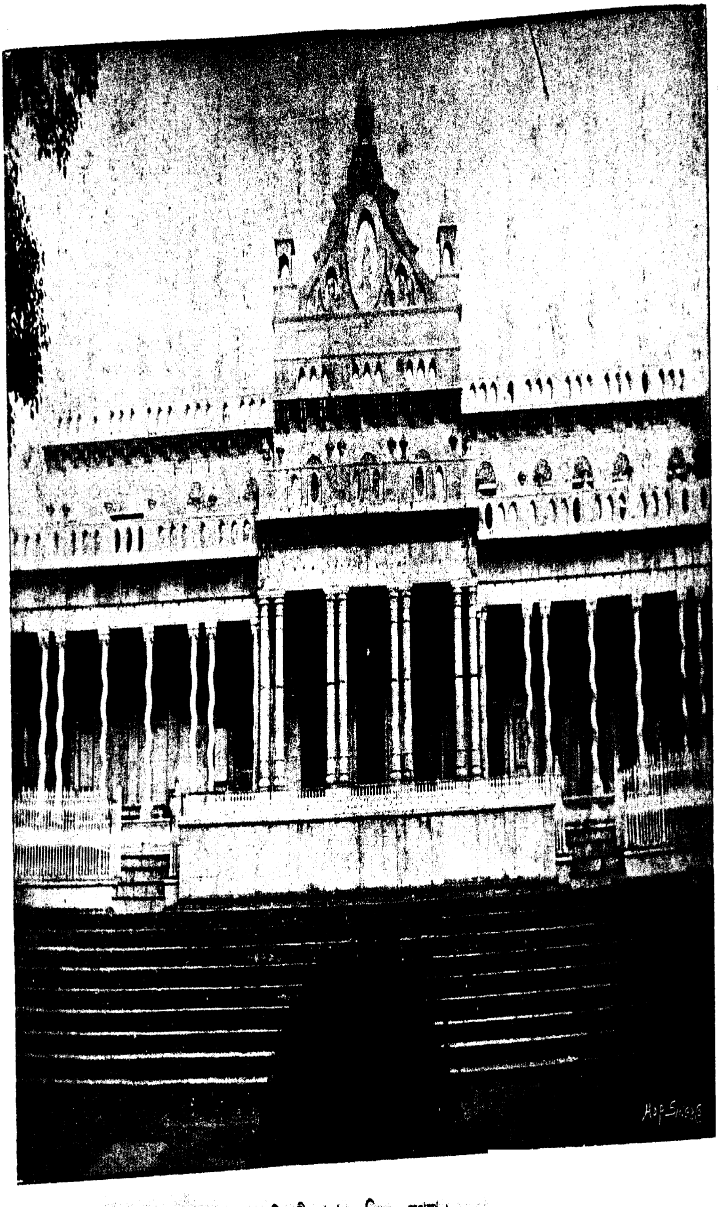
কালিয়দহ ঘাট।

যুগলকিশোরের মন্দির।

সকল খিলানের নীচে গোবর্দ্ধনলীলার চিত্রসমূহ প্রকটিত। তৎপরে আমরা গোপীনাথের মন্দির, রাধাবল্লভজীর মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন মন্দির দুইটী দর্শন করিয়া বেলা প্রায় এগারটা বারটার সময় বিহারী সাহার সুপ্রসিদ্ধ দেবমন্দির দর্শন করিলাম। বর্ত্তমানযুগে এমন নয়ন-মন-মুগ্ধকর সুন্দর দেবমন্দির বৃন্দাবনের আর কোথাও বিদ্যমান নাই, এখানে আসিয়া সত্য সত্যই হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি ও প্রীতির রসাস্বাদন করিয়া বিমুগ্ধ হইলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দিরটীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম—এই দেবমন্দিরটী আগাগোড়া শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত। সেই সকল সুদৃশ্য প্রস্তর-খণ্ডে নানারূপ মনোহর কার্য্য নির্ম্মেতার নির্ম্মল ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়েরই যেন স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের বারেন্দায় দরোজার সম্মুখে হরিভক্তগণের পদরজ প্রত্যাশায় বিহারী সাহার একটী প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে, ইহা বিনয়ের অন্যতম নিদর্শনও বটে। এই পুণ্যময় দেহচ্ছবির উপরে অনেককেই কিন্তু পদচালনা করিতে বিরত দেখিলাম। বারান্দার প্রস্তরস্তম্ভগুলি সাজসজ্জাহীন ও বাঁকা বাঁকা (স্ক্রুর মত) কিন্তু উহার স্বচ্ছ নির্ম্মল সৌন্দর্য্য প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুরাগী ব্যক্তির মনের সৌন্দর্য্য তৃপ্তি সাধনের সহায়তা করিয়া থাকে। এই অট্টালিকার সম্মুখভাগে একটী সুসজ্জিত ক্ষুদ্র বাগান, বাগান মধ্যে নানারূপ প্রস্তর খোদিত প্রতিমূর্ত্তি সমূহ বিরাজমান থাকিয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। বিহারী সাহার এই মন্দির দর্শনান্তে বাসায় ফিরিতে বেলা প্রায় ১॥টা হইয়া গিয়াছিল।

আহারাদির পর বিশ্রামান্তে পুনরায় নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইলাম। এবার প্রথমেই লালাবাবুর ব্রহ্মচারী এবং টিকারীর মহারাণীর সুন্দর দেব মন্দির দর্শন করিলাম। বৃন্দাবনে লালাবাবুর কীর্ত্তি সর্ব্বত্রই বিরাজিত। তাঁহার সদাব্রতে প্রত্যহ যে কত দীন দরিদ্র অন্ন পাইয়া হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। লালাবাবুর সদাব্রতে কোনও রূপ কঠোর ব্যবহার নাই—এবং হইতে পারে না। সদাব্রতের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ এখানে কয়েকজন ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী উচ্চ বেতনে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের সুনিয়মে এই



বিহারী সাহার মন্দির—মথুরা।

সদাব্রতে কোনও রূপ গোলযোগই হইতে পারে না। কোনও ধনী গৃহে বিবাহ ইত্যাদি উৎসব কার্য্যে যেরূপ ভোজের আয়োজন হয় এখানে প্রত্যহই তদ্রূপ আহার প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে যাহা খাইতে ইচ্ছা করে তাহা পরিতোষরূপে খাইতে দেওয়াই এই সদাব্রতের নিয়ম। লালাবাবুর ঠাকুর বাড়ী, ভিখারীগণের বাসস্থান প্রভৃতি প্রত্যেক যায়গাই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যে ঠাকুর বাড়ীর সদাব্রত আজ বৃন্দাবনে মহাত্মা লালা বাবুর অক্ষয় নাম প্রচার করিতেছে—যাঁহার দানশীলতা—যাঁহার আতিথেয়তা আজ ভারতবিখ্যাত—এখানে শুনিলাম যে সেই মহাত্মা নাকি নিজের আহার সংগ্রহার্থ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম পালনার্থ প্রত্যহ বৃন্দাবনের পথে পথে রুটি ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। লালা বাবুর বৈরাগ্য কাহিনী জানেন না এমন বাঙ্গালী অতি বিরল। এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে যে,—একদিন যখন তিনি কার্য্যস্থল হইতে পাল্কীতে চড়িয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন সহসা শুনিতে পাইলেন যে একটী রজকের গৃহে তাহার কন্যা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে "ওঠ বাবা বেলা গেলো," শুভক্ষণে লালা বাবুর কর্ণে এই শব্দ দু'টি প্রবেশ করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ বাহকগণকে পাল্কী নামাইতে আজ্ঞা করিলেন—এবং ভাবিলেন "হায়! হায়! সত্যইত বেলা গেলো"—সত্যই এজীবনের বেলা ফুরাইয়া আসিল, কই সংসারে কি কার্য্য করিলাম! সেদিন হইতেই তিনি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরলোকের হিতার্থে ও দীন দরিদ্রের মঙ্গলে নিজ অর্থ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহাপুরুষের এইরূপ হঠাৎ বৈরাগ্যের কাহিনী বঙ্গের গৃহে গৃহে নানা অলঙ্কারের সহিত প্রকটিত হইয়া আসিতেছে।

বৃন্দাবনের প্রায় সমুদয় দেব-মন্দির গুলিই সুন্দর ও মনোরম। ধনী-গণের ধনের সার্থকতা এখানে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। টিকারীর মহারাণীর মন্দির চূড়া সুবর্ণ নির্ম্মিত, কিন্তু তুলনায় ইহা শেঠের মন্দির হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। সে মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধেকই স্বর্ণ নির্ম্মিত—যখন প্রভাত রবির কনককিরণরাশি উহার উপর পতিত হয় তখন সেই দীপ্ত সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিতে পারা যায় না—সেই কনকোজ্জ্বল প্রভার জ্যোতিতে নয়ন ঝলসিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে শেঠের দেবমন্দির বৃন্দাবনে এক মহতী

কীর্ত্তি। মন্দিরে প্রবেশের সম্মুখস্থ বৃহৎ ফটক উত্তীর্ণ হইলেই প্রস্তর মণ্ডিত আঙ্গিনার পার্শ্বে প্রস্তর সোপানাবলি শোভিতা পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা বিরাজমানা। এই সুপ্রশস্ত আঙ্গিনার পরে একটু পর পর আরও দুইটী অত্যুচ্চ প্রাচীন সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে তবে দেবালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে পঁহুছিতে পারা যায়। এই সিংহদ্বার দুইটীর কারুকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ যোগ্য। এককালে যে ইহা অত্যন্ত সুন্দর ছিল—বর্ত্তমান কারুকার্য্যের চিহ্ন সমূহ হইতে তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। দেবালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে চির বিশ্রুত "সোনার তালগাছ" দর্শন করিলাম। শৈশবে ঠাকুরমা দিদিমার নিকট ও তীর্থ প্রত্যাগত প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট নানা সুমধুর শব্দবিন্যাসের সহিত যাহার মনোহর বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া হৃদয়ে একটা পরিপুষ্ট বৃক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম এখন নয়নসমক্ষে তাহা দেখিয়া শৈশবের সেই কল্পনাঙ্কিত চিত্র অন্তর্হৃত হইয়া গেল। ইহাকে বৃক্ষ নামে অভিহিত না করিয়া স্তম্ভ নামে উল্লেখ করিলেই ঠিক্ হইত। বৃক্ষের অবয়বের সহিত ইহার কোনও রূপ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত না হইলেও বহু অর্থ ব্যয় নির্ম্মিত এই স্বর্ণ স্তম্ভ উল্লেখ যোগ্য ও দর্শন যোগ্য বটে। কাষ্ঠ তদুপরি বস্ত্র ও তাহার পরে স্বর্ণ; (ধ্বজদণ্ড ইহার উপরে উঠিয়া নিশান দেওয়া হয়) অর্থশালী যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে এই ধ্বজা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। তাহা অর্থসাপেক্ষ। দেবালয় নির্ম্মাণেও বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই শ্বেত প্রস্তরের ছড়াছড়ি। এই সুবৃহৎ মন্দিরের দুই পার্শ্বের দুইটী সুদীর্ঘ কক্ষে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহ মূর্ত্তি, সুদর্শনচক্রের সাকাররূপ, শেঠের কুলগুরুর ও রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতির শিলাময় মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। শেঠজীর এই দেব নিকেতনের মধ্যেও যথারীতি দুই বেলা কাছারী হইয়া থাকে, কারণ এখানেও দেবালয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বহু ভৃত্য ও পরিচারক ব্রাহ্মণ আছেন। বৃন্দাবনের ন্যায় আর কোথাও তীর্থ যাত্রিগণের সুবিধা নাই, কারণ এখানে কোনও বিগ্রহ দেখিতেই কোনও রূপ অর্থ দর্শনী দিতে হয় না। এই সমুদয় বিগ্রহ স্বামীগণ দেব দেবীর সেবার নিমিত্ত ও দীন দরিদ্রকে দান ও ভোজনের জন্য প্রচুর অর্থ কিংবা কোন কোন স্থানে জমিদারীও লিখিয়া

দিয়া গিয়াছেন, কাজেই প্রত্যেক বিগ্রহেরই কোনও অর্থাভাব নাই। এ সমুদয় দান-কার্য্যে দাতৃগণ এমন সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, দাতৃগণের বংশধরগণও ইচ্ছা করিলে এ সকল দেবত্র ও ব্রহ্মত্রে কোনও রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না।

বনভ্রমণ ও দেবদর্শনই বৃন্দাবন-তীর্থের প্রধান কার্য্য। পরদিন প্রত্যুষে আমরা নিধুবন, নিকুঞ্জবন প্রভৃতি দর্শনের জন্য বাহির হইলাম। নিধুবন, নিকুঞ্জবন প্রভৃতি বন বৃন্দাবন-সহরের মধ্যে অবস্থিত। শ্যামল পত্র-পল্লব-পরিশোভিত, ময়ুর-কেকা-রব-মুখরিত, কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-পরিবৃত এই কি সেই শ্যাম-পিয়ারীর পরম প্রিয় মধুময় নিধুবন? এখানে দেখিবার কিছুই নাই। এখান হইতে আমরা নিকুঞ্জবন দেখিতে গমন করিলাম। নিকুঞ্জবনের নামে হৃদয়-মধ্যে যে মধুর রম্যকাননের চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলাম, দর্শনে তাহা হৃদয়ের অন্তর-প্রদেশে লজ্জায় মুখ লুকাইল। কোথায় বা সেই বিহগ-কলনাদিত, প্রফুল্ল-প্রসূন-সুষমা-সমুদ্ভাসিত, লতাবিটপীবিনির্ম্মিত, দেবতারও লোভনীয়, কুঞ্জশ্রেষ্ঠ নিকুঞ্জকানন, কোথায় বা সেই ভগবান ব্যাসবর্ণিত, চির-পবিত্রতাময় মনোহর রম্যকানন; কোথায় সেই কবি-কল্পনার শ্রেষ্ঠরত্ন, লবঙ্গলতা-পরিশীলন-মলয়-সমীর-প্রবাহিত, চির-হাস্যময়, প্রমোদময় নিকুঞ্জ-কানন আর কোথায় এখনকার এই—সৌন্দর্য্য-বিহীন শোভাহীন বিচিত্রতাহীন, ঝোপের মত কেবল টগর ও কাঠমল্লিকার ক্ষুদ্র কানন! যাহা আছে, তাহাতে দর্শন-যোগ্য কিছুই নাই, উহা কেবল পাণ্ডা-ঠাকুরদের নিরীহ যাত্রিগণকে প্রবঞ্চিত করিবার অন্যতম উপায়মাত্র। নিধুবন ও নিকুঞ্জবন প্রাচীর-বেষ্টিত ও পাণ্ডাগণের অর্থলাভের ব্যবসা-ক্ষেত্র। এই উভয় স্থানেই অসংখ্য বানর বাস করিয়া থাকে, ইহা-দিগকে কুঞ্জবনের প্রহরী-স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোনও রূপ খাদ্য দ্রব্যাদি এই হনুমানের বংশধরগণকে প্রদান না করিলে, তাহারা কিছুতেই দ্বার ছাড়িয়া দেয় না; কিন্তু খাদ্য-দ্রব্যাদি দেওয়ামাত্র তাহারা নিতান্ত নিরীহ ভদ্রলোকের মত দ্বার ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া যায়। নিধুবন ও নিকুঞ্জবনে বিশাখা-কুণ্ড ও ললিতা-কুণ্ড নামক দুইটী কুণ্ড বিদ্যমান আছে—দুই কুণ্ডই পাষাণ-সোপানযুক্ত ও নীল-সলিল-পূর্ণ। উভয় কুণ্ডেই প্রস্তর গ্রথিত সিংহাসন দেখিলাম, প্রতি রজনীতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ পুষ্পমালায়

ও দীপাধারে ইহা সুসজ্জিত করিয়া যান। পাণ্ডাদের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, নিশাশেষে যখন তাঁহারা উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা এই রচিত কুসুমাবলী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইয়া থাকেন। একথা যদি কেহ অবিশ্বাস করেন, তবে পাণ্ডাগণ সেই যাত্রীকে সন্ধ্যাকালে তালাবন্ধ করিয়া যাইতে অনুরোধ করে,—পাঁচ টাকা ব্যয় করিলেই যে কেহ এই রহস্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন! রাত্রি নয় ঘটিকার পরে আর কেহ এ কাননে প্রবেশ করিতে পারেন না। বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজিও শ্রীমতী রাধিকা ও গোপীগণের সহিত এস্থানে রজনী-বিহার করিয়া থাকেন। নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই যে একটী শ্যাম তমাল বৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত উল্লেখ-যোগ্য। এই গাছটির সহিত আমাদের দেশের তমাল বৃক্ষের পার্থক্য স্পষ্টতঃ অনুভূত হইল। গাছটি খুব বড় না হইলেও ইহার পত্রগুচ্ছের শ্যামল শোভা মনোহর বটে, দেখিলেই এই গাছটিকে প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়। ইহার প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে নবনী ভক্ষণ করিয়া ইহার অঙ্গে হাত মুছিয়াছিলেন, তদবধি ইহার প্রত্যেক গাঁইটে গাঁইটে এক একটী করিয়া শালগ্রামশিলার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষেও ইহার শাখা-প্রশাখার সন্ধিস্থলে চক্‌চকে কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ শালগ্রামের ন্যায় শিলাকার পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষ কৌতূহলের সহিত উহা উত্তমরূপে পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, উহা কৃত্রিম প্রস্তর-খণ্ড নহে, সত্য সত্যই বৃক্ষের অংশ বিশেষ ঐরূপ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 'Trvel's of a Hindoo'—ইতি শীর্ষক গ্রন্থ-প্রণেতা সুবিখ্যাত ভোলানাথ চন্দ্র এই বৃক্ষটির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন * * There stands in it a single tree, remarkable for its bark being knotted like the sila, and reverenced as the identical tree on which Krishna used to hang his lute. Nearly all the branches have droppted off, the trunk has got shrink and lean, and, bent down by age, is almost prolate with the ground. To all appearance, the tree induces a belief of great antiquity. যদিও সেই ভ্রমর-নিকর-গুঞ্জিত, পিককুল-কূজিত নিকুঞ্জ কানন ও

কাব্যরসের অক্ষয় উৎস শ্যামল যমুনা-পুলিনের অতীত-সৌন্দর্য্য কালের ভীষণ প্রহারে লোপ পাইয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন বুকে করিয়া একদিন গৌরবান্বিত হইয়াছিল বলিয়া অদ্যাপি লোকের মুখে-মুখে, কবিতার মধুর ছন্দে, সঙ্গীতের সুমধুর তানে, চির-জাগরূক ও চির-মহিমাময় হইয়া রহিয়াছে। যদিও কিছুই নাই, তথাপি ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রাচীন স্মৃতির মধুময় মোহন-স্পর্শে হৃদয়-মধ্যে সেই পীতবসন মুরলীধারীর প্রিয়ভূমি দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়েন এবং এখানে আসিয়া এই ভগ্ন উদ্যান দর্শনে হৃদয়ে শান্তি ও অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করেন। নিকুঞ্জবন-সম্বন্ধে ও নিধুবন-সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

নিধুবনে ও নিকুঞ্জবনের বর্ত্তমান শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া আমি নয়ন-জল সংবরণ করিতে পারি নাই। একদিন না—এ সকল কুঞ্জবনে ব্যাকুলা রাধিকা সতী প্রিয়তমের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন! আষাঢ়ের নবনীল-নীরদাবৃত অন্ধকার-নিশীথে ব্যথিত-হৃদয়ে বলিতেন,

“এ ঘোর রজনী, মেঘ গরজনী
কেমনে আওব পিয়া!
শেজ বিছাইয়া, রহিনু বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া॥
সই কি করব কহ মোরে।”

হায়! এখনও সান্ধ্য গগন তেমনি নীল মেঘে ছাইয়া ফেলে—তেমনি ঘোরা রজনী আসে, কিন্তু কেহত তেমন করিয়া শেজ বিছাইয়া শ্যাম-দর্শন-লালসায় বসিয়া থাকে না! “এখনও সে মোহন যমুনার কূল,
আর সে কেলি-কদম্বের মূল,
আর সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আর সে মধুর শারদ-যামিনী!
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রব,
পিক কুহু কুহু করত রাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিনী মধুর বোলনি
বিবিধ রাগ গায়নী॥

সকলই আছে কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণও নাই, সে শ্রীমতী রাধাও নাই। এখন 'নূপুর-রব বিনীরব' ও বংশীধ্বনি চির-স্তব্ধ।

রঙ্গজীর মন্দির।

বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ ধনকুবের শেঠ লছ্‌মীচাঁদের বিশাল কীর্ত্তি শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরকেই পূর্ব্বে আমরা 'শেঠের মন্দির' নামে বর্ণনা করিয়াছি। এই মন্দির উত্তর-ভারতে নির্ম্মিত হইলেও দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য-রীতিতেই নির্ম্মিত। এই মন্দিরদ্বার দেখিলে মনে হয় যেন বোম্বাই বা মান্দ্রাজের কোন দেবালয়ে আসিলাম! বর্ত্তমান সময়েও এখানে বহু দেবমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইতেছে, তন্মধ্যে জয়পুর-রাজের নব প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির, পাবনা—তাড়াসের ভূম্যধিকারী—রায় বনমালী রায় বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত রাধাবিনোদ-বাগ-মধ্যস্থ "রাধাবিনোদের মন্দির" বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দেব-সেবার নিমিত্ত রায় বনমালী বাহাদুর বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় পথে যমুনাপুলিন, বংশীবট, গোপেশ্বর শিব, ব্রহ্মচারীর মন্দির, রাধারমণ বিগ্রহ ও অন্যান্য বহু দেবমন্দির দর্শন করিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে মনে হইল, —একদিন যে যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীরবে উতলা রাধা আকুল স্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, এখন কোথায় বা তাহার সেই সৌন্দর্য্য, আর কোথায় বা সে রাধা, আর কোথাইবা সেই মোহন-মুরলীর মধুময় তান! আবার মনে পড়িতেছিল "যমুনাপুলিনে বসে কাঁদে রাধা-বিনোদিনী, বিনে সেই কাল-শশী বাঁকা শ্যাম-গুণমণি॥" এখন সেই পুলিনের বহুদূর পর্য্যন্ত ধূ ধূ করে বালুকা-রাশি! অন্যান্য বিগ্রহ-সমূহের মধ্যে গোকুলানন্দ, শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, ধীর-সমীর, অক্রুর ঘাট, ভাৎরোড, দাবানল কুণ্ড, সিঙ্গার বট, শ্রীবঙ্কবিহারী প্রভৃতি অবশ্য দর্শনীয়। গোপেশ্বর মহাদেবকে বৃন্দাবন-প্রদক্ষিণ কালে অথবা তাহার শেষে দর্শন ও প্রদক্ষিণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি কেহ না করেন, তবে তাঁহার বৃন্দাবন-প্রদক্ষিণের সমুদয় ফল, ইনি অপহরণ করেন বলিয়া কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাস করেন, তখন মহাদেব গোপী-বেশে তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে গোপীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি তদবধি গোপীশ্বর নামেই পরিচিত হইয়া আসি-

তেছেন,—কিন্তু সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে "গোপেশ্বর" নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।

শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা কালে ভক্তগণ শ্রীমতী রাধিকার আরামস্থলী, রাসস্থলী, জয়াটবী, প্রস্কন্দন তীর্থ, দ্বাদশাদিত্য তীর্থ, সূর্য্যঘাট, গোবিন্দঘাট, বেণুকূপ, আমলকীতলা, গোবিন্দকুঞ্জ, বাপীকূপ, ভোজনস্থান, গোকর্ণ, মধুবন, শান্তনতাল, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, কুসুম-সরোবর, গোবিন্দকুণ্ড, কুমুদবন, দানঘাট ইত্যাদি বহুল দর্শনীয় পুণ্যস্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। এখন আমরা বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে পুরাণাদি হইতে সংক্ষেপে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই পাঠক ও পাঠিকাবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—

"ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈককেবলং।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষকীটা-নরামরাঃ॥
যে চ সন্তি মমাধিষ্টে মৃতা যান্তি মমালয়ম্।
অত্র বা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ॥
পঞ্চযোজন মেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী॥
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ॥
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যসদৃশ্যং চর্ম্ম-চক্ষুষা॥"

শ্রীভাগবতকার লিখিয়াছেন ;—

"বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নব কাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্॥
বৃন্দাবনং সখিভূবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকী সুতপদাম্বুজলব্ধ লক্ষ্মী।

গোবিন্দ-বেণুমনুমত্ত ময়ূর নৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রি সান্ব পরতান্য সমস্ত সত্ত্বম্।
(শ্রীভাগবত ১০।২১।১০)

বৃন্দাবনে আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর লাগিয়াছিল বিশীর্ণা যমুনার কল-কল্লোল ও তাহার দৃশ্য। যদিও এখন বাঁশীর তানে যমুনা-সুন্দরী উজান বহেন না—তথাপি প্রতিতরঙ্গ উচ্ছ্বাসে কি যেন কি এক বিষাদ-কাহিনী—কি যেন করুণ মনোবেদনা ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। যমুনা যেন—ভারতমাতার অশ্রুরাশিদ্বারা গঠিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। কোথায় সেই অতীতের সুখস্বপ্ন আর কোথায় বর্ত্তমানের হতাশ্বাস। অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনায় অতীত যেমন আমাদিগের মনোহরণ করে—বর্ত্তমানের মধ্যে সে মাদকতা দেখিতে পাই না।

বৃন্দাবনের রজই বৃন্দাবনের সম্পত্তি। এই ধূলি-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও বহুলোক জীবন ধারণ করিতেছে। যোগমায়া —গোবিন্দজীর মন্দির পার্শ্বে অবস্থিত। এই যোগমায়াই রাধাকৃষ্ণ-লীলার ঘটনকর্ত্রী কিন্তু লীলাময়ী শ্রীমতী রাধিকার এমনি প্রাদুর্ভাব যে কেহই যোগমায়াকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হন না। কিয়দ্দূর সিঁড়ি দিয়া নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিলে একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানা চৌকি, এক জোড়া খড়ম ও একটী ত্রিশূল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কোন্ মহাপুরুষের তাহারা জানিতে পারিলাম না।

যোগমায়া।

বৃন্দাবনের সমস্ত দেবমন্দিরাদি দর্শন করিবার সাধ্য কোনও তীর্থযাত্রীর বা ভ্রমণকারীর সাধ্যাতীত; কারণ সময়, সামর্থ্য ও সঙ্গতিতে কুলায় না। প্রধান প্রধানগুলি দেখিতে গেলেই আট-দশ দিন সময় লাগে। আমরা আবার ততদিনও অপেক্ষা করিতে পারি নাই। তবে একটা বিষয়ে আমরা যাহা লক্ষ্য করিয়াছি এবং যাহা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, তাহা আমাদের নিকট পরমাদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। বৃন্দাবনের প্রধান দেবালয়গুলি সমস্তই বাঙ্গালী বৈষ্ণবের সেবিত, এমন কি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি সেই গোবিন্দজীও বাঙ্গালী বৈষ্ণবের আবিষ্কৃত এবং সেবিত। কোন দেবালয়ে ব্রজবাসীদিগের অধিকারিত্ব বা স্বামীত্ব নাই। চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদগণের

যত্নে তীর্থ উদ্ধার হইলে, তাঁহারাই এখানকার সমস্ত প্রধান প্রধান দেবালয়ের মঠাধ্যক্ষ হইয়া বসেন। ব্রজবাসীরা যে তাঁহাদিগকে সহজে কেন তাহাদের চির-অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল বা কেন দিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত বিবরণ কেহ আজিও অনুসন্ধান করেন নাই। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম একমাত্র 'বাঁকে-বিহারীজীর' মন্দির ব্রজবাসীদিগের অধিকৃত, সেখানে বাঙ্গালী-গোস্বামী বা বৈরাগীর কোন প্রভুত্ব নাই। বাঙ্গালীর সেবিত দেবালয়গুলির সহিত এই দেবালয়ের একটা প্রধান পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দজী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালীর সমস্ত মঠের দেবতা যুগলমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত, কিন্তু বাঁকে-বিহারীজীর রাধা নাই। জিজ্ঞাসায় জানিলাম কোনকালেই ছিল না এবং এখনও নাই। চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যগণ যখন বৃন্দাবনের তীর্থ উদ্ধার করেন, তখন প্রথমে যে গোবিন্দজী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, তাঁহারও রাধা ছিল না। বর্ত্তমান গোবিন্দজী মূর্ত্তি বাঙ্গালী-বৈষ্ণবের ধ্যানজমূর্ত্তি অর্থাৎ ত্রিভঙ্গ, মুরলীধারী, বামে-হেলা, নটবর মূর্ত্তি। বাঙ্গালী বৈষ্ণব ও ব্রজবাসী—উভয় দলেই স্বীকার করেন যে, সেই আসল গোবিন্দজী এখন বৃন্দাবনে নাই। আরঙ্গজেবের সময়ে তিনি জয়পুরে গিয়াছেন এবং সেখানেই আছেন। জয়পুরে যে গোবিন্দজী আছেন এবং যিনি বৃন্দাবনের আসল গোবিন্দজী বলিয়া সমস্ত বৈষ্ণব-জগতে পূজিত হইয়া থাকেন, তিনি বাঙ্গালীর ধ্যানসঙ্গত মূর্ত্তিবিশিষ্ট নহেন এবং তাঁহারও রাধা নাই। এখন আমরা বৃন্দাবনে যে গোবিন্দজী দেখিলাম, তিনি আসল গোবিন্দজীর জয়পুর-গমনের পরে গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক নূতন প্রতিষ্ঠিত। মদনমোহন, গোপীনাথ, যুগলকিশোর প্রভৃতি প্রধান-প্রধান বিগ্রহ এই নবীন গোবিন্দজীর আকৃতির অনুকৃতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্গালারূপ এবং সকলগুলিই শ্রীরাধা-সংযুক্ত। এখনকার গোবিন্দজীরও রাধা আছেন। এই সকল প্রধান বিগ্রহের পর যে সকল দেবমূর্ত্তি বৃন্দাবনের নানাস্থানে যে সকল রাজা, মহারাজ বা জমীদারকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলগুলি যুগলরূপে গোবিন্দজীর আকৃতির অনুকরণে গঠিত। যে বাঁকে-বিহারীজীর কথা বলিয়াছি, সে দেব-বিগ্রহ কিন্তু বাঙ্গালা কৃষ্ণমূর্ত্তি—ত্রিভঙ্গিম ঠাম, নটবরশ্যাম মুরলী-বদন মূর্ত্তি নহে। তাহা অতি

বৃহদাকারের প্রতিমা এবং জয়পুরের আসল গোবিন্দজীর আকৃতির অনুগত। বাঙ্গালা কৃষ্ণমূর্ত্তির বাজাইবার ভাবে বাঁশী ধারণ, বামে হেলিয়া দাঁড়ান এবং বামপদের উপর দক্ষিণ পদ বক্রভাবে স্থাপন এই তিনটী প্রধান লক্ষণ, কিন্তু আসল গোবিন্দজীর কোন অঙ্গ বাঁকা নহে, পায়ের উপর পা দেওয়া নহে এবং বাঁশী, বাজাইবার ভাবে ধৃত নহে। তিনি সোজা পায়ে, সরল ভাবে, উভয় পা পাতিয়া দণ্ডায়মান ও দক্ষিণ করে বাঁশীটি উচ্চ করিয়া ধরিয়া আছেন। বাঁকে-বিহারীজীর মূর্ত্তিও এইরূপ এবং আসল গোবিন্দজীর ন্যায় রাধা-বিরহিত। বিস্ময়ের সহিত শুনিলাম যে তিনি রাধিকাসঙ্গ সহ্যই করিতে পারেন না। ব্রজবাসীরা নাকি তিন-তিনবার তাঁহার রাধিকা গড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে রাধা রাখেন নাই, সিংহাসন হইতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার নকল রাধার প্রয়োজন নাই, প্রতি রাত্রিতে তিনি যথার্থই রাধারাণীর সহিত বিহার করেন এবং অতঃপর যেন বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে তাঁহার দ্বার খোলা না হয়। এই প্রবাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যা যাহাই থাকুক, আমাদের মনে হয় যে, যখন বাঙ্গালী গোস্বামী ও বৈরাগীগণের যত্নে ও চেষ্টায় যুগলরূপে ও যুগলসেবায় বৃন্দাবন ভরিয়া গিয়াছিল, 'রাধারাণী কি জয়' শব্দে বাঙ্গালী যাত্রিদল বাঙ্গালীর মঠগুলি অর্থে, সেবার দানে ভরিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন বোধ হয় 'বাঁকে-বিহারীর' মন্দিরে যাত্রিসমাগম প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যুগল-তন্ত্রের সাধক বাঙ্গালী-বৈষ্ণব বোধ হয়, তখন রাধাবিরহিত কৃষ্ণমূর্ত্তির দর্শন-পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিত না, কাজেই ব্রজবাসীরা বাঁকেবিহারীর পার্শ্বেও রাধা খাড়া করিয়া ন্যূনতা পরিহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবতার অনাসক্তিতেই হউক আর প্রাচীন-তন্ত্রের সাধকবর্গের প্রভাবেই হউক, সে রাধামূর্ত্তি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। অবশেষে রাত্রিতে অশরীরী রাধার বিহার কল্পনা করিয়া, সেই প্রসঙ্গ রটাইয়া, ব্রজবাসীরা আপনাদের মঠের শ্রেষ্ঠত্ব আরও ভালরূপে 'জাহির' করিয়া লইয়াছেন।* এই 'বাঁকে-বিহারীজীই' সুপ্রসিদ্ধ

* কেবল বৃন্দাবনে নহে, বাঙ্গালা দেশেও অনেক স্থলেই রাধাবিরহিত কৃষ্ণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ঐ সকল কৃষ্ণমূর্ত্তি চৈতন্য-প্রভাবের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। ঐ সকল মূর্ত্তির গঠন কিন্তু বাঙ্গালার কৃষ্ণমূর্ত্তিরই অনুরূপ। দাক্ষিণাত্যের রণছোড়জী, শ্রীরঙ্গজী, বিঠ্ঠলনাথজী প্রভৃতিও রাধাহীন কৃষ্ণমূর্ত্তি।

গায়ক স্বামী হরিদাসের সেবিত 'কুঞ্জবিহারীজী'। হরিদাস এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না সেবক ছিলেন। ইহা একটী প্রাচীন মূর্ত্তি।

বৃন্দাবনের ভিখারী ব্রজবালকগণের মুখে ভাঙাভাঙা বাঙ্‌লায় বৈষ্ণব কবির কবিতা—

"ধূলা নয় ধূলা নয় গোপীর পদরে।
এই ধূলা মেখেছিল নন্দের বেটা কানু॥"
"আন সখি পার করিতে লিব আনা আনা।
শিরীমতীকে পার করিতে লিব কাণের সোনা॥"

এবং ভাঙা সংস্কৃতে—

"বিন্দ্রাবনং পরিত্যজি পাদমুখং ন গচ্ছতি"

ইত্যাদির অশ্রান্ত উচ্চারণ এবং বাঙ্গালী যাত্রীর চতুষ্পার্শ্বে উল্লম্ফন-সহকারে নৃত্য উপভোগ করিবার জিনিস বটে।

গিরি-গোবর্দ্ধন।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া পরদিন আমরা গোবর্দ্ধন যাত্রা করিলাম। বৃন্দবনের বিপরীত দিকে গোবর্দ্ধন অবস্থিত, কাজেই আমাদিগকে মথুরা হইয়া যাইতে হইল। এই পথেই সুপ্রসিদ্ধ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। মথুরা ছাড়াইয়া আমাদিগকে প্রথমে মধুবনে প্রবেশ করিতে হয়। এই মধুবনেই রাবণের ভাগীনেয় লবনদৈত্যের আবাস ছিল। শুনিলাম বনের মধ্যে একটা টিলা আছে, তাহাকে এখনও 'লওন টিলা' বলে। ঢিপি ছাড়া আর কিছুই নাই শুনিয়া ত্রেতাযুগের সে দৈত্যপুরী, শত্রুঘ্নের সে বিজয়ভূমি দেখিতে যাইবার লোভ সংবরণ করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। কৃষ্ণ-লীলায় মধুবনই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রিয় গোচারণ স্থান ছিল। গোষ্ঠ-লীলার স্থানই এই। এক্কা হইতে নামিয়া এখানকার রজে গড়াগড়ি দিবার মত ভক্তি আমাদের ছিল না, কাজেই আমরা অগ্রসর হইলাম। এই মধুবনেই বলরাম মধুমাসে মধুপানে মধুলীলা করিয়াছিলেন। মধুবন ছাড়াইয়া তালবনে পড়িতে হয়। সে 'তমালতালীবনরাজি নীলা' এখনও আছে বটে, এখনও শত শত তালগাছ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু তেমন আর নাই,—ভাগবতের মধুবন-বিহারের পরম শোভাধার তালীবনের সৌন্দর্য্য-সম্ভার আর নাই। এক্কা চলিতে লাগিল, আমরাও কৃষ্ণ-লীলার স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির প্রতি সবিস্ময়ে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। শেষে গোবর্দ্ধন গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম,—গ্রাম্য বালকেরা দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া শিশুকণ্ঠে বাঙ্গালী কবির অমর কবিতায় ভক্তের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি তুলিয়াই যেন চারিদিকে নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল,—

"শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
(আর) মধুর মধুর বংশীবাজে এইত বৃন্দাবন॥"

তাহার পরেই তীর্থ-প্রথামত—"দে বাবা একটা পয়সা দে—হাম্‌রা চার জনে লেবে" ইত্যাদি বহুশ্রুত দরখাস্তের 'বয়েদ' আওড়াইতে লাগিল। ক্রমশঃ

আমরা শ্যামকুণ্ড তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দুইটী পাশাপাশি যুগ্মকুণ্ড। মধ্যস্থানে ৫।৬ হাত চওড়া একটী পাথরের বাঁধ আছে। বাঁধের নীচে দিয়া উভয় কুণ্ডের জলে সংযোগ আছে। কুণ্ড দুইটিই চারিদিকে পাথরের সিঁড়ি দিয়া বাঁধান। এখানকার অধিকারী পাণ্ডা অর্থাৎ কুণ্ডবাসী ব্রজবাসীদল বৃন্দাবনের দল হইতে ভিন্ন,— অর্থাৎ একদল অপর দলের অধিকারে হস্তার্পণ করে না। স্বর্গীয় কায়স্থ-কুলতিলক মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ অর্থাৎ লালাবাবু স্বব্যয়ে এই কুণ্ড দুইটি বাঁধাইয়া দিয়া কীর্ত্তি ও পুণ্যসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। শ্যামকুণ্ডের জল নীলাভ এবং রাধাকুণ্ডের জল বর্ণহীন স্বচ্ছ। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-রেখায় যমুনা ও গঙ্গার জলে যে ভাবে মেশামিশি হইতে দেখিয়াছি, এখানেও সেই ভাবে মেশামিশি দেখিলাম। এই মেশামিশি দেখিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির কৃষ্ণ-অঙ্গে রাই-অঙ্গ মেশামিশির ললিত-মধুর পদাবলীগুলি মনে পড়িতে লাগিল। প্রাকৃতির লীলাই যে ভগবানের লীলার সাক্ষাৎ সাক্ষী-স্বরূপ তাহাই দেখাইয়া দেওয়াই হিন্দুর তীর্থস্থান গুলির উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য বিশেষ-ভাবে ব্রজমণ্ডলের প্রতিগ্রামে, প্রতিবনে, প্রতিদৃশ্যে, পরিস্ফুট। যাত্রীরা এই উভয় কুণ্ডে স্নান, তর্পণ, দান করিয়া থাকেন। শ্যামকুণ্ডের তীরে একটী পবিত্র স্থান আছে, এটি একটী গুহার ন্যায়। স্থানটী বাঙ্গালী বৈষ্ণবের নিকট যেমন আদরের, বাঙ্গালী সাহিত্যিকের নিকটেও তেমনি আদরের,—এই গুহাটিতে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন এবং এই গুহাই বাঙ্গালীর মহাগ্রন্থ বৈষ্ণবের গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের জন্মভূমি। এই উভয় কুণ্ডের নিকটে আর একটী কুণ্ড আছে, সেটিও বাঁধান এবং সেটি শ্রীমতী রাধার অভিন্ন-হৃদয়া সখি ললিতার নামে প্রসিদ্ধ—ললিতাকুণ্ড। ললিতাকুণ্ডের জল অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ।বশিষ্ট। ইহারই নিকটে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। আমাদের পাণ্ডা আমাদিগকে রাঘব গোস্বামীর পাট দেখাইলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। চৈতন্যমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া শেষ-জীবনে গোবর্দ্ধনে আসিয়া বাস করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখন ইনিই

তাঁহাদিগকে ভগবানের লীলাস্থল-সকল দেখাইয়াছিলেন। দাস গোস্বামীর সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভক্তিরত্ন-প্রকাশ নামে ইহার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। শ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরে 'সুবলকুঞ্জ' আর একটি দেখিবার জিনিস। স্থানটির শোভা অতি রমণীয়। এই কুঞ্জ মধ্য হইতে কুণ্ডের যে ঘাটে স্নানাদি করিতে হয়, তাহার নাম 'মানস-পাবন' ঘাট। ইহা শ্রীমতী রাধিকার অতি প্রিয় স্থান। এই ঘাটের উপরেই পাঁচটি বৃক্ষ এক সারিতে দণ্ডায়মান আছে। পাণ্ডা বলিয়া দিলেন পঞ্চপাণ্ডব তীর্থ-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া এখানে এই বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন। পঞ্চপাণ্ডবের অবতার গাছকয়টা দ্বাপরযুগের তো নহেই, তবে আধুনিক কালেরও নহে। তীর্থ আবিষ্কার-কালে এই গাছগুলি বনের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শুনা গেল। গোবর্দ্ধনের নিকটে রাসৌলী নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেখানে গিরি-গোবর্দ্ধনে মধুমাসে ব্রজচন্দ্র রাসলীলা করিয়াছেন ও ঝুলনে দুলিয়াছেন। রাসস্থলী আজিও চিহ্নিত আছে, কিন্তু তাহা দর্শনে আমাদের আর যাওয়া



শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন।

ঘটিল না, ইহার নিকটে আনিয়োর গ্রাম। এই গ্রামেই ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধনকে ছত্ররূপে ধারণ করিয়া ভগবান 'গিরিধারী' নাম লইয়াছিলেন। এই গ্রামের পার্শ্বে ইন্দ্রের পরাজয়-নিদর্শন স্বরূপ 'ইন্দ্রকুণ্ড' বর্ত্তমান আছে। গোবর্দ্ধনের চতুষ্পার্শ্বে বহুদূর-পর্য্যন্ত বহুগ্রামে ভগবানের নানা লীলাস্থলের কথা শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিলাম। সকল স্থান দেখিবার কৌতূহল জাগিলেও দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই শুনিয়া, অগ্রসর হইলাম না, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ও তাহার নিকটস্থ দৃশ্যগুলি দেখিবার জন্যই আগ্রহান্বিত হইলাম।

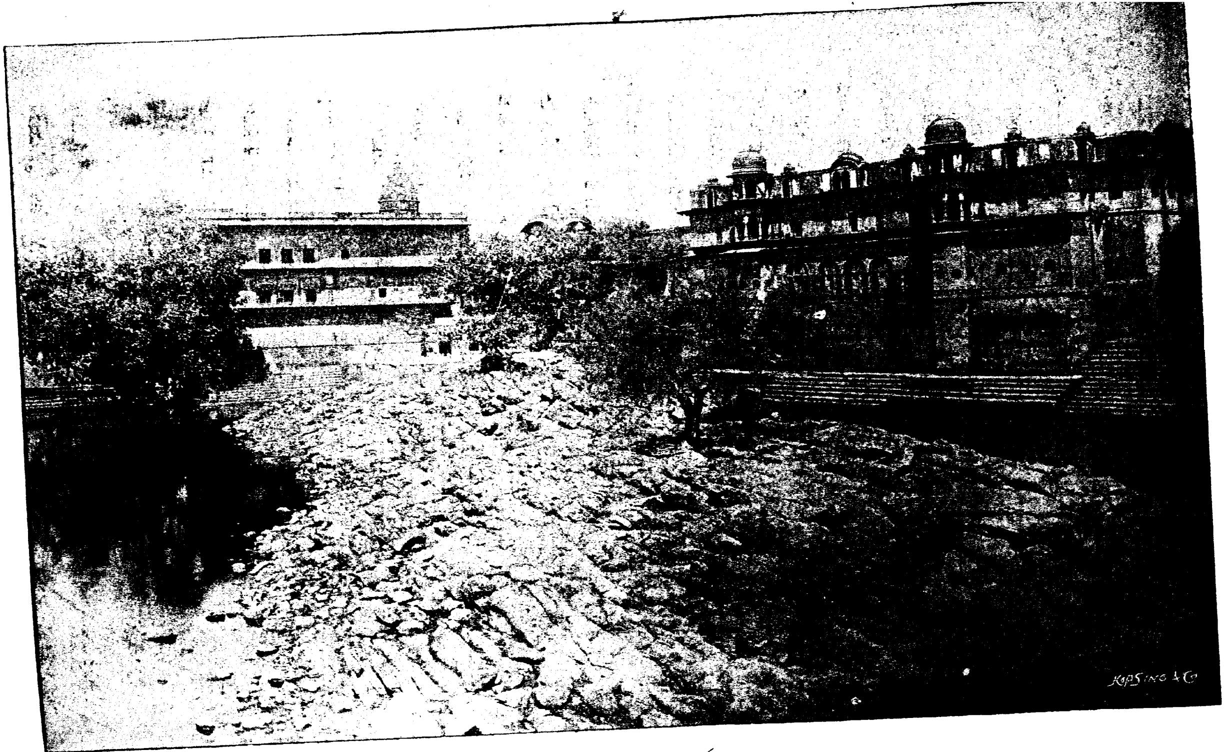
মথুরার পশ্চিমে ৬ ক্রোশ বা ১২ মাইল দূরে গোবর্দ্ধন ক্ষেত্র অবস্থিত। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত অতি উচ্চ নহে। দৈর্ঘ্যে দেড় ক্রোশ হইবে। পর্ব্বতটি বেলে পাথরের। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ কিঞ্চিৎ দুরারোহ হইলেও দৈর্ঘ্যের সীমাদ্বয় হইতে সহজেই আরোহণ করা যায়। পর্ব্বতের পার্শ্বদিয়া যখন আমরা চলিতেছিলাম, তখন ভগবানের চিরশ্রুত গোবর্দ্ধন-লীলার কথা স্মরণ হইতেছিল। কল্পনায় যেন দেখিলাম, এই বৃহৎ পর্ব্বত ছত্রাকারে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত, নিম্নে অসংখ্যজন-মানব-গোমহিষাদি অবস্থিত, মধ্যে ভগবান বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পর্ব্বতের ভার ধারণ করিয়া আছেন! চারিদিকে ইন্দ্রের রোষাগ্নি গলিয়া মুষলধারে বৃষ্টির আকারে দেশ ভাসাইয়া দিতেছে—আর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের স্পর্দ্ধা দেখিয়াই যেন মৃদুহাস্যে শান্ত দৃষ্টিতে আশ্রিত-গণের প্রতি চাহিয়া আছেন! ব্রজবাসী সকলের মুখেই ভয়-বিস্ময়স্নেহ স্পষ্ট দেদীপ্যমান হইয়াছে! সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া আগ্রহভরে ভগবানের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছেন! এক দৃষ্টিতে গোবর্দ্ধন দেখিতে-দেখিতে চলিতেছি আর অন্তরের এই মানস-পটখানি যেন সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাইতেছি! মন যেন মনের অজ্ঞাতে এই মানস-পটের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে! চর্ম্ম-চক্ষুতে পর্ব্বতের প্রস্তরময় রূপ, তাহার উপর গো-গোবৎসের তৃণ-ভক্ষণ ও অজাকুলের উল্লম্ফন, ব্রজশিশুর ছুটাছুটি, স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি বটে কিন্তু অন্তর্দ্দৃষ্টিতে ঐ মানস-পটও এতটা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে যে চর্ম্মচক্ষুর সাহায্য না পাইলেও বহির্দৃশ্যের সঙ্গে যুগপৎ তাহারও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি! সময়ে সময়ে অন্তর্দৃষ্টির শক্তি নিমেষের জন্য এতটা প্রবল হইতেছে যে, চর্ম্মচক্ষু দুইটি সম্পূর্ণ বিস্ফারিত থাকিলেও দিবসের প্রদীপ্ত রৌদ্রে উদ্ভাসিত বহির্দৃশ্যই হারাইয়া ফেলিতেছি, মানসপটেই মন ডুবিয়া যাইতেছে! এই মানস-প্রত্যক্ষই ধ্যানের সফলতা আনিয়া দেয়, সমাধির পথে সাধককে পলে পলে অগ্রসর করে!

গোবর্দ্ধন গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পার্শ্বে আসিয়া যখন আমরা পঁহুছিলাম, তখন বহির্দৃশ্য প্রবল হইয়া উঠিল, মানস-পট অন্তর হইতে হঠাৎ সরিয়া গেল, সম্মুখে এক সুদৃশ্য প্রস্তর সৌধ দর্শন করিয়া চক্ষু ও মন একবারে হঠাৎ তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

শুনিলাম, উহা ভরতপুর-যুদ্ধজয়ী রাজা রণজিৎ সিংহের সমাধি-মন্দির। লর্ড লেকের ভীষণ সৈন্যদল ও কামান-শ্রেণীর মুখ হইতে ইনিই কয়েকদিন দুর্ভেদ্য দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। সমাধি-সৌধের পাশে দুইটী শোভাময় প্রস্তর বাঁধান কুণ্ড দেখিলাম। তন্মধ্যে যেটি ক্ষুদ্র, সেটিতে জল আছে, যেটি বৃহৎ সেটিতে জল নাই। পাণ্ডাঠকুর ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, রাসমণ্ডলে নৃত্যের পর নটবর কৃষ্ণচন্দ্র পিপাসার্ত্ত হইয়া এই কুণ্ডের সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তদবধি আর ইহাতে জল থাকে না। রণজিত সিংহের সমাধির পার্শ্বে ভরতপুরে জাঠরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সূর্য্যমলের সমাধি-সৌধ দেখিলাম। পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ইহা অবস্থিত। এই প্রস্তরময়ী পুরীর সৌন্দর্য্য, পরিপাট্য এবং ভিত্তি-সংস্থান অতি সুন্দর, সুবিধাজনক এবং সুরুচির পরিচায়ক। পাথরের কারুকার্য্যগুলি শিল্পীর সূক্ষ্মযন্ত্র চালনায় এত পরিস্ফুট ও শোভাময় হইয়া আছে যে, আধুনিক অট্টালিকা না হইলে, লোকে হয়ত ইহাকে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিত। প্রধান সমাধি-মন্দিরের চারিদিকে রাজ-পরিবারের আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি আছে। এই সকল সমাধির পাদমূলে স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ নাতি বৃহৎ সরোবর উৎখাত। অন্যদিকে সুবিন্যস্ত উদ্যান।

আগ্রা, বৃন্দাবন, মথুরার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি যে লাল পাথরে গঠিত এবং আধুনিক মন্দিরগুলি যে ধূসর বর্ণের বেলে পাথরে গঠিত সুরজমলের সমাধি সে সকল পাথরে নির্ম্মিত নহে। ইহা একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর সাদা পাথরে গড়া। পাথরের নাম শুনিলাম রূপবাস। সূর্য্যমলের সমাধি যেখানে, ঠিক্ তাহার উপর ভগবানের চরণ-চিহ্নযুক্ত মর্ম্মর প্রস্তরখণ্ড আছে এবং চরণ-চিহ্নের চতুষ্পার্শ্বে সুদর্শন চক্র, নৃমুণ্ড, তরবারি এবং বনমালা চিহ্নও খনিত আছে। এ সকল সমাধির নিম্নে কাহারও দেহ সমাহিত নয়। যে যে স্থানে রাজাদিগের দেহ দাহ করা হইয়াছিল, সেই দাহ-স্থানের উপর এ সকল সমাধি নির্ম্মিত। শ্মশানে দাহস্থানের উপর চৈত্য নির্ম্মাণ, বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা হিন্দুর অতি প্রাচীন পদ্ধতি, কিন্তু এইরূপ সমাধি-সৌধ নির্ম্মাণ মুসলমান সংস্রবের অবিমিশ্রফল।

সমাধি-সৌধগুলির এক পার্শ্বে বলদেবের মন্দির এবং এক পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের



মানসা গঙ্গা—গোবর্দ্ধন।

মন্দির আছে। ব্রজবাসীরা বাঙ্গালীর নিকটে এই দুইটিকে কানাই-বলাইর মন্দির বলিয়া পরিচয় দেয়। সূরযমলের সমাধির গুম্বজের ভিতরদিকে সূরমলের দরবারের ছবি অঙ্কিত আছে। টডের রাজস্থানে অশ্বারোহী শট্‌কার নল-মুখে ধূমপায়ী রাণা ভীমসিংহের ছবি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই সূরযমলের এই ধূমপায়ী মূর্ত্তি কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। অন্য তিন দিকে আর তিনখানি ছবি আছে, তাহার একখানিতে সূর্য্যমল পবিত্র বেশে গৃহ-দেবতা হরিদেবের পূজা করিতেছেন। আর একখানিতে সূর্য্যমল মৃগ ও শূকর-শিকারে নিযুক্ত এবং অপরখানিতে স্বীয় ফরাসী-সেনাপতির সহিত যুদ্ধজয়ী যোধ্‌বৃন্দকে পুরস্কার দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে কৃষ্ণলীলার ছবি অসংখ্য। রণজিত সিংহের সমাধি-সৌধেও ঠিক্ এইরূপ ছবি আছে। একখানি ছবিতে দেখিলাম লর্ড লেক ঘোড়া হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং সেনা পরিচালন করিতেছেন। অতঃপর আমরা জাঠ রাজার সমাধি মন্দির হইতে নিস্ক্রান্ত হইলাম এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিস্থ প্রধান তীর্থস্থান 'মানস-গঙ্গা' দেখিতে চলিলাম।

মানস গঙ্গা।

গোবর্দ্ধনের সর্ব্বোচ্চ স্থানে এই নাতি বৃহৎ হ্রদ বর্ত্তমান। হ্রদ গভীর, জল হরিদ্বর্ণ, ফুলে, ফুলের মালায় উপরিভাগ পরিব্যপ্ত। তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান-তর্পণ করিয়া থাকেন। হ্রদের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, দুইদিকে কতকটা ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দ্বার বসাইয়া পাণ্ডারা এই তীর্থ স্থানটি নিজেদের কবলগত করিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে ভরতপুরের রাজ-সমাধির উচ্চ অট্টালিকা অপর দিকে গোবর্দ্ধনজীর মন্দির বাহির হইতে কিছুই দেখিবার উপায় নাই। পাণ্ডাঠাকুর ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, বৎসাসুর বধের পর শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-কুঞ্জে আসিবামাত্র সখি-পরিবৃতা রাধিকা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন না, অপরাধ,—গো-হত্যা করিয়াছ; গঙ্গাস্নানে পবিত্র হও। শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব সহিল না; হাতের বাঁশী গোবর্দ্ধনের শীর্ষ দেশে বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিতেই কুণ্ড আবির্ভূত হইল এবং গঙ্গা প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া জলে ভরিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া কুণ্ডকে বরপ্রদান করিলেন, আমার এই মানস-গঙ্গায় যে স্নান-তর্পণ করিবে সে গঙ্গায় স্নান তর্পণের সমস্ত

সমস্ত ফলপ্রাপ্ত হইবে। মানসী গঙ্গার ঘাট হইতে ঘুরিয়া আমরা গোবর্দ্ধন-মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইষ্টক-প্রস্তর-মিশ্রিত শ্বেতকায় ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের তিনদিকে তিনটা দ্বার, মধ্যে কুড়ি পঁচিশজন লোক মাত্র বসিতে পারে। মন্দির মধ্যে কোনও দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের কুণ্ড মধ্যে যাঁহারা বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুমান করিতে পারিবেন যে এই মন্দিরের গৃহ তলটিই সেইরূপ কুণ্ড, তবে পর্ব্বত শীর্ষের ায় ব র, কিন্তু মধ্যস্থলে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া, একখানি দেড়ফুট উচ্চ, প্রায় ছয় ইঞ্চি চতুরস্র প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইয়াছে, উহার শীর্ষভাগ কলম কাটার ন্যায় বাঁকা করিয়া যেন কাটা। এই প্রস্তর খণ্ডের উপরে ফুল জল নৈবেদ্যাদি দিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে হয়। পাণ্ডাঠাকুর পরিচয় দিলেন, ইহা গোবর্দ্ধনের মুখ বা শিরোদেশ নহে—নাসিকা। কথায়-কথায় পাণ্ডাঠাকুরের কাছে একটা পরিচয় পাইলাম যে, এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে গোবিন্দজীর প্রধান মন্দির ছিল। বৃন্দাবনে মান সিংহের যে মন্দির অ ম দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র মন্দিরে গোবিন্দজী এই গোবদ্ধনে াকিতেন। তাহার পর গোবর্দ্ধন হইতে নামিয়া আমরা হরি-মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই হরিদেবই আপাততঃ গোবর্দ্ধনের অধিষ্ঠাতা। ইহাঁকে অবলম্বন করিয়াই 'অন্নকূটাদি' যাহা কিছু উৎসব হইয়া থাকে। 'অন্ন কূটের' স্থান পরিদর্শন করিলাম। এই বিস্তীর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করা একটী তীর্থ-কার্য্য। অধিকাংশ যাত্রীই গোবর্দ্ধনে আসিয়া এই মন্দিরে প্রসাদ পাইয়া থাকে। আমরাও সেদিন মধ্যাহ্নের ব্যাপার শ্রীহরির প্রসাদেই সম্পন্ন করিলাম। প্রসাদের মধ্যে পায়সান্ন অতি সুস্বাদু এবং অতি প্রসিদ্ধ। মথুরা হইতে গোবর্দ্ধনের এই পায়সান্ন-প্রসাদের কথা নিয়া আসিয়াছিলাম!

গোবর্দ্ধন মন্দির।

হরি মন্দির।

গোবর্দ্ধনের আশেপাশে বহু গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বহু স্মরণ-চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। 'সখীঘরা' গ্রামে চন্দ্রাবলীর বাস ছিল। শুনিলাম রাধাভক্ত অনেক বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হইলেও রাধার প্রতিদ্বন্দিনী বলিয়া চন্দ্রাবলীর গ্রামে পদার্পণও করেন না। নিকটবর্ত্তী আর একখানি গ্রামের নাম মোরণ,

এখানে আজিও সূর্য্য-মন্দিরে সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত আছেন শুনিলাম, কিন্তু আমাদের আজিও উহা দেখিতে যাওয়া ঘটে নাই। রাধিকা কৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভ-প্রার্থনায় এই সূর্য্যের পূজা করিয়াছিলেন। রাধিকার সেই পূজায় কিন্তু পূজক ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। গাঁটুলি গ্রামে রাধা কৃষ্ণের দোলমঞ্চ আছে ও লালকুণ্ড আছে। বসন্ত কালে এই কুণ্ডের জল নাকি ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে! গোবর্দ্ধনের প্রভাবে ইন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ হইলে যে কুণ্ড তীরে তিনি ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করেন সেই কুণ্ডের নাম ইন্দ্রকুণ্ড এবং সেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম ইঁদ্রৌলী বা ইন্দ্রৌলী। এই প্রধান বৈষ্ণব-তীর্থে বৈষ্ণবের কল্পনানুসারেই হউক আর সাময়িক শৈব-প্রভাবেই হউক কাশীর সকল তীর্থ—মণিকর্ণিকা, বিশ্বনাথ, চক্রতীর্থ, গৌরীকুণ্ড, ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত আছে।

আমরা পর্ব্বত হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম। পাণ্ডাঠাকুরের মুখে বিশ্রাম নাই, কৃষ্ণেরলীলাস্থানগুলির বিবরণ বর্ণনায় তিনি যেন শতমুখ! তাঁহার নানা কথার মধ্যে শুনিলাম, গোবর্দ্ধন-ক্ষেত্রেব মধ্যে লুকলুকানি-কুণ্ডে রাধাকৃষ্ণ লুকোচুরি খেলিতেন, মিচলিকুঞ্জে চোখ ফুটাফুটি খেলিতেন, চন্দ্রসেন পর্ব্বতে পিছলিনী শিলায় .রাধাকৃষ্ণ হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া একত্র অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া পিছলাইয়া নামিয়া পড়িতেন। এতদ্ভিন্ন ভগবান সেতুবন্ধনকুণ্ডে সমুদ্রবন্ধনলীলা করিয়াছিলেন, বাজনশিলায় নানা বাদ্য বাজাইতেন! এইরূপ কত স্থানে কত লীলা করিতেন!

বর্ষাণা।

গোবর্দ্ধন হইতে যাত্রা করিয়া বর্ষাণা গ্রাম দেখিতে গেলাম। বর্ষাণা—বৃষভানুপুর, রাধিকার জন্মভূমি। ইহার নিকটেও পর্ব্বত আছে, পর্ব্বতের নিকট বৃষভানুপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম; কিন্তু তাহাতে দেখিবার মত কিছু দেখিলাম না। গোকুলে নন্দালয়ের যে ঢিপি দেখিয়াছি, ইহাও সেইরূপ। চারিদিক ঘুরিয়া বোধ হইল যে, উহা পূর্ব্বে একটী মৃণ্ময় গড় ছিল। বর্ষাণার নিকট দুটী উচ্চ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র গিরিপথ আছে, উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত দুটীর নাম দানবিলাস পর্ব্বত এবং মানবিলাস পর্ব্বত আর গলিপথটীর নাম সাঁকরিখোর। বৃষভানু পুরীর পূর্ব্বদিকে ভানুখোর এবং পিলুখোর নামক দুইটী পার্ব্বত্য

কুণ্ড বিদ্যমান। ভানুখোর—সূর্য্যকুণ্ড। পিলু একরূপ স্থানীয় ফল, রাধিকা নাকি এই ফল খাইতে বড় ভালবাসিতেন, তাই কাঁটা-খোঁচা না মানিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই ফল পাড়িয়া দিতেন। কাজেই এমন সরস লীলাস্থানে এমন কুণ্ড-তীর্থ কেন না থাকিবে? বার্ষাণাগ্রামের এক পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী আছে—নদীটীর নাম ত্রিবেণী। বর্ষাণগ্রামের একপার্শ্বে জবটগ্রাম আর অপর দিকে নন্দগাঁও, জবটগ্রামে আয়ান ঘোষের বাড়ী আর নন্দগাঁওএ নন্দালয় ছিল। কংসের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া গোপরাজ গোকুল ত্যাগ করিয়া এখানেই বাসস্থাপন করেন। নন্দগাঁওএর ভিতর শ্রীকৃষ্ণের স্নানকুণ্ড, জলপানকুণ্ড, আচমনকুণ্ড প্রভৃতি প্রত্যেক দৈনন্দিন কার্য্য ও ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট নানারূপ তীর্থস্থানের উল্লেখ শোনা গেল। নন্দ-গাঁওএর নন্দভবন এখন উদ্যানরূপে পরিণত। পর্ব্বতের উপরে একটী গোফার ভিতর নন্দ, যশোদা ও বালক কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডাজী বলিলেন, এই বালকৃষ্ণের দেহ স্পর্শ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাব-সমাধি উপস্থিত হইয়াছিল। জাওটগ্রাম বা জবটগ্রামে রাধিকার বাড়ী ছিল। রাধিকার স্বামীর নাম আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি, আয়ান ঘোষ কিন্তু এখানে শুনিলাম তাঁহার নাম অভিমন্যু! এই তিন গ্রামের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলার বহু স্থানে বহু কুণ্ড, বহু কুঞ্জ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। বর্ষাণা দেখিয়া আমরা পুনরায় মথুরায় ফিরিলাম।



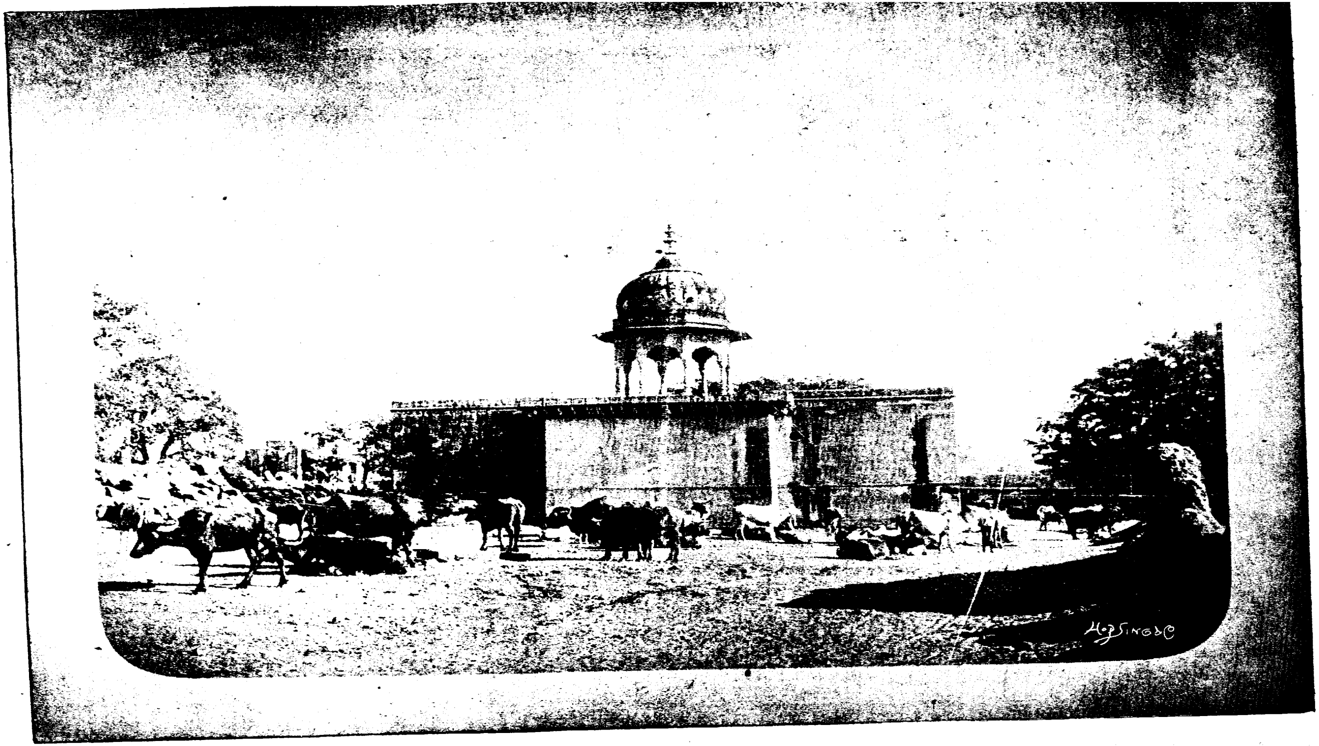
গোকুল যমুনাতীর

গোকুল।

মথুরা ষ্টেসনে আসিয়া যখন উপনীত হইলাম, তখন বেলা প্রায় নয় ঘটিকা হইবে। প্রভাত-রবির সেই সুমধুর কনক-কিরণ-ভাতি বিলুপ্ত হইয়াছে—তাঁহার স্বকীয় গৌরব-প্রভাবের প্রখরতার আভাষ সূচিত হইতেছে। আমরা এক্কা সহযোগে গোকুলাভিমুখে রওয়ানা হইলাম,—উহা মথুরা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী। যখন এক্কা যমুনা তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনই অপর তীরবর্ত্তী গোকুলের হর্ম্ম্যরাজি দৃষ্টি পথে পতিত হইল। যমুনার উপর তরণীমালা সংযোজিত করিয়া যে সেতু রেলওয়ে (ব্রিজ) নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা পার হইয়া দেখিতে-দেখিতে গোকুলে আসিয়া উপনীত হইলাম। আমরা দূর হইতে এ সকল স্থানের প্রাচীনত্বের যে চিত্র কল্পনা-বলে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া আসিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় আসল দেখিয়া অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গেল এবং হৃদয়ে নৈরাশ্য আনিয়া মন অবসন্ন, উৎসাহভঙ্গ এবং অতৃপ্তিতে হৃদয় পীড়িত করিয়া ফেলিল! সময়ের পরিবর্ত্তনে প্রত্যেক স্থানেরই এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, অধিকাংশ স্থলে কেবল মাত্র কল্পনাবলে নির্ভর করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে! বহু রাজ-পরিবর্ত্তন—প্রাকৃতিক বিপ্লব—ধর্ম্মবিপ্লব, অত্যাচার-উৎপীড়নে হিন্দুর কত প্রাচীন তীর্থ দেবমন্দির ও বিগ্রহের যে শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করে কে? যাহা আছে, তাহাও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ অলসতা ও তাচ্ছিল্যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ তীর্থের অধিকারী পাণ্ডা ঠাকুরেরা অজ্ঞতা নিবন্ধন নানা কপোল কল্পিত মিথ্যা কাহিনীদ্বারা অজ্ঞ এবং ভক্তিতে গদগদ স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রিগণকে মুগ্ধ করিলেও শিক্ষিত ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া দিন দিন ভক্তি ও শ্রদ্ধার অতীত হইয়া যাইতেছেন। সত্য সত্যই এই সকল অজ্ঞ পাণ্ডাগণের ছলনা ও চতুরতা নিরীহ তীর্থ যাত্রিগণকে বহু স্থলে প্রবঞ্চিত করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও দেবতার প্রতি

লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস করিয়া দিতেছে। বোধ হয়, বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ এ সব স্থানে আগমন না করিলে, কখনই এ সকল প্রাচীন লুপ্ততীর্থ আবিষ্কৃত হইত না। গোকুল দেখিয়া অতিমাত্র নৈরাশ্য সাগরে ডুবিয়াছিলাম। এখানে প্রাচীন চিহ্ন একরূপ কিছুই বিদ্যমান নাই, একথা বলিলেও কোনও রূপ অত্যুক্তি হয় না। পাণ্ডাঠাকুরেরা দলে দলে আমাদিগকে কবলে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের শত শত বাক্যব্যয়েও আমাদিগকে কোনও রূপ বাক্যব্যয় করিতে না দেখিয়া, তাঁহারা ধীরে ধীরে অন্যত্র গমন করিলেন।

গোকুলের অট্টালিকা সকলই আধুনিক। যে সকল প্রাচীন প্রাসাদ, ভগ্নস্তূপ, দুর্গ ইত্যাদি দর্শন করিলাম—সে সমুদয়ের কোনটিই চারি পাঁচশত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হইল না। এই সেই গোকুল—যাহার সহিত "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে জন্মেছে সে" এই পৌরাণিক কাহিনীটি প্রচলিত আছে। প্রথমে চতুর্দ্দিক প্রস্তরবদ্ধ একটী জলাশয় দেখিলাম—ইহার নাম "পোতর কুণ্ড।" এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, যে দিবস মথুরা নগরে কংসের কারাগারে দৈবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন; সেই দিবসই নন্দ-গৃহিণী যশোদাও এ নগরে একটী কন্যা প্রসব করেন। নবপ্রসূতা যশোদা এই জলাশয়ের জলে প্রসবান্তে নিজ বস্ত্রাদি ধৌত করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা হিন্দু-নরনারীর নিকট বিশেষ রমণীবৃন্দের কাছে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। সধবা রমণীগণ নিজ নিজ সন্তানের দীর্ঘ জীবন লাভার্থ এস্থানে স্নান করিয়া থাকেন আর বন্ধ্যা রমণীগণ সুসন্তান লাভের আশায় স্নান করেন। গোকুলে বহু ছোট ছোট দেবমন্দির আছে—দেবতাদিগের মধ্যে নন্দ, যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ইত্যাদি। আবার কোথাও বা দধিমন্থন-দণ্ডধারিণী যশোদা মায়ির মুর্ত্তি, কোথাও পুতনা রাক্ষসীর বিনাশ দৃশ্যও দর্শন করিলাম। এই সকল মুর্ত্তি অবশ্য পূজিতা প্রতিমা নহে; লীলা স্মরণার্থগঠিত পুত্তলিকামাত্র। যাত্রীরা এই সকল দেখিয়া ব্রজবাসীদের পয়সা দিতে বাধ্য হন। গোকুলে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কেলিঘাট ও নন্দ-যশোদা ঘাট উল্লেখ যোগ্য।



যমুনাতীর—গোকুল।

কেলিঘাটে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশী চুরি করিয়া তাঁহার সহিত এই স্থানে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেন। এই জনশ্রুতি হইতেই ইহার নাম কেলিঘাট হইয়াছে।

কেলিঘাটের অনতিদূরে নন্দ-যশোদা ঘাট অবস্থিত। এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণসহ যশোদা দেবী যমুনার পুণ্য সলিলে স্নান করিতে আসিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম নন্দ-যশোদা ঘাট হইয়াছে। এই ঘাটের উপরিভাগে দুর্গাপ্রাকারাকারে এক উন্নত বাসভবন অবলোকন করিলাম—পাণ্ডারা ইহাকে নন্দের আবাস ভবনের চিহ্ন বলিয়া দর্শকের নিকট বর্ণনা করেন। উহা আমাদের নিকট যথার্থ বলিয়া অনুমিত হইল না। গোকুলে দেখিবার আর কিছুই নাই। গোকুল হইতে আমরা মহাবন দেখিতে চলিলাম। গোকুল হইতে ঐস্থান প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের এক্কা

মহাবন।

গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বালকগণ ভিক্ষা প্রার্থী হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল এবং যে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে দুই চারিটী পয়সা না দেওয়া গেল, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই ইহারা আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে ক্ষান্ত রহিল না। গাড়ীর পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া দুই চারিটি সামান্য পয়সা প্রাপ্তির জন্য এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু যেরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহা ভাবিলে ইহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি সকলেরই হৃদয়ে সমবেদনার উদয় হয়। সুকুমার শৈশব হইতেই ইহারা নিজ নিজ চরিত্রকে এইরূপ ঘৃণিত করিয়া তোলে যে, ভবিষ্যৎ জীবনে আর কিছুতেই সংশোধন করিতে সক্ষম হয় না। মহাবন একটী ছোটখাট সহর। গোকুল অপেক্ষা বরং এ স্থানেই কিছু প্রাচীন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিদিকেই অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নস্তূপরাশি বিদ্যমান। এ স্থানে দ্বাপরযুগের শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বহু দৃশ্য দর্শন করাইয়া পাণ্ডাঠাকুরেরা ভক্ত যাত্রিগণের হৃদয়ে ভক্তি উদ্দীপিত করিয়া থাকে। “আশীখাম্বা” নামক যে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলাম, তাহাই নাকি প্রাচীন নন্দ-ভবন। এই ভগ্ন অট্টালিকার ভিতরে কয়েকটি অংশ ‘যশোদার সূতিকাগৃহ, কৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান ইত্যাদি নামে অভিহিত দেখিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী পরিত্যক্ত মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী

আওরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে নন্দ-ভবন ভগ্ন হইয়া এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাঁচ সারিতে ৮০টী থামের উপর এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা অদ্যাপিও 'আশীখাম্বা' নামে পরিচিত। এই স্তম্ভ-নিচয়ের কারুকার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, হিন্দু মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়াই এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইাছিল। হায়! হিন্দুর কত মহিমাময়ী কীর্ত্তিই যে এইরূপ ধ্বংসের পথে গমন করিয়াছে, তাহার ইতিহাস সংকলন করাও এখন কঠিন। মহাবনে আরও দুই একটী দেবমন্দির দর্শন করিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় যে তাহার কোনটি উল্লেখ যোগ্য নহে, সেজন্যই উহাদের বর্ণনায় ক্ষান্ত রহিলাম। মহাবন হইতে চারিক্রোশ দূরে দাউজী অবস্থিত।

দাউজী।

দুইধারে বহু সুন্দর সুন্দর প্রান্তর, তাহার মধ্য দিয়া এক্কা ছুটিয়া চলিল। মধ্যাহ্ন রবির খর-কিরণ চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত শোভায় শোভান্বিত। নাগরিক শোভা-সম্পদের মধ্যে এতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ এই পল্লী-পথের শ্যাম সৌন্দর্য্যের সবুজ-চিত্র নয়নের উপরে সজীবতার নবীন শোভা ধরিয়া দিতে ছিল। দূরে—আরো দূরে প্রান্ত-নিলীন গ্রাম-সমূহের সীমারেখা। মাঠে-মাঠে শস্য-সম্পদ্, বেশ একটু সুন্দর বোধ হইল। বাঙ্গালায় শ্যামল তরুছায়া-সমাচ্ছন্ন হাস্যময়ী প্রকৃতি সুন্দরীর যৌবন-সৌন্দর্য্যের স্নেহ-কোমলতার পরিবর্ত্তে এখানকার প্রৌঢ়া শোভা কতকটা নূতন, দেখিবার ও উপভোগের বিষয় বটে। কতক্ষণ পরে আমরা বলরাম মন্দিরের অর্থাৎ দাউজীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মহাবনের মত এখানেও বহু ছোট ছোট বালকগণ পশ্চাতে লাগিল। 'দে বাবুজী একটা পয়সা দে' এমনি কোমল সুরে ইহারা এই ভিক্ষা প্রার্থনা করে যে তাহাতে হৃদয় আপনা হইতেই দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। কঠোর ব্যবহার করিতে প্রাণে আঘাত লাগে।

আমরা দেবমন্দিরের নিকট পঁহুছিবামাত্রই পাণ্ডাঠকুরেরা আসিয়া বেড়িয়া ধরিল, কিন্তু তাহাদিগকে বড় একটা আমল না দিয়া নিজেরাই দেব-দর্শনে চলিলাম। তাহাদের স্বার্থান্ধ-অভিশাপ-লোহিত চক্ষু ও নানাপ্রকার অসম্বন্ধ প্রলাপ বড় একটা গ্রাহ্য করিলাম না, কারণ আমরা দলে নিতান্ত কম



মহাবন ।

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

ছিলাম না। এখানে দেখিবার মধ্যে ক্ষীর-সমুদ্র নামক একটী পুকুর ও অন্যান্য কতকগুলি প্রাচীন মন্দির ও ধ্বংসাবশেষ আর দাউজীর প্রধান মন্দিরমধ্যস্থ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত বলরামের বৃহৎ মূর্ত্তি ও গৃহের এক কোনে স্থিত রেবতী দেবীর মূর্ত্তি; এখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরও আছে। দাউজীতে দেখিবার বিশেষ কিছু না থাকিলেও প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদে ইহা নিতান্ত হীন নয়। প্রায় ঘণ্টা তিনেক বেলা থাকিতে দাউজী পরিত্যাগ করিলাম এবং সন্ধ্যার ক্ষীণতম অন্ধকারের মধ্যেই মথুরা নগরীতে আসিয়া উপনীত হইলাম। যদিও মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, মহাবন প্রভৃতি তীর্থস্থল সমূহে প্রাচীন চিহ্ন বিশেষ বিদ্যমান নাই, তথাপি স্থান মাহাত্ম্যে ও অতীতের মধুর স্মৃতির কবিত্বপূর্ণ কাহিনীতে দর্শকের চিত্ত এক মোহময় স্বপ্ন আবরণে এমনি আবৃত করিয়া তোলে যে তাহাকে আর কোন বিষয়ই ভাবিতে দেয় না। একথাও ঠিক্ যে সুদূর অতীতের উজ্জ্বল দৃশ্যের ছবি বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার পরেও বর্ত্তমানে তেমনি সুন্দর দেখার আশা অসম্ভব ও বাতুল কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

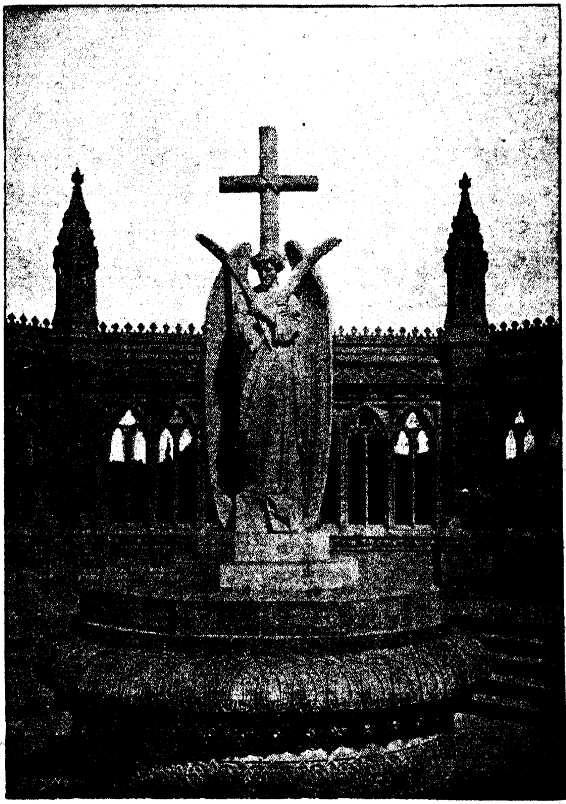
কানপুর।

কানপুর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটী প্রধান জেলা ও নগর। ইহা পুণ্যতোয়া গঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। কানপুর প্রাচীন নগরী নহে, কাজেই এখানে দেখিবার মত প্রাচীন অট্টালিকা ও দুর্গাদি কিছুই নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ইংরেজরাজের একটী প্রধান স্কন্ধাবার বা মিলিটারী ষ্টেশন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহা চতুর্থ নগর—প্রয়াগ-সঙ্গম হইতে ১৩০ মাইল দূরে এবং সমুদ্রগর্ভ হইতে ৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। রেল ষ্টেশনে পঁহুছিয়াই আমরা শীঘ্র নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম, শুনিলাম ষ্টেশন হইতে নগর প্রায় দুই মাইল দূর হইবে। দর্শনীয় স্থান-সমূহের মধ্যে সৈনিকাবাস, সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতি-নিদর্শন-উদ্যান, গঙ্গার পয়-প্রণালী ইত্যাদিই বিখ্যাত। কানপুরের নামোৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণের মধুমাখা হিন্দী নাম কাহ্নাই (কানাই) বা কাহ্ন (কানু) হইতে হইয়াছে—সেকালের 'কাহ্নপুর'ই এখন বর্ত্তমান 'কানপুরে' পরিণত হইয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পৈশাচিক অত্যাচার-চিহ্ন,—নির্দ্দোষ ইংরেজ নরনারীর শোণিতরেখা এখনও ইহার সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়া অর্দ্ধশতাব্দীর একটা ভীষণ নৃশংসতার কাহিনী আজিও জাগাইয়া রাখিয়াছে। কানপুর ইংরেজের হৃদয়ে ভীষণ শোকের উদ্দীপন করিয়া থাকে। সেই জন্য ইংরাজরাজ এই নৃশংসতার ইতিহাস চিরজাগরুক করিবার জন্য ঘটনাস্থানগুলিতে উদ্যান, স্তম্ভ, প্রস্তরপ্রতিমা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। আমার এই স্মৃতি-নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে ধারণা কিন্তু অন্যরূপ;—আমার মনে হয়, সৎকীর্ত্তির নিদর্শনেই হৃদয় প্রশান্ত ও প্রশস্ত হয়, মন সৎপথে ধাবিত হয়, কিন্তু মনুষ্যতার অবনতির পরিচায়ক বর্ব্বরতার, নিষ্ঠুরতার, পাপের নিদর্শন এতটা জ্বলন্ত করিয়া জাগাইয়া রাখিলে পাপে ঘৃণাবুদ্ধি অপেক্ষা মনুষ্যত্বের উপর ঘৃণা, এক জাতির প্রতি অন্য জাতির চিরদ্বেষ আনিয়া ফেলে। ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের জন্য এরূপ নিদর্শন উপকার অপেক্ষা অপকারের মাত্রা বেশী করে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কানপুরের স্মৃতি-নিদর্শন স্থাপন করা মানবহৃদয়ের উচ্চভাবের পরিচায়ক নহে,—ইহাতে

ঘৃণা, ক্রোধ, দ্বেষ ফুটাইয়া তুলে, জাতিতে জাতিতে মিলিতে দেয় না, অবিশ্বাস ও প্রতিহিংসা উৎপাদন করে, ক্ষমার শান্তি ইহাতে আসিতে দেয় না। সম্প্রতি কলিকাতায় লালদীঘীর কোণে অন্ধকূপহত্যার স্মৃতি-নিদর্শন স্তম্ভটীও এইরূপ জাতিগতাবদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া তুলিবার আর একটী স্থূলতর ইন্ধন হইয়াছে। যে ভারতের সর্ব্বত্র দয়া-দান-ভক্তির নিদর্শনে ছাইয়া রহিয়াছে, সেই ভারতে মানবের নিষ্ঠুরতার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য এরূপ চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা আমার মতে নিতান্ত বিসদৃশ। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। স্নান ও আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া আমরা অপরাহ্নে নগর দেখিতে বাহির হইলাম, প্রথমেই 'মেমোরিয়াল' উদ্যানে যাওয়া গেল। ইহা 'ক্যাণ্টনমেণ্ট' বা সেনাবাসের নিকটে অবস্থিত। কানপুরের সেনাবাস গঙ্গার দক্ষিণ তীরে প্রায় ১০ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। সৈনিক-বিভাগের কর্ম্মচারী এবং ইউরোপীয় ব্যতীত এই সেনাবাসেই প্রায় ৬০,০০০ হাজার লোক বাস করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ৭০০০ হাজার সৈন্যের বাসোপযোগী স্থান আছে। ইহা হইতেই পাঠকবর্গ এই সেনাবাসের বিরাটত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উদ্যানের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে সিপাহী-[illegible]
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস না দিলে [illegible]
পারিবেন [illegible]

—তৎপরে দিল্লীর দিকে চলিয়া যায়। নানাসাহেবও বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে হুইলারের মাটীর দুর্গ আক্রমণ করেন। বিদ্রোহীদের প্রথম দুই তিন বার আক্রমণ বৃথা হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে বিদ্রোহিগণের হস্তে স্বল্পসংখ্যক ইংরেজসৈন্য পরাস্ত ও বিনষ্ট হয়। ২৬শে জুন নানাসাহেব হতাবশিষ্ট ইংরেজ-সৈন্যদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, যদি তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে, তিনি কোনরূপ বাধা না দিয়া, তাহাদিগকে এলাহাবাদ যাইতে দিবেন। নানাসাহেবের এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ৪৫০ জন ইংরেজ নরনারী ও শিশু এলাহাবাদ যাইতে প্রস্তুত হইয়া অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক কানপুরের সতীচোরার ঘাটে নৌকায় আরোহণ করিল। সকলের নৌকায় আরোহণ করা হইয়াছে এবং নৌকাগুলিও এলাহাবাদের দিকে রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়ে তীরস্থ বিদ্রোহী সৈনিকেরা হঠাৎ গুলি-বৃষ্টি করিয়া এই হতভাগ্য আরোহীদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিল। নদীর উভয় কূল হইতেই অজস্র গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গুলির আগুনে একখানা নৌকায় আগুন লাগিয়া ডুবিয়া গেল, পুরুষেরা কেহ নদীতে ঝাঁপাইয়া
... প্রাণত্যাগ করিল। এই নৌকার আরোহিগণের
... ডিলাকস, প্রাইভেট মর্ফি
... নৌকা-
...দা

কাণ্ড হয়, সেখানেই বিদ্রোহ দমনের পর গভর্মেণ্ট স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ও তাহারই নাম হইয়াছে "কানপুর মেমোরিয়াল গার্ডন্"।



মেমোরিয়েল ওয়েল, কানপুর।

ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত আদেশ-পত্র বা 'ছাড়' ব্যতীত এই উদ্যানে প্রবেশ নিষেধ। আমরা আদেশ-পত্র সংগ্রহ করিয়া উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই উদ্যানটী গঙ্গা-তীরে অবস্থিত। যে কূপের মধ্যে মৃত

ও মুমুর্ষু নরনারীদিগকে হত্যাকারিগণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, এখন সেই কূপের উপরে একটী স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারই পার্শ্বে একটী সমুন্নত বৃত্তাকার বেদীর উপরিভাগে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত পক্ষবিশিষ্ট ইউরোপীয় কল্পনার এক স্বর্গবিদ্যাধরীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই রমণীমূর্ত্তি দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া শোকভরে, কারুণ্যপূর্ণ নতনেত্রে চাহিয়া আছে, হস্ত দুইটী বক্ষের উপর রক্ষিত। মূর্ত্তিটীর সর্ব্বাঙ্গে ভাবে ও ভঙ্গিমায় শোক ও করুণা উছলিয়া পড়িতেছে! চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রস্তরের রেলিঙের অভ্যন্তরে মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটি দর্শনমাত্র দর্শকের হৃদয়ও শোকে ও সমবেদনায় করুণা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠে। স্তম্ভের পাদদেশে উভয় পার্শ্বে বিদ্রোহ-কালে নিহত ইংরেজগণের সমাধিগুলি বিদ্যমান। নানাবিধ সুন্দর-সুন্দর লতা ও ফুল সমাধি-গাত্র বেড়িয়া রহিয়াছে। স্তম্ভগাত্রে ইংরাজীতে খোদিত আছে "বিঠুরের বিদ্রোহী নানা ধুন্দুপন্থের দল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে এই স্থানের বহু ইউরোপীয়কে বিশেষতঃ ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুকে অন্যায়রূপে বধ করিয়া এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল।" এই শোক নিদর্শন ব্যতীত ফুলের চৌকায়, লতাকুঞ্জে সুশোভিত উদ্যানের অপরাংশ বড় মনোরম। বেড়াইবার কঙ্করময় সুবিন্যস্ত পথগুলি বড় প্রীতিপ্রদ। গভর্ম্মেণ্ট অতি যত্নে এই সুন্দর উদ্যান রক্ষা করেন। রক্ষাণাবেক্ষণের ভার এক জন ইংরাজ উদ্যান-রক্ষকের উপর আছে। তাঁহার অধীনে একদল ইংরেজ প্রহরীও আছে। উদ্যানের সৌন্দর্য্য-রক্ষণার্থ গভর্মেণ্টের বার্ষিক ৫০০০ পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। স্তম্ভ ও করুণাময়ী-মূর্ত্তিটি ব্যতীত এই উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে একটী গির্জ্জাও আছে। বাগানে বেড়াইয়া হৃদয়ে একটা বিষাদের ছায়া লইয়া মেমোরিয়াল গির্জ্জা দেখিবার জন্য উহার ভিতরে গেলাম। গির্জ্জাটি কারুকার্য্য খচিত। উহার উচ্চ চূড়া সহরের মধ্যে বহুদূর হইতে দেখা যায়। উহার প্রাচীর গাত্রে কত শোক-লিপি—মাতা-পিতা পুত্রের জন্য—পতি স্ত্রীর জন্য—স্ত্রী স্বামীর নিমিত্ত হৃদয়ের শোক-নিঃসৃত তপ্ত-শোণিতদ্বারা এই স্মারক-লিপিগুলি লেখাইয়া, শান্তিলাভ করিয়াছেন!—প্রথম দিন

মেমোরিয়েল ওয়েল।

অপরাহ্নে এই সকল দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল—আর এ সমুদয় শোক-চিহ্ন দেখিয়া হৃদয়ও এত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল যে, বাসায় ফিরিয়া আসিয়াও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মুহ্যমান থাকিতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রত্যূষে নগর দেখিতে বাহির হওয়া গেল,—এবং প্রথমেই গঙ্গার খাল দেখিব বলিয়া যাত্রা করা হইল। হরিদ্বার হইতে বাঁধ দিয়া গঙ্গার একাংশ হইতে একটী জল-স্রোত সোপানে সোপানে নামাইয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশলের সহিত সমতল দেশে আনা হইয়াছে এবং তাহাকেই কানপুরের নিম্নে আনিয়া গঙ্গার সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খালটি ৪ শত মাইল দীর্ঘ। কানপুরের নিম্নে ইহা কটীদেশের অধিক গভীর নহে। এই খাল (Ganges canal) নির্ম্মাণ করিতে দুই ক্রোর টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখন আর ইহাকে খাল বলা চলে না, যেন এক স্বতন্ত্র উপনদী কত পর্ব্বত, প্রান্তর, দেশ উত্তীর্ণ হইয়া, কতদেশের অন্ন-ব্যবস্থা করিতে-করিতে কানপুরে আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে। এই খালের মুখের নিকটে উভয় পার্শ্ব ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী দ্বারা বাঁধাইয়া দেওয়াতে ইহাকে আরও শোভাময় করিয়া তুলিয়াছে। এই খালের এক পার্শ্বে একস্থানে একটা মাঠের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ক্ষেত্র দেখিলাম। এইখানে বিবি আজিজন মুসলমান-পতাকা প্রোথিত করিয়া বিদ্রোহের সময় স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে পিস্তল হস্তে সৈন্য চালন করিয়াছিলেন। খাল দেখিয়া সতীচৌরার ঘাট দর্শন করিলাম। এই ঘাট হইতেই অসহায় ইংরেজ নরনারীর প্রতি গোলা বর্ষিত হইয়াছিল। এই ঘাট এখন নিষ্ঠুরতার স্মৃতি ভূমি হইলেও—এখানে আরও যে মহিমাময়ী স্মৃতি বর্ত্তমান আছে, তাহা ইহার নাম হইতেই অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্ব কালে গঙ্গাতীরে এই ঘাটেই সতীদাহ হইত। কত সহস্র সহস্র সতীদেহ বিমল যশ ও পুণ্যস্মৃতি রাখিয়াএখানে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে!—সেই পুণ্যবলেই নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত দৃশ্যের স্থান হইলেও আজিও ইহার নামেও পরিচয়ে সেই শুভ্রপুণ্য ও যশের সংবাদই পাওয়া গিয়া থাকে! এই ঘাটের ক্ষুদ্র মন্দিরটি কিন্তু এত বিপ্লবেও নষ্ট হয় নাই। ইহার পর আমরা 'শাহ্ বিহারীলালের

সতীচৌরা ঘাট।

ঘাট' দেখিতে গেলাম। নদীতীর-নদীগর্ভ হইতে অতি উচ্চ—প্রায় কাশীর মত। এখান হইতে প্রায় ৫০ ফুট নামিয়া গেলে, গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে পারা যায়। ঘাটের আর সে শোভা নাই। ধনী বণিক্ বিহারীলাল লক্ষ-লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে যে প্রশস্ত সোপানাবলী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার একখানি পাথরও আর এখন স্বস্থানে নাই। ঘাটের উপর যে সুদৃশ্য হিন্দু-মন্দিরশ্রেণী ছিল, তাহাও এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই ধ্বংস দেবদ্বেষী মুসলমানের হাতে হয় নাই। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই ঘাটে নৌ-সেতু ছিল। গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সেনাদল এই সকল দেবমন্দির আশ্রয় করিয়া নৌ-সেতু আক্রমণ করে। ইংরাজ-সেনাপতি সার্ কলিন দ্বিতীয়বার লক্ষ্ণৌ যাইবার পূর্ব্বে এই মন্দির-গুলি গোলার আঘাতে রাবিশে পরিণত করিয়া চলিয়া যান। নিরীহ দেব-পূজক মন্দিরের অধিকারী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া মন্দিরগুলি রক্ষা করিতে অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি নৌ-সেতু সুরক্ষার জন্য সামরিক প্রয়োজনে বহুদিনের বিস্মৃত কালাপাহাড়ের লীলার পুনরাভিনয়ের আদেশ দিয়াছিলেন। বহুদিন ঘাটটি অব্যবহার্য্য ছিল, এখন কিছু কিছু সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আসিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কানপুর প্রাচীন সহর নহে—কাজেই প্রাচীন দর্শনীয় অট্টালিকা বা প্রাসাদ-মন্দিরাদি এখানে এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের ও ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যায় নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলা কোরায় যুদ্ধে পরাজিত হইলে এই নগর নির্ম্মিত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবের নিকট ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান প্রাপ্ত হইলে, ইহা একটী প্রধান জেলা বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৮৫৭ সনের সিপাহী-বিদ্রোহের ঘটনা ব্যতীত এস্থানে আর কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে নাই।

বিঠুরে এখনও নানাসাহেবের বাড়ীর ভগ্নাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে কানপুর একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-প্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে। এখানকার চর্ম্মের কারবার বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'কানপুরী জুতা' এই 'স্বদেশীর' দিনে কলিকাতায় বসিয়াও আমরা আদরে গ্রহণ করি।

এই ক্ষুদ্র নগরে যেমন বহু সংখ্যক কল বিদ্যমান আছে, বঙ্গের আর কোথাও তেমন নাই। এ সমুদয় কল-কারখানার মধ্যে উলেন মিল, মিউয়ার মিল, এলগিন মিল, কানপুর কটনমিল, ভিক্টোরিয়া মিল ও কুপার এলেন সাহেবদের জুতা ও চামড়ার কারখানা, গভর্মেণ্টের ঘোড়ার সাজের কারখানা, চিনির কল, ময়দার কল ও সূতার কল ইত্যাদি প্রধান। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, আউডরোহিল খণ্ড এবং বোম্বাইবরোদা রেলওয়ের ইহা একটী সংযোগ (Junction) ষ্টেসন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা কানপুর ত্যাগ করিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি,—এখানে বাঙ্গালীদিগের যত্নে সাধারণের জন্য 'দুর্গাবাড়ী' নির্ম্মিত হইয়াছে, কালীবাড়ীও আছে। উভয় স্থলেই অতিথি-অভ্যাগতের থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

এটোয়া।

স্থানটির নাম দেশীলোকের মুখে শুনিলাম 'ইটাওয়া' বা 'ইটাবা'। ইংরাজীতে 'এটোয়া' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই বিদেশী বাঙ্গালী আমরা রেলগাড়ীর সময়-নিরূপক পুস্তিকাখানির কৃপায় 'এটোয়াই' বলিয়া থাকি। পশ্চিমের যে সকল স্থান স্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর জন্য সুপরিচিত এটোয়া ও তাহার মধ্যে একটী প্রধান। অনেকে জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন। অতি প্রত্যূষে গাড়ী আসিয়া এটোয়ায় পঁহুছিল। এক-দিনের বেশী এখানে থাকিব না, তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, কাজেই সরাইয়ের দিকেই ছুটিলাম; কিন্তু সরাইয়ের নিকট পঁহুছিয়া তাহার যে অবস্থা দেখিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কতকগুলি লম্বা লম্বা ইতরজনোচিত খোলার ঘর তাহাও আবার বহুকালের মধ্যে মেরামত হয় নাই। বাড়ীর মধ্যস্থলে সুবৃহৎ অক্ষরে রাশীকৃত আবর্জ্জনা? কি বীভৎস দৃশ্য। সেখানে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া, নগরের ইতস্ততঃ করিয়া বাসা ঠিক্ করিতেই বেলা প্রায় নয়টা হইয়া গেল। পাঠকবর্গের নিকট আমার একটা অনুরোধ যে তাহার যেন কখনো Railway guideএর লিখিত বর্ণনামত সর্ব্বত্রই ধর্ম্মশালা বা সরাইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প না করেন, তাহা হইলে অধিকাংশস্থলেই প্রতারিত হইবেন। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে এটোয়ার নগর ভাগ প্রায় এক মাইল দূর হইবে।

বাসায় আসিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করতঃ নগর দর্শনে বাহির হইলাম। ক্ষীণকায়া যমুনানদীর দক্ষিণতীরে এটোয়া নগর অবস্থিত। এটোয়া একটী ক্ষুদ্র নগর, অসমতল তরঙ্গায়িত উচ্চ ভূমির উপরে অবস্থিত। প্রথম দর্শনে বোধ হয় যে, ইহা কোনও পার্ব্বত্য প্রদেশ, কিন্তু ইহার নিকটের কথা ছাড়িয়া দাও, দূরেও কোনও পাহাড় নাই। নগরের নিম্নে ক্ষীণকায়া সলিলহীনা যমুনার কোন শোভা-সৌন্দর্য্যও নাই; কিন্তু নদীর শোভা না থাকিলেও নদীর ঘাটের শোভা অনেকটা সে অভাব পূর্ণ করিয়াছে। ঘাটগুলি পরিপাটিরূপে বাঁধান

এবং তাহার তটদেশে কতকগুলি শিবমন্দির বিরাজিত। এটোয়ার দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে একটী ভগ্ন দুর্গ, হিউমস্কুল, বারদ্বারী ও জুমা মসজিদ প্রভৃতি বিখ্যাত। প্রথমেই দুর্গ দেখিতে গমন করিলাম। দুর্গটি অতিশয় প্রাচীন। ইটাওয়া নগর ক্ষুদ্র হইলেও প্রাচীন-স্মৃতি-বিজড়িত। কথিত আছে যে, প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে সোমটিনামক একজন নৃপতি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যমুনার তীরে একটী উচ্চ স্থানের উপর সেই প্রাচীন কেল্লা অবস্থিত। রৌদ্রের প্রখর-কিরণে চারিদিক ঝলসিত হইয়া উঠিয়াছিল,—নির্জ্জন পথে, রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধদেহে উচ্চ স্থানে উঠিলাম, চারিদিকে জনমানবের চিহ্নও নাই; সব স্তব্ধ, সব নীরব, রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, নির্জ্জন পরিত্যক্ত স্থানটি খাঁ খাঁ করিতেছে! আমরা স্বেদ-সিক্ত কলেবরে ভগ্নদুর্গের নিকট পঁহুছিলাম। এক সময়ে যে ইহা সুন্দর ও সুদৃঢ় ছিল তাহা বর্ত্তমান ভগ্নাবস্থা হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায়। এখান হইতে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে একটা ভগ্নপ্রাচীরের নিকট উপনীত হইলাম। কত ঐতিহাসিক তত্ত্ব যে এই প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রাচীরের পার্শ্বস্থ সংকীর্ণ পথ দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একটী প্রাচীন ভগ্নোন্মুখ দুর্গদ্বারের নিকটে পঁহুছিলাম। স্থানীয় কিম্বদন্তী এইরূপ যে, পূর্ব্বে এই দুর্গদ্বারের উপর একটী প্রস্তর নির্ম্মিত বিকট মনুষ্যবদন স্থাপিত ছিল, হিন্দুগণ উহাকে নানা দুর্দ্দশা জন্মাইতে সক্ষম ভাবিয়া ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং সিন্দূর তৈলে সিক্ত করিয়া তাহার অর্চ্চনা করিত। এই দুর্গদ্বার উত্তীর্ণ হইয়া আমরা দুর্গের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত বারদ্বারী নামক একটী ক্ষুদ্র ইষ্টকালয় সমক্ষে উপনীত হইলাম। এই দালানটীর কেন যে 'বারদ্বারী' নাম হইল বুঝিতে পারিলাম না, কারণ আমরা গণনা করিয়া দশটীর বেশী দ্বার পাই নাই। বারদ্বারীর সৌধটিকে কিন্তু খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। এ স্থান হইতে চারিদিকের সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম প্রতীয়মান হয়। ঊর্দ্ধে অনন্তনীলগগন —সীমাহীন, লক্ষ্যহীন, প্রশান্ত, উদার আর নিম্নে নগরমধ্যে সবুজ-সুন্দর বৃক্ষাবলী ও ইতস্ততঃ অবস্থিত সৌধ-নিচয়ের ধবল চূড়া বড়ই মনোহর

দেখায়। যমুনার শীতল শীকর-সিক্ত সমীরণ এখানে আসিয়া ক্লান্ত পথিকের তপ্ত ললাটে শীতলকর স্পর্শ করিয়া যায়। যমুনা শ্বেত সৈকতের মধ্য দিয়া বক্রগতিতে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। তীরে উদাস সৌন্দর্য্যের সবুজ-ছবি। পার্ব্বত্য পথের ন্যায় উচুঁ নীচু পথ ঘাট। সেই সকল পথে কর্ম্ম-ব্যস্ত নরনারীর দলে-দলে গতায়াত এই উচ্চ স্থান হইতে যেন উৎসব-যাত্রার ন্যায় সুন্দর ও মনোহর দেখায়। আমরা এখানে বসিয়া অনেক্ষণ এই শোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। তৎপরে মহাদেবজীর মন্দির ও জুমা মস্‌জিদ দর্শন করিতে গেলাম। মহাদেবজীর মন্দিরটি প্রায় ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে জনৈক অর্থশালী বণিকের অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটী উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপের উপর মন্দিরটি বিরাজিত। জুমা মস্‌জিদটিতে তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছুই নাই, তবে শুনিলাম, উহা কোন প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংস ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। মসজিদটি মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন ;—উহার প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বহু সমাধি বিদ্যমান।

নগরের কথা।

এটোয়া একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা। মৈনপুরী সহর হইতে জজ সাহেব তিন মাস পর দায়রায় বিচারাদি করিতে আসিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ অন্য জেলার মতই আছে। এটোয়ার খাল দেখিতে তাদৃশ সুন্দর না হইলেও ইহার জল অত্যন্ত নির্ম্মল ও পরিষ্কার। রাজপথগুলি বড়ই পরিষ্কার ও জনতাহীন। নীরবে শান্তির কোলে বাস করিতে হইলে এবং নগর ও পল্লীর একত্র সমাবেশের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এটোয়া বড়ই প্রীতিপদ। এখানে হিউমস্কুল নামক একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, তহসিল কাছারী এবং চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। স্থানীয় মিউনিসিপাল উদ্যানটি বেশ মনোরম, কিন্তু উহার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রীগণ ব্যতীত অপরের প্রবেশ নিষেধ। এদেশের পুরুষগণ ধুতি, পায়জামা, চাপকান ও চোগা পরে, আর স্ত্রীলোকেরা ঘাগরা, আঙ্গরাখা ও চাদর ব্যবহার করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বলা বাহুল্য যে পুরুষেরা প্রত্যেকেই টুপি মাথায় দেয়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে খড়ম ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছি। এদেশের স্ত্রীলোকেরা বড়ই অলঙ্কার ওউল্কিপ্রিয়া। ইহারা হাতে, গলায়, বাহুতে, মুখে ও পায়ে অসংখ্য অলঙ্কার

পরিধান করে, তাহাতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরং আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভনীয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল। এখানে বাঙ্গালী একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজপথে দু' একজন বাঙ্গালীও দেখিয়াছি কি না তাহাও সন্দেহ।

এটোয়ার জলবায়ুর শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত সময় সময় স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বাঙ্‌লা দেশ হইতেও কেহ কেহ আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। এখানে দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য সুলভ। মৎস্য বেশী পাওয়া যায় না। হিন্দুস্থানীরা ডাল রুটি খাইয়াই উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকেন। যদিও মিষ্টান্ন এখানে বেশী রকমের দেখিলাম না, তথাপি রসনাপরায়ণ প্রত্যেকেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে এখানকার আহার্য্য মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি খুব সস্তা। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধরার গায়ে ব্যপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এটোয়া পরিত্যাগ করিলাম। স্থানীয় লোক সংখ্যা প্রায় ৩৯,২০০ হইবে। এটোয়া জেলায় এটোয়াই প্রধান নগর। এটোয়ার জুমামস্‌জিদটিকে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পঞ্চমশতাব্দীতে নির্ম্মিত বৌদ্ধ-মন্দিরের রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।

এলাহাবাদ।

হিন্দুর 'প্রয়াগ', মুসলমানের 'ইলাহাবাদ,' ইংরাজের 'আল্লাহাবাদ'—আকবরের 'ইলাহাবাস' দেখিব বলিয়া গাড়ীতে সমস্ত পথ যে উদ্বেগ ও আগ্রহ সহ্য করিতেছিলাম, গাড়ী ষ্টেশনে আসিবামাত্র তাহা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রয়াগের পুণ্যভূমিতে পাদস্পর্শ করিয়া ধন্য হইবার জন্য প্রাণ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সকলের অগ্রে গাড়ী হইতে নামিব এই আশায় পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া সতর্ক হইয়া দ্বারের নিকট বসিয়াছিলাম। গাড়ী থামিবামাত্র ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম, ভূমিতে পাদস্পর্শ করিয়া যেন প্রাণে শান্তি পাইলাম।

দারাগঞ্জের বাসা।

তাহার পর একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া দারাগঞ্জের দিকে চলিলাম। পরিচিত লোকের সাহায্যে পূর্ব্ব হইতে এখানে বাসা ঠিক করা ছিল, নতুবা এখানে বাসার জন্য ভুগিতে হইত না। এটোয়াতে সরাইএর যে দুর্দ্দশা দেখিয়াছি, শুনিলাম, এখানে তাহার ছায়াও নাই। এখানে ভাল ভাল ধর্ম্মশালা ও সরাই আছে, বিলাতী ধরণের হোটেল আছে এবং স্বতন্ত্র থাকিবার ইচ্ছা করিলে অল্প ভাড়ায় বাসা পাওয়া যায়। কর্ণেলগঞ্জের ধর্ম্মশালাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শুনিলাম। সরাইখানা বহু আছে। ষ্টেশনেই সে সকলের লোক থাকে ও যাত্রীদিগকে আক্রমণ করে। সুব্যবস্থা সর্ব্বত্র আছে, সে জন্য সর্ব্বত্রই থাকা সুবিধাজনক। বিলাতী হোটেলগুলি সহরের মধ্যে অবস্থিত। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের একশাখা ও ষ্টেশনের ধারেই কেলনার কোম্পানীর রিফ্রেশমেণ্ট, বাথ্ এণ্ড রিটায়ারিং রুম্‌সৃই প্রধান। যাহা হউক বাসার আশায় আমাদের আর মালিনী মাসীর অপেক্ষায় কোন বকুলতলায় বসিয়া থাকিতে হইল না। গাড়ী লইয়া একেবারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উঠিলাম। প্রাতঃকৃত্য স্নান ও আহারাদি সমাপন করিয়া বেলা তিনটার সময় নগর দেখিতে বাহির হইব, স্থির হইল।

তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে প্রবাসী বন্ধুগণের সঙ্গে নগর সম্বন্ধে অনেক কথা হইতে লাগিল। এই কথোপকথনপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম বর্ত্তমান নগর এখন দুই ভাগে বিভক্ত, প্রাচীন সহর ও নবীন সহর, প্রাচীন সহরের নাম এলাহাবাদ, নবীনের নাম ক্যানিঙ্ টাউন। ক্যানিঙ্ টাউনই ইংরাজ নির্ম্মিত সহর, এলাহাবাদের চৌরঙ্গী—ইংরাজ মহল্লা। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে কোন সহর ছিল না, ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম ছিল। বিদ্রোহী সিপাহীরা এই গ্রামে আশ্রয় লইয়া সহরের অধিবাসী ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া বিদ্রোহদমনের পর ইংরাজ রাজপুরুষেরা গ্রামটী জ্বালাইয়া দেন এবং সেই দগ্ধস্থানের উপর বিদ্রোহবিজেতা গভর্ণর-জেনারল লর্ড ক্যানিঙের নামে নূতন সহর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এখন ইহা সুবৃহৎ, সুপ্রশস্ত, রাজপথে, পথপার্শ্বস্থ পত্র-পুষ্প বহুল তরুশ্রেণীর শোভায়, ইংরাজবাসযোগ্য উদ্যান পরিবেষ্টিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাঙ্‌লা ও অট্টালিকামালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া মোগলবাদশাহের বিলাসক্ষেত্র, হিন্দুর ধ্বংসাবশিষ্ট গৌরবের সমাধি-স্তূপসদৃশ হাটবাজার অট্টালিকা পরিবৃত প্রাচীন নগরাংশকে শোভায় পরাস্ত করিয়া দিন দিন লোচনানন্দদায়ক হইয়া উঠিতেছে। কাশী, মথুরা, বৃন্দাবনাদির ন্যায় প্রয়াগও স্মরণাতীতকাল হইতে হিন্দুর তীর্থযাত্রার একটী প্রধান কেন্দ্র। কাশী, মথুরা, গয়া, সর্ব্বত্রই শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্যের সহিত ব্রহ্মার নামও শুনা যায়, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু প্রয়াগের ন্যায় ব্রহ্মার অধিকারের সুস্পষ্ট স্থান আর কোথাও নাই। কাশী যেমন শিবক্ষেত্রের প্রধান, পুরুষোত্তম যেমন বিষ্ণুক্ষেত্রের প্রধান, প্রয়াগ তেমনই ব্রহ্মক্ষেত্রের প্রধান। ইহাই ব্রাহ্মণাধর্ম্মের সূতিকাক্ষেত্র, এই স্থানই বৈদিকাচারের লীলাভূমি এবং এই স্থানই সকল তীর্থের মুকুটমণি, কারণ ব্রাহ্ম, শৈব ও বৈষ্ণব, ক্ষেত্রের সম্মিলন এই স্থানে, এবং এই স্থানেই প্রধান শক্তিপীঠ অবস্থিত, আবার এইখানেই পিতৃতীর্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। এই সকলের সঙ্গে আবার প্রাকৃতিকদৃশ্যের অতি উচ্চ আদর্শ গঙ্গাযমুনাসঙ্গম অবস্থিত। মানব-কল্পনায় এস্থানকে দেবস্থান ও বিচিত্র সৌধমালা ও উদ্যানাদি দ্বারা যতদূর শোভাময় করিতে হয় তাহা যুগে যুগে করা হইয়াছে।

ক্যানিঙ্ টাউন।

আবার ভগবৎকল্পনায় এখানে দুই বিপুলা নদীর সঙ্গম ঘটিয়া আরও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। নগরটি যুগযুগান্তরকাল হইতে যাত্রীসমাগমের জন্য বিখ্যাত, সুতরাং বিদেশী আসিলে আর এখানে কোন কষ্ট পায় না। থাকিবার ও আহারাদি করিবার কোন অভাব এখানে নাই তবে তীর্থ কলঙ্ক পাণ্ডা-দিগের অত্যাচার এখানে যে নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহা কাশীর 'কেশেল' বা মথুরার 'চৌবে' ও বৃন্দাবনের 'ব্রজবাসীর' ন্যায় নহে। সে সকল স্থানে পাণ্ডাদিগের মধ্যে অত্যাচারীর সংখ্যা যত অধিক, প্রয়াগে সে তুলনায় দুই আনা আছে কি না সন্দেহ, তবে যাহারা দুস্টস্বভাবের, তাহাদের সঙ্গে প্রাপ্যগণ্ডা মিটাইতে সময়ে সময়ে যাত্রিগণকে পুলিসের মধ্যস্থতা ও সহায়তা লইতে হয়, এতটা আবার আর কোথাও নাই। প্রতি দ্বাদশবর্ষে এখানে কুম্ভমেলা হয়। সূর্য্য যখন কুম্ভরাশিতে সংক্রমণ করেন অর্থাৎ মাঘ ফাল্গুনের মধ্যে তিথিবিশেষে সূর্য্য যখন কুম্ভরাশিতে প্রবেশ করেন সেই সময় কুম্ভরাশি যে দেশে অবস্থিতি করে, সেই দেশেই এ মেলা হয়। এক-স্থান হইতে দ্বাদশবর্ষান্তরে কুম্ভরাশি পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসে। সকল স্থলে মেলা হয় না। প্রয়াগ, হরিদ্বার, দ্বারকা প্রভৃতি কয়েক স্থানেই মেলার প্রবলতা খুব বেশী। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সর্ব্বাপেক্ষা ভিড় হয়। সঙ্গম স্নানের জন্য হিমালয়ের গুহাপ্রস্থিত সন্ন্যাসীরাও নামিয়া আসিয়া থাকেন! সন্ন্যাসীর দল ও স্নানযাত্রা দেখিতে অতীব বিস্ময়কর। বহু ধনী মঠের মোহান্তের অধীনে এবং বহু রাজা মহারাজার প্রদত্ত সাহায্যে হয়হস্তী আরোহণে তেজঃপুঞ্জকলেবর, উলঙ্গ, জটাজূটধারী বিশ ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর দল আসিয়া থাকে। অনেকের তপঃক্লিষ্ট, তেজোপূর্ণ দেহ দর্শনে হৃদয়ে ভক্তি বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠে! কুম্ভের সময়ে প্রয়াগে ৫।৬ লক্ষ লোকের আগমন হয়!—একেইতো স্মরণাতীতকাল হইতে বিশ্রুত তীর্থরাজ প্রয়াগের প্রতি হিন্দুর হৃদয় লইয়া সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার উপর এই সকল বিষয়ের কথোপকথনে ইহার অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিবার আগ্রহ এত বাড়িয়া গেল যে বাঙালীর অতিপ্রিয় 'তৈল-তাম্রকূট-সেবা' অতি সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া স্নান ও আহারে অতিমাত্র ত্বরা করা গেল।

আহারাদি সমাধার পর বেলা তিনটার সময় নগরভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। প্রথমেই ভারতবর্ষের নবীন রাজা, সভ্যতার নবীন আদর্শ-ইংরাজ-রাজের নবনির্ম্মিত নূতন সহর ক্যানিঙ্‌টাউনের দিকেই অগ্রসর হইলাম।

হাইকোর্ট।

এখানে বোর্ড, হাইকোর্ট, ছোটলাটের বাড়ী, মুইর কলেজ, আলফ্রেড পার্ক, গ্রিণ পার্ক প্রভৃতি দেখিবার বিষয়। কলিকাতার হাইকোর্টের গাম্ভীর্য্য ও শোভার তুলনায় এখানকার হাইকোর্ট অনেকাংশে হীন। ছোটলাটের বাড়ীটি বাহির হইতে দেখিতে কোনই আকর্ষণ নাই। দূর হইতে আলফ্রেড্ পার্ক সম্বন্ধে যতটা শুনিয়াছিলাম, ততটা কিছু দেখিলাম না; তবে বাগানটী অতি বৃহৎ, প্রায় ৪০২ বিঘার উপর নির্ম্মিত। গাছপালা, ফুলের চৌকা, কঙ্করময় রাস্তা, প্রশস্ত দূর্ব্বাক্ষেত্র, ক্রীড়াস্থান ইত্যাদি সমস্তই সুবিন্যস্ত।

আলফ্রেড পার্ক।

বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অফ এডিনবরা সর্ব্বপ্রথম যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহারই নামে এই উদ্যানের নামকরণ হয়। এই উদ্যান রক্ষার জন্য গভর্মেণ্ট বার্ষিক দশহাজার টাকা ব্যয় করেন। ইংরাজ পরিদর্শক ও উদ্যানতত্ত্ববিৎ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। বাগানটী সাধারণের উপভোগ্য স্থান, তবে প্রাচীন সহর হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া দেশীয় লোকের ভাগ্যে ইহার উপভোগ প্রায় ঘটে না। উদ্যানটীর মধ্যে প্রস্তরগঠিত সিংহাসনে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাই এই উদ্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তু।

ভিক্‌টোরিয়া মূর্ত্তি।

এই পার্কের সম্মুখেই ইউনিভার্সিটী হল ও মুইর কলেজ, দুইটীই এক অট্টালিকার অন্তর্গত, এখানকার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট মুইর সাহেবের নামানুযায়ী ইহার নাম মুইর কলেজ হইয়াছে। সেনেট হাউসের বিশাল গম্বুজ ও তৎসংলগ্ন মধ্যস্থলে অবস্থিত উচ্চ মিনার দূর হইতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

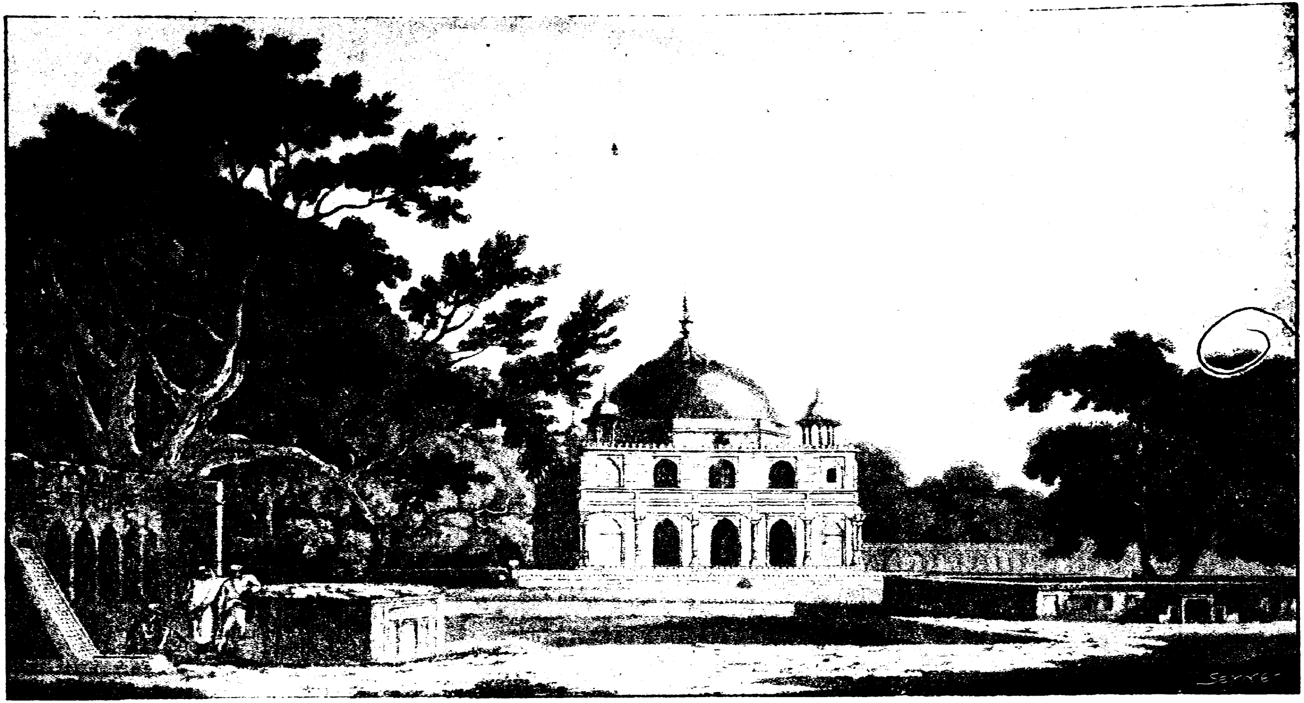
মুইর কলেজটী স্বদেশীয় রাজন্যবৃন্দের বদান্যতার ফল স্বরূপ নির্ম্মিত বলিয়াই ইহার প্রতিপত্তি বেশী বলিতে হইবে। প্রায় চৌদ্দ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অট্টালিকাটী প্রস্তরনির্ম্মিত, একপার্শ্বে একটী উচ্চ ও কারুকার্য্য

মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ।

বিভূষিত চতুষ্কোণ মিনার, দুই দিকে দুইটী গম্বুজ উহার মধ্যে শব্দ করিলে প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। প্রত্যেকটী স্তম্ভ ও খিলান ইত্যাদি এইরূপ সুন্দর-ভাবে নির্ম্মিত যে দর্শন করিলে নির্ম্মেতাগণের শিল্পকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। গৃহ মধ্যে এবং বারান্দার অঙ্গনে 'দ্বাদশ রাশি' চিহ্ন প্রভৃতি শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা এইরূপ সুন্দর ও সুনিপুণ-ভাবে অঙ্কিত যে সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কলানৈপুণ্যের জন্য বিস্মিত হইতে হয়। সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে আমরা Green Park বা সবুজিয়া বাগ দেখিতে গমন করিলাম। এই উদ্যানটী কৃত্রিমতার সহিত অকৃত্রিমের প্রিয় সম্মিলনে বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। দেখিলাম এক পার্শ্বে বৃক্ষলতাদির ঘন সমাবেশে অরণ্যের অনুকৃতি করা হইয়াছে, এইটী দেখিতে বেশ। তবে উহার মধ্যে সহজেই অস্বাভাবিকত্বের ছাপটুকু চক্ষে ধরা পড়ে। পূর্ব্বে উহার মধ্যে বন্য মৃগ মৃগী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল—উহারাও স্বাধীনভাবে চড়িয়া বেড়াইত, পরিশেষে সাহেব মেমদের প্রতি অত্যাচার করিবার দোষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন এলাহাবাদে দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান। (১) খসরু-বাগ (২) এলাহাবাদের সেতু (৩) দুর্গ (৪) ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম (৫) বেণীঘাট (৬) অক্ষয় বট (৭) অশোক লাট ইত্যাদি। ক্যানিং টাউন হইতে ফিরিবার পথে 'খসরুবাগ' পাওয়া গেল, তখনও বেলা থাকায় আমরা এই দিন উহা দেখিতে নামিলাম। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমরা 'খসরু-বাগে' উপনীত হইলাম। এ স্থানে পিতৃবিদ্রোহী জাহাঙ্গীর তনয় খসরুর সমাধি বিদ্যমান; তাঁহার নাম হইতেই ইহার বর্ত্তমান নাম হইয়াছে, কিন্তু উদ্যানটী তাঁহার পিতামহ বাদশাহ্ আকবরের নির্ম্মিত। তিনি যখন এলাহাবাদে রাজধানী স্থাপনের কল্পনা করেন, সেই সময় এখান-কার লাল পাথরের কেল্লা ও এই উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। এই উদ্যানটী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, বড় বড় গাছ ও ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীর আকবর বাদশাহের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মানসিংহের ভগিনী অম্বর রাজ দুহিতার গর্ভে খসরু জন্মগ্রহণ করেন।

খসরু-বাগ।



খস্রুর সমাধি — এলাহাবাদ।

দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্তির লোভে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এস্থানে বন্দী অবস্থায় থাকেন এবং পরিশেষে ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে এখানেই মানবলীলা সংবরণ করেন।

উদ্যান মধ্যে তিনটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধির মধ্যে খসরু, পরবেজ এবং সম্রাটের মাড়োয়ারী বেগম অর্থাৎ খসরু-জননী অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত আছেন। খসরুর সমাধিটি অষ্ট কোণ। ইহার বহির্ভাগে বেশ কারুকার্য্য আছে। ভিতরে চিত্রাবলীর রঙ্ এখনও সর্ব্বত্র উঠিয়া যায় নাই। খসরু বাগের নিকটে বাদশাহী সরাইখানা পড়িয়া আছে। ইহার প্রশস্ত অঙ্গনে এখন প্রত্যহ মাছ তরকারীর বাজার বসে। ঘরগুলি কিন্তু এখনও বাসোপযোগী আছে। এখানকার ইঁদারাটি বড় ভাল। তলদেশ হইতে কূপমুখ-সমস্তই ইট দিয়া বাঁধান। পার্শ্বদেশ দিয়া কূপ মধ্যে জলের কিনারা পর্য্যন্ত যাইবার সিঁড়ি আছে। খসরু জননীর সমাধিটি অপর দুইটী হইতে একটু বিশেষ ভাবাপন্ন। ইংরাজেরা এক সময়ে এই সমাধি গৃহের দ্বিতলের হলে বিলিয়ার্ড খেলিবার আড্ডা করিয়াছিলেন। মৃত রাজ্ঞীর কবরের প্রতি এতটা উপেক্ষা ও অসম্মান দেখান ভাল হয় নাই! ইহা ব্যতীত আর একটা প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর অট্টালিকা আছে—উহা কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় না। উহা এখন শূন্য পতিত রহিয়াছে। ইংরাজ রাজের আলফ্রেড পার্ক অপেক্ষা খসরুবাগের জমী অল্প হইলেও উদ্যান রচনার কৌশল ও পারিপাট্য এই বাদশাহী বাগানেই অধিকতর মনোরম ও কৌশল সম্পন্ন বলিয়া মনে হইল। এখানকার বৃক্ষলতাদিও যেন সেখানকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। যাহা হউক, গভর্মেণ্টের হস্তে খসরুবাগের শ্রেষ্টত্ব ও শোভা যে বজায় আছে, সেজন্য্য ধন্যবাদ না করিয়া থাকা যায় না। এই কীর্ত্তি রক্ষা সংকল্পই ইংরাজ রাজের রাজোচিত মহানুভবতার নিদর্শন। এখানকার সমাধি মন্দিরগুলি যে এক সময়ে সুদৃশ্য ছিল, তাহা ইহাদের অভ্যন্তরস্থ লুপ্তপ্রায় চিত্রাবলী হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। খসরুবাগ আয়তাকার ক্ষেত্র। ইহার প্রবেশের তোরণদ্বার অতি সুদৃশ্য। খিলানটি অতি উচ্চ। হাওদা সমেত হাতী অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। কপাটে কবজা নাই। উপর নীচে কীলকে আবদ্ধ থাকিয়া

দরজা খোলে ও বন্ধ হয়। কপাট জোড়াটী ৩০০ শত বৎসরের পুরাতন, কিন্তু আজিও কালের সর্ব্বচূর্ণকর দণ্ডাঘাতে ইহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। খসরুবাগের প্রাচীন আমগাছ গুলি অতি বিখ্যাত। ইহার ফল আবার সহরে বিশেষ আদরে উচ্চ দরে বিক্রীত হয়। ইহার মধ্যে একটী গোলোকধাঁধা আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করিলাম। হৃদয়ে একটা নৈরাশ্যের ছায়া জানিনা কেন অজ্ঞাত ভাবে আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সমাধি ও শ্মশান ভূমি দর্শন করিলে অন্তর মধ্যে যে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস জাগিয়া ওঠে তাহা সহজে দূর হয় না। উচ্চ বিটপীশ্রেণী-পরিশোভিত, ছায়া-শীতল, নীরব স্থলে অশরীরি আত্মা বুঝি এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাতাসের সর্ সর্ শব্দে—পাতার কম্পনে যেন তাহারই নিশ্বাস, তাহারই গতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যে যায় সে আর ফিরিয়া আসেনা কেন? যে ফুল ঝরিয়া যায় সে আর ফোটেনা কেন! যে গান থামে—সে গান আর ঝঙ্কৃত হয় না কেন? যে প্রেমের স্বপ্ন, সোহাগে মিলাইয়া যায়, তাহা আর জাগেনা কেন? কে জানে বিধাতার একি এক অদ্ভুত নিয়ম!

"মধু নিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বারেবার
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে!"

মৃত্যু—তুমি কি সুন্দর!—মৃত্যু তুমি কি ভীষণ—মৃত্যু তুমি কি দাহক! মৃত্যু তুমি কি পুণ্য সংস্থাপক, অজ্ঞ আমরা বুঝি না তাই কাঁদি। হায় এ সংসারে এমন কে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ আছেন যিনি বলিতে পারেন

"কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যাজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে!
ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন?
অর্থ কি তার, কোথা এ ভ্রমণ?
চুপ করে থাকি সুধায় যখন
দেখে তুমি হাস বুঝি!

কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে
আমি যে তোমারে খুঁজি।”

সেদিন বাসায় ফিরিয়া হতভাগ্য খশ্রুর কথাই কেবল মনে হইতেছিল, মনে হইতেছিল—ধন জন গর্ব্বের বৃথা কাহিনী! হায় ঐশ্বর্য্য তৃষ্ণা,—হায় রাজসিংহাসন! কি মোহিনী শক্তিতেই তুমি মানবকে মোহান্ধ করিয়া ফেল যে ইহার প্রলোভনে লোক স্নেহের ভক্তির প্রেমের সকল সম্বন্ধ ভুলিয়া যায়, সকল বন্ধন ছিন্ন করে, আপনাদিগকে স্বার্থের দাস পশু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা পায় না।

রাত্রি সুখের ঘুম ঘোরে কাটিয়া গেল, ভোরের পাখী যখন ডাকিতে-ছিল—ঊষা সুন্দরী যখন তরুণ অরুণ কনক কিরণে আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া বলিতেছিলেন, ওঠ ওঠ নর নারী একবার আমায় দেখ, তখনি আমরা গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনের পর আবার নগর দেখিতে বাহির হইলাম। তখন পর্য্যন্ত রাজপথে তেমন একটা উদ্দাম কোলাহল জাগিয়া ওঠে নাই। আমরা ধীরে ধীরে যমুনার সেতুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এই সেতুটি দেখিতে বৃহৎ ও সুন্দর। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল বড়ই চিত্তাকর্ষক, ২০৫ ফুট অন্তর অন্তর ৯৫ ফুট উচ্চ চৌদ্দটী স্তম্ভের উপর এই পুলটি অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ৩২২৪ ফুট দীর্ঘ হইবে। সেতুর উপরিভাগ হইতে নিম্নস্থ যমুনা ও গঙ্গার মিলন দৃশ্য বড়ই সুন্দর—রজত সলিলা গঙ্গা নীল সলিলা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া সাগরে মিলিতে চলিয়াছেন! বক্ষে কত শত তরী। এই সেতুটি দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম তল দিয়া বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করে, আর দ্বিতীয় তল দিয়া লোকজন গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহার গঠন-নৈপুণ্য বাস্তবিকই ইংরাজ জাতীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার অপূর্ব্ব পরিচয়। এখান হইতে বেণীঘাট দর্শনে যাত্রা করিলাম।

যমুনার সেতু।

পথে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম যাইবার পথ পাইয়া আমরা প্রথমে তাহা দর্শন করিতে চলিলাম। যে স্থানে একদিন ঋষি ভরদ্বাজ বাস করিতেন এখন সে স্থানে কয়েকটি অর্দ্ধভগ্ন দেবালয় এবং ইষ্টক স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কোথায়

ভরদ্বাজের আশ্রম।

সেই সৌম্য তপোবন? যেখানে সহকার তরুসনে মাধবীলতার প্রিয় সম্মিলন, অশোকে পলাশে মধুর মিলন—কুরঙ্গ কুরঙ্গীর সুমিষ্ট সোহাগ—বিহগকণ্ঠের সুমধুর গান—বেদের মনোমোহন তান আর কোথায় সেই সৌম্য-নিকেতন? যেখানে রামচন্দ্র ও ভরতকে স্বদলে অভ্যর্থনা করিয়া ঋষিবর স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

এখানে একটী উচ্চ টিলার উপর একটী শিব মন্দির ও তাহার এক পার্শ্বে নিম্নস্থানে এক মন্দিরে মহাবীর, পার্ব্বতী ও অন্যান্য দেবতা দর্শন করিলাম। এই স্থানে এক বেদীর উপর সপ্তর্ষি সভা আছে। মূর্ত্তিগুলি অতি আধুনিক কিন্তু বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন মুখভাব বেশ লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিব মন্দিরের পার্শ্বদেশে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে ভূগর্ভস্থ একটী গৃহে প্রবেশ করিলাম, তাহাতে নারায়ণের মূর্ত্তি ও অপর কয়েকটী দেবমূর্ত্তি বিরাজিত আছে দেখিলাম। ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে আমরা দুর্গের পথ ধরিয়া দুর্গ দর্শন করিতে গেলাম। দুর্গটি সহর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের ঠিক মধ্যে দুর্গটি অবস্থিত। দুর্গের পাদমূল ধৌত করিয়া যমুনা ও ভাগীরথী কলনাদে বহিয়া যাইতেছে—আর তাহারি মাঝখানে অচল অটল মূর্ত্তিতে কালের ভৈরব সাক্ষী স্বরূপ দুর্গটি বিরাজিত। প্রাচীন কালে কোন্ হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয় তাহার ঠিক্ নাই, তবে সম্রাট্ আকবর বাদসাহ সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষের উপর বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান দুর্গ, দুর্গ প্রাকার, দুর্গ পরিখা, দুর্গদ্বার ও তন্মধ্যস্থ অট্টালিকাদি সমুদয়ই লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত। দুর্গের উপর হইতে গঙ্গা যমুনার সাদাকালো রেখা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই দুর্গ আরও সুন্দর—এবং আরও মনোহর ছিল, ইংরেজ রাজ ইহার উচ্চ উচ্চ স্তম্ভ সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে সমুদয়কে তাঁহাদের দুর্গের অলঙ্কার Bastion এ পরিণত করিয়াছেন। দুর্গের প্রধান দ্বার দিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম, বলা বাহুল্য যে এই দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলেও ছাড় সংগ্রহ আবশ্যক। দ্বারের উপরিভাগে বৃহৎ গম্বুজ তন্নিম্নে বিস্তৃত গোলাকার গৃহ। বিশপ হিবার ইহা দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে জগতের আর

দুর্গ।

কোথাও এত বড় সুদৃশ্য দ্বার নাই। আমরা দুর্গের ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া দর্শন করিলাম—তেমন বিশেষত্ব কিছুই দেখিলাম না। প্রসিদ্ধ অক্ষয় বট কেল্লা মধ্যস্থ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগর্ভে দর্শন করিলাম। শাস্ত্রানুযায়ী এই অক্ষয় বটমূলে যাঁহার প্রাণত্যাগ হয় তিনি তৎক্ষণাৎ রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন।

"বট মূলং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বলোকানতিক্রম্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥

(মৎস্যপুরাণ)

ঢালুপথে প্রদীপালোকের সাহায্যে আমরা অক্ষয় বট দর্শন করিয়াছিলাম।

অক্ষয় বট।

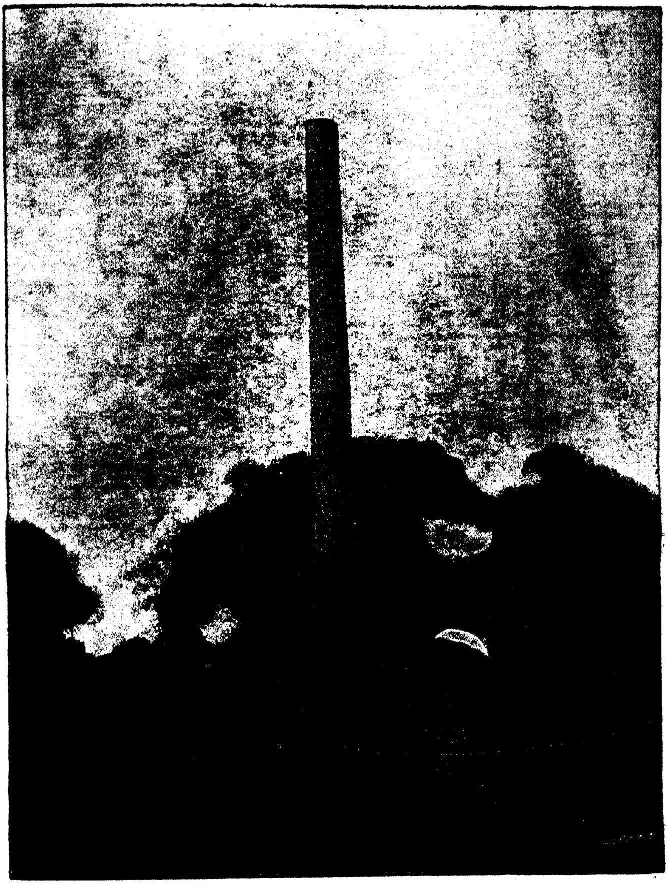
অনুমান পাঁচফুট উচ্চ এবং দুই ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটী কাষ্ঠের গুঁড়িকে 'অক্ষয় বট' বলিয়া পাণ্ডারা পরিচয় দিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়নচয়ঙ্, মহম্মদ গজনির সমসাময়িক আবুরিহান, ঐতিহাসিক আব্দুলকাদের প্রভৃতি প্রত্যেকেই এই বৃক্ষের নামোল্লেখ করিয়াছেন—এসমুদয় দ্বারা অনুমিত হয় যে এই স্থানে ১২০০ বৎসরের পূর্ব্বেও একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। সহর ক্রমশঃ উন্নত হইতে আরম্ভ করিলে পর বৃক্ষটী ক্রমশঃ মৃত্তিকাভ্যন্তরে ডুবিয়া গিয়াছিল। অবশেষে কোনও দৈবঘটনায় (সম্ভবতঃ যে হিন্দু রাজা প্রয়াগ-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার দ্বারা খননকালে উহার শুষ্ক মূলভাগ ও উহার পার্শ্বস্থ শিবমন্দিরাদি আবিষ্কৃত হয়। হিন্দুরাজত্বকালে হয়ত দুর্গমধ্যে এই অংশ পরিষ্কৃত রাখা হইয়াছিল। পরে কালক্রমে আবার ইহার উপর মাটি পড়িলে আকবরের দুর্গনির্ম্মাণের সময়ে ইহার পুনরাবিষ্কার হয় ও সম্ভবতঃ তাঁহার দ্বারাই শিবমন্দিরের উপরিভাগ দুর্গপ্রাঙ্গণের সহিত সমতল করা হয়, এবং বোধ হয় তিনিই অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার করাইয়া সিঁড়ি ও স্তম্ভাদি দ্বারা সুঠাম ও সুরঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। আকবর হিন্দুর প্রার্থনানুসারে এই স্থানটী একেবারে নষ্ট করেন নাই। ভূ-গর্ভকে পাণ্ডারা পাতালপুরী বলেন। পাতালপুরী হইতে বাহির হইয়া আমরা উপরে আসিলাম আকবরের সময়ও গাছটী জীবিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিক আবদুলকাদের এই গাছের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে এই বৃক্ষের উপর হইতে স্বর্গকাম যাত্রীরা ত্রিবেণী-সঙ্গমে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। এখন এই বৃক্ষের যে শুষ্ক

মূলাংশ দেখা যায়, তাহার পার্শ্বে প্রাচীরগাত্র হইতে জল ঝরিতেছে দেখা যায়। পাণ্ডারা ইহাকেই সরস্বতীর লুপ্তধারা বলিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমের ত্রিত্ব বজায় রাখিয়া দেয়। ফলে উহা বহির্দ্দেশস্থ যমুনারই জল; চুয়াইয়া ভিতরে পড়িতেছে এই মাত্র।

অক্ষয় বটের পার্শ্বে যে প্রাচীন শিবমন্দির ছিল, সেই মন্দিরের গর্ভ-গৃহ ও 'মোহন' (নাটমন্দির) এখনও এই ভূ-গর্ভে বর্ত্তমান। শিবলিঙ্গও আছেন—সঙ্গে সঙ্গে এখানে আরও অনেক দেবতার আশ্রয় হইয়াছে। এখানকার থামগুলি কারুকার্য্য বিশিষ্ট নহে। দেখিলে মনে হয়, উপরের মৃত্তিকার ছাদ ধরিয়া রাখিবার জন্য এই থামগুলি স্থাপিত। দুর্গকোণে এলাহাবাদের পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। এখান হইতে ভাগীরথীর অপর তীরে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর ও বর্ত্তমান ঝুঁসি দেখা যাইতেছে—দূরে যমুনার পারে রামায়ণ প্রণেতা সুবিখ্যাত হিন্দী কবি তুলসীদাসের আশ্রম নিকেতন দর্শন করিলাম। দুর্গকোণ হইতে আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটী সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত দীর্ঘ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এই অট্টালিকার একাংশে ২৭২ ফুট দীর্ঘ একটী হল আছে, বর্ত্তমান সময়ে ইহা অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহাই আকবরের উপবেশন গৃহ ছিল। এই অট্টালিকা ও এই গৃহ প্রাচীন হিন্দুপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্থাপত্য-কৌশলে নাকি তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। কমেণ্ডারইনচিফের অনুমতি ব্যতীত এই অট্টালিকায় প্রবেশ নিষেধ কাজেই আমাদের দেখা ঘটিল না।

অশোক লাট।

প্রধান দুর্গদ্বারের অনতিদূরে 'অশোকস্তম্ভ' বা অশোক লাট অবস্থিত। স্তম্ভটী উচ্চে ৪২ ফুট-৭ ইঞ্চ। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত ও মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই স্তম্ভের গাত্রে সম্রাট্ অশোক ও সমুদ্র গুপ্তের খোদিত লিপি আছে, অপর একপৃষ্ঠে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আত্ম সম্পর্কিত কতকগুলি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যে অশোক একদিন স্বীয় নির্দ্দয় ব্যবহারের জন্য 'চণ্ডাশোক' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, পরে তিনিই আবার স্বীয় ব্যবহার গুণে ধর্ম্মের পবিত্র পুণ্যস্পর্শে দেশে



অশোক স্তম্ভ বা অশোক লাট।

দেশে পুণ্য কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া 'ধর্ম্মাশোক' নামে আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা-ভাজন হইয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই অশোক লাটের মত সাতটী লাট আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে, একটী ফতেগড় নামক উপনগরে, একটী দিল্লীর বাহিরে ফিরোজশাহের কোট্‌লাতে, একটী ত্রিহুতের অন্তর্গত লৌড়িয়া নামক স্থানে, একটী কাশীতে গঙ্গাতীরে (এক্ষণে কাশী কলেজের প্রাঙ্গণে), একটী সারনাথে (নবাবিষ্কৃত) রক্ষিত

এবং আর একটী ভূপালরাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাঁচি নামক স্থানে অবস্থিত। বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্তম্ভগুলির স্বরূপ কেহ জানিত না! স্থানীয় লোকে কোথাও বিস্ময়বশে 'ভীমের গদা,' কোথাও রহস্যচ্ছলে 'পিপড়িয়াকা লউড়, অর্থাৎ পিপীলিকার লাঠি', কোথাও 'মহাবীর কা দণ্ড' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিত। শেষে মিঃ জেম্স্ প্রিন্সেপ সাহেব এই স্তম্ভের খোদিত লিপি-গুলির পাঠোদ্ধার করিয়া জগতের মধ্যে আপনাকে 'ধন্য' করিয়া গিয়াছেন। এলাহাবাদের এই 'অশোক লাটে' খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে অভ্যুত্থিত গুপ্তবংশীয় সমুদ্র গুপ্ত নামক নৃপতির পূর্ব্বপুরুষগণের নাম পরিচয় এবং স্বীয় দিগ্বিজয় কাহিনী বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনা-রোহণের কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা ভূতলে পতিত হইয়া গিয়াছিল, পরে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ উহা পুনঃ স্থাপিত করিয়া ইহার গাত্রে স্বীয় রাজত্বের আরম্ভ সূচক কথা পারস্যভাষায় খোদিত করাইয়া গিয়াছেন। অতঃপর

বেণীঘাট।

দুর্গ হইতে বাহির হইয়া 'বেণীঘাটে' চলিলাম। দুর্গের বাহিরে বিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তরের নদীসীমা অতি উচ্চ। সকল স্থান দিয়া নদীগর্ভে নামা যায় না। মধ্যে মধ্যে পথ আছে। সহরের মধ্য হইতেও কয়েকটি পথ আসিয়া এই উচ্চভূমি কাটিয়া নদীগর্ভে গিয়া মিলিয়াছে। বেণীঘাট গঙ্গার দিকে। নদীর জলের ধারে ও দুর্গের মাঠের মৃৎপ্রাকার ও দুর্গের প্রস্তরময় প্রাচীরের নিম্নে নদীর বেলাভূমি। দুর্গনিম্নে এই বেলায় অসংখ্য ধ্বজা প্রোথিত। সেই সকল ধ্বজায় কোনটীতে তিনটী মাছ, কোনটীতে পাঁচটী মৎস্য। কোনটীতে রথচক্র, কোনটীতে ময়ুর, কোনটীতে হস্তী, কোনটীতে সিপাহী ইত্যাদি অঙ্কিত আছে। এই সকল বৃহৎধ্বজার নিম্নে এক এক খানি তক্তাপোষ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি কাষ্ঠাসন স্থাপিত আছে। কলিকাতার ঘাটে বড় ছাতার নীচে এক একটী উড়ে পাণ্ডার যেমন এক একটী ঘাটোয়ালী হাতা দেখা যায়, এগুলিও তদ্রূপ; তবে এগুলি উড়ে পাণ্ডার নহে,—এইগুলিই প্রয়াগী পাণ্ডাদিগের স্থান। প্রত্যেক ধ্বজার চিহ্ন দ্বারা প্রত্যেক পাণ্ডার চিহ্ন সূচিত হয়। এই পাণ্ডাদের অনেক ভৃত্য ও আমলা যাত্রীসংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। সমস্ত তীর্থ স্থানের ন্যায় এই সকল পাণ্ডারও যাত্রীর

খাতা আছে। যজমান লইয়া ইহারাই তীর্থকৃত্য করায়। কাশীর 'কেশেল' ও গঙ্গাপুত্রের' ন্যায় গয়ার 'গয়ালীর' ন্যায় এবং মথুরার 'চৌবে'দিগের ন্যায় প্রয়াগী পাণ্ডারা 'তীর্থ ব্রাহ্মণ' নহেন। ইঁহারা শুদ্ধস্বত্ব কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ। এক পাণ্ডার অনুগৃহীত কয়েক জন নাপিত ধ্বজনিম্নে উপস্থিত আছে। তাহারাই ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করে। পাণ্ডারা যাত্রীর সামর্থ্য বুঝিয়া শ্রাদ্ধ ও দানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। যাত্রীরা যতক্ষণ কোন ধ্বজার নিম্নে গিয়া আশ্রয় না লয়, ততক্ষণ তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। পাণ্ডাদিগের ধ্বজতল হইতে কেহ নদীতে স্নান করে না। সেখান হইতে দুর্গের কোণ ঘুরিয়া গেলে প্রকৃত সঙ্গমস্থল পাওয়া যায়। এই স্থানটী পাথর দিয়া বাঁধান। সিঁড়িগুলি ভাল নাই, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঘাটের ধারে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া স্নানের কোন সুবিধা নাই। নৌকার ভিড়ই বড় বেশী, তাহার উপর ঘাট ভাড়া, নৌকাগুলি ব্যবসায়ীর নৌকা নহে,—ঘাট-মাঝিদের নৌকা,—ইহারা প্রতি যাত্রীতে /০, ৵০, ৶০, ।০ লইয়া নদার মধ্যস্থলে যায় এবং সঙ্গমস্থলে নৌকা রাখিয়া দেয়। যাত্রীরা নৌকায় বসিয়া যমুনার কালোজলে ও গঙ্গার শাদাজলে যেখানে মিশামিশি হইতেছে, সেইখানে ঘটী ডুবাইয়া জল তুলিয়া নৌকায় বসিয়া স্নান করে। ফুল, তুলসী, দুগ্ধ, পঞ্চামৃত, পঞ্চরত্ন এবং ক্ষীরের পেঁড়া, আতপচাউল, বাতাসা ও ফলকরা প্রভৃতি নৈবেদ্য এবং হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি পঞ্চ ফল বিক্রেতারা নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া বিক্রয় করে। যাত্রীরা এই সকল দ্রব্য সংকল্প সহকারে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনায় উৎসর্গ করিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। যাহারা সন্তরণপটু তাহারা নৌকা হইতে ঝম্প দিয়া সঙ্গমস্থলে অবগাহন করে। তাহার পর উঠিয়া আসিয়া স্বীয় পাণ্ডার ছত্রতলে বসিয়া পিতৃকার্য্য ও দান করে। স্নানের পূর্ব্বে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সংকল্প করিয়া ক্ষৌরী হইতে হয়। এই সময় ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতে হয়। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানে এই অর্থের বিশেষ অপব্যবহার হয় না, দানমাত্র ঘাটেই আহারার্থী ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও কাঙালী পাওয়া যায় ও পাণ্ডারা দ্রব্যাদি আনিয়া যজমানের সম্মুখেই খাওয়াইয়া দেয়। লাভ যদি কিছু থাকে সে দোকানদারের সঙ্গে মূল্যের চুক্তিতে

বা ওজনে, যাত্রীর পয়সায় নহে। এই ঘাটের নাম সঙ্গমঘাট নহে পরন্তু ‘বেণীঘাট,’—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিনদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া ইহার প্রাচীন নাম ত্রিবেণী। তাহারই সংক্ষেপে বেণীঘাট নাম হইয়াছে। ঘাটে কোন দেবতা বা মন্দির নাই। পাণ্ডাদিগের ধ্বজতলেও কোনরূপ দেব-প্রতিমার আড়ম্বর থাকে না। এখানে তীর্থকৃত্যের সফলতা বা ‘সুফলের’ আশায় তীর্থ ব্রাহ্মণের পদপূজা করিতে হয় না। কুশজলাদি দ্বারা সংকল্প করিয়া পাণ্ডার হস্তে সেই ‘বরণ’ বারি প্রদান করিলেই কার্য্যসিদ্ধ হয়। প্রয়াগের ‘বেণীমাধব’ মন্দির বা বিষ্ণুমন্দিরের কথা বাঙ্‌লাদেশে যতটা খ্যাত, প্রয়াগে ততটা নহে, তবে বহু বাঙালীর দর্শনাগ্রহে সেস্থানটীও ক্রমশঃ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। উহা গঙ্গাতীর হইতে বহু দূরে সহরের এক নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত। প্রয়াগীরা এই দেবতা দর্শন তীর্থকৃত্য মধ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। বেণীমাধবের মন্দিরটী একটী উচ্চটিলার উপর নির্ম্মিত। ইষ্টকের মন্দির, চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণা আছে। জয়পুরের গোবিন্দজীর ন্যায় এই দেবতার গঠন ভঙ্গিমা, তবে ইহা দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। দেবতা গরিব নহেন, সুবর্ণের অলঙ্কারাদি বেশ আছে। সেবাধিকারীরা অর্থ-লোলুপ বা যাত্রী-লোলুপ নহেন।

অলোপী মাতা।

অতঃপর বেণীঘাট হইতে ফিরিয়া ‘অলোপী মাতা’ দর্শনে গেলাম। ইহাই প্রয়াগের শক্তিপীঠ। দেবী মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। মন্দির অতি প্রশস্ত। মধ্যস্থলে বিস্তৃত মর্ম্মর বেদী। তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী একফুট চতুরস্র গর্ত্ত। শুনাগেল, সেই গর্ত্তই দেবী পীঠ, উহার মধ্যেই ‘দেবীযন্ত্র’ খোদিত আছে। গর্ত্তের উপরে একটি ক্ষুদ্র ‘পালনা’ অর্থাৎ শিশুর দোলা ঝুলিতেছে। ইহাই নাকি দেবীর সাধের আসন। সকল যাত্রী ইহাতে দোল দিয়া থাকে। এখান হইতে গঙ্গার বাঁধের উপর দিয়া নাগরাজ বাসুকী ও নাগেশ্বর শিব দর্শনে যাত্রা করিলাম। সে সহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এই মন্দিরে কতকগুলি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ নাগমূর্ত্তি ও বহুফণ বাসুকী মূর্ত্তি অবস্থিত। মূল মন্দিরের অপর পার্শ্বে নাগেশ্বর শিব মন্দির। এই স্থানটি বড় মনোরম। মন্দিরের বোধ হয় ১০০।১৫০

ফুট নিম্নে গঙ্গার গর্ভ বহু বিস্তৃত। গঙ্গার খাদ—যেখান দিয়া জল যাইতেছে সেখানে নদীর বিস্তার বড় বেশী নহে কিন্তু মন্দির-মূল হইতে অপর পারের উচ্চ শস্য ক্ষেত্রের সীমা পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত হইবে। বর্ষায় এই সমস্ত স্থান জলে ভরিয়া যায়। মন্দির পার্শ্ব হইতে দীর্ঘ সোপান যুক্ত বৃহৎ ঘাট আছে। ঘাটেরনিকট হইতে নদীর খাদ বহুদূরে, কিন্তু ঘাটে জল খাইবার জন্য মাটি কাটিয়া গভীর করিয়া বর্ষার জল আটকাইয়া রাখা হয়। আয়তন অল্প বলিয়া সে জলে স্নান পান করা শুভদায়ক নহে। এই নির্জ্জন স্থানে এই মন্দির ও ঘাট অতি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন ও গঠন কৌশলে অতি গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক।

অতঃপর আমরা বাসায় ফিরিতে লাগিলাম। আমাদের বন্ধুটী বহুদিন তীর্থবাস করিয়া পাণ্ডাগিরি সংক্রামতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই তিনি গাড়ীতে প্রয়াগের তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

তীর্থ মাহাত্ম্য।

প্রয়াগের তীর্থ মাহাত্ম্য প্রায় সমুদয় পুরাণাদিতেই বিশেষরূপে লিখিত আছে। প্রয়াগ-তীর্থ সমূহের মধ্যে প্রধান বলিয়া খ্যাত। সাধারণের মুখে একটী প্রচলিত প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় "প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মরগে পাপী যথা তথা।" যদি পাপী সর্ব্বপ্রকার পাপ করিয়াও প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করে তাহা হইলে তাহার সর্ব্ব পাপই বিনষ্ট হয়। মৎস্য পুরাণে প্রয়াগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে—তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

"এতৎ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
ন শক্যং কথিতং রাজন্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥"

(মৎস্য পু—১০২ অঃ)

এই পুণ্যতীর্থ প্রজাপতির ক্ষেত্র এবং ত্রিলোক বিখ্যাত—ইহার খ্যাতি বলিয়া শেষ করা যায় না ও তাহা ত্রিলোকেই বিখ্যাত আছে। যদি এই তীর্থে স্নান দান ও পিতৃতর্পণাদি করিয়া দেহাবসান হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি প্রদীপ্ত সুবর্ণ সদৃশ ও সূর্য্য তুল্য তেজস্ক বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করে। এখানে একটী পয়স্বিনী গাভী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে দানের পঞ্চ কোটী গুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এলাহাবাদের

প্রাচীন নাম প্রায়াগ বা ত্রিবেণী; প্রাচীনকালে প্রয়াগ পবিত্র সলিলা গঙ্গা ও যমুনার এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী এই নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল বলিয়াই ইহার নাম ত্রিবেণী হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ অদ্যাপিও ইহাকে এই নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। সম্রাট্ আকবর শাহের সময়ে ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এলাহাবাদ হইয়াছে, তিনি এলাহি ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া উহার নাম বদলাইয়া 'এলাহাবাদ' নাম প্রদান করেন, সেই 'এলাহাবাদ' নামই রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে এলাহাবাদ নামে পরিণত হইয়াছে। সম্রাট সাজাহান আকবর প্রদত্ত এই নামে সন্তুষ্ট না হইয়া আল্লাহ্‌বাদ নাম প্রদান করেন,—কিন্তু আল্লাহ্‌বাদ নাম সাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই, ইংরাজগণ কিন্তু যে ভাবে তাঁহাদের বর্ণমালায় এই স্থানটির নাম লেখেন তাহা 'এলাহাবাদ' না হইয়া আল্লাহ্‌বাদই হয়। প্রয়াগে কেশ মুণ্ডন করিলে তাহার কেশ পরিমিত বৎসর স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অন্যান্য তীর্থে যেমন স্ত্রীলোকদিগের কেশচ্ছেদন স্থলে কেবল দুই অঙ্গুলি পরিমিত কেশ ছেদন করিলেই হয়, এখানে তাহা নহে। এখানে স্ত্রীদিগের সমস্ত কেশই মুণ্ডন করিতে হইবে। সধবার পক্ষে এই রীতি খাটেনা,—তাহাদের কেবল দুই অঙ্গুলি মাত্র ছেদন করিলেই হয়।

মাঘ মাসে প্রয়াগ আসাই প্রশস্ত, সে সময়ে গঙ্গা যমুনার পুণ্য সঙ্গমে অবগাহন করিলে সমগ্র তীর্থ ভ্রমণের ফললাভ হয়, কারণ সে সময়ে সমগ্র তীর্থের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। এই জন্যই মাঘ মাসে তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশে এখানে আসা প্রশস্ত।

অতঃপর আমরা বাসায় আসিয়া আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলাম এবং শেষে রাত্রি ৮ টার সময় প্রয়াগ ত্যাগ করিলাম।

কুরুক্ষেত্র।

দিল্লী ছাড়িয়া অবধি মহাভারতের রঙ্গভূমি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার জন্মভূমি, আর্য্যগণের প্রথম যজ্ঞভূমি 'ব্রহ্মবেদী' কুরুক্ষেত্র দেখিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যস্ত হইয়াছিল, কাজেই আর কোথাও যাইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র দর্শনে রওয়ানা হইলাম।

থানেশ্বর ষ্টেশনে নামিয়া এক্কা ভাড়া করিয়া সহরের দিকে চলিলাম। সহরটি ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল দূরে, সুতরাং পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না।

থানেশ্বর নগর।

বাসা ভাড়া, বিশ্রাম আহারাদি ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সারিয়া নগর দর্শনে বাহির হইলাম। সহরটি কুরুক্ষেত্র ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল, এবং সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। তীর্থ-কৃত্যের জন্য এখানে বহু যাত্রি সমাগম হয় বলিয়া ইংরাজ-রাজ সহরের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার বহু সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বকালে এখানে বৎসরের মধ্যে ৫।৬ লক্ষ লোকের আগমন হইত, এখন আর তত হয় না। এখন বার্ষিক যাত্রীর সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে না। ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাস্তা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এই সহর হইতে দূরে পড়ায় এখানে ব্যাণিজ্য ব্যাপার তেমন বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই; তবে সেকালে লাহোর হইতে যে বাদশাহী সড়ক বাদশাহী ফৌজের কুজ কাওয়াজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহা তাহারই ধারে পড়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের একটী নাতি ক্ষুদ্র কেন্দ্র হইয়া আছে। নগরটির নাম 'থানেশ্বর' নহে—'স্থানেশ্বর' বা 'স্থান্বীশ্বর' কুরুক্ষেত্র—ক্ষেত্রের তীর্থপতি 'স্থাণু' নামক মহাদেবের নাম হইতেই এখানকার নাম 'স্থান্বীশ্বর' হইয়াছে। থানেশ্বর নগরে তীর্থ স্থানগুলি ব্যতীত আওরঙ্গজেবের মোগলপাড়া নামে এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছু দেখিবার নাই। মুসলমানেরা এই নগরেই সর্ব্বপ্রথমে ভারত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করে। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ মহম্মদ সাহেব-উদ্দিন ঘোরীর যুদ্ধে পরাজিত ও স্বর্গগত হন। পৃথ্বীরাজের রাজত্বই ভারতে মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি। নগর প্রান্তে বিরাট বিপুল

প্রান্তর সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের লীলাভূমি। কেবল সেই যুদ্ধ কেন—মহাভারতের যে মহাযুদ্ধের কথা পৃথিবীব্যাপ্ত,—এই প্রান্তর সেই যুদ্ধেরও লীলাভূমি। এই প্রান্তরে দাঁড়াইয়াই অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা লইয়া গান্ধার হইতে কাম্বোজ এবং প্রাগজ্যোতিষপুর হইতে সিন্ধু—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয় বীরগণ এইখানে অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধে ধ্বংস লাভ করেন। এই খানেই ভগবান কৃষ্ণের মন্ত্রণাবলে আর্য্যাবর্ত্তের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের 'মহাভারত' রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এই প্রান্তরেই পরম পুণ্যময়ী সরস্বতী তীরে স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞবেদী স্থাপন করিয়া আর্য্য যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, তদবধি ইহা 'ব্রহ্মবেদী' নামে পরম পুণ্যময় স্থানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্মযজ্ঞ স্থানের ইহাই উত্তরবেদী। বৈদিককালের স্মৃতির মহিমা অনুভব করিতে করিতে আমরা নগরের দক্ষিণভাগে এক বিপুল হ্রদতীরে উপনীত হইলাম। এই হ্রদটির পূর্ব্বায়তন নাই, অনেক ভরাট হইয়া গিয়াছে। এখনও ইহার জলাংশ এক মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ মাইল প্রশস্ত। এই দ্বীপটিই মহাভারতোক্ত দ্বৈপায়ন হ্রদ। নাম শুনিবামাত্র দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ-কাহিনী স্মরণ পথে উদিত হইল। মহাভারতোক্ত শোভা অবশ্য আর এখন ইহার নাই। আমরা তাহা দেখিব বলিয়া আশা করি নাই, কারণ সে শত সহস্র বর্ষের পূর্ব্বের অতীত-সৌন্দর্য্য পৃথিবীর লক্ষলক্ষ পরিবর্ত্তনেও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যে আজিও দর্শককে আপ্যায়িত করিবে, ইহা অসম্ভব। শুনিলাম হ্রদটির আকার এখনকার আকার অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ ছিল। হ্রদের চতুর্দ্দিকেই বান্ধাঘাট। ঘাটের বহু নাম আছে। যে ঘাটের নিকট ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা 'ব্রহ্মঘাট' নামে খ্যাত। প্রতি ঘাটে বহু দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ স্তূপীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে যেগুলি অভগ্ন তাহা খুব বেশী দিনের প্রাচীন নহে। এমন কি কোনটি দিল্লীর কোন প্রাচীন অট্টালিকার সম সাময়িক নহে। অধিকাংশ মন্দিরই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত। ঘুরিয়া আসিতে আমরা একটী ঘাটে উপনীত হইলাম। এই ঘাটের নাম 'বিশ্রাম ঘাট'। ভারত যুদ্ধের দৈনন্দিন অবসানে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই ঘাটে বসিয়া

দ্বৈপায়ন হ্রদ।

শ্রান্তিদূর ও পরামর্শ করিতেন!—কোথায় সেই কোন্ অতীতকালে দুই নরোত্তম এই ঘাটে বসিয়াছিলেন,—এ স্মৃতি আজিও পুরুষ পরম্পরাক্রমে আমাদের ন্যায় দূরবর্ত্তী কালের উত্তর পুরুষগণের নিকটেও বাহিত হইয়া আসিতেছে! হিন্দুর স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষার মহিমা অপর জাতিতে বুঝিতে পারিবে না। হ্রদের জল মধ্যে মধ্যে শুকাইয়া গিয়াছে। এই সকল শুষ্ক স্থানের অনেক স্থলই আবার বর্ষায় ভরিয়া উঠে। ইহার প্রতি ঘাটই একটী না একটী তীর্থের স্থান, কাজেই তীর্থযাত্রীর প্রদত্ত ফুল তুলসী বিল্বপত্র ও নৈবেদ্যের পাতার দোনায় ঘাটগুলি আবর্জ্জনা পূর্ণ হইয়া থাকে। পাণ্ডারা তীর্থস্বামী বটে, এই সকল তীর্থের আয়ই তাঁহাদের উপজীবিকা হইলেও তাঁহারা এই যে তাঁহাদের এই পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অক্ষয় বাণিজ্যাগারটি কে পরিষ্কার করাইয়া যাত্রীর সুবিধা এবং স্বাস্থ্য-বিধানে সহায়তা করিবেন, তাহা করেন না, কাজেই হ্রদের জল খুব গভীর, পরিষ্কার বা স্বাস্থ্যকর নহে। হ্রদের মধ্যস্থলে একটী দ্বীপ আছে। দ্বীপটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, প্রায় ৫৫০ ফুট হইবে। এই দ্বীপে একটী দেবমন্দির আছে। ঐ দেবমন্দিরে যাইতে হইলে হ্রদতীর হইতে উত্তর দক্ষিণে দুইটী সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। মহারাষ্ট্রগৌরব মহারাজ শিবাজী এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, কেহ কেহ বলেন রাজা বীরবলের নির্ম্মিত। এই দ্বীপের এক পার্শ্বে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পুরাণ বর্ণিত 'চন্দ্রকূপ' তীর্থ, দ্বীপের মধ্যে পশ্চিমাংশে বর্ত্তমান।

মোগলপাড়া দুর্গ।

দুর্গটি হিন্দুদ্বেষী মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। উহার নাম মোগলপাড়া দুর্গ। নাম হইতে অনুমান হয়, আওরঙ্গজেবের সময় এই দ্বীপে মোগল পল্লী বসান হইয়াছিল। পাণ্ডাদিগের নিকট শুনিলাম, এখানার দুর্গস্বামী বাদশাহের আদেশে মধ্যে মধ্যে মনুষ্য-শিকারের খেলা খেলিতেন। কোন তীর্থস্থান উপলক্ষে যখন হ্রদের চতুর্দ্দিকে যাত্রি সমাগম হইত, তখন দুর্গস্বামী সসৈন্যে হ্রদতীরে আসিয়া তীর গুলি ও বর্ষার আঘাতে 'কাফের' বলিয়া নিরীহ হিন্দুতীর্থযাত্রীদিগকে বধ করিতেন! কথাটা শুনিয়া আপাদমস্তক তড়িদ্বেগে শিহরিয়া উঠিল!—ভাবিলাম ভারতের সিংহাসনে বসিয়াও যে ব্যক্তি আপন ভরণপোষণের জন্য

প্রজার ধন গ্রহণ করিত না, নিজে পরিশ্রম করিয়া সল্মাচুমকীর কাজে আপনার জীবিকার্জ্জন করিত;—সেই সদ্ধর্ম্মাপরায়ণ, সংযতমনা, মহানুভব সম্রাট্ কি সত্যসত্যই এতটা পশু হইতে পারেন?—অথবা ইহা কল্পনা করিলেও পাপ হয়? জানিনা এই দুই বিপরীত বর্ণনার সামঞ্জস্য ইতিহাসে কোথাও আছে কি না? অতঃপর আমরা তীর্থপতি স্থাণ্বীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মধ্যস্থলে অনাদি লিঙ্গ বিরাজিত। মন্দিরটি নাতি বৃহৎ ও আধুনিক। শুনিলাম বহু প্রাচীন কাল হইতে এই তীর্থের উপর মুসলমানের অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে। যেদিন পৃথ্বীরাজের ধ্বংস হইল, তাহারও বহু পূর্ব্বের গজনীয় সুলতান মামুদ এই তীর্থক্ষেত্র আক্রমণ করিয়া বহু দেবালয় ভগ্ন এবং ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান এখানে তখন 'চক্রস্বামী' নামে এক বিষ্ণু মূর্ত্তির অতি উচ্চ ও সুদৃশ্য মন্দির ছিল। দেব প্রতিমায় অনেক বহুমূল্য রত্ন খচিত এবং রত্নালঙ্কার ছিল। মামুদ মন্দির ধ্বংস করিয়া দেবমূর্ত্তি গজনীতে লইয়া যান। সাহেবউদ্দীন পৃথ্বীরাজকে জয় করিয়া এই তীর্থক্ষেত্রের দুই শত মন্দির ধ্বংস করেন এবং সম্রাট্ কুতুবউদ্দীন এখানকারও ইন্দ্রপ্রস্থের দেবমন্দিরাদি ভাঙিয়া তাহারই উপকরণে দিল্লীর প্রথম সাধারণ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করান। তাহার পর যিনিই যখন সম্রাট্ হইয়াছেন, এই তীর্থ তাঁহারই হস্তে অল্পবিস্তর অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। আওরঙ্গজেবের সময়েই তীর্থ ধ্বংস সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এখন এখানে একটীও প্রাচীন হিন্দু দেবালয় নাই। আকবরের ন্যায় সমদর্শী সম্রাটের সময়েও মানসিংহের ন্যায় অতুল ক্ষমতাশালী রাজপুত বীরও রাজধানীর এত নিকটে অবস্থিত বলিয়া এখানে কোন সংস্কার-সাধন বা পুনর্গঠনাদি করিতে সাহস পান নাই। তাহা দ্বারা বৃন্দাবনের মন্দিরাদির উদ্ধার হইয়াছিল কিন্তু মোগল রাজধানীর পার্শ্বে অবস্থিত তীর্থরাজ কুরুক্ষেত্রের কোনই উপায় হয় নাই। এই সকল শুনিয়া মনে হইল, ভগবান হিন্দুর প্রতি এইটুকু করুণা প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজধানীর এত নিকটবর্ত্তী হইলেও মুসলমান বাদ্‌শাহ্‌দিগের আদেশে 'কাফেরের' এই তীর্থ স্থান পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে একেবারে বিলোপ করিয়া দেওয়া হয় নাই বা হিন্দুদিগকে স্থানচ্যুত

স্থাণ্বীশ্বর মন্দির।

করা হয় নাই! এই হ্রদের তীরেই বিস্তৃত প্রান্তর পড়িয়া আছে। উহাই মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্র। পাণ্ডাগণের কৃপায় এখনও ইহার স্থানে স্থানে মহাভারতীয় বীরগণের যুদ্ধস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। আমরা একে একে অভিমন্যু, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, ভগদত্ত, ঘটোৎকচ, প্রভৃতি বীরের পতন স্থান দর্শন করিলাম। যে স্থানটিকে যাহা বলিয়া শুনিলাম, তাহা বিশ্বাস করা ব্যতীত সেখানে তদ্ব্যাপারের কোন চিহ্ন নাই। ভীষ্মের শরশয্যার স্থানও দেখিলাম, কেবল এইখানে দুইটী মাত্র চিহ্ন আছে। ভীষ্মের শয্যাস্থানে একটী ক্ষুদ্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহারই নিকটে একটী ক্ষুদ্র পঙ্কপূর্ণ পুষ্করিণীকে ভোগবতীর আবির্ভাব স্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইল!

ভারত-যুদ্ধক্ষেত্র।

থানেশ্বর হইতে আমরা কুরুক্ষেত্রের অন্যান্য তীর্থে প্রাচীন কিছু দেখিবার লোভে অগ্রসর হইলাম। থানেশ্বরের পশ্চিমে ও পশ্চিম-দক্ষিণাংশে কুরুক্ষেত্র তীর্থ ভূমি বহুদূর বিস্তৃত। শিখরাজ্য ঝিন্দ থানেশ্বর হইতে ১৬ ক্রোশ দূরে। এই ষোড়শ ক্রোশ পরিমিত ক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থ। বৈদিককাল হইতে ইহা প্রসিদ্ধ। বেদের ব্রাহ্মণভাগে ইহার উল্লেখ আছে। ইহারই অন্যতম নাম সমস্ত পঞ্চকতীর্থ। আর্য্য-বাসের প্রথম স্থান দক্ষিণে সরস্বতী ও উত্তরে দৃষদ্বতী এই উভয় নদী-মধ্যস্থ স্থানের নাম ব্রহ্মর্ষি দেশ। কুরুক্ষেত্র সেই ব্রহ্মর্ষি দেশান্তর্গতঃ একটী প্রদেশ। বৈদিক দৃষদ্বতীই এখনকার ঘাগর নদী। 'ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং' দ্বাদশযোজনাবধি এই প্রদেশের তীর্থসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬০টী তন্মধ্যে পিপালিগ্রামে 'রতনযখ' অর্থাৎ রত্নযক্ষ বা তরুন্তুক তীর্থ, কৈথল গ্রামে 'বাহের' বা অরুন্তুক তীর্থ, রামরায় গ্রামে 'রামহ্রদ' ও 'কপিল' তীর্থ, পাণিপথ ও ঝিন্দের মধ্যপথে 'শিঙ্খ' বা সচক্রুক তীর্থ অবস্থিত। এই পাঁচ তীর্থ লইয়া ইহার সমস্ত পঞ্চক নাম হয়। তদ্ব্যতীত এই ক্ষেত্রমধ্যে পেহোবা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পৃথুদক তীর্থ বিরাজিত, ইহাই এক্ষেত্রের আর একটী প্রধান তীর্থ, ব্রহ্মযোনি, বিশ্বামিত্র তীর্থ, নক্রাবর্ত্ত ও কপালমোচনতীর্থ পেহোবাগ্রামের নিকটে অবস্থিত। পৃথুদক সেকালে একটী প্রাচীন নগর

কুরুক্ষেত্র।

ছিল। বিশ্বামিত্র তীর্থে একটী কারুকার্য্য বিশিষ্ট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এই তীর্থ ও মন্দির প্রায় ৪০ ফুট একটী উচ্চস্তূপের উপর সরস্বতীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে ঐরাবতারোহী ইন্দ্রমূর্ত্তি এবং নবগ্রহ ও অষ্টনায়িকার মূর্ত্তি আছে। থানেশ্বরের নিকট পুরাণোক্ত বৃদ্ধকন্যক বা কন্যাতীর্থ, স্বর্গদ্বার, সোমতীর্থ, দ্বৈপায়ন, বামতীর্থ, রামহ্রদ, মুঞ্জবট বা স্থাণ্বীশ্বর, পঞ্চবটী, নরকতীর্থ প্রভৃতি প্রধান। দ্বৈপায়ন-তীর্থের নামই দধীচিতীর্থ। বেদেও এই তীর্থের নাম আছে। ইহার বৈদিক নাম শর্য্যণাবত সরোবর। এই তীর্থ ইন্দ্রের সোমপানস্থল। এখানকার সোম দেবতাদিগের ও পিতৃগণের বিশেষ প্রিয় ছিল। বেদে শর্য্যণাবতে প্রস্তুত সোমের বহু প্রশংসা দেখা যায়। যুয়ান-যুয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে কুরুক্ষেত্রকে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উহার রাজধানীর নাম ছিল সর্ঘণা। বর্ত্তমান সুঘ বা মঘ্ নামক গ্রামেই ঐ নগর ছিল, কেহ কেহ এই অনুমান করেন। বৈদিক 'শর্য্যণা' যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে 'সর্ঘণা' হয় নাই, তাহা কে বলিল? এতদ্ভিন্ন পেহোবা-গ্রামের কিছু দূরে কপালমোচনতীর্থ ও কামোদগ্রামের কাম্যবন বিশেষ বিখ্যাত। এই কাম্যবনেই পাণ্ডব বনবাসকালে অবস্থান করিতেন। এই স্থানে দ্রৌপদীর রন্ধনশালার স্থান দেখাইয়া পাণ্ডারা 'দ্রৌপদীকাভাণ্ডারের' পরিচয় দেন। কুরুপাণ্ডবের স্মৃতি ও বৈদিককালের স্মৃতি এখানে বহু তীর্থে বিজড়িত। অংশুমতী নদী বুড়ীযমুনার একটী ক্ষুদ্র শাখা। ইহা বেদবিখ্যাত-নদী। এই নদীতীরে দশ সহস্র সৈন্য পরিবৃত কৃষ্ণাসুরকে ইন্দ্র বিনাশ করেন। তদবধি ইহা আর্য্যতীর্থ হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যে কেবল মহাভারতযুগের ও মুসলমানযুগের যুদ্ধভূমি তাহা নহে; বৈদিক-যুগেও এই ক্ষেত্রে আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। আর্য্যগৌরবের চির-লীলাভূমি এমন আর নাই। থানেশ্বর ও পেহেবার মধ্যপথে 'ইন্দ্রবারি' বা ইন্দ্রতীর্থ নামক তীর্থ বর্ত্তমান। ভরদ্বাজ কন্যা প্রভাবতীর সহিত এই স্থানে ইন্দ্রের বিবাহ হয়। বদরীপাচন তীর্থও এই প্রভাবতী ও ইন্দ্রের বিবাহ মুলক আর একটী তীর্থ। থানেশ্বরের অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে 'ঔজস-ঘাট বা তৈজস তীর্থ, বর্ত্তমান। এই স্থানে ব্রহ্মা দেবগণ ও ঋষিগণ

কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। যদি অনুমান করা যায় যে তারকাসুর নিধনকালে এই তীর্থস্থানের নিকট দেবতাদিগের 'মিলিটারী হেড কোয়াটার' ছিল, তাহা হইলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। এতস্তিন্ন ঋণমোচক কিন্দ ও কূপতীর্থ, নাগতীর্থ, নাগোদ্ভেদ, বারাগ্রামের বরাহতীর্থ, উর্ণাসগ্রামে রেণুকাতীর্থ প্রভৃতি প্রধান তীর্থ স্থানে যাত্রীরা সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। বাস্থলীগ্রামে ব্যাসবন ও ব্যাসস্থলী তীর্থ কৌশিকী ও সরস্বতী-সঙ্গমের নিকট অবস্থিত। শুনিলাম এই স্থানে পুত্রশোকে ব্যাসদেব আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন—ব্যাসের নামে এরূপ উদ্ভট উপাখ্যান এই প্রথম শুনিলাম। ব্যাসের এই মায়ার পুতলী পুত্রটী যে কে ছিল তাহা জানিতে পারিলাম না—ক্ষেত্রজপুত্র পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্য কি কোন দিন এই শোক উথলিয়া উঠিয়াছিল নাকি? নতুবা শুকদেবের মরণকথা কোথাও শুনি নাই!

অতঃপর কুরুক্ষেত্র দর্শন আমরা শেষ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

ইতিহাস।

সম্বরণের ঔরসে সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরু নামে যে পুত্রের উৎপত্তি হয়, তাঁহার নামানুযায়ীই কুরুক্ষেত্রের নাম হইয়াছে, তিনিই কুরুক্ষেত্রাধিপতি ছিলেন তিনি দেববরে এই ক্ষেত্রকে মুক্তিক্ষেত্র করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বংশে কৌরব ও পাণ্ডবের জন্ম হয়। তাঁহাদের সময়ে রাজধানী কুরুক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পাণ্ডুবংশের শেষ রাজা ক্ষেমক নরপতির সময় পর্য্যন্ত এই স্থান চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের অধিকারে ছিল, পরে কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কান্যকুব্জাধিপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান-চুয়াঙ্গের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে বর্দ্ধদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থাম্বীশ্বর-রাজ মালবরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন, তাঁহার দেহাবসানের পরে পুনরায় হর্ষদেবই স্থানীশ্বরের রাজা হন। এই স্থানীশ্বরই যে স্থানে তিনি এই অস্থিসঞ্চার দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানেই এখন 'স্বস্তিপুর' বা 'অস্থিপুর' নামক গ্রাম ও তীর্থ বর্ত্তমান। থানেশ্বর এবং অনুমিত হয় স্থাম্বীশ্বর রাজ্যই কুরুক্ষেত্র, তৎকালে কুরুক্ষেত্র ৫০০ ক্রোশের অধিক (৭০০০ লি) বিস্তৃত ছিল, তখন এস্থানে তিনটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, হীনযান মতাবলম্বী ৭০০ সাত শত

বৌদ্ধ যাজক এবং প্রায় একশতের উপর হিন্দু দেবমন্দির বিদ্যমান ছিল। চীনপরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে সে সময়ে থানেশ্বরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় ১৬ ক্রোশ স্থান (২০০ দুই শত লি) ধর্ম্মক্ষেত্র নামে অভিহিত হইত। তখনও এই স্থানে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধে হত বীরগণের অস্থি সমুদয় বিদ্যমান ছিল।

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে জয়চাঁদের সহায়তায় দিল্লীশ্বর হিন্দুর গৌরব-রবি পৃথ্বীরাজের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়—তাঁহার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্র ও পুণ্যসলিলা সরস্বতীর তটবর্ত্তী ভূভাগ সমূহ মুসলমান নরপতির করতলগত হইল। মুসলমান আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বহু তীর্থ লুপ্ত হইয়া যায়। এত অত্যাচার, এত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও কিন্তু হিন্দুতীর্থ যাত্রিগণ এখানে ধর্ম্মকার্য্যার্থ আগমন করিতেন। তারিখ-ই-দাউদী নামক একখানা মুসলমান ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে একবার এস্থানে বহু তীর্থযাত্রী স্নানার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইলে, সম্রাট্ সিকন্দর লোদী তাহাদের সকলকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নিরীহ ধর্ম্মলাভেচ্ছু যাত্রিগণের প্রাণবধ করিবার প্রবৃত্তিও যাঁহাদের হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে—তাহাদিগকে মনুষ্যাকারে পশু বলিলে কোন অপরাধ করা হয় না।

শিখদিগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার প্রাচীন তীর্থও ধ্বংসাবশিষ্ট দেবমন্দিরাদি মুসলমানের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। সেই সময় হইতে পুনরায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী নির্ভয়ে এই তীর্থে আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও বহু সহস্র তীর্থযাত্রিগণ এই স্থানে আগমন করেন। পাণ্ডাদের গৃহে কিংবা সহরে বাসা করিয়াই তাঁহারা তীর্থকৃত্য সমাধা করেন। আহার্য্য পশ্চিমের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও মিলে। কুরুক্ষেত্র হইতে ফিরিবার পথে মনে হইল—জগতে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, আজ হউক—কাল হউক একদিন না একদিন—ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবেই হইবে। পৃথ্বীরাজের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া নয়ন-জল সংবরণ করিতে পারি নাই। এই থানেশ্বর ক্ষেত্রেই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, এই রণক্ষেত্রেই শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতি পৃথ্বীরাজ

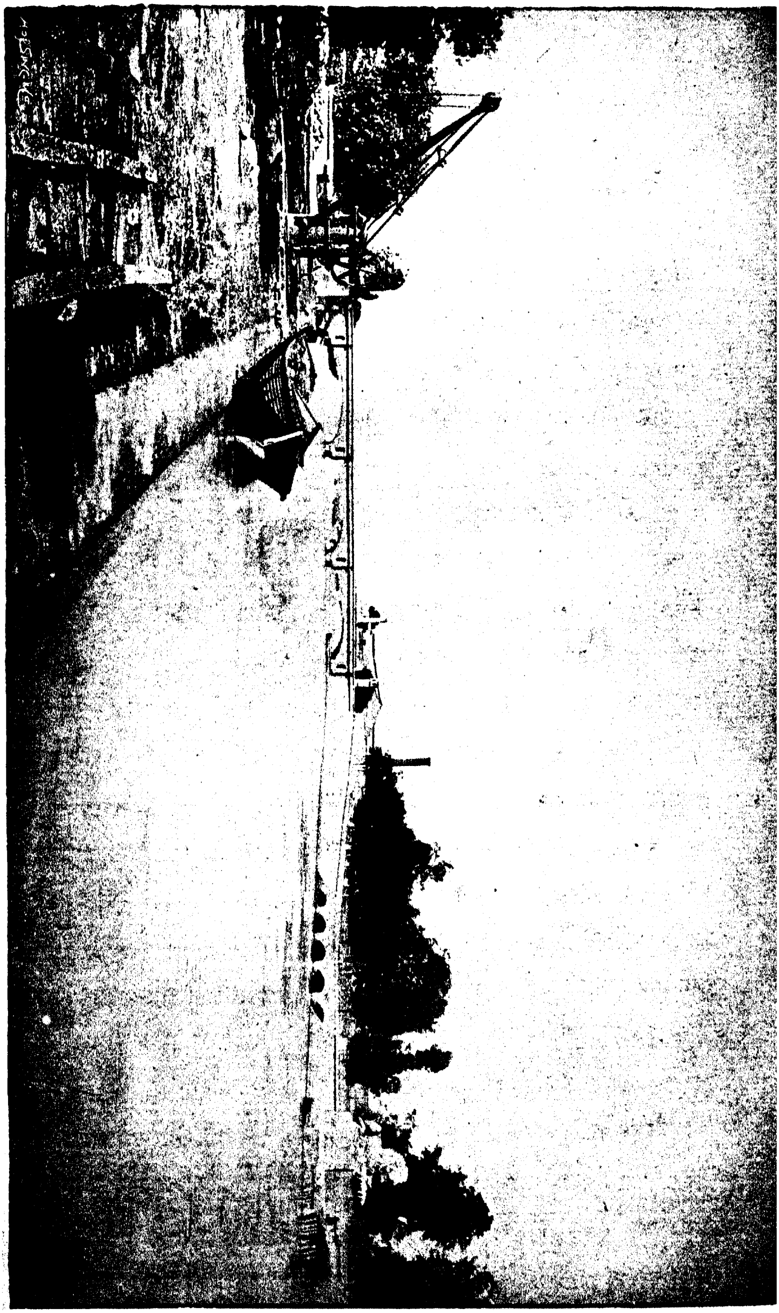
মহম্মদঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সত্য সত্যই মহাক্ষেত্র। সত্য সত্যই ঃ—

“বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্ব-নিয়ন্তার।
এ বিশ্বের স্তরে স্তরে রয়েছে লিখিত
অভ্রান্ত ভাষায়, নাহি হইতে সৃজিত
ক্ষুদ্রতম জীব বীজ, গিয়াছে বহিয়া
কি অনন্তকাল বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।
ছিল কত শত জীব, আজি নাহি আর;
কত শত নব জীব হইবে আবার
কে বলিবে? কিবা মহা কালের হুঙ্কার
উঠিছে পশ্চাতে আর সম্মুখে তোমার!”

রুড়কী।

আমরা বেলা প্রায় একটার সময় রুড়কীতে পঁহুছিলাম। সাহারণপুর হইতে ইহা ২২ মাইল দূরে অবস্থিত। বাসা ঠিক করিয়া আহারাদি ও বিশ্রামের পর নগর দেখিতে বাহির হইলাম। পর্ব্বতোপরি অবস্থিত সৈন্যাবাস, সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ, মানমন্দির, বোটানিকেল গার্ডেন, ডিস্‌পেন্সেরী ও স্কুল ইত্যাদি এখানকার দৃশ্যবস্তু। সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের জন্যই রুড়কীর বিশেষ প্রসিদ্ধি। ইহার নাম টমসন সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

রুড়কীর নিকটে গঙ্গার খাল সোনালী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবলে জগতে যে কত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, রুড়কীর লৌহের কারখানা হইতে তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এখানকার লৌহ ও কাষ্ঠের কারখানা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। দেখিলাম কোথাও কলের সাহায্যে লৌহ গলিতেছে, কোথাও গড়িতেছে, ছেঁচিতেছে, কাটিতেছে এবং কাষ্ঠের নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের এ সমুদয় অত্যদ্ভুত কল-কৌশল আমাদের নিকট কল্পনাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হরিদ্বার হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গার একাংশ হইতে একটী জলস্রোত বাহির করিয়া লইয়া অচিন্তনীয় ও প্রভূত বিস্ময়কর এক অদ্ভুত বিজ্ঞান-শক্তিতে প্রায় তিন মাইল ব্যাপী এক প্রকাণ্ড পুলের ভিতর দিয়া লইয়া আসিয়াছেন। নীচে গঙ্গার স্বাভাবিক মূল প্রবাহ বহিতেছে আর তাহারই গর্ভে থাম ও খিলানের উপর অবস্থিত পুলের মধ্য দিয়া শূন্যে কৃত্রিম খালের প্রবাহটী বহিয়া যাইতেছে, ইহা যে কতটা বিস্ময়কর তাহা না দেখিলে ভাষায় বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। খালের লহর সেতুর উপর দিয়া উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত। বর্ষাকালে এস্থানের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইয়া থাকে।



গঙ্গার লহর দর্শনান্তে এখানকার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ দেখিতে গমন করিলাম। কালেজ গৃহটী দেখিতে বড়ই সুন্দর ও সুগঠিত, মধ্য-স্থলের গোল কক্ষটী বড়ই মনোমুগ্ধকর, উপরে একটী গুম্বজ আছে, গুম্বজের পার্শ্বে আবার ছোট ছোট দুইটী গোলাকার কক্ষ। নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলীতে ইহার প্রকোষ্ঠ সমুহ সুরঞ্জিত। প্রকোষ্ঠ মধ্যে বহু বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারদিগের চিত্রাদি সজ্জিত। গলির উভয় পার্শ্বস্থ কক্ষে ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। রুড়কীতে তেমন দর্শনীয় আর কিছুই নাই। এখানকার জলবায়ু উত্তম। ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের অধ্যক্ষ সাহেব আমা-দিগকে বিশেষ যত্নের সহিত কলেজের বিভিন্নাংশ এবং একজন লোক সঙ্গে দিয়া work-shop দেখাইয়াছিলেন এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। স্ক্রু, কোদাল, রেলওয়ে ব্রিজ এবং নানাবিধ ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি এস্থানে কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কলে দশ বার বছরের ছেলেরা পর্য্যন্তও কার্য্য করিতে পারে!

চুনার।

রোগজীর্ণ বাঙ্গালীর শারীরিক অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে আজ কাল হাওয়া বদলান একটা রীতি হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বাবুরাও আর এখন শাস্ত্রীয় ঔষধের প্রতি আর তেমন আস্থাবান নহেন, অথবা বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি নির্ভর করিয়া রোগ নির্ণয়ে, ঔষধ নির্ণয়ের জন্য আপনাদের মস্তিষ্ককে বড় বেশী উৎপীড়িত করিতে সম্মত না হইয়া, চট্ করিয়া রোগীকে স্থান পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া থাকেন। মধুপুর, বৈদ্যনাথ, প্রভৃতি স্থানে এখন স্থানাভাব হওয়ায় বিলাসী বাঙ্গালী বাবুদিগের কৃপায় চুনার বর্ত্তমান সময়ে একটী প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রীষ্মের সময় এবং শারদীয় অবকাশে বড় বড় আফিসের কর্ম্মচারী, পর্য্যাটক ও রোগজীর্ণ বাঙ্গালীর আগমনে নির্জ্জন চুনার সহর জন-কোলাহলে মুখরিত হইয়া ওঠে। চুনার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেসন, কলিকাতা হইতে ইহা প্রায় ৪৮৯ মাইল দূরে অবস্থিত। মোগলসরাই ষ্টেসন হইতে চুনার প্রায় দশ ক্রোশ, কাশী হইতে ১৩ ক্রোশ ও মীর্জ্জাপুর হইতেও ১২ ক্রোশ দূর হইবে। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী। একা আরোহণে যথাসময়ে ষ্টেসনে নামিয়া আমরা সহরের দিকে অগ্রসর হইলাম।—সহরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা অনির্ব্বচনীয়। বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার একটী অনতি-উচ্চ শিখরের নিম্নে সহর ও শিখরের উপরে দুর্গ অবস্থিত। দুর্গ ও সহর উভয়ই অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। পর্ব্বত শিখরের নিম্ন দিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত। পাহাড়টি দীর্ঘে ৫।৬ শত হাত এবং বিস্তারে তাহার অর্দ্ধেক হইবে। সমতল ভূমি হইতে পাহাড়টি নদীগর্ভে অনেকদূর নামিয়া যাওয়ায় উহার প্রায় তিনদিকেই নদীর জল। এই পর্ব্বত শিখরটি এই ভাবে নদীর গর্ভে নামিয়া পড়ায় গঙ্গাকে ঘুরিয়া উত্তরবাহিনী হইতে হইয়াছে। গঙ্গা এইখানে উত্তরবাহিনী হইয়া কাশীর নিম্ন দিয়াও উত্তর মুখে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই কাশীতে গঙ্গা কেন উত্তরবাহিনী”—ইহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা যাহাই থাকুক,

আমরা একটা সুস্পষ্ট ভৌগলিক প্রমাণ পাইয়াছি। পাহাড়টির উচ্চতা কূলের দিকেই বেশী, আনুমানিক দুই শত ফুট হইবে। সহরে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে দুর্গ দেখিবার বাসনা প্রবল হইল, কিন্তু তহশীলদারের 'ছাড়' না পাইলে দেখিতে পাওয়া যায় না জানিয়া, তাহা পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমরা নগর দেখিতে গেলাম। দুর্গ হইতে একমাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিমে শাহ্ কাসেম সুলেমান নামক জনৈক ফকীরের সমাধিস্থান অবস্থিত। এই সমাধি-মন্দিরটির গঠন-কৌশল ও কারুকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট এবং মনোহর। এমন কি প্রবাদ এইরূপ যে এই সমাধিমন্দির দেখিয়াই শাহ্জাহাঁর তাজমহল নির্ম্মাণের বাসনা জাগিয়া উঠে এবং তাজমহলের আকারের কল্পনাও ইহারই আকার অনুসারেই করিয়াছিলেন। ফকীরের তীর্থস্থান পেশাবরে। বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তিনি নানাদেশে ঘুরিতে-ঘুরিতে এখানে আসিয়া আস্তানা করেন; সম্রাট্ জাহাঁগীর এক সময়ে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াতাঁহাকে বধ করিবার আদেশ দেন। যখন তাঁহাকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন সন্ধ্যার নমাজের সময়,--তিনি উপাসনার জন্য সময় প্রার্থনা করেন এবং উপাসনা কালে লৌহ-শৃঙ্খলের বন্ধন আপনা হইতে খুলিয়া যায়। এইরূপে কয়েকদিনেই তাঁহাকে বন্ধন করাহয় এবং উপাসনাকালে তাঁহার বন্ধন খসিয়া পড়ে। সম্রাট্ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন চুনার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দেন। এখানে তাঁহার অনেক শিষ্য হয়। কাল-ক্রমে পরে যখন আসন্নকাল উপস্থিত হইল, তখন শিষ্যবর্গকে ডাকিয়া কাসেম বলেন, অমুক দিনে অমুক সময়ে আমি মরিব। তৎপরে দুর্গ হইতে তিনি সকলের সম্মুখে জঙ্গলের দিকে একটী তীর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই তীর যেখানে পড়িবে, সেই খানে আমার কবর দিবে।" ইতিমধ্যে নিক্ষিপ্ত তীরটাকে দুর্গের প্রাচীরের নিকটে পড়িতে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"টুক্-আউর" ফকিরের এই কথায় পতিত তীর আবার ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া বর্ত্তমান সমাধি স্থানে পড়িল। সেই নির্দ্দেশ অনুসারে ফকীর কাসেম সুলেমান এই স্থানে সমাহিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই 'টুক-আউর' কথা হইতে 'টিকৌর মহল্লা' নাম হইয়াছে।

টিকৌর মহল্লা।

এখন এখানে আরও অনেকগুলি সমাধি প্রস্তুত হইয়াছে এবং সকলগুলি একটী ক্ষুদ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উদ্যানে বেষ্টিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর হিন্দু মুসলমান—বহু যাত্রী এই সমাধি স্থানে আসিয়া থাকে। এখানে একটী গাছ ও একটী লম্বা দড়ি ঝুলান আছে। প্রবাদ যে কোন মানস করিয়া ফকীরকে স্মরণপূর্ব্বক এই দড়িতে গ্রন্থি দিয়া যে সীরণি মানত করা যায়, ফকীর সাহেব তাহা পূর্ণ করেন। মানসসিদ্ধির আশায় হিন্দুযাত্রীর সংখ্যাই প্রতি বৎসরে বেশী হইয়া থাকে। সীরণিতে এখানে ন্যূনকল্পে /১।০ পোয়া চাউল দিতে হয় বলিয়া শুনিলাম। ফকীর সাহেবের পুত্রের কবরও এখানে আছে। শুনিলাম সমাধি-মন্দিরটী কোনও দিল্লীর বাদ্‌শাহের নির্ম্মিত—সম্ভবতঃ ফকীরের শত্রু জাহাঁগীরই শেষকালে তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ইহা প্রস্তুত করাইয়া দিয়া থাকিবেন।

চুনার রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দক্ষিণদিকে অর্দ্ধ মাইল দূরে 'দুর্গাকুণ্ড' নামে একটী পার্ব্বত্য কুণ্ড আছে। এই কুণ্ড হইতে 'জাগ্‌গকেনালা' নামে একটী অপ্রশস্ত অথচ গভীর নালা বাহির হইয়াছে। এই নালার ঠিক উত্তরে ভগবতী কামাক্ষী দেবীর একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের নিকট আর একটী ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন মন্দির আছে। সে মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকায় ভিতরের দেবতার পরিচয় পাইলাম না। নালার উপর একটী

কামাক্ষীদেবীর মন্দির।

সেতু আছে। সেতুটী চুনারের বেলেপাথরে নির্ম্মিত—বড় সুদৃশ্য। এই সেতু পার হইয়া তিনটী পার্ব্বত্য মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির তিনটী পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহাদের ভিত্তিগাত্রে নানা দেবদেবীর ও পশুপক্ষীর চিত্র খোদিত আছে। এখানে অনেকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম। কতযুগের কত প্রকারের অক্ষরেই এই সকল লিপি খোদিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দুর্গাকুণ্ডের আরও কিছু দূরে 'দুর্গাখো' নামে এক গুহা মন্দির আছে শুনিয়া আমরা উহা দেখিতে গেলাম। শুনিলাম প্রতিবৎসর নবরাত্রির পর অর্থাৎ দুর্গোৎসবের পর এখানে একটী মেলা হয়। এই মেলায় বিস্তর লোক সমাগম হয়। 'দুর্গাখো' দেখিলেই মনে হয় যে উহা স্বভাবসিদ্ধ গুহা নহে, যেন কোনও প্রাচীনকালে এখান

হইতে পাথর কাটিয়া তুলিয়া লওয়া হইত, শেষে কোনও কীর্ত্তিমানের অভিপ্রায়ে ও ব্যয়ে সেই প্রস্তরখানিকে গুহার আকারে কাটাইয়া উহার মধ্যে স্তম্ভাদির ব্যবস্থা করিয়া উহাকে দেবীমন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী দেবী মূর্ত্তির প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গুহাতেও প্রাচীন অক্ষরে খোদিত শিলালিপি দেখিলাম। এই দেবীপ্রতিমা মীর্জ্জাপুরের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর ন্যায় প্রসিদ্ধা। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস দেবী খুব জাগ্রত। এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। 'জাগ্‌গৎনালা' পর্ব্বত হইতে নামিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সমতল স্থানে বহু বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে। চুনার রেলওয়ে ষ্টেশনের ১।০ মাইল দূরে এই ক্ষুদ্র নদীর গর্ভ ও বেলাভূমির বিস্তার অতি অধিক। রেল লাইন এই গিরিনদী পার হইবার জন্য একটী সপ্ত খিলান বিশিষ্ট সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক খিলানের বিস্তার ৬০০ ফুট। এই সেতুটী চুনারের বেলে পাথরে নির্ম্মিত—অতি সুদৃশ্য।

চুনারদুর্গ।

অতঃপর আমরা দুর্গ দর্শনে অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে শুনিলাম যে ইংরাজেরা এই স্থানের নাম 'চুনার' করিয়া লইয়াছেন,—আসলে ইহার নাম 'চনার'। যে পর্ব্বতের উপর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে উহার নাম চরণাত্রি পাহাড়। পাহাড়ের যে অংশটীতে দুর্গ অবস্থিত, তাহার আকার ঠিক পদচিহ্নের ন্যায়। গঙ্গার দিকে নিম্নমুখে পদচিহ্নের অঙ্গুলিভাগ এবং পর্ব্বতের শিখর স্থানে গুল্‌ফভাগ অবস্থিত। প্রবাদ এই শ্রীরামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধে 'রামেশ্বর' স্থাপন করেন, তখন মহাদেব কৈলাস পর্ব্বত হইতে দক্ষিণ দিকে যাইবার সময়ে মধ্যস্থলে এই পর্ব্বতের শিখরে একটী চরণের ভর রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধি এখানে এই পদাঙ্ক ছিল। তৎপরে যিনি এখানে প্রথম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তিনি সেই পরম পবিত্র পদচিহ্নের আকারের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া সমস্ত পদচিহ্নটীকেই দুর্গভূমি করিয়া লয়েন। পৌরাণিক কাল হইতে এই দুর্গের বর্ত্তমানতা কল্পিত হয়। তাহা ছাড়িয়া দিলে শুনা যায় যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গঙ্গাতীরে এই পবিত্র পদাঙ্কতীর্থে আসিয়া যোগাশ্রম স্থাপন করেন ও

এই খানেই সমাধিলাভ করেন। তাঁহার সময়েই রাজা বিক্রমাদিত্য এই দুর্গনির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অনেকে বলেন তৎপরে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ এই দুর্গে বাস করিতেন। এই সকল শুনিতে শুনিতে আমরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তোরণদ্বারে স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড খসিয়া গিয়াছে। শুনিলাম উহা মুসলমানদিগের আক্রমণের ফল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম দুর্গের মধ্যে অতি প্রাচীনকালের মধ্যযুগের এবং এখনকার কালের প্রস্তরময় সৌধমালা ও 'বাঙ্গালা' ঘর আছে। দুর্গের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে যত, প্রস্থে তাহার সিকি এবং পদাঙ্কের চতুষ্পার্শ্বে যে প্রাচীর তাহার দৈর্ঘ্যতা ২৪০০ গজ হইবে। দুর্গসৌধগুলির অধিকাংশ মুসলমানদিগের সময়ে নির্ম্মিত। হিন্দুসৌধাদি যাহা ছিল তাহাই অধিকাংশ ভাঙিয়া-চুরিয়া সেই উপকরণে এই সকল অট্টালিকা গঠিত। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও লতাপাতার নক্সাবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডাদি এই সকল অট্টালিকার ভিত্তিতে ও প্রাচীরগাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবমূর্ত্তির অধিকাংশই মুসলমানের বিদ্বেষবলে উলটাইয়া গাঁথিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধমন্দিরের চিহ্নাদিও এখানে যথেষ্ট আছে। ত্রিশূল, অসি, মৎস্য প্রভৃতি এবং নাগরী ও পালি অক্ষরও এই সকল অট্টালিকার গাত্রে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর সৌধাদির চিহ্ন যে একবারে লোপ হইয়াছে তাহা হয় নাই। শুনা গেল প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে (১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে) এখানে সহদেব নামে এক রাজা ছিলেন। অনেকের ধারণা তিনিই এই পদাঙ্ক দুর্গের নির্ম্মাতা। তাঁহার 'সোনবা' নামে পরম রূপবতী কন্যা ছিল। রাজা প্রতিজ্ঞা করেন, যে রাজপুত্র যুদ্ধে তাঁহাকে হারাইতে পারিবেন, তিনিই কন্যালাভ করিবেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি অজেয় ছিলেন, শেষে মহোবার রাজা ওসলের পুত্র ওদল তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সোন্‌বার পাণিগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান প্রাচীন অট্টালিকার একাংশে রাজকুমারীর গৃহ ও বিবাহের ছায়ামণ্ডপ ছিল বলিয়া নির্দ্দেশও হইয়া থাকে। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানে বীরসিংহ ও বীরভানু নামে দুই রাজা ছিলেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত মন্দির ও তাঁহাদের রাণীদিগের নির্ম্মিত রাণীঘাট ও দেউল এখনও 'ভর্ত্তরি চবুতারার' (ভর্ত্তৃহরি চত্বর) নিকট বর্ত্তমান আছে। ১৫২৯

খৃষ্টাব্দে মোগল বাদ্‌শাহগণের প্রথম সম্রাট্‌ বাবরশাহ ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসী আক্রমণ করেন তখন সসৈন্যে নিজে এই দুর্গে ছিলেন। ইনি এ দুর্গ জয় করেন নাই। পৃথ্বীরাজের পর সৈরুদ্দীন সবক্তীলন এ দুর্গ অধিকার করেন। তদবধি ইহা মুসলমানের হাতেই ছিল, কিন্তু সিংহদ্বারের উপরিস্থ একখানি ভগ্নশিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে স্বামীরাজ নামে এক হিন্দু ১৩৯০ সম্বতে (১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে) এই দুর্গ মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করেন এবং সেই জয় ঘোষণার্থ ঐ খোদিত লিপিফলক স্থাপন করেন।

বাবরশাহের মৃত্যুর পরে শেরশাহ এইস্থানে আবাসভবন ও স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনি বিবাহসূত্রে শ্বশুরের নিকট ইহা প্রাপ্ত হন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন উহা অধিকার করেন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালা জয়ে গেলে শেরশাহ উহা পুনরায় অধিকার করেন এবং বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাগমন করিলে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। শেরশাহের সৌধাবলী এখন শিলহখানা বা অস্ত্রাগার নামে পরিচিত। শেরশাহের দেহাবসানের পর ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে আকবর এই গড় পুনরায় অধিকার করেন। মহাত্মা আকবর গড়ের ভিতর হইতে গঙ্গাজল আনিবার জন্য যে একটী দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাকে পানিঘাটের দ্বার কহে। উহার উপর দ্বার নির্ম্মাণের সন তারিখ ইত্যাদি খোদিত আছে।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ অধিকার করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মেজর মন্‌রো ইংরাজ সৈন্য লইয়া এই দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যাধ্যক্ষ কার্ণাক ইহা জয় করিয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিবলে ইহার অধিকার প্রাপ্ত হন।

সে অবধি ইহা ব্রিটিশ সিংহের করতলগত আছে। ১৭৮১ সালে কাশীরাজ চৈত সিংহের সহিত কলহের সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই দুর্গে বাস করিতেন। দুর্গের সর্ব্বোচ্চ সৌধটিই তাঁহার বাসস্থান। এই দুর্গ ইংরেজদের অধীনে আসিলে কিছুকাল পর্য্যন্ত ইহা পশ্চিমাঞ্চলের অস্ত্রাগার স্বরূপ এবং তাহার পরে ইহাকে জেলখানারূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১৮১৭—১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারহাট্টা রাজদ্রোহীদলের নায়করূপে ত্র্যম্বকজী দঙ্গলিয়া এই কারাগারে প্রথম কয়েদীরূপে অবস্থান করেন।

দুর্গের সৌধমালা দেখিয়া আমরা মহারাষ্ট্র বীর ত্রম্ব্যকজী যে অন্ধকারাচ্ছন্ন গারদে আবদ্ধ ছিলেন তাহা দেখিতে গেলাম। সে গৃহ দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। এই গারদ অত্যন্ত ভীষণ, দুই তিনটী ছিদ্র পথ ব্যতীত ইহাতে আলো প্রবেশের পর্য্যন্ত অন্য কোনও পথ নাই—বাতাসের প্রবেশ পথ উহাই। দুর্গের ভিতর জলের ব্যবস্থা কিছুই নাই, গঙ্গাজলই প্রধান পানীয়। এক সময়ে যে দুর্গাভ্যন্তরে পানীয় সংগ্রহের নিমিত্ত উহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী কূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে—ঐ কূপের এখন অন্তিম দশা—উহার বৃত্তাকার দাগের পরিমাণ ১৫ ফিট। দুর্গের এই অংশ হইতে চুনার সহরের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। চুনার সহরের বাড়ী ঘর—দূরস্থিত নীল গিরিশ্রেণী, গঙ্গার বক্রগতি প্রতি মুহূর্ত্তেই হৃদয়-পটে এক অভিনব দৃশ্য আঁকিয়া দিতেছিল। গঙ্গার বক্রগতি বড়ই মনোহর—তীরে শ্যামল তৃণরাজি বিস্তৃত, তার পরে শ্বেত সৈকত মধ্যে মধুর-নাদিনী—বিষ্ণুপদ—রজবাহিনী গঙ্গা বহিয়া বহিয়া চলিয়াছেন।

অতঃপর আমরা 'ভর্ত্তরি চবুতারা' অর্থাৎ ভর্ত্তৃহরির সমাধি দেখিতে গেলাম। একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় একটী নাট-মন্দিরের ন্যায় দালানের মধ্যে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর স্থাপিত আছে। উহা পুষ্পরাশি ও সিন্দূর দ্বারা পূজিত হয়।

ভর্ত্তৃহরির সমাধি।

কথিত আছে যে ভর্ত্তৃহরি পাথরের উপর বসিয়া কঠোর সাধনায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া বারাণসী-পতি বিশ্বনাথ এখানে আসিয়া নাকি দিনের মধ্যে নয় ঘণ্টা বসতি করেন এবং পরে কাশীতে ফিরিয়া যান। আমাদের প্রদর্শকও ঐ কৃষ্ণ প্রস্তর-খণ্ডকে 'হরমঙ্গল' নামে অভিহিত করিলেন। চুনারের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এই পর্ব্বতে গদাপাহাড় 'কদমরসুল' আর দুইটী প্রসিদ্ধ স্থান। গদাপাহাড় এই পাহাড়ের এখন নাম গদাই পাহাড় কারণ জনৈক ফকীরের সমাধিও এই পর্ব্বতে আছে—ফকীরের কবরের চতুষ্পার্শ্বে হস্ত ঘর্ষণ করিলে

চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায় এইরূপ প্রবাদ আছে। কদম রসুল—গড়ের নিকটে ইমান বক্সের মস্‌জিদ নামে এক মস্‌জিদ আছে। উহার মধ্যে একখানি কৃষ্ণ প্রস্তরের মধ্যে চরণের সম্মুখস্থ অর্দ্ধাংশ বিদ্যমান। চুনার দুর্গ হইতে ইংরেজ গভর্মেণ্ট দেবমূর্ত্তি সমূহ স্থানান্তরিত করিবার সময় মুসলমানগণ এই প্রস্তরখণ্ড মস্‌জিদে আনিয়া রাখিয়াছেন। মুসলমানগণ ইহাকে 'কদম রসুল' নামে অভিহিত করিয়াছেন—আর হিন্দুগণ ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের 'চরণ পাদুকা' বলিয়া অভিহিত করে। পৌরাণিক মতানুসারে ভগবানের যে দুইটী চরণ পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহার মধ্যে দক্ষিণ চরণের চিহ্ন এই প্রস্তরে পতিত হইয়াছে এইরূপ প্রবাদ। আর মুসলমানেরা বলেন মারুজ নামক একজন হাজি মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে দুইটী কদমরসুল আনয়ন করেন এবং তৎকালিন সম্রাট্ ফিরোজ শাহ্‌কে তাহার একটী উপহার দেন ইহা সেই কদম রসুল। যদিও এই চরণচিহ্ন মস্‌জিদে আছে তথাপি বহু হিন্দুযাত্রী ইহা দর্শন মানসে আগমন করেন। কাশী নরেশের বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন ব্রাহ্মণ ইহার সেবা করিয়া থাকেন।

চুনারের জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এখানকার প্রস্তর ভারত প্রসিদ্ধ। এইরূপ পাতলা স্তর বিশিষ্ট প্রস্তর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তামাকের নিমিত্তও চুনারের খ্যাতি আছে। যখন এস্থানে ইংরেজ সৈনিকাবাস ছিল তখন প্রায় সমুদয় দ্রব্যাদিই পাওয়া যাইত। সে সময়ে এ প্রদেশ অত্যন্ত জাঁকাল ছিল—এখন আর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি বিদ্যমান নাই। চুনারের পাথরের শিল্পকার্য্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। খ্রীষ্টান মিশনারীরাও একদিন এখানে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃতছিল।

মীর্জ্জাপুর।

মীর্জ্জাপুর নিজে তীর্থস্থান নহে, দেখিবারও তেমন কিছুই নাই, তবে ইহারই অতি নিকটে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, সেখানে যাইতে হইলে পূর্ব্বে এই ষ্টেসনেই নামিতে হইত, তবে মন্দিরের নিকট 'বিন্ধ্যাচল' নামে ষ্টেসন হইয়াছে। আমরা বেলা প্রায় এগার-বারোটার সময় মীর্জ্জাপুরেই নামিলাম। পরদিন রাত্রির গাড়ীতেই আবার মীর্জ্জাপুর পরিত্যাগ করিব স্থির করিয়া এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। আহারাদির আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল,—পরদিন প্রত্যূষে বিন্ধ্যাচল যাইতে হইবে স্থির করিয়া আমরা রন্ধনের অবকাশে মীর্জ্জাপুর দেখিতে বাহির হইলাম।

এখানে প্রাচীন ঐতিহাসিক কিছুই দেখিবার নাই। দর্শনীয় বস্তু সমূহের মধ্যে গঙ্গার তটশোভা অতি সুন্দর, প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর ঘাটগুলি, আধুনিক সুদৃশ্য হিন্দু মন্দিরের এবং মুসলমানী মস্‌জিদের শ্রেণী, ইওরোপীয়-গণের নয়নাকর্ষক বৃহৎ বৃহৎ সৌধমালা বড়ই সুন্দর। ঘাটগুলির চাতালে ভাস্কর-শিল্পের অপূর্ব্ব নিপুণতা দেখিতে পাওয়া যায়: গঙ্গার দক্ষিণ কূলে এই নগর অবস্থিত। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। ধনী বাণিক্‌দিগের প্রস্তরময়ী প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা সকলের শোভা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইল। প্রস্তরে খোদিত তোরণদ্বার, কার্ণিস, রেলিং, থাম, দরজা, জানালার চৌকাঠ, অলিন্দ অতি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় এবং আধুনিক ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিপুণতার পরিচায়ক। নগরের উপকণ্ঠে অধিকতর ধনীগণের অতি সুদৃশ্য উদ্যান ও আবাস ভবন আছে। নদীর নিম্ন দিক হইতে ইহার উচ্চ তীর ভূমির ক্রমোচ্চ বন্ধুর স্তর বিন্যাসের শোভা এবং স্তরে স্তরে সুদৃশ্য প্রস্তরময় সৌধরাজি মন্দিরাবলী এবং মন্দির সমূহের শোভা বড়ই চিত্তাকর্ষিণী এবং মনোমুগ্ধকারিণী। উত্তর পূর্ব্বদিকে নদীর সহিত সমান্তরালভাবে একটী প্রশস্ত রাস্তার ধারে ইংরাজ-পল্লী। এই স্থানেই ইউরোপীয়দিগের সুবিন্যস্ত অট্টালিকাদি ব্যতীত গির্জ্জা, স্কুল, অনাথ-আশ্রম এবং লণ্ডন মিশনের আশ্রম আছে। আফিস আদালতও

এই ভাগে। এই সকল বাড়ী পাথরের নির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট ও সুদৃশ্য। এখানে আগে স্কন্ধাবার বা ক্যাণ্টনমেণ্ট ছিল, এখন নাই। তবে কাওয়াজের মাঠ ও দু' একটী বাঙ্গালা ঘর এখন ঘোড়দৌড়ের মাঠরূপে ব্যবহৃত হয়। নগরের দেশী মহল্লায় বড় বড় প্রশস্ত তিনটী রাস্তা আছে। রাস্তার ধারে বৃক্ষ শ্রেণী ও ইঁদারা আছে। অনেকগুলি ইঁদারা ও তদুপরি নির্ম্মিত ছত্রী, চবুতারা ইত্যাদি বড়ই সুন্দর শিল্প-খচিত এবং চিত্তাকর্ষক। আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে যে পথিকদিগের জন্য পথে গুড়-ছোলা এবং পানীয় জল দিবার ব্যবস্থা পুণ্যকামীরা করিয়া থাকেন, তাহাকে চলিত কথায় 'জলছত্র' বলে কিন্তু আসলে সেটি 'জলসত্র'। যদি প্রকৃত 'জলছত্র' দেখিতে হয়, তবে তাহা এই উত্তর পশ্চিমের ইঁদারা ও তাহার ছত্রী দেখিলে বুঝা যায়। দাতা বৃহৎ গভীর ইঁদারা কাটাইয়া তাহা বাঁধাইয়া দিয়াছেন; মুখের নিকট সুউচ্চ সুপ্রশস্ত বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, বেদীর উপর স্তম্ভ গাঁথিয়া তাহার উপর সুন্দর সুদৃশ্য ছাদ করিয়া দিয়াছেন, নিকটে ছায়ার জন্য ঘন ছায়া দিতে পারে এমন বড় গাছ লাগাইয়া দিয়াছেন। জল তুলিবার জন্য কূপের উভয় পার্শ্বে স্তম্ভ বা খোঁটায় বাঁধা মোটা কাছি দড়ি আছে। কূপের গভীরতা বুঝিয়া জল তুলিবার জন্য কপি বা ঘড়ঘড়ি দেওয়া আছে। কোথাও কোথাও জল তুলিয়া দিবার জন্য দাতার বেতন-ভোগী বা বৃত্তি ভোগী লোকও নিযুক্ত আছে, আবার কোথাও বা পুণ্যকামী ব্যক্তিরাই প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা করিয়া জলপ্রার্থীদিগকে জল তুলিয়া দিয়া তাহাদের পিপাসা ও ক্লেশ নিবারণ করে। কোথাও কোথাও কূপের উপরের এই সকল 'ছত্রী' দ্বিতল বা ত্রিতল এবং প্রকোষ্ঠ ও বারাণ্ডা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিতল হইতেই জল তুলিবার ব্যবস্থা থাকে। পথিকেরা এই সকল স্থানে বসিয়া দাঁড়াইয়া ঘুমাইয়া বিশ্রাম করে, রাত্রিবাস করে, এবং রাঁধিয়া বাড়িয়া আহারাদি করে। অনেক ইঁদারার গাত্রে বেদীর নিম্নভাগে বা ভূমিতলের অপেক্ষা নিম্নদিকে 'ঠাণ্ডাঘর' প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। দারুণ গ্রীষ্মে এই সকল স্থানে লোকে আরাম উপভোগ করে বা সাধু সন্ন্যাসীরা থাকিবার আশ্রয় করিয়া লয়। মীর্জ্জাপুরে পাথরের স্বচ্ছলতাবশতঃ এই সকল কূপচত্বর অতি সুদৃশ্য এবং বচনাতীতরূপে

মনোরম। এখানে সমস্তই পাথরের, কুটীরগুলিরও কাহারও প্রস্তর তোরণ, কাহারও প্রস্তর স্তম্ভ বা কাহারও মেঝের প্রস্তরের আস্তরণ। নদীতীরস্থ কথা ছাড়িয়া দিলেও নগর মধ্যেও অনেক সুদৃশ্য মন্দির ও মস্‌জিদ আছে। এই সকল শিল্পের ভাস্কর অধিকাংশই হিন্দু, সহরের মধ্যে বাজারের চকটি একটী দেখিবার বিষয়। শিল্পকার্য্য খচিত সুদৃশ্য স্তম্ভ তোরণাদি-শোভিত প্রস্তর নির্ম্মিত দোকান ঘরগুলির সুবিন্যাস বড়ই বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদন করে। চকের বাজারে গালিচা, পিত্তলের বাসন ও কম্বল বিস্তর পাওয়া যায় এবং অতি উৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য। এতদ্ভিন্ন এই সহর তুলা ও গালার রপ্তানী ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। এই নগর নানাবিধ ফল, নানাবিধ শস্য, নানাবিধ ধাতু, তামাকু, চিনি, লবণ, কাপড় ইত্যাদির একটী প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। কাশীর ন্যায় ইওরোপীয় সওদাগরের কোন আফিস এখানে নাই,—দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য কলিকাতার অনেক হৌসের এজেণ্ট বা গোমস্তা আছে। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি ও দাতব্য ঔষধালয় (ইংরাজী) আছে। পূর্ব্বে এখানকার বাণিজ্য বহু বিস্তৃত ছিল কিন্তু রেল দ্বারা বোম্বাইএর সহিত জব্বলপুরের যোগ হওয়ায় কানপুরের বাণিজ্য ব্যাপার বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে এবং এখানে মন্দা পড়িয়াছে। এখানে জল বায়ু স্বাস্থ্যকর হইলে ও গ্রীষ্মাবাসের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, কারণ পার্ব্বত্য প্রদেশ ও বনরাজি সমাকুল বলিয়া অতি গ্রীষ্ম ও অতি বৃষ্টিতে ঐ সময়ে অপর দেশীয় লোকের তিষ্ঠান কষ্টকর হয়। এই নগরের মধ্য দিয়া যেমন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিল্লীর দিকে গিয়াছে, তেমনি দাক্ষিণাত্যে যাইবার বাদশাহী সড়কও দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। বিন্ধ্য পর্ব্বতের তারঘাট নামক গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া এই পথ বিস্তৃত। মীর্জ্জাপুরের নিম্নে গঙ্গা বড় শান্ত কিন্তু প্রবল-তরঙ্গময়ী। বর্ষাকালেও মায়ের বন্যায় কোন উপদ্রব এ দেশে হয় না। মিউনিসিপ্যালিটি সেই একঘেয়ে রকমের, রাজপথ—ধূলি কঙ্কর পূর্ণ, দুই ধারে সারি সারি দোকান, পথের ধারে আবর্জ্জনার স্তূপ ও কূপাদির নিকটে পঙ্কিল পয়ঃনালা এমন সুদৃশ্য সহরের পক্ষে কেমন অশোভন বোধ হইতে লাগিল।

মীর্জ্জাপুরের গঙ্গার তীর হইতে নানাদেশের নানা জাতিয় বাণিজ্য দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ তরীশ্রেণী দেখিলে সত্য সত্যই হৃদয়ে আনন্দ হয়। ইংরাজ

পল্লীতে মীর্জ্জাপুরের টাউন হলটি দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। নানাবিধ শিল্পকার্য্য সমন্বিত উৎকৃষ্ট প্রস্তরে নির্ম্মিত এখানকার উচ্চ ঘণ্টাঘর বা ঘটিকাস্তম্ভ (Clock-Tower)টী আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। এই উচ্চ স্তম্ভটির উপর একটী ঘড়ী স্থাপিত আছে বলিয়া স্থানীয় লোকে ইহাকে ঘণ্টাঘর বলে। ইহা এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জর্জ্জ ডেলের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বর মিস্ত্রী নামক জনৈক উৎকৃষ্ট শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মীর্জ্জাপুরে একটী সাধারণের ব্যবহারে উদ্যান দেখিয়াছিলাম তাহাও বেশ মনোহর।

নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় ফিরিতে বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মশালায় আসিয়া দেখি আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া সকলে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। একটু বিশ্রাম করিয়া কোন রকমে আহার শেষ করিলাম। ধর্ম্মশালায় যাত্রিগণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে একজন জমাদার নিযুক্ত আছে। যাত্রিগণ এই ধর্ম্মাশালায় তিনদিন পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে অবস্থান করিতে পারেন অবশ্য আহারাদির ব্যয় নিজেদেরই বহন করিতে হয়। ধর্ম্মশালার কক্ষগুলি ছোট ছোট, মলিন ও অর্দ্ধ ভগ্ন; গ্রীষ্মের দিনে এইরূপ এক একটী ছোট ছোট কুটরীতে থাকা কি ভয়ানক কষ্টকর, তাহা কল্পনা করিতেও আশঙ্কা হয়। যাত্রিগণ সাধারণতঃ বারেন্দায়ই বিছানা পাতিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। এ ধর্ম্মশালার জমাদারটিকে সাধু প্রকৃতির লোক বলিয়াই প্রতীয়মান হইল, কোনরূপ বক্সিসের প্রত্যাশী তাহাকে দেখিলাম না। মীর্জ্জাপুর প্রাচীন কালে সঙ্গীত বিদ্যার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল—এখনও এখানে সঙ্গীত বিদ্যা বিশেষ সমাদরের সহিত আলোচিত হইতে দেখা যায়।

বিন্ধ্যাচল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া আমরা বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে অগ্রসর হইলাম। মীর্জ্জাপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক উচ্চ শিখরে মা বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত, বিন্ধ্যাচল গ্রাম হইতে এই পর্ব্বত প্রায় দেড় মাইল দূর। বিন্ধ্যাচল গ্রামও গঙ্গাতীরে পর্ব্বত প্রান্তে অবস্থিত। আজ কাল বিন্ধ্যাচল গ্রামেই একটী রেল ষ্টেশন হইয়াছে। সকল ট্রেণ এখানে থামে না। ষ্টেশনের অতি নিকটেই একটী পর্ব্বত শিখরে ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর আর এক মন্দির অবস্থিত। এবং এই মন্দিরের অতি নিকটে এক নানক পন্থী সন্ন্যাসীর ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্মশালা পাহাড়ের উপরেই নির্ম্মিত। পাহাড়ের এই অংশও আবার একবারে গঙ্গার গর্ভে অবস্থিত সুতরাং ইহার শোভা চমৎকার। পার্ব্বত্য স্তরের গলি পথ ঘুরিয়া এই ধর্ম্মশালায় আসিতে হয়। আমরা এই স্থানেই বাসা লইলাম। শিখ সন্ন্যাসী নদীর ধারের দীর্ঘ গৃহটি আমাদিগকে বাসার্থ প্রদান করিলেন। ঘরে বসিয়া প্রশস্ত জানালা দিয়া দুই দিকে গঙ্গা দেখা যায়। গঙ্গার শোভা এখানে বড় বিস্ময়কর। আমরা যে পারে আছি,—এ পারে নদীর কূলে বহুদূর বিস্তৃত দুরারোহ পর্ব্বত শিখর জলের সীমারেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া প্রাচীরের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতে নানাজাতীয় পত্রপুষ্প সমন্বিত বহুবিধ বৃক্ষরাজী পূর্ণ জঙ্গল, কিন্তু অপর তীরে এই উচ্চতার ঠিক্ বিপরীত দৃশ্য—বহুদূর বিস্তৃত বালুকা-কর্দ্দমময় বেলাভূমি এবং তৎপরে দৃষ্টি-রেখা অতিক্রম করিয়াও শ্যামল শস্যক্ষেত্র দিগন্তের কোলে গিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। তীরে ধীরে জলচর পক্ষীকুল বিশেষতঃ বলাকাশ্রেণীর নির্ভয় বিচরণ দেখিতে বেশ সুন্দর। প্রাতরৌদ্রের মৃদূজ্জ্বল আলোকে দূরে শস্য ক্ষেত্রে হরিদ্বর্ণ শুক পক্ষীর ঝাঁক এখান হইতে ওখানে উড়িয়া বসিতেছে আবার উড়িয়া যাইতেছে, আর শ্যামলশস্যের মস্তকে মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত শ্যামল চন্দ্রাতপের ন্যায় দেখাইতেছে!—এদিকে পর্ব্বত শিখরের উচ্চ বৃক্ষ-

চূড়ে শ্বেত ময়ূর ও হরিদ্বর্ণ ময়ূরের কেকারবে বন থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে এবং সেই শব্দে নিশ্চিন্ত জলচর পক্ষীরা চম্‌কাইয়া দল বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেছে!—আমাদের ঘরের নিম্নেই বলুন আর পার্শ্বেই বলুন বিন্ধ্যবাসিনীর ঘাট!—বিরাট পাষাণময় সোপানশ্রেণী জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে। তীর্থযাত্রিগণের স্নানের এইটী প্রধান ঘাট। পর্ব্বতের স্তরানুসারে ঘাটের দিকে এই ধর্ম্মশালার গায়ে এক একটী চাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে, সকালে সন্ধ্যায় উহার উপর যাত্রীরা এবং গ্রামবাসী সাধুসজ্জন এই সকল স্থানে বসিয়া পূজা পাঠ ও সদালাপ করেন। আমরা এই স্থানে আমাদের দ্রব্যাদি রাখিয়া গঙ্গা স্নান করিয়া দেবী দর্শনে চলিলাম। ঘাট হইতে কিয়দ্দূরে পাহাড়ের এক সমতল ক্ষেত্রে মায়ের মন্দির ও মন্দির প্রাঙ্গন প্রস্তুত। প্রাঙ্গন সহ মন্দির চত্বর পর্ব্বত পৃষ্ঠ কাটিয়া সমতল করা হইয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে উপাসক, পূজক ও তীর্থযাত্রীরা চণ্ডীপাঠ এবং হোমে নিযুক্ত। নবরাত্রির সময় চত্বরের মধ্যস্থলে বিশাল হোমকুণ্ড প্রস্তুত হয় এবং নয় দিন ক্রমাগত তাহাতে হোম হয়, রাত্রিতেও অগ্নি নিবিতে দেওয়া হয় না। চত্বরের এক কোণে প্রাচীন কয়েকটী বৃক্ষ আছে। অঙ্গনে যূপকাষ্ঠ আছে। ইহার চারিদিকে পাণ্ডাদিগের বাড়ী। এই সকল পাণ্ডারও যাত্রীর অধিকার নির্দ্দেশক ‘খাতা’ আছে। মায়ের মন্দির সুগঠিত নহে, বন্ধুর কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের গর্ভস্থলে যাইতে সঙ্কীর্ণ গলি পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। মন্দির মধ্যে এক কুলঙ্গীতে দেবী প্রতিমা আছেন। কাশীর দুর্গামূর্ত্তি, অন্নপূর্ণা ও সঙ্কটামায়েরমূর্ত্তি যে পাথরে গঠিত,—ইহাও সেইরূপ এবং সেইরূপ স্বর্ণমুখ মণ্ডিত। দেবীর অষ্টভূজা বা সিংহবাহনাদি লাঞ্ছন সর্ব্বদা দেখা যায় না। নবরাত্রির সময় আবার একবারেই দেখা যায় না। দেবীমূর্ত্তি বস্ত্রাবৃতা থাকেন শুনিলাম দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর দুই মূর্ত্তি,—এই মন্দিরের এই মূর্ত্তিই ভোগমূর্ত্তি, ভোগমায়া ও বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাতা এবং দূরে পর্ব্বত শিখরে যে মূর্ত্তি আছেন তিনিই যোগমায়া নামে খ্যাত। কংস হস্তভ্রষ্ট দেবীই তিনি—সে দুর্গম স্থানে ভক্তেরা সর্ব্বদা যাইতে পারিবে না বলিয়া দেবী ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া এই সমতল ক্ষেত্রের নিকটে এই স্থানে আবির্ভূতা হইয়া আছেন।

এই মন্দিরে ছাগ বলির যেরূপ বাহুল্য এবং অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেখিলাম এরূপ আর কোথাও কোন দেবীমন্দিরে দেখিনাই। সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্ন আরত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনবরত ছাগ বলি চলিতে থাকে। বলির পশুর শৃঙ্গোদ্ভেদ না হইলে তাহা বলির যোগ্য হয় না, ইহাই শাস্ত্রবিধি কিন্তু ছাগ শিশু বলির বড়ই প্রাদুর্ভাব! এত শিশু ছাগ বলি দেওয়া হয় যে, দেখিলে বা শুনিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়!—দুইদিনের শিশুও বলি দেওয়া হয়। এই সকল শিশু ছাগ বলির জন্য যূপ নাই, মৃত্তিকা স্তূপের উপর শয়ন করাইয়া কদলী কর্ত্তনের ন্যায় কুচ্ করিয়া কাটিয়া ফেলে এবং দেহটি যখন হাতের তলে করিয়া লইয়া যায়, তখন হাতের দুই পার্শ্বে সেই কোমল দেহাংশ ঝুলিয়া পড়ে,—সে দৃশ্য দেখিলে আপাদ মস্তক কম্পিত হইয়া উঠে! পাণ্ডাদিগকে শাস্ত্র বিধানের কথা বলিয়া এই শিশু বলির রহস্য জিজ্ঞাসা করিলাম।—পাণ্ডারা বলিলেন, দেবী শিশু মাংসেরই লোলুপা,—তাঁহারই প্রত্যাদেশে স্মরণাতীত কাল হইতে এ মন্দিরে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে! আমরা যোগমায়া দর্শন করিয়া একায় আরোহণ করিলাম। একা দ্রুতবেগে পর্ব্বতাভিমুখে চলিতে লাগিল। পথে যাইতে যাইতে পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম উহা জনৈক হিন্দুস্থানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত স্বাস্থ্য নিবাস। তাঁহারই ব্যয়ে উহা পরিচালিত হয়, দৈনিক ২৲ টাকা ভাড়া দিলে থাকিতে পারা যায়। ইংরাজী ধরণের—খাদ্যাদি পাকের জন্য বাবুর্চ্চির বন্দোবস্ত আছে। পথে বিলম্ব করিব না বলিয়া আমরা আর উহা দর্শনের জন্য নামিলাম না। একা ক্রমশঃ এক নির্জ্জন ধর্ম্মশালার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। এই ধর্ম্মশালাটির বন্দোবস্তের প্রশংসা শুনিলাম কিন্তু তখন আমাদের উহার ভিতরে যাইবার আবশ্যক না থাকায়, আরও কিয়দ্দূর ঘুরিয়া আসিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের উপরে দেবী মন্দিরে রক্তবর্ণ নিশান বহুদূর হইতে দেখা যায়। এখান হইতে দামামা ধ্বনিও শোনা গেল। কিয়দ্দূর পার্ব্বত্য পথে উঠিয়া পাহাড়ের গাত্রে সুন্দর গাঁথা পাথরের সিঁড়ি পাইলাম। ইহা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া আমরা দেবী মন্দিরের নিকটে পঁহুছিলাম। মন্দিরের অর্দ্ধ পথে সিড়ির একটি চত্বরের উপরে দাঁড়াইয়া

সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়,—নিম্নে—বহুনিম্নে বহুদূরে রজত রেখার ন্যায় গঙ্গার বিমল ধারা বহিয়া যাইতেছে, তীরে বেলাভূমি, তৎপরে প্রান্তর, তৎপরে প্রথমে বিরল, পরে ঘন বিন্যস্ত বনজাত তরুশ্রেণী। গঙ্গাতীর হইতে বনের সীমা পর্য্যন্ত সমতল, পরে অল্পে অল্পে উচ্চ হইয়াছে। যে চত্বরে আমরা দাঁড়াইয়াছি এখান হইতে ধর্ম্মশালার দ্বার বহু নিম্নে এবং পর্ব্বত প্রায় সোজা হইয়া উঠিয়াছে; সেই জন্যই এই শিখরে উঠিবার জন্য সিঁড়ি করিতে হইয়াছে। পাহাড়ের নিম্নে বিরল বনের মধ্যে গরু বাছুর ছাগল দুই চারিটী দেখিলাম। নিকটে গ্রাম নাই, ধর্ম্মশালা ব্যতীত অন্য লোকালয় নাই। আরও কতকগুলি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম সিঁড়ি দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। আমরা বামের সিঁড়ি দিয়া মন্দির-পথে যাত্রা করিলাম, দক্ষিণের পথে পর্ব্বতের উপর দিয়া, ব্রহ্মকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি প্রস্রবণযুক্ত তীর্থকুণ্ডে যাইতে হয়।

দেব মন্দিরের চত্বরটি বড় বেশী প্রশস্ত নহে, প্রস্তরাদি ফেলিয়া বন্ধুর পর্ব্বতপৃষ্ঠ সমতল করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই চত্বরের চতুর্দ্দিকে কোন সময়ে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল এরূপ অনুমান করিবার অনুকূলে অনেক নিদর্শন বর্ত্তমান আছে দেখিলাম। স্থানটি নির্জ্জন, কিন্তু অপ্রশস্ত ও গভীর অরণ্যগর্ভস্থ বলিয়া বিশেষ চিত্তাকর্ষক নহে। চত্বরের একদিকে সিংহদ্বার ছিল। তাহারই সম্মুখে দেবীমন্দিরে আসিবার সিঁড়ির এক মুখ আসিয়া মিলিয়াছে। এই দ্বারের সম্মুখে যূপকাষ্ঠ দেখিলাম। আর একখানি বৃহৎ প্রস্তর এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে দেখিলাম। শুনিলাম পূর্ব্বে ঠগীদিগের প্রাদুর্ভাব সময়ে, তাহারা এই পাথরে নরবলি দিত। এক সময়ে এই মন্দিরে নররক্ত লোলুপ কাপালিক সন্ন্যাসীরও প্রাদুর্ভাব ছিল। নরবলির পাথরখানি দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। কাপালিকের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল কুণ্ডলা মনে পড়িল! এই নির্জ্জন বনে কপালিনীর মন্দির চত্বরে দাঁড়াইয়া সেই নীলোর্ম্মি-চঞ্চল বারিধি তটস্থ কাপালিকের ভৈরব রব "কপাল কুণ্ডলে!" এই বিরাটধ্বনি যেন শুনিতেছিলাম। মন্দির চত্বরে মালাকর পত্নীরা পূজার্থীর জন্য ফুলমালা নৈবেদ্য বেচিতে বসিয়াছে। সংখ্যায় তাহারা বেশী নহে ৪।৫ জন মাত্র। দরিদ্র ভারতের এই বনান্তরালে

পর্ব্বত গর্ভে ভিখারীর অভাব দেখিলাম না অথবা বিশ্বজননীর দ্বারে মায়ের হতভাগ্য সন্তানেরা আসিয়া কাঁদিয়া, ভিক্ষা করিয়া কর্ম্মের মহিমা জানাইতেছে, কর্ম্মফলের অবশ্য ভোগ দেখাইতেছে এবং জগজ্জননীর কৃপাতেই যে এই গভীর বনেও যাত্রী সমাগম হইয়া তাহাদের অন্ন সমাগম হইতেছে তাহাও বুঝাইয়া দিতেছে। মালিনীরা মৃৎপাত্রে গঙ্গাজল, পাতার দোনায় ফুল, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, তিল, যব, (চাউল নাই) এবং সাগুদানার ন্যায় চিনির দানা বেচিতেছে। দুই পয়সায় সমস্ত পাওয়া যায়। দেবীমন্দির হাতে গড়া নহে। একটি পর্ব্বতচূড়া চাঁচিয়া ছুলিয়া মন্দিরাকার করা হইয়াছে। তাহারই মধ্যে পাথর খুদিয়া গহ্বর করা হইয়াছে। গহ্বরের উচ্চতা বড় অল্প, মধ্যাকারের বামন ব্যক্তিও সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। উচ্চতার তুলনায় গহ্বরের প্রশস্ততা বেশী। ২০ জন লোক তন্মধ্যে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পূজা পাঠ করিতে পারে। মন্দিরের এক ভিত্তিগাত্রে এক প্রশস্ত কুলঙ্গীতে দেবী বিরাজিতা। দেবীর অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, কিন্তু পাথরের টালির গায়ে পাথর চাঁচিয়া গড়া। প্রতিমা ক্ষুদ্র। ভক্তের অঞ্জলি প্রদত্ত পুষ্পাদি ভিন্ন মায়ের আর কোন ভূষণ নাই, সিন্দূর ভিন্ন অন্য অঙ্গরাগ নাই এবং যাত্রী প্রদত্ত ঘৃত দীপ ও কর্পূর দীপ ব্যতীত আর কোন বিলাস নাই। মন্দির তল পরিস্কার,—প্রতিদিন যাত্রী অল্প না হইলেও ফুলে, পাতার জলে মন্দিরতল পরিব্যাপ্ত নহে। পাথরের মেজে বেশ শুষ্ক। মেজেতে বসিয়া অনেকে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন,—একজন পড়িলেন,—"মহিষাসুরনির্ণাদি বিধাত্রী বরদে নমঃ!" অমনি স্মরণ হইল,—এই বিন্ধ্য পর্ব্বতই মায়ের আমার সেই লীলাভূমি;—এই পর্ব্বত গাত্রেই মহিষাসুরের ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিল,—এই স্থানে মা নগেন্দ্রনন্দিনী মহিষমর্দ্দিনী হইয়াছিলেন,—এই পর্ব্বতেই মা কৌষিকীর হুহুঙ্কারে শুম্ভ নিশুম্ভ হত হইয়াছিল।—কে জানে এই মন্দির সেই সকল লীলাস্থলের কোনটির স্মৃতি নিদর্শন কি না?—আবার মনে হইল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সূত্রপাতে মহামায়া কংসহস্ত পরিভ্রষ্টা হইয়া অষ্টভূজা মূর্ত্তিতে বিন্ধ্যাচলে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। এখন বর্ত্তমানে আমরা এই যে মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ইহা মায়ের আমার কোন্ লীলার মূর্ত্তি?—

ইহা অসুরঘাতিনী লীলার মূর্ত্তি না দানবমোহিনী লীলার মূর্ত্তি ?—কে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিবে ? আমার অদৃষ্টে মাতৃ দর্শন ঘটিল না।—মায়ের মন্দিরের উচ্চতা যেমন অল্প, প্রবেশ দ্বারও তেমনি ক্ষুদ্র—বসিয়া নিম্নমুখে অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে হয়। একটু স্থূলকায় হইলে, একটু ভূঁড়ি থাকিলে আর সে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার উপায় নাই! যাক্,—মায়ের গহ্বরের পার্শ্ব দিয়া মন্দিরমধ্যে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় একটী পথ আছে, তাহা দিয়া 'কালী-খো' নামক গুহার অপর পার্শ্বে যাওয়া যায়। "কালী-খো" অর্থে কালী-গহ্বর। শঙ্খাবর্ত্ত পথে গুহার শেষে আসিয়া ঐরূপ পাথরের টালিতে খোদিত কালিকামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও মূল মন্দিরের ন্যায়ই সমস্ত, তবে এখানে একজনের বেশী দুই জনের স্থান হয় না; কাজেই কোন সূক্ষ্মকায় দর্শন করিয়া ফিরিয়া না আসিলে অপরে প্রবেশ করিতে পারে না; তবে মা কালী ভক্তের প্রতি ততটা নিদয়া নহেন তাই বিনা আয়াসে তাহার দর্শন করিবার অন্য উপায় করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের বহিঃপ্রাচীর গাত্রে একটী ঘুলঘুলি কাটা আছে, তদ্দ্বারা কালী দর্শন বেশ স্পষ্টরূপে হয়।—শুনিলাম এই দেবী ঠগীদের পূজিতা ছিলেন। এই চত্বরের পার্শ্বে ৮।১০ হাত উচ্চে আর একটী চত্বর আছে, সেখানে ছাদ খোলা একটী চতুরস্র গৃহ আছে। শুনিলাম উহা মহাকালের মন্দির। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গৃহের এক পার্শ্বে মেজের এক গর্ত্ত মধ্যে এক বিরাট শিবলিঙ্গ এবং ঘরের অন্যান্য অংশে আরও কয়েকটি শিবলিঙ্গ অবং অন্য কয়েকটি ভগ্ন দেবমূর্ত্তি দেখিলাম।

মহাকাল দর্শনের পর আমরা যোগমায়া বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় লইলাম এবং পার্ব্বত্য পথে ঘুরিয়া ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থে উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মকুণ্ড ও অগস্ত্যকুণ্ড একই শিখরে অবস্থিত। শিখরটি পর্ব্বতের চূড়াকার নহে। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে যেন ক্ষয় হইয়া অসমান স্তরে বিভক্ত হইয়া সমতল ভূমিতে গিয়া মিশিয়াছে। এই স্তরের মধ্যস্থানে দুইখানি পাথরের ফাটল দিয়া জল গড়াইয়া আসিতেছে এবং নিম্নের এক একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তে পড়িতেছে। ইহার বামেরটি ব্রহ্মকুণ্ড দক্ষিণেরটি অগস্ত্যকুণ্ড। এখানে স্নান তর্পণ করিতে হয়। পাণ্ডা কেহ নাই, তবে দূর

গ্রামের এক ব্রাহ্মণী আসিয়া বসিয়া থাকে ও যাত্রীদিগের মাথায় কুণ্ডজল ছিটাইয়া দিয়া এক পাই, আধ পয়সা, এক পয়সা মাত্র দর্শনী লয়। স্থান চতুর্দ্দিকের ঘন বৃক্ষছায়ায় কতকটা অন্ধকার। কুণ্ডদ্বয়ের জলধারা গড়াইয়া সমতল ভূমি বাহিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছে। এখানে সেরূপ যাত্রী সমাগম হয় না। তৎপরে আমরা আবার পাহাড় বহিয়া উঠিয়া ভৈরবকুণ্ড দর্শনে চলিলাম। একটু দূর যাইতেই দেখিলাম—কি ভীষণ স্থান! দুইদিকে দুরারোহ পর্ব্বত! প্রাচীর গাত্রের মত সোজা নহে, স্তর বিভক্ত, বন্ধুর এবং কতকটা গর্ত্ত, কতকটা যেন বাহিরে ঝুঁকিয়া আছে! মধ্যস্থানে অতি উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত পাহাড় যেন সুবিন্যস্ত সিড়ির ন্যায় স্তরে স্তরে উঠিয়া গিয়াছে। দেখিলেই যেন মনে হয় একটী জল প্রপাত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। স্থানটী ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের উভয় বাহু স্থানের পর্ব্বত দুরারোহ,—ভূমিভাগ উভয় বাহুর মধ্যস্থ খোলা স্থান একবারে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উভয় বাহুর মিলন স্থানই জলপ্রপাত সদৃশ। এই পর্ব্বতের শিখর দেশ এত উচ্চ যে মাথা তুলিয়া দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। ত্রিভুজের দুই বাহুস্থ পাহাড়ে এত ঘন নিবিড় বন যে দ্বিপ্রহরে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। স্তর বিন্যস্ত প্রপাত সদৃশ পর্ব্বত গাত্রে গাছ পালা নাই, কেবল সর্ব্ব শেষে শীর্ষ স্থানে এক অতি বিস্তৃত বৃহৎ শাখা প্রশাখাযুক্ত শিমূল গাছ ঃ—হিতোপদেশের "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু ঃ"—যে কি পদার্থ তাহা এইখানে বেশ অনুভব করিলাম। এই শুষ্ক প্রপাতের মাঝামাঝি একস্থানে ব্রহ্মকুণ্ডের ন্যায় একটী কুণ্ড আছে,—তাহাই ভৈরবকুণ্ড। সেখানে শ্বাপদের আশঙ্কা থাকায় রিক্ত হস্তে আমরা কেহ গেলাম না। ভৈরবকুণ্ডের ভৈরবভাব স্মরণ করিতে করিতে আমরা সীতাকুণ্ড পাহাড়ে চড়িলাম। সীতাকুণ্ড পাহাড়ের এক একস্থানে একটু লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া চড়িতে হইল কিন্তু শেষে উঠিয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম। পর্ব্বত শীর্ষে এতক্ষণ বেড়াইতেছি কিন্তু এমন খোলাস্থান পাই নাই। সম্মুখে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খোলা। পশ্চাদ্দিকে সোজা দুরারোহ পাহাড়ে বামে ব্রহ্মকুণ্ড যাইবার পার্ব্বত্য পথ দক্ষিণে অতি উচ্চ পর্ব্বত—তাহাতে উঠিবার জন্য শতাধিক ধাপ সিঁড়ি গাথা আছে। তখন আমরা খুব ক্লান্ত,

তাই আর এই প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ পাহাড়ে কৌতূহল হইলেও সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে আগ্রহ করিলাম না। শুনিলাম উহারই উপর শুম্ভ নিশুম্ভের রণভূমি।

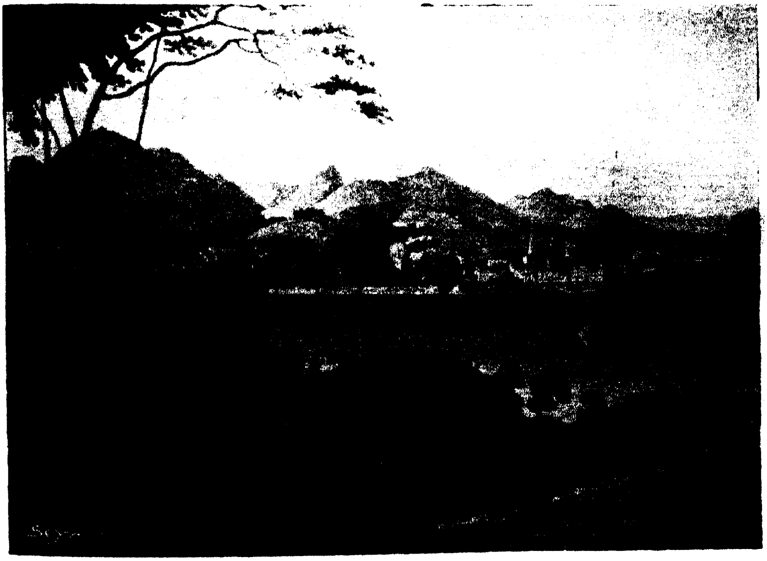
পশ্চাতের সোজা পাহাড়ের একটী ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু জল চুঁয়াইতেছে আর তাহা নিম্নে একটী ৬ ইঞ্চি গভীর ২ ফুট লম্বা ১ ফুট চওড়া কুণ্ডে সঞ্চিত হইতেছে। এই কুণ্ডের সম্মুখে বিস্তৃত চত্বর, পাথরের টালি দিয়া বাঁধান। এই কুণ্ডে ছোট ঘটি ডুবাইয়া যত ইচ্ছা জল তুলিয়া লও কুণ্ড কখন খালি হইবে না বা ছাপাইয়া উঠিবে না। অতিরিক্ত জল কুণ্ডের অন্তরস্থ শিরাদ্বারা বহিয়া কিছু নিম্নে নর্দ্দামার জলের ন্যায় ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে ও সেই জল গঙ্গায় গিয়া মিশিতেছে। এই সীতাকুণ্ডের জল অতি স্বাদু, সুশীতল এবং স্বাস্থ্যকর। বিন্ধ্যাচল ও মীর্জ্জাপুর হইতে অনেকে এই জল পানার্থ লইয়া গিয়া থাকেন। এই জলে আমরা স্নানাদি করিলাম। কুণ্ডে অবগাহন করা চলে না, সঙ্গে মৃৎ-কলস ছিল, তাহা ভরিয়া ভরিয়া একে একে সকলেই স্নান করিলাম, ক্ষুধা যথেষ্ট পাইয়াছিল তবু ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য কেবল জলই কতকটা খাওয়া গেল। এই সীতাকুণ্ডের পার্শ্বে একটী গাছের পাতায় স্বভাবতঃ রামনাম লেখা জন্মায় শুনিয়া দেখিতে গেলাম কিন্তু, পাতার সে দাগ হইতে 'রাম' কেন কোন অক্ষরই—না "বাঙ্‌লা" না 'নাগরি' বাহির করিতে পারিলাম।--গাইড আমাদিগকে অবিশ্বাসী মূর্খ বলিয়া চুপ করিল। সীতাকুণ্ডের ঝরণার একটু নিম্নে একটী ধ্বংসাবশিষ্ট কুটিরের আদ্‌রা আছে। গাইড উহাকে সীতাদেবীর রন্ধনশালা বলিয়া পরিচয় দিলেন। আমরা দেখিলাম উহা কোন সন্ন্যাসীর কিয়দ্দিবসের আশ্রয় স্থান, আপাততঃ পরিত্যক্ত ও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। সীতাকুণ্ডে কোন পাণ্ডা নাই কেবল ব্রহ্মকুণ্ডের ন্যায় এক রমণী আছে, তাহার আশাও তদনুরূপ।

স্নানাদির পর আমরা সীতাকুণ্ড পাহাড় হইতে নামিয়া সমতল রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা হাঁটিবার পর ধর্ম্মশালার দ্বারে আমাদের এক্কা গুলিকে দেখিলাম। তৎপরে উদর জ্বালায় জ্বলিত হইয়া অশ্ব পৃষ্ঠে তীব্র কষাঘাতের ব্যবস্থা করিয়া রণভূমি ত্যাগ করিলাম। শুনিলাম শুম্ভ নিশুম্ভের

রণভূমি অতিক্রম করিয়া গেলে সাত রাজার দেউলের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।—তাহা দেখিবার লোভ তখন আর কাহারও ছিল না, তখন বাসায় আসিয়া মা বিন্ধ্যবাসিনীর প্রসাদী খেচরান্ন ও কচি ছাগলছানার ঝোলের প্রতিই সকলে কায়মনোবাক্যে আকৃষ্ট হইতেছিলাম। তৎপরে বাসায় আসিয়া আহারান্তে অপরাহ্ণে বিন্ধ্যাচল ত্যাগ করিলাম।

গয়া।

এমন ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অতি বিরল যিনি কখনো গয়াতীর্থে যাইতে অভিলাষী নহেন, কারণ ইহা পিতৃ তীর্থগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। গয়া সকলেরই সুপরিচিত, কাজেই ইহার সম্বন্ধে সংক্ষেপেই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। রেল ষ্টেসন হইতে তীর্থ স্থান দুই মাইল দূরবর্ত্তী। ফল্গুনদীর দক্ষিণ কূলে গয়া নগরী অবস্থিত। বিষ্ণুপাদ পদ্মে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ড দিবার জন্য এখানে যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে।



গয়ার সাধারণ দৃশ্য।

(শত বর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত)।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে প্রথমে গয়াধাম হিন্দুতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল না,—প্রথমে ইহা বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের পরে ইহা হিন্দুতীর্থ রূপে প্রখ্যাত হইয়াছে। তাঁহাদের এই মত সমীচিন বলিয়া

বোধ হয় না, কারণ বাল্মীকিয় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও গয়ার নাম উল্লেখ আছে।

ত্রষ্টব্যা বহবং পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ॥
(অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭। ৩-১০)

গয়ার চতুর্দ্দিকে পাহাড়, কেবল পূর্ব্বদিকে স্বল্প সলিলা ফল্গুনদী প্রবাহিতা। ফল্গু অন্তঃসলিলা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ কিন্তু বাস্তবিক অন্তঃসলিলা নহে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আমরা গয়ার নীচে ফল্গুতে এক হাত হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত গভীর জল দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দুর নিকট এই ফল্গুনদীও একটী প্রধান পুণ্যতোয়া নদী। ওড়িষ্যার বৈতরণী যেমন জীবিত ব্যক্তিকে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত করিয়া দেয়, ফল্গু তেমনি পিতৃগণকে প্রেতাত্মা হইতে মুক্তি দিতে সক্ষমা, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস, গয়ার উত্তরদিকে রামশিলা, দক্ষিণদিকে ব্রহ্মযোনি ও পশ্চিমে প্রেতশিলা এবং কেটারি পাহাড় অবস্থিত। গয়ার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে গয় নামক একজন ধীমান ও যশস্বী নরপতি ছিলেন হিন্দুর পুরাণে ইনি অসুর জাতীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তাহারই নামানুযায়ী এই নগরীর নামোৎপত্তি হইয়াছে। এই পুণ্যতীর্থের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারত, হরিবংশ, বায়ু পুরাণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়।

গয়ার তীর্থগুলি প্রায় সমুদয়ই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। রামশিলা নামক পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সীতাদেবী সহ বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার নাম রামশিলা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই পাহাড়ে উঠিবার কোনও পথ ছিল না কাজেই—পাহাড়ের উপরে উঠিয়া মন্দিরমধ্যস্থিত দেবতা দেখিবার পক্ষে যাত্রিগণের বিশেষ কষ্ট হইত; বিকারির মহারাজা রণবীর সিংহের কৃপায় সে কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই সিঁড়ি হওয়ায় উপরে উঠিতে কোনওরূপ কষ্ট হয় না,—পর্ব্বতোপরি দুইটী দেবমন্দির আছে, উহার একটীর মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্ত্তি, আর অপরটির

মধ্যে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। শিব-মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুইটী কুণ্ড আছে, উহার একটী দিয়া শীতল এবং অপরটি দিয়া উষ্ণ জল প্রবাহিত হয়। মন্দিরের পশ্চিমভাগে একটী নির্ঝরিণী ঝর্ ঝর রবে নিরন্তর ঝরিতেছে—বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ই সর্ব্বোচ্চ, উহার শিখরদেশে ব্রহ্মযোনি, মাতৃযোনি গুহা আছে। পৌরাণিক উক্তি এইরূপ যে ঐ গুহা হইতে একবার বাহির হইয়া আসিতে পারিলে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই পাহাড়ের শিখরদেশেই সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী ব্রহ্মশক্তির এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি অবস্থিত। এই পাহাড়ে আরোহণ করিবার সোপানাবলী প্রাতঃস্মরণীয়া রাজ্ঞী অহল্যাবাই নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের আরও যে দুইটী পুণ্যস্থান আছে তাহার একস্থানে বসিয়া ব্রহ্মা গো-দান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেস্থানে পর্ব্বতগাত্রে অসংখ্য গো-পদ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অপর স্থানটিতে মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেখানে তাঁহার জানুর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তিনি বামজানু পাতিয়া পিণ্ডদানকালে জানুর ভরে পর্ব্বতে জানুর আকারে খাল হইয়া গিয়াছে, সেই খাল বর্ত্তমান। এই পাহাড়ের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ অক্ষয় বট ও গৌরীদেবীর মন্দির রহিয়াছে, অক্ষয় বটমূলেই পিণ্ডদান করিয়া তীর্থগুরু গয়ার পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ করিতে হয়। যে যে স্থানে তীর্থগুরু পাণ্ডা বর্ত্তমান সেই সেই স্থানে 'সুফল' লইবার ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গালাদেশের তীর্থেও এ ব্যবস্থা আছে। কথাটী 'সুফল'রূপে চলিয়া গিয়াছে—আসলে কিন্তু 'সুফল' নহে—'সফল'—তীর্থকৃত্য করিয়া তীর্থগুরুদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া—'তীর্থকৃত্য সফল হইল' এইরূপ আশীর্ব্বাদ লইতে হয়। প্রেতশিলা নামক পাহাড়েও পিণ্ডদান করিতে হয় নচেৎ প্রেতত্ব দূরীভূত হয় না। এসকল ছাড়া সীতাকুণ্ড পাহাড়ে সীতাকুণ্ড নামক কুণ্ড, রামগয়া প্রভৃতি দেখিবার স্থান আছে। রামগয়াতে রাম সীতার মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটী কুণ্ডে—একখানি সুন্দর কষ্টিপাথরে হাত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত জাগিয়া আছে—সেই একটী প্রস্তরময় লড্ডুক। ইহার ব্যাখ্যা এই—সীতাদেবীর প্রদত্ত পিণ্ড দশরথ

হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতেছেন। মন্দিরটি বড় পুরাতন নহে। রামগয়া ফল্গুর বাম তীরে। আর ঠিক উহার বিপরীত দিকে নদীর দক্ষিণকূলে গয়া সহরের মধ্যে বিষ্ণুপাদ মন্দির। ইহাই গয়াতীর্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। এই মন্দির খুব সৌন্দর্য্য সম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা গঠিত, উপরের চূড়াটি সোনার পাতে মণ্ডিত। মন্দির সম্মুখেই সুপ্রশস্ত নাট-মন্দির ইহা কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রস্তুত। বিষ্ণু-পাদ-পদ্মের বর্ত্তমান মন্দিরটি রাজ্ঞী অহল্যাবাইয়ের অপর কীর্ত্তি। মন্দির মধ্যে প্রায় ১৩×৬ ফুট একখানা বিস্তৃত প্রস্তর ফলকের উপর রৌপ্য নির্ম্মিত ষোড়শ কোণ বিশিষ্ট একটী কুণ্ড মধ্যে বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম অবস্থিত। এই কুণ্ডমধ্যে একখানি কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ বন্ধুর শিলাখণ্ডে একখানি পদাঙ্ক আছে। পদাঙ্ক এখন আর সহজে লক্ষ্য হয় না, দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে পায়ের আকৃতি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কর্দ্দমে পা বসিয়া গেলে যেভাবে পদাঙ্ক বসিয়া যায়—এই পদাঙ্কও তদ্রূপ। পদাঙ্কে বিষ্ণুপদের শাস্ত্রোক্ত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি লাঞ্ছনগুলি এখন পাণ্ডার কথায় অনুমান ও ভক্তির সাহায্যে মিলাইয়া দেখিতে হয়। অনবরত পিণ্ড, ফল্গুদক, দুগ্ধ ও পুষ্প, তুলসীপাতে ও অবিরত মার্জ্জনের বলে ঐসকল চিহ্ন ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কথিত আছে এই পদাঙ্কযুক্ত পাথরখানি গয়াসুরের মাথায় স্থাপিত। পুরাণানুসারে এই শিলাখানি মরীচি ঋষির পত্নী ধর্ম্মব্রতার দেহ বলিয়া কথিত আছে। গয়াসুর ও ধর্ম্মব্রতার উপাখ্যান গয়ামাহাত্ম্যে অতি বিস্তৃত-ভাবে কীর্ত্তিত আছে।

গয়ার তামাক, কষ্টিপাথরের জিনিষ দেশবিদেশে বিখ্যাত। এখানকার পয়সার নাম ঢেবুয়া, পয়সাগুলি লৌহখণ্ডের উপর তাম্র দিয়া নির্ম্মিত, উহার পাঁচটীতে আমাদের এক আনা হয়। গয়া জেলার গয়াই প্রধান নগর,—নগরের লোক সংখ্যা ৮০,৩৮৩। এ জেলায় ছোট ছোট অনেক পাহাড় আছে তন্মধ্যে মাহের পাহাড় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১৬২০ ফুট উচ্চ হইবে। গয়া নগর হইতে ইহার দূরত্ব ৬ ক্রোশ। এ জেলায় ধান্য, যব, গম, কোদো, ছোলা, মটর, খেসারি, কলাই, শণ, পাট, তূলা, সর্ষপ, অহিফেন, নীল, ইক্ষু, পান, আলু যথেষ্ট

জন্মিয়া থাকে। সিপাহীবিদ্রোহের ভীষণ বহ্নিতে এস্থানও জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেসময় এখানকার সমুদয় রাজকীয় কাগজপত্র নষ্ট হওয়ায় এ জেলার প্রাচীন ইতিহাস এখন আর জানিবার কোনও উপায় নাই। সমগ্র গয়া জেলাতে বর্ত্তমান সময় ১২টী ফৌজদারী ও পাঁচটী দেওয়ানী আদালত আছে। যখন রেল হয় নাই সে সময় গয়াযাত্রীদিগকে দস্যু তস্করের হস্তে নানারূপে নির্য্যাতিত হইতে হইত। খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এস্থানে পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতিগণের আধিপত্য ছিল, পরে উহা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বেহার প্রদেশ ইংরেজরাজের হস্তগত হইলে মহারাজ সিতাব রায় এই জেলার বন্দোবস্তের কার্য্য করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে এস্থানে বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়। এখানকার পাণ্ডারা অম্বষ্ঠকুল-সম্ভূত, কিন্তু ব্রাহ্মণের মত কাজ করিতে করিতে ইঁহারা এখন ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। গয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে পাণ্ডারা সকলেই 'গয়ামাহাত্ম্যে' বর্ণিত গয়াসুরের উপাখ্যানটি বর্ণনা করিয়া থাকেন, গয়াসুরের কাহিনী বাঙ্‌লার নরনারীর এতদূর পরিচিত যে বাহুল্য ভয়ে আর এস্থানে তাহার কোনও উল্লেখ করিলাম না। গয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪টী পুণ্যস্থান। এই সকল স্থানেই পিতৃকার্য্য এবং পিতৃগণের স্বর্গার্থে দানাদি করিতে হয়। সমস্ত তীর্থ ঘুরিতে মাসাধিককাল সময় ও ন্যূনকল্পে দুইশতাধিক মুদ্রা ব্যয় লাগে। সামান্যতঃ প্রধান প্রধান ৩৫টী স্থানে ঘুরিতে হইলেও সপ্তাহকাল সময় লাগে আর সংক্ষেপতঃ ফল্গুতীরে, বিষ্ণুপদে ও অক্ষয়বটে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া মৃত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণের নামে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পিণ্ডদান করিতে তিনদিন সময় লাগে। আপাততঃ অধিকাংশ বাঙ্গালী এই সংক্ষেপ রীতিই মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রীয় শাসনবাক্যের সম্মানমাত্র রাখিয়া চলিতেছে। এখানকার তীর্থ ব্রাহ্মণেরা মথুরার চৌবেদিগের ন্যায় দশবিধ ব্রাহ্মণের বহির্ভূত সম্প্রদায়। ইহারা ব্রহ্মাকল্পিতব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ এবং শ্রাদ্ধের দান তীর্থস্থানে গ্রহণ জন্য অন্যান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে হীন মর্য্যাদ। গয়ার চারিদিকের তীর্থস্থানে পাণ্ডাগিরি যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা এই 'গয়ালী' ব্রাহ্মণেরাই করিয়া থাকেন।

গয়ার তীর্থকার্য্য সারিয়া আমরা পরদিন প্রত্যুষে বুদ্ধগয়া দেখিতে রওয়ানা হইলাম। বহুদিন হইতেই মহাত্মা বুদ্ধদেবের সে পুণ্যলীলাভূমি দর্শন করিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা ছিল, এতদিনে তাহা সফল হইতে চলিল—তাই আমার হৃদয়-গঙ্গায় আনন্দের ও ঔৎসুক্যের বাণ ডাকিয়া উঠিয়াছিল। একদিন যে মহাপুরুষের মহান্ ধর্ম্ম দেশ দেশান্তরে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল, যে মহান্ ধর্ম্মে 'আজিও যুড়িয়া অর্দ্ধ জগত ভক্তি-প্রণত-চরণে যাঁর,' সেই মানবদেবতা—আর্ত্তের ব্যথা মোচনকারী মহাপ্রভুর শ্রীচরণরজ-লাঞ্ছিত—গৌরবময় পুণ্যভূমির পথে যখন শ্রদ্ধা ছুটিয়া চলিল—তখন আমার মনে কেবলি জাগিতেছিল—মানবপ্রেমিক সিদ্ধার্থের সেই করুণ-কোমল মুখখানি।

বুদ্ধগয়া।

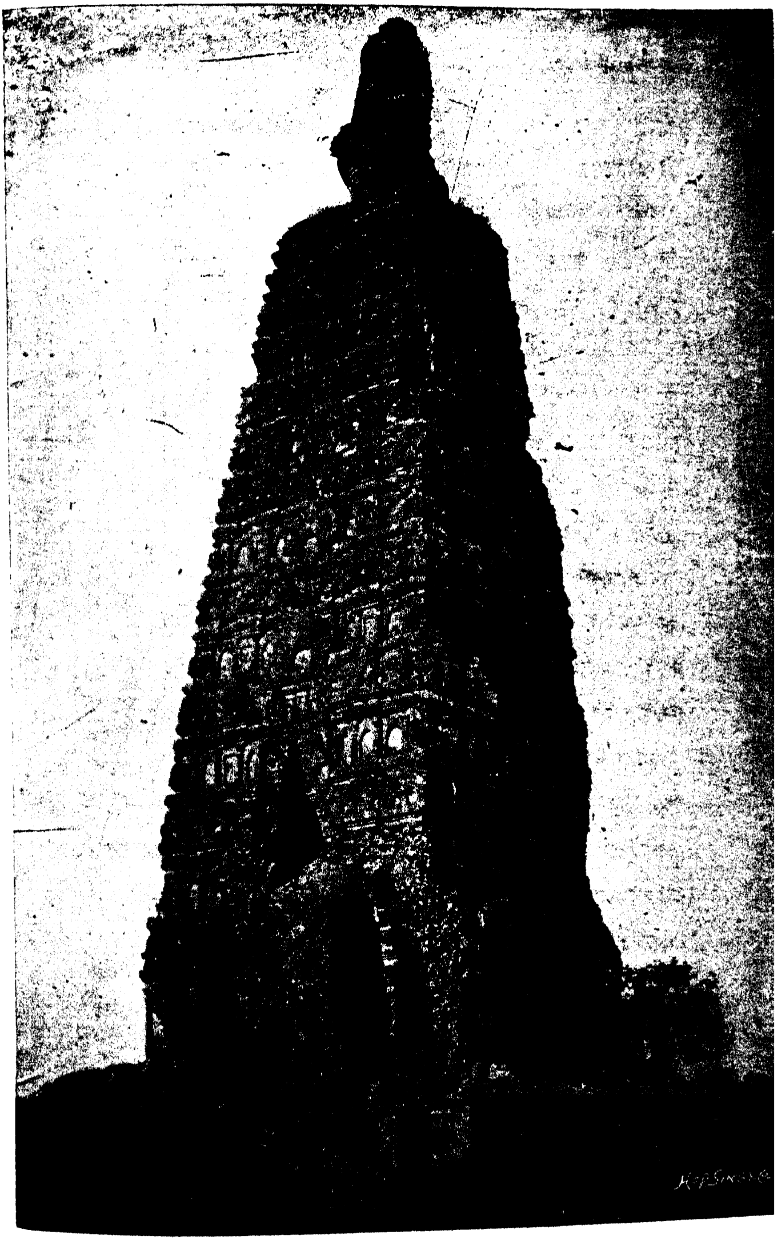
হাসিমুখে যখন উষা সুন্দরী কনক রবির কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিলেন,—নবীন প্রভাতের সেই তরুণ কোমল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিহগকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতেও বুদ্ধের মহিমার সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, সেই জীবপীড়ায় কাতর সদয় হৃদয় শাক্য সিদ্ধার্থের অপূর্ব্ব বুদ্ধলীলার মাধুর্য্য ভাবিতে ভাবিতে আমরা এক্কা আরোহণে বুদ্ধগয়ার দিকে রওয়ানা হইলাম। বুদ্ধ গয়া, গয়া হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে; সুন্দর পথ—পথের উভয় পার্শ্বে আম্র ও খর্জ্জুর বৃক্ষের শ্রেণী,—ফাল্গুনের সেই স্নিগ্ধ সুন্দর প্রত্যূষে কবির সেই 'চূত মুকুল বাসে মন যে হরে', তাহা সেদিন আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম। দূর হইতে এই বৃক্ষ শ্রেণী যেমন সুন্দর দেখায় ইহার ছায়া দিয়া যাইতে নব মুকুলিত চূত কলিকার সুগন্ধ উপভোগ করিয়া মনও তেমনই প্রফুল্লিত হয়। বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় বুদ্ধ গয়া পঁহুছিলাম, পঁহুছিয়াই আমরা বহুকালের প্রাচীন বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখিতে গমন করিলাম। কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে যতক্ষণ সেই দুই হাজার বৎসরের পুরাতন মন্দিরটি না দৃষ্টিগোচর হইতেছে ততক্ষণ কোন ক্রমেই শান্তি পাইতেছি না। পথের কিয়দ্দূর হইতেই উহার শিখর দেশ দৃষ্টিগোচর হইল এবং বিস্ময়ে ও যাঁহার স্মৃতিতে এই স্থান বিজড়িত তাঁহার মহিমার কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া উঠিল। ক্রমে আমরা মন্দির সম্মুখে উপনীত হইলাম। ভগবান শাক্যসিংহ যে স্থানে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন—সেই পুণ্য স্থান দর্শনে হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্মদান করিতে এমন ত্যাগী মহাপুরুষ জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ১৭০ ফুট হইবে। নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত বলিয়া ইহার প্রকৃত উচ্চতা বুঝিতে পারা যায় না। প্রায় ৫০ ফুট বিস্তৃত বেদীর উপর ইহা অবস্থিত, মন্দিরটী ত্রিতল।

মন্দিরের কথা।

সর্ব্ব নিম্ন তলে বুদ্ধদেবের বৃহৎ প্রতিমা বিরাজিত। এই প্রতিমা প্রস্তরের কিম্বা মৃত্তিকার তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বাস্তবিক

সামান্য দৃষ্টিতে আমরাও তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কিংবদন্তী এই-রূপ যে পূর্ব্বে এই মন্দিরে যে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ছিল তাহা স্থানান্তরিত হওয়ায় ব্রহ্মদেশবাসিগণ তাহার স্থলে এই মৃণ্ময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এইমূর্ত্তির দুই দিকে দুইটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের চারিদিকে মহারাজ অশোকের নির্ম্মিত প্রস্তরের রেলিঙের কতকাংশ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি হিন্দুদের অধিকারে আছে। বৌদ্ধ পরিব্রাজক সুবিখ্যাত ধর্ম্মপাল হিন্দু মোহন্তদিগের হস্ত হইতে ইহা উদ্ধার করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া এখনও কৃতকার্য্য হন নাই। নিম্নতলের বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা অপর একটী কক্ষে গমন করিলাম ও সেখানে 'মায়াদেবীর' মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

মন্দির ও মন্দিরের প্রাঙ্গণের পরিসর ১৫০০ × ১৪০০ ফুট। বৌদ্ধগয়া ও তারিডি গ্রামের মাঝখান দিয়া যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তার দ্বারায় মন্দিরাধিকৃত ভূ-ভাগ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তরাংশে জমির পরিমাণ বেশী, দক্ষিণাংশেই মন্দির বর্ত্তমান। মন্দিরের দক্ষিণ দিয়া নীলাজন বা নৈরঞ্জনা নদী প্রবাহিত। বৌদ্ধগয়ার অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে মোরা পাহাড়ের নীচে মোহনা নামক আর একটী ক্ষুদ্র নদীর সহিত নৈরঞ্জনা নদী মিলিত হইয়া ফল্গুনাম ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। উত্তরাংশের ভূ-ভাগ "রাজস্থান," "রাজাবাড়ী" বা "গড়" নামে খ্যাত। মন্দিরের গাত্রে সর্ব্বত্র বহু বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। মুল মন্দির নির্ম্মাণের সময় প্রস্তর প্রাচীর গাত্রে ছোট বড় কুলুঙ্গি কাটিয়া তন্মধ্যে এই সকল বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত; কতকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ কালেই প্রস্তুত এবং কতকগুলি পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মন্দিরের গাত্রে অসংখ্য ছাঁচে ঢালা মাটির মূর্ত্তি চুণ, সুরকি দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এগুলি গরীব বৌদ্ধ ভক্তের মানসিক পূজার পরিপূর্ত্তি স্বরূপ দেব প্রতিষ্ঠার অনুকল্পাচরণ। ব্যয় সাধ্য চৈত্য স্থাপন, বুদ্ধ প্রতিমা স্থাপন, যাহারা করিতে পারিত না, তাহারাই পুত্তলিকা ক্রয়ের ন্যায় এই সকল মৃণ্ময় মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া যথাবিহিত শাস্ত্রবিধানানুসারে এই পবিত্র ক্ষেত্রে পবিত্র মন্দির গাত্রে লাগাইয়া দিত ও প্রতিষ্ঠা করিত। কালক্রমে এইরূপ মৃণ্ময় মূর্ত্তির অনেক গুলি মন্দির গাত্র হইতে খসিয়া গিয়াছে। চারিদিকে



বুদ্ধগয়ার মন্দির মেরামতের পূর্ব্বে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাত

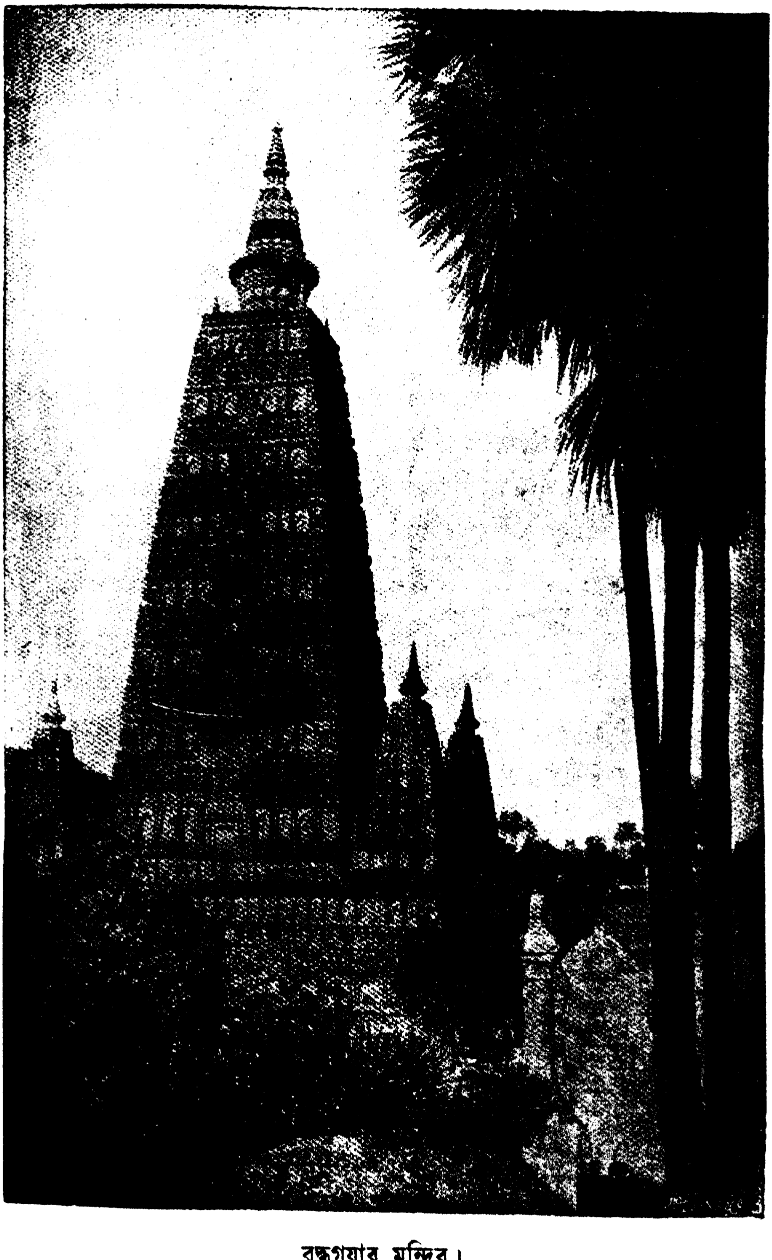
ইহার ভগ্ন খণ্ড সকল বিকীর্ণ হইয়া আছে। মন্দিরটী বৌদ্ধধর্ম্ম ধংসের পর হিন্দুরাজগণের উপেক্ষায় এবং মুসলমানের অত্যাচারে বহুকালাবধি কালের প্রভাব সহ্য করিতে করিতে একেবারে ধংসমুখে পতিত হইয়াছিল, খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই প্রাচীন মন্দিরের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মদেশের রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ধর্ম্মরাজ গুরু নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দেন। ১০৩৫ খ্রীঃ অঃ তিনি এই মন্দিরে এক বৃহৎ তাম্র নির্ম্মিত স্বর্ণমণ্ডিত ছত্র স্থাপন করেন। কিন্তু মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য তাঁহার দ্বারা বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। ১০৭১ খ্রীঃ অঃ আর একজন ব্রহ্মদেশীয় কর্ম্মচারী সাতবৎসর পরিশ্রম করিয়া এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করেন। মুসলমানের বঙ্গবিজয়ের কিছু পূর্ব্বে অশোকবল্লদেব মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার করাইয়াছেন। তাহার পর ৬০০ বৎসর কাল মুসলমানের অত্যাচারে এখানকার অধিবাসী পর্য্যন্ত মন্দির ফেলিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। গ্রাম, নগর, দেবায়তন সকলি জঙ্গলে ভরিয়া যায়, মন্দিরও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ ব্রহ্মরাজ এই মন্দির সংস্কারের জন্য তিনজন কর্ম্মচারী পাঠান। তাঁহারা সংস্কার কার্য্যে সুবিধা করিতে না পারিয়া ইংরাজ রাজের শরণাপন্ন হ'ন, তখনকার ছোটলাট সার এস্‌লি ইডেন, জে, ডি, বেগ্‌লার নামক জনৈক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীকে সংস্কার কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তাঁহার দ্বারাও কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয় নাই, অবশেষে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই কার্য্যের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। আজ আমরা যে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন মহাকীর্ত্তি বর্ত্তমান দেখিতেছি তাহা উঁহাদের উভয়ের অধ্যাবসায় ও যত্ন এবং ব্রহ্মদেশবাসীর ধর্ম্ম প্রাণতা, ভক্তি এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঐ মন্দির ৫৪৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সংস্কারের পর ইংরেজ রাজ যে খোদিত লিপি ইহার গাত্রে গাঁথিয়া দিয়াছেন, আমরা পাঠকদের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"This ancient temple of Mohabodhi erected on the

holy spot where Prince Sakya Sinha became Buddha was repaired by the British Government under the order of Sir Ashley Eden, Lieutenant-Governor of Benga. A. D. 1880."

বোধ হয় ইংরেজ গভর্মেণ্টের কৃপাকটাক্ষ পতিত না হইলে এই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি চিহ্ন চিরদিনের মত ধরা হইতে বিলুপ্ত হইত। এ বিষয়ে ন্যায়বান ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের নিকট যে আমরা কত দূর ঋণী তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। মুসলমান রাজগণ স্বধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি এবং অপর ধর্ম্মের প্রতি অসঙ্গত অশ্রদ্ধা বশতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের এবং ধর্ম্ম কীর্ত্তি সকলের ধ্বংস করিয়াই তৃপ্তি অনুভব করিতেন, কিন্তু কোন নূতন দেশ জেতার পক্ষে তদ্দেশবাসীর প্রাচীন কীর্ত্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন রক্ষা করা রাজধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ইংরাজ রাজ এই রাজধর্ম্ম পালনে তৎপর, বিশেষ আজকাল লর্ড কার্জ্জনের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা আইনের বলে আরও বেশী তৎপর হইয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি আরও বেশী আকর্ষণ করিয়াছেন। মন্দির হইতে নামিয়া আমরা "গড়" দেখিতে গেলাম। গড়ের ভিতর একটী ১০ হইতে ১৫ ফিট উচ্চ স্তূপ ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের যত্নে উহা খনিত হইয়াছে। আলোচনায় প্রকাশ হইয়াছে যে ঐ স্তূপই প্রাচীন মহাবোধি সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ, কালে হয়ত কোন রাজার আমলে ইহা "গড়" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে, কারণ স্থানটির চতুর্দ্দিকে পরিখা ও প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গড় ছাড়িয়া নদীর বামতীরে একটী উদ্যান মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম, এখানে একটী চারিতল অট্টালিকা আছে। তাহার চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত, উহা হিন্দু-দিগের একটী মঠ, এই মঠের দক্ষিণ প্রান্তে বার দুয়ারী নামক এক অট্টালিকা ও কতকগুলি গৃহ আছে। মঠের পশ্চিমদিকের প্রাচীরের বাহিরে এক স্তূপের উপর চারিটী মন্দির ও একটী অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। মন্দিরগুলি শুনিলাম হিন্দু-মন্দির। মঠ হইতে বাহির হইয়া ঐ স্তূপে উঠিলাম, মন্দির চতুষ্টয়ের মধ্যে একটীতে জগন্নাথ, আর একটীতে রামমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। শুনিলাম এই রামমূর্ত্তি মহারাষ্ট্র রমণী গঙ্গা-



বুদ্ধগয়ার মন্দির।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

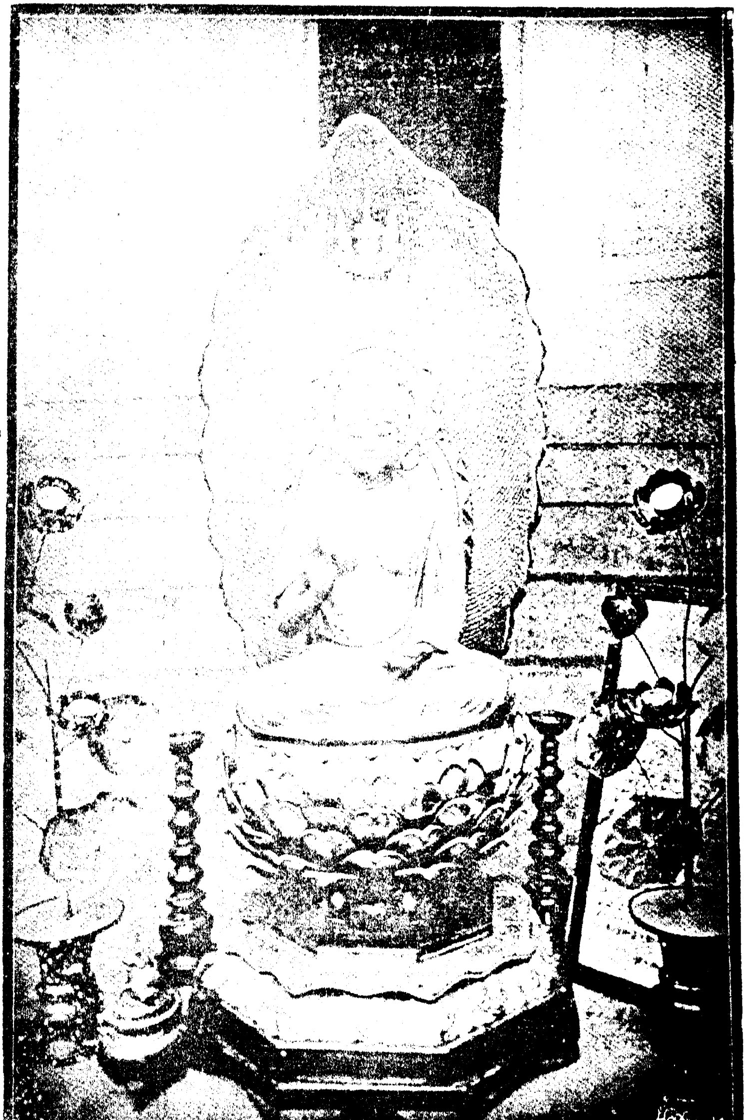
বাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। অপর দুই মন্দিরে দুইটী শিবলিঙ্গ আছে। অট্টালিকাটীতে দেব পূজকদিগের বাস। মঠের দক্ষিণ পশ্চিমে সাধুদিগের সমাধির স্থান, প্রত্যেক সমাধির উপরে ক্ষুদ্রাকারে চৈত্য, বা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মোহান্তদিগের সমাধির উপর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মঠই এখন বৌদ্ধ মন্দিরের অধিকারী। মঠস্বামীই প্রধান মোহন্ত, বোধগয়া এবং তাড়িডি গ্রামের অধিকারী হিন্দু এবং বৌদ্ধতীর্থ যাত্রিগণের প্রদত্ত উপহার এবং গ্রাম দুইখানির আয়ে মোহান্তের বার্ষিক প্রায় আশী হাজার টাকা আয় হয়, ইহা হইতে তাঁহাকে একটী অতিথিশালা ও একটী বিদ্যালয় প্রতিপালন করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন নিত্য প্রায় শতাবধি সন্ন্যাসীরও আহার্য্য জোগাইতে হয়। মোহান্ত এখন যে বাড়ীতে অবস্থান করেন তাহার প্রাচীর গাত্রে অনেক কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রস্তর খণ্ড প্রাচীন সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই অনুমিত হয়। লর্ড কার্জ্জন যখন এই মন্দির দেখিতে আসেন তখন এই মোহান্তের বাটী হইতেই সুপ্রসিদ্ধ অশোক নির্ম্মিত প্রস্তরময় রেলিঙের কতকাংশ উদ্ধার হইয়াছিল।

সম্রাট্ অশোক বুদ্ধদেবের স্মৃতি-চিহ্ন সমূহ স্থাপনে যত্নবান্ হইলে উপগুপ্ত শাক্য সিংহের সমাধি স্থান তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাঁহারি যত্নে বুদ্ধদেবের তপস্যাস্থান বোধিবৃক্ষ আবিষ্কৃত হয়, তখন এই গ্রামের নাম উরুবিল্বা ছিল এখনও লোকে উড়েল বলিয়া থাকে। বুদ্ধদেবের এই সমাধি স্থানে মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অশোক উপগুপ্তের নিকট লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়াছিলেন। অশোকের সময়েই নৈরঞ্জনাতীরে বোধিবৃক্ষ (অশ্বত্থ) মূলে বুদ্ধের আসনস্থলে বজ্রাসন নির্ম্মিত হয়। কুশন বংশীয় শকরাজ হবিস্ক খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই বজ্রাসন সংস্কার করাইয়াছিলেন। বজ্রাসনের সম্মুখে মৃত্তিকা হইতে হবিস্কের বৌদ্ধমুদ্রাদি আবিষ্কৃত হয়। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বজ্রাসন এবং মন্দির প্রাঙ্গণ ফল্গুর বালুকারাশিতে ডুবিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শত্রু হিন্দুরাজ শশাঙ্কদেব খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে বোধি দ্রুম কাটাইয়া দিয়াছিলেন। মন্ত্রী পূর্ণ বর্ম্মার কৌশলে তাহার মূলভাগ এবং মন্দির মধ্যস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি রক্ষা পায়। ৬২০ খ্রীঃ অব্দে

পূর্ণ বর্ম্মা বোধিবৃক্ষের মূলের চতুর্দ্দিকে ২৪ ফুট উচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া দেন এবং বজ্রাসন বালুকামধ্য হইতে আবিষ্কৃত করেন।

এখন বোধিবৃক্ষ বলিয়া যে গাছটি দেখিলাম সেটি পাণ্ডাদের কথায় বুঝিলাম যে সেই প্রাচীন মূল হইতে উৎপন্ন কিন্তু তাহার মূলদেশ পরীক্ষায় আমরা বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতার চিত্রশালায় (মিউজিয়ামে) কতকগুলি শুষ্ক খণ্ড কাষ্ঠ প্রাচীন বোধিদ্রুমের অংশ বলিয়া রক্ষিত আছে। এক্ষণে এখানে অশোকের মহা বোধি মন্দির, তাহার অশোকনির্ম্মিত প্রস্তর বেষ্টনী, মন্দিরের তোরণ দ্বার মহাবোধি সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপ, বোধি দ্রুম, বজ্রাসন চৈত্য, প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ বিহারের ভগ্নাবশেষ, বজ্রাসন প্রভৃতি দেখিবার প্রধান বিষয়। হিন্দুর স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইলে এই স্থানটি যেমন উপযোগী এমন বাঙ্‌লাদেশে আর কোথাও নাই। গয়াতীর্থ বর্ণনায় হিন্দুর তীর্থ কৃত্যের সামান্য আভাস দিয়াছি এই বোধিদ্রুম মূলে পিতৃপুরুষ-গণের স্বর্গার্থে পিণ্ডদানকরা হিন্দুতীর্থ যাত্রীর আর একটী প্রধান কর্ত্তব্য। হিন্দুরা কোন সময়ে বৌদ্ধবিদ্বেষী হইলেও ভগবান বুদ্ধদেবকে ভগবান নারায়ণের নবম অবতার বলিয়া স্বীকার মাত্র করিয়া যে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা নহে। বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ ভূমি যেটি, সেটিকে আপনাদের পিতৃপুরুষগণের স্বর্গারোহণের দ্বার স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়া সেখানে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'গয়ামাহাত্ম্য', 'গয়াপদ্ধতি' প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রেও এই মহা বোধিবৃক্ষকে নারায়ণরূপী ভগবান্ বলিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা ও তন্মূলে পিণ্ড দানের ব্যবস্থা দেখা যায়।

'চলদ্দলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতি হেতবে,
বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ
একাদশৌসি রুদ্রনাম্ বায়ুনাং পাবকস্তথা,
নারয়ণোশিদেবানাং বৃক্ষরাজসী পিপ্পল
অশ্বত্থ যস্মাৎত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণঃ
স্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালং।
অত শুভ স্তং সততং তরুণাম্ ধান্যসি
দুঃ স্বপ্ন বিনাসৌসি।'



জাপান সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রেরিত চন্দন কাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তি   বুদ্ধগয়া।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

ইহাই বোধিদ্রুমের মন্ত্র। যে যজ্ঞ বিধানের নিন্দার জন্য বুদ্ধদেবের অবতার সেই বুদ্ধদেবের তপস্যার স্থানে তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞপুরুষ এবং বসুরুদ্র নারায়ণরূপে ধ্যান করিয়া প্রণাম করিবার ব্যবস্থা করা হিন্দুর মহত্ত্ব, উদারতা এবং হিন্দু ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতার পরিচায়ক নহে কি ?

বুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী আর একটী উচ্চ পর্ব্বতে এক মন্দির দেখিতে গেলাম। এই মন্দিরটীর নাম বরাবর। বরাবর পর্ব্বতের উপরে এক শিব মন্দির দেখিলাম। দেবতার নাম সিদ্ধেশ্বর। শুনিলাম অসুররাজ বাণ এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, এখানে শরৎকালে এক মেলা হয়, দশ বিশ হাজার পুরুষ যাত্রী সমবেত হইয়া একরাত্র পর্ব্বতে বাস করে। মন্দিরটী অতি প্রাচীন এবং সুদৃশ্য, পর্ব্বত নিম্নে অশোকের সময় খোদিত কতকগুলি গুহামন্দির আছে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটী পবিত্র নির্ঝরিণী ও কুণ্ড এবং তত্তীরে প্রত্নতত্ত্বপূর্ণ বহু প্রস্তর শিল্পযুক্ত মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। সময়াভাবে আমরা সে সকল দেখিতে পারিলাম না।

মহাবোধি মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখিলাম, সেটির গঠন ভঙ্গিমায় প্রাচীন বলিয়াই বোধ হইল। বর্ত্তমান সময়ে মন্দিরের চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে কতকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলাম। এগুলি কিছুদিন হইল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের যত্ন ও উদ্যোগে খনিত হইয়া বাহির হইয়াছে।

নৈরঞ্জনা নাম্নী স্রোতস্বিনীর বাম তীরে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। নৈরঞ্জনার পূর্ব্বদিকে ধূসর পর্ব্বত শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের মোহান্তর বাড়ীতে কয়েকটি শিব মন্দির ও একটী দশভূজার মন্দির আছে। পূর্ব্বদিকে ধর্ম্মশালা—তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী সুন্দর অট্টালিকা, সেখানে ইউরোপীয় পরিদর্শকগণ সময় সময় আসিয়া বাস করেন।

বুদ্ধ গয়ার মন্দিরটি দুই সহস্র বৎসরেরও পুরাতন। চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দূর দেশ হইতেও এই তীর্থস্থানে যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। এই মন্দিরের তিনটী সুন্দর ও সম্পূর্ণ খিলান দৃষ্টে বাবু রাজেন্দ্র-লাল মিত্র হিন্দুর স্থাপত্য নিপুণতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"A remarkable

proof of the Hindoos having had a knowledge of the principle of the arch at a very early period, though the credit of it has been denied them by all our Anglo-Indian antiquaries."

ওড়িষ্যা।

পুরী বা জগন্নাথ।

ওড়িষ্যার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি বহুবার দেখিয়াছি, তবু তাহা দেখিয়া সাধ মিটে নাই, প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির বহুল স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, তাই বহুবার লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নিজকে জগন্নাথদেবের পাষাণ মন্দির সোপানে আনিয়া ফেলিয়াছি। ওড়িষ্যা বহুদিন হইতেই আমাদের নিকট আদরণীয়, ইহার কারণ এই যে জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল প্রভৃতি বহু হিন্দু তীর্থ এখানে অবস্থিত। যখন রেল জাহাজ ছিল না, তখনও নীলোর্ম্মি-চঞ্চল জলধির তটস্থিত শ্রীক্ষেত্র ধামে গমন করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী নানাবিধ বিপদাপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াও জগন্নাথ দর্শনে আগমন করিত। সে সময়ে স্থলপথই একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল। পূর্ব্বে স্থলপথে পুরী যাইবার যে কত কষ্ট ছিল তাহা এখনও বৃদ্ধ নরনারীগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তখন একদিকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যাদির অভাবে ও বিশ্রামের স্থানাভাবে অনেক সময়ই উন্মুক্ত গগন-ছায় বিটপীতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত,—যে সকল চটি ছিল তাহাও দূরে দূরে থাকায় অনেক সময় যাত্রিগণ চটিতে পঁহুছিতে পারিত না, সে সময়ে নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে প্রায়ই বহু যাত্রী ওলাউঠা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগে প্রাণ হারাইত। কেহ রোগাক্রান্ত হইলেই তাহার সহযাত্রিগণ কর্ত্তৃক জীবিতাবস্থায়ই পরিত্যক্ত হইয়া মাংস-লোলুপ হিংস্র শৃগাল কুক্কর প্রভৃতির দ্বারা ভক্ষিত হইয়া দারুণ নির্য্যাতনের মধ্যে ভীষণ শোচনীয় অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিত। সে সমুদয় শোচনীয় কাহিনী বর্ত্তমান সময়ে কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! ব্যাধি, খাদ্যাভাব, বিশ্রাম ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা পথে আবার ডাকাইতিরও খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। অনেক সময় দুষ্ট লোক কৌশলে পুরী যাত্রিগণের দলে মিশিয়া তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের সহিত ধুতুরার বীজ ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া যাত্রি-

পূর্ব্বে যাতায়াতের অসুবিধা।

গণকে অজ্ঞান করতঃ তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। সেকালে কেহ পুরী কিংবা কাশী যাত্রার নাম করিলে আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিত, চিরদিনের জন্য সকলের নিকট হইতে অন্তিম বিদায় লইয়া আসিতে হইত—ইহা হইতেই অর্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বে পুরী যাতায়াতের ভীষণ ক্লেশ পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আর বাঙ্‌লা দেশে এমন লোক অতি বিরল, যিনি নিজ ঠাকুরমা, দিদিমা প্রভৃতি প্রাচীনাগণের নিকট পুরী যাইবার পথের দুই চারিটী ভয়াবহ ঘটনা শোনেন নাই। তীর্থ মাহাত্ম্যে পুরী এতদূর পবিত্র ও আদরণীয় ছিল যে—এত ক্লেশ ও পথকষ্ট ভুলিয়া সংসার-ক্লিষ্ট নরনারী জগন্নাথ দেবের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার দর্শনোদ্দেশে মৃত্যুকে বরণ করিয়া পথে বাহির হইত,—তখন সকলের একমাত্র মূল মন্ত্র ছিল "তোমার নাম নিয়ে দাঁড়ালেম পথে বাঁচি কি বা মরি।" ব্রিটিশ শাসনের কৃপায় এখন আর পুরী যাতায়াতের কোনও রূপ কষ্ট নাই। স্থলপথে গমনাগমনের কষ্টের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি, জলপথেও যাওয়া যাইত কিন্তু তাহাতেও বিশেষ অসুবিধা ছিল। রেল হইবার পূর্ব্বে অনেকেই জলপথে যাতায়াত করিতেন। কলিকাতা হইতে কতকদূর জাহাজে, কতকদূর নৌকায় এবং কতকদূর স্থলপথে যাইতে হইত। সমুদ্র পথে গমন করিতে হইলে কলিকাতা হইতে জাহাজে চাঁদবালি হইয়া সেখান হইতে খালের মধ্য দিয়া কটক গমন করিতে হইত কিংবা বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া জাহাজে একেবারে পুরী যাওয়া যাইত। যাহারা কটক সহর হইতে পুরী যাইত তাহারা বিখ্যাত "জগন্নাথ সড়ক" দিয়া গরুর গাড়ীতে, পাল্কীতে কিংবা পদব্রজে গমন করিত। কলিকাতা হইতে বরাবর যে রাস্তা কটক পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহা মেদিনীপুর, নারায়ণগড় মোগলমারী, জলেশ্বর, বালেশ্বর, ভদ্রক ও যাজ্‌পুর দিয়া কটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কটক হইতে জগন্নাথ সড়ক নামে একটী শাখাপথ কটক সহর হইতে পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে—কটক হইতে পুরীর দূরত্ব ৫৩ মাইল মাত্র। এই রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত, প্রতি তিন হইতে পাঁচ মাইল অন্তর এক একটী সরাই আছে। স্থল পথে যাতায়াতে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী পার হইতে হয়। বর্ষার সময় ভিন্ন সে সমুদয় স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনী হাঁটিয়াই পার হওয়া যাইত। এক বর্ষার

সময়ে নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইত। এতদিনে পুরী যাইবার ক্লেশ ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুর বড় সাধনার ধন—তপস্যার ফল জগন্নাথদেবের দর্শন সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের পক্ষেই সুগম হইয়া পড়িয়াছে। রেলপথে কলিকাতা হইতে পুরী এখন কেবল বার ঘণ্টার রাস্তা। হাবড়া ষ্টেসন হইতে রাত্রি ৯টা ১০টার সময় "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর মান্দ্রাজগামী ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিলে পরদিন বেলা ৯টা ১০টার সময় খুর্‌দারোড জংশনে পঁহুছাইয়া দেয় এবং সেখান হইতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই পুরীতে পঁহুছান যায়। পুরীতে দেখিবার জানিবার ও শুনিবার বহু জিনিষ আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা অদ্বিতীয়। বঙ্গোপসাগরের নীলোর্ম্মিমালা পরিশোভিত বিশাল সৌন্দর্য্য, অমল-ধবল সৈকতময় বেলাভূমি, তীর্থযাত্রিগণের প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে "জয় জগন্নাথজীকি জয়" রব প্রাণে একটী ভক্তির ভাব আনিয়া দেয়। সার্ব্বভৌমিক প্রীতির নিমিত্ত ইহা তীর্থরাজ, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন তীর্থই ইহার সমকক্ষ নয়। এখানে ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ সব সমান। বিশ্ব-জনীন প্রেমের চরমোৎকর্ষ—এখানে যেরূপ, তদ্রূপ আর কোথাও মিলে না। এখানে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নাই, নেপালী বল, গুজরাটি বল, মারহাটি বল, মান্দ্রাজী বল, সকলই তোমার সমকক্ষ,—একত্র তাহার সঙ্গে ভোজন কর, জাতিভেদের সংকীর্ণতা এখানে নাই। এখানকার মূলমন্ত্র প্রীতি—এখানকার মূলমন্ত্র একতা, এখানকার মূলমন্ত্র সর্ব্বজীবই ব্রহ্ম। একদিকে সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস—অন্যদিকে শ্রীমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া মস্তকোত্তলন করিয়া ভক্তগণের চিত্ত-বিনোদন করিতেছে। আমরা ওড়িষ্যা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া প্রথমেই হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ নীলাচলস্থ পুরী বা জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলাম,—আমাদের এ ভ্রমণ বিবরণেও তদ্রূপ প্রথমে পুরী সহরের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া পরে উৎকলের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সমূহের বিবরণ লিখিলাম। হাবড়া হইতে পুরী ৩১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন উৎকলের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও দেওয়া গেল, কারণ কোনও দেশকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে তাহার প্রাচীন ইতিহাস অতিশয় প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে ইহা পার্ব্বত্য বর্ব্বর জাতি-

রেলপথ।

প্রাচীন ইতিহাস।

গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল, আর্য্যগণ এ সকল ম্লেচ্ছ জাতিকে ঘৃণা করিতেন এবং যে সকল আর্য্য জাতীয় ব্যক্তিগণ সে স্থানে গিয়া বাস করিতেন তাহারাও বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইতেন। আর্য্য নিবাস বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ও নানারূপ ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় ক্রমশঃ ওড্র প্রদেশ আর্য্যগণের বাসভূমিতে পরিণত হইয়া পুণ্যভূমি হইয়াছে। প্রাচীন কালে পুরী জেলায় শবর জাতিরই প্রাধান্য ছিল বর্ত্তমান সময়েও পুরীর পার্ব্বত্য প্রদেশে শবর-জাতির বাস আছে। "অমরকোষের" টীকাকার ভরত শবর অর্থে "পত্র পরিধানঃ শবরঃ" এইরূপ লিখিয়াছেন। এখনও এই জাতির অনেকেই পত্র পরিধান করিয়া থাকে। গ্রাক্ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থেও ইহাদের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই শবর জাতীয় "বসুর" প্রতি সর্ব্ব প্রথমে কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়—তখন উৎকল প্রদেশ অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত বলিয়া অপবিত্র বিবেচিত হইত। মহাত্মা শাক্য সিংহ বুদ্ধ-

বৌদ্ধযুগ।

দেবের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকলে বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক ব্যক্তি উৎকলের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি গিরিগাত্রে অদ্যাপিও তাহার চিহ্ন স্বরূপ পালি অক্ষরে খোদিত বহু শিলালিপি বিদ্যমান আছে। ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ তে শাক্য সিংহের দেহাবসানের পর তাঁহার একটী দন্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তঃর্গত দাঁতনে নীত হইয়াছিল, পরে উহা পুরীতে রক্ষিত হয়, এই দন্তের জন্যই কিছুকাল পর্য্যন্ত পুরী বৌদ্ধদিগের বিশেষ তীর্থস্থান হইয়া উঠে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ঐ দন্ত সিংহলে নেওয়ার পর হইতেই উহার বৌদ্ধ মাহাত্মের হ্রাস হয়। খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ব্যতীত উৎকলের আরও অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের প্রমাণ সমূহ বিদ্যমান আছে। ভুবনেশ্বর হইতে কিছু দূরে ধউলি পর্ব্বতেও অশোক রাজার এক-খানা অনুশাসনস্তম্ভ আছে উহা খ্রীঃ পূঃ ২৫০ পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত যাজপুরেও বুদ্ধদেবের প্রস্তরময় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে প্রায় সাতশত বৎসরেরও অধিক সময় বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক যুয়নচয়ঙের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি খ্রীষ্টিয় অষ্টম

শতাব্দীতেও ওড়িষ্যায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই প্রচলিত দেখেন। খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দী হইতেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন হয়। কিম্বদন্তি এইরূপ যে পরে বৌদ্ধগণ বাধ্য হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল।

জগন্নাথের মন্দিরে প্রাপ্ত তালপত্রের উপরে লৌহ লেখনী দ্বারা লিখিত পুঁথি হইতেও ওড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কতক বিবরণ জানিতে পারা যায়। ঐ গ্রন্থে খ্রীষ্টিয় শকের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেক রাজার নামও তাহাদের রাজত্বের সময় লিখিত আছে। প্রথমে হিন্দু নরপতি শঙ্করদেব ও গৌতমদেব কর্ত্তৃক ওড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হয়, তাহার পরে বৌদ্ধ অধিকার, বৌদ্ধ অধিকারের পরে অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের সময়েই মুসলমানেরা ওড়িষ্যা দখল করে, পাণ্ডাগণ জগন্নাথ দেবসহ অরণ্যাভ্যন্তরে পলায়ন করেন। একটা কথা বলা উচিত যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি পুরীতে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া নরসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন ও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া শ্বেতদ্বীপ হইতে দারুব্রহ্মরূপী নিমের গুড়ি আনাইয়া বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞও এস্থানেই সম্পন্ন হইয়াছিল। জগন্নাথদেবের এরূপ অদ্ভুত অবয়ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক জনরব প্রচলিত আছে, তাহা বঙ্গের নর নারীগণের মধ্যে একটা না একটা প্রায় সকলেই জানেন, কাজেই অনাবশ্যক বোধে সে সকলের এখানে কোন উল্লেখ করিলাম না। ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকুলোদ্ভব কেশরী বংশের যযাতি রাজা মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া উৎকলে তন্নামধেয় রাজবংশ স্থাপন করেন। ইঁহার রাজত্ব সময় হইতেই উৎকলের খ্যাতি ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি জঙ্গলে লুক্কায়িত জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া পুনরায় মহাসমারোহে উহা পুরীতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের একজন রাজা কটকনগর স্থাপন করিয়া সেখানে নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও কটকই ওড়িষ্যার রাজধানী। কেশরী বংশীয় রাজারা শৈব ছিলেন,—ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির সমূহ ইঁহাদেরই নির্ম্মিত। এই রাজ-বংশের ও ইঁহাদের পরবর্ত্তী গঙ্গাবংশীয় বৈষ্ণব রাজগণের যত্নে উৎকল

কেশরী রাজবংশ ও গঙ্গাবংশ।

হিন্দু মাত্রেরই পবিত্র ভূমি হইয়াছে। প্রায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত উৎকলের হিন্দুরাজগণ নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য যেরূপ প্রাণপণে যত্ন চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষরূপ আলোচনার যোগ্য ও প্রশংসনীয়।

তাঁহারা প্রায় দশ সহস্র ব্রাহ্মণ উৎকলে বাস করান। ইঁহারা একদিকে যেমন ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন অন্যদিকেও তদ্রূপ বীরত্বে ও অন্যান্য রাজোচিত গুণ গরিমায় বিভূষিত ছিলেন। যখন উত্তর ভারতের প্রায় অধিকাংশ স্থলই মুসলমানাধিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তখনও ইহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী গৌরবের সহিত উড্ডীয়মান থাকিয়া হিন্দু রাজগণের শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল। মোটের উপর উত্তর ভারত মুসলমানদের কর্তৃক অধিকৃত হইবার পরও চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত উৎকলের গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের বাহুবল প্রভাবে আফ্‌গান ও পাঠানগণকে বৈতরণী পার হইতে দেন নাই,—ইঁহারা সময় সময় ভাগীরথী তীরপর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ওড়িষ্যাবাসিগণ যেরূপ অলস ও নির্জীব পূর্ব্বে তাহারা এরূপ ছিল না, তখন ইহারা বীরত্বে ও ধীরত্বে, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে এমন কি শিল্পনৈপুণ্যেও ভারতের অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্রদেব ওড়িষ্যায় রাজত্ব করেন, ইনি বিলক্ষণ প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। গঙ্গাবংশীয় এই খ্যাতনামা রাজার রাজত্ব সময়েই ১৪৩৬ শকে (১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনের জন্য উৎকলে গমন করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইহা জ্ঞাত আছেন। প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব সময়েই ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ইসমাইল গাজী নামক হোসেন সাহার জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ ওড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া রাজধানী কটক অধিকার করেন ও পুরী পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন, এই সময়ে প্রতাপরুদ্র রাজ্যের দক্ষিণাংশে থাকায়ই মুসলমান সেনাপতি এত সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে স্বাধীনতা লোলুপ বীর ওড়িষ্যাবাসিগণের তীব্র আক্রমণে পরাভূত হইয়া উৎকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রকৃত পক্ষে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুসলমানগণ কোন-

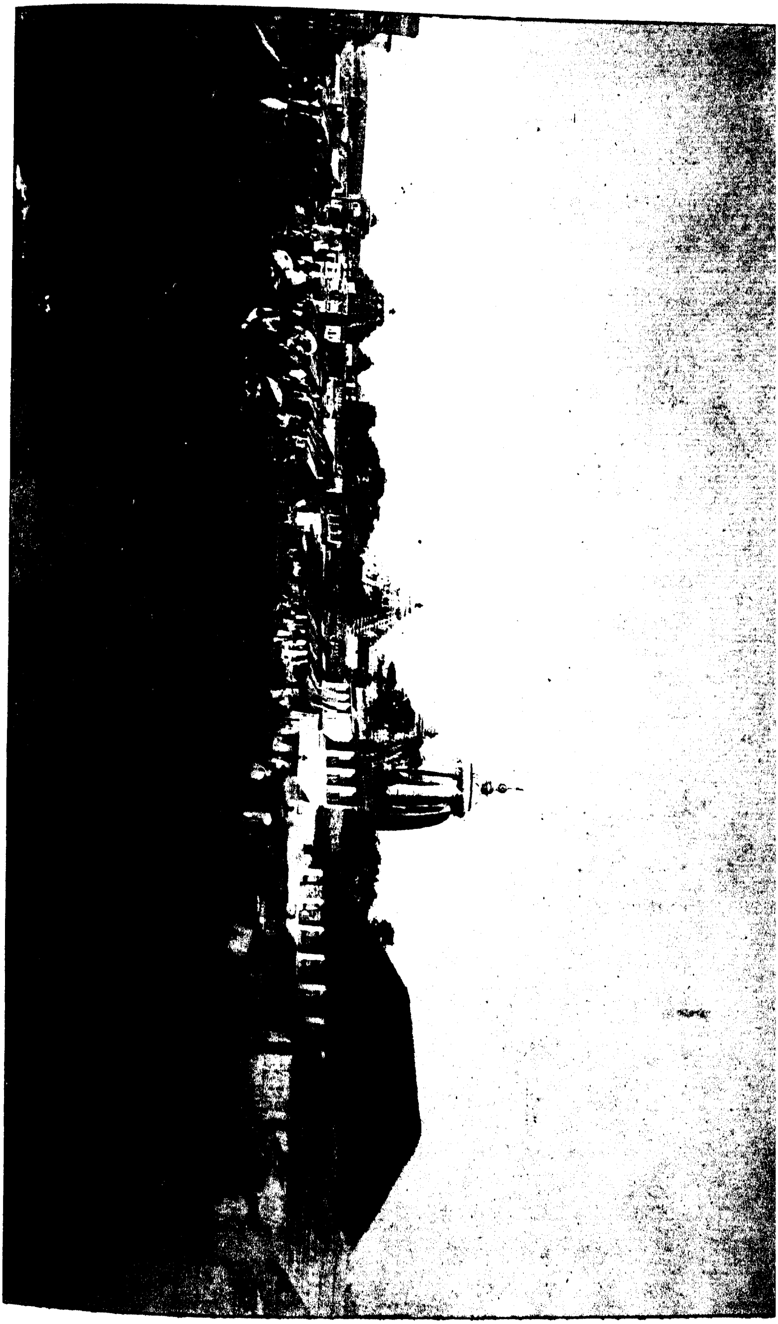
রূপেই উৎকল অধিকার করিতে পারেন নাই। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব সুলামানের সেনাপতি কালাপাহাড় (ইনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু কোনও মুসলমান রমণীর প্রেমে পতিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন) যাজপুরের নিকট গঙ্গাবংশীয় নরপতি মুকুন্দদেবকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিধন করেন ও পুরীর অনেক দেব দেবীর হস্তপদাদি ছেদন করিয়া দেন। সুলামানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দাউদ মোগল সম্রাটের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হন এবং জলেশ্বর নামক স্থানে পাঠান সৈন্যের সহিত মোগল সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে পাঠানগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হ'ন। এই যুদ্ধের পর হইতে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওড়িষ্যা মোগল সম্রাটের রাজ্যাধিকারভুক্ত ছিল। মোগলের পরে ১৭৪২—১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে থাকে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ওড়িষ্যা প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তদবধি তাহাই আছে।

আমরা যখন পুরীতে আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা হইবে। প্রখর সূর্য্য কিরণে অদূরস্থিত সমুদ্রের সিকতাময় বেলাভূমি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের শব্দ কাণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য—যাত্রিগণের সেই গগনভেদী "জয় জগন্নাথকীজয়" রবে ষ্টেসন প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল, কত দেশ বিদেশের যাত্রী—নেপালী, ভূপালী, গুজরাটী, মারোয়ারী কে তাহাদের সংখ্যা করে? কত রং বেরংয়ের পোষাক, কত রকমের পুরুষ রমণী, কত রকমের মাথার পাগ্‌ড়ী—হিন্দুস্থানী ভায়াদের পৃষ্ঠের উপর পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা, হাতে লম্বা লাঠি ও লোটা—চারিদিকেই কল-কোলাহল, আর ওদিকে পাণ্ডা ভায়াদের যাত্রী-শিকার ধরিবার নানা কৌশল, বিকট চীৎকার, ক্রমে যখন গোলটা একটু থামিয়া গেল, তখন ধীরে ধীরে সঙ্গীয় পাণ্ডার সহিত আমাদের নির্দ্ধারিত বাসার দিকে রওয়ানা হইলাম। বালুকাপূর্ণ রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, রাস্তার দুইধারে সারি সারি নারিকেল গাছ ও ঝাউ গাছের শ্রেণী। ছোট ছোট দালান, কুঁড়ে ঘরগুলি বালুকাময় রাস্তার দুই পার্শ্বে একটু নূতনত্ব প্রকাশ করিতেছিল। দালানগুলিও গাছগুলির মাথার উপর দিয়া ধ্বজা পরিশোভিত জগন্ননাথদেবের উচ্চ মন্দিরের শীর্ষ দেখা যাইতে-

ছিল। বাসায় পঁহুছিয়া সে দিবস বিশ্রামাদি করিয়া পথক্লান্তি দূর করিলাম। পুরীনগরটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এস্থানে ৫৭৪১টি বাসবাটী ছিল, কিন্তু ক্রমশঃই বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার আয়তন ৬৫০০ বিঘা। এখানে যাত্রীবর্গের থাকিবার জন্য নানাপ্রকারের বাসবাটী আছে, তাহার অধিকাংশই বাঁশের নির্ম্মিত। রথযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, স্নানযাত্রা ও ঝুলনযাত্রার সময়েই এখানে বহুতর যাত্রী সমাগম হয়। তখন লোক সংখ্যা এত অধিক হয় যে নানা প্রকারে বায়ু দূষিত হইয়া মড়কের সৃষ্টি করে—কত শত যাত্রী যে এইরূপ মড়কের আক্রমণে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন তাহা নিরুপণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। গভর্মেণ্ট এই অকাল মৃত্যুর জন্য অনেক নিয়ম অবলম্বন করিয়াও বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাধারণতঃ বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাবই এস্থানে খুব বেশী হইয়া থাকে। যাহাতে যাত্রিগণ এইরূপ অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পান, সে জন্য সদাশয় গভর্মেণ্ট পথে পথে হাঁসপাতাল প্রস্তুত করাইয়াছেন, এবং চিকিৎসা বিভাগের অন্তর্গত একদল চৌকিদার (Medical patrol) নিযুক্ত হইয়াছে এবং এক এক বাড়ীতে কত জন লোক থাকিতে পারিবে, এক একটী কক্ষ কয়জন লোক থাকিবার উপযুক্ত ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এত করিয়াও কিন্তু গভর্মেণ্ট যাত্রিগণকে মড়কের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। ইহার দোষ যাত্রীদের, গভর্মেণ্টের নহে। কারণ ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত যাত্রিগণ নিতান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত না হইলে কখনও চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালের সাহায্য লইতে অগ্রসর হ'ন না,—ইঁহারা এতদূর অন্ধবিশ্বাসী যে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকেই এই পবিত্র ধামে অধিকতর বরণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। আমরা পূর্ব্বে ওড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে জানাইয়াছি এখন জগন্নাথ তীর্থের পৌরাণিক ইতিবৃত্তও সংক্ষেপে তাহাদিগকে উপহার দিলাম। এই স্থান নীলাচল, পুরী, পুরুষোত্তম, শ্রীক্ষেত্র, শঙ্খক্ষেত্র ও কেবল ক্ষেত্র নামে পরিচিত। হিন্দুদিগের নিকট এরূপ পুণ্যস্থান আর কোথাও নাই, এমন কি বারাণসীও ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। ইহার অপর নাম স্বর্গদ্বার, ইহাই বৈকুণ্ঠ, কারণ ভক্তি-মুক্তি-

নগরের কথা।

পৌরাণিক ইতিহাস।



দাতা, নির্ব্বাণ মুক্তির কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান এখানে দারুব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। এখানে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, রাজা মহারাজ সকলই এক, এই নিমিত্তই লক্ষ লক্ষ যাত্রী, ধন, প্রাণ তুচ্ছ করিয়াও এই পুণ্য তীর্থে আগমন করিয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পুরুষোত্তমপুরাণ, উৎকল খণ্ড প্রভৃতি বহু পুস্তকে সংস্কৃত ভাষায় ও উৎকল ভাষায় লিখিত মাগুনিয়াদাস ও শিশুরামকৃত ক্ষেত্রপুরাণ ও মহাদেব দাসকৃত নীলাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে জগন্নাথদেব ও জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। পৌরাণিক গ্রন্থে জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যে বৃত্তান্তটি সমধিক প্রচলিত আমরা এস্থানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম। অতি পূর্ব্বকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ এক নরপতি ছিলেন, তিনি কোন্ তীর্থ গমন করিয়া এবং কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন সে জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন, মনে মনে বহু তীর্থের কথা চিন্তা করিলেন বটে কিন্তু কোন তীর্থই তাহার মনের মত হইল না। অবশেষে তিনি পুরুষোত্তম তীর্থে আগমন করিলেন। এস্থানে আগমন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন ইহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞাদি করতঃ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, কিন্তু নির্ম্মিত প্রাসাদ মধ্যে কি মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন তাহা ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা রাত্রি এক মনে বিষ্ণুর ধ্যান ও মূর্ত্তি স্থাপন বিষয়েই চিন্তা করিতেন, এক দিবস এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কুশাসনোপরি ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন যে "কল্য প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পর তুমি স্বয়ং একখানা কুঠার হস্তে সমুদ্র তীরে জল ও স্থল মধ্যে যে বৃক্ষ দেখিতে পাইবে তাহা একাকী ছেদন করিয়া আনয়ন করিবে ও তদ্বারা আমার প্রতিমা প্রস্তুত করাইয়া মন্দির মধ্যে স্থাপন করিবে।" ঈপ্সিত প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ায় পরদিন প্রত্যুষে ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রফুল্ল চিত্তে সমুদ্র তীরে গমন করিয়া বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন যে

"জনং তথৈব বেলায়াঃ দৃশ্যতে যত্রবৈ মহৎ।
লবণস্যোদধোরাজং স্তরঙ্গৈঃ সমভিপ্লুতঃ॥
কুলালম্বী মহাবৃক্ষঃ স্থিতঃ স্থলজলেযুচ।"
(নারদ পুঃ উঃ ৫৫।২২-২৩)

তিনি স্বপ্নকথিত ভগবদ্বাক্যের সহিত প্রকৃত ঘটনার অত্যাশ্চর্য্য মিলন দেখিয়া ভক্তিতে গদগদ হইলেন, রাজা পূর্ব্বে কখনও এইরূপ মহাবৃক্ষ অবলোকন করেন নাই। যখন তিনি বৃক্ষচ্ছেদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে বিষ্ণু ও বিশ্বকর্ম্মা সে স্থানে ব্রাহ্মণের রূপধারণ করতঃ আসিয়া উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ বেশী বিষ্ণুবৃক্ষ ছেদন নিরত ইন্দ্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনি কিসের জন্য সমুদ্র তীরস্থ এই বৃক্ষটিকে ছেদন করিতেছেন? আপনার ইহা দ্বারা কি আবশ্যক?" রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মণদ্বয়ের অলৌকিক মাধুর্য্য দর্শনে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে নম্রভাবে নমস্কার করিয়া কহিলেন "মহাশয় ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে, সে নিমিত্তই আমি এই বৃক্ষ ছেদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" তদুত্তরে ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু কহিলেন "মহারাজ, তোমার এই সাধু উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়া সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলাম, আমার সঙ্গীয় ব্রাহ্মণটি একজন বিশ্বকর্ম্মার সমকক্ষ উৎকৃষ্ট শিল্পী, তুমি ইচ্ছা করিলে ইঁহাদ্বারা তোমার অভিপ্রেত দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে পার।" ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের এই কথায় বিশেষরূপ প্রীত হইলেন ও স্বীয় ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মাকে অনুরোধ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও রাজার অনুজ্ঞামত তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। প্রথমটী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শান্ত ও কৃষ্ণমূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী গৌরবর্ণ ও লাঙ্গলধারী অনন্তদেবের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টী বাসুদেবের ভগ্নী সুভদ্রার সুশোভন মূর্ত্তি। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিত্রয়ের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের হৃদয়ে পবিত্রতম দেবভাবের উদয় হইল, তিনি ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপী দেবদ্বয়কে বাষ্পাকুল কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমাকে বঞ্চনা করিবেন না—দীন অধম বলিয়া পায়ে ঠেলিবেন না—বলুন আপনারা কে? আপনারা কি দেব,

দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব ? না স্বয়ং পতিত পাবন—ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু—বিষ্ণু ? বলুন ! আমায় কৃতার্থ করুন,—আমি বুঝিতে পারিয়াছি আপনারা কখনও মানুষ নহেন, মানুষের দ্বারা এইরূপ নৈপুণ্য কখনো সম্ভবপর নহে।" ইন্দ্রদ্যুম্নের এইরূপ ঐকান্তিক প্রার্থনায় ভক্তের ভগবান,—চিরসাধনার ধন কমলাপতির হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, তিনি বলিলেন "আমিই স্বয়ং পুরুষোত্তম, আমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা ও আমিই মহেশ্বর, বৎস ! আমি তোমার অকৃত্রিম ভক্তি ও একাগ্রতা দৃষ্টে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার বরে দশ হাজার নয় শত বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে রাজদণ্ড পরিচালনা করিবে, ইহার পরে তুমি নির্লেপ ও নির্গুণ পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রহিবে ; তোমার যজ্ঞীয় সম্ভার-সম্ভূত ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর মহাতীর্থে পরিণত হইবে। এই সরোবরের নৈঋর্ত কোণে যে বটবৃক্ষ আছে, তাহার নিকট নানাজাতীয় পাদপরাজি পরিবেষ্টিত যে মণ্ডপ আছে, আষাঢ় মাসের শুক্ল পঞ্চমীর দিবস হইতে সপ্তদিন পর্য্যন্ত মহোৎসব করিয়া সে স্থানে ইষ্টদেবকে স্থাপন করিও।" ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে এইরূপে উপদেশ দান করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। রাজা প্রফুল্ল চিত্তে বেদপারগ ঋত্বিকগণে পরিবৃত হইয়া সেই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মূর্ত্তিত্রয় রথে করিয়া আনিয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিলেন—এবং যাগ যজ্ঞাদি বহুতর পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বিষ্ণুর বরে যথা সময়ে পরমপদ লাভ করিলেন। 'নারদ পুরাণের' মতে ইহাই জগন্নাথদেবের পৌরাণিক তত্ত্ব। ব্রহ্ম পুরাণের উক্তির সহিত এই উক্তির যথেষ্ট ঐক্য আছে। নানামুনির নানামতের মত জগন্নাথদেবের উৎপত্তি বিষয়ক পৌরাণিক মত ও নানা বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্ট এবং শ্রুত হওয়া যায়। এই পৌরাণিক গল্পটি ছাড়া আরেকটি গল্প ও আমাদের দেশে সমধিক প্রচলিত, আমরা এখানে তাহাও উল্লেখ করিলাম।

একদিন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান্ কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন যে তুমি কল্য প্রত্যূষে সমুদ্রের তীরে গমন করিলে দারুব্রহ্মরূপে বাঁকি মোহনায় আমার দর্শন লাভ করিবে। পরদিবস প্রত্যূষে মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যথারীতি

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমুদ্র তীরে আসিলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশমত দারুব্রহ্মরূপে তাঁহার দর্শন পাইলেন। রাজার সঙ্গীয় সমুদয় অনুচরবর্গ ও হস্তী মিলিয়া কোনরূপেই সেই কাষ্ঠখণ্ড সরাইতে পারিল না। রাজা এইরূপ বিফল মনোরথ হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই রাত্রিতে পুনরায় স্বপ্নে ভগবান্ তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে "বৎস! আমি ভক্তের অধীন, ভক্ত ভিন্ন কেহই অই কাষ্ঠ নাড়িতে পারগ হইবে না, তুমিও ভক্ত শবর কল্য গিয়া কাষ্ঠ স্পর্শ করিলে উহা আপনা হইতেই রথে উঠিবে।" পরদিন রাজা শবরকে ডাকাইয়া আনিয়া সমুদ্র তীরে গমন করিলেন এবং উভয়ে উহা স্পর্শ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! যে কাষ্ঠখণ্ড সহস্র সহস্র লোক ও মহাবলশালী হস্তীযূথ বিন্দুমাত্রও স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই তাহা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও শবরের স্পর্শ মাত্রেই রথে উঠিল, সর্ব্ব-প্রথমে বর্ত্তমান গরুড়স্তম্ভ যে স্থানে আছে, সেখানে দারুখণ্ড স্থাপিত হইল।

সুদক্ষ সূত্রধরগণের উপরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার ভার অর্পণ করিলেন। সপ্ত দিন অতীত হইলে রাজা সূত্রধরগণ কিরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল তাহা দেখিবার জন্য আসিয়া দেখিলেন যে সূত্রধরগণ কিছুই করিতে পারে নাই, যেরূপ কাষ্ঠ ছিল তদ্রূপই আছে, ইহাতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন যে "যদি আগামী কল্য প্রত্যূষের মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া না দিতে পার তাহা হইলে তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব।" সূত্রধরগণ বলিল যে "মহারাজ আমাদের কোনও দোষ নাই, আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই, এই দেখুন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সমূহ পর্য্যন্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।" রাজার ক্রোধ কিছুতেই উপশম হইল না,—তিনি কিছুতেই তাঁহার আদেশ ফিরাইয়া নিলেন না।

সূত্রধরগণ এইরূপ ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়া একমনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে ডাকিতে লাগিল, তাহাদের করুণ প্রার্থনায় পরম দয়াল জগন্নাথ দেবের অনুকম্পা হইল,—সূত্রধরগণ দৈববাণী শুনিতে পাইল যে "তোমাদের কোনও ভয় নাই, আমি কল্য প্রত্যূষে স্বয়ং রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া তোমাদের প্রাণরক্ষা করিব," সূত্রধরগণ নিশ্চিন্ত হইল।

পরদিন প্রত্যুষে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দরবারে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময় প্রহরী আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল যে "মহারাজা, একজন অদ্ভুতাকৃতি বৃদ্ধ সূত্রধর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে, সে কোনরূপেই আমার নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য করিতেছে না।" মহারাজা সেই সূত্রধরকে সভায় আনয়ন করিবার আদেশ দেওয়ার পর প্রহরীসহ বৃদ্ধ সূত্রধর রাজ দরবারে উপস্থিত হইল, তাহার বিশ্রী কালো রং, তদুপরি আবার পায়ে গোদ, পিঠে কুঁজ, চোখে পিচুটী, শোণের নুড়ির মত মাথায় পক্ক কেশ। এই অদ্ভুতাবয়বের সূত্রধরকে সভায় দেখিতে পাইয়া রাজার সভাসদ্‌বর্গ নানাপ্রকার বিদ্রুপাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। মন্ত্রী বলিলেন "লোকের ধন-তৃষার আর কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না, এই ব্যক্তি আজ বাদে কাল মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তবু অর্থের লোভ ছাড়িতে পারে নাই।" মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সূত্রধরকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল যে "আমার নাম বাসুদেব মহারাণা, আমার অসাধ্য কোন কার্য্যই পৃথিবীতে নাই, আমি স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার গুরু, আমাকে আপনি যে কার্য্য সম্পাদন করিতে আদেশ করিবেন আমি তাহা দেখিতে দেখিতে সম্পন্ন করিয়া দিব। আমার উপর কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেই বাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।" রাজা বৃদ্ধ সূত্রধরের বাক্যে বিস্মিত হইয়া স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন, সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল যে বৃদ্ধের নখাঘাতেই বৃক্ষের ছাল উঠিয়া গেল। ইহাতে রাজা নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "আপনার উক্তি প্রকৃত বটে; আপনি অসাধারণ ব্যক্তি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কয় দিবসের মধ্যে আপনি এই কাষ্ঠ দ্বারা আমার অভিপ্রেত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারিবেন?" ইহাতে বৃদ্ধ সূত্রধর বলিল যে "আমি মন্দিরের ভিতরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া একুশ দিনের মধ্যে প্রতিমা গড়িয়া দিব, কেহই এই কয়েক দিন মন্দিরের দ্বার খুলিতে পারিবে না, যদি খোলে তবে তৎক্ষণাৎ আমি উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, কাহারও অনুরোধ উপরোধ শুনিব না।" রাজা সম্মত হইলেন।

বৃদ্ধ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। দিনের পর দিন

চলিয়া যাইতে লাগিল, ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বকীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশায় প্রফুল্লিত—পনের দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এক দিবস রাজার প্রধানা মহিষী গুণ্ডিচা রাজাকে কহিলেন "প্রিয়তম! তুমি আমায় জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি দেখাইবে বলিয়াছিলে, কই আজিও ত দেখাইলে না! তাহাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সূত্রধর ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। রাণী হাসিয়া উত্তর করিলেন "তুমিও যেমন! এ আবার একটা কথা, বহু সূত্রধর সম্মিলিত হইয়া যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিল না, একটা বৃদ্ধ কিরূপে তাহা করিবে? বোধ হয় বৃদ্ধ এতদিনে মন্দির মধ্যে অনাহারে মরিয়া গিয়াছে।" রাজার হৃদয়ে রাণীর উক্তিতে সন্দেহের উদয় হইল, তিনি রাণীর কথা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ করিলেন না। মন্ত্রী সমভিব্যহারে মন্দির নিকটে উপস্থিত হইয়া দ্বারের নিকট কাণ পাতিয়া কোনওরূপ যন্ত্রের শব্দ শুনিতে না পাইয়া ভাবিলেন যে রাণীর উক্তিই যথার্থ, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ সূত্রধর অনাহারে মন্দির মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহা মনে করিয়া মন্দির দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইলেন, মন্ত্রী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন কিন্তু রাজা কোনওরূপ বাধা না মানিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু একি! কোথায় বৃদ্ধ? মন্দিরের মধ্যে কোন জনপ্রাণীই নাই, বিস্ময়াকুল নেত্রে দেখিলেন যে সিংহাসনোপরি দারুব্রহ্ম জগন্নাথ মূর্ত্তি বিরাজমান, কিন্তু তাহার হাত ও আঙ্গুল ইত্যাদি কিছুই নাই। রাজা ইহাতে যারপরনাই শোকাকুল হইয়া পড়িলেন, তাহার নিজ দোষেই যে এইরূপ অঘটন ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়া আরও অধিক মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। শেষে মনের দুঃখে কুশশয্যা রচনা করিয়া শুইয়া রহিলেন। অর্দ্ধ রাত্রি অতীত হইলে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে স্বয়ং জগন্নাথ দেব তাঁহাকে আসিয়া বলিতেছেন, "বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না, তোমার চিন্তার কোনও কারণ নাই, কলিযুগে আমি হস্তপদবিহীন বুদ্ধ রূপেই থাকিব, তুমি পরিশেষে স্বর্ণ দ্বারা আমার হস্ত পদ গড়াইয়া দিও।" মাগুনিয়া দাসের লিখিত "ক্ষেত্রপুরাণে" এ বিষয়ে লিখিত আছে যে;—

"মুই বউদ্ধ রূপ হই।
কলিযুগরে থিবু রহি॥

স্থবর্ণ হাত গোড় করি।
গড়াহি দেব দণ্ডধারী।”

রাজা পরে করযোড়ে কিরূপে জগন্নাথদেবের পূজা ইত্যাদি সম্পাদিত হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করায় নারায়ণ বলিলেন যে “শবর নামীয় যে ব্যক্তি অরণ্যাভ্যন্তরে আমার অর্চ্চনা করিত তাহার পুত্র পশুপালক দৈতাপতি ও তাহার বংশধরগণ দৈতাপতি নামে চিরকাল আমার পূজা করিবে, আর বলভদ্র গোত্রের “সুয়ার”গণ আমার রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এখানে জাতিভেদ থাকিবে না, চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সমগ্রজাতিই এস্থানে একত্র বসিয়া ভোজন করিতে পারিবে।” রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি জগন্নাথদেব এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার আদেশ মত সেবার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, অদ্যাপিও সেই নিয়মেই পূজাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে। আমাদের লিখিত এই প্রবাদটি বাঙ্লার ঘরে ঘরে শুনিতে পাওয়া যায়, কেবল যে বঙ্গদেশেই ইহা সীমাবদ্ধ তাহা নহে, ওড়িষ্যার অধিবাসিগণের মধ্যেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। শিশুরাম, মুকুন্দরাম, মাগুনিয়া দাস প্রভৃতি উৎকল-বাসী ব্যক্তিগণ যাঁহারা জগন্নাথদেবের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের গ্রন্থেই এই প্রবাদের উল্লেখ আছে,—তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার গণের ভিন্ন ভিন্ন কল্পনার সাহায্যে প্রতি গ্রন্থে অল্পাধিক পরিবর্ত্তন থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। আমরা পাঠকবর্গের নিকট ওড়িষ্যার ও জগন্নাথদেবের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিবরণ বিবৃত করিয়াছি এখন

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মত।

তাহাদিগকে ইহার সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আধুনিক প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণের মতামতও প্রদান করিলাম। হাণ্টার সাহেব ও ফাগু´সন সাহেব তাঁহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে পুরীর প্রাচীন নাম “দন্তপুর” ছিল, মহাত্মা শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার একটী দন্ত এই নগরে ছিল বলিয়াই নাকি এইরূপ নাম হয়* তখন এ স্থান

* In the uncertain dawn of Indian tradition, the highly spiritual Doctrines of Buddha obtained shelter here; and the Golden Tooth of the founder remained for centuries at Puri, then the Jerusalem of the Buddhists, as it has for centuries been of the Hindus.'' Hunter's Statistical Account of Puri,

বৌদ্ধদিগের একটী সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল, নানা দেশ-বিদেশ হইতে তীর্থ যাত্রিগণ এ স্থানে আগমন করিতেন। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে জগন্নাথের দেহ মধ্যে যে বিষ্ণুপঞ্জর আছে তাহাও এইরূপ কোনও পবিত্র অস্থি। হাণ্টার সাহেবের ও ফার্গুসন সাহেবের মতের সহিত বঙ্গদেশের উজ্জ্বল রত্ন স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতের ঐক্য হয় না। তিনি পুরীকে দন্তপুর বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার মতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন নামক স্থানই খুব সম্ভব বৌদ্ধ তীর্থ দন্তপুর। তবে পুরী যে এক সময়ে বৌদ্ধ তীর্থ ছিল এবং সে সময়ে এখানে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহা তিনি অস্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বুদ্ধদেবের দন্তোৎসব হইতেই জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে। এ সমুদয় বিষয় সম্পর্কে নানাবিধ মতালোচনা করিয়া স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তদীয় সুবিখ্যাত উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গের বোধ সৌকর্য্যার্থ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন "জগন্নাথের ব্যাপারটিও বৌদ্ধ ধর্ম্ম-মূলক বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম মিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটী জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী ফাহিয়ন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ তীর্থ পর্য্যটনার্থ যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটী বৌদ্ধ মহোৎসব সন্দর্শন করেন। তাহাতে জগন্নাথের রথ যাত্রার ন্যায় অবিকল এক রথে তিনটী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া আইসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধমূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী বোধিসত্বের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল।

"খোটানের উৎসবে যে সময়ে ও যতদিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইত, জগন্নাথের রথ যাত্রাও প্রায় সেই সময়ে ও ততদিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মেজর জেনেরেল কনিংহেম বিবেচনা করেন, ঐ তিনটী মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত

---

page 42. "Orissa was principally Buddhist, at least from the time of Asoka, B. C. 250, till the Gupta era, A. D. 319, when all India was distracted by wars connected with the tooth relic, which was said to have been preserved at Puri—then in consequence called Danta Pura--till that time." Furguson's Indian Architecture, p. 416.

বৌদ্ধমূর্ত্তিত্রয়ের অনুকরণ বই আর কিছুই নহে। সেই তিনটী মূর্ত্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও শঙ্ঘ। বৌদ্ধেরা সচরাচর ঐ ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। তিনি জগন্নাথের সুভদ্রা। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার পরিত্যাগ প্রথা এবং জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণু পঞ্জরের অবস্থিতি প্রবাদ, এ দুটির বিষয় হিন্দু ধর্ম্মের অনুগত নয়; প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু এই উভয়ই সাক্ষাৎ বৌদ্ধ মত বলিলে বলা যায়। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতার স্থলে জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়। কাশী এবং মথুরার পঞ্জিকাতেও বুদ্ধাবতার স্থলে জগন্নাথের রূপ আলেখিত হইয়া থাকে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জগন্নাথের ব্যাপারটি বৌদ্ধধর্ম্মমূলক বলিয়া স্বতই বিশ্বাস হইয়া উঠে। জগন্নাথ ক্ষেত্রটি পূর্ব্বে একটা বৌদ্ধক্ষেত্রই ছিল, এই অনুমানটি জগন্নাথ বিগ্রহস্থিত উল্লিখিত বিষ্ণুপঞ্জর বিষয়ক প্রবাদে একরূপ সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। যে সময়ে বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হয়, ইহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ঘটনাটিতেও উল্লিখিত অনুমানের সুন্দররূপ পোষকতা করিতেছে। চান দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্থ্সঙ্গ উৎকলের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতটে (অর্থাৎ উড়িষ্যার যে অংশে পুরী সেই অংশে) চরিত্রপুর নমে একটী সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। এই চরিত্রপুরই এক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। শ্রীমান্ এ কানিংহেম অনুমান করেন, তাহারই একটী অধুনাতন জগন্নাথের মন্দির। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধাদির অস্থিকেশাদি সমাহিত থাকে, এই নিমিত্তই জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণু-পঞ্জরের অবস্থিতি বিষয়ক উল্লিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে।" প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই সাধারণের বহুকালের বিশ্বাসী সত্যগুলি কক্ষভ্রষ্ট হইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে,—একদিকে প্রামাণিক সত্য, অপর দিকে বংশপরম্পরায় অনুস্যূত ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাস। আমরা এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কোনও মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না,—এ সকল বিভিন্ন মতানুযায়ী আলোচনা পাঠকবর্গের কৌতূহলোদ্দীপক হইবে বলিয়াই এ স্থানে যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া

প্রকাশ করিলাম। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁহার গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন যে * জেনেরেল কনিংহেম্ ঐ (দারু মূর্ত্তি) তিনটি বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এই মূর্ত্তিত্রয়ের বিজ্ঞাপক হওয়াই অতিমাত্র সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি সাঞ্চি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা স্থান হইতেও এমন কি শক রাজাদিগের মুদ্রা হইতেও ঐরূপ ধর্ম্মযন্ত্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ধর্ম্মযন্ত্র বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ বীজ স্বরূপ য র ল ব ন এই পাঁচটি পালি অক্ষরের সমষ্টি স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উল্লিখিত তিনটি ধর্ম্মযন্ত্রের সহিত জগন্নাথাদি তিন মূর্ত্তির অভেদ বা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জেনেরেল্ কানিংহেম ডিল্‌সা স্তূপ বিষয়ক বত্রিশসংখ্যক চিত্রপটে ঐ উভয়কেই পার্শ্বাশার্শি করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। দেখিলেই শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণবত্রিমূর্ত্তি তিনটী বৌদ্ধধর্ম্মযন্ত্রের অনুকরণ বলিয়া সহজেই প্রতিয়মান হয়। ঐ তিনটি যন্ত্র সমগ্র বৌদ্ধত্রিমূর্ত্তির পরিচায়ক হউক বা না হউক, যখন জগন্নাথপুরীর তিনমূর্ত্তি কোনরূপ পরিজ্ঞাত দেবাকৃতি, পশ্বাকৃতি বা প্রকৃত মনুষ্যাকৃতি নয় এবং যখন ঐ তিন ধর্ম্ম যন্ত্রের সহিত তাহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন উল্লিখিত অনুমানটি সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত ও সঙ্গত বলিয়া স্বীকার

---

* আমরা এস্থানে ফার্গুসন সাহেবের অভিমতও প্রকাশ করিলাম।

"In like manner, there seems little doubt that the tooth relic was preserved at Puri till the invasion of the Yavanas, apparently, as before mentioned, to obtain possession of it. According to the Buddhist version, it was buried in the Jungle, but dug up again shortly afterwards, and conveyed to Ceylon. According to the Brahmanical account, it was the image of Juganát, and not the tooth, that was hidden and recovered on the departure of the Yavanas, and then was enshrined at Juganát in a new temple on the sands. The tradition of a bone of Krishna being contained in the image is evidently only a Brahmanical form of Buddhist relic worship, and, as has been frequently suggested, the three images of Juganát, his brother Balbhadra and the sister Subhadhra, are only the Buddhist trinity—Buddha, Dharma, Sanga—disguised to suit the altered-condition of belief among the common people. The pilgrimage, The Rát Jatra, the suspension of caste prejudices, everything in fact at Puri, is redolent of Buddhism but of Budhism so degraded as hardy to be recognisable by those who know that faith only in its older and purer form."

Furguson's History of Indian and Eastern Architecture, page 429.

করিতে হয়। আরাঙ্গাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত ইলোরার নিকটস্থ একটী বৌদ্ধ দেবালয় অদ্যাপি জগন্নাথের মন্দির বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে হিন্দু দেবতার জগন্নাথ এই নামটিও বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত এইরূপ অক্লেশেই মনে করা যাইতে পারে।* প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান যাহাই হউক না কেন একথা ঠিক্ যে হিন্দুগণ কখনই দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবকে বৌদ্ধধর্ম্ম-যন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। হিন্দুর প্রত্যেক পুরাণ গ্রন্থে জগন্নাথদেবের প্রাচীনত্ব বিশেষরূপে উল্লিখিত থাকা সত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন যে মহারাজ যযাতি কেশরী কর্ত্তৃক বৌদ্ধযন্ত্রত্রয় দারুব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিবার পর হইতে উহা হিন্দু-দিগের প্রধান আরাধ্য দেবরূপে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু "বিশ্বকোষ" সঙ্কলিতা সুধী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মত খণ্ডন করিয়া পুরুষোত্তমদেবকে আর্য্যজাতির এক প্রাচীনতম দেব প্রতিমা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার মতই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। যে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্ব হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যে পুণ্যস্থান হিন্দুদিগের চিরআদরণীয় ও চিরবরণীয় এবং প্রতি বৎসর যে তীর্থে ভারতবর্ষের নানাদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মকামীযাত্রী সমাগত হ'ন এবং যাহার মাহাত্ম্য প্রতি প্রাচীন পুরাণাদিতে বর্ণিত, হিন্দুর সেই চিরআদরের—চিরগৌরবের—পরম পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র কি বৌদ্ধধর্ম্মমূলক ও নিতান্ত আধুনিক? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা এস্থানে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের প্রাচীনত্ব ও তিনি যে হিন্দুর আদিম দেবতা তাহার প্রমাণার্থ "বিশ্বকোষ" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শাঙ্খায়ণব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরষম্।
তদা লভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্॥"

শাঙ্খায়ন ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু দারুময় পুরুষোত্তমাখ্যাদেবতাশরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপূরুষং নির্ম্মাতৃ-রহিতত্বেন অপূরুষং তৎ আলভস্ব দুর্দ্দনো হে হোতঃ তেন দারুময়েণ দেবেন

* উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ।

উপাস্যমানেন পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকাং গচ্ছেতার্থ।' আদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্টদেশে যে অপৌরুষেয় দারুমূর্ত্তি সমুদ্রতীরে ভাসিয়াছে, তাহার উপাসনা করিলে লোক পরমলোকে গমন করে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও বাচস্পত্য রচয়িতা পণ্ডিত তারানাথও অথর্ব্ববেদের নাম দিয়া এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোর্মধ্যে অপূরুষম্।
তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্।

* * * * * সাত শত বৎসরের হাতের লেখা উৎকল খণ্ডের পুথি পাইয়াছি, তাহাতে উক্ত বচনের অনুকূলে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"য এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারেহপৌরুষঃ।
তমুপাস্য দুরারাধ্যং মুক্তিং যান্তি সুদুর্লভাম্॥

(উৎকলখণ্ড, ২১।৩ শ্লোক)

ঐ শ্লোকের পর লিখিত আছে—

"ব্রহ্মজ্ঞাননিধিঃ সাক্ষান্নারদঃ প্রত্যুবাচ তং।
নহি প্রবৃত্তির্বিষ্ণোস্তু বিনা বেদং প্রবর্ত্ততে॥
পরেষাং যস্য বা স্বষ্টো শ্রুতি প্রামাণ্যবান্ প্রভুঃ।
বিনা শ্রুতিং প্রবৃত্তে তৎ কস্তৎ প্রামাণ্যমৃচ্ছতি॥
তস্মাৎ স্মৃতি প্রসিদ্ধোহয়মবতারোহত্র ভূপতে।
বেদান্তবেদ্যং পুরুষং গীতং তং সামগীতিষু॥
প্রতিমামেব জানীহি নিঃশ্রেয়সকরীং নৃণাম্।
সন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ পূর্ব্বমেতদর্চ্চাপ্রকাশিকাঃ॥"

উক্ত প্রমাণের দ্বারা অনুমিত হয় যে সময়ে বেদান্তবেদ্য উপনিষদে ব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছিল, সেই প্রাচীন কালে অথবা তাহার অনতিকাল পরে দারুব্রহ্মের প্রতিমা—প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।"

(বিশ্বকোষ—৫৭৫)

পাঠকগণ হয়ত আমাদের এই প্রত্নতত্ত্বালোচনায় রুষ্ট হইতেছেন, কিন্তু কি করা? কোনও একটা স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে কেবল

মাত্র তাহার দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বিবরণ দিলেও ত তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন না, কাজেই সংক্ষেপে আমরা তাঁহাদিগের নিকট আবশ্যকীয় সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছি এখন প্রকৃত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে খোর্দারাজের অধিকৃত সমুদয় স্থান যখন ব্রিটিস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন পুরীর দেব-মন্দিরের সমুদয় ভার বৃটিশ গভর্মেণ্টের হস্তে আইসে ও ইংরেজরাজ যাত্রিগণের নিকট হইতে কর আদায় প্রভৃতি করিতে থাকেন, কিন্তু খ্রীষ্টান মিসনারিগণের খ্রীষ্টীয় গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ হিন্দুমন্দিরের তত্ত্বাবধান অসঙ্গত বোধ হইল, তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে গভর্মেণ্ট পুরীর রাজার উপরেই দেবসেবার ভার ও আয়ের উপযুক্ত তদানুসঙ্গিক সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তদবধি জগন্নাথের সকল কার্য্যই উক্ত রাজা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে।

পুরুষোত্তমের সীমা ও মাহাত্ম্য।

নীলাদ্রিমহোদয়ের মতে জানিতে পারা যায় পুরুষোত্তমধামের মাহাত্ম্য ঋষিকুল্যা নদী হইতে বৈতরণী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মহানদীর দক্ষিণ ও সাগরের উত্তরকূল নীলাচলের মধ্যে দশ যোজনের স্থানে স্থানেও শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র আছে। উৎকলখণ্ডের মতে এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক স্বীয় মূর্ত্তির অনুরূপ করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কপিলসংহিতাকার বলেন,—

"সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাংরাজা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥ ।৩৯।

অর্থাৎ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র সকল তীর্থের রাজা এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও সকল দেবতার অধিপতি। শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য আরও বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ইত্যাদি নানা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চৈতন্যভাগবতকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহাতে বর্ণিত আছে—

"সিন্ধুতীরে বটমুলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্যস্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥

সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
মরণ মঙ্গল করি কহি যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সেখানে নাহিক যম দণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥

(চৈ. ভা. অন্ত্যখণ্ড ২.)

পরদিন প্রত্যূষে নবপ্রভাতের নবীন রাঙা রবি যখন লোহিত-কিরণসম্পাতে চতুর্দ্দিক হাস্যময় করিয়া পূর্ব্ব গগনে উদিত হইয়াছিলেন, তখন আমরাও অগণ্য যাত্রীর সহিত শ্রীমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। গলি ছাড়িয়া রথের সুপ্রশস্ত রাস্তায় পঁহুছিয়া অদূরস্থিত মন্দিরের উচ্চ ধ্বজা দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল! মনে পড়িল গোবিন্দদাসের "ধ্বজা দেখি মহাপ্রভু পড়িল ধরায়"। এই রাস্তাটি অতিশয় প্রশস্ত, কারণ এখান দিয়াই রথের সময় রথ টানা হয়। কত ভক্ত তীর্থযাত্রী দূর হইতেই মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইয়া আনন্দে ধূলায় লুটাইয়া পড়িতেছে। পুরুষ রমণী কত তীর্থ যাত্রী রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া জগন্নাথ দেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। কি নিবিড় আনন্দ! কি প্রাণারাম অপূর্ব্ব প্রীতির উচ্ছ্বাস! আমরা ক্রমে জগন্নাথ দেবের মন্দির সমীপে উপনীত হইলাম। যে স্থানে মন্দির

ইত্যাদি অবস্থিত তাহার নাম নীলাচল। প্রায় ২২ ফিট উচ্চ ভূমির উপরে মন্দির নির্ম্মিত। নীলাচলক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে লাটারাইট প্রস্তর নির্ম্মিত মেঘনাদ নামক ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহা গঙ্গাবংশীয় রাজা পুরুষোত্তম দেবের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে, পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার, উত্তরে হস্তীদ্বার এবং দক্ষিণে অশ্বদ্বার। সিংহদ্বারের শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসার পরিচায়ক, উহা কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহমূর্ত্তি। উপরের ছাদ পিড়ামিডাকারে (চূড়ার মত) নির্ম্মিত অতি সুন্দর ও কারুকার্য্য সম্পন্ন। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৬৫২ ফুট ও বিস্তার প্রায় ৬৩০ ফুট হইবে। এই দ্বারের কপাট দুইটী শালকাষ্ঠের। উপরে নবগ্রহের মূর্ত্তি সুন্দররূপে অঙ্কিত। দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি জীবন্ত স্বরূপ বিরাজমান; ওড়িষ্যার প্রায় প্রতি দেবমন্দিরেই এইরূপ দৃষ্ট হয়। এই পথেই শ্রীমন্দিরে যাইতে হয়। ২২টী সোপান অতিক্রম করিলে তবে মন্দির-প্রাঙ্গণে পঁহুছা যায়। সিংহদ্বারের সম্মুখে অরুণস্তম্ভ। ইহা ৪৪ ফিট উচ্চ। একখানি মাত্র প্রস্তর দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্তম্ভ পুরী হইতে কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী কনারক হইতে আনীত, ইহার শীর্ষদেশে অরুণের মূর্ত্তি।* পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই বাম ভাগে "শ্রীকাশী-বিশ্বনাথ" ও "শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি" দৃষ্ট হয়। ইহার পরে আমাদের পূর্ব্বো-ল্লিখিত ২২টী ধাপ পার হইলেই শ্রীমন্দিরের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ৪০০ শত ও উত্তর দক্ষিণে ২৭৮ ফিট। ইহার চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে, উহার যে কোনটি দ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। এই প্রাঙ্গণের মধ্যেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিখ্যাত মন্দির, ইহার চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ প্রাচীর মধ্যে আশেপাশে আরও ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর প্রায় ১২০টী মন্দির আছে। বঙ্গোপসাগরের তটপ্রদেশ হইতে এই মন্দিরটি প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই মন্দিরের চূড়া, হস্তী

মন্দিরাদি।

* Outside the Principal entrance, or Lion Gate, in the square where the [pilg]rims chiefly throng, is an exquisite monolithic pillar which stood for [cent]uries before the Temple of the sun, twenty miles up the coast."

Hunter's Statistical Account of Puri, page 58.

শুণ্ডাকৃতি, উপরে বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজাদ্বারা পরিশোভিত, ইহার উচ্চতা ১৯২ ফুট, সময়ের গতিকে ইহার উর্দ্ধভাগ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়। হাণ্টার বলেন "Its conical tower rises like an elaborately carved sugar-loaf, 192 feet high, black with time, and surmounted by the mystic wheel and flag of Vishnu." দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রাজা অনঙ্গভীম দেব কর্ত্তৃক শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ১৪ বৎসর ব্যাপী সময় লাগিয়াছিল। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। দাক্ষিণাত্যের ও ওড়িষ্যার রীত্যানুসারে জগন্নাথদেবের মন্দিরও চারিভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বদিকে ভোগ মণ্ডপ, তাহার পশ্চিমদিকে জগমোহন বা মোহন, মোহনের সম্মুখ-ভাগে নাটমন্দির ও সর্ব্ব পশ্চিমভাগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূল মন্দির। ভোগ মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে এতদূর কুৎসিত সব মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে যে তাহার বর্ণনা অসম্ভব। মন্দিরের এই চারিটী অংশই প্রশস্ত। ভোগ মণ্ডপ ৫৮×৫৬ ফুট। ইহার দরোজার উপরে অতিশয় সুন্দর নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে। এস্থানে জগন্নাথদেবের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম ভোগ-মন্দির হইয়াছে, ইহারও প্রবেশের চারিটী দ্বার, অধিকাংশ সময়েই পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দ্বার বন্ধ থাকে।

নাটমন্দির—এই গৃহটিও বিশেষ প্রশস্ত ইহা ৮০×৮০ ফুট। ইহারও চারিদিকে চারিটী দ্বার; পূর্ব্ব দ্বারে জয় ও বিজয়ের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। দেওয়ালে কোনওরূপ কারুকার্য্য বিদ্যমান নাই।

নাটমন্দিরের পরেই মোহন বা জগমোহন, ইহাও ৮০×৮০ ফুট, ইহার ছাদ ১২০ ফিট উচ্চ দেখিতে ঠিক্ পিরামিডের মত। ইহার প্রাচীরে বহু দেব মূর্ত্তি ও পুরুষোত্তমদেবের দক্ষিণবিজয়ের প্রতিলিপি আছে। মোহনের পশ্চাতেই মূল মন্দির বা মহামন্দির, ইহা ৮০×৮০ ফুট। মূল-মন্দিরের চূড়ার উচ্চতার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা ইহা অনেক উচ্চ—সেজন্যই বহুদূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া দৃষ্টি-গোচর হয়। পুরী ষ্টেসনে গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই যাত্রিগণ এই চূড়া দেখিতে পাইয়া আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠে। এরূপ উচ্চ চূড়া অতি অল্প

দেব-মন্দিরেই দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন উৎকলে আসেন তখন তিনিও এই শ্রীমন্দিরের শোভাদর্শনে আকুল হইয়াছিলেন, সেই প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষের ভাবাবেশ তদীয় সাধক ভক্ত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"প্রভুর মন্দির হেরি কাঁদে উভরায়।
কখন আছাড় খেয়ে পড়য়ে ধরায়॥
বেগে গিয়া ধূলাপায় প্রভুর দুয়ারে।
অশ্রুস্রোতে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে না পারে॥
আছাড়ি বিছাড়ি চীৎকার বিলুণ্ঠন।
লক্ষ লোক আসে ভাব করিতে দর্শন"॥

(গোবিন্দ দাস)

মন্দিরের অগ্নিকোণে বদরীনারায়ণ ও তাহার অল্প পশ্চিমদিকে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজিত। এই উভয় মন্দিরের মধ্যে পুরাণো পাক গৃহের দরোজা, ইহার পশ্চিমেই বটবৃক্ষ ও তাহার পশ্চিমে বটের মূলে অষ্টশক্তির অন্যতমা মূর্ত্তি মঙ্গলাদেবী। এই অষ্টশক্তির সম্বন্ধে 'উৎকলখণ্ডে' লিখিত আছে যে—

"মঙ্গলা বটমূলে তু পশ্চিমে বিমলা তথা।
শঙ্খস্য পৃষ্ঠভাগে তু সংস্থিতা সর্ব্বমঙ্গলা॥
অর্দ্ধাশনী তথা লম্বা কুবেরদিশি সংস্থিতা।
কালরাত্রির্দক্ষিণস্যাং পূর্ব্বস্যান্তু মরীচিকা॥
কালরাত্র্যাস্তথা পশ্চাৎ চণ্ডরূপা ব্যবস্থিতা।
ত্রতাভিরুগ্ররূপাভিঃ শক্তিভিঃ পরিরক্ষিতম্॥"

অর্থাৎ বটের মূলদেশে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পশ্চাদ্দিকে সর্ব্ব-মঙ্গলা, উত্তরদিকে অর্দ্ধাশনী ও লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রি, কালরাত্রির পশ্চাতে চণ্ডরূপা এবং পূর্ব্বদিকে দেবী মরীচিকা অবস্থিতা।

পুরাণে লিখিত আছে যে এই অষ্টশক্তি কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমক্ষেত্র রক্ষিত হয়। মঙ্গলাদেবীকে দর্শন ও তাঁহার পূজা করিলে মানুষের সর্ব্বপ্রকার মোহের বন্ধন দূরীভূত হয়। আমরা যে বটবৃক্ষের কথা উল্লেখ করিলাম নারদপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণে ইহা অক্ষয়বট বা কল্পবৃক্ষ নামে বর্ণিত হইয়াছে—

যাত্রিগণ এই বৃক্ষকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিষ্ণুরূপে পূজা করিয়া থাকেন। এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে, সূর্য্যমূর্ত্তি নরসিংহমূর্ত্তি, ভূষণ্ডিকাকেরমূর্ত্তি ক্ষেত্রপালের মূর্ত্তি প্রভৃতি বহু মূর্ত্তি বিরাজমান, সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ক্ষেত্রপালমূর্ত্তির পশ্চাতে মুক্তি মণ্ডপ, যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেন সে সময়ে মহারাজা প্রতাপরুদ্র ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে সময়ে সময়ে নানা বিভিন্ন দেশ হইতে আগত পণ্ডিতবর্গ যাত্রীদিগকে শাস্ত্রব্যাখ্যাদি শুনাইয়া থাকেন। গণেশমূর্ত্তির পশ্চিমভাগে একটী কুণ্ড আছে। ইহার মাহাত্ম্য উৎকলখণ্ড, কপিল-সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এই কুণ্ডের পশ্চিমভাগেই বিমলাদেবীর মন্দির অবস্থিত, মন্দিরটী দেখিলেই ইহাকে অতিশয় প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বিমলাদেবী অষ্টশক্তির অন্যতম শক্তি। তান্ত্রিকগণের মতে ইনিই শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী আদ্যাশক্তি ও জগন্নাথদেব তাহার ভৈরব। দেখিলাম অনেক রমণী ইঁহার ললাটে সিঁন্দূর স্পর্শ করাইয়া তাহা গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অঞ্চলস্থ কৌটায় সযত্নে রাখিয়া দিতেছে। পুরীর অন্যান্য দেবী মূর্ত্তি অপেক্ষা ইনিই অধিক প্রাচীনা, মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে—"গয়ায়াং মঙ্গলা নাম বিমলা পুরুষোত্তমে॥" আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীর দিবস গভীর নিশীথে যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শয়ন হইয়া যায় তখন বিমলাদেবীর সম্মুখে ছাগবলি দেওয়া হয়, এতদ্ব্যতীত পুরুষোত্তমধামের আর কোথাও ছাগবলি হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট ভোগান্নে ইঁহার ভোগ হয়। বিমলাদেবীর উত্তরদিকে ও দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি বিরাজিত,—ইহার দক্ষিণভাগে ভাণ্ড গণেশ, উত্তরে গোপীনাথমূর্ত্তি, তাহারও উত্তরদিকে মাখনচোরার মূর্ত্তি, ও তাহার উত্তরে সরস্বতী এবং নীলমাধবের মূর্ত্তি বিরাজিত। এ সকল মন্দিরে দেবদর্শনার্থ লোক স্রোতের মত প্রবেশ করিতেছে ও নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী দর্শনী প্রদান করিয়া বাহিরে আসিতেছে—যাত্রিগণের সকলের বদন-কমল এক অপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। নীলমাধবের মন্দিরের উত্তরদিকে সুদৃশ্য কারুকার্য্যসম্পন্ন লক্ষ্মীর মন্দির অবস্থিত, এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী ও শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরও চারি অংশে

বিভক্ত, এই মন্দিরেও তদ্রূপ ভোগমণ্ডপ, নাট-মন্দির, মোহন ও মূল মন্দির এই চারি বিভিন্ন অংশ দর্শন করিলাম। লক্ষ্মীদেবীর মূল মন্দির অতিশয় প্রাচীন, কাহারও কাহারও মতে ইহা মহারাজ চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবীর যে ভিন্ন পাকগৃহ আছে তাহাতে প্রায় সাধারণ সমুদয় বিগ্রহেরই ভোগান্ন প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বমঙ্গলা কালীমূর্ত্তি—লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী ছোট মন্দির মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা কালীমূর্ত্তি বিরাজিতা। ইহার পরে ক্রমান্বয়ে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, সূর্য্যনারায়ণের মন্দির, পাতালেশ্বর প্রভৃতি বহু দেব মন্দিরাদি অবস্থিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ঈশাণকোণে রাধাশ্যাম ও ভোগমণ্ডপের ঈশানকোণে গৌরাঙ্গদেবেরমূর্ত্তি, রাধাশ্যাম ও গৌরাঙ্গদেবের মন্দির মধ্যস্থলে একটী দ্বার আছে এই দ্বারের মধ্য দিয়া স্নানের বেদীতে যাইতে হয়। এই বেদীর উপরেই জন্মোৎসব বা স্নানযাত্রা হয়, এই স্নান-মণ্ডপের অগ্নিকোণে চাহনিমণ্ডপ, এখানে জগন্নাথদেবের স্নান দর্শনার্থ লক্ষ্মীদেবী আগমন করেন।

ভেট-মণ্ডপ—সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দক্ষিণদিকে ভেট-মণ্ডপ দৃষ্ট হয়, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচাদেবীর মন্দিরে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী তাহার অপেক্ষার নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন। বাইশ পৈঠার উত্তর-দিকে পাণ্ডার গৃহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বিক্রী হইয়া থাকে। মন্দিরে গমন করিয়া যাত্রিগণ সাধারণতঃ প্রথমে কল্পবট বা অক্ষয়বট ও গরুড়কে নমস্কার করিয়া সুভদ্রা বলরাম ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন। আজকাল গভর্মেণ্টের কৃপায় দেবদর্শনের বহু সুযোগ হইয়াছে—পূর্ব্বে একত্রে এত লোক ঢুকিত ও এইরূপ ভিড় হইত যে তাহাতে অনেক ক্ষাণজীবী যাত্রীর প্রণান্তের যোগাড় হইয়া উঠিত। আমরা আমা-দের সঙ্গীয় বহু যাত্রিগণ সমভিব্যহারে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম এবং প্রাঙ্গণস্থ সমগ্র দেবদেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলাম, সে সমুদয় দেবতার অত্যধিক বিবরণ দেওয়া অসম্ভব এবং পাঠকগণেরও তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইবে না বলিয়াই ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। মন্দিরের প্রাঙ্গণে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী প্রবল স্রোতের

মত আসিতেছে যাইতেছে,—সে স্রোতের একটুকু বিরাম নাই—আর সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে "জয় জগন্নাথজীকি জয় রব" অতি বড় পাষাণ হৃদয়েও ক্ষণিকের জন্য ভক্তির উন্মেষ করিয়া দিতেছে। আমরা মোহনের অভ্যন্তরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম—সম্মুখে গরুড়স্তম্ভ, জগন্নাথদেবের সম্মুখস্থ গরুড় মূর্ত্তিকে নমস্কার করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম। ইহাতে বিলক্ষণ শিল্প-নৈপুণ্য বিরাজমান। কথিত আছে যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রথমে ভক্তির আবেগে সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভ বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন, গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন,—

"গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিলা।
কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিলা॥"

জগমোহনের মধ্যে একটী বেড়া আছে, যাহারা অধিক অর্থব্যয় করিতে পারে না তাহারা এই বেড়ার বাহির হইতেই অভীপ্সিত মহাবিষ্ণুরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের আর দেবতা স্পর্শন করিয়া মন-সাধ পূর্ণ হয় না। যাহারা কাঞ্চন-খণ্ড কিঞ্চিৎ বেশী খরচ করে তাহারা মন্দিরের দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশ করে ও রত্নবেদী বা মহাবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে মন প্রাণ ভরিয়া দর্শন করতঃ হৃদয় শীতল করে। হায় অর্থ! জগত সংসার তোমার অধীন, দেব-মন্দিরেও সাম্যভাবের পরিবর্ত্তে বৈষম্যের আদর। এ স্থানে দেবদর্শন উপলক্ষে যাহা প্রণামী প্রদত্ত হয় তাহা. পাণ্ডামহাপ্রভুগণ নির্ব্বিবাদে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহা দক্ষিণা প্রদত্ত হয় তাহা মন্দিরের আয় ব্যয়ের হিসাবে জমা হয়। জগন্নাথের মন্দিরের ভিতর দিবালোকেও অন্ধকার, কেবল রত্নবেদীর দুই পার্শ্বে দুইটী প্রদীপ জ্বলে, সেজন্যই অনেক ক্ষীণ দৃষ্টি-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সহসা আলোক হইতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি সুস্পষ্ট দেখিতে পায় না। যে রত্নবেদীর উপরে জগন্নাথদেব প্রভৃতি অধিষ্ঠিত আছেন, উহা দৈর্ঘ্যে ১৬ ফিট ও উর্দ্ধে ৪ ফিট। কথিত আছে যে ইহার মধ্যে লক্ষ শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্য স্বয়ং দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি হইতেও ইহার মাহাত্ম্য বেশী, কারণ ইহা মহাবেদী বা

রত্নবেদী।

সিদ্ধপীঠ। এই মহাবেদীর উপরে প্রথমে দক্ষিণদিকে বলরাম, তাহার পরে সুভদ্রা এবং তৎপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। এ সকল মূর্ত্তির সম্মুখে সুন্দর সুগঠিত স্বর্ণ নির্ম্মিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি, রৌপ্যবিনির্ম্মিত বিশ্বধাত্রী মূর্ত্তি ও পিত্তলের মাধব মূর্ত্তি আছে। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ও অন্যান্য প্রধান ত্রিমূর্ত্তি স্নানযাত্রা ও রথোৎসব ব্যতীত অন্য কোনও উপলক্ষে বাহিরে আনা হয় না। দিবসের বিভিন্ন সময়ে দেবমূর্ত্তির বিভিন্ন প্রকারের

দেবতা সম্পর্কিত কথা।

শিঙ্গার বা বেশ হয়। প্রাতঃকালে মঙ্গল-আরতি-শিঙ্গার, তাহার কিঞ্চিৎ পরে অবকাশ-শিঙ্গার, দ্বিপ্রহরের সময় প্রহর-শিঙ্গার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চন্দন-শিঙ্গার ও সন্ধ্যার পরে বড়-শিঙ্গার হইয়া থাকে। কোন কোন সময় দামোদর, বামন প্রভৃতি বেশও হইয়া থাকে। প্রতিদিন দেবতার অর্চ্চনা প্রভৃতি কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হয় এ স্থানে তাহাও উল্লেখ করিলাম। সর্ব্বপ্রথমে জাগরণ, তখন দুন্দুভি ধ্বনি হয়, তৎপর মঙ্গল আরতি, মঙ্গল আরতির পরে দন্তকাষ্ঠ প্রদান, বস্ত্র পরিধান, বালভোগ ইত্যাদি সকল প্রকারের ভোগ প্রদত্ত হয়। বালভোগে খই, ননী, দধি, নারিকেল, আর সকাল ভোগে খেচরান্ন ও পিষ্টকাদি দেওয়া হয়। সকাল ভোগের পরে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়,—এই ভোগকে দ্বিপ্রহর ভোগ কহে। পরে বেলা চারি ঘটিকার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে জিলাপি ভোগ, তৎপরে নানাপ্রকার মিষ্টান্নযুক্ত সন্ধ্যা ভোগ ও তাহার পরে বড়-শিঙ্গার ভোগ হইয়া থাকে, এই সময়ে “গোপবল্লভ” নামে রাজবাটী হইতে এক প্রকার মিষ্টান্ন আসে ও তাহাদ্বারা ভোগ হয়। প্রত্যেকবার ভোগ দেওয়ার পূর্ব্বেই পূজা ও যথারীতি আরতি হয়। জগন্নাথদেবের উদ্দেশে যে কোনও প্রকার ভোগ দেওয়া হয় তাহাকেই মহাপ্রসাদ কহে। এই মহাপ্রসাদের জন্যই এই স্থানের বিশেষ খ্যাতি। ইহার এমনি মাহাত্ম্য যে জাতিভেদের কঠোরতা দূরে রাখিয়া বিশেষ সমাদর ও ভক্তির সহিত ইহা সকলেই এক সঙ্গে গ্রহণ করেন। এখানে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলে একত্র আহারাদি করিতে পারে, দারুরূপী পরম ব্রহ্মের নিকট জাতিভেদের সংকীর্ণতা থাকিতে পারে না, ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন, আচণ্ডাল সকলেই তাঁহার সেবার অধিকারী।

কেবল বেশ্যা ও চণ্ডালেরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। এই পুণ্যস্থানে উচ্চ নীচ সকলে দেবের প্রসাদ একত্র গ্রহণ করে বলিয়া কোন দোষ হয় না। উৎকলখণ্ড, কপিল সংহিতা মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষরূপে লিখিত আছে।

মহাপ্রসাদ।

গঙ্গাজল যেরূপ কিছুতেই অপবিত্র হয় না, তদ্রূপ মহাপ্রসাদও কোনরূপে অপবিত্র হয় না, এমন কি যদি চণ্ডালেও ইহা পাক করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহা স্বয়ং লক্ষ্মী দ্বারা পাক হইয়াছে জানিতে হইবে। এই প্রসাদ ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ, এমন কি বহুদূর হইতে আনিয়া দিলেও অশুদ্ধ হয় না, যখন যে অবস্থায়ই পাওয়া যায় না কেন তখনি তাহা ভোজন করিবে, 'ইহাতে সর্ব্বপ্রকারের পাপ বিনষ্ট হয়।' কপিল সংহিতায় ইহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—

"জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং মহাপাতকনাশনম্।
ভক্ষণাৎ ফলমাপ্নোতি কপিলাকোটিদানজং॥
কিং তেন ন কৃতং পাপং কিং তেন চ কৃতং তপঃ।
ভক্ষিতং যেন নান্নাদ্যং দারুব্রহ্মস্বরূপিণঃ।
জগন্নাথো যথা সাক্ষাদ্দর্শনান্মুক্তিদোধ্রুবম্॥
তথৈব মুক্তিদং হ্যন্নং জগন্নাথস্য ভো দ্বিজাঃ।
দেশান্তর গতং বাপি শুষ্কমার্দ্রমথাপি বা॥
ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব দ্বিজাতীনাঞ্চ মুক্তিদম্।
পুরুষোত্তমাৎপরং ক্ষেত্রং নাস্তি নাস্তি মহীসুরাঃ॥
দ্বিজাস্তু শ্বপচাদন্নং যত্র ভুঞ্জন্তি পূপকং।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গন্তব্যং পুরুষোত্তমম্।"

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে শ্রীক্ষেত্রধামের এই জাতি ভুলিয়া হিন্দুদের সকলের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার প্রথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে 'যখন জগন্নাথ ক্ষেত্র শবররাজগণের অধিকারে ছিল, তখন ইহা সামান্য ভাবে প্রকাশ পায়, পরে চৈতন্যদেবের সময় সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইয়া পড়ে।'* এ কথা অযথার্থ বলিয়া মনে হয় না, কারণ পূর্ব্বে

* বিশ্বকোষ—৫৮৬ পৃঃ।

জগন্নাথদেব যখন শবররাজের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হইতেন সে সময়ে নটী শবরগণই জগন্নাথদেবের ভোগ প্রস্তুত করিত, পরে দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্বারা জগন্নাথদেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে সে সময়েও তাহারাই জগন্নাথের ভোগ প্রস্তুত করিত, যখন জগন্নাথসেবক ব্রাহ্মণগণ দেখিতে পাইলেন যে তীর্থযাত্রিগণ এখানে আসিয়া নির্ব্বিবাদে শবরগণের প্রস্তুত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেছে তখন এই সূপকার শবরগণকে যজ্ঞোপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া লইলেন, উহারাই এখন বলভদ্রগোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইয়াছে। এ স্থানে সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা হিন্দুর এইরূপ জাতিভেদ সম্পর্কিত আচার অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না, উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে,—

"সাধারণং ধর্ম্মশাস্ত্রং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ন বিচার্য্যতে।
আয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যো দেবেন প্রবর্ত্তিতঃ॥
আচার প্রভবোধর্ম্মো ধর্ম্মস্থ প্রভুরচ্যুতঃ।"

পুরীর এই জগন্নাথদেব ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। ৪০৯ শকাব্দে জগন্নাথদেব মহারাজা যযাতিকেশরীর দ্বারা পুনর্ব্বার স্থাপিত হ'ন। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে,—

"Jagannath makes his first historical appearance in the year 318 A. D., when the priests fled with the sacred image and left an empty city Rakta Bahu and his buccaneers. For a century and a half the image remained buried in the western jungles, till a pious prince drove out the foreigners and brought back the deity. Three times has it been buried in the Chilka lake; and whether the invaders were pirates from the sea, or the devouring cavalry of Afghanistan, the first thing, that the people saved, was their god."

(Hunter's Statistical Account of Puri—p. 42).

মন্দির সম্পর্কে অন্যান্য কথা।

যাঁহারা শ্রীক্ষেত্রের সুবিশাল শ্রীমন্দির স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা যে ইহার অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মাণ কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই—নানাবিধ বিভিন্ন প্রকারের মন্দির সমূহের এইরূপ সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত অতি অল্প

মন্দিরেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু স্থাপত্য-কার্য্যে ইহা ভুবনেশ্বরের দেবমন্দির সমূহের সহিত তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট—প্রাচীনত্ব হিসাবেও ইহা ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে আধুনিক। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের উপর যে চূড়া আছে উহার নাম নীলচক্র, ইহা অষ্টধাতুর রাসায়নিক সংযোগে নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিতে অত্যন্ত মনোরম। কালাপাহাড় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই কথঞ্চিৎ অনিষ্ট করিয়াছিল মাত্র। অনেকদিন পর্য্যন্ত উহা বিকৃত অবস্থায় ছিল, পরে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে খুর্দ্দার প্রথম নৃপতি রামচন্দ্রদেব উহার সংস্কার সাধন করেন; এই চক্রের ওজন ৪মণ ৩০ সের ১০ ছটাক তিন কাঁচ্চা। ইহা তিনবার সংস্কারাদির পরে এখন অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৯৮৮৭।৷৹ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। এই দেব মন্দিরের চতুর্দ্দিকে নৃসিংহ, বামন ও কল্কি অবতার প্রভৃতি নানাবিধ পৌরাণিক বিরাট মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য ও গঠন নৈপুণ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু জানিনা কাহার আদেশে এসকল দেবমূর্ত্তি ভিন্ন শ্রীমন্দিরের তিনদিকের গাত্রে নানাবিধ অশ্লীল মূর্ত্তি অঙ্কিত ও খোদিত রহিয়াছে! এইরূপ জঘন্য ছবি দেখিলেই হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয়, এরূপ নীচ কল্পনা যে মানুষের চিন্তায়ও আসিতে পারে তাহাই আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। এমন লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হয় যিনি এসকল ছবি দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করেন না। পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগ্নী, মাতা পুত্রে ও স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া এসকল ছবির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারা যায় না। জানিনা কোন্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত ও খোদিত হইয়াছে! কেহ কেহ বলেন যে লোকের চিত্ত-বৃত্তি পরীক্ষার নির্ম্মিতই এসকলের উৎপত্তি, এসকল কুৎসিৎ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও যাহাদের চিত্তবৃত্তি বিচলিত হয় না তাঁহারাই প্রকৃত দেবদর্শনের অধিকারী। কিন্তু এমন লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি, যিনি এই সব বীভৎস মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করেন নাই। গুণ্ডিচাবাড়ীর অশ্লীল ছবিগুলি আরও জঘন্য। যেমন অজণ্টা গুহা চিত্রাবলী হইতে আমরা সে কালের রীতি-নীতি, শিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতি বুঝিতে পারি, তদ্রূপ এই সব মূর্ত্তিগুলি যে সময়ে অঙ্কিত ও চিত্রিত হইয়াছে ইহা যে সে সময়কার

অবনতির জঘন্য চিত্র দৃষ্টান্ত নহে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কি কোন কারণ নৈতিক আছে ?

শ্রীক্ষেত্রের ভোগ মন্দির হইতে লক্ষ লোকের ভোজ্য দ্রব্য যোগাড় হইতে পারে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে সারা বৎসর বিশ সহস্র লোক জীবন ধারণ করিয়া থাকে। শ্রীক্ষেত্রে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টী উৎসব হয়। তন্মধ্যে দোল-যাত্রা রথ-যাত্রাতেই অত্যন্ত লোক সমাগম হয়। অবার এই উভয় উৎসবের মধ্যে রথ-যাত্রায়ই বেশী যাত্রীক উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা এ স্থানে সমুদয় উৎসবের এক একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

উৎসব।

রথ-যাত্রা—রথ যাত্রার জন্য প্রতি বৎসর তিনখানি রথ প্রস্তুত হয়, জগন্নাথদেবের রথ ৩২ হাত উচ্চ ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৫ ফিট্, ব্যাসে ১৬টী লৌহ-চক্র আছে, চূড়ায় চক্র বা গরুড় পক্ষীর মূর্ত্তি থাকে, সেই নিমিত্ত এই রথের নাম চক্রধ্বজ বা গরুড়ধ্বজ। বলরামের রথ ৪৪ ফিট্ উচ্চ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩৪ ফিট্ এবং ইহাতে ৬ ফিট ব্যাসের ১২টী চক্র থাকে। ইহার শীর্ষদেশে পথচিহ্ন থাকে বলিয়া ইহাকে পথধ্বজা কহে। জগন্নাথদেবের রথ হইতে, বলরাম ও সুভদ্রার রথ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। রথের সময় দৈনিক সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে আসিয়া থাকে, প্রতি বৎসর যে কত লোক অকালে নানাবিধ ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার সংখ্যা নাই, অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি রথের তলে পড়িয়া বা লোকের ভিড়ে পদদলিত হইয়া কালকবলে নিপতিত হইয়া থাকে, গভর্মেণ্টের চেষ্টায় ও শাসনগুণে ইহা বহু পরিমাণে দূর হইলে ও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। রথ যাত্রার সময়ে দৈতাপতিগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি বহন করিয়া রথে আনিয়া স্থাপন করে। জগন্নাথ ও বলরামের কোমরে রেশমের দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া হয়— এবং সুভদ্রা ও সুদর্শনকে মাথায় তুলিয়া আনিয়া থাকে, সুদর্শন জগন্নাথদেবের রথেই রক্ষিত হয়, এ সময়ে মহাপ্রভুকে রাজশৃঙ্গার বেশ ও স্বর্ণের হস্ত পদাদিদ্বারা সুশোভিত করা হয়। চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী এসময়ে পুরীর রাজা রাজবেশে সুসজ্জিত হইয়া রথের সম্মুখে আগমন করেন এবং মুক্তাখচিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া দেন ও শ্রী শ্রীজগন্নাথ দেবের

পূজা করিয়া সর্ব্বাগ্রে রথের দড়ি ধরিয়া টানেন, এসময়ে ৪২০০শত কুলিতে রাজার সহিত রথের দড়ি ধরিয়া টানে এবং যাত্রিগণ ও পাণ্ডাগণ সহায়তা করে, পূর্ব্বে হাতীতে টানিত। এসময়ে অগণিত মনুষ্য মুণ্ড ও যাত্রিগণের কল-কোলাহলে শ্রবণ বধির হইয়া যায়, কারণ রথেতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে পারিলে আর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেই দিবসই গুণ্ডিচার বাড়ীতে রথ যাইবার কথা, কিন্তু তাহা হইতে পারে না, সেখানে যাইতে প্রায় চারি দিবস লাগে।

রথযাত্রা ব্যতীত শয়ন একাদশী, ঝুলন-যাত্রা, জন্মাষ্টমী কালীয়দমন-যাত্রা, দেবের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, উত্থান একাদশী, রাসযাত্রা, প্রাবরণোৎসব, (ওড়িষ্যা বাসিগণ ইহাকে ঘরনাগি বলে।) অভিষেকোৎসব, মাঘীপূর্ণিমা, দোলযাত্রা, রামনবমী, দমনকভঞ্জিকা ইত্যাদি উৎসব হইয়া থাকে। 'উৎকল খণ্ড' পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে এসমুদয় উৎসবের কোন একটী দর্শন করিলেই মহা-পুণ্যলাভ হয়।

নবকলেবর।

এসকল উৎসব ব্যতীত নবকলেবর নামক আরেকটি উৎসব হইয়া থাকে। এসময়ে শ্রীমূর্ত্তির জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ও সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, এই নবমূর্ত্তি স্থাপন উপলক্ষে যে উৎসব হয় তাহার নামই নবকলেবর উৎসব। জগন্নাথের অন্যান্য যে সমুদয় উৎসব হয় তাহার মধ্যে এই উৎসবই বিশেষ প্রধান, এসময়ে নানাদেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী শ্রীমূর্ত্তির নবকলেবর দেখিতে আগমন করেন। ওড়িষ্যার পণ্ডিতেরা বলেন যে আষাঢ় মাসে দুইটী পূর্ণিমা ও মলমাস হইলেই নবকলেবর হয়, এরূপাবস্থায় সাধারণতঃ সাত বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর মধ্যে উক্ত নবকলেবর হইয়া থাকে। এ বিষয়ে নীলাদ্রিমহোদয়ের মত এই যেঃ—

"বর্ষাণাং শততো বাপি তদর্দ্ধং বা নৃপোত্তম।
আবির্ভাব-তিরোভাবৌ ভবিষ্যতো হরেঃ কলৌ।
বর্ষ-বিংশতিতো বাপি পঞ্চবিংশতিতশ্চ বা।
জীর্য্যতাং দারু দেহানাং দেবানাং ঘটনাভবেৎ।"

অর্থাৎ একশত বছরেই হউক বা পঞ্চাশ বছরেই হউক কলিযুগে শ্রীহরির

আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে, আর কুড়ি বৎসরেই হউক বা পঁচিশবৎসরেই হউক জীর্ণ দারুমূর্ত্তির পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। আজকাল প্রায়ই নবকলেবর না হইয়া কেবল পুনর্নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। মন্দিরের ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে একটী উচ্চ বারান্দা হইতে নীল লহরীমালা বিভূষিত বঙ্গোপসাগরের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম, এখান হইতে সমুদ্রের ভৈরব গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায় না, এ সম্বন্ধে এইরূপ জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে যে সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিয়া সুভদ্রাদেবীর হাতদুইটী পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল! তাহাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সমুদ্রকে আদেশ করিলেন যে তোমার শব্দ যেন আমার মন্দিরে শ্রুত না হয়।

পুরীর মন্দিরের উচ্চতা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়! এতদূর উচ্চে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সকল কিরূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত তাহা চিন্তা করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এক স্থানে একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর পতিত দেখিলাম, শুনিলাম যে উহা মূলমন্দির হইতে পতিত হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তাহা আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীক্ষেত্র ধামে আরও অনেক তীর্থস্থান আছে; তন্মধ্যে নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থ ই প্রধান। এ সকল তীর্থের মাহাত্ম্যও নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, কপিলসংহিতা, উৎকল খণ্ড প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে সবিস্তারে লিখিত আছে,—ইহা ছাড়া আরো যে কত উপতীর্থ আছে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক, বিশেষ নূতনত্ব কিংবা প্রাচীনত্ব অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষে ধর্ম্মের নামে যে কত প্রকার ভণ্ডামি চলিয়া থাকে এবং নিরীহ যাত্রিগণের নিকট হইতে কত কৌশলেই যে ধূর্ত্ত পাণ্ডাগণ শোণিত সম অর্থগ্রাস করিয়া থাকে তাহা তীর্থ-স্থলে দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হয়।

নরেন্দ্রসরোবর।

আমরা এ সকল তীর্থ দর্শনাভিলাষী হইয়া সর্ব্বাগ্রে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে উপনীত হইলাম। এই প্রকাণ্ড সরোবরটি অত্যন্ত প্রাচীন, ইহার চারি তীর ইষ্টকদ্বারা বাঁধা। নরেন্দ্র সরোবরের তীরের চারিদিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর, কালোজলে সূর্য্যের কিরণরাশি চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, একদিন শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু ইহার কালোজলে

সন্তরণ করিতেন—সেই কালোজল এখনও তেমনি ঢল ঢল ; কিন্তু হায় ! সে প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব কোথায় ? যে পবিত্র ফুলটির মধুর সৌরভে একদিন 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু ও নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল,'—যাঁহার প্রেমের বন্যায় পাপী তাপী পাপ ভুলিয়াছিল,—যাঁহার ধর্ম্ম ছিল প্রেম—যাঁহার ধর্ম্ম ছিল ক্ষমা—যাঁহার নীতি ছিল "মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না ?" এমন উদার ধর্ম্মের বাঙ্‌লার চির আদরেব চির গৌরবের মুকুট-মণি শ্রীশ্রীচৈতন্য এই সরোবরের তীরে কত ক্রীড়া করিতেন,—দিবস যামিনী মৃদঙ্গের মধুর নিনাদে হরিনাম কীর্ত্তিত হইত, বনের পশু পাখী মুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করিত,—পাঠক ! এই সেই নরেন্দ্র সরোবর,—অই যে বড় গাছটি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে,—সে একদিন গোরাচাঁদকে এখানে দেখিয়াছিল, প্রতি বালুকা কণায় তাঁহার পদরজ রহিয়াছে,—আমরা ভক্তি-পূর্ণ চিত্তে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে মাথা লুটাইলাম, প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল। অন্যান্য দেশের তীর্থযাত্রীদের অপেক্ষা বঙ্গদেশবাসী তীর্থযাত্রিগণের নিকট নরেন্দ্রসরোবর অধিক আদরণীয় হওয়া উচিত। যাত্রিগণ এখানে স্নান করিয়া থাকে। ওড়িষ্যার ও দাক্ষিণাত্যের প্রথানুযায়ী এই সরোবরের মধ্যেও একটী মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে চন্দন যাত্রা নামক এখানে একটী মেলা হয়। এই মেলা ২১দিন স্থায়ী হয় ও সে সময় মদনমোহন এখানে আগমন করিয়া থাকেন। শুনিলাম যে এই সরোবরের মধ্যে অনেক কুম্ভীর আছে, সময়ে সময়ে লোককে আহত করে বলিয়াও শুনা যায়।

নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরে স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম, মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধি, ফুলে ফুলে সুশোভিত ও নানাবিধ বিটপী দ্বারা সজ্জিত এই নির্জ্জন স্থানটীকে সেকালের একখানি পুণ্যতপো-বনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এখানে উক্ত মহাত্মার কয়েকজন শিষ্য বাস করিয়া থাকেন। পুরীতে স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয় জটিয়াবাবা নামে পরি-চিত ছিলেন,—তাঁহাকে সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বঙ্গদেশে আজ কাল এইরূপ লোক অতি বিরল যিনি উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাম শোনেন নাই, পূর্ব্বে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন, ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অতিশয় প্রগাঢ় রকমের ছিল, নীরবে আপনার মনে সর্ব্বদা

আরাধ্যের ধ্যান করিতেন, এই মহাত্মার উদার ও স্নেহ ব্যবহার যিনি এক বার লাভ করিয়াছেন তিনি জীবনে তাহা কখনো ভুলিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইঁহার বহু শিষ্য সেবক আছে। বিজয় গোস্বামীর সমাধিটিও অবশ্য দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

নরেন্দ্র সরোবর দেখিয়া আমরা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিতে গমন করিলাম। বালুকাপূর্ণ পথে যাতায়াত করা বড়ই কষ্টকর। নগরের এক বিরল বসতি অংশে সরোবরটি অবস্থিত। ইহা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল দূর। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার মত শুনিতে পাওয়া যায়। নারদ ও ব্রহ্ম পুরাণের মতে এই তীর্থ ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন সে সকলের খুরাগ্র হইতে যে গর্ত্ত হইয়াছিল তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি। পুরাণের মত এই যে এ স্থানে অবগাহন করিলে অশ্বমেধের ফল হয় এজন্য ইহার অপর নাম অশ্বমেধ গঙ্গা। সরোবরের চারিদিক প্রস্তর দিয়া বাঁধান, ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৮৬ ফিট এবং প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। এই সরোবর মধ্যে অনেক বড় বড় কচ্ছপ আছে, এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহার বংশ থাকিলে পাছে ধর্ম্ম লোপ হয় এ নিমিত্ত জগন্নাথদেবের নিকট বংশ-নাশের জন্য বর প্রার্থনা করেন, তাঁহারি বরে ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্রগণ সরোবর মধ্যে কচ্ছপরূপে বাস করিতেছে। দেখিলাম যে পাণ্ডাদের চীৎকারে এ সকল কূর্ম্মাবতারগণ সমবেত হইয়া যাত্রিগণ প্রদত্ত খই, মুড়কী ইত্যাদি নির্ভয় চিত্তে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সরোবরের দক্ষিণ কূলে নৃসিংহ ও পশ্চিম তটে নীলকণ্ঠের মন্দির আছে, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করিয়া এই মূর্ত্তিদ্বয়ের পূজা করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। ইহা কপিল সংহিতার মত। শ্রীক্ষেত্রের যে প্রধান অষ্টলিঙ্গ আছে তাহার মধ্যে নীলকণ্ঠের একটী। এই লিঙ্গ দুইটী অত্যন্ত প্রাচীন হইলেও মন্দিরটি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। উৎকল খণ্ডে অষ্টলিঙ্গ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—

"কপালমোচনং নাম ক্ষেত্রপালং যমেশ্বরম্।
মার্কণ্ডেয়ং তথেশানং বিশ্বেশং নীলকণ্ঠকম্॥
বটমূলে বটেশঞ্চ লিঙ্গানষ্টৌ মহেশতু।"

কপাল মোচন, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়, ঈশান, বিশ্বেশ্বর, বটেশ্বর ও নীলকণ্ঠ মহেশ্বের এই অষ্টলিঙ্গ মূর্ত্তি শ্রীক্ষেত্রধামে বিরাজমান। ফিরিবার সময় পথে গুণ্ডিচা বাড়ী দর্শন করিলাম,—ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণী গুণ্ডিচা দেবীর নামানুসারেই এই বাড়ীর নাম হইয়াছে। নারদপুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থে ও গুণ্ডিচা বাড়ীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্গণ ইহাকে খুব বেশী প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন না। সাধারণ অনুসন্ধিৎসু দর্শকগণ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের এমত একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না, কারণ ইহা দৃষ্টে কিছুতেই সমধিক প্রাচীন বলিয়া উপলব্ধি হয় না। এই বাড়ী বা মন্দিরের নির্ম্মাণ প্রাণালী প্রায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুরূপ। ইহার প্রাঙ্গণ শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা অনেক ছোট। ভোগ প্রস্তুতের গৃহ ভিন্ন আর সমুদয়ই ইষ্টক নির্ম্মিত। গুণ্ডিচা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ৫ ফিট্ বিস্তৃত এবং ২০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর আছে। প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ৪৩২ ফিট্ ও প্রস্থে ৩২১ ফিট্। প্রাচীরের পশ্চিমদিকে সিংহদ্বার, উত্তরদিকে বিজয়দ্বার ও মধ্যভাগে দেবাগার অবস্থিত। এই দেবাগার চারিভাগে বিভক্ত। মূলমন্দির, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। দেউল বা মূলমন্দির দৈর্ঘ্যে ৫৫ ফিট, প্রস্থে ৪৬ ফিট; মোহন দৈর্ঘ্যে ৪৮ ফিট ও ৪২ ফিট নাটমন্দির দৈর্ঘ্যে ৪৮ ফিট ও প্রস্থে ৪৫ ফিট এবং ভোগ মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ৫৯ ফিট ও প্রস্থে ২৬ ফিট। মূলমন্দির উচ্চে ৭৫ ফিট; ইহার মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ১৯ ফিট দীর্ঘ এবং তিন ফিট উচ্চ এক রত্নবেদী আছে, রথের সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এ স্থানে আসিয়া সাত দিবস অবস্থান করেন। দারুব্রহ্ম মূর্ত্তিকে এখানে আনিবার সময় সিংহদ্বার দিয়া আনয়ন করা হয় এবং মূলমন্দিরে লইয়া যাওয়ার সময় বিজয়দ্বার দিয়া নেওয়া হয়। কথিত আছে যে বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্ব প্রথমে এ স্থানেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ওঁকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের গায় যেরূপ

গুণ্ডিচা বাড়ী।

অশ্লীল মূর্ত্তি সমূহ খোদিত ও অঙ্কিত আছে গুণ্ডিচা দেবীর মন্দিরের গায়ে ও তদ্রূপ কুরুচি সম্পন্ন অশ্লীল মূর্ত্তি সমূহ খোদিত ও অঙ্কিত আছে। ধূর্ত্ত পাণ্ডাগণ যাত্রিগণকে বিশেষতঃ অল্প বয়স্কা যুবতী বিধবা তীর্থ দর্শন-কারিনীগণের নিকট ইহা শ্রীভগবানের সখীগণসহ লীলার মূর্ত্তি বলিয়া বুঝাইতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না। ধর্ম্মের নামে তীর্থস্থলে যে কত প্রকার ব্যাভিচার ঘটিয়া থাকে তাহা যাঁহারা কখনও ভারতবর্ষের নানা তীর্থভ্রমণ করেন নাই তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন না।

মার্কণ্ডেয় সরোবর—এই সরোবরটি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ইহাকে সরোবর না বলিয়া পুকুর বলিলেই ঠিক্ হয়। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা অত্যন্ত প্রাচীন। ইহা শ্রীক্ষেত্রের পঞ্চতীর্থের অন্যতম। কপিল সংহিতা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণ মার্কণ্ডের মঙ্গলের জন্য এ স্থানে মার্কণ্ডেয় বট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সরোবরে স্নান করিয়া ইহার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মার্কণ্ডেয়শ্বরের মন্দির মধ্যস্থ মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিবকে দর্শন করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে এবং মানব সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোক লাভ করে। মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির ও চারি অংশে বিভক্ত। মন্দিরের চারিদিকে আদ্যনাথ, হরপার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয়, পঞ্চ-পাণ্ডবলিঙ্গ, ষষ্ঠীমাতা প্রভৃতি বহুদেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। ইহার চারিতীর ও বাঁধা। এ স্থানে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমী তিথিতে কালীয় দমন যাত্রা অভিনীত হয়।

শ্বেত গঙ্গা—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহামন্দিরের উত্তর দিকে শ্বেত গঙ্গা অবস্থিত। ব্রহ্ম পুরাণ, নারদ পুরাণ প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম গ্রন্থে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই সরোবরটিই সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। যাত্রিগণ অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানেও স্নান করিয়া থাকেন। প্রায় ৭০।৮০টি প্রস্তর নির্ম্মিত সিড়ি বাহিয়া নীচে নামিলে তবে জলের নিকট পঁহুছা যায়। জলের রং সবুজ ও দুর্গন্ধ। শ্বেত গঙ্গা অতিশয় পুণ্যপ্রদ তীর্থ মনে করিয়া প্রায় সকল তীর্থযাত্রীই এই তীর্থ দর্শন করেন। শ্বেত গঙ্গার তীরে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধব মূর্ত্তি আছে। এ স্থানে স্নান করিয়া দেব দর্শন করিলে সমুদয় পাপ রাশি দূর হয় এবং শ্বেতদ্বীপ লাভ হইয়া থাকে।

শ্বেত গঙ্গা দর্শনান্তে আমরা যমেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, কপাল মোচন প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেব মন্দির দর্শন করিলাম। যমেশ্বর—শ্রীমন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে যমেশ্বরের মন্দির বিরাজিত। মন্দিরের সৌন্দর্য্য কিংবা অসাধারণত্ব সম্বন্ধে তেমন কিছুই বর্ণনীয় নাই। উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে যে মহাদেব এখানে যমের সংযম নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া 'যমেশ্বর' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। যমেশ্বরের পূজা করিলে যমের ভয় হইতে মুক্তি পাইয়া মানব শিবত্ব লাভ করে।

অলাবুকেশ্বর—যমেশ্বরের মন্দিরের পশ্চিম দিকে অলাবুকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এই শিবলিঙ্গটির আকৃতি অলাবুর মত বলিয়াই ইহার নাম অলাবুকেশ্বর হইয়াছে। কপিল সংহিতায় লিখিত আছে যে এই লিঙ্গ দর্শন করিলে অপুত্র ও পুত্রবান এবং কুৎসিৎ ব্যক্তি ও কায়িক সৌন্দর্য্য লাভ করে।

কপাল মোচন।

অলাবুকেশ্বরের অতি সন্নিকটে কপালমোচনের মন্দির দর্শন করিলে মানুষের সর্ব্বপ্রকার পাপরাশি বিদূরিত হয় এবং অনন্ত পুণ্য, সঞ্চয় হয়। চক্রতীর্থ দর্শনের জন্য সমুদ্রতীরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। পথে সিদ্ধ-বকুল দর্শন করিয়াছিলাম। সিদ্ধবকুল একটী অত্যাশ্চর্য্য বৃক্ষ, ইহা সার শূন্য, অত্যন্ত প্রাচীন, ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। সবুজ-সুন্দর উজ্জ্বল পত্রাবলী পরিশোভিত বৃক্ষটি নয়নানন্দদায়ক।

সিদ্ধ বকুল।

কথিত আছে যে যবনকুল-প্রদীপ সাধক শ্রেষ্ঠ পরম বৈষ্ণব হরিদাস সাধু এই বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান-পরায়ণ থাকিতেন বলিয়াই ইহার নাম সিদ্ধবকুল হইয়াছে। সিদ্ধবকুল দর্শনান্তে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দর্শন করিলাম। যে স্থানে বসিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম। এস্থানে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কাঁথা গায়ে দিতেন তাহার একাংশ দেখিতে পাওয়া যায়,—আমরা উহা প্রফুল্ল চিত্তে ধরিয়া দেখিলাম,—যে অংশটুকু আছে তাহাতে

সূচীকার্য্যের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কি সুন্দর! তাঁহার ব্যবহৃত এক যোড়া খড়ম ও প্রদর্শক ব্রাহ্মণটি দেখাইলেন; এই ব্রাহ্মণটির বিনীত ব্যবহার তীর্থস্থলে সুদুর্লভ; অর্থের জন্য কোনরূপ পীড়াপীড়ি দেখিলাম না, যাহারা যাহা ইচ্ছা, ভক্তিভরে দিয়া যাইতেছে। চৈতন্যদেবের জীবনের ন্যায় এইরূপ ধর্ম্মময় জীবন জগতের ইতিহাসে অতিশয় দুর্লভ। পুণ্যভূমি ভারতের ন্যায় জগতের আর কোনও দেশে এত অধিক স্বার্থত্যাগী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষকে ধর্ম্মভূমি বলিলেই অধিকতর উপযুক্ত হয়।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাড়ী দর্শন করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সম্মুখেই সমুদ্রের সুনীল সৌন্দর্য্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণে চারিদিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সমুদ্র ও চক্রতীর্থ।

পথের দুইধারে পয়সা আদায়ের জন্য নানা প্রকার অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলাম, কেহ কেহ উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া যাত্রিগণের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছে—কোন কোন যাত্রী দুই একটা পয়সা দিতেছে—কেহবা দিতেছে না। তীর্থস্থলে অর্থব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে বড়ই প্রতারিত হইতে হয়। পুরীর নিকট সমুদ্রের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। এমন লোক সংসারে অতি বিরল যাঁহার হৃদয়ে সমুদ্রের সীমান্তরহিত নীলাভ মূর্ত্তি দর্শন করিলে আনন্দের উদ্রেক না হয়! কেমন সুন্দর ধারাবাহিকরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বেলাভূমির বালুকার দিকে ধাবমান হইতেছে—আবার চাহিয়া দেখ পলকের মধ্যে তাহা সাগর-বক্ষে বিলীন হইতেছে,—কোথায় সে তরঙ্গ? সমুদ্রের এই ক্রীড়া কৌতুক—এই অপূর্ব্ব লহরী লীলা দেখিয়া মনে হইল

"বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গাঃ
মহোর্ম্মি বিস্ফূর্জ্জথু নির্ব্বিশেষাঃ॥" (রঘুবংশ)

কবি রবীন্দ্রনাথ পুরীতে সমুদ্র দর্শনে যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সমুদ্রের নীলিমা জড়িত তরঙ্গমালার প্রাণময় চেতনার আভাস পাওয়া যায়—এরূপ আর কিছুতেই হয় না। অন্ধ প্রকৃতির মধ্যে যে মানববুদ্ধির অগোচর একটা গূঢ় রহস্যময় জীবন আছে, তাহা কবি ভিন্ন আর কে বুঝা-

হইতে পারে? নৈসর্গ-প্রেমিক কবির এ সমুদ্র-সঙ্গীত যখনই সমুদ্রের তীরে আসিয়াছি তখনি প্রতি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে মনে হইয়াছে :—

"হে আদি জননি, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন, তাই উঠে বেদমন্ত্র সমভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্র মন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি, তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।"

ফেনিল-কল্লোল-ময় সমুদ্র তরঙ্গমধ্যে কি যেন কি আছে যাহাতে হৃদয় বিভোর হইয়া যায়। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের অব্যক্ত মহিমা সাগরতীরে যেমন পরিস্ফুট এমন কি কোথাও দেখিয়াছ? একদিকে অনন্ত সমুদ্র ও অসীম নীলাকাশের প্রাণের মিলন বড় সুগভীর নিবিড় আনন্দময় সোহাগ চুম্বন, অন্যদিকে সিকতাময় বেলাভূমি উজ্জ্বল তপনালোকে সহস্র সহস্র মণি মুক্তার মত ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে! সমুদ্রের মত সুন্দর আর মহান্ বুঝি জগতে কিছুই নাই, জানিনা সমুদ্রের তীর ত্যাগ করিতে সকল সময়েই কেন একটা বিষাদের ভাব আসিয়া হৃদয় ছাইয়া ফেলিয়াছে তাই বিদায়ের কালে সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি :—

"হৃদয় করেছ চুরি ওই নীল নীরে,
শূন্য দেহ ল'য়ে সিন্ধু! গৃহে যাই ফিরে।
ভুলিব না তোমা কভু, ভুলোনা আমায়
আসি তবে নীরধি হে, বিদায়, বিদায়!"

বালগণ্ডিনালার ধারে যে সরোবরটি দেখিলাম, ইহাকেই চক্রতীর্থ কহে। জনপ্রবাদ এই চক্রতীর্থের ধারেই সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মদারু ভাসিয়া আসিয়াছিল।

এই সরোবরটি সুমিষ্ট জলদ্বারা পরিপূর্ণ—শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে ইহার জলই সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট। এখানে আসিয়া লোকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া বালুকার পিণ্ডদেয়। চক্রতীর্থের অনতিদূরে উত্তরদিকে চক্রনারায়ণের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের ঈশান কোণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হনুমানের মূর্ত্তি দেখিলাম। চক্রতীর্থ সমুদ্র হইতে এক পোয়া পথও দূর হইবে না।

স্বর্গদ্বার।

ইহাও সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবস্থিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে নৈঋর্ত কোণে প্রায় আধ মাইল দূরে বিরাজিত, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা এ স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার নাম স্বর্গদ্বার হইয়াছে। এ স্থানে যে কোন সময়ে স্নান করিলেই অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। এ স্থানে স্বর্গদ্বারের সাক্ষীস্বরূপ কাণপাতা হনুমান মূর্ত্তি আছে। শুনিলাম যে সমুদ্রের শব্দে সুভদ্রা অত্যন্ত ভীতা হন এবং তাহাতে তাঁহার হস্ত উদর মধ্যে প্রবেশ করে; তাহাতে জগন্নাথদেব সমুদ্রকে অদেশ করেন যে "তোমার শব্দ আমার মন্দিরে না আইসে।" সে নিমিত্তই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞায় হনুমান্ কাণ পাতিয়া সমুদ্রের ভীষণ আরাব শ্রবণ করিতেছে ও সমুদ্রের তরঙ্গ যাহাতে মন্দিরের নিকটে না আসিতে পারে তাহার জন্য পাহাড়া দিতেছে। পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে সূর্য্যগ্রহণ সময়ে এ স্থানে স্নান করিলে মানুষের কোটী জন্মের পাপ দূরীভূত হইয়া অনন্ত স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

স্বর্গদ্বারের অনতিদূরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত যবন-কুলোদ্ভব হরিদাস সাধুর সমাধি অবস্থিত। বারাঙ্গনার হাবভাব বিলাসময়ী কটাক্ষ একদিন যে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে নাই, হে সমুদ্র, তোমার এই বৃথা আস্ফালনে কি কখনো তাঁহার অনন্ত ধ্যান ভঙ্গ হইবে? আমরা ভক্তিভরে এই পবিত্র সমাধি-তীর্থে প্রণাম করিয়া তৃপ্তি বোধ করিলাম। এখানে মন্দির মধ্যে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। বৈষ্ণব-ভক্তগণের নিকট হরিদাসের সমাধি মহাতীর্থ। যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইবে ততদিন তিনি এই পরম ভক্তের নাম জগতে অমর হইয়া রহিবে।

হরিদাসের সমাধি।

লোকনাথ।

স্বর্গদ্বারের নিকট সমুদ্রে স্নান করিয়া সে দিবস বাসায় বিশ্রাম করিলাম। তাহার পর দিবস প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে লোকনাথদেবকে দর্শনের জন্য রওয়ানা হইলাম। শ্রীক্ষেত্রের পশ্চিম সীমায় প্রায় ২।৩ মাইল দূরে লোকনাথদেবের মন্দির অবস্থিত। গ্রাম্য ছায়াবহুল রাস্তা ধরিয়া আমরা যখন লোকনাথদেবের মন্দির সমীপে পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় আটটা হইবে। স্থানটি বড়ই নির্জ্জন, চারিদিকে বড় বড় গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওদিকে বাঁশের ঝোপের আড়াল দিয়া বক্রগ্রাম্য পথখানা দূর গ্রামের দিকে বহিয়া গিয়াছে—দুই চারিজন পথিক আসিতেছে যাইতেছে। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে সজীবতা বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থানটি পরম রমণীয়, পাখীদের কলরবে ও যাত্রিগণের চীৎকারে বেশ আনন্দ বোধ হইতেছিল। লোকনাথ, পুরীর সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত দেবতা—এমন লোক পুরীতে অতি বিরল যিনি লোকনাথদেবকে ভয় করেন না, সর্ব্ব-সাধারণের বিশ্বাস যে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ইহা মহারাষ্ট্রদিগের সময় নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্ধকার গৃহে লিঙ্গরাজ বিরাজিত। লোকনাথ সর্ব্বদাই পীঠের মধ্যস্থ একটী কৃত্রিম উৎসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন, নিকটস্থ পুকুরের জলের সহিত ঐ উৎসের যোগ থাকায় মন্দির মধ্যে ধীরে ধীরে জল উঠিয়া লিঙ্গরাজকে ডুবাইয়া রাখে এবং অতিরিক্ত জল পীঠের উপর দিয়া বহিয়া যায়। শিব চতুর্দ্দশীর দিবস এখানে খুব ধূমধাম হয় এবং শিবলিঙ্গ ও সে দিবস ভক্তগণের দৃষ্টিপথে পতিত হন। তখন এস্থানে প্রায় ২০।২৫ হাজার যাত্রী সমাগম হয়। শিব-চতুর্দ্দশীর দিন ছাড়া কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসেও এস্থানে জন-সমাগম ও উৎসবাদি হয়।

তেটাগোপীনাথ।

এই মন্দিরটি বৈষ্ণব-তীর্থ যাত্রিগণের নিকট বিশেষ বিখ্যাত। প্রবাদ আছে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব এই মন্দির হইতেই অন্তর্দ্ধান হ'ন। চৈতন্যদেব

অনেক সময় এখানে থাকিতেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে একটী কবিতা শুনিতে পাওয়া যায়—

"কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদে হারাইনু গোপীনাথের ঘরে॥"

পুরীতে নানা সম্প্রদায়ের বহু মঠ আছে। কেহ কেহ ৭৫২টী পর্য্যন্ত গণনা করিয়াছেন। এ সমুদয় মঠের মধ্যে চৈতন্যের মঠ, বিদূরপুরী বা মুলকদাসের মঠ, সুদামাপুরী বা পাতাল গঙ্গার নিকট নানকসাহী মঠ প্রভৃতি প্রধান। শঙ্কর মঠে বহু বৈদান্তিক গ্রন্থ আছে। আঠার নালা সেতুটি পুরী সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। পুরীর বড় রাস্তা ধরিয়া বরাবর গমন করিলে প্রথমেই আঠার নালার সেতু সম্মুখে পড়ে। এই সেতুর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার জন প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। (১) কেহ কেহ বলেন যে রাজা মৎস্যকেশরী মুটিয়া নামক নদী পারাপারের সুবিধার নিমিত্ত এই সেতুটি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আঠারটি ফোকর আছে বলিয়া ইহার নাম আঠার নালা হইয়াছে। (২) এই সেতুর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আর একটী গল্প এই যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মুটিয়া বা মধুপুর নদীর খরস্রোতের জন্য পুনঃ পুনঃ সেতু নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রকে বলিদান করিয়া দেবীর সন্তোষ বিধান করতঃ এই অষ্টাদশটী খিলান যুক্ত সেতু নির্ম্মাণ করেন। (৩) বৈষ্ণবগণ বলেন যে চৈতন্যদেব এ স্থানে আসিয়া নদী পার হইতে না পারায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার পার হইবার সুবিধার জন্য এক রাত্রির মধ্যে এই সেতু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া দেন। কোন্ সময়ে যে এই আঠার নালা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। এই নালা বা সেতুটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ দুই শত হস্ত, এবং ১৮টী বিস্তৃত খিলানের উপর স্থাপিত। রক্ত-প্রস্তর বিনির্ম্মিত ১৯ উনিশটী সুবৃহৎ স্তম্ভ খিলানগুলির ভার বহন করিতেছে। সাধারণতঃ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে ১০৩৮ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পুরী গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাজা মৎস্যকেশরী ইহা নির্ম্মাণ করেন। তাহা হইলেও ইহা প্রায় ৯০০ নয় শত বৎসরের প্রাচীন, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ কৌশল এতই সুন্দর

মঠ।

আঠার নালার সেতু।



আঠার নালার সেতু।

যে আজ পর্য্যন্ত উহা অক্ষত দেহে সুদৃঢ়াবস্থায় বিরাজিত আছে। রেলওয়ে কোম্পানীর সেতু ইহার অনতিদূরে অবস্থিত, এই নব-নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়াই রেলগাড়ী গমনাগমন করে। যাহারা পদব্রজে "জগন্নাথ সড়কের" উপর দিয়া পুরীতে গমন করেন তাঁহাদিগকে এই সেতুর উপর দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। পূর্ব্বে পাণ্ডারা এখানে যাত্রিগণের নিকট হইতে ধ্বজা দর্শনী স্বরূপ অর্থ আদায় করিত, কারণ আঠার নালা হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়াও ধ্বজা অতি সূক্ষ্মরূপে দৃষ্টি গোচর হয়।*

জগন্নাথ ক্ষেত্রের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। রথযাত্রা, দোলযাত্রা, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি সময়ে যাত্রী সমাগম যখন বেশী হয়, তখনি এ স্থানে নানা প্রকার সংক্রামক রোগ বৃদ্ধি পায়। এখানে যে দাতব্য চিকিৎসালয়

* The Atarah Nullah bridge at Puri, built by Kabir Narsingh Deo, about 1250, has been drawn and described by Stirling, and is the finest in the province of those still in use. 434 p. Fergusan's Eastern and Indian Architecture.

আছে সর্ব্ব সাধারণে তাহাতেই বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। আদালত প্রভৃতি সমুদয়ই সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। জগন্নাথের শ্রীমন্দির মধ্যে নিম্নলিখিত জাতির লোকেরা প্রবেশ করিতে পারে না। ১। খ্রীস্টান; ২। মুসলমান; ৩। পার্ব্বত্যজাতিসমূহ; ৪। বাউরী; ৫। শবর; ৬। পাণ; ৭। হাড়ি; ৮। কাওরা; ৯। চামার; ১০। ডোম; ১১। চণ্ডাল; ১২। চিড়িয়ামার, (যাহারা পাখী মারে) ১৩। সিয়াল (মদ্য বিক্রেতা); ১৪। তীবর; ১৫। তুলিয়া; ১৬। পাত্র; ১৭। তন্তুবায়; ১৮। কাণ্ডার; ১৯। কুস্বী; ২০। কুমার; ২১। ধোপা; ২২। বেশ্যা ইত্যাদি।

বিবিধ কথা জলবায়ু ইত্যাদি।



অরুণস্তম্ভ—পুরী।

আবার রন্ধনকার্য্যে অধিকারী ভিন্ন যতি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বাণ-

প্রস্থাশ্রমী ও শূদ্র অথবা ইহাদের পুত্রগণ জগন্নাথদেবের পাকশালায় যাইতে পারে না, যদি কেহ যায় তবে তৎক্ষণাৎ সে সমুদয় ভোজ্য দীর্ঘখাতে ফেলিয়া দিবে। দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দির সমূহের ন্যায় পুরীতেও জগন্নাথদেবের সেবার জন্য একদল দেবদাসী আছে—ধর্ম্মের সহিত এইরূপ পাপানুষ্ঠানের সুযোগ বড়ই ঘৃণার বিষয়। এ সকল দাসীগণ ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সমাজে বিশেষ রূপে আদৃতা হইতেছে। পুরীর সার্ব্বভৌমিক প্রসাদ গ্রহণ নীতির সহিত দাক্ষিণ্যাত্যের দেবমন্দির সমূহের প্রসাদ গ্রহণনীতির একটু পার্থক্য আছে। এখানে যেমন ব্রাহ্মণ বল, চণ্ডাল বল সকলেই একত্র এক পংক্তিতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারে ও এমনকি চণ্ডালও ব্রাহ্মণের মুখে প্রসাদ তুলিয়া দিলে তাহা তিনি বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে বাধ্য;—দাক্ষিণাত্যে তদ্রূপ নহে;—সেখানে সকলেই প্রসাদ স্পর্শ করিতে পারে বটে, তাহাতে প্রসাদ অশুদ্ধও হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক পংক্তিতে বসিয়া কখনই ভোজন করিবে না। তাহা সেখানকার রীতি বিরুদ্ধ। আমরা পুরী হইতে কনারক রওয়ানা হইলাম।

কনারক।

কনারক বা কোনার্কের সূর্য্যমন্দির পুরী হইতে ১৯ উনিশ মাইল দূরে অবস্থিত। জগন্নাথদেবের মন্দির ব্যতীত কনারকের সূর্য্যদেবের কৃষ্ণ-মন্দিরের সমতুল্য মন্দির আর ভারতবর্ষে নাই। ফার্গুসন সাহেব বলেন "With, perhaps, the single exception of the temple of Juganât at Puri, there is no temple in India better known and about which more has been written than the so-called Black Pagoda at Kanarac" (History of Indian and Eastern Architecture, p. 427.) যিনি এই অনিন্দ্য সুন্দর দেবমন্দিরের ভগ্ন সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন তিনি জীবনে কখনও সেই অতুল শিল্পনৈপুণ্যের মহিমাময় ছবি ভুলিতে পারিবেন না। আমরা কনারক সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে সংক্ষেপে ইহার পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম। আশাকরি পাঠকদের নিকট এই পৌরাণিক তত্ত্বটুকু অতৃপ্তির কারণ হইবেনা।

সর্ব্বসাধারণে ইহাকে কোণারক বা কনারক কহিয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণ, শাম্বপুরাণ, কপিল-সংহিতা পুরুষোত্তম পদ্ধতি প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ইহা 'কোণাদিত্য,' 'মিত্রবন,' 'অর্কক্ষেত্র,' 'মৈত্রেয়বন,' 'কোনার্ক,' 'পদ্মক্ষেত্র' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

শাম্বপুরাণে লিখিত আছে যে "একদা নারদ দ্বারকা পুরীতে গমন করিলে অন্যান্য সমুদয় যদুকুমারগণই তাঁহাকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিল, কিন্তু জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব নারদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করিল না; ইহাতে মনে মনে নারদ যারপর নাই ক্রোধ পরবশ ও প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু হইলেন। তিনি একদিন শাম্বকে জব্দ করিবার জন্য কৌশল করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিলেন যে আপনার পুত্রের মধ্যে শাম্ব অতিশয় রূপ গর্ব্বিত আর আপনার ষোল হাজার পত্নীর মধ্যে সকলেই তাহার রূপে বিভোর। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন যে

"একি কখন সম্ভবপর হইতে পারে যে আমার পত্নীগণ আমার পুত্রের প্রতি অনুরাগিণী? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে নারদ বলিলেন যে "আমি আমার উক্তির সততা একদিন আপনার নিকট প্রমাণ করিব।" একথা বলিয়া মহর্ষি নারদ তদীয় গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন। এক দিবস রৈবতক পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার স্ত্রীগণের সহিত জলকেলি করিতে ছিলেন সে সময়ে নারদ দ্বারকায় উপনীত হইয়া শাম্বকে বলিলেন যে "তুমি এক মুহূর্ত্তও কাল বিলম্ব না করিয়া তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া আমার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত কর,—যাও আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।" শাম্ব নারদের আজ্ঞায় পিতার নিকট সংবাদ দিতে গেলেন—তখন কৃষ্ণপত্নীগণ উন্মত্তভাবে জল-ক্রীড়ায় নিরত ছিল; তাহারা এই সুন্দর সুঠাম যুবককে দেখিয়া সকলেই কাম-মোহিতা হইল ও দিকে শাম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নারদও আসিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইল। নারদের উপস্থিতিতে এবং শাম্বকে দেখিয়া তদীয় পত্নীগণের কামভাব দর্শনে কৃষ্ণ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া রমণীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে কামার্ত্তা রমণীগণ তোমরা কখনও স্বর্গলাভ করিতে পারিবেনা এবং দস্যুহস্তে পতিত হইবে।" আর শাম্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে "তোমার কাম সদৃশ দেহ সৌন্দর্য্য দর্শনে রমণীগণ কামমুগ্ধ হইয়াছে অতএব তুমি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইবে।" শাম্ব নারদের নিকট ইহার প্রতীকারোপায় প্রার্থনা করিল। নারদ তাহাকে এ স্থানে আসিয়া সূর্য্যদেবের তপস্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিছুদিন তপস্যার পর শাম্বকে স্বপ্নে সূর্য্যদেব দেখা দিলেন ও পরদিন প্রত্যূষে চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিতে গিয়া সূর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তিময় তনু দেখিতে পাইলেন। শাম্ব সূর্য্যদেবের পূজার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও কিরূপে তাঁহার পরিচর্য্যা হইবে একথা সূর্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করায় সূর্য্যদেব শাম্বকে কহিলেন যে

"ন যোগ্যাঃ পরিচর্য্যাং জম্বুদ্বীপে মমানঘ॥
মম পূজাপরান্ কৃত্বা শাকদ্বীপাদিহানয়।
মগশ্চ মামগাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
তন্মগান্ মম পূজার্থং শাকদ্বীপাদিহানয়॥"

সূর্য্যদেবের আদেশে রোগমুক্ত শাম্ব তৎক্ষণাৎ গরুড়ারোহণে শাকদ্বীপে গমন করিলেন ও সেখান হইতে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে বেদবাদী অষ্টাদশটী মগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন।* এই কনারক ক্ষেত্র অতিশয় পুণ্যপ্রদ, কপিল সংহিতায় লিখিত আছে যে যদি কেহ এ স্থানে দেহ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যময় জ্যোতির্লোকে গমন করে। রবিবারে যিনি এ স্থানে একাগ্রচিত্তে সূর্য্যদেবকে দর্শন করেন তাঁহার সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়। কপিল সংহিতা পাঠে আরও জানা যায় যে এখানে অনেকগুলি প্রাচীন তীর্থ ছিল যথা মঙ্গল তীর্থ, শাম্ভলীভাণ্ড তীর্থ, সূর্য্যগঙ্গা, চন্দ্রভাগা, রামেশ্বর ও আর্কট। আবার এ সকল তীর্থের মধ্যে সাগর তীর্থই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ;—

"সর্ব্বতীর্থবরশ্চাসৌ সাগরসরিতাং পতিঃ।
রামেশ্বরস্তু তত্রৈব বেলায়াঞ্চ নদী পতেঃ॥"

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

কনারকের এই সূর্য্য মন্দিরের শিল্প নৈপুণ্যের ও কারুকার্য্যের কথা ভাষার এমন শক্তি নাই যে বিশদরূপে তাহা পাঠকগণের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়। এক নির্জ্জন স্থানের মধ্যে মন্দিরের ভগ্নস্তূপ এখন ও পর্য্যাটকগণকে দূর দেশান্তর হইতে ইহার নিকট আনয়ন করে। একদিন এ স্থানে ভারতের সুদূর প্রান্তবর্ত্তী নর নারীও ধর্ম্মোদ্দেশে আগমন করিত, তখন দূর হইতেই কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত এই কবিত্বময় সূর্য্য মন্দিরের উচ্চ চূড়া যাত্রিগণের হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক করিয়া দিত, কিন্তু হায়! এখন কোথায় তাহার সেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ? কোথায় এখানকার তীর্থ সমূহ ? মন্দিরের সমুচ্চ দেউলগুলি এখন বিধ্বস্ত—জনাকীর্ণ পুণ্যভূমি আজ হিংস্র জন্তুর দ্বারা অধিকৃত। তবু এখনও এ স্থানে যে প্রাচীন ভগ্ন মন্দির আছে তাহার তুলনায় শ্রীক্ষেত্রের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সৌন্দর্য্য অতি সামান্য। বঙ্গীয় শিল্পীগণের

---

* "অষ্টাদশ কুলানীহ মগানাং বেদবাদিনাম্।
যাস্তন্তি চ ত্বয়া সার্দ্ধং যত্র সন্নিহিতো রবিঃ॥
আরোপ্য গরুড়ে সাম্বস্তুড়িতঃ পুনরভ্যগাৎ।
সপুত্রদার সংযুক্তো পূজাবজ্ঞায় চাগতঃ॥"
(শাম্বপুরাণ)।

যদি কোথাও শিল্প নৈপুণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অবশিষ্ট থাকে—তবে এই গৌরবময় কনারকেই তাহা ছিল। কনারকের সূর্য্য মন্দিরের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেকেই ষ্টারলিঙ্গ সাহেবের মতানুযায়ী ইহা লাঙ্গুলীয় নরসিংহ কর্ত্তৃক ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসন সাহেব এমতাবলম্বী নহেন, তাঁহার মতে এই অপূর্ব্ব শিল্প-নিপুণতা সম্পন্ন মন্দির কখনই পুরীর দেব মন্দিরের (১১৬৪ খ্রী) পরে নির্ম্মিত হয় নাই। পুরীর দেব মন্দিরের শিল্পের অবনত অবস্থা দৃষ্টে ইহাসম্পূর্ণ অসম্ভব মনে হয় যে কণারকের সূর্য্য মন্দিরের ন্যায় অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প গৌরব সমলঙ্কৃত মন্দির তাহার এত পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি বলেন:—"Starling does not hesitate in asserting that the present edifice," as is well known, was built by the Raja Langora Narsingh Deo, in A.D. 1241, under the superintendent of his minister Shibai Santra," and everyone who has since written on the subject adopts this date without hesitation, and the native records seem to confirm it. Complete as this evidence, at first sight appears I have no hesitation in putting it aside, for the simple reason that it seems impossible—after the erection of so degraded a specimen of the art as the temple of Puri (A.D. 1174) The style ever could have reverted to anything so beautiful as this." (James Ferguson's History of India and eastern Architecture p. 426) ফার্গুসন সাহেব 'আইন-ই-আকবরী' প্রণেতা আবুল ফজল লিখিত বর্ণনা ও তাঁহার গ্রন্থে ইহা "সাত শত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল" এই মত হইতে এবং মন্দিরের স্থাপত্য নিপুণতা দর্শনে এই মন্দির নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

আমরা এ স্থানে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আবুল ফজল এই মন্দির দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন

"জগন্নাথদেবের মন্দিরের নিকট সূর্য্যদেবের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটি প্রস্তুত করিতে ওড়িষ্যা রাজের দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব ব্যয়িত হইয়াছিল। এরূপ অত্যুত্তম শিল্পকার্য্য সমন্বিত মন্দির অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; এমন লোক অতি বিরল যিনি এই বিরাট কীর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত না হইবেন। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ১৫০ হাত উচ্চ ও ঊনিশ হাত চওড়া প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সিংহদ্বারের সম্মুখে ৫০ পঞ্চাশ হাত উচ্চ একটী কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভে নানাপ্রকার খোদিত মূর্ত্তি আছে; ইহার নয় ধাপ উপরে উঠিলে প্রস্তরের উপর খোদিত সূর্য্য ও নক্ষত্র মণ্ডলের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ গাত্রে নানাজাতীয় উপাসক শ্রেণীর মূর্ত্তি আছে—কেহ উপবিষ্ট, কেহ মাথায় হাত দিয়া দণ্ডায়মান, কেহ ক্রন্দনপরায়ণ, কেহ হাসিতেছে, কেহ সচেতন, কেহ অচেতন, কেহ সঙ্গীতে মত্ত, কেহ নৃত্যে নিযুক্ত, কত প্রকার যে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব জন্তু তাহা কল্পনাতীত। এই সুবৃহৎ মন্দিরের নিকট আরও ২৮টী মন্দির আছে। জন সাধারণে বলে যে প্রতি মন্দিরেই নানারূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এই স্থানে কবির মাওহেদের সমাধি হইয়াছিল। অদ্যাবধি তাহার সম্পর্কে নানাপ্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ও ধর্ম্মশীলতার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। এই মহাত্মার দেহাবসানে হিন্দুগণ তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিতে চাহে ও মুসলমানবৃন্দ তাহা কবরস্থ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আবরণ বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখে যে তাহার নীচে মৃতদেহ নাই!"

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আইন-ই আকবরীতে কনারক সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিছুই দেখিলাম না। জানিনা কোন্ যাদুমন্ত্র বলে এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সম্পন্ন মন্দির সমূহ এত শীঘ্র ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল! এখন সকলই লুপ্ত হইয়াছে কেবল মূলমন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ময়দানের মধ্যবর্ত্তী গ্রাম্য পথে অগ্রসর হইতে হইতে যখন দূর হইতে এই ভগ্নস্তূপ আমাদের প্রথম দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তখন নৈরাশ্যের একটা কালো ছায়া আমাদের হৃদয়

ছাইয়া ফেলিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম যে এই সমস্ত স্তূপ দেখিবার জন্য কেনই বা রাত্রি জাগিয়া পাল্কীর প্রীতি মধুর দোলানীর মধ্যে নানা ভঙ্গী সহকারে সর্ব্বাঙ্গের ব্যায়াম করিতে করিতে এতদূর অগ্রসর হইলাম! কিন্তু যখন গাড়ী নিকটে আসিয়া পঁহুছিল,— তখন এই জরাগ্রস্থা বৃদ্ধার লোলচর্ম্মের অভ্যন্তরেও অতীত যৌবনের যে সৌন্দর্য্যের আভাস পাইলাম— সে রূপ বর্ণনা কবি-লেখনীর যোগ্য। সকলি গিয়াছে—কিন্তু যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহারি তুলনা কোথায়? কনারক, সত্য সত্যই তুমি ভারতবাসীর গৌরব স্থল। তোমার এ ভগ্ন শ্মশানের মধ্যে যে যৌবন শ্রীর অপূর্ব্ব-রূপলাবণ্যময় মহিমামণ্ডিত বিরাট শিল্পের আভাস পাই, তাহা বড়ই গৌরবের, আজ অপূর্ণ হৃদয় পূর্ণ হইল! মনে হইল ধন্য আমরা তাই বহু পুণ্যফলে হিন্দুর ঘরে ও পুণ্যময় ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি! যাহারা বৈদেশিক শিল্পিগণের শিল্পকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাহারা একবার তন্দ্রালস নয়ন মুছিয়া একটু শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া এ স্থানে আসুন! কনারকের সূর্য্য মন্দির হিন্দু শিল্পীর অতি আদরের জিনিষ, তাই প্রত্যেক হিন্দুরই একবার এ স্থানে আসিয়া এই বিরাট শিল্প মন্দির দর্শন করা কর্ত্তব্য। কে বলে হিন্দু শিল্পিগণ শারীর বিজ্ঞানে অজ্ঞ? যাঁহারা তাহা বলেন তাঁহারা আসুন একবার এখানকার মন্দির গাত্রস্থ প্রতিমূর্ত্তি সমূহের সজীব ও স্বাভাবিক চিত্র সমূহ দর্শন করুন! সে কালের সামাজিক ব্যবহার —সে কালের ভক্তি বিশ্বাসের চিত্র, আমোদ প্রমোদ, অতীতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন কুহেলিকার অভ্যন্তর দিয়া বর্ত্তমান যুগে ও আমাদিগের নিকট পরিস্ফুট। অই যে নৃত্য পরায়ণ লোকগুলির চিত্র খোদিত, উহাদিগকে দেখিয়া কি তোমার চিত্তে সেকালের প্রমোদৎসবের উন্মাদ উশৃঙ্খলতার চিত্র হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না? কত ঋষি, কত সিদ্ধ, কত গন্ধর্ব্ব, কত যক্ষ, কত রক্ষ, কত দিক্‌পাল, কত লোকপাল, সকলই অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত—দেখিয়া মনে হয় এই বুঝি কার্য্য করিয়া শিল্পিগণ বিশ্রামের জন্য বিশ্রামশালায় গমন করিয়াছে, আমরা অপেক্ষা করি এখানে আসিয়া পঁহুছিবে! দেখিব তাহারা কেমন যন্ত্রের সাহায্যে এ সকল মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছে, একবার কি সহস্র বৎসরের পরে তাহাদিগকে এ স্থানে দেখিতে

পাইব না ? একেকটি মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা অঙ্কিত করিয়াছে! প্রতি লতা পাতার মধ্যে—প্রতিমূর্ত্তির বদন মণ্ডলেও দেহ ভঙ্গীতে একটুকুও অস্বাভাবিক কিংবা উৎকট কল্পনার বীভৎস চিত্র নাই, প্রত্যেকটি সুন্দর—প্রত্যেকটি মনোরম—প্রত্যেকটি কবিতা, প্রত্যেকটি নীরব ভাষায় প্রকৃত সত্য ব্যক্ত প্রয়াসী।

বর্ত্তমান সময়ে জগমোহন চাঁদনিটি অভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিলেও ইহার অভ্যন্তরের অংশ অনেক স্থলে বিকৃত ও ভগ্ন হইয়াছে। একপ্রকার পাটকিলে রংয়ের পাথরে নির্ম্মিত বলিয়া ইহা হইতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পতিত হয় এবং সে নিমিত্তই ইহাকে ব্ল্যাক প্যাগোডা বা কৃষ্ণমন্দির কহে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল অতি সুন্দর; নীচ হইতে প্রায় ৪০ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়া ক্রমশঃই ইহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া ২০ ফুটে পরিণত হইয়াছে, আবার এই ২০ফুটের উপরস্থিত প্রস্তর নির্ম্মিত ছাদ লৌহ থাম দ্বারা সংরক্ষিত। এ স্থানের গ্রাম্য অধিবাসিগণ বলিয়া থাকে যে পূর্ব্বে এই মন্দিরের চূড়ায় কুম্ভর প্রস্তর নামক একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর ছিল—এই প্রকাণ্ড প্রস্তরের আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে বহু অর্ণবযান এস্থানে ঠেকিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে যে একজন মুসলমান ঘটনাক্রমে এস্থানে আসিয়া মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তর লইয়া যায়। এই দুর্ঘটনার পরে পাণ্ডারা এই পুণ্যভূমি পরিত্যাগ করতঃ দেবমূর্ত্তি সহ পুরীতে গমন করেন—তদবধি পুরীর সূর্য্যমন্দিরে সেই দেবপ্রতিমা বিরাজিত আছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও এখান হইতে মন্দিরের প্রাচীর ইত্যাদি ভগ্ন করতঃ শ্রীক্ষেত্রের কতকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। নানারূপে কনারক-ক্ষেত্রের বহু অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এস্থানে কেবল প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই নাই। মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারের উপরে ক্লোরাইট প্রস্তরের উপরে যে নবগ্রহাদির খোদিত মূর্ত্তি দ্বারা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের উৎপত্তির বিষয় অঙ্কিত আছে, সেই প্রস্তর নির্ম্মিত বিশালস্তম্ভ সমুদ্রপথে ইংরেজ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক কলিকাতার চিত্রশালিকা বা মিউ-জিয়মে আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং প্রায় দুইশত গজ খনন করার পর এই অসাধ্য সাধনায় ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হ'ন—এ বিষয়ে হাণ্টার সাহেব

লিখিয়াছেন যে—"The beauty of this elaborate piece proved to it a more fatal enemy than time itself, and tempted English antiquarians to try to remove it by sea to the Museam Calcutta. A grant of public money was obtained ; but it sufficed only to drag the massive block a couple of hundred yard, where it now lies, quite apart from the temple, and as far as ever from the shore. The builders * * * * had excavated it in the quarries of the Hill States, and carried it by a land journey, across swamps and unbridged rivers, for a distance of eighty miles." অশীতি বৎসর পূর্ব্বে ষ্টার্লিঙ্গ সাহেব কনারক দর্শন করিয়া যে মনোজ্ঞচিত্র পাঠকবর্গের সমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের তৃপ্তি ও কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এস্থানে ষ্টার্লিঙ্গ সাহেবের বর্ণনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি ১৮২০খ্রীষ্টাব্দে কনারক দর্শন করেন, তিনি লিখিয়াছেন—"The skill and labour of the best artists seem to have been reserved for the finely-polished slabs of chlorite which line and decorate the outer faces of the doorways. The whole of the sculpture on these figures, comprising men and animals, foilage and arabesque patterns, is executed with a degree of taste, propriety, and freedom, which would stand a comparison with some of our best specimens of Gothic architectural ornament The workmanship remains, too, as perfect as if it had just come from the chisel of the sculptor, owing to the extreme hardness and durability of the stone. A triangular niche over each doorway was once filled with a figure cut in altorelievo, emblematic of the deity of the place, being that of a youth in a sitting posture, holding in each hand a stalk of the true lotus, the expanded flowers of which are turned towards him. Each architrave has, as usual, the Nava-graha, or nine Brahmnical planets, very finely sculptured in alto-relievo. Five

of them are well-proportioned figures of men, with mild and pleasing countenances, crowned with high-pointed caps, and seated cross-legged on the lotus, engaged in religious meditation. One hand bears a vessel of water, and the fingers of the other are containing over the beads of rosary which hangs suspended. The form of the planet which presides over Thursday (Virhaspati or Jupiter) is distinguished from the others by a flowing majestic beard. Friday, or Venus, is a youthful female, with a plump, well-rounded figure. Ketu, the descending node, is a Triton, whose body ends in the tail of a fish or dragon ; and Ràhu or the ascending node, a Monster all head and shoulders, with a grinning, grotesque countenance, frizzly hair dressed like a full-blown wig, and one immense canine tooth projecting from the upper jaw. In one hand he holds a hatchet, and in the other a fragment of the Moon." পাঠকগণ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে কনারকের শিল্প-সৌন্দর্য্য কতদূর উন্নত ছিল। ইংরেজ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রত্যেকেই এ মন্দিরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এ স্থানে খাদ্য দ্রব্যাদির বড়ই অভাব, এক দুগ্ধ ভিন্ন আর কোন খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। পাল্কী কিংবা ঘোড়া ভিন্ন যাতায়াতের অন্য কোনও প্রকার যান ও পাওয়া যায় না। পথের দৃশ্যও তত সুন্দর নহে, মাঠের মধ্য দিয়া পথ, কচিৎ দূরে এক আধখানা গ্রাম ও দুই একটী বৃক্ষ মাত্র দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রভাগায় স্নান

কনারকের মন্দির হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী চন্দ্রভাগার তীরে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে এক মহামেলা হয়; সে সময়ে চন্দ্রভাগার তীরে প্রায় দুই লক্ষ লোক সমাগত হইয়া থাকে। শুনিলাম যে কনারক হইতে চন্দ্রভাগা বলদযানে যাওয়া যায়—পথে প্রায় এক হাটু বালি,—আমাদের চন্দ্রভাগা যাওয়া হয় নাই, কারণ এক মাঘী সপ্তমী ভিন্ন তথায় কেহই যায় না—আর সেখানে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই কেবল ৩।৪ বিঘা জমিতে ৩।৪ ফুট জল দেখা যায়—ঐ তীর্থ সমুদ্রের তটে অবস্থিত।

ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগন-পথে অবতরণ করিতে লাগিলেন, আমরাও আর অধিককাল এই নির্জ্জন স্থানে থাকিবার আবশ্যকতা বোধ করিলাম না—একটী স্বপ্নের ছবি—একটী শিল্প কবিতার সুমধুর সৌন্দর্য্য গৌরব হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতে পুরীর পথে অগ্রসর হইলাম,—যতদূর সাধ্য—সেই ভগ্ন মন্দিরের অস্পষ্ট চূড়ার দিকে অশ্রুভরা চোখে চাহিয়া রহিলাম,—ক্রমে কনারকের সমুদয় চিহ্ন অপসারিত হইল,—ভাবিলাম এ কি সত্য,—না স্বপ্ন ?

সাক্ষীগোপাল।

পুরী তীর্থে যাঁহারা গমন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক অতি বিরল যিনি সাক্ষীগোপাল দেবকে দর্শন করিয়া আসেন নাই। কনারক হইতে পুরী রাত্রিতে পঁহুছিয়া পরদিবস সারাদিন সেখানে বিশ্রাম করিয়া—সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে পুরী হইতে কলিকাতাগামী যাত্রী গাড়ীতে সাক্ষীগোপাল দর্শনোদ্দেশে যাত্রা করিলাম। যাত্রিগণের "জয় জগন্নাথজী কি জয়" রবে ষ্টেসন প্রাঙ্গণ বিকম্পিত করিয়া আমাদের গাড়ী পুরী পরিত্যাগ করিল ;—গাড়ীর জানালা দিয়া শেষবারের মত জ্যোৎস্না বিধৌত অনন্ত সাগরের নীলোর্ম্মিমালার উচ্ছৃঙ্খল নর্ত্তন ছায়ার মত দেখিয়া লইলাম। পুরী হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে সত্যবাদী নামক গ্রামে সাক্ষীগোপালের মন্দির বিরাজিত। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সাক্ষীগোপাল ষ্টেসনে পঁহুছিলাম।—ষ্টেসন হইতে প্রায় একপোয়া পথ দূরে সাক্ষীগোপালের বা সত্যবাদী গোপালের মন্দির। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী ; কাজেই আমরা প্রফুল্ল চিত্তে পদব্রজেই মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ষ্টেসনে অনেক গো-যান মিলে, কাজেই স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে তাঁহাদের জন্য গো-যানেরও বন্দোবস্ত হইতে পারে। আমাদের নিকট এই গ্রাম্য পথে অগ্রসর হইতে বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছিল, রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফলপূর্ণ নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও বা গৃহস্থের বাড়ীর নিকটস্থ পুকুরের কালো জলে জ্যোছনা ঢল ঢল করিতেছে—কোথাও বা মৃদঙ্গের সুমধুর নিনাদে কীর্ত্তন হইতেছে—গাছের আড়াল দিয়া কোনও কুটীরের প্রদীপ-রশ্মি যেখানে গাছের ছায়া একটু বেশী ঘোরালো, যেখানে জ্যোছনা নিজেকে ভালরূপে বিকাশ করিতে পারে নাই, সেইরূপ আধয়ান অন্ধকারময় স্থানে উজ্জ্বল মণির মত বিকশিত করিয়া জানি না কোন্ দূরাগত পান্থকে আহ্বান করিতেছে! আমরা গল্প করিতে করিতে চলিয়াছি তাহার আদিও নাই শেষও নাই—কত দেশের কত যাত্রী যাইতেছে—আমরাও কাহারও দিকে লক্ষ্য করি না তাহারাও আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে না। অগ্রে ও পশ্চাতে গরুর

গাড়ীর গাড়োয়ানের অব্যক্ত ভাষার চট্‌পটাপট শব্দ ও চক্রের ঢেকস্‌ ঢেকস্‌ শব্দ নিভৃতে মিলাইয়া যাইতেছে। আমরা ক্রমে সাক্ষীগোপালের মন্দির সন্নিকটে উপনীত হইলাম। গুপ্ত বৃন্দাবন নামক একটী সুন্দর ও সুবিস্তৃত উদ্যান মধ্যে সাক্ষীগোপালের মন্দির বিরাজিত। এই মন্দিরটি আধুনিক, অত্যন্ত প্রাচীন নহে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন দেব-মন্দিরের নির্ম্মাণ প্রণালীর সহিত ইহার কোনও ভেদ নাই – উৎকলের অন্যান্য দেব-মন্দিরের সহিত ইহারও সৌসাদৃশ্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় এখানেও একটী উচ্চ অখণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ বিরাজমান। মন্দিরের পর্শ্বেই সরোবর,—সরোবর মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দেব-মন্দির আছে সে স্থানে সাক্ষীগোপালের চন্দন-যাত্রা সম্পন্ন হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত,—উহার নিকটে সুরভিকুসুমোদ্যান ও ফলের বাগান। জগন্নাথদেবের ন্যায় সাক্ষীগোপালে সিদ্ধান্ন ভোগ দেওয়া হয় না, এস্থানে ভোগের নিমিত্ত খই চূর্ণ চিনি দ্বারা পাক করতঃ এক প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীগোপালদেবকে ভোগের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে। এখানে ডাব ও কলা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; নারিকেল ব্যবসার ইহা একটী প্রসিদ্ধ স্থান—নানা দেশে এস্থান হইতে ব্যবসার নিমিত্ত নারিকেল পাঠান হয়।

মন্দিরের কথা।

পুরী হইতে প্রত্যাগত যাত্রীর সংখ্যাই এখানে বেশী হয়। যাত্রিগণ যে পুরী গমন করিয়াছিল তাহার সাক্ষী স্বরূপ পাণ্ডাদিগের হস্তলিখিত একখানা চিঠি সাক্ষীগোপালকে অর্পণ করে; তাহাদের বিশ্বাস যে ইহাতে সত্যবাদী গোপাল তাহাদিগের পুরী গমনের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন।

মন্দির মধ্যে বিষ্ণুর সুন্দর দ্বিভুজমুরলীধর বালমূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি উৎকলের ভাস্করগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে, ইহাতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রথাই বিশেষরূপে বিরাজমান দেখিলাম। শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্বে পিত্তল নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তি, স্ত্রীমূর্ত্তি উৎকলে নির্ম্মিত বলিয়াই শুনিলাম, আমাদেরও দেখিয়া তাহাই মনে হইল। সাক্ষীগোপাল মূর্ত্তি পূর্ব্বে বৃন্দাবনে বিরাজিত ছিলেন, কিরূপে উহা বৃন্দাবন হইতে উৎকলে আনীত হ'ন তাহার সম্বন্ধে চৈতন্য

চরিতামৃতে একটী অতি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। আমরা এস্থানে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। পূর্ব্বকালে কাঞ্চী প্রদেশস্থ বিদ্যানগরবাসী দুইটী ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। উহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ও অপরটি যুবক। বয়োবৃদ্ধটি যুবক হইতে কুল, মর্য্যাদা ও বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। উভয়ে একত্র তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া নানা তীর্থ দর্শনান্তর অবশেষে বৃন্দাবনধামে আসিয়া উপনীত হইলেন। বৃন্দাবনে পঁহুছিবার অব্যবহিত পরে বৃদ্ধ বিপ্রের সে স্থানে সাংঘাতিক পীড়া হইল, যুবক ব্রাহ্মণ প্রাণপণে বৃদ্ধের সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন। যুবার এইরূপ অকপট সেবায় মুগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ বিপ্র কহিলেন—

"পুত্রেহো পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলা শ্রম॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান॥"

যুবা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বিপ্রের এ কথা শুনিয়া কহিলেন "মহাশয় ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, আপনি বিদ্যাধনাদিতে এবং কৌলীন্যে আমা অপেক্ষা বহুশ্রেষ্ঠ, আমি অকুলীন ও বিদ্যাধনাদিবিহীন, অতএব ইহা কিরূপে সম্ভবপর? আপনি নিজে স্বীকৃত হইলেই বা আপনার আত্মীয় বন্ধুবান্ধববর্গ কেন স্বীকৃত হইবে? সকলের সম্মতি বিহনে আপনি কন্যাদানইবা কিরূপে করিতে পারিবেন? যদি একান্তই আপনি আমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করেন তবে—

"গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজকন্যা ইঁহারে আমি দিল॥
ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাব যদি অন্যতম দেখি॥"

উভয়ে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ নিজ বাড়ীতে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রী পুত্রের নিকট গোপালজীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যে যুবা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিয়াছেন সে কথা বলিলেন—

তাঁহার এই কথা শুনামাত্রই আত্মীয়স্বজন সকলে যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন তখন—

“শুনি সব গোষ্ঠি তবে করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনি সব লোক তবে করিবে উপহাস॥
বিপ্র কহে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন।
যে হউ সে হউ আমি দিব কন্যাদান॥
জ্ঞাতি লোক কহে সবে তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥”

এদিকে ছোট বিপ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তাঁহার কন্যাদান সম্পর্কে ঔদাসীন্য দর্শনে—

“আসিঞা পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার ব্যবহার॥
এত শুনি সেই বিপ্র মৌন ধরিল।
তার পুত্র ঠেঙ্গা হাতে—মারিতে আইল॥
অরে অধম মোর ভগিনী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাহে যেন চাঁদ ধরিতে॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইঞা গেল।
আর দিন গ্রামের লোক সভাত করিল॥
সব লোক বড় বিপ্রে বোলাইঞা লইল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল॥
এহো মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেনে না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥

বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ॥

পিতার এই কথায় পুত্র 'বাক্‌ছল' পাইয়া কহিল যে "এই দুষ্ট ছোট বিপ্র আমার পিতার ধন ইত্যাদি দর্শনে লোভ পরবশ হয় এবং পিতাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া পাগল করে এবং সুযোগ পাইয়া—

"সব ধন লঞা কহে চোর নেলধন।
কন্যা দিতে কহিয়াছে উঠাইল বচন॥"

এই প্রকার অসত্য ব্যবহারে ছোট বিপ্র মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন তবু কেহই তাঁহার কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিল না, তখন সেই একমাত্র সাক্ষীগোপালদেব ভিন্ন কে আর তাঁহার কথার যথার্থতা প্রমাণ করিতে পারে? কাজেই নিরুপায় ব্রাহ্মণকুমার সেই নবজলধর পটল সদৃশ শ্যামকলেবর শ্রীশ্রীগোপালজীকে ভক্তি সহকারে মনে মনে স্মরণ করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে কহিলেন,—

"যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা হৈও সাবধান॥
এই বাতে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যার বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥
তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি হেথা॥
তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে ভাল এই বাত হয়॥
বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ সহজে দয়াবান।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিব প্রমাণ॥
পুত্রের মনে প্রতিমা সাক্ষী নারিব আনিতে।
দুহ বুদ্ধ্যে দুইজনা হইলা সম্মতে॥
ছোট বিপ্র কহে পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি চলে এ সব বচন॥

তবে সব লোক এক পত্রত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লঞা আপনে রাখিল॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সভাজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্ম পরায়ণ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাই কভু মন।
স্বজন মৃত্যু ভয়ে কহে লট্‌পটি বচন॥
ইহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥"

ছোট বিপ্র এইরূপ কথালোচনার পরে একমনে সেই শ্রীভগবানের চরণ স্মরণ করিতে করিতে যথাসময়ে আসিয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইল এবং গোপালজীর নিকট বলিল যে আপনাকে এই প্রতিমারূপেই আমার বাস গ্রামে গমন করতঃ বৃদ্ধ বিপ্রের উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে হইবে। তখন গোপালজী ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন "বৎস! তুমি তোমার বাসগ্রামে গমন করিয়া সভাস্থলে আমাকে স্মরণ করিও আমি সেস্থানে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিব। কিন্তু ছোট বিপ্র কহিলেন,—

" * * হও যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্তে যাঞা যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্বলোক মানে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাঁহাও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী॥
প্রতিমা না হও তুমি সাক্ষাদ্‌ব্রজেন্দ্র নন্দন।
বিপ্রলাগি কর তুমি অকার্য্য সাধন॥
হাসিঞা গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
উলটি আমারে তুমি না করিহ দর্শনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে॥

নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীত করিবে॥
একসের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥"

এইরূপ ভাবে ছোট বিপ্র প্রফুল্ল চিত্তে গোপালজীকেসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—গোপালজীর নূপুরের রিণিক ঝিনিক রবেই তিনি বুঝিতে পারিতেন যে তাঁহার পশ্চাতে গোপালজী আসিতেছেন—ক্রমে বিপ্র যখন নিজ বাসগ্রামে আসিয়া পঁহুছিল, তখন ভাবিল যে—

"ইবে মুঞি গ্রামে আইলু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিঞা সাক্ষী আগমন॥
সাক্ষাৎ না দেখিলে মনে প্রতীত না হয়।
ইহাঁ যদি রহে তবে কিছু নাই ভয়॥
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিঞা চাহিল।
হাসিয়া গোপালদেব তাহাঞি রহিল॥"

ছোট বিপ্র গ্রামে গমন করিয়া গোপালজীর আগমন সংবাদ প্রচার করিবামাত্র দলে দলে গ্রামবাসিগণ আসিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইল এবং সকলই—

"গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত।
প্রতিমা চলি আইলা শুনি হইলা বিস্মিত॥
তবে সেহ বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষ্য দিল।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল॥"

কাঞ্চীর রাজা এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন ও গোপালকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে সেই স্থানে গোপালজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি সেবার বন্দোবস্ত করিলেন।

"এই মতে বিদ্যানগরে সাক্ষি গোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥

উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব নাম।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম ॥
সেই রাজা জিনি নৈল তার সিংহাসন।
মাণিক্য সিংহাসন নাম অনেক রতন ॥
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপাল চরণে মাগে চল মোর রাজ্য ॥
তার ভক্তি রসে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া রাজা কটকে আইল ॥”

পুরুষোত্তমদেব গোপালকে আনয়ন করিয়া পুরীর নিকটে স্থাপন করেন—এবং খুব সম্ভব তাঁহা দ্বারাই রাধিকামূর্ত্তি গোপালজীর পার্শ্বে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণেরা সাক্ষীগোপালের সেবার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা আমাদের উল্লিখিত ঐ দুই ব্রাহ্মণের বংশাবলী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই ঘটনার পর হইতে সাক্ষীগোপালের অপর নাম সত্যবাদী গোপাল ও যে গ্রামে এই দেব মন্দির অবস্থিত তাহার নাম সত্যবাদী।

আমরা সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া সে রাত্রিতেই একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখিবার মানসে—সাক্ষীগোপাল ত্যাগ করিলাম। প্রত্যুষের উজ্জ্বল আভা চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই দূর হইতে ভুবনেশ্বরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দেব মন্দির সমূহের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছিল। এ দিকের রেল পথের উভয় পার্শ্বস্থ সৌন্দর্য্য বড়ই চিত্তাকর্ষক, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র ও ছোট ছোট গিরিশ্রেণীর অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সমূহ একটা অজানা দেশের নবীন সৌন্দর্য্য মানসপটে অজ্ঞাতভাবে অঙ্কিত করিয়া দেয় ও তাহাতে তন্ময় করিয়া তোলে।

ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন।

সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণরাশি যখন নবীনতার সহিত দীপ্তিময়রূপে শালবনের নিবিড় পত্রাবলীর মধ্যে ঝিক্ মিক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঠিক্ সেই সময়ে আমরা ভুবনেশ্বর ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। মাঠের মধ্যে বনের প্রান্তদেশে এই ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেসনটি অবস্থিত। এ স্থান হইতে একদিকে খণ্ডগিরির উপরিস্থিত জৈন মন্দির চূড়া ও অন্যদিকে ভুবনেশ্বরের মন্দির সমূহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ষ্টেসনের গেইটের বাহির হইয়া দেখিলাম যে দলে দলে পাণ্ডাগণ শিকার ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে ও যাত্রিগণকে নানাবিধ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিয়া অস্থির করিতেছে। আমরা উহাদের মধ্য হইতে একজনকে পাণ্ডা নির্দ্দেশ করিয়া গরুরগাড়ীতে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দিকে রওয়ানা হইলাম। ষ্টেসন হইতে মন্দির প্রায় দুই মাইল পথ—পথ বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার, দুই পার্শ্বে ছোট ছোট শালবন,—উঁচু নীচু ঢিবি—পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া রাস্তার কোন স্থানই সমতল নহে। ভুবনেশ্বর ষ্টেসন কটক ও খুরদা জংশনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ষ্টেসনের কর্ম্মচারীগণ সকলেই মান্দ্রাজী, ইঁহারা ইংরেজীতে বেশ অভিজ্ঞ।

ভুবনেশ্বর ওড়িষ্যার অতুল কীর্ত্তিময় স্থান। যিনি এস্থানের দেব মন্দির সমূহের অতুল সৌন্দর্য্যাবলোকন করিয়াছেন জীবনে তিনি তাহা কখন ভুলিতে পারিবেন না। কতদিন—কতকাল চলিয়া গিয়াছে,—কত ঝড় ঝঞ্ঝা ইহা-দের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—কত রাজা—কত ধর্ম্মের উত্থান পতন হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু একবার চাহিয়া দেখ এই দেব-মন্দিরগুলি এখনও ঊর্দ্ধ মস্তকে অবিচলিত ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কে জানে যে ইহারা আরও কতকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও শিল্পের গৌরব ঘোষণা করিবে! যাত্রিগণ কর্ত্তৃক কোলাহলময় কানন পথে আমাদের গাড়ী অগ্রসর হইতেছিল—আর ভুবনেশ্বর মন্দিরের চূড়াগুলিও সূর্য্যালোকে অনিন্দ্য সুন্দর বোধ হইতেছিল।

ভুবনেশ্বরের মন্দির নিকটে পঁহুছিয়া পাণ্ডার গৃহে বিশ্রামান্তে আমরা মন্দিরাদি দর্শন করিতে বাহির হইলাম। ভুবনেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মত লিখিত আছে, সে সকল ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু ধর্ম্মের আদি পুরাণ ব্রহ্ম পুরাণে লিখিত আছে যে—

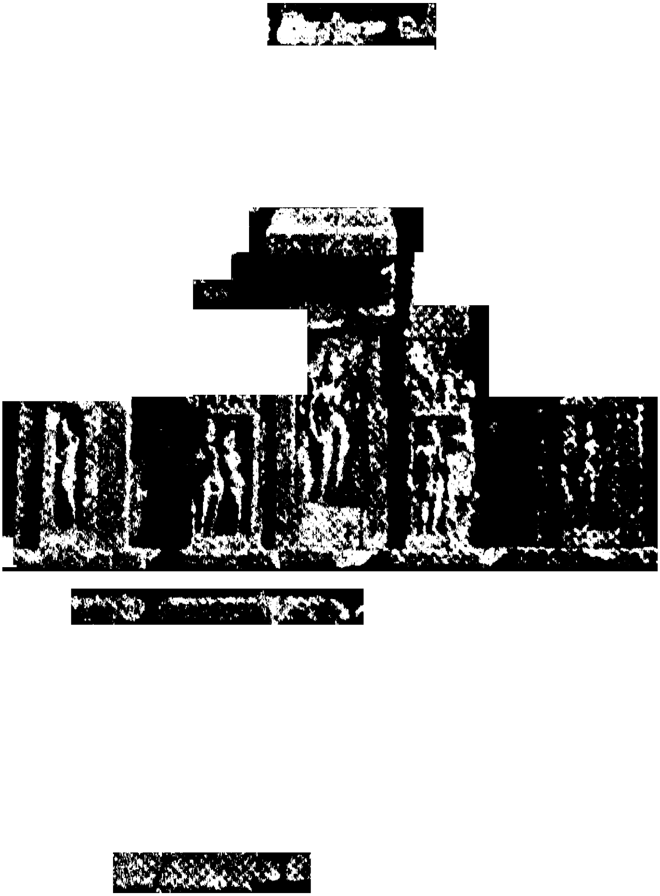
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

"সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
লিঙ্গকোটি সমাযুক্তং বারাণসী সমপ্রভম্॥
একাম্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টক সমন্বিতম্॥"

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ স্থান বারাণসীর ন্যায় পুণ্যপ্রদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের উপাখ্যান সমূহ তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব, এবং সে সকল যে পাঠকগণের পক্ষেও বিশেষ তৃপ্তিদায়ক হইবে তাহা বিশ্বাস করি না, সেজন্য আমরা এস্থানে 'স্কন্দপুরাণের' উৎকলখণ্ডে যে বিবরণটি পাওয়া যায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। তাহাতে আছে যে—"পূর্ব্বকালে ভগবান মহাদেব দেবী পার্ব্বতীর সহিত শ্বশুরালয় হিমাদ্রি পর্ব্বতে বাস করিতেন—সতীকুল শিরোমণি দেবী ভগবতীও প্রাণপণে তাঁহাকে সেবা দ্বারা তৃপ্তি করিতেন। এক দিবস কতিপয় পুরললনা পতিসহ পার্ব্বতীর এইরূপ নিয়ত সুখ সম্ভোগ দর্শনে কহিল "সতি! তুমি অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী রমণী, তোমার স্বামী বৃদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পরিহার করিয়া তোমার ন্যায় রূপ-যৌবন-সম্পান্না" যুবতীর সহিত কালযাপন করিতেছেন,—কবে তিনি বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন? পার্ব্বতী কহিলেন "আমি বহু তপস্যার বলে এই নিষ্কুল ও নির্ধন বৃদ্ধকে পতিরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, রাত্রি আসিলে আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না বলিয়া তিনি এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।"

পৌরাণিক উপাখ্যান।

এক দিবস মেনকাসুন্দরী কন্যা পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন



একটী প্রাচীন মন্দির—ভুবনেশ্বর।

"বৎসে! তোমার পতির কোন্ গুণ আছে যে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তুমি তাঁহার অনুগ্রহলাভার্থ এতদূর চঞ্চলা হইয়াছ? তুমি উহার জন্য ব্যাগ্র না হইয়া বসন ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া আমার গৃহে অবস্থান কর।"

পতির প্রতি এইরূপ অপমানসূচক বাক্যে পতিপরায়ণা সাধ্বী সতী দেবী পার্ব্বতী অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া মহাদেবকে সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। মহাদেব দেবীর কথায় আর এক মুহূর্ত্তও কালক্ষেপ না করিয়া বৃষভারোহণে মধ্যপ্রদেশে গমন করিলেন ও সর্ব্বতীর্থাদি পরিভ্রমণান্তর গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে উভয়ের বাস করিবার জন্য পরম রমণীয় পঞ্চক্রোশ পরিমিত বারাণসী তীর্থ নির্ম্মাণ করিলেন এবং বহুকাল সেস্থানে অবস্থিতি করিয়া পরে কৈলাসধামে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্বাপর যুগে কাশী-ধামে কাশীরাজ নামে একজন রাজা ছিলেন তিনি উগ্র তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। মহাদেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন যে আমি যুদ্ধকালে বৃষভারোহণে স্বয়ং তোমার পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিব।" এদিকে কোন সময়ে চক্রধারী বিষ্ণু কাশী নরপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধার্থ কাশীধামে চক্র নিক্ষেপ করিলেন, মহাদেব ও তদীয় ভক্তকে বিষ্ণুর চক্র হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেস্থানে উপনীত হইলেন, কিন্তু হায়! সুদর্শন চক্রের অমিত তেজ প্রভাবে ভূতপ্রেতগণ ধ্বংস হইতে লাগিল—মহাদেবও উপায়ান্তর না দেখিয়া পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল। তখন মহাদেব নিরুপায় হইয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিষ্ণু গরুড়োপরি শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে আবির্ভূত হইয়া মহাদেবকে কহিলেন "হে ধূর্জ্জটি! কেন তোমার এরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি কোন্ সাহসে একজন সামান্য রাজার সহায়কারী হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলে? তুমি কি আমার প্রভাব অবগত নহ? তোমার পাশুপত অস্ত্র দুর্জ্জয়, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার ক্রোধরূপ চক্রের নিকট তুমিও উদ্ধার পাইতে পার না। তুমি বহু তপস্যা করিয়া তবে আমার শরীরাংশ প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি তুমি গৌরীর সহিত বাস করিতে চাও এবং কাশীধামকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর—তবে আমার

আদেশানুযায়ী আমার নামে যে বিখ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আছে সেখানে গমন কর—তথায় নীলগিরির উত্তরদিকে একাম্রকানন নামক কাননে গিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত বাস কর।" বিষ্ণুর কথায় মহাদেব একান্ত লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিষ্ণুকে কহিলেন "হে দেবাদিদেব জগন্নাথ! আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে অপমানিত করিয়াছি,—আমি তোমার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিব,—এই কথা বলিয়া মহাদেব এই একাম্রকাননে আগমন করিলেন। এস্থান পুরাকালে মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল—এখানে সর্ব্বপ্রকারের পাপ দূরীভূত হয়। * একাম্রকানন কেন নাম হইল এ সম্বন্ধে 'কপিলসংহিতায় লিখিত আছে যে,—

"একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে তু মুক্তিদঃ।
তত্র একো যতশ্চাম্রস্তস্মাদেকাম্রকং বনম্॥
মহোচ্ছ্রায়ঃ সুশাখী চ নববিদ্রুমপল্লবঃ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষকামাশ্চ যত্র বৃক্ষে ফলানি চ।
তং বৃক্ষং গোপনীয়ঞ্চ চকার মুরনাশনঃ।
তস্যমূলে মহেশস্তু তন্নাম্না খ্যাতিমাগতঃ॥"

অর্থাৎ পুরাকালে এস্থানে কেবল একটীমাত্র আম্র বৃক্ষ থাকায় ইহার নাম একাম্রকানন হইয়াছে। এই বৃক্ষটি অত্যন্ত উচ্চ, শাখা সংযুক্ত এবং নব নব কিশলয় ও পল্লব পরিশোভিত। এই বৃক্ষের ফল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদায়ক। এই বৃক্ষটি স্বয়ং মুরারি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণের মতে ইহার অপর নাম শাম্ভব ক্ষেত্র। এ স্থানে ভগবান ভুবনেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই সকলে এই পুণ্যক্ষেত্রকে 'ভুবনেশ্বর' বলিয়া থাকেন। ইহা পুরী জেলার অন্তর্গত। 'একাম্রচন্দ্রিকা' নামক একখানি আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে এ স্থানের চতুঃসীমা একক্রোশ বলিয়া লিখিত আছে। খণ্ডগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কুণ্ডলেশ্বর মন্দির পর্য্যন্ত এবং বারাহীদেবীর মন্দির হইতে বহ্নিরঙ্গেশ্বরের মন্দির অবধি মণ্ডলাকার ভূমিই একাম্রকানন।

* বিশ্বকোষ।

"খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রাস্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বারাহীদেবী বহিরঙ্গেশ্বরাবধি॥"

আমরা এখন সংক্ষেপে এ স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। ভুবনেশ্বর পূর্ব্বে কেশরীরাজগণের রাজধানী ছিল।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

কেশরী রাজা যযাতিকেশরী ওড়িষ্যা অধিকার করিয়া প্রথমে যাজপুরে রাজধানী স্থাপন করেন, তিনি ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫২ বৎসর কাল ওড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়া তদীয় রাজত্বের শেষভাগে যাজপুর হইতে ভুবনেশ্বরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। তিনি যবনদিগের হস্ত হইতে ওড়িষ্যা অধিকার করেন, এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে এস্থানে যবন অর্থে বৌদ্ধগণকে বুঝাইয়াছে। যযাতি কেশরী একাম্রকাননে রাজধানী স্থাপন করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তিনি তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী সূর্য্যকেশরী ও অনন্তকেশরীর সময়েও ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে থাকে এবং অবশেষে যযাতি কেশরীর প্রপৌত্র ললাটেন্দু কেশরী ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মন্দিরের কথা।

"গজাষ্টেষুমিতে জাতে
শকাব্দে কীর্ত্তি বাসসঃ।
প্রাসাদ মকরোত রাজা
ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

ভুবনেশ্বরের এই বৃহৎ মন্দির ৬১৭ হইতে ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ভুবনেশ্বরের এই সুবৃহৎ ও সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর হইতে একাম্রকাননের নাম ভুবেনেশ্বর হইয়াছে আমাদের নিকট ও এই অনুমান অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যযাতি কেশরী হইতে তাঁহার অধস্তন চতুর্বিংশতি পুরুষ ভুবনেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ললাটেন্দু কেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এ স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইলেও ইহা রাজধানী স্থাপনের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল,

কারণ নদী না থাকায় নৈসর্গিক কোনরূপেই ইহা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে তাদৃশ নিরাপদ নহে। কাজেই কয়েক শত বৎসর রাজত্বের পরে কটকে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেশরী রাজবংশের পরে চোর গঙ্গাবংশ উৎকলে রাজত্ব করেন,—ইহারা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন কাজেই ভুবনেশ্বরের শিব মন্দিরগুলির প্রতি ইঁহাদের মনোযোগ তাদৃশ আকর্ষিত হয় নাই। বিধর্ম্মী রাজাগণের নানাপ্রকার অত্যাচারে ও হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষী কালাপাহাড়ের উৎপাতে এ স্থানের যে কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহার ঠিক্ নাই। পঞ্চদশ শত বৎসরের নানাপ্রকারের বিপ্লবের মধ্য দিয়া ইহারা এখনও জীবিত, এ সকল হিন্দুকীর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে আনন্দ ও গৌরবের উদ্রেক হয় না এমন হিন্দু অতি বিরল।

পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরস্থ বিন্দুসরোবরের চতুর্দ্দিকে ৭০০০ হাজার দেব-মন্দির ছিল, এখন মাত্র ৫০০ শত ভগ্ন ও অৰ্দ্ধভগ্নাবস্থায় বিরাজিত আছে। তীর্থ যাত্রিগণ সকলেই বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া তবে লিঙ্গরাজ ও অন্যান্য দেব-মন্দির সমূহ দর্শনার্থ গমন করেন। বিন্দুসরোবরের তীর হইতে চতুর্দ্দিকস্থ মন্দিররাজি বেষ্টিত ভুবনেশ্বরধামের দৃশ্য লোচনানন্দদায়ক। এই সরোবর বা হ্রদটি ভুবনেশ্বরের ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত। কথিত আছে

বিন্দু সরোবর।

যে মহাতীর্থ সকলের বিন্দু বিন্দু সার সংগ্রহ করিয়া এই বিন্দুসরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। একাম্রপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ও ব্রহ্মপুরাণের মতে এই পবিত্র সলিলপূর্ণ হ্রদ মধ্যে অবগাহন করিলে সকল তীর্থের ফললাভ হইয়া থাকে।

"তত্র বিন্দু সরস্তীর্থং তীর্থবিন্দুভিপূরিতম্।
তস্য মজ্জনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থাম্বুগাহনম্॥"

(ব্রহ্মপুরাণ)

এই সরোবরের অপর নাম গো-সাগর। ইহার কারণ এই যে এক সময়ে দেবী ভগবতী গোপবালিকার বেশে গোচারণ করিতেন এবং গো দুগ্ধ দ্বারা লিঙ্গাকৃতি মহাদেবকে স্নান করাইতেন। বিন্দুসরোবরের জলে তাহার গো সকল স্নান করিত ও ঐ জল পান করিত বলিয়া এই সরোবরের অপর নাম গো-সাগর হইয়াছে। বিন্দুসরোবরের দৈর্ঘ্য ১,৪০০০ ফিট ও প্রস্থে

১,১০০ ফিট এবং ইহার গভীরতা গড়ে প্রায় ১৬ ফিট। পূর্ব্বে ইহার চতুর্দ্দিক লেটারাইট প্রস্তর দিয়া বাঁধান ছিল, বর্ত্তমান সময়ে উত্তরদিকের গাঁথুনি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের সোপানাবলী অনেকাংশে নষ্ট হইয়া গেলেও চলাচলের অনুপযুক্ত হয় নাই। পূর্ব্বদিকের ঘাটকে মণিকর্ণিকার ঘাট কহে, এখানেই তীর্থ যাত্রিগণ স্নানান্তে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণাদি করিয়া থাকেন। উৎকলের প্রথানুযায়ী এই সরোবরের মধ্যে একটী দ্বীপ আছে, উহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬০ × ৫০ ফিট। দ্বীপের মধ্যে কয়েকটি দেবমন্দির আছে, পর্ব্বাদি উপলক্ষে সেস্থানে ভুবনেশ্বরের যাত্রা হয়—কিন্তু মন্দিরগুলির এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও সংস্কার সাধিত হয় নাই। বিন্দুসরোবরের নীচে কয়েকটি প্রস্রবন আছে উহা হইতেই সরোবরে জল সঞ্চিত হয় জলের রং সবুজ বর্ণ। এই হ্রদের মধ্যে নৌকারোহণে বিচরণ করিতে বড়ই তৃপ্তিকর—সরোবর বক্ষ হইতে মন্দির সমূহের সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম দেখায়। এই নির্জ্জন প্রদেশে মনে হয় যেন মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী বিরাজমানা রহিয়াছেন—কি শান্ত, কি নির্জ্জন—এখানে নগরের কল-কোলাহল নাই, সংসারের যন্ত্রণা বেদনা নাই—ধূলি ধূসরিত রাজপথের উশৃঙ্খলতায় পথিককে এখানে ব্যস্ত হইতে হয় না। কেবল সৌন্দর্য্য—কেবল শান্তি। চারিদিকে ছায়া নিবিড় বিটপী-পুঞ্জ সমলঙ্কৃত পথ,—আর নয়ন সমক্ষে প্রাচীনের কারুকার্য্য সম্পন্ন মন্দির গুলি,—মুহূর্ত্ত মধ্যেই তোমাকে সুদূর অতীতের মহিমাময় ভাস্করবিদ্যার কবিত্ববৈভবময় সৌন্দর্য্য মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিবে! সত্য সত্যই এখানে আসিলে অপূর্ণ হৃদয়পূর্ণ হয়,—শোক-ক্লিষ্ট ব্যথিত প্রাণ ও শান্তিলাভ করে। বাঙ্গালা ভূমির কিরীটমণি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও এই বিন্দু সরোবরে অবগাহন করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :—

"সর্ব্বতীর্থ জলে যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দুসরোবর শিব সৃজিলা আপনি॥
শিব প্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিল অতি ধন্য।"

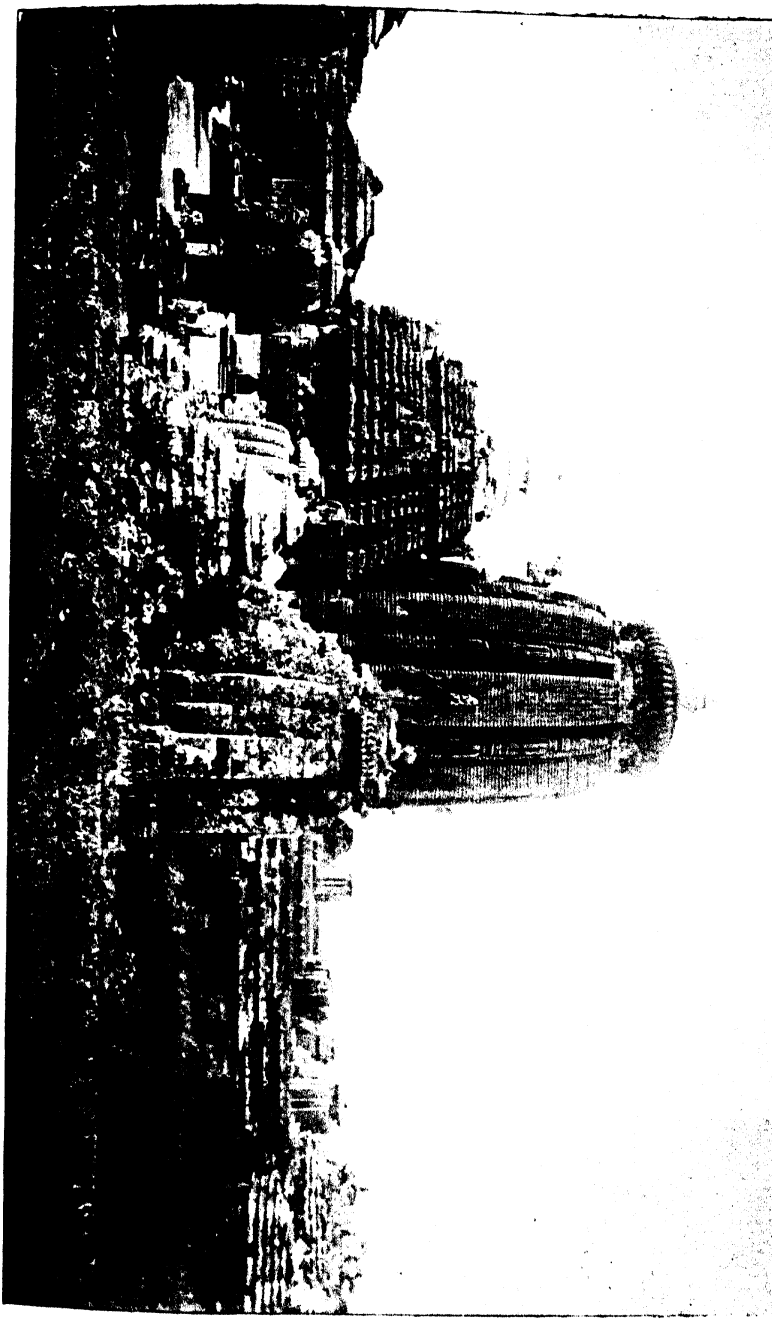
ভুবনেশ্বরের সমুদয় ভগ্ন ও অভগ্ন মন্দিরাদি দর্শন করিতে হইলে সময় সাপেক্ষ। যাঁহারা কেবল তীর্থের অভিপ্রায়ে যাইবেন তাহাদের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; কারণ মন্দির সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত নহে—এখানে একটী—ওখানে একটী, একটীর নিকট হইতে আরেকটী হয়ত প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাজেই উহা সময় এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে উদয়গিরির খোদিত লিপিসমূহের মধ্যে যে ঐশ্বর্য্যশালিনী কলিঙ্গনগরী ও প্রবল প্রতাপশালী কলিঙ্গ রাজগণের কথা লিখিত আছে—তাহা এই ভুবনেশ্বর বলিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ইহা কতদূর সত্য তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণই বলিতে পারেন।

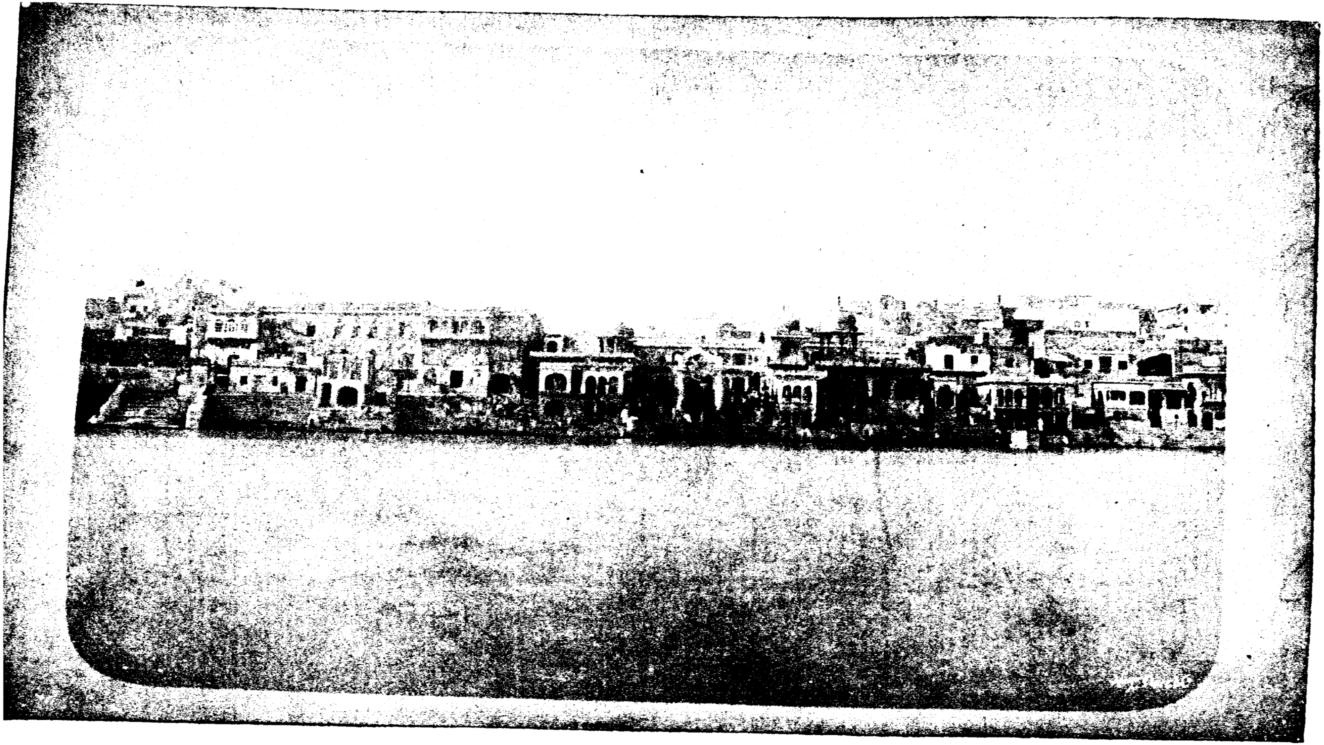
আমরা এখানে ভুবনেশ্বর তীর্থের যে সকল দেব-মন্দিরাদি দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাদের বিবরণ বিবৃত করিলাম। বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বদিকে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির; এই দেবতার পূজাও অনুমতি না লইয়া কোন যাত্রীরই ভুবনেশ্বর দর্শন করিবার অধিকার হয় না। এই মন্দিরের গঠন ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রধান মন্দিরের কারুকার্য্য এতই সুন্দর যে দেখিয়া আর চক্ষু ফিরে না, মন্দির মধ্যে বাসুদেব ও বলরামের কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি; উভয় ভ্রাতার মধ্যস্থলে সুভদ্রাদেবী বিরাজমানা। এই দেব মন্দির ও উৎকল প্রথায় নির্ম্মিত, চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। মূলমন্দিরের বহির্ভাগে লক্ষ্মীর মন্দির, লক্ষ্মীর মন্দির ভাঙিয়া যাওয়ায় লক্ষ্মীদেবী এখন বাসুদেবের নিকটেই বিরাজ করিতেছেন। নাট মন্দিরের স্তম্ভোপরি গরুড় মূর্ত্তি বিরাজমান। এই মন্দিরস্থ খোদিত লিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে হরিবর্ম্মা নামক জনৈক নরপতির মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। খোদিত লিপির লেখক বাচস্পতি মিশ্র একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন।

অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

ভুবনেশ্বর দেবের মন্দির শ্রীক্ষেত্রধামের মন্দির অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও পরিধিতে উহা অনেক বিস্তৃত। এই সুবৃহৎ দেব-মন্দির সরোবর হইতে প্রায় ৩০০ শত গজ দূরে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই মন্দিরটিও পুরীর শ্রীমন্দিরের ন্যায় ভোগ

লিঙ্গরাজ বা ভুবনেশ্বরের মন্দির।





যমুনাবক্ষ হইতে মথুরানগরীর দৃশ্য।

মণ্ডপ,—নাটমন্দির জগমোহন ও দেউল এই চারি অংশে বিভক্ত। পুরীর ন্যায় এস্থানেও ভোগমণ্ডপে ভোগের সামগ্রী, নাট মন্দিরে নৃত্যগীত ও অন্যান্য উৎসবাদি হইয়া থাকে। মন্দিরের যে অংশে ভুবনেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত তাহাকে দেউল কহে। নাট মন্দির হইতে দেউলে প্রবেশ করিবার যে বিস্তৃত পথ আছে তাহাকে জগমোহন কহিয়া থাকে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে দেউল ও জগমোহন নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। নাট মন্দিরের আশ্চর্য্য কারুকার্য্য দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া থাকিতে হয়, এমন একটু স্থান নাই যে স্থানে কোন না কোন শিল্প নৈপুণ্য না আছে, প্রস্তর কাটিয়া কত ধীরতা ও নিপুণতার সহিত যে এ সকল মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষেই প্রাচীন হিন্দু জাতির অক্ষয় গৌরব। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ফার্গুসন সাহেব এই নাট মন্দিরের কারুকার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "A glance at the Nat-Mandir is sufficient for the mastery of its details. A week's study of the Jag Mohan would every hour reveal new beauties." এই অভিজ্ঞ মহাত্মার উক্তি হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে নাটমন্দির ও জগমোহন কত সুন্দর! শিল্পের সৌন্দর্য্য লেখনী মুখে ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব, যাহা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়, যে সৌন্দর্য্যের বর্ণনার উপযুক্ত শব্দ ভাষায় নাই তাহা কেমন করিয়া বলিব? কে এমন আছেন যিনি একখানা সামান্য প্রস্তর খণ্ডের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ভাষা দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া পাঠকের সমক্ষে ধরিতে পারেন?

নাট মন্দিরটি ১০৯৯-১১০৪ খ্রীস্টাব্দ মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেউল বা মন্দির মধ্যে ভুবনেশ্বর বা লিঙ্গরাজের প্রস্তরময় লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। ভুবনেশ্বরের অপর নাম ত্রিভুবনেশ্বর বা কৃত্তিবাস। মন্দিরের ভিতর প্রায় সমুদয় তীর্থস্থলের ন্যায় ইহাও গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ও আলোকের সহায়তা ভিন্ন মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কোনও দ্রব্য দেখিবার উপায় নাই। ভুবনেশ্বরের পাষাণময় দেহের অধিকাংশই ভূমির মধ্যে প্রোথিত কিয়দাংশ মাত্র ভূমির ঊর্দ্ধে অবস্থিত। দেহের ব্যাস প্রায় ৬।৭ হস্ত—চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের বৃত্তাকার অল্প প্রশস্ত

বেদী, লিঙ্গের চতুর্দ্দিক স্বর্ণ পত্রের দ্বারা মণ্ডিত--এক দিকে বেদী প্রদীপের মুখের ন্যায় সরুভাবে নির্ম্মিত। দিবা রাত্রি লিঙ্গের চারিধারে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। পাণ্ডারা ভুবনেশ্বর দেবকে হরিহর বলিয়া থাকেন এবং লিঙ্গরাজের শিরোদেশস্থ শুভ্র রেখাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজতগিরি-সন্নিভ দেবাদিদেব মহাদেবের মিলন প্রতিপন্ন করিতেছে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বরের গাত্রস্থ কয়েকটি রেখাকেও ইঁহারা গঙ্গা যমুনার সিত ও অসিত প্রবাহ-ধারা বলিয়া বর্ণনা করেন। পাণ্ডাদের এই উক্তি হইতে উহা সম্যকরূপে বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও ইহা আশ্চর্য্যের ও সাম্যের বিষয় বটে যে ভুবনেশ্বরের ন্যায় শৈব-প্রধান তীর্থ স্থলেও বিষ্ণুর বাসুদেব মূর্ত্তির পূজা বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। ভুবনেশ্বর দেবের পূজা পদ্ধতি অতি সুন্দর ও সহজ। গঙ্গাজল, দুগ্ধ এবং সিদ্ধিই তাঁহার অর্চ্চনা করিবার প্রধান উপকরণ। ভক্তগণ স্তূপীকৃত সঞ্চিত বিল্বপত্র ও পুষ্প দ্বারা দলে দলে সমবেত হইয়া যখন ভক্তি গদগদ চিত্তে সেই পরম পুরুষের অর্চ্চনার জন্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পাপক্ষালনের নিমিত্ত মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে—তখন হৃদয়ে এক সুমহান শান্তি ও পবিত্রতার উদয় হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজার ন্যায় লিঙ্গরাজেরও পূজা হয়—সেই মঙ্গলারতি, স্নান, বস্ত্রপরিধান, বাল্য ভোগ, মধ্যাহ্ন ভোগ ইত্যাদি দ্বাবিংশতি প্রকারের নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান একরূপই হইয়া থাকে। এ স্থানে ইহাকে দ্বাবিংশ ধূপ কহে। জগন্নাথদেবের পূজার সহিত ইহার পূজার পদ্ধতির যেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়—তদ্রূপ ভুবনেশ্বরের উৎসব সমূহকেও "যাত্রা" কহে। এইরূপ যাত্রার সময়ে ভুবনেশ্বরদেবের প্রতিনিধি চন্দ্রশেখরের পিত্তল নির্ম্মিত মূর্ত্তি দ্বারাই বিশেষ ধূমধামের সহিত উৎসবাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দির সমূহের ভোগমূর্ত্তির সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষেই ভুবনেশ্বরে বহু যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে—সে সময়ে ভারতের বিভিন্নাংশ হইতেও অনেক তীর্থযাত্রী এখানে আগমন করেন। আষাঢ় মাসে এখানেও রথযাত্রা হয় এবং তাহা ছাড়া চৈত্র বা বৈশাখ মাসে অশোকাষ্টমীর দিনেও এ স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে। পুরীতে যেমন বৈশাখ মাসে চন্দন-যাত্রা

হয় ভুবনেশ্বরেও তেমনি বৈশাখ মাসে চন্দন যাত্রা হয়—বিন্দু সরোবর মধ্যস্থ দ্বীপের মধ্যে যে দেবালয় আছে সে স্থানে প্রতিনিধি চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি দ্বাবিংশতি দিবস অবস্থিতি করেন এবং বিশেষ সমারোহের সহিত তাঁহার অর্চ্চনা হয়। এই বিষয়টি একটু লক্ষ্য করা আবশ্যক যে ভুবনেশ্বর মহাদেবের প্রতিরূপ হইলেও তাঁহার পূজা ইত্যাদি সমুদয়ই শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের অনুকরণে সম্পাদিত হয়। ভুবনেশ্বর মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২০০ শত ফিট হইবে। এই মন্দির গাত্রেও অশ্লীল ছবি আছে বটে কিন্তু তাহা সংখ্যায় অল্প ও পুরীর শ্রীমন্দিরের ন্যায় তত কদর্য্য নহে। এ স্থানের সমস্ত মূর্ত্তিই প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে—মন্দিরের এই প্রস্তরময় গাত্রে যে কত সামাজিক জীবনের বিবিধ ঘটনাবলী, কত রীতি নীতি, কত শৌর্য্য বীর্য্যের চিত্র খোদিত থাকিয়া প্রাচীন ভারতের প্রাচীন কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে তাহা কে নির্ণয় করে? ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত ষাঁড় আছে ইহাকে ভুবনেশ্বরের বাহন কহে। এই বৃষের পার্শ্বে নীল-প্রস্তর-খোদিত লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্ত্তি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বেই "গোপালিনীর" মন্দির। গোপালিনী পার্ব্বতী; ইনি গোপীবেশধারিনী হইয়া একাম্রকাননে গোচারণ করিতেন এবং এ স্থানেই ত্রিভুবনেশ্বরের দর্শন পাইয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। গোপালিনী মন্দিরের নিকটে অপর একটী মন্দিরে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। হেরম্বের সুবিশাল কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিটির গঠন নৈপুণ্য বিশেষ নয়নানন্দদায়ক। ভুবনেশ্বরের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের চারিদিকেই বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির আছে। এ সমুদয় মন্দির ও প্রাঙ্গণ উচ্চ ল্যাটারাইট প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাঙ্গণ মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দিরের কথা উল্লেখ করিলাম তাহাদের মধ্যে কতকগুলির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

পার্ব্বতীর মন্দির।

এ স্থানে যতগুলি মন্দির আছে তন্মধ্যে পার্ব্বতীর মন্দির আকারে ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা ছোট হইলেও কারুকার্য্যে ইহা ভুবনেশ্বরের বৃহৎ মন্দির অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। এই মন্দির গাত্রে যে সকল সুন্দর সুন্দর প্রস্তর খোদিত নরনারী ও ইতর

জন্তুর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা প্রাচীন শিল্পকলার চূড়ান্ত নিদর্শন। এ সমুদয় মূর্ত্তি ধর্ম্ম বিপ্লব হেতু নানাপ্রকারে বিরূপ ও ভগ্ন হইলেও শিল্পীর অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্য ও কার্য্যকুশলতার সাক্ষ্য দিতে পশ্চাদপদ নহে। কোথাও বা দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা রমণীর মনোজ্ঞ চিত্র অতিশয় সূক্ষ্মভাবে খোদিত করা হইয়াছে,— কোথাও বা রণবেশ পরিহিত সজ্জিত অশ্বারোহী বীর পুরুষ যুদ্ধ স্থলে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে,—তাহার কেমন সুবিশাল বক্ষ, কেমন সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক চাহনি! স্তম্ভ, কার্ণিস, গবাক্ষ, হস্তীযূথ প্রত্যেকের গঠনেই যেরূপ সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিপরিচালনানিবন্ধন স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ রচনা কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দেখিলে সহজেই অনুমান হয় যে প্রাচীন ভারতে শিল্প-বিজ্ঞান কতদূর উন্নত ছিল। পার্ব্বতীর গাত্রের বসনখানিতে যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে—তাহা দর্শন করিলে শিল্পিগণকে অলৌকিক দৈব শক্তি সম্পন্ন বলিতে কুণ্ঠা বোধ হয় না—অতএব সাধারণ লোকে যে এই সমুদয়কে বিশ্বকর্ম্মার হস্ত নির্ম্মিত বলিবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

পাদহরা পুষ্করিণী।

পার্ব্বতী মন্দিরের অনতিদূরে পাদহরা পুষ্করিণী। ইহার চতুঃপার্শ্বে ছোট ছোট বহুতর শিব মন্দির, কতকগুলিতে শিবলিঙ্গ আছে, কতকগুলিতে নাই। এই সরোবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে শিবপুরাণে লিখিত আছে যে কীর্ত্তি ও বাস নামক দুই প্রতাপান্বিত অসুর ভ্রাতা ভগবতীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হয় ও তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উভয়েই উন্মত্ত হয়, দেবী এই অসুরদ্বয়কে বলেন যে "যে ব্যক্তি আমাকে স্কন্ধে ও মস্তকে উত্তোলন করিতে পারগ হইবে আমি তাহারই পত্নী হইব। কামমোহিত ভ্রাতৃদ্বয় দেবীর বচনানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে তিনি তাহাদিগকে পদদ্বারা চাপিয়া বিনাশ করেন,—পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইয়া এই সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে।

"পাদেন প্রোথয়ামাস ভূব পর্ব্বত নন্দিনী।
ততস্তাবসুরৌ বীরাবসূংস্ত্যক্তা রসাতলম্।
জগ্মতুস্তত্র যা দেবী চকার হ্রদমুত্তমম্॥"

ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির।

লিঙ্গরাজের সুবৃহৎ মন্দির দর্শনান্তে আমরা ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম; উহা ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পন্ন মন্দির ভুবনেশ্বর দেবের আদেশক্রমে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মূরত ছিল কিন্তু তাহার অধিকাংশই পর্য্যটকগণ কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই মন্দির গাত্রে যে একখানা খোদিত প্রস্তর লিপি ছিল তাহা কাপ্তান কিটো সাহেব কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে রাখিয়াছেন, ঐ খোদিত লিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে কেশরীবংশীয় রাজা উদয়কের মাতা রাণী কলাবতী খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে ইহা নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের পশ্চিমদিকস্থ ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিলে সর্ব্বপ্রকারের পাপ বিনষ্ট হয়।

ভাস্করেশ্বরের মন্দির।

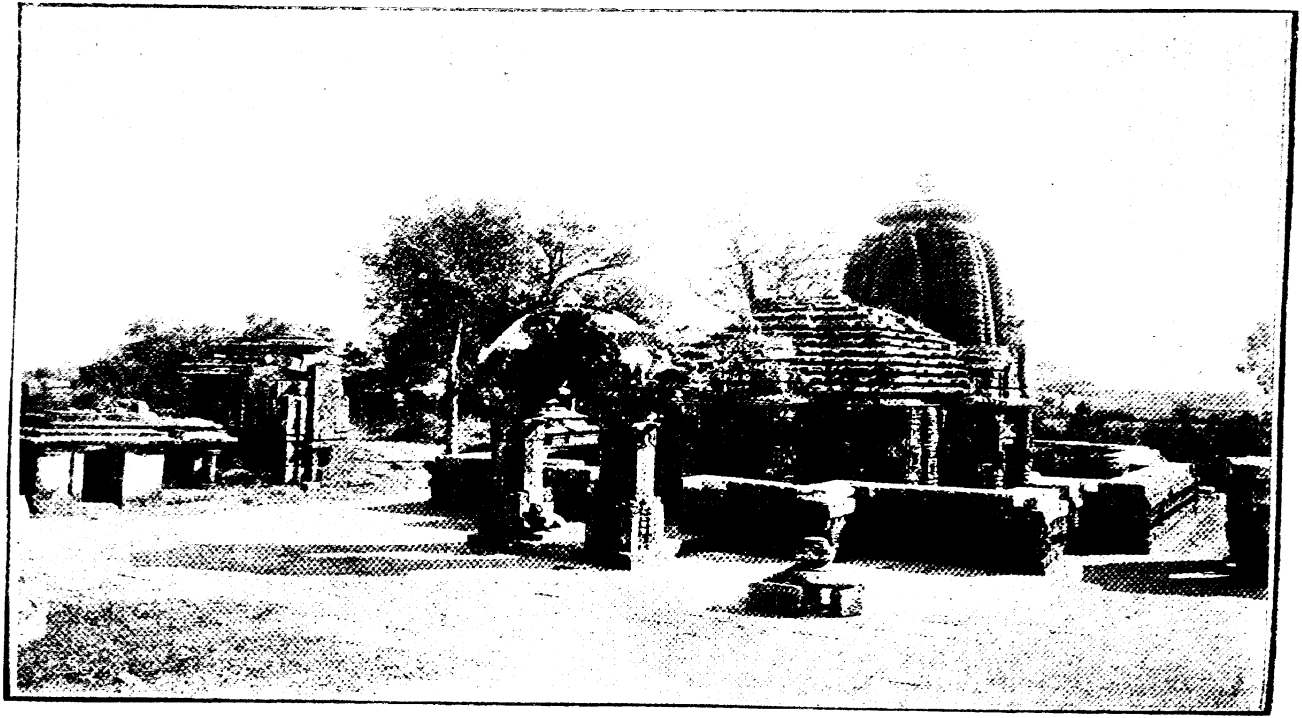
লতাগুল্মসমাচ্ছন্ন গ্রাম্য পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ভাস্করেশ্বরের মন্দির সমীপে পঁহুছিতে পারা যায়। মন্দিরের নিকট পঁহুছিলে এবং চতুর্দ্দিকের জঙ্গলাকীর্ণ বিজন সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে কেন জানি আপনা হইতেই প্রাণের ভিতর একটা অবসাদের ভাব জাগিয়া ওঠে— মনে হয় কালের শ্রেষ্ঠত্ব। বহু জনাকীর্ণ প্রমোদপূর্ণ সুন্দর মনোমোহন নগর—এক রাজবংশের দীর্ঘকালের রাজধানী এখন তাহার কি শোচনীয় অবস্থা। শৃগালের চীৎকারে—সন্ধ্যায় এখন দেব-মন্দিরের আরতি-সঙ্গীত কীর্ত্তিত হয়— কবি তুমি যথার্থই গাহিয়াছ "কাল প্রবল চিরদিন ও"। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কিংবদন্তি এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে দেব বিবস্বান্ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ইহার মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ভাস্করেশ্বর শিবলিঙ্গ অত্যন্ত বৃহদাকারের। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কাহারো কাহারো মতে ইহা ভুবনেশ্বরের দেবমন্দির হইতেও অধিকতর প্রাচীন, পূর্ব্বে ইহা বৌদ্ধদিগের একটা মঠ ছিল এবং ইহার মধ্যস্থ শিবলিঙ্গকে তাঁহারা একটী বৌদ্ধস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান করেন।

ভাস্করেশ্বরের মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে রাজারাণীর মন্দির বিরাজিত—এই মন্দির মধ্যে কোনও দেবমূর্ত্তি না থাকায় সাধারণ তীর্থযাত্রিগণ প্রায়ই এদিকে কেহ আসেন না। এই মন্দিরটি রক্ত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত,—বর্ত্তমান ভগ্নাবশিষ্ট সৌন্দর্য্য হইতেও ইহার প্রাচীন সৌষ্ঠবের প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে কেশরী বংশীয় কোনও রাজমহিষীর কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের অনেকগুলি মূর্ত্তি কর্ণেল ম্যাকেঞ্জি ও জেনারেল ষ্টুয়ার্ট সাহেব কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হওয়ায় মন্দিরের সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে বিনষ্ট করিয়াছে। থামের গায়ে উপবিষ্ট তিনটী হস্তী ও সিংহমূর্ত্তি অতিশয় সুন্দর, তাহার উপরেই আবার নবগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজিত। রাজারাণীর মন্দিরের কিয়দ্দূরে প্রায় ৬০০ হাত পশ্চিমে সিদ্ধারণ্য নামক আম্রকাননে পূর্ব্বে বহুতর দেবমন্দির ছিল, এখন ও প্রায় ২০টী অভগ্ন অবস্থায় বিরাজিত আছে তন্মধ্যে মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এ স্থানের মুক্তেশ্বরের মন্দির আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সৌন্দর্য্যে ইহাই ভুবনেশ্বরের অন্যান্য সমুদয় মন্দির হইতে শ্রেষ্ঠ।

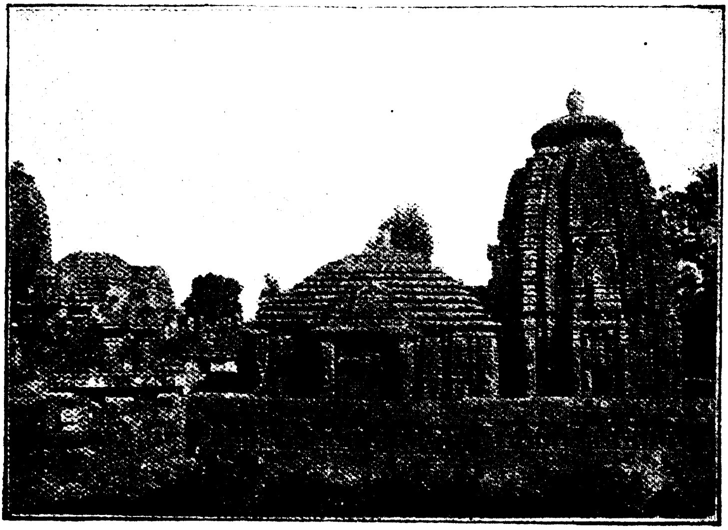
রাজারাণীর মন্দির।

রাজারাণী মন্দিরের অতি নিকটেই মুক্তেশ্বরের মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরও 'রাজারাণী' মন্দিরের ন্যায় রক্ত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই মন্দিরের উচ্চতা কেবল মাত্র ৩৫ ফিট। এই মন্দিরের সমকক্ষ শিল্পকলা সম্পন্ন মন্দির ওড়িষ্যায়ই অতি বিরল। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসন সাহেব এই মন্দির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "In its class it may be considered the gem of Orissian architecture." যিনি এই মন্দিরের প্রতি স্তম্ভ, খিলান, কার্ণিশ প্রভৃতির অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প নৈপুণ্য দর্শন করিয়াছেন জীবনে তিনি তাহা কখনো বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। মন্দির গাত্রে যে সমুদয় মূর্ত্তি খোদিত আছে তাহাদিগকে সজীব বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। পৌরাণিক দেবদেবীর নানাবিধ লীলাজ্ঞাপক প্রতিমূর্ত্তি, হস্তী, অশ্ব, প্রভৃতি পশুগণের মূর্ত্তি; নৃত্য পরায়ণা রমণীগণের হাবভাব বিলাসময়ী মূর্ত্তি ও বাদয়িত্রীগণের আকৃতি, সমুদয়ই স্বাভাবিক ও সুরুচিসম্পন্ন। দেখিলাম একস্থানে একটী যুবতী

মুক্তেশ্বরের মন্দির।



মুক্তেশ্বরের মন্দির—ভুবনেশ্বর।



মুক্তেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বদৃশ্য।

রমণী হস্তীর উপরে আরোহিতা হইয়া নির্ভয় চিত্তে সশস্ত্র অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অপর এক স্থানে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে ও বাদয়িত্রীগণ মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। একস্থানে অন্নপূর্ণা শিবকে অন্নদান করিতেছেন। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সে দিকেই এ সকল সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য দর্শনে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ছাদের শিল্পকার্য্য অতিশয় মনোহর। মন্দিরের পশ্চাতে গৌরীকুণ্ড নামক একটী ক্ষুদ্র সরসী। ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ ও কদুষ্ণ, পানের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। একটী প্রস্রবণের জল নিয়ত ইহার মধ্যে পতিত হয় বলিয়া ইহার জল কখন ও হ্রাস হয় না, পুষ্করিণীর অপরদিকে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকায় যখন জল অধিক হয় তখন উক্ত ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া দূরস্থিত নদীর সহিত মিলিত হইয়া যায়।

মরীচকুণ্ড।

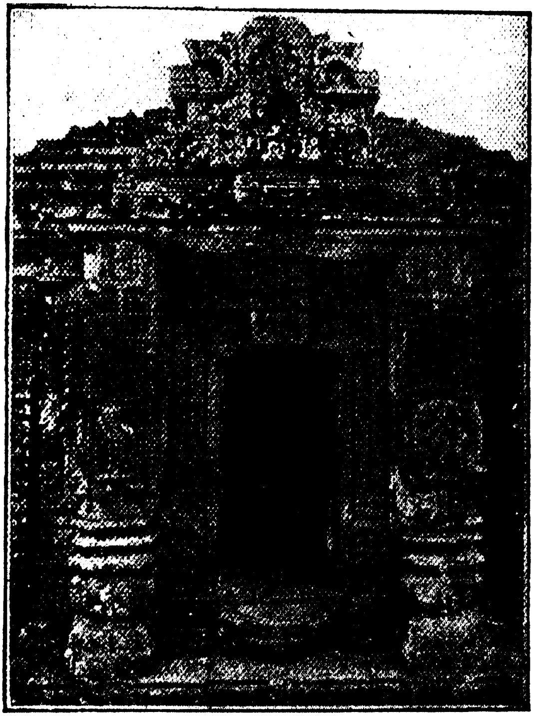
এই সরসী বা কুণ্ডের চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর দিয়া উত্তমরূপে বাঁধান। গৌরী কুণ্ডের সন্নিকটে এবং তাহার সহিত সংযুক্ত আরেকটি ক্ষুদ্রকায় পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম মরীচকুণ্ড। কথিত আছে যে এই কুণ্ডের জল পান করিলে

বন্ধ্যা রমণীরও বন্ধ্যা দোষ বিনষ্ট হইয়া সন্তান সম্ভবা হয়। লোকের এইরূপ সংস্কার থাকায় পূর্ব্বে পাণ্ডাগণ এই কুণ্ডের জল যাত্রিগণের নিকট বিক্রেয় করিত, কিন্তু গভর্মেণ্টের আদেশে এখন এই প্রকারের জল বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। গৌরীকুণ্ডের নিকটেই কেদারেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের সন্নিকটে হনুমান ও সিংহবাহিনী দুর্গামূর্ত্তি। ইহার পার্শ্বেই সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, কিন্তু ইহা প্রাচীন হইলেও এখানকার পরশুরামেশ্বরের মন্দিরই ভুবনেশ্বরের সমুদয় মন্দির হইতে প্রাচীন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার উচ্চতা ৩৮ ফিট হইবে। এই মন্দির গাত্রেও হস্তী, অশ্ব, প্রভৃতির চিত্র শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অঙ্কিত আছে। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি মনোজ্ঞ চিত্রও এস্থানে খোদিত দেখিলাম। দক্ষিণদিকের দরোজার নিকট প্রাচীন কুটিলা অক্ষরে একটী খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। উহার মাত্র চারিটী লাইন। এই খোদিত লিপি পাঠে জানা যায় যে জনৈক কলিঙ্গ রাজা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফাগুর্সন সাহেব এই মন্দির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"It may, however, be that if this is really the oldest temple of its class in Orissa, its design may be copied from a foreign example, and borrowed, with all its peculiarties, from a style practised elsewhere." এই মন্দিরের অন্যান্য দেবমন্দির হইতে বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রবেশদ্বারের চাঁদনির উপরে সম্মুখদিকে ছয়টী এবং পার্শ্বভাগে দ্বাদশটী জানালা আছে, ইহা দ্বারা সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে—কিন্তু বৃষ্টি ইত্যাদিতে কোনও রূপ ক্ষতি হয় না—বেতাল দেউল ব্যতীত অন্য কোনও মন্দিরেই এইরূপ জানালা নাই।

পরশুরামেশ্বর মন্দির।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে কপিলেশ্বরের মন্দিরে কপিলেশ্বর মহাদেব বিরাজিত আছেন। পূর্ব্বে এই গ্রাম অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। মন্দিরের গঠন প্রণালী ইত্যাদি সমুদয়ই ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য দেবমন্দিরের ন্যায়। ভুবনেশ্বর হইতে কপিলেশ্বর পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে পূর্ব্বে এই পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বিপণি সমূহ ও সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির বিরাজমান ছিল অদ্যাবধি তাহাদের

কপিলেশ্বর।



মুক্তেশ্বরের মন্দিরের—প্রবেশ-দ্বার।

ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্দিরের নিকটস্থ সরোবরের নাম মণিকর্ণিকা। এই সরোবরেও গজগিরি এবং জলের প্রস্রবণ আছে। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কপিলেশ্বরের দেবমন্দির ভুবনেশ্বরের দেবমন্দির অপেক্ষাও সুপ্রাচীন। ইহা একাম্রকাননে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিরাজমান। কপিলেশ্বর গ্রামে বহুলোকের বাস, ইহাদের বাস-গৃহগুলি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরী— প্রাচীরগুলা চূণকাম করা এবং নানারঙের চিত্র দ্বারা সুশোভিত। কপিলেশ্বরের মন্দির মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। আমরা পূর্ব্বে যে মণিকর্ণিকা সরোবরের কথা উল্লেখ করিয়াছি উহার জল গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্রতম বিবেচিত হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের

সমুদয় দেবমন্দিরের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। একাম্রপুরাণে লিখিত আছে যে এই স্থলে এক লক্ষ মন্দির ও এক কোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। হাণ্টার সাহেব ৭০০০ হাজার পর্য্যন্ত গণনা করিয়াছিলেন। আমরা এস্থানে কয়েকটি প্রধান দেবমন্দিরের উল্লেখ করিলাম--বোধ হয় ইহাতে তীর্থযাত্রিগণের এবং ভ্রমণকারিগণের দর্শনের পক্ষে সুবিধা হইবে। যথা রামেশ্বর উচ্চতা ৭৮ ফিট, যমেশ্বর ৬৭ ফিট, রাজারাণী ৬৩ ফিট, অনন্ত বাসুদেব ৬০ ফিট, ভগবতী বা পার্ব্বতী দেবীর মন্দির ৫৪ ফিট, সারিদেউল ৫৩ ফিট, নাগেশ্বর ৫২ ফিট, সিদ্ধেশ্বর ৪৭ ফিট, কপিলেশ্বর ৪৬ ফিট, কেদারেশ্বর ৪৬ ফিট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ ফিট, মুক্তেশ্বর ৩৫ ফিট, কোপারি ৩৫ ফিট, সোমেশ্বর মন্দির ·৩ ফিট। এতদ্ব্যতীত তীর্থযাত্রিগণের দর্শনোপযোগী আরও বহু তীর্থ আছে। মহারাজা অলাবুকেশরী ৫৯৯

অলাবুকেশ্বর।

শকে বহু অর্থব্যয়ে অলাবুকেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—এই সুন্দরও বৃহৎ মন্দির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮০০ ফিট হইবে। একাম্র চন্দ্রিকার মতে এই পুণ্যতীর্থ ও মন্দির মহাদেব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অলাবু বিনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্রের সলিল হইতে এই তীর্থ হইয়াছিল বলিয়াই ইহা অলাবু তীর্থ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। পুরাণে লিখিত আছে—

"অস্মিন্ ক্ষেত্রবনে রম্যে ভৈক্ষপাত্রঞ্চ মামকং।
কুণ্ডঞ্চ উদকাধারং তীর্থভূতং ভবিষ্যতি॥
অলাবুতীর্থং বিখ্যাতং ত্বৎ প্রাসাদাদিবাস্ত মে।
ভূতানাং হিতমত্যর্থং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥
এবমস্থিতি দেবেশন্তমলাবুং দ্বিজেরিতম্।
স্পর্শয়া মাস হস্তেনাহভবদ্দিব্যো মহাহ্রদঃ॥
ভূয়ঃ প্রাহ হরস্তুষ্ট এষমে নির্ম্মিতঃ স্বয়ং।
যত্রাভবন্মুনিশ্রেষ্টঃ পরিপূর্ণশ্চ পাবনঃ॥
অলাবুতীর্থমিদং লোকে বিখ্যাতং জনপাবনম্।
অষ্টায়তন মধ্যেহদো গতিমিষ্টাং প্রদায়কম্॥
দেবপিতৃমনুষ্যাণাং তোষণার্থায় নির্ম্মিতম্॥"

একাম্রকাননের অপর নাম "গুপ্তকাশী"। হিন্দুমাত্রেরই এই হিন্দুকীর্ত্তির আদর্শস্থান দর্শন করা একান্ত প্রয়োজন। মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন তখন তিনিও ভুবনেশ্বর বা গুপ্তকাশী দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"তবে মহাপ্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্ত কাশীবাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দু সরোবরে শিব সৃজিল আপনি॥"

তীর্থের জন্যই হউক কি প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শন বলিয়াই হউক প্রত্যেকেরই একবার সুবিধামত এই মনোরম স্থান দর্শন করা কর্ত্তব্য। ভুবনেশ্বর ওড়িষ্যার অতুল কীর্ত্তিময় স্থান। যিনি ওড়িষ্যা গমন করিয়া এই সুন্দর শান্তিময় স্থান দর্শন করেন নাই তাঁহার নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ভুবনেশ্বর শিবধাম, কাজেই এ স্থানে এক বৈতাল মন্দির ব্যতীত অন্য কোথাও শক্তি-চিহ্ন নাই। ওড়িষ্যায়—যাজপুর পার্ব্বতীধাম,—ভুবনেশ্বরে শিবধাম, পুরীতে বিষ্ণুধাম, মহাবিনায়ক পর্ব্বতে গণেশ ধাম এবং কনারকে সূর্য্যধাম,—এই কয়েকটি স্থানই উৎকলের মহাতীর্থ।—ভুবনেশ্বরে একটী ছোট পাঠশালা ও পোষ্টাফিস আছে—কোনও চিকিৎসালয় দেখিলাম না;—এইরূপ একটী প্রধান তীর্থস্থান, যেখানে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমাগম হয় সে স্থানে গভর্মেণ্টের একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এস্থানে প্রায় ৩।৪ শত ঘর পাণ্ডা আছে। আমাদের ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। তীর্থস্থলে অনেকেই আহার্য্য সামগ্রী সম্পর্কে বড়ই উদাসীন হইয়া পড়েন, আমরা ইহা একান্ত

ভুবনেশ্বরের প্রসাদ ও খাদ্য দ্রব্যাদি।

অন্যায় বিবেচনা করি,—অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। শরীর রক্ষা করাই সকল ধর্ম্মের সার। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন "শরীর মাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্।" দেখিয়াছি যে শরীরের অনাবশ্যক তাচ্ছল্যে এবং কদর্য্য ভক্ষণে বহুলোক তীর্থস্থলে পীড়িত হইয়া পড়েন, বিদেশে এইরূপ

পীড়াগ্রস্থ হওয়া যে কতদূর কষ্টকর এবং যন্ত্রণাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিত সক্ষম হইবেন। আমাদের বিনীত অনুরোধ যে তীর্থযাত্রিগণ যেন একটু সংযত ও নিজ শরীরের প্রতি ও আহারাদি সম্পর্কে একটু মনোযোগী হইয়া চলেন, দেবপ্রসাদের প্রতি ভক্তি করিতে হইবে বলিয়া যে তিন চারিদিনের বাসি প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে ইহা আমরা কোনরূপেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। ভুবনেশ্বরে খাদ্য দ্রব্যাদির বড়ই অসুবিধা, যাহা মিলে তাহাও বাঙ্গালী ভ্রমণকারিগণের পক্ষে ও তীর্থযাত্রিগণের পক্ষেও বিশেষ অসুবিধাজনক। যাত্রিগণ সাধারণতঃ প্রসাদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন; এস্থানে প্রসাদকে "পকাল" কহে—এই পকাল 'প্রসাদ' অন্ন, দধি ও মিষ্টান্ন মিশ্রিত করিয়া তৈরী করিয়া থাকে। ইহার আস্বাদন নিতান্ত মন্দ নহে। এ স্থানের কোরা নামক রসকরা দেখিতে যেমন শুভ্র খাইতেও তদ্রূপ সুস্বাদু। ভুবনেশ্বরের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দর্শনান্তে তৎপর দিবস অতি প্রত্যূষে আমরা বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিস্তম্ভ পরিপূর্ণ "খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি" দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। অনেক দিন হইতেই প্রাচীন বৌদ্ধযুগের এ সকল সুন্দর সুন্দর গুম্ফা প্রভৃতি দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল—আজ এতদিন পরে ভগবৎ কৃপায় সে বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল কাজেই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। ভুবনেশ্বর হইতে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি এই ক্ষুদ্র শৈল দুইটী উত্তর পশ্চিমদিকে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। নবোদিত অরুণের লোহিত কিরণ সম্পাতে প্রকৃতি সুন্দরীকে সেই মাঘের প্রভাতে অতিশয় মনোরম বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমাদের গো-যান মাঠের মধ্যস্থ পাকারাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল,—দুই পার্শ্বে দিগন্ত বিস্তৃত গ্রাম্য মাঠ—অতি দূরে কোথাও বা গ্রামের ধূসর রেখা আকাশের শেষ প্রান্তে মিলাইয়া গিয়াছে। দূরে দূরে দুই একটী ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দর্শকগণকে যেন বলিতেছে একবার আমায় দেখনা ভাই, আমি উহার চেয়ে কত সুন্দর। রাস্তার পার্শ্বে কোথাও বা আম বাগান; শীতকালেই ওড়িষ্যায় বসন্তের আবির্ভাব বলিয়া মনে হইতেছিল। আম্রের মুকুল-সৌরভে চতুর্দ্দিক সুরভিত। রাস্তাটী জনমানবহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কচিৎ দুই একটী

পথিকের সহিত ও দুই একখানা গো-যানের সহিত দেখা হইয়াছিল। কেমন একটা মৌন নীরবতা, কেমন একটা রৌদ্ররঞ্জিত উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যেও মহান ঔদাসীন্য তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিতেছিলাম না। দুইধারে শূন্য মাঠ ও দূরে দূরে অনুচ্চ শৈলখণ্ড বিরাজমান। এই গিরিশ্রেণী সমূহ দক্ষিণদিকে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার সহিত সংযুক্ত। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি এই শৈল দুইটীও উপরোক্ত শৈলশ্রেণীর অংশ মাত্র। এই গুম্ফময় গিরিদ্বয়ের মধ্যে বৌদ্ধযুগের যে কত স্মৃতি বিজড়িত আছে তাহা যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন। খণ্ডগিরির শেখরস্থ জৈন মন্দিরের চূড়া ক্রমশঃই স্পষ্ট—ক্রমশঃই পূর্ণরূপে নয়ন-পথে পতিত হইতেছিল। একটী ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী কুলুকুলু রবে—মাঠের মধ্য দিয়া রাস্তার পাশ কাটিয়া বহিয়া যাইতেছিল সেটা উত্তীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে আমরা যখন গিরিদ্বয়ের পাদদেশে উপনীত হইলাম তখন বেলা প্রায় ৯।১০ ঘটিকা হইবে—চারিদিক উজ্জ্বল দীপ্তিময়—রবির প্রখর কিরণ মণ্ডিত।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

যেস্থানে একদিন ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের লীলাক্ষেত্র ছিল, যে স্থানে একদিন প্রব্রজ্যাগ্রহণান্তর ভিক্ষুগণ নীরবে ধ্যানপরায়ণভাবে সময় অতিবাহিত করিতেন,—এই সেই পবিত্র খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। কত পুণ্যাত্মা জ্ঞানসম্পন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পূত-চিহ্ন-রেখা এখানে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? ধন্য তাঁহারা, ধন্য সেই স্বার্থহীন দ্বেষহীন-ভিক্ষুর দল; যাঁহারা এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন শ্যামল বনরাজি-পরিশোভিত সংসারের কোলাহলহীন নীরব ও বিজন এমন সুরম্যস্থানকে তপস্যার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। কতদিন কতকাল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও এই গিরিদ্বয় প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা ও বৈরাগ্যের সহিত অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাঁহার অত্যাশ্চর্য্য বৈরাগ্যের মহত্ত্ব সুদূর চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মধ্য এসিয়া ও পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই আত্মত্যাগী কর্ম্মবীরকে জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর সহিত নমস্কার করি। গুণের আদর —আত্মত্যাগী রাজসন্ন্যাসীর প্রতি সম্মান, কবি ভিন্ন নির্ভয় চিত্তে আর কে প্রদর্শন করিতে পারে? তাই কবি জয়দেব বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গাহিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহঃ শ্রুতিজাতম্।
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্॥
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর।
জয় জগদীশ হরে॥"

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্য দিয়া একটী অল্প প্রশস্ত রাজপথ বহিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটী গিরি। পাহাড়ের দুইদিকই নিবিড় অরণ্যানী দ্বারা আচ্ছাদিত—গাছের পর গাছ, তারপর গাছ, ক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সুদূর সীমান্তে মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তার পার্শ্বে একটী

ডাকবাংলা আছে, ভ্রমণকারিগণ সেস্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। খণ্ড-গিরির পদপ্রান্তে একটী নোটিস বোর্ডে লিখিত আছে—"You are requested not to write your names in the caves or the temples." অর্থাৎ এই গিরিগুহাতে বা মন্দিরে আপনাদের নাম লিখিবেন না এই প্রার্থনা; কিন্তু এই অনুরোধবাক্য অতি অল্পলোকেই পালন করিয়া থাকে। হায়! মানবগণ প্রত্যেকেই পৃথিবীতে নিজ নিজ স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার জন্য পাগল, কিন্তু পৃথিবী কি কাহাকেও মনে রাখিয়াছে? কত রাজা, কত সম্রাট্, কত কোটীশ্বর, কত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিগণ জগতে পদাঙ্ক-রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজ এই সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী বসু-মতীকে তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা কর, সে এক মুষ্টি ধূলিকণামাত্র দেখাইয়া দিবে। তবু অন্ধ আমরা জগতে স্মৃতি রাখিবার জন্য পাগল। অনেক হিন্দু এই বৌদ্ধ কীর্ত্তিরাশি সমলঙ্কৃত স্থান দেখিতে আইসেন না—পূর্ব্বেও ইহা হিন্দুদিগের ত্যজ্য ছিল। এখনও ইহা হিন্দুতীর্থ নহে, সাধারণ তীর্থ-যাত্রিগণের মধ্যে অনেকে ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অবগত নহেন, কাজেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অতি অল্পলোকেই এ সকল গুম্ফা ইত্যাদি দর্শন করিয়া থাকেন।

উদয়গিরির পাদদেশে একটী পর্ণকুটীর আছে, তাহা বৈরাগীর মঠ নামে পরিচিত। মঠধারী একটী বৃদ্ধ ব্যক্তি। গৃহাভ্যন্তরে দেওয়ালের গাত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ও বহু খড়ম সাজান রহিয়াছে। মঠধারী বৃদ্ধ এই সমুদয় খড়মের মধ্য হইতে এক জোড়া খড়ম চৈতন্যদেবের খড়ম বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। একথা কতদূর সত্য তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। এই পর্ব্বতদ্বয় লেটারাইট ও বালু প্রস্তর দ্বারা গঠিত। খণ্ডগিরিতে আরোহণ করিবার জন্য লতা পাতার মধ্য দিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী আছে, সোপানগুলির অধিকাংশ স্থলেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সময় সময় নানাজাতীয় বন্য কুসুম পথের দুই পার্শ্ব সুন্দররূপে সুশোভিত করিয়া রাখে। ফুলের উগ্রগন্ধে বন-রাজীর পত্রান্দোলিত সর্ সর্ শব্দে শীতলতার সহিত সজীবতা আনিয়া দিয়া থাকে। সোপানের কিঞ্চিৎ উপরেই চারিটী গুম্ফা বিরাজিত; একটী ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে;

তাহার পার্শ্বের একটী গুম্ফায় হিন্দুদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ; সময় সময় এস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পঠিত হইয়া থাকে। এই পার্শ্বের গুম্ফায় বহু ভাস্করকার্য্যের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে—এ স্থানে দশভূজা ও সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি বিরাজিতা আছেন - কেহ কেহ বলেন যে, এ সকল হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক এই স্থান পরিত্যক্ত হইলে, হিন্দুগণ অঙ্কিত করিয়াছিলেন ; আবার কেহ কেহ বলেন, মহাযান বৌদ্ধগণ-কর্ত্তৃকই এ সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা কেহই কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি এই উভয় পর্ব্বতেই বহু গুম্ফা আছে, তবে খণ্ডগিরি হইতে উদয়গিরিতেই গুম্ফার সংখ্যা বেশী। আমাদের লিখিত চারিটী গুম্ফার একটু দূরেই একটী সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং একটী সিংহমূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে যে, এই সিংহদ্বার কেশরীরাজ ললাটেন্দু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকে, গভীর রাত্রে এ স্থানে তোপ-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজা অশোকের রাজত্বের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধভিক্ষুগণ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুম্ফার মধ্যে বাস করিতেন। খণ্ডগিরির গুম্ফা অপেক্ষা উদয়গিরির গুম্ফাগুলিই অধিকতর সুন্দর ও বিস্তৃত। খণ্ডগিরিতে দুইটী শিলালিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এ অঞ্চলে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, খণ্ডগিরি পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতের একটী অংশবিশেষ ছিল এবং উহার গুহাভ্যন্তরে ধ্যানপরায়ণ মহাতপস্বিগণ বাস করিতেন, পরে সেতুবন্ধনের সময় হনুমান এই পর্ব্বত-খণ্ড হিমালয় হইতে উৎপাটন করিয়া এ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া যান!

খণ্ডগিরির শিখরদেশের জৈন মন্দিরাভ্যন্তরে মহাবীরের নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি শতবর্ষ পূর্ব্বে দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত কটক নিবাসী মঞ্জু চৌধুরী ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানী দাদু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরমধ্যস্থ মহাবীর নামক তীর্থঙ্করের ত্রিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাও তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে কত ব্যক্তি যে পেন্সিল ও অঙ্গার দ্বারা নিজ নিজ নাম, ধাম ও তারিখ লিখিয়া গিয়াছে, তাহার শেষ নাই। মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্বভাবের



জৈন মন্দির---খণ্ডগিরি ।

শোভা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। কি সুন্দর! দূরে সুনীল গগন-পটে চিত্রের ন্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির; নিম্নে পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ শির তরুরাজীর দিগন্ত-বিস্তৃত-নর্ত্তন-লীলা—কোথায় কতদূরে কোন্ নীল শৈলমালার পাদমূলে যে ইহারা নিঃশেষ হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। সহস্র সহস্র নানাজাতীয় তরুশ্রেণী নয়নানন্দদায়ক হরিৎ ক্ষেত্র মৃদুমন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া, পৃথিবী-সুন্দরীর নব-যৌবন-সুষমা প্রকটিত করিয়া থাকে। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা,—চারিদিকে সৌম্যা স্নিগ্ধা শান্তিরাণী বিরাজিতা। গাছের শাখায় বসিয়া কত অজানা দেশের অজানিত বিহঙ্গম সকল স্বর-লহরীতে চিত্তমুগ্ধ করিয়া থাকে। এরূপ শান্তিপূর্ণ স্থান অতি অল্পই দেখা যায়। প্রখরসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিতা জননী বসুমতী শিশুর ন্যায় যেন এই গিরিদ্বয়কে শ্যামল সুন্দর অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত করিয়া, মৃদুল বীজনে ঘুম পাড়াইতেছেন। প্রকৃতিদেবী যে কত মনো-মোহিনী—আমাদের মাতা বসুমতী যে কত স্নেহময়ী, কত ঐশ্বর্য্যময়ী—তাহা যিনি কখনও পর্ব্বতারোহণ করিয়া নৈসর্গের প্রাণারাম শোভাসম্পদ দর্শন ও চিত্তে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই তাহা অবগত আছেন। পাহাড়ের শীর্ষস্থ এই মন্দির দুইটীর জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বৌদ্ধদেবের বিবিধ প্রকারের মূর্ত্তিও বিরাজিত আছে। মন্দিরদ্বয়ের নিকটে সমতল ভূমিতে কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ রহিয়াছে, ইহাদের নাম দেবসভা। এগুলি যে কি উদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কেহই কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও মতে এইগুলি মহাযান বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক পুণ্যার্থ স্থাপিত হইয়াছিল, কাহারও কাহারও মতে এই স্তম্ভগুলি কোনও কোনও বৌদ্ধভিক্ষুগণের সমাধি-চিহ্ন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, সন্ধ্যার সময়ে সমুদয় ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া এস্থানে ধর্ম্মালোচনা করিতেন বলিয়া ইহার নাম দেবসভা হইয়াছে। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুন্দর সমতল ভূমি,—চারিদিকে প্রকৃতির সৌম্য নীরবতা, ঊর্দ্ধে মণিরঞ্জিত অনন্ত নীলগগনরূপ চন্দ্রাতপ অনন্তের মহিমা জ্ঞাপন করিতেছে, ইহা কি ধর্ম্মালোচনার উপযুক্ত স্থান নহে? যে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি একসময়ে বৌদ্ধ যতিগণের পুণ্যময় চরণধূলিতে

পবিত্র ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সেস্থানে বৌদ্ধভিক্ষুক বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন গৃহী দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্তম্ভগুলি ঝোপে ঝাপে ও কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন। মন্দিরদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে সমতল ভূমিতে এই দেবসভা বহুদূর বিস্তৃত। মধ্যস্থলের স্তম্ভ দুইটী অপর অপর স্তম্ভ হইতে কথঞ্চিৎ উচ্চ ও উহার দিকে দুইটী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিও রহিয়াছে। দেবসভার পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূরে গমন করিলে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়; একটীর নাম শ্যামকুণ্ড, একটীর নাম রাধাকুণ্ড ও অপরটির নাম আকাশগঙ্গা। এই জলাশয় কয়টির আকৃতিই চতুষ্কোণ ও প্রস্তর-গ্রথিত; অবতরণের নিমিত্ত সোপানাবলীও রহিয়াছে, ইহাদের সহিত একটী প্রস্রবণের সংযোগ আছে, তাহা না হইলে এইরূপ উচ্চ পর্ব্বতোপরি জল থাকা সম্ভবপর হইত না। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের জল অতি সুন্দর ও স্বচ্ছ, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সলিল মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে। আকাশ-গঙ্গার জল বিবর্ণ, অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট; কে জানে কতকাল হইতে ইহারা এইরূপ অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এককালে ইহাদের সুস্নিগ্ধ শীতল ও নির্ম্মল সলিলরাশিই বোধ হয় গুম্ফাবাসীদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করিত। বৌদ্ধযুগের ও বৌদ্ধভিক্ষুগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত এসকল কুণ্ডের নাম 'শ্যামকুণ্ড' ও 'রাধাকুণ্ড' শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বোধ হয়, ইহা হিন্দুদের কর্ত্তৃক আধুনিক এইরূপ নূতন নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। খণ্ডগিরির উচ্চতা ১২৩ ফিট মাত্র।

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও আকাশগঙ্গা।

খণ্ডগিরি দর্শনান্তে আমরা উদয়গিরি দর্শন করিতে গমন করিলাম, এখনও যাহা কিছু দেখিবার তাহা উদয়গিরিতেই আছে। ইহার অপর নাম ললিতগিরি। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্ব্বতের খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি সমূহ দর্শন করিয়া লেখনীমুখে যাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য এবং শিল্প-নিপুণতার অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এস্থানে তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উদয়গিরির প্রতি গুম্ফার নিকট যখন যাইতেছিলাম ও বিমুগ্ধ চিত্তে দর্শন করিতেছিলাম—তখনই তাঁহার সেই অমর বর্ণনা-কাহিনী

উদয়গিরি।

হৃদয়ে জাগিতেছিল ;—তিনি লিখিয়াছেন "সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,—মাতা বসুমতার অঙ্গে বহু-যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী, তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র তালবৃক্ষ ; সরল, সুপত্র, শোভাময়, মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল, পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর যেন কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু ? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু ? আর প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন ; পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সংমিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু ? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত রত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভি :—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু ? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার ! তখন মনে করিলাম, হিন্দু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।" আমরা ধীরে ধীরে বৈষ্ণবের মঠের নিকটস্থ পথ দিয়া উদয়গিরিতে আরোহণ করিলাম। উদয়গিরির গুম্ফাগুলিকে দুই শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। প্রত্যেকগুলিই পর্ব্বতের কঠিন গাত্র ভেদ করিয়া পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর বা আদিযুগের গুম্ফাগুলি দেখিলে মনে হয়, যেন কঠোর বৈরাগ্য ব্রতধারী সংসারে সম্পূর্ণরূপ বীতস্পৃহ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ কোনও রূপে বাতাতপের আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষা করিবার জন্য এই গুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ সকল গুম্ফার মধ্যে একজন মানুষের হাত

পা ছড়াইয়া শয়ন করা দূরে থাকুক বরং বসিলেই মাথার সহিত গুম্ফার ছাদের বিশেষ কোন ব্যবধান থাকে না, এ সব গুম্ফার ভিতরে কোনও শিল্পনৈপুণ্য নাই। কোনওরূপ শিল্পচাতুর্য্য বিহীন দুরারোহ গিরিগাত্রস্থিত

বৌদ্ধযুগের প্রথমাবস্থার গুম্ফা।

এ সকল গুম্ফাগুলি কালের নিষ্পেষণ হইতে এখনও জীর্ণদেহে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আদিকালে ভারতবর্ষে মানবের বাসগৃহ কিরূপ ছিল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উদয়গিরির এসকল গুম্ফার ন্যায় প্রাচীন গুহা ভারতবর্ষের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। হাণ্টার সাহেব এই গুম্ফাগুলিকে খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসরের বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, এই গুলি খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল,* ইহাদিগকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না। হাণ্টার সাহেব এই গুম্ফা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"They are holes rather than habitations, and do not even exhibit those traces of primitive carpentry architecture which the earliest of the western specimens disclose. Some of them are so old that the face of the rock has fallen down, and left the caves in ruins. The men who, year after year, cronched in these holes, and cramped their limbs within their narrow limits, must have been supported by a great religious earnestness, little known to the Buddhist priests of latter times." (Hunter's Statistical Account of Puri, p. 73-74) বোধ হয় শরীর এবং মনকে সংযত রাখিবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার শারীরিক কষ্ট সহিবার উপযোগী করিয়াই এই গুম্ফাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্ফাগুলির পরে আমরা বৃহদায়তনের ও শিল্পকার্য্য-সমন্বিত গুম্ফাগুলির দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম, যদিও এখন ইহাদের ছাদ পতিত, স্তম্ভ ভগ্ন, প্রস্তর খোদিত নরমূর্ত্তি সকল বিকলাঙ্গ, কোন কোন স্থলে সর্ব্বস্বই একেবারে লোপপ্রাপ্ত তবুও প্রাচীনত্বের এক মহিমাময়

* Hunter's Statistical Account of Puri, p. 73.

গৌরব-সৌন্দর্য্য ইহাদের প্রতি অণুতে পরমাণুতে বিজড়িত থাকিয়া, হৃদয়ে এক ঔদাস্যের ভাব আনয়ন করিয়া দেয়। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র গুম্ফাগুলির সহিত ইহাদের তুলনাই হইতে পারে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী বলেন যে, এই বৃহদায়তনের ও বহু কক্ষ শোভিত গুম্ফাগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারতের নানাদেশে ধর্ম্মশীল ভিক্ষুগণের মণ্ডলী গঠিত হইতে লাগিল, যখন নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্র সম্পর্কিত কূট বিষয় সমূহের আলোচনার প্রয়োজন হইতে লাগিল এবং নানাদেশদেশান্তর হইতে সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রালোচনা এবং দূর দেশান্তরে প্রচারকার্য্যের প্রণালী উদ্ভাবনীর নিমিত্ত সন্ন্যাসিগণ দলে দলে আসিতে লাগিল, তখন বহুজনের একত্রবাসের জন্য সচ্ছন্দতানিবন্ধন এই গুম্ফাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।*

এই গুম্ফাগুলি উচ্চতায় পূর্ব্ব গুম্ফাগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী, ভিতরে দাঁড়াইলেও ছাদের সহিত মাথা ঠেকে না এবং এ সকলের মধ্যে অনায়াসে নয় দশ জন লোক একত্র বাস করিতে পারে, কোনও অসুবিধা হয় না। এই গুম্ফাগুলির সম্মুখে এক একটী করিয়া দালান বিরাজিত—এবং ২।৩টী করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার দ্বার আছে। দরজার চৌকাঠগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু তাহাতে কবাট নাই, পূর্ব্বে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নির্ণয় করা এখন অসম্ভব। আমরা প্রত্যেক গুম্ফার মধ্যেই প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপে দর্শন করিয়াছিলাম; এখন অধিকাংশ স্থলেই উহার রং জ্বলিয়া গিয়াছে— ভিতরাংশ যদিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবুও কেমন একটা দুর্গন্ধ বোধ হইতেছিল। আমাদের প্রদর্শক বলিল 'বাবু আজকাল রাত্রিতে এখানে বাঘ ভালুক থাকে'—এইরূপ অরণ্য সঙ্কুল অথচ নির্জ্জন স্থানে তাহাদের বাস করা অসম্ভব বোধ হইল না।

খণ্ডগিরিতে মাত্র দুইটী শিলালিপি আছে, কিন্তু উদয়গিরিতে বহু শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়গিরিতে রাণীনূরগুম্ফা বা রাণী-

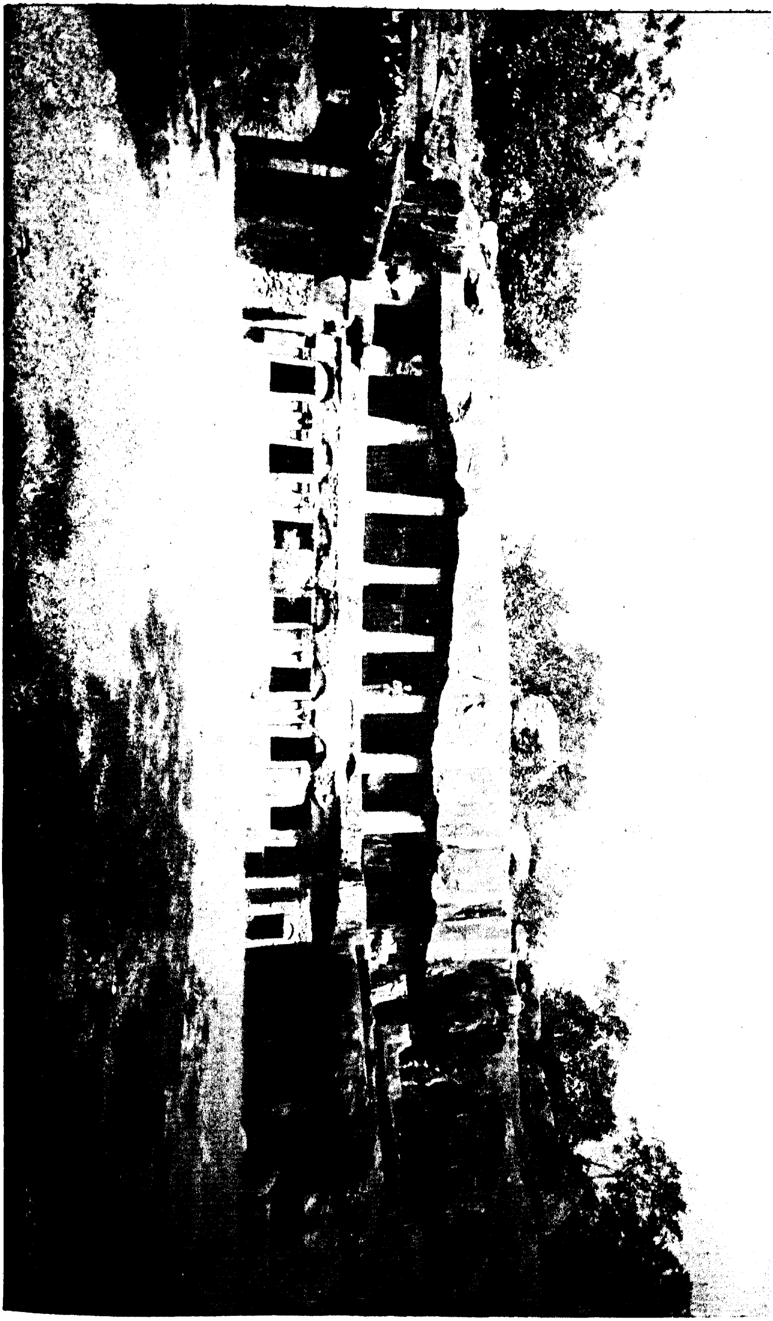
* These appear to have been intended for the religious meetings of the brotherhood. Some of them are very roomy, and have appartments at either end, probably for the spiritual heads of the community; small, indeed, when compared with the temple chambers, but greatly more commodious than the primitive single cells. (p. 74).

গুম্ফা, হস্তিগুম্ফা, স্বর্গপুরীগুম্ফা, জয়াবিজয়াগুম্ফা, বৈকুণ্ঠ ও যমপুর-গুম্ফা, সর্পগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা প্রভৃতি গুম্ফাগুলি প্রধান।

এ সকল গুম্ফার মধ্যে রাণীগুম্ফাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। এই গুম্ফাটি দ্বিতল। নিম্নতলে প্রায় দ্বাদশটি এবং উপরের তলায় প্রায় একাদশটি প্রকোষ্ঠ আছে। গৃহটি দ্বিতল হইলেও, ইহার রীতিমত একতলের উপর অপর তল অবস্থিত নহে, নিম্নতলের গৃহগুলি হইতে উচ্চতলের গৃহগুলি পশ্চাতে পর্ব্বতের উচ্চ অংশে অবস্থিত বলিয়া দ্বিতলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এ নিমিত্তই প্রত্যেক পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ও ভ্রমণকারিগণ ইহাকে দ্বিতল বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই গুম্ফার নাম রাণীগুম্ফা কেন হইল, এ সম্বন্ধে একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, একজন রাণী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া সমুদয় রাজ্যসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক এসকল গুম্ফা নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা রাণীগুম্ফা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। একটী পর্ব্বতগাত্র-খোদিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণের তিন দিকে এই গৃহগুলি অবস্থিত। গৃহের সম্মুখে বারাণ্ডা, কতকগুলি স্তম্ভের উপর বিরাজ করিতেছে, গৃহের ছাদ অপেক্ষা বারাণ্ডার ছাদ অনেক উচ্চ। দক্ষিণদিকের ও বামদিকের কক্ষগুলি পাকের কার্য্যের জন্য ও সকলের ভোজনের জন্য ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়।

রাণীগুম্ফা।

উপরের তলের গুম্ফাগুলির মধ্যে চারিটি গুম্ফার দৈর্ঘ্য ১৪ ফিট ও প্রস্থ ৭ ফিট এবং উচ্চতা তিন ফিট নয় ইঞ্চি। বাহিরের বারাণ্ডা ৬০ × ১০ ফিট এবং ৭ ফিট উচ্চ। প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য দুইটি করিয়া দ্বার আছে—দরজার চৌকাঠগুলি প্রস্তর হইতে সুকৌশলে খোদিত করিয়া বাহির করা হইয়াছে। প্রবেশদ্বারের উর্দ্ধাংশ গোল খিলান দ্বারা শোভিত এবং তাহাতে নানাপ্রকারের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। নিম্ন-তলের দ্বারদেশে দুইটি বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রহরীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উভয়েরই হাটুর উপর পর্য্যন্ত বর্ম্মাবৃত, একজনের পায়ে বুট জুতার মত একপ্রকার পদরক্ষিণী, অপরের কেবল পদের নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের পাতা খালি, কিন্তু উপরাংশে সাঁজোয়া দ্বারা সুশোভিত।



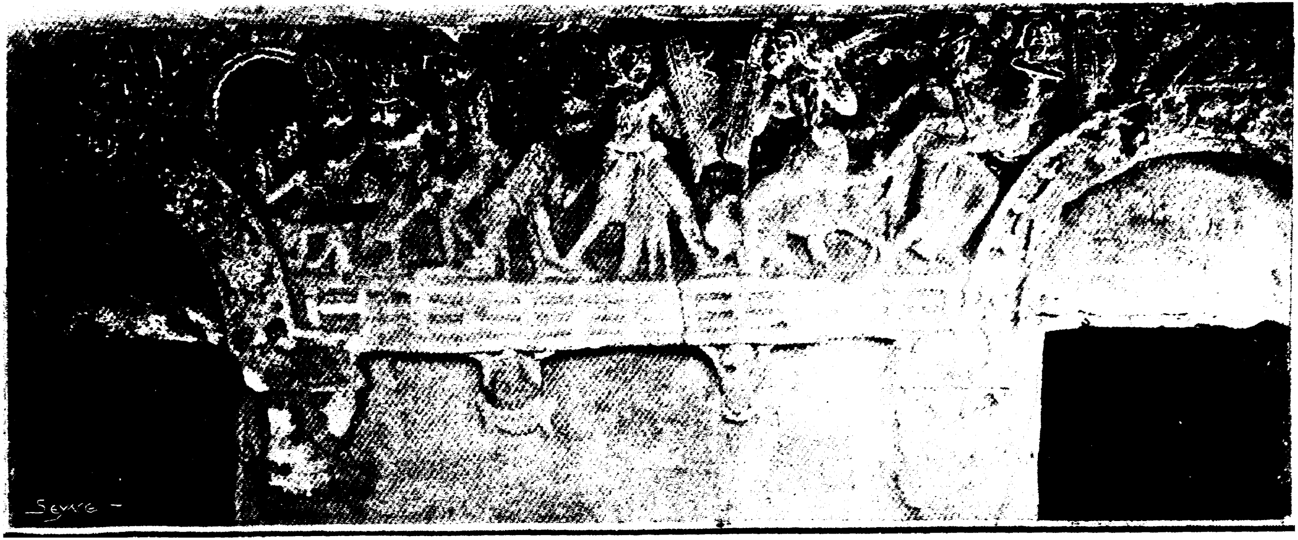
দুঃখের বিষয় এই যে দুইটি মূর্ত্তির মধ্যে একটী প্রায় ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে, অপরটির অবস্থা ভালই আছে। এই দুইটির অনতিদূরে একটী বৃহৎ সিংহের উপরে একটী নারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে। চৌকাঠের উপরে ও গোলানের মাথায় একটী ধারাবাহিক ঘটনার চিত্র এবং একটী শিকারের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। এই ঘটনাটির সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও হাণ্টার সাহেব প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—ইহার যে কোন্‌টি ঠিক্, কোন্‌টি অঠিক্, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পশু, পক্ষী, নর, নারী প্রভৃতি প্রত্যেক গুলির মূর্ত্তিই সুন্দর এবং স্বাভাবিক; এমন মানুষ অতি কম, যাঁহার এ সকল মূর্ত্তি এবং ঘটনার চিত্র দেখিয়া মনে একটা কাল্পনিক-চিত্র আসিয়া না উদয় হয়। সিংহ ও ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, যাহারা এ সকল মূর্ত্তিগুলি খোদিত করিয়াছে, তাহারা বিশেষরূপে এই সকল জানোয়ারকে লক্ষ্য করিয়াছিল।

আমরা রাণীগুম্ফা দর্শনান্তে হস্তিগুম্ফা দর্শনের জন্য গমন করিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা হইবে; সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ ঢালিয়া দিতে ছিলেন,—কিন্তু পার্ব্বতীয় মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চালনহেতু আমাদের কোনও কষ্ট হয় নাই, বিশেষ প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসমূহ দর্শন করিতে গেলে, এমনই একটা অমৃতময় মাদকতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই মনে থাকে না। উদয়গিরি অতিশয় মনোরম স্থান। আম, কাঁটাল, আমলকী ও অন্যান্য নানাজাতীয় বৃক্ষরাজিদ্বারা ইহা শ্যামলবরণে সমলঙ্কৃত। কত জাতীয় বন্য পুষ্প যে, সেই নীরব বিজন প্রদেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া আপনার মনে ঝরিয়া যায়, তাহার খোঁজ কে লইয়া থাকে? কবি সত্যই গাহিয়াছেন,—"Full many a flower is born to blush unseen." যদি আমরা রত্ন চিনিতাম—যদি বুঝিতে পারিতাম যে, নিবিড় অরণ্যানীর প্রচ্ছন্ন ছায়ায় যে সুরভি কুসুম-দাম ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা অমূল্য—তাহা হইলে আর আমাদিগকে বৈদেশিক ঐতিহাসিক-গণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। যখন দেখিতে পাই যে, আমাদের ঘরের গুপ্ত কাহিনীটুকুও ইংরেজ ঐতিহাসিকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির নিকট হইতে মুক্তি পায় নাই; তখন ভাবি, ধন্য

ইঁহারা, ধন্য ইঁহাদের চেষ্টা, ধন্য ইঁহাদের যত্ন ও অধ্যবসায়। এমন জাতির যদি উন্নতি না হয়, তবে কি তোমার আমার মত পরিশ্রমকাতর বিলাসী বাঙ্গালী বাবুর হইবে? যাহারা নিজের দেশকে ভালরূপ জানিতে পারিল না, নিজের মায়ের পবিত্রতম সুমিষ্ট দুগ্ধধারা পান করিতে পারিল না; তাহারা সত্য সত্যই "নিজবাসভূমে পরবাসী।" সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, আজ কাল অনেকে পুরাতত্ত্বের অমৃতময় রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষার কলেবর পুষ্ট করিতেছেন।

হস্তিগুম্ফা বা গণেশগুম্ফা।

উদয়গিরির উচ্চতম শিখর প্রদেশের এবং রাণীনূরগুম্ফার উত্তর পূর্ব্বদিকে গণেশগুম্ফা অবস্থিত! এই গুম্ফার নাম গণেশগুম্ফা কেন হইল বুঝিতে পারা যায় না। ইহার নাম হস্তিগুম্ফা হওয়াই অধিকতর সঙ্গত ছিল, কারণ গুম্ফাভ্যন্তরে গণেশ-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রস্তরময় হস্তিমুণ্ড সংরক্ষিত আছে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে হস্তিমূর্ত্তি থাকায়ই ইহার নাম গণেশগুম্ফা হইয়াছে। গণেশগুম্ফার সম্মুখে একটী বারাণ্ডা আছে, বারাণ্ডার ছাদ পাঁচটী স্তম্ভের উপর স্থাপিত, স্তম্ভগুলি প্রায়ই ভগ্ন; ইহাদের শীর্ষদেশে কতিপয় রমণীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই গুম্ফায় আরোহণ করিবার সিড়ির দুই ধারে দুইটি প্রকাণ্ড হস্তীর মূর্ত্তি; উভয়েরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন, ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শুণ্ড দ্বারা এক একটি নালসমেত বিকশিত শতদল ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই গুম্ফার শীর্ষদেশে একটী রমণী-হরণের ধারাবাহিক চিত্র অতিশয় সুন্দররূপে খোদিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। রাণীগুম্ফার চিত্রের সহিত ইহার বহু সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। স্থানীয় জনসাধারণে ইহা রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ বলিয়া বিশ্বাস করে; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন; অস্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণও আছে, রামায়ণের বর্ণিত সীতাহরণের সহিত কোনও সৌসাদৃশ্যই বিদ্যমান নাই। কোথায় বা জটায়ু, কোথায় বা দশস্কন্ধ রাবণ, কোথায় বা পুষ্পক রথ। মূল ঘটনা সম্বন্ধে কেহই কোনওরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তবে কল্পনার অবাধ গতিতে অপূর্ব্ব কাহিনীর ছবি অনেকেই আঁকিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাসের কঠোর সত্যের সম্মুখে সে সকল



রণ-দৃশ্য—খণ্ডগিরি

।৩।

জলবিম্বের ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে। এই চিত্রসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও বোধ হয়, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তৎকালীন কোনও বিশেষ সামাজিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এই চিত্রগুলি খোদিত হইয়াছিল।

স্বর্গপুরী গুম্ফা।

এই দ্বিতল গুম্ফাটি রাণীগুম্ফার পশ্চিমদিকে অবস্থিত; ইহা দ্বিতল হইলেও, সর্ব্ববিষয়ে পূর্ব্বোক্ত গুম্ফা হইতে নিকৃষ্ট। এখানে কয়েকটি হস্তীর মূর্ত্তি অতি সুন্দরভাবে গুম্ফাভ্যন্তরে খোদিত রহিয়াছে; ইহার উপরে ও নীচের তলে দুইটি করিয়া মোট চারিটি গৃহ ও সম্মুখভাগে একটি বারাণ্ডা আছে, বারাণ্ডার স্তম্ভগুলি একটিও ভাল অবস্থায় নাই। এই গুম্ফার চতুর্দ্দিকে ধ্যানমগ্নপর্ব্বতগাত্রে প্রসারিত রাস্তার মধ্যে বড় বড় গাছগুলি হইতে পতিত রাশি রাশি শুষ্ক-পত্রগুলি আমাদের পদতলে পতিত হওয়ায় মর্ মর্ ধ্বনি হইতেছিল। বিহগকল-কাকলীমুখরিত-নিবিড়চ্ছায়াবৃত এই গুম্ফাগুলির পার্শ্বে এমনি একটি নিস্তব্ধ নীরবতা বিরাজমান যে, প্রাণে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অতীতের সমগ্র ইতিহাস তোলপাড় করিতে থাকে। যে সমুদয় ধর্ম্মপ্রাণ অর্হিতগণ প্রাণপণে অতুল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে কারুকার্য্যসম্পন্ন-গুম্ফাগুলিকে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদের মনে তখন একদিনের জন্যও এ ভাবের উদয় হয় নাই যে, এই গুম্ফাগুলি একদিন ব্যাঘ্রভল্লুকের আশ্রয় হইবে। আমরা গুম্ফার পার্শ্বে বসিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম; ধীরে স্নেহময়ী প্রকৃতি জননী তাঁহার শ্যামাঞ্চল আন্দোলিত করিয়া ব্যজন করিতেছিলেন। এখানে বসিয়া আমি আপনাকে কোন সুদূর অতীতের এক গৌরবান্বিত মানব বলিয়া অনুভব করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, সিদ্ধার্থের মহৎ জীবনা,—মনে হইতেছিল, সেই ত্যাগী রাজ-সন্ন্যাসীর ধনৈশ্বর্য্য-স্নেহ-মায়া-প্রেমের অমানুষিক বন্ধন ছেদন। পতি-প্রাণা অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী গোপার প্রেম তুচ্ছ করিয়া নিদ্রিতাসুর-সুন্দরীর অর্দ্ধবিকশিত শতদলের মত প্রফুল্ল ও বিমল হাস্য রেখা বিভাসিত কমনীয় বদনের শোভা দর্শনেও প্রীতি ও প্রেমের আকর্ষণ কেমন করিয়া ছেদন করিলে সন্ন্যাসী? সে যে আর তোমা বই জানিত না।

সে যে শয়নে স্বপনে তোমাকেই ধ্রুবতারা জ্ঞান করিত। হায়! কঠোরহৃদয়, সমুদয় ভুলিলে? ঐ দেখ সোণার শিশু হাসিমুখে নিদ্রামগ্ন, একবার কি এই স্বর্গীয় কুসুমটিকে বক্ষে তুলিয়া লইতেও হৃদয় কাঁপিল না? কেমন করিয়া পদদ্বয় অগ্রসর হইল? বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন,—পুত্রগত প্রাণ শুদ্ধোদন—একমাত্র আশা—একমাত্র অবলম্বন তুমি, বড় আশায় সে যে দিন কাটাইতেছিল, এই কি তাঁহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান? হায়! স্নেহ-শালিনী জননী—তাঁহাকেও ভুলিলে? ধন্য তুমি, ধন্য ভারত-মাতা, তাই এমন ত্যাগী রাজসন্ন্যাসীকে বক্ষে ধারণ করিতে পারিয়াছিলে!

পাঠক! অই দেখ, নীরব নিশীথে ত্যাগী সন্ন্যাসী জগতের মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া, মানবের হিতার্থ আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিলেন। আমি ভাবিতেছিলাম, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, মনের মধ্যে কেবল জাগিতেছিল, ত্যাগী পুরুষের অলৌকিক জীবনের সার্থকতা।

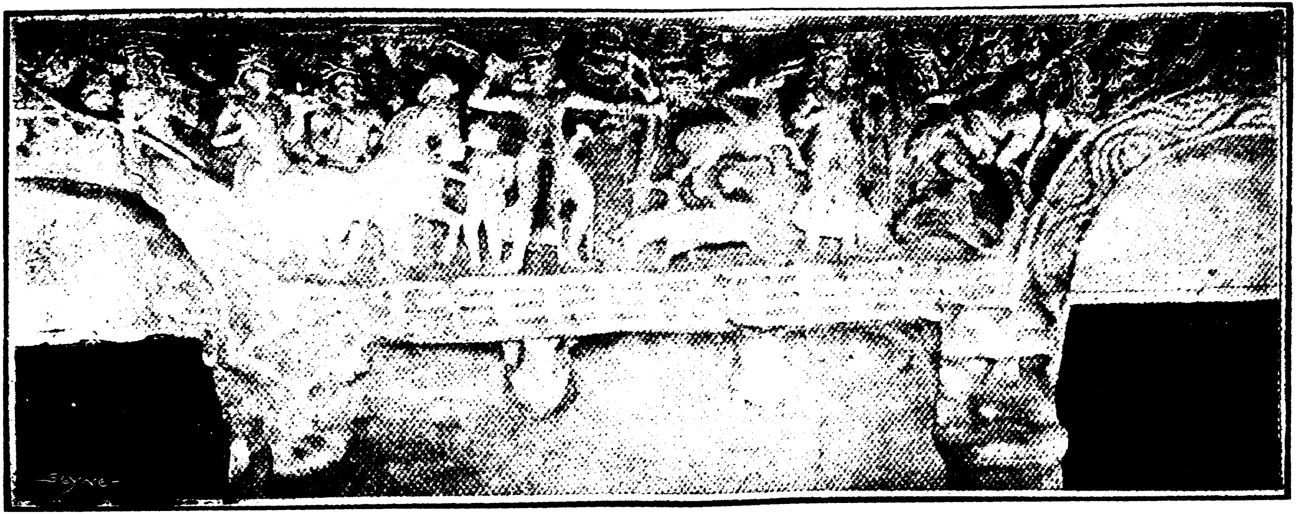
জয়া-বিজয়া গুম্ফা।

স্বর্গপুরী গুম্ফার পার্শ্বেই এই ক্ষুদ্র গুম্ফা দুইটি অবস্থিত। বিশেষত্ব কিছুই নাই, তবে এই গুম্ফার মধ্যে একটী বোধিবৃক্ষ ও তাহার দুইদিকে দুইটি ধ্যানপরায়ণ মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। স্বর্গপুর গুম্ফার ও জয়াবিজয়া গুম্ফার নিকটে মাণিকপুর, বৈকুণ্ঠ, পাতালপুর, যমপুর, মর্ত্ত্যলোক, দ্বারকাপুর প্রভৃতি বহুতর গুম্ফা বিরাজিত রহিয়াছে। এ সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

বৈকুণ্ঠপুর গুম্ফা।

ইহাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর গুম্ফার ও যমপুর-গুম্ফার নাম উল্লেখ-যোগ্য বিবেচনা করি। রাণীনূরগুম্ফার মত বৈকুণ্ঠ-পুর-গুম্ফাও দ্বিতল, ইহার উপরাংশের নাম বৈকুণ্ঠ ও নিম্নাংশের নাম পাতালপুর, পাতালপুরের সন্নিকটে যমপুরগুম্ফার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈকুণ্ঠপুর-গুম্ফার উপরে পালি ভাষায় লিখিত খোদিতলিপির অর্থ প্রিন্সেপ (Princep) সাহেব এইরূপ করিয়াছেন, "ভিক্ষুগণের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে কলিঙ্গ-নৃপতিবৃন্দ এই গুম্ফা সকল প্রস্তুত করিয়াছেন।"

পর্ব্বতের উচ্চতম প্রদেশে হস্তিগুম্ফা নামক একটী বড় রকমের গুম্ফা আছে, ইহা পর্ব্বতের একটী স্বাভাবিক গুহাকে কাটিয়া বড় করা হইয়াছে;



রাণীগুম্ফার শিকার-দৃশ্য—খণ্ডগিরি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

একটী অতি প্রাচীন শিলালিপির নিমিত্তই এই গুম্ফা বিশেষ বিখ্যাত।

হস্তিগুম্ফা ও তাহার খোদিত লিপি।

এই গুম্ফায় কোনরূপ শিল্পচাতুর্য্য বিদ্যমান নাই, কেবল তিনটি কক্ষ এবং গৃহের সমক্ষে একটী বারাণ্ডা আছে। এই গুম্ফার নিকট হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—অতি দূরে দূরে দুই একটা অনুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, আর কেবল সুবিস্তৃত বনরাজিনীলা কাননকুন্তলা ধরণী সুন্দরীর উচ্ছৃঙ্খল স্তরে স্তরে বিভক্ত সুষমাসম্পদ। বর্ত্তমান সময়ে শিলালিপির অক্ষরগুলি অধিকাংশ স্থলেই অস্পষ্ট এবং কোন কোন স্থান একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ কিটো সাহেব ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার একটী প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য ইহার প্রাচীনত্ব ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। এই লিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, কলিঙ্গদেশে ক্ষমতাবান্‌ ঐর নামক একজন নরপতি ছিলেন; তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন; বারাণসীতে তিনি বহু স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সৈন্য, অশ্ব, গো, মেষ মহিষাদি অসংখ্য ছিল এবং সর্ব্বদা তাহাদিগের দ্বারাই বেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার বাহন এক অতি বৃহদাকারের হস্তীর নাম ছিল "মহামেঘ।" ইনি কলিঙ্গরাজ্য জয় করিয়া, নূতন রাজধানী স্থাপনান্তর রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষ সময়ে পর্ব্বত নামক জনৈক নৃপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি মগধের নরপতি নন্দরাজকে রণে পরাজিত করিয়া, সেখানে নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন ও ধর্ম্মমণ্ডলীর নিমিত্ত ভূমধ্যে স্তম্ভশোভিত চৈত্য ও সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করেন। এই মহানুভব নরপতি কর্ত্তৃকই হস্তিগুম্ফা প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই খোদিত লিপি হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, এই হস্তিগুম্ফা খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩১৬ হইতে ২১৬ বৎসরের মধ্যে ঐর নৃপতি রাজত্ব করেন এবং তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন গুম্ফা পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

এই গুম্ফার পার্শ্বে ব্যাঘ্রগুম্ফা ও সর্পগুম্ফা নামক দুইটী ক্ষুদ্র গুম্ফা,

ব্যাঘ্রগুম্ফা ও সর্পগুম্ফা।

দেখিতে বেশ সুন্দর। ব্যাঘ্রগুম্ফাটি দেখিলে মনে হয়, যেন একটি ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এই বৃহৎ ব্যাঘ্রমুণ্ডের নাসিকা, দন্তপাটি, চক্ষু অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে

খোদিত। সর্পগুম্ফার মাথায় একটি ত্রিশির অজগর সর্পের মস্তক খোদিত। ইহা ব্যতীত পাবনগুম্ফা, ভজনগুম্ফা, অলকপুরগুম্ফা প্রভৃতি আরও কয়েকটি গুম্ফা আছে।

যে ভারতবর্ষে এই ত্যাগী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, নিতান্ত আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে যে, সেখানে তাঁহার ধর্ম্মের প্রখরজ্যোতি নির্ব্বাপিত প্রায়। সুদূরের চীন, জাপান ও তিব্বত তাঁহার আদর করিল, কিন্তু ভারতে তাঁহার আদর হইল না, শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ই বোধ হয় ইহার মূল কারণ।

আমরা গুম্ফাগুলি দর্শনান্তর পুনরায় ভুবনেশ্বরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। ধীরে ধীরে গিরিদ্বয় আমাদের পশ্চাতে সরিয়া যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে দুইপাশে বনশূন্য বৃক্ষশূন্য বালুকাপ্রস্তরময় ভূমি, স্থানে স্থানে বেতের ঝোপে ও বেণুবনের ঝোপে খস্ খস্ ফিস্ ফিস্ শব্দ হইতেছিল। যখন আমরা ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম, তখন চারিদিকে অপরাহ্নের মৃদুভাব ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল; আম্রবনে ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি বাঁশীর মত বাজিতেছিল। মনের সুখে পাখীগুলি শাখায় শাখায় গান গাহিয়া, মন প্রাণ মাতাইয়া তুলিতেছিল।

কটক।

সেদিন রাত্রির গাড়ীতেই ভুবনেশ্বর হইতে কটক আসিলাম। কটক অতি প্রাচীন সহর। যেস্থানে বিপুলকায়া মহানদী ও কাঠজুড়ি দ্বিধারা হইয়া দ্বীপাকারে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে—সেই স্থানে এই নদী দুইটির সঙ্গমস্থলে বিখ্যাত কটক নগর অবস্থিত। কেশরীবংশীয় রাজা নৃপতি কেশরীর রাজত্ব সময়ে (৯৪০—৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ভুবনেশ্বর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া কটক নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে কটক ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভবগুপ্ত কটকে রাজত্ব করেন, তাঁহার অনুশাসন পত্রেও কটকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় যে এই নরপতির রাজত্ব সময়েও কটক নগরের অস্তিত্ব ছিল। বর্ত্তমান কটক নগরের তিন মাইল দূরে চৌদ্বার নামক একটী গ্রাম আছে তাহাকে জনসাধারণ কটক চৌদ্বার নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উৎকল পঞ্জীপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় এই নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে ভবগুপ্তের অনুশাসনোক্ত কটকচৌদ্বারই হইবে।

কটকের প্রাচীন ইতিহাস।

পূর্ব্বে যে এস্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রাচীন নগরের নিকট গঙ্গাবংশীয় মহারাজা চোর গঙ্গার সময়ের নির্ম্মিত কপালেশ্বর নামক একটী দুর্গ জীর্ণদেহে বিরাজমান থাকিয়া প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। রাজা চোরগঙ্গা এই দুর্গ মধ্যে একটী বৃহদাকারের সরোবর খনন করাইয়াছিলেন—সেই জলাশয়কে এখনও স্থানীয় অধিবাসীবর্গ চোরগঙ্গার পুকুর কহিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রতি বৎসরই মহানদী ও কাঠজুড়ির জলপ্লাবনে কটক নগরবাসী ব্যক্তিবর্গের বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত। এই বন্যার আক্রমণ হইতে নগর সুরক্ষিত করিবার জন্য ৯৫৫।৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশরী বংশোদ্ভব মহারাজা মর্কর কেশরী কাঠজুড়ি, মহানদীর নিকট হইতে যে স্থানে

পৃথক্ হইয়াছে সে স্থানে কাঠজুড়ির প্রসিদ্ধ বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই বাঁধ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল এবং উচ্চতায় ২৫ ফিট, বলা বাহুল্য যে ইহা প্রস্তর নির্ম্মিত। বাঁধের দৃঢ়তা বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও অক্ষত দেহে ইহা বিরাজিত থাকিয়া কটক সহরকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়া প্রাচীন ভারতের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে।

কাঠজুড়ির বাঁধ বা Anicut।

কটকে একটী প্রাচীন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম বড়বাটী দুর্গ। এই দুর্গ মহারাজা অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয় ও পরে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ সাহের শাসন সময়ে ইহার উত্তর পশ্চিম দিকের প্রাকার ও পূর্ব্বদিকের তোরণ দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, ইহার চতুর্দ্দিকে পরিখা এবং একটী উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে, পূর্ব্বে এই স্তম্ভের উপরে বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান থাকিত। আইন-ই-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পূর্ব্বে এখানে নৃপতি মুকুন্দদেবের নয়তালা অতি সুন্দর ও উচ্চ প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল,— কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার সামান্য কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই। দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ সুবিস্তৃত প্রান্তরকে বড়বাটীর প্রান্তর কহে। আইন-ই-আকবরীতে মুকুন্দদেবের নির্ম্মিত নয়তালা প্রাসাদের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে "ইহার সর্ব্বনিম্ন তলায় হস্তী অশ্ব ও উষ্ট্রাদি বাস করে, দ্বিতলে যুদ্ধসংক্রান্ত সমুদয় দ্রব্যাদি তাহার রক্ষকগণ, তৃতীয় তলায় প্রহরী এবং অনুচরবর্গের বাসস্থান, চতুর্থতলায় শিল্পীগণ, পঞ্চম তলায় রন্ধন-শালা, ষষ্ঠতলে রাজসভা, সপ্তম তলে গোপনীয় রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত, অষ্টম তলে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ অর্থাৎ অন্দর মহলরূপে ব্যবহৃত হইত এবং নবম তলায় মহারাজা স্বয়ং বাস করিতেন আবুল ফজলের এই বর্ণনা হইতে অনুমান হয় যে তিনি ইহার সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবগত ছিলেন।* জয়পুরে এবং বিজাপুরে সপ্ততল প্রাসাদ এখনও বিদ্যমান আছে, ফতেপুর সিক্রীতেও

কটকের দুর্গ।

* 'Ayeen Akbery,' Gladwin's translation, Vol. II, p. 13.

পঞ্চতল প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু নয়তল অট্টালিকা ভারতের কোন স্থানেই দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ফার্গুসন সাহেবও লিখিয়াছেন, "There are seven storied palaces at Jeypur and Bijapur still standing, which were erected about this date, and one of five stories in Akbar's own palace at Futtehpur Sikri, but none, so far as I know, of nine stories, though I see no reason for doubting the correctness of the description of the one just quoted." (Ferguson's History of Indian and Eastern Architecture, p. 434.)

কটক নগরী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। ইহার রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত এবং বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারা পরিশোভিত। বর্ত্তমান সময়ে কটকের প্রাচীন দুর্গে ইংরেজ-সেনা-নিবাস অবস্থিত। কটকে মেডিকেল স্কুল, সার্ভেস্কুল এবং রাভেন্স কলেজ নামক একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে এম্, এ, পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। সমগ্র ওড়িষ্যা প্রদেশে কেবল এই একটী মাত্র কলেজ। রাভেন্স নামক একজন ভূতপূর্ব্ব ইংরেজ কমিসনারের নামানুসারে এই কলেজের নাম রাভেন্স কলেজ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় বালক বালিকাগণের শিক্ষার নিমিত্তও একটী বিদ্যালয় আছে, সেখানে দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সন্তানেরাও শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

স্থানীয় হাসপাতালের কিছুদূরে একটী সুবৃহৎ লৌহের কারখানা আছে। রেলওয়ের এবং গভর্মেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের লৌহ-নির্ম্মিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এই কারখানা হইতেই সরবরাহ করা হয়। কলের সাহায্যে বড় বড় লৌহখণ্ড কিরূপ ভাবে দেখিতে দেখিতে কর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই কারখানার নিকটেই বাঁধদ্বারা মহানদীর প্রচুর পরিমাণে জল আবদ্ধ রাখিয়া হ্রদের মত করা হইয়াছে,—অনেকে এখানে প্রাতে ও অপরাহ্ণে ভ্রমণ করিতে আগমন করেন। বাঁধের অপর দিকে মহানদীর সুবিস্তৃত বালুকাময় কলেবর, দুই এক স্থানে কেবল ক্ষীণ ধারা মৃদু-গতিতে প্রবাহিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

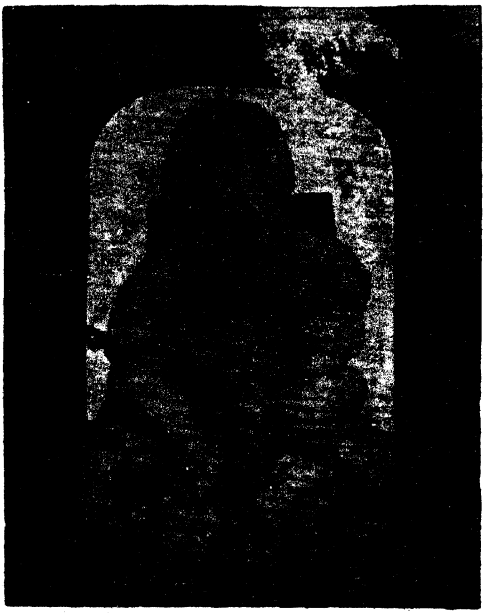
তুলসীপুর, রাজার দেবমন্দির, অশ্ব-শালা, শিল্পকার্য্য ইত্যাদি।

তুলসীপুর নামক পল্লীই কটকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। এস্থানে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ, জমিদার এবং ওড়িষ্যার কমিশনার বাস করিয়া থাকেন। পল্লীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুদৃশ্য। কটকে বাজারের সংখ্যা খুব বেশী, তন্মধ্যে বালু বাজার, বক্সি বাজার, নয়া-সড়ক বাজার, তৈলঙ্গ-বাজার এবং বাখরাবাদ প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। এস্থানে প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের মধ্যে গোপালজী, রঘুনাথজী এবং কটক-চণ্ডীর মন্দিরই বিখ্যাত। কটক-চণ্ডী—কটকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাসন সময়ে ইনি দুর্গমধ্যে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। এই তিনটি হিন্দুদেবমন্দির ব্যতীত শঙ্করাচার্য্যের মঠ, শিখদের মঠ, বৈষ্ণবদের মঠ, জৈন-মন্দির প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাখার বহু মঠ আছে, প্রত্যেক মঠেই বহু সাধু সন্ন্যাসী এবং বিগ্রহাদি আছে। মহারাষ্ট্রীয়দের রাজত্ব সময়ে তাহারা এ স্থানে যে দুর্গ এবং অশ্বশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা এখনও আছে। অশ্বশালার ছাদ খিলান করা এবং স্তম্ভের উপর স্থাপিত, ইহাতে কড়ি বর্গার কোনওরূপ সংস্রব নাই, বর্ত্তমান সময়ে এই অশ্বশালায় রিজার্ভ পুলিশগণ বাস করে। কটকের শিল্পকার্য্য বিশেষ বিখ্যাত। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপরে অতি সুন্দর কার্য্য করা হয়,—সে নিমিত্তও ইহা বিশেষ বিখ্যাত। হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্যাদিও বহুপরিমাণে নির্ম্মিত হয়। কটকের অনতিদূরে বাড়ম্বা ও তিগড়িয়া নামক স্থানের প্রস্তুত রেশমী ধূতি, উড়ানি, সাটি এবং মানিয়াবন্দী বস্ত্র কটকে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এখানকার কাঠের কার্য্যও বেশ সুন্দর। কটক সহরে মুসলমানদের একটী বৃহৎ মস্‌জিদ এবং খ্রীষ্টানদের তিনটী গির্জ্জা এবং একটী অনাথাশ্রম আছে। কটক সহরে অনেক বাঙ্গালী বাস করেন, আবার অনেকে স্বাস্থ্য লাভার্থও আগমন করিয়া থাকেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর কৃপায় এখন আর কটক আসিতে কোনওরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। যাঁহারা তীর্থার্থে পুরী যান, তাহাদেরও ফিরিবার পথে একবার এখানে অবতরণ করিয়া—ওড়িষ্যার প্রাচীন রাজধানীর প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দর্শন করিয়া যাইতে পারেন।

যাজপুর।

কটক হইতে যাজপুর ৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা হিন্দুতীর্থ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। যাজপুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর,—ওড়িষ্যার সোমবংশীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতি নামক নরপতি কর্ত্তৃক এই স্থানে ওড়িষ্যার রাজধানী স্থাপিত হয়—এ নিমিত্তই প্রাচীন তাম্রশাসনে ও শিলালিপি ইত্যাদিতে ইহার নাম 'যযাতি' নগর দৃষ্ট হয়। বৈতরণী নদীর দক্ষিণকূলে যাজপুর নগর অবস্থিত। যাজপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তী এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কালে বৈতরণীর দক্ষিণতটে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার নাম যজ্ঞপুর হয়, ক্রমশঃ ঐ যজ্ঞপুর শব্দ অপভ্রংশ হইয়াই যাজপুর হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এস্থানে মহকুমা হওয়ায় পূর্ব্ব গৌরব বৈভব একেবারে পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাজ যযাতিকেশরী নামক কেশরীবংশীয় নরপতি ওড়িষ্যা জয় করিয়া ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে যাজপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এস্থানের যজ্ঞক্ষেত্র, গদাক্ষেত্র, বিরজাক্ষেত্র, নাভিক্ষেত্র, প্রভৃতি বহু হিন্দুতীর্থ বিরাজিত আছে। পৌরাণিক কিম্বদন্তী এইরূপ যে, গয়াসুর যখন বিষ্ণুর চরণতলে দেহ বিস্তার করিয়াছিল, সে সময়ে তাহার মস্তক গয়াক্ষেত্রে এবং নাভিদেশ যাজপুরে সংস্থিত হয়—সেইজন্য ইহাকে নাভিতীর্থ কহে। আবার অপর পুরাণের মত এই যে, মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া যখন নানা স্থানে উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ডিত হইবার সময় ভগবতীর নাভিদেশ পতিত হওয়ায়, ইহার নাম নাভিক্ষেত্রও হইয়াছে। যাজপুরে পূর্ব্বে বহু সুন্দর সুন্দর হিন্দু দেব দেবীর মন্দির ও বিগ্রহাদি ছিল, কিন্তু ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী বিখ্যাত কালাপাহাড়ের সহিত যাজপুরের নিকট তৎকালীন ওড়িষ্যার নরপতি মুকুন্দদেবের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ওড়িষ্যার স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হয় এবং ওড়িষ্যাবাসিগণ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে। মহারাজা যযাতি-

পৌরাণিক কিম্বদন্তী ও ইতিহাস।



বারাহীদেবীর মূর্ত্তি।

কেশরী ও তাঁহার পরবর্ত্তী অন্যান্য নৃপতিগণের বহু হিন্দু মন্দিরাদি কালাপাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন, এবং বহু হিন্দুবিগ্রহ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া বৈতরণীর জলে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল। কত ধর্ম্ম বিদ্বেষিগণের প্রবল নির্য্যাতন যে হিন্দু দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে— তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে, কিন্তু তথাপি এই প্রবল সত্যধর্ম্ম—ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া শুভ্রতুষারমুকুটমণ্ডিত হিমাদ্রির উচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় আপনাকে অটল ও অচল ভাবে সেই অনন্তের মহান্ গৌরবময় পথপ্রদর্শকরূপে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কালাপাহাড়ের ভীষণ অত্যাচারের পর হইতেই প্রাচীন সৌন্দর্য্যশালিনী যাজপুর নগরী শ্রীভ্রষ্টা। বর্ত্তমান ডাকবাংলার নিকট

দেবমন্দির সমূহ।

সৈয়দ আলিবুখারির সমাধি স্থান, ইনি কালাপাহাড়ের পাঠান সেনাপতি ছিলেন, কথিত আছে যে, একটী হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া এই সমাধিটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৈতরণীর তীরে এখনকার

প্রসিদ্ধ দেবমন্দির বরাহ নাথের মন্দির, অষ্টমাতৃকার মণ্ডপ ও বিরজা দেবীর মন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বৈতরণীর তটবর্ত্তী দশাশ্বমেধ ঘাট এস্থানের প্রাচীনত্বের বিশেষ নিদর্শন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, ব্রহ্মা এস্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে বঙ্গদেশে যেরূপ বৈদ্যকুলোদ্ভব সেনবংশীয় রাজা আদিশূর কনৌজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা যযাতিকেশরী দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট কনৌজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট হইতে নগরের দক্ষিণ দিকে সোজাসুজি প্রায় ২॥ মাইল গমন করিলে বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকট পঁহুছিতে পারা যায়। ইহা একটী বিখ্যাত পীঠস্থান। মন্দিরাভ্যন্তরে পাষাণময়ী ক্ষুদ্রকায়া দেবী অবস্থিতা আছেন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ১০০ × ৭০ ফুট একটী পুরাতন পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে, ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড। বিরজাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪০০ চারি শত ফুট। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ এই মন্দিরটিকে সোমবংশীয় নরপতিগণের সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন। যাজপুরের এ সকল দেব মন্দির সমূহের প্রাচীনত্ব অনুমান করা সুকঠিন; কারণ চূণ বালির গাঢ়তর আবরণ মন্দির গুলির উপর থাকায়—প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন ইত্যাদি দৃষ্টে ইহাদের বয়স অনুভব করা অসম্ভব। ফার্গুসন সাহেব বলেন "Jajepur, on the Bytarni, was one of the old capitals of the province, and even now contains temples which, from the squareness of their forms, may be old, but, if so they have been so completely disguised by a thick coating of plaster, that their carriages are entirely obliterated, and there is nothing by which their age can be determined." (Fergusson's Indiaan and Eastern Architecture, p. 243.) বিরজাদেবী অষ্টভুজা এবং অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিতা। জগমোহন মণ্ডপে একটী হোমকুণ্ড ও

বিরজার মন্দির।

উহার বহির্ভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত চত্বরে বদ্ধ একটী যূপকাষ্ঠে প্রত্যহ পশুবলি হইয়া থাকে। মন্দিরের অনতিদূরে উত্তর ভাগের একটী কক্ষ মধ্যে পাঁচ ফুট ব্যাসের একটী কূপ নাভিগয়া নামে প্রসিদ্ধ, সে স্থানে তর্পণ করিয়া পিতৃমাতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে পিণ্ড ঐ কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়।

চণ্ডেশ্বরস্তম্ভ, কীর্ত্তিস্তম্ভ বা শুভস্তম্ভ।

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে কিছুদূরে যাজপুরনগরের প্রায় এক মাইল দূরে চণ্ডেশ্বর নামক গ্রামে একটী স্তম্ভ আছে, ইহাকে কেহ চণ্ডেশ্বরস্তম্ভ, কেহ শুভস্তম্ভ, কেহ গরুড়স্তম্ভ কেহবা কীর্ত্তিস্তম্ভ কহিয়া থাকেন। স্তম্ভটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বিদ্যমান আছে। বহুযাত্রী এই স্তম্ভটি দেখিতে আসে বলিয়া সম্প্রতি গ্রামবাসিগণ একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্থানটি বড়ই বিজন,—লোক সমাগম বিহীন। স্থানীয় লোকে ইহাকে 'সভাস্তম্ভ' কহিয়া থাকে। উহা লম্বে প্রায় ৩৬ ফুট ১০ ইঞ্চ স্তম্ভটির নিম্নভাগ হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ৯ ফুট অবশিষ্টাংশ চূড়াদেশ। পূর্ব্বে ইহার উপরে একটি গরুড় মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, ছিল, এখন স্তম্ভের উপরিস্থিত সেই গরুড় মূর্ত্তি চণ্ডেশ্বর গ্রাম হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল দূরে এক ঠাকুর বাড়ীতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার মূল-দেশস্থ একটী ছিদ্র দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, পাঠানগণ দড়ি বাঁধিয়া টানিবার নিমিত্ত এই স্তম্ভে ছিদ্র কাটিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে ইহা ব্রহ্মার অশ্বমেধ যজ্ঞের স্তম্ভ, আবার কেহ কেহ এইটিকে সোমরাজবংশীয় নৃপতিবর্গের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া কহেন। যে যাহাই বলুক, প্রকৃত ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই,—কখনও কেহ পারিবেন কিনা তাহাও বিশেষ সন্দেহ স্থল। মুসলমানগণ এই স্তম্ভটিকে ধ্বংস করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কোন কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইহার শিরোদেশস্থ শিল্প কার্য্যাদি দর্শনে ইহাকে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। উহার উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত গরুড় মূর্ত্তি সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীযুগে বৈষ্ণব বংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ মহাত্মা ফার্গুসন সাহেব এই স্তম্ভটীর

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—" * There is one pillar, however, still standing * * * as one of the most pleasing examples of its class in India. Its proportions are beautiful and its details in excellent taste; but the mouldings of the base, which are those on which the Hindus were accustomed to lavish the utmost care, have unfortunately been destroyed. Originally it is said to have supported a figure of Garuda —the Vahana of Vishnu and a figure is pointed out as the identical one. It may be so, and if it is the case, the pillar is of the 12th or 13th century." (Fergusson's Indian and Eastern Architecture, p. 432). যাজপুরের নিকটস্থ নরপড়া নামক একটী গ্রাম আছে, সেস্থানেও একটী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ সমাধি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসিগণ ইহাকে মহারাজা যযাতিকেশরীর প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ বলিয়া অনুমান করে,—এখনও ইহার প্রকৃত বিবরণ কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। যাজপুরের তিতুলামাল নামক গ্রামে আঠারনালার সেতুর গঠনাকৃতি একাদশ খিলান-যুক্ত একটী সেতু দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাও অত্যন্ত প্রাচীন; কয়েক বৎসর হইল,

শান্ত মাধব ও অগ্নীশ্বর।

যাজপুর মহকুমা হইতে প্রায় ১॥ মাইল পশ্চিমে একটী মাঠের মধ্য হইতে শান্ত মাধব নামক এক বৃহৎ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি তিনখণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শীর্ষদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত ৯ ফুট ১॥ ইঞ্চ এবং উরু হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত ৭ ফুট ১১ ইঞ্চ লম্বা। এই মূর্ত্তির এক হস্তে পদ্ম এবং চূড়ার উপরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেকে পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে এই মূর্ত্তিটি এবং ইহার সহিত আরও কয়েকটি মূর্ত্তি স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীর মধ্যে রক্ষিত আছে।

যাজপুরের কিছুদূরে অগ্নীশ্বর নামক একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, স্থানীয় জনসাধারণে প্রতিদিন ইহার গাত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়

বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমরা যাজপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে বৈতরণী তটস্থ বরাহনাথের মন্দির ও অষ্টমাতৃকার মণ্ডপ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব, পূর্ব্বেই বিরজা দেবীর মন্দির ও দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই দেব মন্দির খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজা প্রতাপ রুদ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ স্থানে গো-দান করিলে আর বৈতরণী পারের ভয় থাকে না। এখন গো-দানের পরিবর্ত্তে মূল্য স্বরূপ পঞ্চমুদ্রা দান করিলে গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। বরাহনাথের মন্দিরের পাদদেশেই বৈতরণীর তীরে দশাশ্বমেধঘাট অবস্থিত।

বরাহনাথের মন্দির।

বৈতরণীর অপর তটে অষ্টমাতৃকার মণ্ডপ অবস্থিত। এস্থানে আটটী পাষাণ নির্ম্মিতা দেবীমূর্ত্তি বিরাজিতা আছেন। এই মূর্ত্তি সমূহ সাধারণ মনুষ্যাকৃতি অপেক্ষা অনেকটা উঁচু, নীলবর্ণ প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত তাহাদের গঠন নৈপুণ্যের মধ্যে শিল্পচাতুর্য্য অনুভূত হয়। ইন্দ্রানী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ব্রাহ্মণী, বারাহী, চামুণ্ডা ও ছায়া এই অস্ট মূর্ত্তি মণ্ডপ মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন। এতদ্ব্যতীত বৈতরণী নদীর তীরে কালী, শচী, বিমলা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী প্রভৃতি বহু দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যাহারা পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেন, তাঁহারা সকলেই যাজপুরের এ সমুদয় দেব মন্দিরাদি দর্শন করিয়া যাইতেন, কিন্তু রেল হওয়ার পর হইতে এ স্থানে যাত্রিসংখ্যা খুব কম হয়। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদের অবসর ও সুযোগ মিলিলে এ সকল হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ অতি অবশ্য দর্শন করা উচিত।

অষ্ট মাতৃকার মণ্ডপ।

পৌরাণিক মতে যাজপুর অত্যন্ত পৌরাণিক তীর্থ। মহাভারতেও লিখিত আছে যে, পঞ্চ পাণ্ডবগণ এ স্থানে তীর্থোদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন* ইহাই পুরাণের বিরজাক্ষেত্র। কপিল সংহিতায় ও ব্রহ্মপুরাণে এ স্থানের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে লিখিত আছে। স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

* মহাভারত বন পর্ব্ব (১১৪ অধ্যায়)।

বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং করোতি বৈ।
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতনাং নাত্র সংশয়ঃ॥
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠা বিরজে যে কলেবরম্।
পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ॥ (ব্র, পু, ৪২ অ,)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই বিরজা ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করে, সে ব্যক্তি তাহার পিতৃলোকের অক্ষয় সন্তোষ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় এবং যে ব্যক্তির এস্থানে মৃত্যু হয়, সে অনায়াসে মোক্ষলাভ করে। কপিল সংহিতায়ও এইরূপ খ্যাতি লিপিবদ্ধ আছে। অতএব তীর্থ হিসাবেও যাজপুরের প্রতিপত্তি কম নহে।

আমরা যাজপুর দর্শনান্তে আবার মাতৃভূমির শ্যাম স্নিগ্ধ স্নেহাঞ্চলে ফিরিয়া আসিলাম। ওড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তি সমূহ দর্শনে হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার প্রয়াস বৃথা। ভারতের যাহা কিছু প্রাচীন এবং শিল্প কারুকার্য্যসম্পন্ন তাহাই দেবোদ্দেশে নির্ম্মিত, ইহা অপেক্ষা ভারতবাসীর ধর্ম্ম প্রবণতার আর কি অধিক পরিচয় হইতে পারে জানি না। বর্ত্তমান সময়ে বাষ্পীয় শকটের অনুগ্রহে ওড়িষ্যা অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষ ওড়িষ্যা-ভ্রমণে বহু ব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই ইহা করায়ত্ব। ওড়িষ্যাবাসীদিগকে 'উড়ে এক জন্তু' এই ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমরা নিজ জাতিয় সংকীর্ণতার পরিচয় দিলেও—এককালে যে ইহারা কতদূর উন্নত ও বীরজাতি ছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গ মাত্রই অবগত আছেন। ওড়িষ্যাবাসীদিগকে ঘৃণা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহাদের যাহা আছে, তাহা আমাদের নাই। একখণ্ড সামান্য প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে যে অপূর্ব্ব শিল্প-নিপুণতা ও মৌলিকতা আছে সারা বাঙ্লা দেশেও তাহা দুষ্প্রাপ্য। প্রাচীন ভারতের অতুল শিল্পৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার যে কত বৃহৎ কত উন্নত ও কত সমৃদ্ধিশালী ছিল, পাঠক! যদি তাহা অনুভব করিতে চাও, তবে ওড়িষ্যায় যাও। যাহা দেখিবে তাহাতেই বিমুগ্ধ হইবে। ওড়িষ্যার একাম্রকাননের যে সমুদয় মন্দির জঙ্গলাকীর্ণ ও পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে যদি তাহার একটাও বঙ্গদেশে থাকিত তাহা হইলে

আমরা গৌরব অনুভব করিতাম। ওড়িষ্যায় যাহা দেখিয়াছি তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়াছি। যাহারা এ সকল অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা আজ কোথায়? কত চিন্তা, কত অর্থব্যয় ও কত খ্যাতনামা শিল্পিগণের গৌরব বৈভব প্রতি মন্দিরের প্রতি কার্ণিসে প্রতি প্রস্তরগাত্রে খচিত তাহা কে বলিতে পারে? যাহারা ওড়িষ্যার এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে হাণ্টার সাহেব, ফার্গুসন সাহেব, ষ্টার্লিং সাহেব ও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের পুস্তকাবলী পাঠ করা উচিত, তাহা হইলে দর্শনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। ওড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যেরূপ প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি সমূহ এখনও বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা হিন্দুমাত্রেরই দেখিবার এবং গৌরব করিবার স্থল। যুগযুগান্তের নানারূপ পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে তাহা দেখিবার কাহার না সাধ হয়? আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, একথা ওড়িষ্যায় আসিলে সহজে যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, অন্যত্র কোথাও সেরূপ হয় না। আশা করি, যাহারা ওড়িষ্যাদেশবাসীদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহারা ইঁহাদের প্রাচীন শৌর্য্য বীর্য্য ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিপুণতার কথা চিন্তা করিয়া সেই সংকীর্ণ বুদ্ধি বিস্মৃত হইবেন। যে জাতি আজ এত পতিত ও অবনত তাহাদের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরব-কাহিনী-পাঠে জ্ঞানীও ব্যথিতের অশ্রুজল ও সহানুভূতি আসাই স্বাভাবিক,—ঘৃণা নহে।

দাক্ষিণাত্য।

ওয়ালটেয়ার।

এবার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণোদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ভারতের রাজধানী প্রাসাদময়ী কলিকাতা নগরীতে উপনীত হইলাম।

যাত্রা।

এস্থানে শারীরিক ক্লান্তি দূরীকরণার্থ দিন কয়েক বিশ্রাম করিয়া এক নিদাঘ নিশীথে ওয়ালটেয়ার যাত্রা করিলাম। রোগ-জীর্ণ বাঙ্গালীর পক্ষে ওয়ালটেয়ার এখন তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছে; সমুদ্র-বায়ু ফুস্‌ফুসের দোষ নষ্ট করে বলিয়া ডাক্তারদের পরামর্শে বহু ফুস্‌ফুস্ রোগাক্রান্ত রোগী স্বাস্থ্যলাভার্থ এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পর্ব্বতবেষ্টিত এই স্থানটি নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্যও যেরূপ লোক-লোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে; রোগ-কাতর ব্যক্তিকে পুনরায় স্বাস্থ্যসুখ প্রদান করিতেও তদ্রূপ মুক্তহস্ত। সাগরের ভীমমন্দ্র, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, উজ্জ্বল তপনালোকে চতুর্দ্দিকের হসিত সৌন্দর্য্য, সত্য সত্যই নবাগত পথিকের নিকট সহসা এক স্বপ্নময় দেশের মোহাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। মদ্রদেশের সীমান্ত প্রদেশে ওয়ালটেয়ার বর্ত্তমান সময়ে সৌন্দর্য্যে ও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। একাধারে সমুদ্রের ও গিরিশ্রেণীর মনোমোহন সৌন্দর্য্য অতি অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা হইতে ইহা ৫৪৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সুদীর্ঘ পথ ২০ বিশ ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে হয়। ওয়ালটেয়ার মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভিজিগাপাটাম ডিষ্ট্রীক্টে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ার যাইবার পথিপার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী মনোরম। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির লোচনানন্দদায়ক সৌন্দর্য্য রেলপথে গমনাগমন কালে যেরূপ পূর্ণভাবেউপলব্ধি করা যায়, অন্যত্র সেরূপ বৈচিত্র্যতার সহিত তাহা অনুভূত হয় না।

ওয়ালটেয়ারের পথটি সুদীর্ঘ হইলেও প্রকৃতি সুন্দরীর অযত্ন বিন্যস্ত সৌন্দর্য্য নিচয়ের প্রভাবে তাহা পথিকের বিরক্তি উৎপাদন

পথের বর্ণনা।

না করিয়া বরং ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের ন্যায় অচিন্ত্যনীয় শক্তির সাহায্যে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলে। এ পথে বহু নদ ও নদী পার

হইতে হয়। সকল নদীর কলেবর যে সমান তাহা নহে। বিশালকায় রূপনারায়ণের রজত-সলিল-প্রবাহ রেলওয়ে ব্রিজের উপর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়। ক্রমে আমরা বঙ্গদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতের অতীত গৌরব-মহিমামণ্ডিত ভাস্করকার্য্যের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্থল ওড়িষ্যায় আসিয়া উপনীত হইলাম। বালেশ্বর ও ভদ্রক ষ্টেসন অতিক্রম করিবার পর হইতেই নবীন তপনের কনক-কিরণ-রঞ্জিত বৃক্ষ-রাজি সমাকীর্ণ দূরস্থিত নীলগিরিশ্রেণী আমাদের নয়ন-মন বিমোহিত করিতে লাগিল।

ভদ্রক।

ভদ্রক সহর সালন্দী নদীর তটে অবস্থিত। ভদ্রকালী দেবীর নাম হইতে এই নগরের নাম ভদ্রক হইয়াছে। এস্থানের জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর; ওড়িষ্যাবাসিগণ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এস্থানে আসিয়া থাকেন। এই সহরে অতি সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ভদ্রকের ভদ্রকালীর মন্দির ও গোপালজিউর মঠ ওড়িষ্যার তীর্থ যাত্রিগণের নিকট অবশ্য দর্শনীয়। অতঃপর আমরা স্বনামখ্যাতা বৈতরণী নদী তটে অবস্থিত যাজপুর, ভুবনেশ্বর এবং পুরী যাইবার সংযোগস্থল খুরদা জংশন অতিক্রম করিয়া ওড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের সন্ধিস্থলে অবস্থিত চিল্কা হ্রদের তটদেশ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

চিল্কা হ্রদ।

চিল্কা অতি রমণীয় হ্রদ। পুরীজেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ হইয়া মান্দ্রাজপ্রদেশে গঞ্জাম জেলায় ইহার শেষ হইয়াছে। এই হ্রদটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সমুদ্র ও হ্রদের মধ্যে একটী বালির ঢিবি দ্বারা পরস্পরে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৪ মাইল; প্রস্থে উত্তরার্দ্ধে প্রায় ২০ বিশ মাইল, এবং দক্ষিণার্দ্ধে ক্রমশঃ সরু হইয়া যাওয়ায় চওড়ায় ৫ পাঁচ মাইলের অধিক নহে। এই হ্রদের গভীরতা কোন স্থানেই ৬ ফিটের অধিক নয়। ইহার জল লবণাক্ত, কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভের সহিত লবণাক্ত জল সরিয়া গিয়া হ্রদের কলেবর ক্রমশঃ সুমিষ্ট সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ হয়। ট্রেণ হইতে হ্রদের সৌন্দর্য্য চিত্রিতবৎ মনোহর। এই হ্রদের তীরবর্ত্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিলে ইহাকে নৈসর্গের প্রমোদ-কানন বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠা

বোধ হয় না। দক্ষিণ ও পশ্চিম কূলে গিরিশ্রেণী অবস্থিত থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চিল্কার মধ্যে প্রস্তর গঠিত কয়েকটি দ্বীপ আছে। হ্রদের উত্তরাংশেও একটী দ্বীপ আছে, কিন্তু তাহা প্রস্তর গঠিত নহে। চিল্কার পূর্ব্বদিকস্থ দ্বীপপুঞ্জকে পারিকূদ দ্বীপপুঞ্জ কহে। চিল্কার তটবর্ত্তী সুদৃশ্য পাদপরাজির শাখায় উপবিষ্ট হইয়া যখন নানা জাতিয় বিহঙ্গম কুল মনোহর সঙ্গীত করিতে থাকে, তখন সত্য সত্যই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়। জন-প্রবাদ এইরূপ যে এক সময়ে প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু চিল্কার এই লোচনানন্দদায়ক সৌন্দর্য্য দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া সলিল মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ওয়ালটেয়ারে উপনীত হইলাম।

ওয়ালটেয়ার। ষ্টেসন হইতে ওয়ালটেয়ার তিন মাইল দূরে উচ্চ ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য ইহাকে আপল্যাণ্ড (uplands) কহে। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ২৩০ ফিট মাত্র। ষ্টেসন হইতে সহরে যাইতে ঝট্‌কা এবং বাণ্ডি উভয়ই পাওয়া যায়। বাণ্ডি ও ঝট্‌কা দেখিতে কতকটা ছোট অম্‌নিবাসের মত। একটী গরুতে যাহা টানে তাহাই 'বাণ্ডি' এবং একটী ঘোড়াতে যাহা টানে তাহাকেই 'ঝট্‌কা' কহে, বাহন ও ভাড়ার বিভিন্নতার সহিত নামের ও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ওয়ালটেয়ার

ভিজিগাপত্তন। হইতে ভিজিগাপত্তন যাইবার তিনটী রাস্তা আছে, একটী সমুদ্রের ধার দিয়া, একটী সহরের মধ্য দিয়া এবং অপরটী ষ্টেসন হইতে। ভিজিগাপত্তন অতি প্রাচীন সহর। ইহার প্রাচীন নাম বিশাখপত্তন। কিন্তু কালক্রমে পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নামও বিশাখপত্তন হইতে রূপান্তরিত হইয়া ভিজাগাপত্তনে পরিণত হইয়াছে। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে ভাইজাগ বা পত্তন বলিয়া থাকে। সহরের মধ্যে

টার্ণার ছত্রী। টার্ণার ছত্রী (Turner's Choultry) নামক একটী ছত্র আছে; এস্থানে সকলেই দুই দিবস পর্য্যন্ত বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারেন, নির্দ্ধারিত দিবসের অতিরিক্ত থাকিতে হইলে প্রতিদিনের জন্য ।০ চারি আনা করিয়া ভাড়া দিতে হয়।

যে টার্ণার সাহেবের নামে এই ছত্রটি, তিনি পূর্ব্বে ভিজিগাপত্তনের



ভিজিগাপত্তন।

কালেক্টর ছিলেন, তাঁহার সময়েই এই সহরের ও জেলার বহু উন্নতি সাধিত হয়। এই মহাত্মার যত্নেই বহু অর্থ ব্যয়ে সহরবাসীদের ব্যবহারের জন্য জলের কল সংস্থাপিত হয়। ইনি অতি মহৎ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। টার্নার সাহেব যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ স্থানীয় অধিবাসিগণ এই ছত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ওয়ালটেয়ার মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার সম্বন্ধে Imperial Gazeteer of Indiaতে এইরূপ লিখিত আছে যে,—

Waltair (Vàltern). Town in Vizagapatam District, Madras, in lat. 17044′ N, and long. 8322·36″ E, population (1881) 1482 inhabiting 305 houses. The European Suburb of Vizagapatam, situated 3 miles North of that town. Although only 230 feet above sea-level, it is remarkable for its healthy climate, and all the European officers civil and military live here. The garrison consists of I Native Infantry regiment.

এখানকার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলিয়া থাকে যে পূর্ব্বে 'ডল্‌ফিন্‌স্ নোজের নিকটে পিত্তল মণ্ডিত বিশাখদেবের মন্দির অবস্থিত ছিল, কিন্তু সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ-প্রহারে তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। বিশাখ অর্থ কার্ত্তিক এবং পত্তন অর্থে নগর বুঝায়, অতএব বিশাখপত্তন শব্দে 'কার্ত্তিকের নগর' বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে এ স্থানে ওলন্দাজগণের উপনিবেশ ছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা এই নগরের জনসংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে এ স্থানের লোক সংখ্যা প্রায় ৩৫০০০ সহস্র হইবে। এ নগরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে; রাস্তাঘাট মন্দ নহে, একেবারে আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধবিহীন বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় সহর হইতে ইহার পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়।

সমুদ্রের তীরে উচ্চ ভূমিতে যে সমুদয় বাঙ্গলো আছে তাহাদের অধিকাংশ-গুলিই উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। ওয়ালটেয়ারে একটী পোষ্টাফিস, বাজার ও ডাক্তারখানা আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারাদি ক্রয় করিতে হইলে ভাইজাগ যাইতে হয়; কারণ প্রকৃত হাট, বাজার, আফিস, আদালত, পোষ্টাফিস, হাঁসপাতাল ইত্যাদি সমুদয়ই ভিজিগাপত্তনে অবস্থিত।

সীমাচল।

এ স্থানের প্রধান দেব-মন্দির সীমাচল,—ওয়ালটেয়ার হইতে ৭৷৮ মাইল দূরে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। প্রস্তর নির্ম্মিত প্রায় সহস্রাধিক সোপান অতিক্রম করিলে তবে মন্দির সম্মুখে উপনীত হইতে পারা যায়। সিঁড়িগুলি সুগঠিত এবং সুপ্রশস্ত, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? অতিশয় বলবান ব্যক্তিকেও সোপানাবলী অতিক্রম করিতে দুই তিনবার বিশ্রাম করিতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বাহ্নে চেষ্টা করিলে ডুলি পাল্কীও সংগৃহীত হইতে পারে। সোপান-পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই প্রথম তোরণের নিকট উপনীত হইতে পারা যায়। এই তোরণের পার্শ্বে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত জলাধারে পর্ব্বতোপরি হইতে নির্ঝরের সুবিমল সলিলরাশি ঝর্‌ঝর্ রবে নিপতিত হইয়া ইহাদের কলেবর পূর্ণ রাখিতেছে। যতই পর্ব্বতের উচ্চদেশে আরোহণ করা যায় ততই আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। হরিত-লতাপল্লবসমাচ্ছন্ন গিরি-শেখর নৈসর্গের

অযাচিত শোভায় শোভান্বিত। বিহগ-কল-কাকলী-মুখরিত, প্রীতি উচ্ছ্বসিত চতুর্দ্দিকের প্রাণারাম পবিত্র সৌন্দর্য্য অবলোকন করিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তির উদয় হয়। পর্ব্বতোপরি সমতল প্রদেশে বহু তাল পত্রের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর দেখিলাম, যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে ঘরগুলি সমস্ত দিনের জন্য ভাড়া করিয়া অভিপ্রায়ানুরূপ বিশ্রাম ও রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এই কুটীর শ্রেণী পার হইলেই দেব-মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

মন্দিরে প্রবেশ করিতেই এক আনার পয়সা দিতে হয়, পর্ব্বোপলক্ষে দুই আনা লাগে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দিকে নানা দেবদেবী, মনুষ্য ও অদ্ভুত অদ্ভুত জীব জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির মধ্যস্থ আসল দেবতার নাম নরসিংহ। বৎসরের মধ্যে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া এবং শুক্লা একাদশী, এই দুই দিন মাত্র যাত্রিগণ ইহাঁর দর্শন পায়; সে উপলক্ষে এস্থানে মেলা বসে এবং বিভিন্ন বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। এই দুই দিবস ব্যতীত বৎসরের অন্য সময় ঠাকুরের দর্শন পাওয়া অসম্ভব, তাঁহাকে চন্দন দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে, কথিত আছে প্রত্যহ একমণ চন্দন ঘসিয়া দেয়। প্রাঙ্গণের একদিকে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির এবং অপর দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত রথ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির-প্রাকারে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও খোদিত দেখিলাম। কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে ইহা বৌদ্ধ-মন্দির ছিল, পরে হিন্দুদের দখলে আসিয়া ইহা হিন্দু দেব মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাদ্দিক হইতে আরও উচ্চে পর্ব্বতারোহণ করিলে রাম-সীতার মন্দিরে পঁহুছিতে পারা যায়। রাম-সীতা মন্দিরের পার্শ্বেই গঙ্গাধারা অবলোকন করিলাম। একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সর্প-মুখ হইতে অবিরত নির্ঝরিণীর পবিত্র ধারা কুলু কুলু রব করিতে করিতে পতিত হইতেছে। যাত্রিগণ এখানে স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে এবং নিকটস্থ প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার মধ্যে রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সীমাচলে আসিবার পথে আমরা মাধোধারা দর্শন করিয়াছিলাম।

মাধোধারা।

এস্থানে একটী মন্দির ও নির্ঝরিণী ব্যতীত দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। পথের উভয় পার্শ্বে বহুল পরিমাণে আনারসের চাষ দেখিলাম। মৃত্তিকা বেশ উর্ব্বর,—বলিয়া বোধ হইল। নানা জাতিয়

পরিচিত কুসুম বৃক্ষে এ স্থানটিকে দিব্য সুষমাময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রস্ফুটিত চাঁপা, গোলাপ, করবী এবং বিবিধ অপরিচিত কুসুম-স্তবক ধীর পবনে দুলিতেছিল, ক্লান্তি দূরীকরণার্থে এখানে একটু উপবেশন করিলাম। নির্ঝর-শীকর-সিক্ত শীতল সমীরণ কুসুম-সৌরভ বিতরণ করিয়া হৃদয়ে ও দেহে নবীন সঞ্জীবতা দান করতঃ বহিয়া যাইতেছিল ; মাঝে মাঝে বনান্তরাল হ'তে দু' একটা বিহঙ্গ গাহিয়া গাহিয়া থামিয়া যাইতেছিল, প্রফুল্ল বাত্যান্দোলিত কুসুম-স্তবক দেখিয়া বহুদিন বিশ্রুত রবি কবির সেই সঙ্গীতটি মনে হইতেছিল,

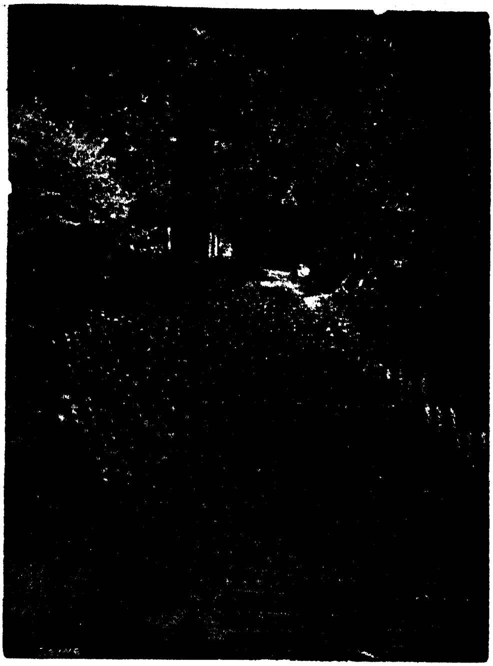
"তোরা দেখে যা—দেখে যা-দেখে যা লো
সাধের কাননে মোর,
সেথা মলয় বহিছে সৌরভ লুটিয়া রে।"

সীমাচলের যে সোপানারোহণে আমাদিগকে রীতিমত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, দেখিলাম সে সমুদয় সোপানাবলীই এ দেশীয় নিম্ন শ্রেণীস্থ রমণীগণ শিশুপুত্র ক্রোড়ে এবং কাষ্ঠের বোঝা মাথায় লইয়া অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতেছে। অভ্যাসের এমনি অত্যাশ্চর্য্য শক্তি বটে! ওয়ালটেয়ারে গভর্মেণ্টের একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর অবজারভেটারি আছে।

অধিবাসী রমণীগণ।

এ দেশীয় মহিলাদের মধ্যে বিশেষ স্বাধীনতা আছে বলিয়া বোধ হইল ; কারণ রাজপথ দিয়া বহু স্ত্রীলোককে অনবগুণ্ঠনও দিব্য সতেজ ভাবে যাতায়াত করিতে দেখিলাম। ইহাদের শরীর সুগঠিত, দৃঢ় এবং বেশ বিন্যাস ও রমণীয়। প্রত্যেকের মুখেই স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার চিহ্ন বিরাজমান। এ দেশের রমণীগণের ন্যায় কণ্ঠে, বাহুতে ও কটিদেশে অলঙ্কার পরিধান করে। অলঙ্কার গুলিও সুদৃশ্য এবং সুন্দর ; কিন্তু ইহারা নাসিকায় যে অলঙ্কার পরিধান করে তদ্বারা মুখ মণ্ডলের সমুদয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ; তবে দেশভেদে রুচিভেদ, একথাও ঠিক্। ভিজিগাপত্তনের সমুদ্র তটে ভিক্টোরিয়া জুবিলি টাউন হল অবস্থিত। এই টাউনহলটি ওয়ালটেয়ারের অদূরবর্ত্তী বব্‌লির মহারাজা ৩২০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই গৃহে ভাইজাগ ক্লাব অবস্থিত। এ স্থানে

জুবিলি টাউনহল, ক্লাবঘাট বা স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্ট ইত্যাদি।



সীমাচলের মন্দির আরোহণের সোপানাবলী।

দেশী ও বিদেশী বহু সংবাদ পত্রাদি ও বিলিয়ার্ড, পিং পং, টেইনিস্ প্রভৃতি বিদেশী খেলার ও ব্যবস্থা আছে। যৎসামান্য অর্থব্যয়ে যে কোন ব্যক্তি ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

ওয়ালটেয়ার হইতে ভাইজাগ যাইবার সমুদ্রতটবর্ত্তী পথে একটী বিশ্রাম স্থানকে ক্লাবঘাট বা স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্ট বলে। অপরাহ্নে সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থ এস্থানে বহু লোকের সমাগম হয়। এস্থানে উপবেশনার্থ সিমেণ্ট নির্ম্মিত বেঞ্চ আছে। এই বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লীলা দর্শন করিলে হৃদয় এক অচিন্তনীয় আনন্দ-লহরে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। একদিকে তাল-নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ গিরিমালা পরিবেষ্টিত কানন-কুন্তলা ধরণীর বুকে চিত্রিতবৎ ভাইজাগ নগরী, অন্যদিকে অনন্ত বিস্তৃত সুনীল-সিন্ধুর মহিমাময় নীল সৌন্দর্য্য দিগন্তে বিলীন হইয়া

গিয়াছে ; উদ্বেলিত ফেণময় লহরী নিচয় গভীর গর্জ্জনে অবিশ্রান্ত আসিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে ও বেলাভূমিতে আঘাত করিতেছে ! সমুদ্রের লীলাময় অনন্ত সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র ; সে মহিমাময় সৃষ্টির বিশালত্ব যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই বিমুগ্ধ হইয়াছেন, যিনি দেখেন নাই, তাঁহার পক্ষে হৃদয়ে সেই বিরাট ভাব কল্পনা করা অসম্ভব।

ওয়ালটেয়ারে নানাবিধ সামুদ্রিক মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্থানীয় তেলেগু শিক্ষিত ভদ্রলোকদের আচার পদ্ধতি একটু বিচিত্র রকমের। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বাহুতে স্বর্ণ বলয় ও কর্ণে হীরার ফুল ইত্যাদি পরিয়া থাকেন; সর্ব্বাপেক্ষা নূতনত্ব বোধ হয় যখন ইঁহারা নগ্নপদে কাপড় ও কোট পরিয়া কোর্টে ও স্কুলে মাষ্টারী এবং ওকালতি করিতে গমনাগমন করেন। ব্রাহ্মণেরা ও বৈশ্যগণ নিরামিষাসী, কিন্তু অন্যান্য জাতির মধ্যে সকলেই মৎস্যমাংসাদি ভোজন করে। বণিকেরা সর্ব্ববিষয়েই ব্রাহ্মণদের অনুকরণ করিয়া থাকে ; তাহারাও নিরামিষাসী।

রীতি-নীতি।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেবল বিধবারাই মস্তক মুণ্ডন ও অবগুণ্ঠন দিয়া থাকে, সধবারা গুণ্ঠনে বদনকমল আবৃত করিয়া রাখে না। বালিকারা ঘাঘড়া পরে। ভদ্ররমণীরা সাধারণতঃ কাছা দিয়া কাপড় পরেন, কিন্তু উৎসবাদিতে কাছা ও কোচা উভয়ই থাকে। বিধবারা একাদশীর দিবস উপবাস করেন, কিন্তু তাহা আমাদের দেশের ন্যায় নির্জ্জলা নহে। বাঙ্গালা দেশের পৌষ সংক্রান্তিকে ইহারা 'পঙ্গল' প্যোদ্দা, পন্‌ডুগু বলে এবং তাহাই এখানকার প্রধান পর্ব্ব। এসময়ে আমাদের দেশের দুর্গোৎসবের ন্যায় চারিদিকে একটা আনন্দের কলরব জাগিয়া ওঠে। ছেলে মেয়েরা নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করে, প্রবাসীগণ দেশে আইসে, বিবাহিতা সীমন্তিনীগণ পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে, প্রতি ঘরে ঘরেই আনন্দ-উৎসব সম্পাদিত হয়। এই উৎসব ও দুর্গোৎসবের ন্যায় তিন দিবস ব্যাপীই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর একটী পর্ব্ব আছে তাহাকে 'দশ্‌রা' বলে। এ সময়ে বাগ্দেবীর অর্চ্চনা হয়, এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এবং শিক্ষিত লোকেরা পুস্তকাদি এবং শিল্পীগণ স্বীয়

পর্ব্ব ইত্যাদি।

স্বীয় যন্ত্রাদির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। স্ক্যাণ্ডেল পয়েণ্ট হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ব্যাকওয়াটারে পঁহুছিতে পারা যায়। এক পয়সা ব্যয় করিয়া ব্যাকওয়াটার পার হইলেই ভ্যালি গার্ডেন ও 'ডল্‌ফিন্‌সনোজ' পাহাড়ে পঁহুছান যায়। দূর হইতে পর্ব্বতের অধিত্যকার মধ্যে যে একটী সুন্দর উদ্যান আছে তাহা অনুমান করা যায় না। বাগানটি দেখিতে অত্যন্ত মনোরম। ইহার ভিতরে একটী বাড়ী ও একটী ঝরণা আছে। এই পর্ব্বতের উপর হইতে নগরের ও সমুদ্রের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোহারী বলিয়া বোধ হয়। উদ্যানটি রাজা গজপতি রায়ের সম্পত্তি। ভ্যালি গার্ডেন ব্যতীত ওয়ালটেয়ারের উত্তর পূর্ব্বে গিরিশ্রেণীর সানুদেশে সন্ন্যাসীর চট্টি বা সীতাম্‌ধারা নামক এদেশীয় জনৈক সঙ্গতিশালী ব্যক্তির আর একটি উদ্যান বাটিকা আছে। এই উদ্যান মধ্যস্থ বাংলাটি অত্যন্ত সুন্দর। চারিদিকে নানাশ্রেণীর ফুল ও ফলের বৃক্ষাদি থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাগানের পশ্চাৎ পর্ব্বত গাত্র হইতে একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী কুলু কুলু রবে প্রবাহিত হইয়া বাগানের জলসেকের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। বাড়ীটি থাকিবার জন্য ভাড়া পাওয়া যায়, দুই একদিন বিনা ব্যয়েও থাকিতে পারা যায়, কিন্তু সহর হইতে কিছু দূরে নির্জ্জন বলিয়া থাকিবার পক্ষে সুবিধা হয় না।

ভ্যালি গার্ডেন ও সীতাম্‌ধারা।

ভিজিগাপত্তন নগরে গজদন্ত, চন্দন কাষ্ঠ ও মহিষের শৃঙ্গের কার্য্য খুব সুন্দর হয়। শিল্পীরা ফরমাইসানুযায়ী দ্রব্যাদি তৈরি করিয়া দিতে পারে। ওয়ালটেয়ারে স্থায়ী প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব অল্প; স্বাস্থ্যপ্রার্থী নরনারীর সংখ্যাই এখানে অধিক। আমরা দুই মাসের কিঞ্চিদধিক কাল ওয়ালটেয়ারে অবস্থিতি করিয়া শ্রাবণের প্রত্যূষে সামলকোট রওয়ানা হইয়া অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় তথায় উপনীত হইলাম।

স্থানীয় শিল্পাদি।



গর্ব্বিত জনক—দাক্ষিণাত্য

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সামলকোট।

সামলকোট একটী ক্ষুদ্র সহর। এস্থানে দর্শনীয় তেমন কিছুই নাই। এখান হইতেই কোকনদ যাইতে হয়, ইহা একটা রেলওয়ে সংযোগ স্থল। সামলকোটের তলদেশ প্রবাহিনী গোদাবরী খালের অপরতটে একটী দ্বিতল অট্টালিকার উপর ভীমেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত। এ স্থানের নাম ভীমাভরম। শিবলিঙ্গটী অত্যন্ত বৃহৎ, দ্বিতল অট্টালিকার উপর যাইয়া ইঁহার মস্তকে জল চড়াইতে হয়। স্থানটি নীরব ও নির্জ্জন, প্রকৃতি-সুন্দরীও স্নেহদানে কৃপণতা করেন নাই! অদ্য রাত্রিতে সামলকোটেই অবস্থিতি করিলাম।

পর দিবস আহারাদির পর দশ ঘটিকার সময় সামলকোট হইতে কোকনদ যাইবার উদ্দেশ্যে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলাম। কোকনদ, সামলকোট হইতে মাত্র দশ মাইল দূরে অবস্থিত। রজনী অন্ধকারময়ী, অল্প অল্প আলোকে রেলপথের উভয় পার্শ্বস্থ নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাত্রি এগার ঘটিকার সময় কোকনদ উপনীত হইয়া কোনও রূপে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষেই নগর দেখিতে বাহির হইলাম।

কোকনদ।

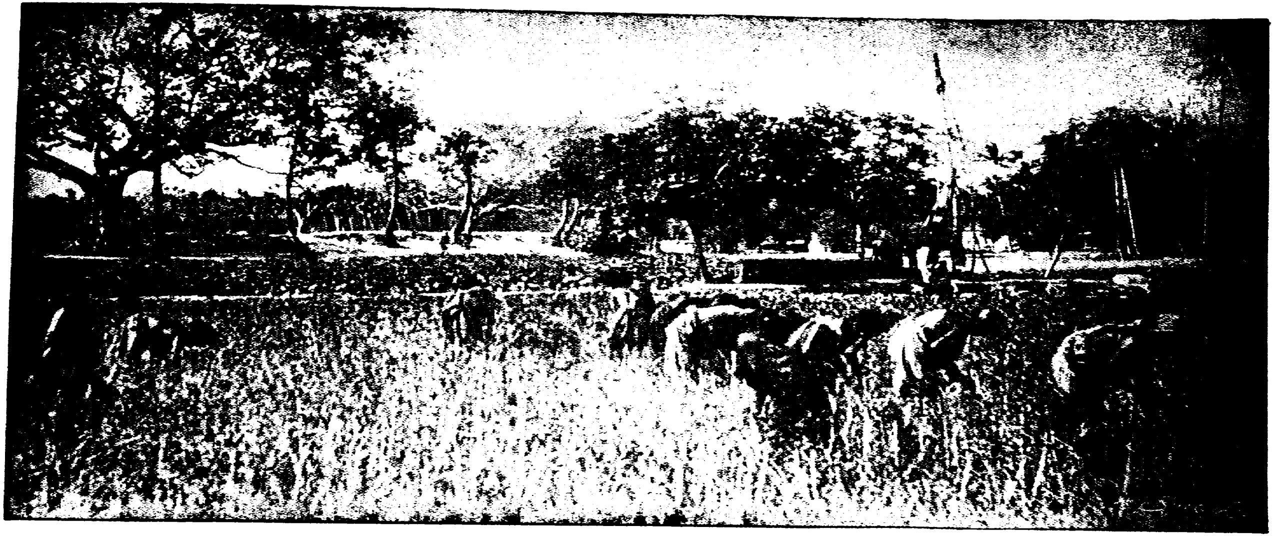
কালিন্দী সাগর, মহিষাসুরমর্দ্দিনী সোমেশ্বর বিগ্রহ ও গৌরগণ্ডুলা নরসিংহ সিদ্ধান্ত।

আমরা প্রথমেই কালিন্দী সাগর তীরে উপনীত হইলাম। দেখিলাম পূর্ব্বদিক দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বারিধি ভৈরব গর্জ্জন করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে। গোদাবরীর একটী ধারা এস্থানে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন এই স্থানের নাম কালিন্দী। এখানে একটী অর্দ্ধভগ্ন মন্দিরে মহিষাসুর-মর্দ্দিনী ও সোমেশ্বর বিগ্রহ আছেন। পুরোহিতের নাম গৌরগণ্ডুলা নরসিংহসিদ্ধান্ত, ইনি নিজকে ভারতবর্ষের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিবদ (The Great Indian Astrologer) বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। গোদাবরী হইতে একটী খাল আসিয়াও সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে এই সাগর-সঙ্গমের স্থলেই ভগবতী কমলেকামিনী রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ প্রকৃত কমলেকামিনী স্থান এখন চড়া পড়িয়াছে। গোদাবরীর এই সাগর-সঙ্গম পরম রমণীয়। যখন ভগবান অংশুমালী দিবসের কার্য্য সমাপনান্তর সমুদ্র-গৃহে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই অসংযত লোহিতরশ্মিনিচয় জলধি তরঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতেছিল, সে সময়ে আমরা একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া একাধারে সৌন্দর্য্য ও প্রীতি অনুভব করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল;—

"আহা! কিবা শোভাময় এভব ভবন,
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন।"

মান্দ্রাজ নগরীর পর কোকনদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। এই ক্ষুদ্র সহরটি সুগঠিত ও সুন্দর। লোকসংখ্যা ৪০,৫৫৩। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শোভা সম্পদে কোকনদ সম্পদশালিনা। কোকনদ সহর ও কোকনদ বন্দর দুইটী পৃথক স্থান। আমরা সন্ধ্যা সাতটার সময় কোকনদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সামলকোটে ফিরিয়া আসিলাম।

১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই শুক্রবার প্রাতে ৬-৪৫ মিনিটের সময়



দাক্ষিণাত্যের পল্লীদৃশ্য—কৃষক রমণীরা শস্য সংগ্রহ করিতেছে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সামলকোট হইতে গোদাবরী রওয়ানা হইলাম। মধ্যাহ্ন এগার ঘটিকার সময়ে গোদাবরীতে গাড়ী উপস্থিত হইল। তখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণে চতুর্দ্দিক অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, সে সময়ে রাজপথে বাহির হয় কাহার সাধ্য ? কাজেই ছত্রে আহারাদি করিয়া বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে নগর দেখিতে বাহির হইলাম।

গোদাবরী।

গোদাবরী ষ্টেসনের পশ্চিমেই গোদাবরী নদী সপ্তধারার সহিত সাগরসঙ্গমে বহিয়া চলিয়াছেন। নদীর উপরে সুবৃহৎ পুল আছে। গোদাবরী বৈদিক কালের পুণ্য নদী। ইহার অপর নাম গৌতমী গঙ্গা। নাসিক জেলার ত্র্যম্বক নামক গ্রামের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পর্ব্বত হইতে গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদী পূর্ব্ব ঘাট হইতে পশ্চিম ঘাট পর্য্যন্ত ৯০০ মাইল বিস্তৃত। গোদাবরীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের শোভা মনোহারিণী। ইহার জলের পবিত্রতা ও উপকারিতা চির প্রসিদ্ধ। গোদাবরী তুল্যা, আত্রেয়ী, ভারদ্বাজী, গৌতমী, বৃদ্ধগৌতমী, কৌশিকী, ও বশিষ্ঠা এই সপ্তশাখায় বিভক্ত। ধবলেশ্বর নামক স্থানে গোদাবরী এই সপ্তধারায় মিলিতা হইয়াছেন। সহর হইতে ইহা প্রায় দশ বার মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা ১৩ই শ্রাবণ প্রত্যূষে রওয়ানা হইয়া বেলা আট ঘটিকার সময় এস্থানে

ধবলেশ্বর।

উপস্থিত হইলাম। গোদাবরী সপ্তধারায় মিলিতা হইয়াছেন বলিয়া ইহার নাম সপ্ত-গোদাবরী-সঙ্গম। ধবলেশ্বর একটী ছোট পাহাড়। আশীটি প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়ি পার হইলে এই নির্জ্জন গিরিশেখরস্থ একটী মন্দিরে পঁহুছা যায়, এই মন্দিরে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন মূর্ত্তি বিরাজমান। পাহাড়ের উপর হইতে চতুর্দ্দিকস্থ সৌন্দর্য্য প্রীতিপদ। সূর্য্যকর-প্রদীপ্ত গভীর-অরণ্যানীর সবুজ-সুন্দর দৃশ্য আমাদিগের চিত্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। বেলা নয় ঘটিকার সময় ধবলেশ্বর দর্শনান্তে রওয়ানা হইয়া বেলা ১১ এগারটার সময় সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

রাজমাহিন্দ্রী ও গোদাবরী এক। রাজমাহিন্দ্রী নগরের মধ্যস্থলেই গোদাবরী ষ্টেসন স্থাপিত—ইহা একটী ফ্লেগ ষ্টেসন। যাহারা রাজমাহিন্দ্রী দর্শনাভিলাষী তাহাদের গোদাবরীর টিকেট করাই উচিত। রাজমাহিন্দ্রী

সহরের কথা।

ষ্টেসন সহর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। গোদাবরীর তীরবর্ত্তী অট্টালিকা সমূহ রাজমাহিন্দ্রীর একটী দ্রষ্টব্য পদার্থ। প্রাচীন পুরাতত্ত্বের জন্যও ইহা প্রসিদ্ধ। গোদাবরী নদীর



ফল বিক্রেত্রী---দাক্ষিণাত্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

পুলটি দৈর্ঘ্যে ১৮ মাইল। ৫৬টী স্পোনের উপর এই সুগঠিত সুন্দর পুলটি নির্ম্মিত হইয়াছে। শোন নদের উপর ডিহিরি (Dehri) নামক স্থানের পুলের পরেই এই পুলটি দীর্ঘ। ভারতবর্ষের সমুদয় রেলওয়ে ব্রিজের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থানীয়। গোদাবরীর জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

গোদাবরী ত্যাগ।

১৩ই শ্রাবণ রাত্রি আটটার সময় গোদাবরী হইতে যাত্রী গাড়ীতে (Passenger train) বেজাওদা রওয়ানা হইলাম। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে নিবিড় অরণ্য, শীর্ণানদী, নীল গিরিশ্রেণী নয়ন-মন-মুগ্ধ করিতেছিল। সারা রাত্রি গাড়ীতেই কাটাইয়া পরদিন বেলা দশ ঘটিকার সময় বেজাওদা উপনীত হইলাম। বেজাওদা একটী বিখ্যাত রেলওয়ে সংযোগস্থল। মান্দ্রাজের নর্থ ইষ্ট রেলওয়ে, মারহাট্টা রেলওয়ে এবং নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে এস্থানে পরস্পর মিলিত হইয়াছে।

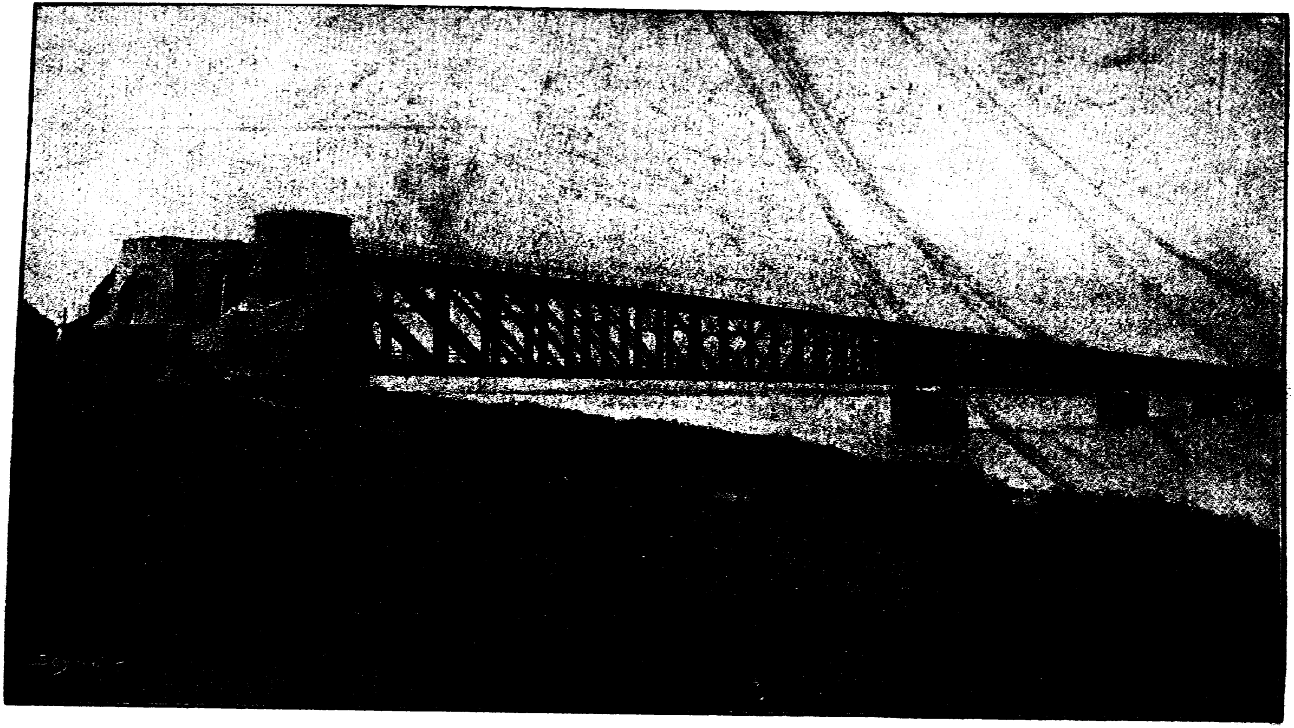
বেজাওদা।

কৃষ্ণা নদীর উত্তর তীরে এই ক্ষুদ্র নগরীটি অবস্থিত। আমরা এ স্থানে অবতরণ করিয়াই ষ্টেসনের অনতিদূরবর্ত্তী "রামগোপাল ধর্ম্মশালা" নামক একটী ধর্ম্মশালায় আমাদের জিনিষ পত্রাদি রক্ষা করিয়া কৃষ্ণাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই ধর্ম্মশালার বন্দোবস্ত খুব ভাল। কৃষ্ণাজেলার বেজাওদা তালুকের বেজাওদাই প্রধান নগর। কৃষ্ণা হইতে একটী খাল বহির্গত হইয়া সুদূর মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই খালের জন্য বেজাওদা বিশেষ বিখ্যাত, কারণ মান্দ্রাজ, ইলোর, মছলিপট্টন, কোকনদ প্রভৃতি বহু বাণিজ্য প্রধান স্থান জলপথে ইহার সহিত সংযোজিত। খালের মুখটি অতি মনোরম স্থান।



বেজাওদা খালের মুখ।

কৃষ্ণার দুই তীরে দুইটী পাহাড়; মনে হয় যেন তাহারা উৎসুক চিত্তে মাথা তুলিয়া কৃষ্ণার স্ফটিকনিভ সলিল-প্রবাহে তাহাদের প্রতিরূপ নিরীক্ষণ করিতেছে। এই দুইটী পাহাড়ের উপরে অনেক প্রাচীন দেবালয় ও



কৃষ্ণানদীর উপরিস্থিত পুল—বেজাওদা।

সাধুদিগের থাকিবার স্থান আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের বহু প্রস্তর গঠিত মঠও এ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। গিরি সন্নিকটেই কনক দুর্গার মন্দির। ১৭৮টি সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া মন্দিরে পঁহুছান যায়। মন্দিরের অল্প দূরে একটী গুহার মধ্যে একজন সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকেন। অদূরবর্ত্তী অপর একটী গুহায় একজন ভৈরবী বাস করেন।

যখন কৃষ্ণার এই বিখ্যাত খালটি কাটান হয়, তখন ভূগর্ভ হইতে প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত বহু মূল্যবান দ্রব্য উদ্ধার হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এস্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে। এখানে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, মুন্সেফী আদালত, ডাক্তারখানা, জেল, লাইব্রেরী এবং মিউজিয়াম আছে।

পুণ্য-সলিলা কৃষ্ণা নদী এই নগরের চরণ ধৌত করিয়া প্রবাহিতা হওয়ায় ইহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অদূরে গম্ভীরাকৃতি পর্ব্বতমালা উন্নত শিরে ধ্যানপরায়ণ, স্থানে স্থানে ঘনবিন্যস্ত শালবন, কোথাও বা বেণু-বন-রাজি পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া খস্ খস্ ফিস্ ফিস্ শব্দে মৃদু পবন-স্পর্শে আন্দোলিত হইতেছে, কোথাও বা গিরিগাত্র হইতে নির্ঝর ঝর্ ঝর্ ঝরিতেছে, আর কৃষ্ণার সেই অবিশ্রান্ত কলকল ছলছল রবে প্রেম-অভিযান, হৃদয়ে এক অভিনব শান্তিরস ঢালিয়া দেয়, তখন মনে হয় সত্য সত্যই জগত আনন্দময়, সত্য সত্যই

"তাঁহারই আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে।"

আমরা বেজাওদা নগরে তিন দিবস অবস্থিতি করিয়া ১৭ই শ্রাবণ প্রত্যুষে এ স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরস্থিত মঙ্গলগিরি দর্শন করিয়া আসিলাম। মঙ্গলগিরিতে পান্না নরসিংহ ও দ্রোণ নরসিংহের এগার তালা মন্দির দ্রষ্টব্য। একটী সুন্দর কূপ ও পুষ্করিণীও উল্লেখ যোগ্য; ইহা ছাড়া দর্শনীয় আর তেমন কিছুই নাই। এখানে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত উচ্চ রথ আছে।

মছলিপত্তন।

১৭ই শ্রাবণ বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় বেজাওদা হইতে মছলিপত্তন বা মৎস্যনগরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। মছলিপত্তন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণা জেলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর ও নগর। প্রাচীন কালে এই স্থান বাণিজ্যের জন্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল, তখন ইহার বাণিজ্যখ্যাতি সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক ভৌগোলিকগণ ইহাকে Mæsolia শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। এই নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে এই স্থানে সমুদ্র-জাত মৎস্যের বিস্তৃত কারবার ছিল, সেজন্যই ইহার নাম মছলী (মৎস্য) পত্তন (নগর) এইরূপ হইয়াছে। সমুদ্র গর্ভ হইতে এই নগরের সৌন্দর্য্য বড়ই চিত্তাকর্ষক।

নগরের কথা।

মছলিপত্তন যে পূর্ব্বে কখনও হিন্দু শাসনাধীনে ছিল, নগরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে এবং ইতিহাস হইতে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। করমণ্ডল উপকূলে নগর রক্ষার জন্য যে স্থানে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত তাহার দেড় ক্রোশ দূরে সমুদ্র-তটে মছলী বন্দর নামক দেশীয় লোকের বসতিপূর্ণ একটী পল্লী আছে, কেহ কেহ ঐ স্থানের নাম হইতে সমুদয় বন্দরের নাম হইয়াছে এইরূপও বলিয়া থাকেন।

আমরা বর্ত্তমান সময় পূর্ব্ব দুর্গটিকে ভগ্নাবস্থায় দর্শন করিলাম। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ হইতে সৈন্যদল স্থানান্তরিত করা হয়, তাহার পর হইতেই দুর্গের এই ভগ্নাবস্থা।

দুর্গের অনতিদূরে প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান্ ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জ্জা এবং একটী ব্রহ্ম উপাসনা মন্দির আছে। পূর্ব্বে যে স্থানে ইয়ুরোপীয়গণের বাসবাটি ছিল বর্ত্তমান সময়ে তথায় একটী ফরাসীদের কুঠি বিদ্যমান আছে। বর্ষার সময় ইহার চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এস্থানে এক ভীষণ ঝড় হয়, সেই ঝড়ে মছলিপত্তনের সমুদয় গৃহাদি উড়িয়া যায় এবং বহুব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়,



তৃষিত পথিক—দাক্ষিণাত্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সেই ঝড়ের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণে মছলীপত্তনের সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাস।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সিংহলাধিবাসী আরবীয় বণিক্‌গণ যখন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন, তখন তাহারা সমুদ্রবারি-বিধৌত সমুদ্রোপ-কূলবর্ত্তী এই স্থানের বাণিজ্যোপযোগীতা দর্শনে এই স্থানে একটী বাণিজ্যার্থ বন্দর স্থাপন করিয়া যান।

১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটাধিপতি দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণীরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে মুসলমান সৈন্যগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে জন্য এই স্থানে তিনি তাহাদের উপাসনার নিমিত্ত একটী মসজিদ নির্ম্মাণের অনুমতি দেন। ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহ্মণীরাজ দ্বিতীয় মহম্মদ, তৎপরে ওড়িষ্যারাজ গজপতি সিংহ এবং এই গজপতি বংশের প্রভাব ক্ষীণ হইলে গোলকুণ্ডাধিপতি সুলতান কুতবসাহ মছলীপত্তনের আধিপত্য লাভ করেন। সার্দ্ধ শতাব্দকাল পর্য্যন্ত ইহা গোলকুণ্ডার রাজার অধিকারে ছিল, সে সময়ে এস্থান বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে অতি উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছিল। এ সময়ে ইয়ুরোপীয় বণিক্‌গণও এখানে প্রবেশ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

করমণ্ডল কূলে মছলিপত্তনই ইংরেজদের প্রথম উপনিবেশ। ইংরেজগণ পুলিকটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনে ব্যর্থমনোরথ হইয়া "গ্লোব" নামক জাহাজের কাপ্তেন হিপানের সাহায্যে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে এক এজেন্সী স্থাপন করেন, ইহাকেই ইতিহাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ৭ম ভারত-যাত্রা বলিয়া কহিয়া থাকে। মছলীপত্তনে ইংরেজগণ কুঠি নির্ম্মাণের পর বিতাড়িত হন, কিন্তু গোলকোণ্ডার নরপতির ফার্ম্মাণের বলে পুনরায় এই বন্দরে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, ইংরেজ ইতিহাসে এই ফার্ম্মণকে "গোল্ডন ফার্ম্মাণ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ওলন্দাজের পর ইংরেজ বণিক্, তৎপরে ফরাসী বণিক্‌ও বাণিজ্যের অংশভাগী হইবার জন্য ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, ইতিমধ্যে কোন কারণে ইংরেজদের সহিত গোলকোণ্ডারাজের মনোমালিন্য হওয়ায় ইংরেজদের প্রতি বাণিজ্য রহিতের আদেশ প্রদান করিয়া ওলন্দাজ-

দের প্রতি নগর শাসনের ভার অর্পণ করেন। ওলন্দাজেরা ইংরেজের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হইয়াও অকৃতকার্য্য হয়।

ইহার তিন বৎসর পরে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি জুলফিকার খাঁ দাক্ষিণাত্য বিজয়ে আসিয়া মছলীপত্তনের সমুদয় কুঠি লুণ্ঠন করেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাটের নিকট হইতে ফার্ম্মাণ আনাইয়া ইংরেজগণ মছলীপত্তনে পুনরায় বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ফাউ সাহেব বলপূর্ব্বক এ স্থানের দুর্গ অধিকার করেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সমুদয় মছলীপত্তন ইংরেজ হস্তে পতিত হয়।

শিল্পদ্রব্যাদি।

পুর্ব্বে এ স্থানের কার্পাস বস্ত্রের ও ছিটের উৎকর্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও এ স্থানের তন্তুবায়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ ছিট, ছাপের কাপড়, "মাটাপোল্লাম" বস্ত্র এবং টোয়ালে, টেবিল ক্লথ প্রভৃতি নানাপ্রকারের উত্তম বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল দূরদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মছলীপত্তনে তেলেগু ভাষা প্রচলিত। এই নগরকে তেলেগু রাজ্যের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্র-স্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খ্রীষ্টান মিশনরীগণের কৃপায় এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছে।

সমুদ্র তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। আমরা এস্থান দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

সে দিবস রাত্রিতে বেজাওদায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেখান হইতে পরদিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় পুনরায় কালহস্তী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। সারাদিন এবং সারারাত্রি গাড়ীতে কাটাইয়া পরদিবস বেলা নয়টার সময় কালহস্তী উপনীত হইলাম। পথে রাত্রিতে চতুর্দ্দিকস্থ সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই; কিন্তু প্রত্যূষে পূর্ব্বদিকে যখন ঊষার রক্তিমচ্ছটা দেখা দিয়াছিল তখন চারিদিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বত মালার অটল অচল সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্য্যন্তই কেবল বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ নির্ঝর-শীকর-সম্পৃক্ত, দিগন্ত প্রসারী ভূধরশ্রেণী মনোমোহন সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।



পল্লী-পথ—দাক্ষিণাত্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কালহস্তী।

কালহস্তী মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটী জমিদারী। ইহার কতক অংশ উত্তর আর্কট আর কতক অংশ নেল্লোর জেলায় অবাস্থত সমুদ্র তীর হইতে কালহস্তী ২১৫ ফিট উচ্চ। লোক সংখ্যা ১১,৯৯২ জন। কালহস্তীকে স্থানীয় লোকে শ্রীকোলস্ত্রীও বলিয়া থাকে। নাগরী (Nagari) পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে স্বর্ণমুখী নদীর দক্ষিণ তীরে কালহস্তী অবস্থিত। এই গিরিশ্রেণী এতদূর পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় যে ইহার গাত্রস্থ প্রস্তর ইত্যাদি কাহারও আনিবার অধিকার নাই। এ স্থানে কোনও ডাক বাঙ্গলা নাই। যদি কোনও ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী কিংবা ভ্রমণকারী কালহস্তীর মহারাজকে পূর্ব্বাহ্নে নগর দেখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাত করান, তবে তিনি তাঁহাদিগের থাকিবার এবং নগর দেখিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন। আহারাদির সংস্থান বাজার হইতে করিতে হয়। সহরের মধ্যে মহারাজার একটী ছত্রম্ আছে, সে স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে বিনাব্যয়ে আহারাদি করিতে দেওয়া হয়, বৈরাগী-গণও ছত্র হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইয়া থাকে।

সাধারণ কথা।

নগরে দুইটী হোটেল আছে, সেখানে পারিয়া ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বশ্রেণীস্থ হিন্দুরাই আহারাদি করিতে পারেন; ৵১০ হইতে ৶০ আনা করিয়া প্রতিবেলা হিসাবে দিতে হয়। যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা এবং গরুর গাড়ী উভয়ই পাওয়া যায়। ভাড়া যথাক্রমে ।৵০ আনা ও ৶০ আনা। এখানকার শিবরাত্রির মেলা বিশেষ বিখ্যাত। সে সময়ে এ স্থানে প্রায় ১৫,০০০ লোকের সমাগম হয়। কালহস্তীর মহারাজা তাঁহার হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি মিছিলের জন্য প্রেরণ করেন। মেলার সপ্তম দিবসের দিন মিছিল বাহির হয়। মিছিলের সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজা-জমিদারেরাও নিজ নিজ হস্তী ইত্যাদি প্রেরণ করেন। হস্তী ও অশ্ব সমূহ যখন নানাপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত হাওদা, মুকুট ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রাজপথে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বহির্গত হয় তখন

শিবরাত্রির মেলা।

বড়ই সুন্দর দেখায়। এ মিছিল কতকটা ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের মত।

কালহস্তী একটী তীর্থস্থান এ স্থানে বহু দেব দেবীর মন্দিরাদি আছে, তন্মধ্যে শিব-মন্দিরই প্রধান। উহা ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল দূরে নগরের নৈঋত কোণে পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। পুরাণে লিখিত আছে যে ব্রহ্মা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরে চোল রাজা এবং বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণরায় মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া অপরাপর অংশ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানকার লিঙ্গমের নাম 'বায়ু' লিঙ্গ। মহাদেব এস্থানে বায়ু মূর্ত্তিতে বিরাজিত। কালহস্তীর নামোৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এই যে,—পুরাকালে একটী হস্তী ও একটী সর্প উভয়ে মহাদেবের অর্চ্চনা করিত। সর্প নিজের মস্তক-মণি মহাদেবের শীর্ষদেশে রাখিয়া এবং হস্তী জলাভিষেক দ্বারা আশুতোষের পূজা করিত। একদিন দৈবক্রমে হস্তীর অভিষেকের জল সর্পের অঙ্গে লাগিয়াছিল, ইহাতে সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীর শুণ্ডে দংশন করে, হস্তী দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া সর্পকে আঘাত করিয়া উভয়েই নিয়তি-বশে আশ্চর্য্য রূপে কাল-কবলে নিপতিত হয়।

পৌরাণিক কথা ও দেব দেবীর মন্দির ইত্যাদি।

ভক্তের ভগবান উভয় ভক্তের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে পরম ব্যথিত হইলেন এবং কৃপা-পরবশ হইয়া উভয়ের জীবনদান করিলেন ও তাহাদের উভয়কে চির-স্মরণীয় করিবার জন্য নিজ মন্দিরের নাম কাল-হস্তী রাখিলেন। কাল অর্থে (সর্প) ও হস্তী এই উভয় মিলিয়া কালহস্তী হইয়াছে।

মন্দিরের প্রবেশ পথে হস্তী, সর্প ও উর্ণনাভের মূর্ত্তি নয়ন-পথে পতিত হয়। অন্যান্য শিব-লিঙ্গের মূর্ত্তি হইতে ইহার আকার ভিন্ন। এই বায়ুমূর্ত্তি চতুষ্কোণ। কালহস্তীর শিব-মন্দিরের কোন দিক দিয়াই বায়ু প্রবেশের পথ নাই, কিন্তু বিগ্রহের উপরে যে প্রদীপ আছে তাহা সর্ব্বদাই অল্প অল্প আন্দোলিত হয়। মন্দির মধ্যে আরও অনেক প্রদীপ আছে কিন্তু আর কোনটিই দোদুল্যমান হয় না। কেহ কেহ বলেন যে এই জন্যই লিঙ্গের নাম বায়ুলিঙ্গ হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত এই যে অই বৃহৎ প্রদীপটির নিম্নস্থিত প্রদীপ সমুহের অগ্নিরতেজে বায়ু উত্তাপিত হয় বলিয়াই



চক্ষুনাইকি মাতা—চিঙ্গলপৎ

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

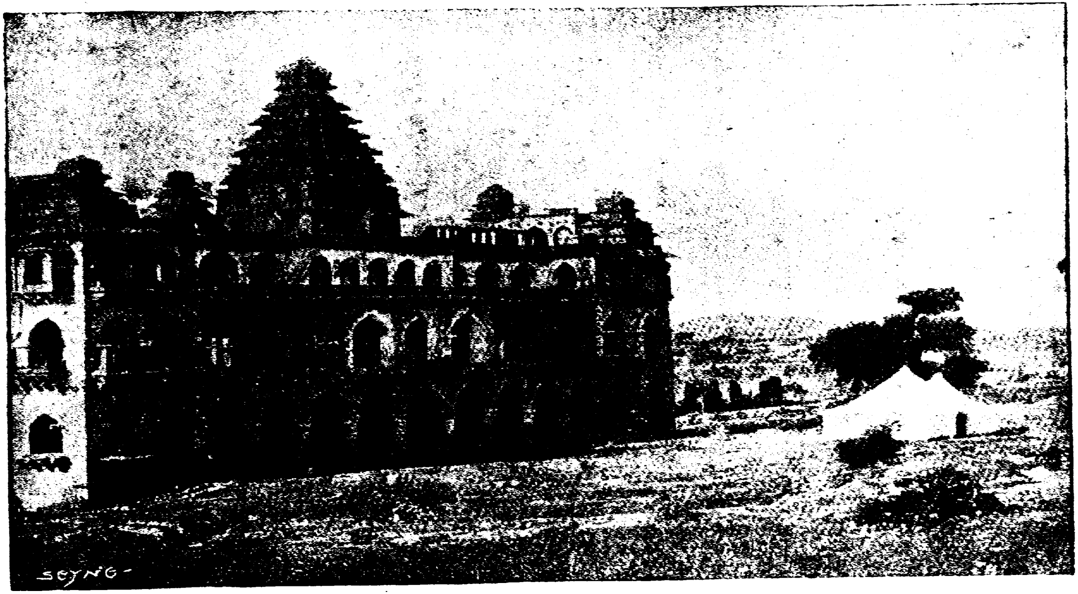
ঐরূপ আন্দোলিত হইয়া থাকে। মহাদেবের সঙ্গে পার্ব্বতীও আছেন, তাঁহার নাম জ্ঞানপ্রসন্না। পুরাণকার বলেন যে কোনও কারণে মহেশ্বর ভগবতীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নর-যোনি হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। দেবাদিদেবের শাপে ভগবতী নরদেহ ধারণ করিয়া ভবানীপতিকে সন্তুষ্ট করেন, মহাদেবও তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করিয়া জ্ঞানপ্রসন্না নামে অভিহিত করেন। ভগবতীর তপস্যা সময়ে দুর্গা নাম্নী জনৈকা রমণী তাঁহার অনুগমন করেন, তজ্জন্য দেবানুগ্রহে তিনিও মুক্তিলাভ করিয়া এই স্থানে স্বতন্ত্র মন্দিরে দুর্গাম্বা দেবী নামে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

পাহাড়ের পার্শ্বে শিব-মন্দিরের দক্ষিণদিকে মণিকুণ্ডেশ্বর স্বামীর মন্দির। কোনও রমণীর তপস্যায় মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মৃত্যুর সময়ে স্বয়ং তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই রমণী মুক্তিলাভ করে। তদবধি মুমূর্ষ ব্যক্তিগণকে এখানে আনয়ন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে মৃত্যুকালে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইয়া উর্দ্ধদিকে কর্ণ রাখিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করাইলে দক্ষিণ কর্ণ দিয়া তাহার আত্মা বাহির হয় এবং মৃতব্যক্তি মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। পর্ব্বতের পাদদেশে ব্রহ্মার মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের উপরের বিবিধ খোদিত মুর্ত্তি দেখিলাম। জন-প্রবাদ এইরূপ যে ব্রহ্মা এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দক্ষিণদিকে পর্ব্বতের অধিত্যকায় একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চতুর্দ্দিকের ঘাট প্রস্তরে বাঁধান। পুষ্করিণীর নিকট ভরদ্বাজ স্বামীর মুর্ত্তি। সেইজন্য এই স্থান ভরদ্বাজ মুণির আশ্রম বলিয়া খ্যাত। প্রতি মাঘ মাসে এস্থানে দশ দিবস ব্যাপী এক মহোৎসব হয়, তাহাতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

কালহস্তীর মৃত্তিকা লালবর্ণ ও বালুকা-মিশ্রিত। তাম্র ও লৌহ এস্থানে পাওয়া যায়, কাঁচের কারখানাও আছে। এখানকার জমিদারকে গভর্মেণ্ট C. S. I. উপাধি দিয়াছেন। গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এই জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

কালহস্তীর মন্দিরের বাহিরে কয়েকটি গপুরাম (সিংহদ্বার) আছে,

এই গপুরাম একটী সপ্ততল, অপর কয়েকটি পঞ্চতল, এই গপুরামের গায়েও পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের গায়ে যেরূপ কুৎসিৎ মূর্ত্তিসমূহ খোদিত আছে, তদ্রূপ বহু মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। গপুরামের নিকটে কাষ্ঠের একটী প্রকাণ্ড রথ দেখিলাম, তাহাও নানাবিধ জঘন্য মূর্ত্তিতে কলঙ্কিত বা শোভিত! এখানে বহু দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ লোক দেখিলাম,—অন্নাভাবে এবং শীতের প্রাদুর্ভাবে বহু লোক অকালে কাল-কবলে পতিত হয়। কয়েকটি উৎসাহী পাণ্ডা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিল, আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিলাম। ২০শে শ্রাবণ—অদ্য প্রত্যূষে কালহস্তী পরিত্যাগ করিয়া বেলা এগার ঘটিকার সময় চন্দ্রগিরি নগরে উপনীত হইলাম।



প্রাসাদ সম্মুখ—চন্দ্রগিরি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

চন্দ্রগিরি।

চন্দ্রগিরি একটী অতি ক্ষুদ্র সহর। জনসংখ্যা (৪,৯২৩) সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ৬৭৫ ফিট। ষ্টেসন হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণদিকে এই নগরটী অবস্থিত। নির্ম্মল সলিলা স্বর্ণমুখী নদী নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত। এস্থানের শোভা অনির্ব্বচনীয়। প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া মনকে কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া তোলে। সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় শৈলশ্রেণীর পর শৈলশ্রেণী, কোন স্থানে বা বহুদূর বিস্তৃত শালবন, কোথাও বা তৃণ গুল্মবিহীন পার্ব্বত্য ভূ-ভাগ, আবার কোন কোন স্থানে চাহিয়া দেখ,—বিরল-তৃণ-সমতল-ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দচিত্তে গো-মেষ-মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ বিচরণ করিতেছে। নানাদেশে নানা বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য্য দৃষ্টে মনে হয় কবি সত্যই গাহিয়াছেন—

"এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে প্রভু! সাজায়ে রেখেছ।"

প্রাচীন রাজপ্রাসাদের এক অংশই এখন ভ্রমণকারিগণের বাঙ্‌লোরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই ডাক বাংলায় একখানা টেবিল ও কয়েক-খানা চেয়ার ব্যতীত আর কিছুই নাই। আহারাদির সম্পর্কিত সকল বন্দোবস্তই ভ্রমণকারীদেব নিজের করিতে হয়। দুইটী ব্রাহ্মণের ও কয়েকটি শূদ্রের হোটেলও এখানে আছে, কাজেই হিন্দু তীর্থযাত্রীদিগের আহারাদি সম্পর্কে কিংবা থাকিবার সম্বন্ধে কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এখানে প্রতি বেলা আহারের ব্যয় ৵১০ পয়সা পড়ে। ষ্টেসনেই যাতায়াতের জন্য গো-যান ইত্যাদি পাওয়া যায়।

অবস্থানের সুবিধা অসুবিধা।

চন্দ্রগিরির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার যোগ্য। বিজয়নগরের রাজগণ ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তালিকোটে পরাভূত হইয়া এইস্থানে আসিয়া বাস করেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে উহা গোলকুণ্ডার সরদারগণের করতলগত হয়, তাহার প্রায় শত বৎসর পরে আর্কটের নবাব উহা অধিকার করেন।

প্রাচীন ইতিহাস।

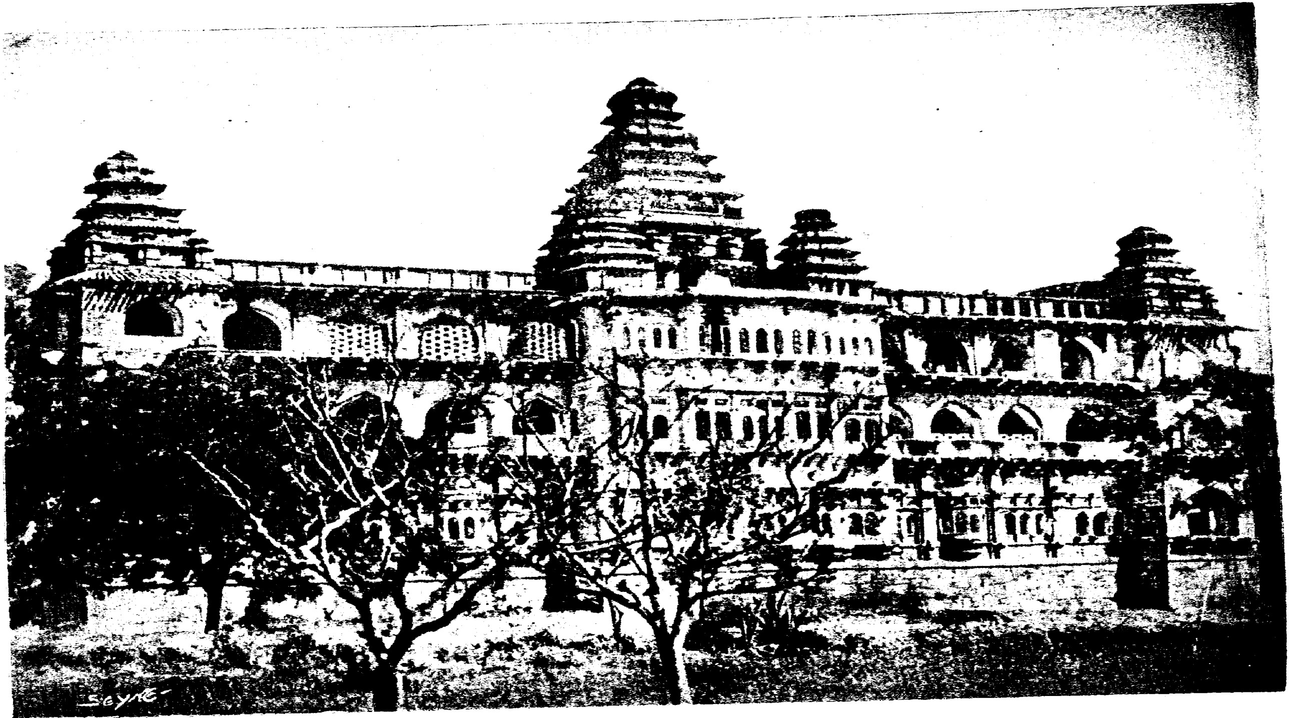
১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আবদুল বাহাব খাঁ ঐ দুর্গের অধিপতি ছিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলী ঐ দুর্গ জয় করেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা মহীশূরের অধীন ছিল। চন্দ্রগিরিতে বহু দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে। তন্মধ্যে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ

দ্রষ্টব্য স্থান।

এবং রাজপ্রাসাদের নিম্নতলস্থ দুইটী কক্ষ বিশেষরূপে দর্শনীয়। ১। প্রাচীন দুর্গ—এই দুর্গটি চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি হইতে ৬০০ শত ফিট উচ্চ স্বতন্ত্র একখণ্ড সুবিশাল গ্রেনাইট প্রস্তরের ক্ষুদ্র গিরি-শেখরে বিনির্ম্মিত। এই ক্ষুদ্র পাহাড়টিকে অধিকতর সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য করিবার জন্য দুইটী গ্রেনাইট প্রস্তরের সুকঠিন প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছিল। যে যে স্থানে পর্ব্বত গাত্র খাড়া উঁচু এবং সম্পূর্ণরূপে দুরারোহ, কেবল সেই সেই স্থানে গড়বন্দি করা হয় নাই। এই গিরির তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি এখনও কয়েকখানা ছোট ছোট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী এবং পূর্ব্বদিকের এক স্থানে একটা উঁচু ঘণ্টা পিটাইবার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কালের কি বিচিত্র লীলা, যে স্থানে একদিন শত শত সৈন্যগণ সশস্ত্র ও সুসজ্জিত থাকিত, প্রতি দ্বারে দ্বারে প্রহরী থাকিত, নানা-প্রকার উৎসবে ও উল্লাসে দিন রাত প্রমোদিত থাকিত এখন তাহা নীরব ও বিজন। দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া যেদিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন সেদিকেই ছোট বড় গিরিশ্রেণী ও নারিকেল বৃক্ষের সারি দৃষ্টিপথে পতিত হইবে।

নিম্নভূমির দুর্গটি অভ্যন্তরস্থ প্রচীর দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। দরবার মহল, রাণীমহল ইত্যাদি প্রকোষ্ঠগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। যে গৃহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে মান্দ্রাজ প্রদান করিবার সন্ধিপত্র সর্ব্বপ্রথমে লিখিত হয়। তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের অধিপতিবৃন্দগণ এখন কোথায়?

চন্দ্রগিরির ধ্বংসাবশেষ দৃশ্যগুলি বড়ই মনোরম। খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তি এবং স্তম্ভ ইত্যাদি বহু পরিমাণ এখনও বিদ্যমান আছে। ধ্বংসাবশিষ্ট গপুরামের নিম্নাংশ দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে সময়ে ইহা অত্যন্ত সুন্দর ও উচ্চ ছিল, কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা এখন ভগ্নদেহ লইয়া কেবল প্রাচীনের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজমান। এ নগরে সরকারি আফিস, জেল, ডাকঘর, স্কুল ইত্যাদি বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিক্ষার উপযোগী সমুদয় আছে



রাজপ্রাসাদ—চন্দ্রগিরি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

ত্রিপতি।

চন্দ্রগিরি হইতে ত্রিপতি আসিলাম, এই স্থানের সৌন্দর্য্য লোচনানন্দদায়ক। উত্তর দিকে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী ত্রিমলী গিরিশ্রেণীর বন্ধুর আয়তন, বিটপীশ্রেণীর সবুজ-সুন্দর দৃশ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ ছোট ছোট অনুন্নত শৈলরাজির বঙ্কিম দেহভঙ্গিমা দেখিলে আগন্তুক পথিকের নিকট প্রথম এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। ত্রিপতি নগরী উত্তর আরকাড়ু জেলার একটী বিখ্যাত বৈষ্ণব তীর্থ এবং চন্দ্রগিরি তালুকের প্রধান নগর। এস্থানে পাকাল জংশন শাখা রেলের একটী ষ্টেসন আছে, ষ্টেসনটি নিম্ন ত্রিপতি সহর হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ডাক বাংলা এবং তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীদের থাকিবার সর্ব্ববিধ সুবিধা বিদ্যমান। যাত্রিগণ ছত্রে বিনা ব্যয়ে অবস্থিতি করিতে পারেন, কিন্তু আহারাদির বন্দোবস্ত নিজের করিতে হয়, এই ছত্র ব্যতীত ব্রাহ্মণদের জন্য পাঁচটী হোটেল এবং অন্যান্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকের জন্য আটটী হোটেল আছে, সেখানে ৵১০ হইতে ১০ আনা পর্য্যন্ত প্রতি বেলা আহারের ব্যয় পড়ে। যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা এবং বাণ্ডি উভয়ই পাওয়া যায়। নগরটি দুই ভাগে বিভক্ত; পর্ব্বতের পাদদেশে যে অংশে দেব-মন্দিরাদি বিরাজমান তাহাকে উচ্চ ত্রিপতি কহে।

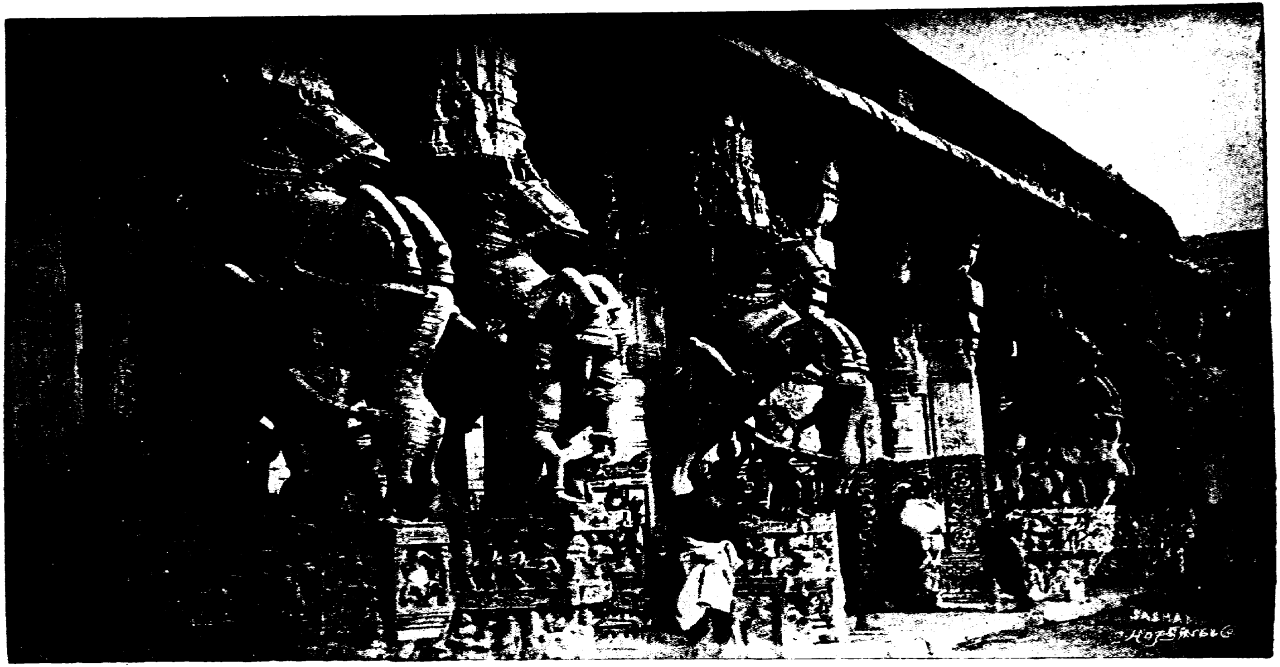
সাধারণ বর্ণনা।

নিম্ন ত্রিপতি হইতে ছয় মাইল পূর্ব্ব দিকে তিরুমলয় পর্ব্বত অবস্থিত। তিরুমলয়ে আরোহণ করিবার চারিটী প্রধান প্রধান পথ আছে। প্রথমটী নিম্ন ত্রিপতি হইতে উত্তর দিকে, দ্বিতীয়টি চন্দ্রগিরির দিক হইতে পূর্ব্বোত্তরাভিমুখে, তৃতীয়টি নাগপট্টন হইতে পশ্চিম দিকে ও চতুর্থটী বালপট্টু হইতে পূর্ব্ব দিকে। ইহা ভিন্ন এই পর্ব্বতারোহণের আরও অনেক সুঁড়ি পথ আছে। ইহাতে উঠিবার সোপান-শ্রেণী নিম্ন ত্রিপতি হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। তিরুমলয় পর্ব্বতের সাতটি শৃঙ্গ প্রধান। প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, তন্মধ্যে

তিরুমলয় পর্ব্বত।

শেষাচলম্ নামক শৃঙ্গেই শ্রীনিবাসদেবের মন্দির অবস্থিত। এই নিমিত্ত অনেকে এই গিরিশ্রেণীকেই শেষাচলম্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতের অপর নাম ব্যঙ্কট্। স্কন্ধপুরাণান্তঃর্গত ব্যাঙ্কটাদ্রি মাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, কোন এক সময়ে ভগবান বিষ্ণু কমলার সহিত অন্তঃপুরে ক্রীড়া কৌতুকে নিমগ্ন ছিলেন, পুরদ্বারে শেষনাগ দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এইরূপ সময়ে বায়ু আসিয়া বিষ্ণুর দর্শনার্থ অন্তঃপুরে যাইতে চাহিল, শেষনাগ তাহাকে নিষেধ করায় বায়ু বলপ্রয়োগে অন্তঃপুরে যাইতে চাহিল, শেষনাগও তাহাকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল ইহাতে পরস্পরের মধ্যে কলহ হয়, কমলা-পতি পুরদ্বারে এইরূপ কলহ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন "তোমরা বিবাদ করিতেছ কেন?" পরে উভয়ের বক্তব্য শুনিয়া কহিলেন "জগতের মধ্যে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। বিষ্ণুর মুখে এই কথা শুনিয়া শেষনাগ বলিল "আমাদের মধ্যে কে বলবান প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। আমি জাম্বুনদ-তটস্থ ব্যাঙ্কটগিরি বেষ্টন করিয়া থাকিব, বায়ু যদি আমাকে সে স্থান হইতে স্থানচ্যুত করিতে পারে, তবেই তাহাকে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ট বলবান বলিয়া স্বীকার করিব, নচেৎ নয়।" শেষনাগ ব্যঙ্কটগিরি বেষ্টন করিয়া ধরিলে বায়ু তাহাকে উড়াইয়া অর্দ্ধলক্ষ যোজন দূরে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ৩২ যোজন উত্তরে ও পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম ভাগে সুবর্ণমুখীনদীর বামভাগে ফেলিয়া দিয়াছিল। শেষনাগ পরাজিত হইয়া নিতান্ত অপমানিত বোধ করেন এবং এই গিরিশৃঙ্গেই বহুদিন যাবত বিষ্ণুর তপস্যা করেন। তপস্যাতে বিষ্ণু পরিতুষ্ট হইয়া বর দিতে আগমন করিলে শেষনাগ বলিল "প্রভু! আপনি বৈকুণ্ঠে যেমন আমার কুণ্ডলে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তদ্রূপ ব্যঙ্কট শৈলরূপ আমার দেহেও নিত্য বাস করুন। ভগবান ভক্তের কথায় সম্মত হইলেন এবং তদবধি শঙ্খ, চক্র হস্তে ব্যঙ্কট গিরিশেখরে বাস করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু ব্যঙ্কটগিরির শিখরদেশে অবস্থিত আছেন বলিয়া ইনি ব্যঙ্কটপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বরাহপুরাণানুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা-গমন সময়ে সদলে এই স্থানে আসিয়া "স্বামী তীর্থে" স্নানাদি করিয়াছিলেন। স্কন্ধপুরাণে আরও লিখিত

পৌরাণিক কথা।



শেষাচলম্—মন্দিরের কারুকার্য্য ।

আছে যে "পাণ্ডবগণ বনবাস কালেও এক বৎসর কাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাহা "পাণ্ডব তীর্থ" নামে সর্ব্বজন পরিচিত। কলির ৪১১৮ অব্দে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং ৯০০ নয় শত বৎসর পূর্ব্বেও ইহা মহা তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পর্ব্বতস্থিত ঝরণা ও তাহার নিকটস্থ একটী জলাশয় পুণ্য তীর্থ বলিয়া বিবেচিত হয়; তন্মধ্যে (১) স্বামীতীর্থ (২) বিরদ্ গঙ্গা (৩) পাপবিনাশিনী (৪) পাণ্ডব তীর্থ (৫) তুম্বীর কোণ (৬) কুমারবারিকা (৭) গোগর্ভ প্রধান।

এস্থানে বৎসরব্যাপীই যাত্রী সমাগম হয়। ভারতের সুদূর প্রান্তবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ধর্ম্মোদ্দেশে এ স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। প্রতি ভাদ্র মাসে ব্রহ্মোৎসবম্ নামক এক মেলা হইয়া থাকে সে সময়েও যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

যখন বসন্ত-রাণী প্রকৃতি-সুন্দরীকে মনোমোহন ফুল্ল কুসুম মালা পরাইয়া ও শ্যামল বিটপী রাজিকে হরিৎবসনে সাজাইয়া মধুর কণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীত রবে জগৎ আমোদিত করিয়া তোলেন, তখন সেই শোভা সম্পদের অপূর্ব্ব পুলকে পুলকিতান্তঃকরণে ত্রিপতি জেলাধিবাসিগণ যে উৎসব করেন, তাহার নাম গঙ্গা-যাত্রা, গঙ্গা-যাত্রা নাম শুনিয়া পাঠকগণ শিহরিয়া উঠিবেন না; উভয় গঙ্গা-যাত্রায় বহু প্রভেদ বিদ্যমান। এই উৎসব উপলক্ষে বহু মহিষ, ভেড়া, ছাগল, এমন কি কুক্কুট পর্য্যন্ত বলি দেওয়া হয়। নিম্ন ত্রিপতিতে প্রায় দ্বাদশটি মন্দির আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই তেমন দর্শনীয় নহে।

নিম্ন ত্রিপতি।

এ স্থানের গোবিন্দরাজ স্বামীর এবং রামস্বামীর মন্দিরই বিশেষ বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত এস্থানে ৩১টি তীর্থম্ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। তন্মধ্যে স্বামী পুস্করিণীই প্রধান। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১০০ × ৫০ গজ। চারিদিকে গ্রেনাইট প্রস্তরদ্বারা সোপান বাঁধান। জল সবুজবর্ণ এবং দুর্গন্ধজনক। যাত্রিগণ ইহাতে অবগাহন করিয়া থাকে। এই তীর্থ দেবালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত।

কপিলাতীর্থ।

নগরের এক মাইল উত্তরে তিরুমলয় পর্ব্বত-গাত্রে কপিল-তীর্থ নামক একটী জল-প্রপাত আছে। এদেশবাসিগণ বলিয়া থাকেন যে কপিলমুনি কিছুদিন এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই এস্থানের

নাম 'কপিলাতীর্থ' হইয়াছে। পর্ব্বতারোহণের পূর্ব্বে যাত্রিগণকে এস্থানে স্নান করিতে হয়। এযায়গাটি নীরব ও নির্জ্জন। জন-কোলাহল হইতে দূরে,—গিরিপদপ্রান্তে প্রকৃতি-সুন্দরীর স্নেহাঞ্চল-বর্দ্ধিত লতা-গুল্মাদি পরিবেষ্টিত বিশাল মহীরুহ সমূহের ছায়া-শীতল শিলাপরি উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অনন্ত সৌন্দর্য্যরাজির অনন্ত মহিমা ক্ষুদ্র সান্ত হৃদয়ে অনুভব করতঃ যে অভূতপূর্ব্ব প্রীতিসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল, এখনও আনন্দদায়ক। তখন মনে হইয়াছিল—

"———be lowly wise;
Think only what concerns thee, and thy being:
Dream not of other worlds, what creatures there
Live, in what state, condition or degree:
Contented that thus far hath been revealed,
Not of earth only, but of highest heaven."*

প্রকৃত পক্ষে যিনিই এই কপিলাতীর্থ দর্শন করিয়াছেন, সারাজীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না। প্রকৃতির লীলাভূমি, দিগন্ত বিস্তৃত তিরুমলয় পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশস্থিত এই সাধুজন-মনোমোহন নির্ঝর-বারি বিধৌত, বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ, বিহগ-কল-কাকলী-মুখরিত স্থানটিকে দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি-জননী সংসারের সর্ব্ববিধ গ্লানির মধ্য হইতে অতি যত্নে এই সুরম্য প্রদেশটিকে স্বীয় স্নেহাঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। অদূরবর্ত্তী গিরিশেখর হইতে একটী ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী নির্গত হইয়া কপিল তীর্থমে পতিত হইতেছে। এই প্রস্রবণের তিনটি ধারার নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ইহার জল স্বচ্ছ ও সুপেয়। মর্কট কুলের আধিপত্য এস্থানে একটু বেশী; ইহাদের উৎপাতে অনেক সময় নিরীহ যাত্রিগণকে বিব্রত হইতে হয়। উহাদিগকে কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি না দিলে যাত্রিগণের স্নানাদি করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কপিলাতীর্থের পশ্চাতে গিরিশ্রেণীর পাদদেশে একটী গোপুরাম আছে, ইহাকে আলিপিরি গোপুরাম কহে। এই গোপুরামের দ্বার পর্য্যন্ত সর্ব্বজাতীয় লোকই

পর্ব্বতারোহণের পথ।

* Paradise Lost, Book VIII, from Raphael's address to Adam.



বালাজি—ত্রিপতি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু ইহার পর হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতির প্রবেশাধিকার নাই। এখান হইতেই পর্ব্বতারোহণের সিঁড়ি আরম্ভ। এই সোপানশ্রেণী এক মাইল লম্বা ও ভূমির সমতল ভাগ হইতে প্রায় এক হাজার ফিট উচ্চ হইবে। সিঁড়ির এক পার্শ্বে কিছু উচ্চে দুইটি কূপ আছে, একটীর জল উষ্ণ ও অপরটীর জল শীতল। এই আরোহণের পথে স্থানে স্থানে পরিশ্রান্ত পথিকগণের বিশ্রামার্থ প্রস্তর নির্ম্মিত মণ্টপম্ ইত্যাদি আছে, তাহাতে যাত্রিগণ ইচ্ছানুযায়ী বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে যাহারা পর্ব্বতারোহণে অশক্ত, তাহাদের পূর্ব্বাহ্নেই ডুলি সংগ্রহ করা আবশ্যক. উচ্চ ত্রিপতিতে ও নিম্ন ত্রিপতিতে যাতায়াতের জন্য জন প্রতি ৩৷৴ আনা করিয়া ডুলি ভাড়া পড়ে। আমরা ডুলিতেই পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলাম। সিঁড়ি গাত্রে অনেকেই নিজ নিজ নাম ধাম খোদিত করিয়া আইসেন; হায়! মানুষ নিজকে নশ্বর জগতে অবিনশ্বর করিবার জন্য কত ব্যাকুল! এ পথে এক প্রকার লোক আছে তাহারা যাত্রিগণকে স্বীয় স্বীয় নাম খোদিত করিবার জন্য অনুরোধ করে, আমরাও ইহাদের মিনতিতে স্বীয় স্বীয় নাম খোদাই করাইলাম; প্রতি অক্ষর এক পয়সা। সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ স্থানের গোপুরামটি "গালি" গপুরাম নামে খ্যাত। এই গোপুরামের পশ্চাতে বৈকুণ্ঠ নামক মন্দিরে রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজমান। বৈকুণ্ঠমন্দিরের ঈশানকোণে একটী গুহা আছে তাহাও বৈকুণ্ঠ গুহা নামেই পরিচিত; কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীশৈলে আগমন কালে এই গুহায় অনুচরগণসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখান হইতে ব্যঙ্কটেশ্বর যাইবার পাকা পথ আছে।

উচ্চ ত্রিপতি।

পর্ব্বতোপরিস্থিত উচ্চ ত্রিপতি নগরটী অতি ক্ষুদ্র। ইহা স্বামীতীর্থের ব্যঙ্কটস্বামী ও বরাহস্বামীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতির এস্থানে বাস করিবার নিয়ম নাই। জন-সংখ্যা পনের ষোল শতের অধিক হইবে না। যাত্রিগণের থাকিবার জন্য এস্থানেও ছত্র আছে, এ সমুদয় ছত্র মহীসুর, কোচীন, কালহস্তী ও ব্যঙ্কটগিরির জমিদারগণ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের পার্শ্বে সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ অবস্থিত, স্তম্ভ সমুহের কারুকার্য্য অত্যন্ত সুন্দর। রাস্তার দিকে তাহার

প্রত্যেকটিতে বড় বড় মূর্ত্তি খোদিত। এই মণ্ডপের একাংশ পড়িয়া গিয়াছিল, লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে তাহার জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এস্থানে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর-বিনির্ম্মিত রথ পতিত দেখিলাম, শুনিলাম যে ইহা চন্দ্রঢোল নামক জনৈক রাজা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ইহাতে ব্যঙ্কটেশ্বরের রথ হইত, এখন তাহা হয় না। এস্থানে স্বামীতীর্থে স্নান করিতে হয়। দেবালয় তিনটী ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, বাহিরের প্রাচীর কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার এক পার্শ্বে একটী খোদিত লিপি (inscription) দেখিলাম। এই প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ১৩৭ গজ ও প্রস্থে ৮৭ গজ। মন্দিরের দ্বার সমীপে একটী ক্ষুদ্র গপুরাম অবস্থিত, ছোট হইলেও ইহার শিল্প-নৈপুণ্যাদি প্রশংসনীয়। দেব-মন্দির মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় বিরাজিত। ইহার দক্ষিণের এক হস্তে চক্র, অপর হস্ত নিম্নাভিমুখে পৃথিবীর দিকে। বামদিকের এক হস্তে শঙ্খ ও অপর হস্ত পদ্ম দ্বারা সুশোভিত। এই মূর্ত্তির সহিত শক্তি না থাকায় কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে ইহা কেবল শিব মূর্ত্তি ছিল, রামানুজের যত্নে এই মূর্ত্তিতে শঙ্খ-চক্র শোভিত দুইখানি সোনার হাত যুড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুগে বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে কুলোত্তুঙ্গ ঢোলের পুত্র তোণ্ডমল চক্রবর্ত্তী এই প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরস্থ দেবের দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দক্ষিণা দিতে হয়; দেবের দুগ্ধ স্নান দেখিতে হইলে ১৩৲ টাকা, তুলসী দ্বারা সহস্র নাম অর্চ্চনা ৭৲ টাকা ও কর্পূরালোকে দেবতা দর্শন করিতে হইলে এক টাকা দিতে হয়। বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত অর্চ্চনা ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই দেবালয়ের বার্ষিক আয় প্রায় ২১ একুশ হাজার টাকা ও ব্যয় পনের হাজার টাকা। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য দেবালয়ে যেমন সেবাদাসী আছে এখানে তদ্রূপ নাই। যে সকল মহাত্মারা এই দেব-মন্দিরের উন্নতিকল্পে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন অদ্যাপিও মন্ত্র-পুষ্পের সহিত তাঁহাদের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। দেবালয়ের হস্তলিপি হইতে তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ অবগত হওয়া যায় যে, রাজা পরীক্ষিত প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় প্রাচীর ও তাঁহার পুত্র জন্মেজয় বহির্ভাগের প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, পরে বিক্রম



পাপনাশন্ তীর্থ—ত্রিপতি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নামে অপর এক রাজা এই মন্দিরের সংস্কার করাইয়া দেন। এস্থানে প্রতি আশ্বিন মাসে দশ দিবস ব্যাপী একটী উৎসব হয়, ইহাই এখানকার প্রধান উৎসব। উৎসবের পঞ্চম দিনে গরুড়োৎসব ও দশম দিনে নারায়ণ-বনে পদ্মাবতীর সহিত বাৎসরিক কল্যাণোৎসব হইয়া থাকে। স্বামী পুষ্করিণীর তীরে একটী সামান্য মন্দির আছে, তাহাতে বরাহস্বামীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

পাপবিনাশিনী তীর্থ।

দেবালয় হইতে তিন মাইল দূরে পাপবিনাশিনী নামক একটী তীর্থ আছে। ইহা ছোট একটী জল-প্রপাতের নীচে অবস্থিত। এই জল-প্রপাতের নীচে দাঁড়াইয়া স্নান করিলে প্রবাদ এইরূপ যে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপানুষ্ঠানেরও বিনাশ হয়। শুনিলাম যে পাপের তারতম্যানুসারে জলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু আমারা বিশেষ ভাবে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। স্থলপুরাণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পূর্ব্বে এই স্থানে ঋষিগণের পুণ্য তপোবন বিদ্যমান ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ইহার চারিদিকেই নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এস্থানে কাহারও কোনও মানস করিবার আবশ্যক হইলে কপিলাতীর্থে স্নান করিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত ব্যঙ্কটেশ্বরের কাঁটা গলায় ধারণ করিতে হয়। পরে স্বামীতীর্থে অবগাহন করিলে কাঁটা আপনি হইতে খুলিয়া পড়ে, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত। সাধারণতঃ যাত্রিগণ পীড়ামুক্তি কামনায় এবং পুত্রার্থে এস্থানে আগমন করে; এ তীর্থে স্ত্রী যাত্রিগণের সংখ্যাই বেশী হয়। রমণীগণ এখানে কেশমুণ্ডন করিয়া থাকেন, মণ্টপমের নিকটেই নাপিতগণ ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করে। পূর্ব্বে এই মন্দিরের আয় দুই লক্ষ টাকা ছিল, এখনও নিতান্ত অল্প নহে। ব্রাহ্মণ মোহান্তগণের কর্ত্তৃত্বাধীনেই এই মন্দিরের সমুদয় ভার ন্যস্ত। পাহাড়ের উপরে শ্বেত চন্দনের forest আছে, এই ফরেষ্ট দেবতার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত—দেবতার প্রধান মোহান্ত উহার তত্ত্বাবধানাদি করিয়া থাকেন। ইহাতে দেবালয়ের যথেষ্ট অর্থাগম হয়—কেহ এই কাষ্ঠ ভাঙ্গিলে এবং লইলে দণ্ডিত হয়। বৃন্দাবনের সোণার তালগাছের ন্যায় এখানেও একটী ধ্বজা আছে—ইহাতে কাষ্ঠের উপর পিত্তলের স্বর্ণ গিল্টি আছে। ইহার উপরে ধ্বজা উড়াইতে হয়।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় যখন চারিদিক আবৃত হইয়া আসিতেছিল, যখন দুই একটী করিয়া তারা একে একে প্রফুল্ল-পদ্ম-কোরকবৎ সুনীল-গগন-সাগরে ভাসিয়া উঠিতেছিল, তখন আমরা উপর ত্রিপতি হইতে নিম্ন ত্রিপতিতে অবরোহণ করিলাম; দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে শেষাচলমের শৃঙ্গরাজি আমাদের নয়ন-পথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। উচ্চ ত্রিপতির ব্যঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দির সন্নিকটে গোগর্ভ তীর্থের কাছে ক্ষেত্র-বলি-গুণ্ডি নামে এক প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে, এ স্তম্ভের নিকট কেহ মিথ্যা কথা কহিতে সাহসী হয় না। যে সকল বিষয়ের সত্যাবধারণ করিতে বিচারক অপারগ হন, এস্থানে তাহা নির্ব্বিবাদে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বাদী ও প্রতিবাদী গো-গর্ভ তীর্থে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে এই স্তম্ভের নিকট আসিয়া যাহা বলে তাহাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ শপথ করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীকে সাত টাকা জমা দিতে হয়। তৎপরে খিচুরি, পুরি, অন্ন ও দধিমণ্ডীর ভোগ হইয়া থাকে। এই ভোগপ্রসাদ বৈরাগিগণ পায়।

বলিগুণ্ডি।

নিম্ন ত্রিপতি নগর কখন কখন স্বামিজী গোবিন্দপত্তন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সহর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। নগরের তিন মাইল দক্ষিণদিকে সুবর্ণমুখী নদী প্রবাহিতা। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে বহুদূর ব্যাপিয়া অগণন ছোট ছোট গিরিশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ডেপুটি তহশীলদার ও ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফের আফিস আছে। সর্ব্বশুদ্ধ উভয় ত্রিপতিতে ৩১টি দেবালয় বিদ্যমান। আমরা নিম্ন ত্রিপতি হইতে সেই রাত্রিতেই ঝট্‌কারোহণে রেণীগুণ্টা (Renigunta) জংশনে উপনীত হইয়া এক হোটেলে আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। এ দেশের হোটেলে ও আমাদের দেশের হোটেলে বহু প্রভেদ। দেশভেদে রুচিভেদে খাদ্যাদিরও যে পার্থক্য হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। এখানকার খাদ্য দ্রব্যাদি (১) সাক (২) সম্বরা ও (৩) সোরা এই তিন ভাগে বিভক্ত। সাক আমাদেরি দেশের ন্যায় প্রস্তুত হইয়া থাকে, মোটের উপর যাহা কিছু ভাজিয়া রসুই করা হয়, তাহাই সাক শ্রেণীর অন্তর্গত। (২) সম্ব্‌রা অর্থাৎ যে সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে 'সম্বার'

রেণীগুণ্টা।

বা ফুরণ দিতে হয়, তাহাই সম্ব্রার শ্রেণীভুক্ত। (৩) সোরা অর্থাৎ টক্। এ দেশের ব্রাহ্মণ মহাশয়দের প্রস্তুতি ভোজ্য দ্রব্য বঙ্গদেশবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই যে রসনার তৃপ্তিদায়ক নহে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পর দিবস বেলা বারোটার সময় কাঞ্জীভরাম বা কাঞ্চী নগরী দর্শনার্থ রেণীগুণ্টা পরিত্যাগ করিলাম। লৌহ-অশ্ব বেগে ছুটিয়া চলিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী নয়ন-মন-মোহকর। কোথাও ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা খরস্রোতা তরঙ্গিণী তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিয়া চলিয়াছে, কোথাও বা ঘন বিন্যস্ত নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় বসিয়া কৃষক বালকগণ ক্ষেতের পাহাড়ায় নিযুক্ত, কোথাও বা দু' এক জন পল্লী রমণী উৎসুক নয়নে বাস্পীয় শকটের দর্শনাভি-লাষিণী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; প্রতি পলকেই রঙ্গালয়ের দৃশ্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় নব নব দৃশ্য নয়ন সমক্ষে উন্মুক্ত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে ইহার বৈচিত্র্য প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি হয়। আরকোনাম (Arkonam) জংশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া আপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় কাঞ্চী নগরীতে পৌঁছিলাম। আমাদের ত্রিপতি তীর্থের পাণ্ডা তাহার ভ্রাতষ্পুত্র কৃষ্ণাইয়া পাণ্ডার নিকট একখানা স্বীয় নামাঙ্কিত কার্ড দিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে তাহা দেখাইবা মাত্রই তিনি আমাদিগকে সযত্নে নগরে লইয়া গেলেন এবং তথায় একটী বাসা ঠিক্ করিয়া দিলেন।

কাঞ্চী বা কাঞ্জীভরম্।

অদ্য কাঞ্চীনগরী দর্শন করিলাম। এ স্থানের লোকসংখ্যা ৪৬,১৬৪। ইহারই প্রাচীন নাম কাঞ্চী, বা কাঞ্চীপুরম্ (স্বর্ণনগরী)। যে সাতটি মহাতীর্থ মোক্ষপ্রদ বলিয়া কথিত, কাঞ্চী তাহার মধ্যে অন্যতম। (১) এই নগরী দক্ষিণ-ভারতের কাশী নামে বিখ্যাতা। কাঞ্চী নগরী দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল হইবে। রাস্তাগুলি সমুদয়ই সুপ্রশস্ত। বিশেষতঃ, উহাদের উভয় পার্শ্বে নারিকেলবৃক্ষশ্রেণী থাকায় বড়ই সুন্দর দেখায়। পথের ধারে স্থানে স্থানে বাগান, এবং ছোট ছোট কুঞ্জ। সে সমুদয় ছায়া-নিবিড় স্থানে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণেও তাঁতীগণ তাঁত পাতিয়া বস্ত্র ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য বয়ন করিয়া থাকে। নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর শীতল ছায়ায় ও মৃদুমন্দ সমীরসঞ্চালনে তাহারা দ্বিপ্রহরের রৌদ্র-দীপ্ত প্রকৃতির রুদ্রতেজ অনুভব করে না। এই নগরী সাধারণতঃ শিব-কাঞ্চী ও বিষ্ণু-কাঞ্চী, এই দুই ভাগে বিভক্ত। এ স্থানে জলের কল আছে।

সাধারণ বর্ণনা।

ব্রাহ্মণের পাঁচটি ও শূদ্রের একটি হোটেল থাকায় নবাগত যাত্রিগণের আহারাদি সম্পর্কে কোনও অসুবিধা হয় না। ব্যয়ও সামান্য; ৵১০ দশ পয়সা হইতে।০ চারি আনা পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত যাত্রিগণের থাকিবার জন্য দশটি ছত্রম্ আছে। এ সকল ছত্রে থাকিতে পারা যায়, কিন্তু আহারাদির বন্দোবস্ত যাত্রীদিগকে নিজে করিয়া লইতে হয়। যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা, গো-যান ইত্যাদি সমুদয়ই পাওয়া যায়।

চোল রাজ্যের মধ্যে ইহা একটী বিশেষ বিখ্যাতা নগরী। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাঞ্চী টোণ্ডামণ্ডলমের রাজধানী ছিল। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজবংশের পতন হইলে, ইহা গোলকুণ্ডার মুসলমান নরপতির শাসনাধীন

---

(১) অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা ॥— স্কন্দপুরাণম্।



কামাক্ষী দেবী—কাঞ্চী

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

হয়। তাহার কিয়ৎকাল পরে ইহা আরকট রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব ফরাসীদিগের নিকট হইতে ইহা অধি-
প্রাচীন ইতিহাস। কার করেন। কিন্তু ঐ বর্ষেই রাজা সাহেবকে ফিরাইয়া দিতে হয়। ফরাসীরা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আক্রমণ করিয়া অগ্নিসাৎ করেন। পর বৎসরে ইংরেজগণ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে মান্দ্রাজে অভিযান করেন, এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এই নগর ফরাসীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সিয়ং যখন (কি-এন্-চি-পু-লো) কাঞ্চী নগরীতে আগমন করেন, তখন ইহা দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে এই স্থানে এক শতটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ৮০টি দেবমন্দির ছিল। ধর্ম্মপাল বোধিসত্ব কাঞ্চীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিত। সেই জন্য এ স্থানে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু-যাত্রী সমাগত হইত। পাণ্ড্যরাজগণের সময়ে এ স্থানে জৈন ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। জৈনগণ এ স্থানের বহু বৌদ্ধ অধিবাসীকে বিতাড়িত করেন।

এই নগরের অনতিদূরে পুল্ললপুর নামক একটি স্থান দৃষ্ট হয়। পুল্লল-পুরে ইংরেজ ও মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে বিখ্যাত হাইদার আলি জেনারেল বেলীর সৈন্যব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ঘটে। যখন কাঞ্চীপুরে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৮) রাজ্যাভিষিক্ত হন, তখন তিনি কাঞ্চীপুরের শতস্তম্ভ মঠ ও কতকগুলি মন্দির সংস্কৃত করিয়াছিলেন।

১৪৩১ শকে খোদিত একখানি অনুশাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, অত্রত্য বরদরাজ স্বামীর মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই সমুদয় গ্রাম হইতে প্রায় এগার শত টাকা কর আদায় হইত। কাঞ্চীনগরী যে কেবল তীর্থস্থান, তাহা নহে। ইহা একটি মহা পীঠস্থানও বটে। বৃহন্নীল তন্ত্র বলেন,—

"কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী স্যাদবস্ত্যামর্তিপাবনী।

—বৃহন্নীলতন্ত্রে পঞ্চম পাঠ।

তোড়ল তন্ত্রের মতে, এই তীর্থ মহাদেবের কটিদেশস্বরূপ। যথা,—

নাভিমূলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটিদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে॥
—তোড়লতন্ত্র; ৭ম উল্লাস।

কাঞ্চীতে প্রস্তরনির্ম্মিত বহু মন্দির, মূর্ত্তি ও নানাপ্রকার প্রাচীন ঐতিহাসিক বিখ্যাত দর্শনীয়ে পরিপূর্ণ। এই নগরী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষরূপে দর্শনযোগ্য। প্রত্যেক মন্দিরের প্রত্যেক প্রস্তরস্তম্ভে কত প্রাচীন তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন, তাহা কে বলিতে পারে? কত স্মৃতি, কত শিল্প, কত ধনৈশ্বর্য্যের গৌরবস্তম্ভ এই সমুদয় মন্দিরসমূহে বিদ্যমান; তাহার উদ্ধার দৈবজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতীত অপরের পক্ষে অসম্ভব। ইহা দেখিবার, কিন্তু বুঝাইবার নহে। প্রাচীন শিল্প-নৈপুণ্য ও স্থপতিবিদ্যার অভূতপূর্ব্ব কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু কাহাকেও তাহা বুঝাইতে পারি, এমন শক্তি নাই।

শিবকাঞ্চীতে শিব-মন্দির ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু-মন্দির অবস্থিত। শিবকাঞ্চীতে একাম্রনাথ, ভগবতী কামাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ও সমাধিস্থান। বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজস্বামী নামক বিষ্ণুর উলঙ্গ মূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত বেগবতীধারাতীর্থ, রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, বুধতীর্থ ও শনিতীর্থ প্রধান। আমরা সর্ব্বপ্রথমে শিব-কাঞ্চী দর্শন করিলাম। এ দেশীয় লোকের নিকট ইহা বারাণসীতুল্য। শিব-কাঞ্চীর এই মন্দিরটি একাম্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। এই শিবলিঙ্গ দক্ষিণ-ভারতের বিখ্যাত পঞ্চলিঙ্গমের অন্যতম। মন্দিরের সুবৃহৎ সুউচ্চ গোপুরামটি বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহাতে অদ্যাপিও হাইদার আলির কামানের গোলার আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তকালে এখানে পঞ্চদশদিবসব্যাপী মেলা বসে। বড় গোপুরামটি ব্যতীত এই মন্দিরে আরও কয়েকটি ছোট ছোট গোপুরাম ও সুবৃহৎ মণ্ডপ আছে। ইহার একটি অট্টালিকাতে এক হাজার প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান। পাঠক! একবার কল্পনা করুন যে, প্রাচীন ভারতে স্থপতিবিদ্যা কত দূর উন্নত ছিল! যে গৃহে সুবৃহৎ নানাপ্রকার কারুকার্য্যে খচিত সহস্র স্তম্ভ বিদ্যমান, সে গৃহটি কত বৃহৎ, এবং তাহা নির্ম্মাণ করিতে কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম, কত শিল্পী ও পরিশ্রমীর আবশ্যক হইয়াছিল! এ স্থানের

শিব-কাঞ্চী।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর গোপুরামটি দশতালা, তাহার উচ্চতা ১৮৮ ফিট; ইহা সমচতুষ্কোণ; ইহার প্রত্যেক দিক্‌ই ৭৪ ফিট দীর্ঘ। যখন আমরা ইহার পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমরা ইহার উচ্চতা ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম! সুপ্রশস্ত ও সুকঠিন গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা ইহার কলেবর গ্রথিত। এমন একটু স্থান নাই, যে স্থানে কোনও লতা পাতা ফুল ফল বা কোনও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত না আছে। যে সময়ে কোনও রূপ কল কৌশল ছিল না সে সময়ে কিরূপে যে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ হইতে এই সকল প্রস্তরখণ্ড আনীত হইয়াছিল, এবং কত দিনে কত পরিশ্রমে কিরূপ অধ্যবসায়ে যে ইহাদের গঠন হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে এক দিকে বিস্ময় ও অপর দিকে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। হায়! হায়! মহাকালের করাল শাসনে কত উন্নত অবস্থা হইতেই না আমাদের চরম অধঃপতন হইয়াছে! প্রত্যেক গোপুরামেই উঠিবার সোপান আছে। এই গুলির উপর আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যাবলী আলেখ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সিঁড়িগুলি খুব উঁচু, এবং সিঁড়ির পথ এত অন্ধকার যে, আলোর সহায়তা ভিন্ন তদুপরি অরোহণ করা অসম্ভব। আমরা সঙ্গে প্রদীপ লইয়াছিলাম।

বিষ্ণুকাঞ্চী।

বিষ্ণুকাঞ্চীর বিষ্ণুমন্দির শিবকাঞ্চী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বিষ্ণু-মন্দিরের নিকটস্থ মণ্টপমের একটি হলে এক শতটি স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভে নানাজাতিয় জন্তুসমূহের দেহ অতি সজীবভাবে ক্ষোদিত। কোনটিতে অশ্বারোহী অশ্বারোহণে দ্রুত-গমনে যাইবার জন্য তুরঙ্গপৃষ্ঠে কশাঘাত করিতেছে; কোথাও বা অসিহস্তে যোদ্ধা যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যগ্র! এবংবিধ বহু প্রকারের ক্ষোদিত মূর্ত্তির সজীবতা দর্শন করিলে বিস্ময়ে তন্ময় হইতে হয়।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

কাঞ্চীনগরীর উৎপত্তি বিষয়ে পুরাণে কথিত আছে যে, মহাদেবের মতে ইহা শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর, এমন কি, কাশী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এ স্থান যাহারা দর্শন করে, এবং এ স্থানে যাহারা বাস করে, তাহারা অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে; ভবানী-পতি আরও

বলেন যে, "আমি সমস্ত শাস্ত্রকে আম্রবৃক্ষরূপে রাখিয়া লিঙ্গরূপে একাম্রনাথ নামে অভিহিত হইয়া এ স্থানে বাস করিতেছি। কাঞ্চীতে বাস করিলে মানুষ সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। প্রলয়েও এই নগরীর বিনাশ নাই, আমি সে সময়ে ইহাকে ত্রিশূলে রক্ষা করিব।"

দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এ স্থানে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় বলিয়া বিশ্বাস করে। আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা যেমন জীবনের শেষভাগে কাশীতে বাস করিয়া থাকে, দাক্ষিণাত্যের লোকেরাও তদ্রূপ কাঞ্চীতে বাস করে। এ স্থানের একাম্রনাথ লিঙ্গ ক্ষিতিমূর্ত্তি। তজ্জন্য অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় এ স্থানে জলাভিষেক হয় না।

প্রাচীন আম্রবৃক্ষ।

দাক্ষিণাত্যে একাম্রনাথের মন্দির বিশেষ বিখ্যাত। ইহা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ও পুরাতন। এই মন্দির এক সময়ে একজন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই; ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ইহার বিপুল কলেবর সমাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহার মূল মন্দির চোল রাজারা নির্ম্মাণ করেন, এবং গোপুরাম ইত্যাদি পরে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী প্রাচীন সহকার বৃক্ষ বিরাজমান। বৃক্ষটি কত কালের, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে তিন চারি শত বৎসর কিংবা তাহারও অধিক প্রাচীন হইতে পারে। স্থানীয় জন-সাধারণের বিশ্বাস, এই বৃক্ষটি অনন্তকালের সাক্ষী, এবং সর্ব্বশাস্ত্ররূপী। এই সহকার তরুর চারিটি শাখায় মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অম্ল, এই চারি প্রকারে আম্র ফলিয়া থাকে। যাঁহারা এই বৃক্ষের ফল খাইয়াছেন, তাঁহারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। মন্দিরস্থ পুরোহিতেরা বলেন যে, পূর্ব্বে প্রত্যহ একটী করিয়া সুপক্ব আম্র এই বৃক্ষ হইতে পাওয়া যাইত, এবং তাহাই একাম্রনাথকে ভোগ দেওয়া হইত। এখন আর প্রত্যহ সেরূপ আম্র পাওয়া যায় না। অনেকে এই হইতেই একাম্রনাথের নামোৎপত্তির সিদ্ধান্ত করেন। একাম্রনাথের মন্দিরের সন্নিহিত কামাক্ষী দেবীর মন্দির একাম্রনাথের মন্দির অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কামাক্ষীদেবীর মন্দিরোৎপত্তি সম্বন্ধে স্থলপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা দেবী ভগবতী কৌতুহলপরবশা হইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে দেবাদিদেব



পার্ব্বতী, মূর্ত্তি—চিদম্বরম্।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মহাদেবের চক্ষুস্ত্রয় হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়াছিলেন; ইহাতে মুহূর্ত্তমধ্যেই সৃষ্টিবৈষম্যের সম্ভাবনা ঘটিল। কারণ, সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নি, এই ত্রিনয়ন আচ্ছাদিত হইলে কিরূপে আলো প্রকাশিত হইবে? ভগবতীর এইরূপ গর্হিত কার্য্য করায় পাপের সঞ্চার হইল। মহাদেব এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ভগবতীকে পৃথিবীতে আসিয়া কাঞ্চীপুরস্থ একাম্রনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণস্থিত কম্পা নদীর তীরে তপস্যা করিবার আদেশ করিলেন। যখন ছয় মাস উত্তীর্ণ হইল, তখন মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মহেশ্বরীকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের ইহাই পৌরাণিক ইতিহাস। ফাল্গুন মাসে যখন এখানে পঞ্চদশ-দিবসব্যাপী একাম্রনাথের উৎসব হয়, তখন উহার দশম দিবসের রাত্রিতে কামাক্ষীদেবীর ভোগমূর্ত্তির* সহিত একাম্রনাথের ভোগমূর্ত্তি একত্রে রাখা হয়।

কামাক্ষী দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। সমাধির উপরে তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আমরা বিষ্ণুমন্দিরের পৌরাণিক ইতিবৃত্তও এ স্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। স্থলপুরাণে লিখিত আছে যে, কোনও সময়ে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কাঞ্চীপুরে স্থান নির্দ্দেশ করেন। সরস্বতী দেবী ব্রহ্মার এই যজ্ঞের কথা অবগত ছিলেন না। তিনি নারদপ্রমুখাৎ বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইলেন, এবং যজ্ঞস্থল ভাসাইয়া দিবার জন্য নদীরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা প্রমাদ গণিলেন। তিনি অবশেষে নিরুপায় হইয়া বিষ্ণুর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষার্থ সরস্বতীর গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। সরস্বতী দেবীও সহজে হটিবার পাত্রী নন। তিনিও অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিতা হইতে লাগিলেন। বিষ্ণু নিরুপায় হইয়া অবশেষে উলঙ্গদেহে এদোক্ষোরী নামক স্থানে নদীমুখে পতিত হইলেন। দেবী সরস্বতী বিষ্ণুর উলঙ্গমূর্ত্তিদর্শনে লজ্জিতা হইয়া আপনার সঙ্কল্প-পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। ব্রহ্মাও নির্ব্বিবাদে হয়-মাংস আহুতি দিলেন।

বিষ্ণু মন্দিরের পৌরাণিক ইতিহাস।

* দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরেই বিগ্রহের দুইটি করিয়া মূর্ত্তি আছে তাহার একটি পূজার, অপরটি ভোগমূর্ত্তি। উৎসব ইত্যাদিতে ভোগমূর্ত্তিই প্রদর্শিত হয়।

বিষ্ণু সেই হুত মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞীয় অগ্নিমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণুর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সমবেত ঋষি ও ঋত্বিকগণের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাঞ্চী নগরে শ্রীবরদরাজস্বামিরূপে তিনি বিরাজ করিতে লাগিলেন।

কিংবদন্তী এই যে, একাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তা গঙ্গা-গোপাল রাও এই বিষ্ণুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। বরদরাজের কৃপায় তাঁহার পুত্রসন্তান হয়। সে জন্য তিনি এক শিব-মন্দির ভগ্ন করিয়া সেই ইষ্টক দ্বারা এই বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বরদরাজস্বামীকে আনাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই বিষ্ণুমন্দির হইতেই এই স্থানের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী হইয়াছে। বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে বিজয়নগরের কৃষ্ণরাম কর্তৃক নির্ম্মিত বিখ্যাত শতস্তম্ভ মণ্ডপ বিদ্যমান। একখানি প্রস্তর কাটিয়া এই সুবৃহৎ মণ্ডপটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আরও কয়েকটি মণ্ডপ আছে। তন্মধ্যে বাহন মণ্ডপ ও কল্যাণ মণ্ডপই শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ৩০০০৲ টাকা আয়ের একখানি গ্রাম এবং মান্দ্রাজ গভর্মেণ্ট হইতে ৯৯৬১৲ টাকা বরাদ্দ আছে। লর্ড ক্লাইব ৩৬৬১৲ টাকা মূল্যের একখানি কণ্ঠাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন। এই দেবমন্দিরস্থ মণি মুক্তাদির মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হইবে। বৈশাখ মাসে এ স্থানে দশদিবসব্যাপী মহোৎসব হয়। তখন এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কাঞ্চী নগরীর দুই মাইল দূরবর্ত্তী ত্রিপতিকুণ্ড্রম নামক স্থানের জৈন মন্দির ও মস্‌জিদ দর্শনীয়। বিজাপুরের বিখাত ফকীর হজরৎ সাহেবের কবরের উপর এই মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এ স্থানে উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয়, আফিস আদালত প্রভৃতি সমুদয়ই আছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।



মহামোক্ষম বা কুম্ভমেলার স্নানদৃশ্য—কুম্ভকোনাম্।

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

চিঙ্গলপৎ।

কাঞ্চীনগরী হইতে আসিবার পথে কেবল কাঞ্চীনগরীর মহান্ স্মৃতিই হৃদয়ে জাগিয়াছিল। কি মহিমাময় শিল্পনৈপুণ্য! কি মহান্ উৎসাহ ও উদ্যম, ধর্ম্মের জন্য মানুষ যে কত স্বার্থ ত্যাগ ও অর্থব্যয় করিতে পারে তাহা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের অন্যত্র সুদুর্লভ। চিঙ্গলপৎ একটী ক্ষুদ্র নগর, লোক সংখ্যা (১০,৫৫১)। চতুর্দ্দিকে অনুন্নত শৈলশ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় ঘিরিয়া রহিয়াছে। বিটপী-বল্লরী-সমাচ্ছন্ন শীলাকীর্ণ এ সমুদয় গিরি সমূহের সৌন্দর্য্য উপভোগ্য। এই পাহাড়গুলির কোনটিই ৫০০ পাঁচ শত ফিটের অধিক উঁচু নহে। ইহা পালার নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। সহর হইতে অর্দ্ধ মাইল দূর দিয়া কল্ কল্ ছল্ ছল্ রব করিতে করিতে নীরব অরণ্যানীর শীতল ছায়ার মধ্য দিয়া কোন্ প্রিয়তমের উদ্দেশে যে পালার বহিয়া চলিয়াছে, তাহা কে জানে? তটিনীর প্রেমের কাকলী মানবের বুঝিবার সাধ্য নাই, সে দেবভাষা, দেবতারাই বুঝিতে সক্ষম। এস্থানে আগন্তুক পথিকগণের থাকিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা নাই। ডাক বাঙ্গলা, ব্রাহ্মণের হোটেল প্রভৃতি সমুদয়ই আছে। হোটেলে সর্ব্বশ্রেণীস্থ হিন্দু যাত্রিগণই আহারাদি করিতে পারেন। প্রতি বেলা আহারের জন্য ৵১০ হইতে ।০ চারি আনা দিতে হয়। যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা এবং গো-যান উভয়ই পাওয়া যায়, প্রতি মাইল ৵০ আনা হিসাবে লাগে।

সাধারণ বর্ণনা।

চিঙ্গলপৎ জেলা ও তালুকের চিঙ্গলপৎই প্রধান নগর। ইহা মান্দ্রাজ নগরের ৩৬ মাইল দক্ষিণদিকে আর্কোণাম্ লাইন্ ও দক্ষিণ রেল পথের সংযোগস্থলে বিরাজিত। আমরা যখন এ স্থানে উপস্থিত হই, তখন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ছিল। গভর্মেণ্ট হইতে এ সমুদয় জীর্ণ শীর্ণ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীগণকে ভাতের কাঞ্জী (মণ্ড) খাইতে দেওয়া হইত। জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, অর্দ্ধোলঙ্গ ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী, এবং অপোগণ্ড শিশুগণের করুণ

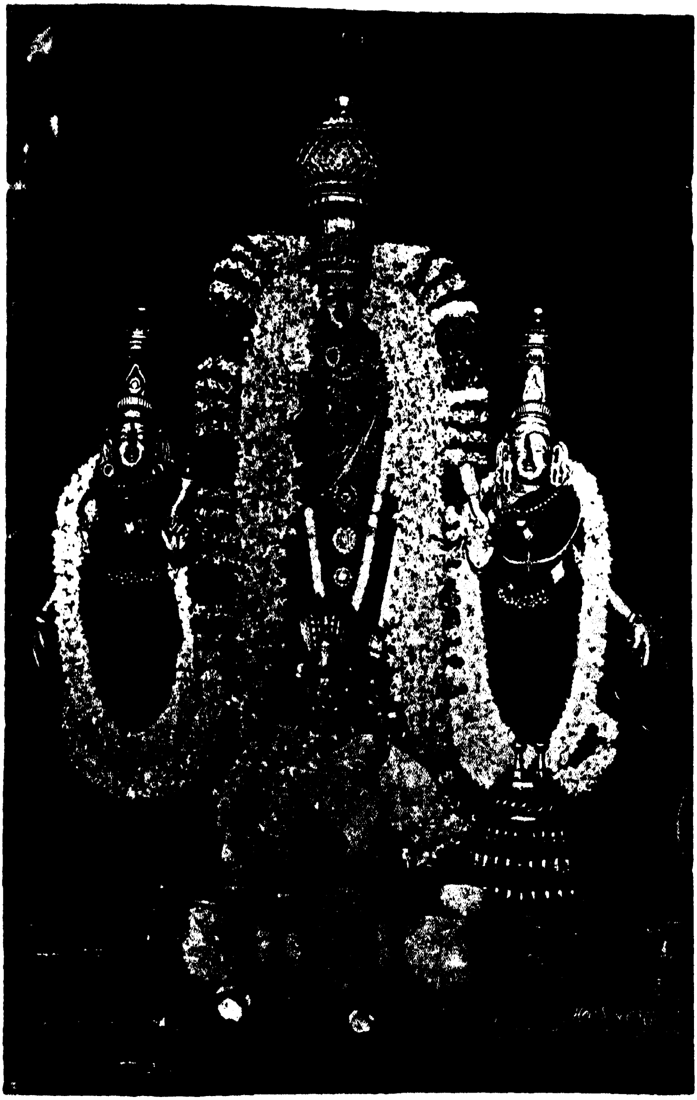
দুর্ভিক্ষের কথা।

আর্ত্তনাদে হৃদয়ে যে দারুণ দুঃখের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে! আমরা এক দিবস ইহাদিগকে খাওয়াইবার ইচ্ছা করিয়া রীতিমত ডাল ভাতের বন্দোবস্ত করিতে চাহিলাম, কিন্তু স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ আমাদের প্রস্তাবে আপত্তি করায় বাধ্য হইয়াই সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া মণ্ড দিতে হইয়াছিল। এ সমুদয় বুভুক্ষু নর-নারীবৃন্দের সামান্য পরিমাণেও ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিয়া প্রাণে যে স্বর্গীয় শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা অবর্ণনীয়। চিঙ্গল পতের দুর্গটি দর্শনীয়। এখন এই দুর্গ অব্যবহৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। এই দুর্গের উপর দিয়াই রেল-পথ গিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়নগরের রাজগণ হীনতেজা হইলে তাঁহারা চিঙ্গলপৎ এবং চন্দ্রগিরি উভয় স্থানেই সমভাবে রাজত্ব করিতেন। সে সময় এই দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গের দুর্গম অবস্থিতি দেখিলে সহজেই ইহাকে দুর্ভেদ্য ও অজেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনদিকে জলাভূমি এবং একদিক সুদৃঢ় পরিখা ও প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গ গোলকুণ্ডার সর্দ্দারদের হস্তগত হয়, পরে তাঁহারা আর্কটের নবাবকে ইহা অর্পণ করেন। নবাব পুনরায় ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদিগের সাহায্যে কর্ণাট আক্রমণকালে চাঁদ সাহেবকে সমর্পণ করেন। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ফরাসীদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যগণ এই দুর্গে আশ্রয় লয়। মহীসুর যুদ্ধের সময় ইহা একবার মহীসুরের হস্তগত হয়, পরে আবার ইংরেজেরা অধিকার করেন। চিঙ্গলপৎ ও চন্দ্রগিরির নায়কদিগের নিকট হইতে ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ মান্দ্রাজ নগরী নির্ম্মাণ করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন।

দুর্গ ও প্রাচীন ইতিহাস।

এ নগরে প্রোটেষ্টাণ্ট এবং রোমান ক্যাথলিক এই উভয় সম্প্রদায়েরই দুইটি গির্জ্জা আছে। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, আফিস, আদালত, কোন বিষয়েই কোনওরূপ অভাব নাই।

আজ আমরা চিঙ্গলপৎ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত পঞ্চতীর্থ বা পক্ষীতীর্থে গমন করিয়াছিলাম, চিঙ্গলপৎ হইতে গো-যান কিংবা ঝট্‌কা উভয় প্রকারেই এস্থানে আসা যায়। এখানে ত্রিপুরাসুন্দরী, ভক্তবৎসলেশ্বর শিব, বেদগিরি



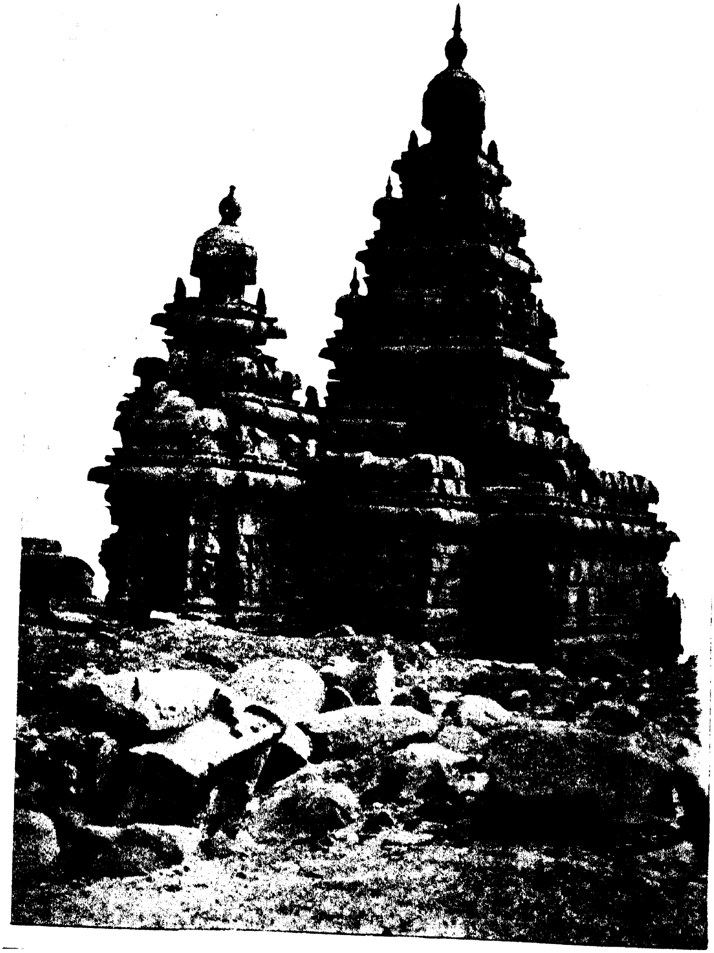
পাচ্চাভামার—কাঞ্চী।

কুন্তলী। প্রেস।

শিব, চক্ষুনাইকি মাতা প্রভৃতি বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম; এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রেততর্পণার্থ পিণ্ডাদি প্রদত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ দুইটী শ্বেত শকুন আসিয়া তাহা ভক্ষণ করে। পক্ষীতীর্থ দর্শন করিয়া সে দিবস সন্ধ্যার সময়ে পুনরায় চিঙ্গলপৎ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

মহাবলীপুর।

চিঙ্গলপৎ হইতে মহাবলীপুর দর্শন করিতে গমন করিলাম। পৌরাণিক প্রবাদ এই যে এস্থানে প্রাচীনকালে সুপ্রসিদ্ধ দানবীর বলী রাজার রাজধানী ছিল। মান্দ্রাজ নগরী হইতে ৩৫ পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে এই ক্ষুদ্র সহরটী অবস্থিত। কথিত আছে যে এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ বামনাবতারে বলী রাজাকে ছলনা করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণাংশে পাঁচখানি রথ আছে; এ স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির গুলিকেই রথ কহিয়া থাকে। মহাবলীপুরের পশ্চিমদিকে পর্ব্বত-গাত্রে বহু খোদিত মন্দির ও অন্যান্য দেব মন্দিরাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। নগরের মধ্যভাগে বিষ্ণুমন্দির ও শিবমন্দির বিরাজিত। এই দুইটি মন্দির ও পাঁচটী রথ ধরিয়া সাহেবেরা এ স্থানের নাম (Seven pagoda) বলিয়া থাকেন। মন্দিরগুলি অধিকাংশই সমুদ্র তটে অবস্থিত। নীলাম্বুময়ীর চঞ্চল-তরঙ্গ-বিধৌত বেলাভূমির অনতিদূরে এই সমুদয় দেব-মন্দিরগুলি অবস্থিত বলিয়া দেখিতে পরম রমণীয় বোধ হয়। প্রত্যেক মন্দির-গাত্রেই নানাবিধ ফুল, ফল ও পৌরাণিক দৃশ্য সমূহ ভাস্কর বিদ্যার অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত। কোনও মন্দিরে অর্জ্জুন কঠোর তপস্যায় নিরত, কোনটিতে বামন ভিক্ষা, কোনটিতে শেষ নাগা-রোহণে বিষ্ণু উপবিষ্ট, কোনটিতে বা শিব ও পার্ব্বতীর বিগ্রহ, কোনটিতে বিষ্ণুর বরাহ মূর্ত্তি, ইত্যাদি বহুবিধ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বরাহস্বামীর মন্দির, দুর্গার মন্দির ও বলিপীঠ প্রভৃতি দর্শনে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়; এখান হইতে সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনাতীত। তটে দাঁড়াইয়া অনন্ত নীলিমাময় অনন্ত মহাসাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গ নিচয় দর্শন করিলে হৃদয় বিমোহিত হয়। সৃষ্টির বৃহৎ ও সুন্দর সাগর ও ভূধরের মত আর কিছুই নাই। মহাবলীপুরের সর্ব্বত্রই তাল, নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষাদি সুপ্রচুর। চিঙ্গলপৎ হইতে সাদ্রস ব্রিজ (Sadras) ১৮ মাইল দূর, এই আঠারো মাইল ঝটকায় আসিয়া, বক্রী পাঁচ মাইল নৌকায় যাইতে হয়। চিঙ্গলপৎ হইতে সাদ্রস ব্রিজ যাইতে ঝটকার ভাড়া ২॥০ টাকা এবং সে স্থান



সমুদ্রতীরবর্ত্তী মন্দির—মহাবলীপুরম্।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

হইতে মহাবলীপুর পর্য্যন্ত নৌকার ভাড়া ২৲ দুই টাকা। আমরা সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে পুনরায় চিঙ্গলপৎ ফিরিয়া আসিলাম।

নিশাবসানে উষা-সুন্দরীর অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত চরণ-স্পর্শে যখন পূর্ব্ব গগন আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল, যখন নবীন প্রভাতের নব সূর্য্যোদয়ের লোহিত-কিরণ-রশ্মি-জাল বৃক্ষ পত্রে সোণা ছড়াইয়া দিতেছিল, মধুর-কণ্ঠ বিহগগণের মধুর কাকলীতে চারিদিকে সজীবতা জাগিতেছিল, তখন আমরা বাষ্পীয় শকটারোহণে চিঙ্গলপৎ পরিত্যাগ করিলাম এবং দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় এগার ঘটিকার সময় ভিলুপুরমে উপনীত হইলাম।

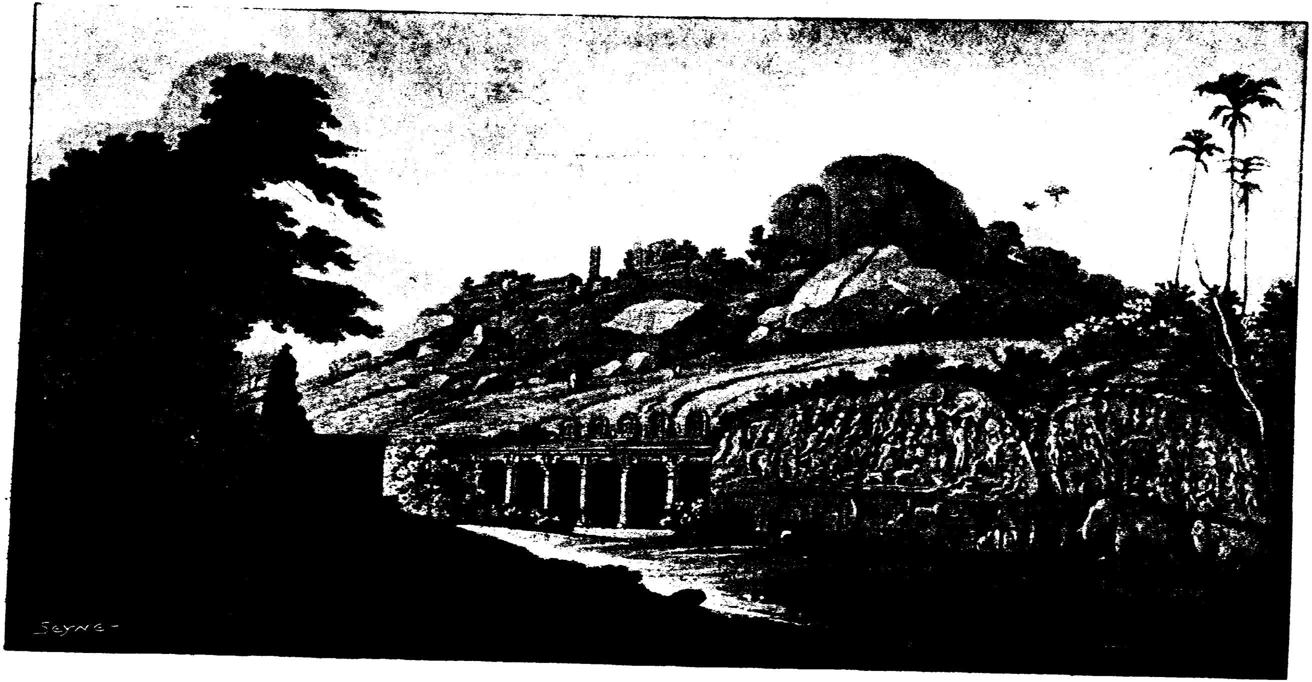
ভিলুপুর।

ভিলুপুর একটী রেলওয়ে জংশন; এই সহরটী দক্ষিণ আরকট জেলার ভিলুপুরম্ তালুকের অন্তঃর্গত। মান্দ্রাজ নগরী হইতে ইহা ৯৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেসন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে ডাক বাংলা আছে, সে স্থানে কেবল দুইজন লোক থাকিতে পারে; আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করা প্রয়োজনীয়। হিন্দু-যাত্রিগণ নিকটস্থ ছত্রেই আহারাদি করিতে পারেন, প্রতি বেলা আহারের জন্য কেবল দশ পয়সা দিতে হয়। যাতায়াতের জন্য ষ্টেসনেই গো-যান পাওয়া যায়। ভিলুপুরমে দর্শনযোগ্য কিছুই নাই। এস্থান হইতে ২॥ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তর-পশ্চিম দিকে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে তাহার নাম ত্রিবমথুর, সে স্থানের প্রাচীন অভিরামেশ্বরের মন্দির দর্শনীয়। আমরা ভিলুপুরমে আহারাদি সমাপন করিয়া বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় গো-যানারোহণে ত্রিবমথুর গ্রামাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। তখন প্রখর তপনালোকে চারিদিক উত্তপ্ত। প্রকৃতির প্রভাত সময়কালীন শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি আর নাই, চারিদিকে একটা প্রখরতা জাগিয়া উঠিয়াছে। গাড়োয়ান তাহার জাত ভাষায় বলদ দু'টিকে গালি দিতে ও তাহার ল্যাজ মোচ্ড়াইতে মোচ্ড়াইতে গাড়ী চালাইয়া চলিল। রাস্তার দুই ধারে নানাজাতিয় গাছ, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, কোথাও বা অতি দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, ছোট ছোট খাল হইতে গ্রাম্য রমণীগণ জলপাত্র ভরিয়া জল নিতেছে, ক্ষেত্রে কৃষকেরা কাজ করিতেছে, মাথার উপর দিয়া পাখীগুলি পাখা মেলিয়া আহার সংস্থানে ব্যগ্র; মধ্যাহ্নের সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় জগতই জাগ্রত প্রতীয়মান হইল। আমরা অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় ত্রিবমথুরস্থ মন্দির সন্নিকটে উপনীত হইলাম, মন্দিরটী প্রাচীন এইমাত্র, তেমন শিল্পনৈপুণ্য এস্থানে দেখিলাম না। মন্দির মধ্যে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র এবং সপ্ত ঋষির মূর্ত্তি বিরাজিত।

সাধারণ বর্ণনা।

ত্রিবমথুর।

পথের বর্ণনা।



পর্ব্বতে খোদিত মূরত সমূহ—মহাবলীপুর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

এই গ্রামের নামের অর্থ পবিত্র দুগ্ধ (Sacred Milk)। কথিত আছে যে, সৃষ্টির প্রথম সময়ে গাভীগণের শৃঙ্গ ছিল না, তাঁহারা দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট অন্যান্য জন্তুগণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে কোনওরূপ অস্ত্র প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করে,—মহাদেব তাহাদের এই সঙ্গত প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হন এবং স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গাভীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকার সময় ভিলুপুরমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বসন্তকালে ত্রিবমথুরে একটী মেলা হয়।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

পরদিবস প্রত্যূষে তাঞ্জোরাভিমুখে রওনা হইলাম, পথে আরও কয়েকটী তীর্থস্থল দর্শন করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে তাহাদের কথা বিবৃত করিয়া পরে তাঞ্জোরের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

মায়াভরম্।

প্রথমেই মায়াভরমে অবতরণ করিলাম। ইহা একটী রেলওয়ে সংযোগস্থল। লোকসংখ্যা (২৪,২৭৬)। কলনাদিনী পুণ্য-সলিলা গোদাবরী নদীর দক্ষিণ তীরে এই ক্ষুদ্র নগরটী বিরাজমান।

সাধারণ বর্ণনা।

রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে সহরটী ২॥০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এস্থানে ডাকবাংলা, ছত্রম্ এবং ব্রাহ্মণের হোটেল আছে বলিয়া যাত্রিগণের আহারাদি করিবার কোনও অসুবিধা হয় না। যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা এবং গো-যান উভয়ই পাওয়া যায়, ভাড়াও যথাক্রমে প্রতি মাইল ৵০ দুই আনা ও ⁄১০ ছয় পয়সা মাত্র। এস্থানে স্ত্রীলোকদের পরিধানোপযোগী এক প্রকার বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, এ অঞ্চলে তাহার বিশেষ আদর, ইহাকে কর্ণাড কাপড় বলে। কলা, ধান্য এবং নারিকেলই এ স্থানের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। প্রতি সোমবার এবং শুক্রবার এখানে একটী হাট বসে। সে সময়ে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহুলোক সমবেত হয় এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে শিব এবং বিষ্ণু মন্দিরের সন্নিকটে যে উৎসব হয়, তাহাতে ৩০,০০০ হইতে প্রায় ৪০,০০০ লোক সমবেত হয়। এই উৎসব একমাসকাল স্থায়ী হইলেও শেষ দশম দিবসই বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

নগরের ও মন্দিরের কথা।

মায়াভরমে শিব এবং বিষ্ণুর মন্দির ব্যতীত আর কিছুই দর্শনীয় নাই। বিষ্ণুমন্দিরের স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তাদিখচিত শয্যা বিশেষ দ্রষ্টব্য। বাড়ী অত্যন্ত প্রকাণ্ড।

এ অঞ্চলের শস্যশ্যামলা প্রকৃতি-সুন্দরীর হাস্যময়ীমূর্ত্তি ভ্রমণকারীর চিত্তাকর্ষক। চারিদিকে নারিকেল গাছ ফলভারে সুশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। আমরা এখান হইতে চিদাম্বরমে গমন করিলাম।

চিদম্বরম্।

চিদম্বরম্ বা চিত্তম্বরম্—মান্দ্রাজ নগরীর দেড়শত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই সহরটী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। লোকসংখ্যা (১৯,৯০৯)।

সাধারণ বর্ণনা।

এখানে ষ্টেসনের অনতিদূরেই ডাকবাঙ্‌লা এবং সহরের মধ্যে ত্রিশটী ছত্রম্ এবং বহু ব্রাহ্মণের হোটেল আছে; এ সকল হোটেলে সর্ব্বশ্রেণীস্থ হিন্দুগণই আহারাদি করিতে পারেন। প্রতি বেলা ৵১০ দশ পয়সা হইতে ৶০ তিন আনা করিয়া ব্যয় পড়ে। চিদম্বরমের দেব-মন্দিরসমূহের জন্যই এই স্থান বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার পার্ব্বতী ও শিবের মন্দির বৃহৎ ও সুন্দর। এখানে চিদাম্বরেশ্বর-দেবের উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষমাসের শুক্লা-পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একটী মেলা হয়, সে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ৫০।৬০ হাজার নরনারী দেবদর্শন এবং ব্যবসাদি উপলক্ষে আগমন করিয়া থাকে। দেবমন্দির-সমূহ মধ্যে শিবদুর্গার কনকসভা সর্ব্বপ্রধান। স্থলপুরাণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই সমুদয় দেবমন্দির পঞ্চম মনুর পুত্র

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

রাজা শ্বেতবর্ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি শ্বেতকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া পিতৃপ্রদত্ত গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোগমুক্তির আশায় তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে কাঞ্চী নগরীতে উপনীত হন, এস্থানে এক ব্যাধের মুখে অবগত হইলেন যে, চিদম্বরমে ব্যাঘ্রপদ নামক একজন মহাতপা ঋষি বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনি ব্যাধের বাক্যে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চিদারমে গমন করিয়া ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করেন, ঋষিবর অরণ্য মধ্যে আকাশরূপী মহাদেবের এক মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। রাজা শ্বেতবর্ণ ঋষির নিকট উপনীত হইলে তিনি ধ্যানযোগে সমুদয় অবগত হইয়া রাজাকে হেমতীর্থে স্নান করিতে আদেশ করিলেন। রাজা শ্বেতবর্ণ ঋষির অনুমত্যানুসারে উক্ত তীর্থে স্নান করামাত্র রোগমুক্ত হইয়া দেবানুগ্রহে দিব্য কাঞ্চন-কান্তি লাভ করিলেন, এই হেমকান্তি-লাভহেতু তিনি হিরণ্যবর্ণ নামে

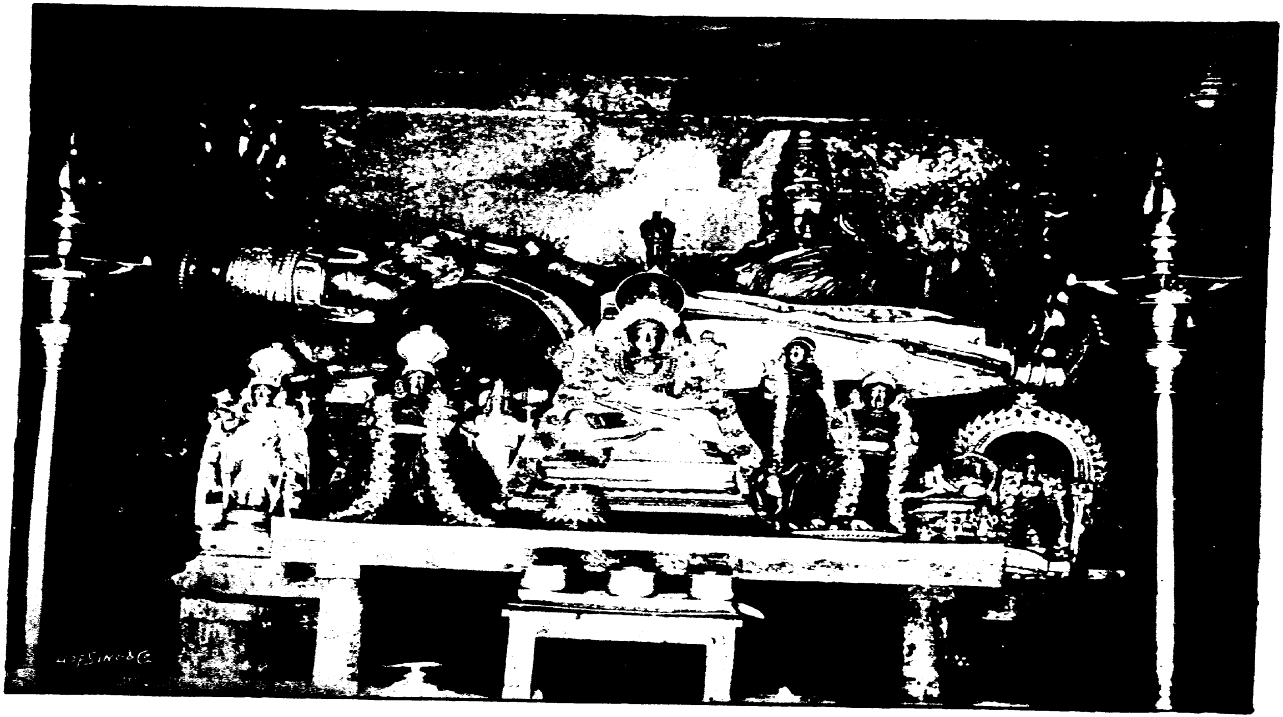
অভিহিত হইতে লাগিলেন। শঙ্কর-দেবের কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হওয়ায় ভক্তিমান্ চিত্তে এ স্থানের কনকসভা শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির মধ্যে কোন বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। এ স্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিকমূর্ত্তির অন্যতম আকাশমূর্ত্তির অর্চ্চনা হইয়া থাকে। যাত্রিগণ দেব-দর্শনের জন্য আসিলে পাণ্ডারা পর্দ্দা তুলিয়া দেন, তখন দেবালয়ের দেয়াল ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। কারণ দেবতা আকাশরূপী; মানব চক্ষুর অগোচর!

হিরণ্যবর্ণ যদি এই কনক-সভামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কারণ কাশ্মীর রাজবংশের ইতিবৃত্ত রাজতরঙ্গিণীতে হিরণ্যবর্ণ রাজা ও তাঁহার সিংহল জয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোঙ্গুদেশের 'রাজকাল' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে "বীর চোল রায় একদিন চিদম্বরেশ্বর ও পার্ব্বতীকে নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদের জন্য এই কনকসভা নির্ম্মাণ করান।" এই বীর চোল রায় ৯২৭—৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। এই পুস্তকের মত স্বীকার করিলে কনকসভা মন্দির খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উক্ত গ্রন্থের অপর এক স্থানে লিখিত আছে যে, "বীর চোল রাজের পৌত্র অরিবৈরি দেব ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে চিদম্বরেশ্বরের উদ্দেশে গোপুর, মণ্ডপ ও প্রাচীর ইত্যাদি নির্ম্মাণ করান।"

সহরের মধ্যস্থলে প্রায় এক শত কুড়ি বিঘা স্থান ব্যাপিয়া এই মন্দিরগুলি অবস্থিত। একটীর পর আর একটী এইরূপ দুইটী ত্রিশ ফিট উচ্চ প্রাচীর দিয়া মন্দিরগুলি ঘেরা। মন্দির-প্রাচীরের চারি কোণে চারিটী গোপুর

মন্দিরের বর্ণনা ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতের স্থপতি-বিদ্যার অপূর্ব্ব কলা-কৌশল দেখাইবার জন্য এখনও উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া সগর্ব্বে আগুন্তুক পথিককে আহ্বান করিতেছে। তাহারা যেন বলিতেছে, "হে পান্থ! একবার আমাদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহিমোজ্জ্বল গৌরব-ইতিহাস পাঠ কর। একবার অতীত-গৌরব কাহিনী ভাব, কি ছিলে, কি হইয়াছ?" প্রত্যেকটী গোপুর ১২২ ফিট উচ্চ। ইহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটী ৪০ ফিট লম্বা এবং ৫ ফিট প্রস্থ গ্রেনাইট প্রস্তরের স্তম্ভ



গোবিন্দরাজ —চিদাম্বরাম ।

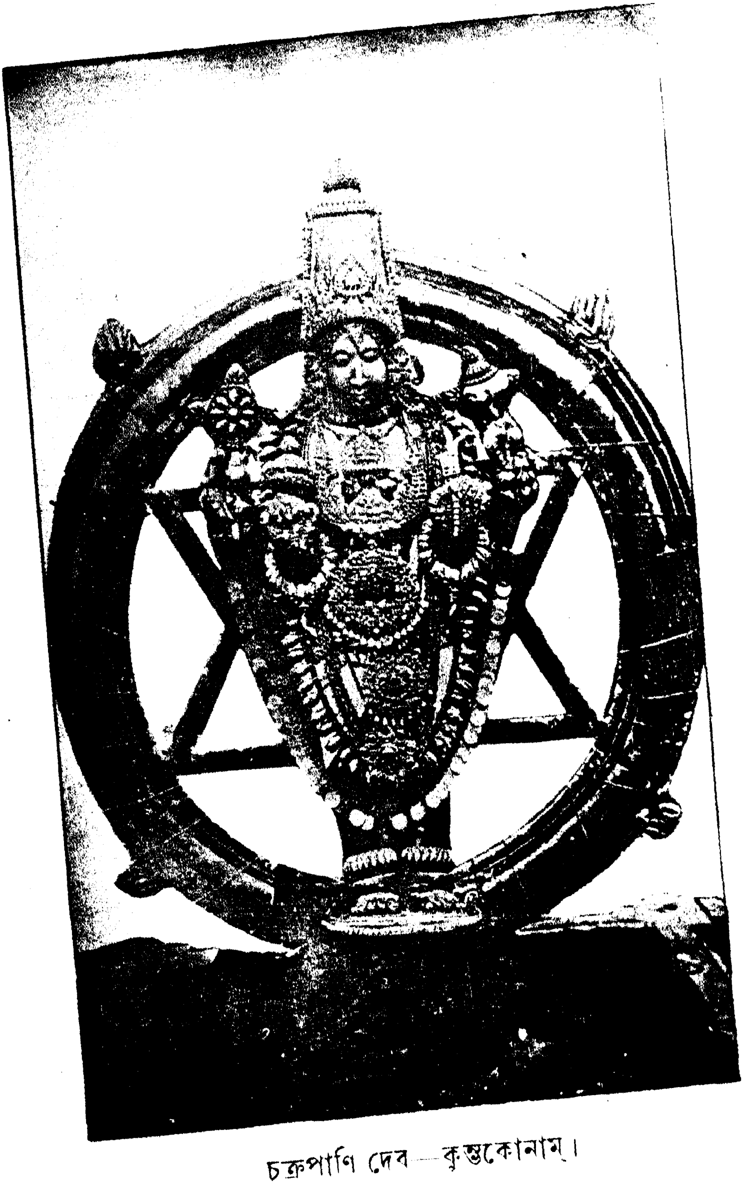
আছে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ তামার পাত দ্বারা বিজড়িত। মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে; ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৫০ × ১০০ ফিট। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর দিয়া বাঁধান। এই জলাশয়টী প্রাচীন হেমতীর্থের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুলোক এই সরোবরে ভক্তিভরে স্নান করিয়া থাকে। সরোবরের জলের রং সবুজ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। পানীয় জলের নিমিত্ত মন্দিরে চারিটী কূপ আছে। এই সকল কূপের জলও স্বাস্থ্যকর নহে। এই পুণ্য সরসীর উত্তরভাগে পার্ব্বতী দেবীর সুবৃহৎ মন্দির। মন্দির সম্মুখস্থ নাটমণ্ডপ অতিশয় মনোরম এবং নানাবিধ ভাস্কর-কার্য্য-সমন্বিত। পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে বিখ্যাত সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ। এই মণ্ডপ অনেকাংশে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এই মণ্ডপে অত্যুৎকৃষ্ট ভাস্কর-কার্য্যযুক্ত এক সহস্র স্তম্ভ আছে। অপর একটী মণ্ডপে নটেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, একদা মহাদেব এক পদে নৃত্য করিয়া ভগবতীকে পরাভূত করেন; তদবধি ঐ স্থানে নটবেশে একপদে অবস্থান করিতেছেন। শিবের এই এক পদে নৃত্যভঙ্গীর প্রতি যাঁহারা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা হ্যাভেল সাহেবের গ্রন্থে 'নটেশ' মূর্ত্তির ধাতু-প্রতিমার ছবি দেখিতে পাইবেন। আমরা এ সমুদয় দর্শন করিয়া একটী মন্দিরে অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও পিন্নিইয়ার নামক আর একটীতে বিঘ্নেশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম।

এ মন্দিরের পুরোহিতগণকে দীক্ষিত কহে। ইহারা সকলে সভায় সমবেত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। যদি একজন সভ্য কোন বিষয়ে আপত্তি করেন, তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কোনও বিষয়-কার্য্য পরিণত করিতে হইলে তাহা সর্ববাদী-সম্মত হওয়া আবশ্যক। উপবীতধারী সকল দীক্ষিতেরই তুল্য ক্ষমতা। এই নিমিত্তই দীক্ষিতগণের অতি শৈশবেই উপনয়ন হইয়া থাকে। কুড়ি জন করিয়া দীক্ষিত প্রতিবারে পূজায় নিয়োজিত থাকে। ইঁহাদের এক একজন প্রতিদিন এক এক মন্দিরে পূজা করেন। এইরূপে কুড়িদিনে প্রত্যেকেরই সকল মন্দিরে একবার করিয়া পূজা করিতে হয়। তখন নূতন ২০ কুড়িজন আসিয়া উঁহাদের স্থান অধিকার করেন। ইঁহারা পালা অনুসারে এক এক

দল করিয়া দেবতাদের পূজা আদায় করিবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রতি গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। এই ভিক্ষাদ্বারা ইঁহারা যাহা উপার্জ্জন করেন তাহার যৎসামান্যমাত্র দেব-সেবায় অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট-ভাগ নিজেরাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন দীক্ষিত একবার এক বাড়ী হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আর কোন দীক্ষিত সে বাড়ী গমন করে না। চিদম্বরতন্ত্র, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে চিদম্বর-দেবের মাহাত্ম্যাদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরোহিতদের কথা।

সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম গগন-প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন, চারিদিকে দিনান্তের সৌম্য-মধুর অনবদ্য মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, তখন সিন্দূর-রাগ-রঞ্জিত নানাবর্ণের বিচিত্র জলদ-নিচয়ের নয়নাভিরাম মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে চিদাম্বরম্ পরিত্যাগ করিলাম। চিদাম্বরমের মন্দির-চূড়াগুলি সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার মধ্যে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেল।



চক্রপাণি দেব—কুম্ভকোনাম্।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কুম্ভকোনাম্।

কুম্ভকোনাম্ তাঞ্জোর জেলার অন্তঃর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর; দৈর্ঘ্যে তিন মাইল এবং প্রস্থে দেড় মাইল মাত্র। লোক সংখ্যা ৫৯,৬৩৭ জন। পূর্ব্বে ইহা চোল রাজ্যের একটী রাজধানী ছিল। প্রাচীনকালে সংস্কৃত বিদ্যার জন্য কুম্ভকোনাম্ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এস্থানে ডাকবাঙ্‌লা, ছত্রম্ ইত্যাদি সমুদয়ই আছে, পর্য্যটকদিগের কোন বিষয়েই কোনও প্রকারের অসুবিধা নাই। যাতায়াতের জন্য ষ্টেসনেই ঝট্‌কা এবং গো-যান পাওয়া যায়। এ স্থানের (১) শার্ঙ্গপাণিস্বামী (বিষ্ণুমন্দির) (২) কুম্ভেশ্বরস্বামী (৩) রামস্বামী (৪) চক্রপাণিস্বামী এই কয়েকটী দেব-মন্দির এবং মহামোক্ষম্ নামক সরোবরটী দর্শনীয়। আমরা এ স্থানে একে একে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

সাধারণ বর্ণনা।

১। শার্ঙ্গপাণিস্বামীর মন্দির নগরের ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে একটী সুবৃহৎ তেরতালা বিশিষ্ট ১৪৭ ফিট উচ্চ গোপুরমের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এই গোপুরমের সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ দেব-দেবীর ও কল্পিত মূর্ত্তি সমূহ খোদিত দেখিলাম।

২। কুম্ভেশ্বরস্বামীর মন্দির মধ্যে উক্ত নামীয় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শার্ঙ্গপাণি স্বামীর মন্দির হইতে কুম্ভেশ্বরস্বামীর মন্দিরে যাইতে হইলে ৩৩০ ফিট দৈর্ঘ্য এবং ১৫ ফিট প্রশস্ত একটী বারাণ্ডা পার হইয়া যাইতে হয়। এই মন্দির সন্নিকটস্থ গোপুরমের উচ্চতা ১২৮ ফিট। নানাপ্রকার রৌপ্য-নির্ম্মিত দেব-বাহনগুলির জন্য এই দেব-মন্দিরটি বিশেষরূপে দর্শনীয়।

৩। রামস্বামীর মন্দির—এই মন্দিরটী শার্ঙ্গপাণি স্বামীর এবং কুম্ভেশ্বর স্বামীর মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী। মন্দির সম্মুখস্থ গোপুরমটী অন্যান্য মন্দিরের গোপুরম হইতে ছোট। এই মন্দিরটী অন্যান্য মন্দির হইতে আকারে ক্ষুদ্র হইলেও শিল্পনৈপুণ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। মন্দিরের প্রত্যেক প্রস্তর স্তম্ভটীই প্রাচীন যুগের স্থপতি-বিদ্যার শ্রেষ্ঠতর সাক্ষী। এই সমুদয়

প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যে বিষ্ণুর দশ অবতারের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, রূপ-যৌবন-সম্পন্না ষোড়শী যুবতীর হাবভাব বিলাসময়ী দেহ-ভঙ্গিমা, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র ইত্যাদি নানা জাতীয় জন্তুর স্বাভাবিক মূর্ত্তি অতি সজীবভাবে খোদিত দেখিলাম। এইগুলি দেখিতে দেখিতে আমাদেরও মনে হইল যে, এমন সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট থাম দেখিয়া যিনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন এমন লোক জগতে অতি বিরল।

৪। চক্রপাণি স্বামীর মন্দির—সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা চক্রপাণি স্বামীর মন্দির দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম। এই মন্দিরের নিম্নদেশে পুণ্য-সলিলা কাবেরী নদী কুলুকুলু রবে বহিয়া চলিয়াছেন। চারিদিকে শান্তি-রাণীর স্নেহাঞ্চল বিচ্ছুরিত। স্থানটী বড়ই নির্জ্জন; নগরের কোলাহল এখানে শুনিতে পাওয়া যায় না। দূরে নগরের সৌধ-এবং গোপুরম সমূহের উচ্চ শীর্ষ দেখা যাইতেছে! কাবেরীর অপর পারে তরঙ্গায়িত বসুধা-সুন্দরীর অপূর্ব্ব লীলাময়ীমূর্ত্তি প্রকটিত। ইহার স্বচ্ছ রজত-সলিলপ্রবাহে তীরস্থ বিটপীরাজির ছায়া প্রতিফলিত হইয়া ছোট ছোট তরঙ্গের সহিত দুলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন তাহারা উল্লাসে নৃত্য করিতেছে! আমরা এস্থানে বসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। দেবতার শুভ-আশীর্ব্বাদের মত মৃদুমন্দ সুশীতল সমীরণ আসিয়া আমাদের ক্লান্ত দেহে সজীবতা প্রদান করিতে লাগিল। সমুদয় তীর্থ অর্থাৎ কুম্ভ-কোনামের অন্যান্য বিগ্রহাদি দর্শনান্তর যাত্রিগণ এ স্থানে আগমন করিয়া থাকে।

৫। মহামোক্ষম্ সরোবর—দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এই সরোবরটী পবিত্রতার জন্য অতিশয় বিখ্যাত। দ্বাদশ বর্ষান্তর এখানে একবার সুবিখ্যাত "কুম্ভমেলা" হইয়া থাকে, তখন এ স্থানে ভারতের প্রায় সমুদয় দেশ হইতেই লোক সমাগম হয়, লোক সংখ্যা কোন কোন বৎসর ৪০০,০০০ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সরোবরটী প্রায় ৬০০ শত বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে পাষাণ নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী ও তীরদেশে বহুবিধ দেবমন্দির বিরাজিত। প্রতি বৎসর মাঘ মাসেও এখানে একটী মেলা হয়।



সারঙ্গপাণিদেব—কুম্ভকোনাম্‌।

কুন্তলীন প্রেস।

এখানকার ব্রহ্মমন্দিরে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। দক্ষিণ ভারতে কেবল এই একটী মাত্রই সূর্য্য মন্দির আছে।

এতদ্ব্যতীত এ স্থানে গভর্মেণ্ট কলেজ, মিউনিসিপাল হাঁসপাতাল, মিউনিসিপাল আফিস, টাউনহল, উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কুম্ভকোনামে সর্ব্বশুদ্ধ ষোলটী দেব-মন্দির আছে, তন্মধ্যে বারোটী শিব-মন্দির এবং চারিটী বিষ্ণু-মন্দির।

আমরা এ স্থান হইতে কেড্‌লোর গমন করিলাম।

কেড্‌লোর।

কেড্‌লোর নগর কেড্‌লোর তালুকের অন্তর্গত। দক্ষিণ আরকট জেলার ইহাই হেড্‌কোয়াটার। মান্দ্রাজ নগরী হইতে ইহা ১২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। লোক সংখ্যা (৫২,২১৬)। এস্থানে ডাক বাংলা এবং প্রায় বারো তেরোটি ব্রাহ্মণের হোটেল থাকায় নবাগত যাত্রিগণের আহারাদির এবং বাসস্থানের জন্য বিশেষ বিপদাপন্ন হইতে হয় না। আহারের ব্যয় প্রতি বেলার জন্য দশ পয়সা মাত্র। যাতায়াতের নিমিত্ত ঝট্‌কা এবং গো-যান উভয়ই পাওয়া যায়।

সাধারণ বর্ণনা।

সেণ্ট ডেভিডের দুর্গ ও কেড্‌লোরের প্রাচীন ইতিহাস।

কেড্‌লোরস্থ সেণ্ট ডেভিড দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে উদ্যান-গৃহে দুর্গের গভর্ণার এবং ডেপুটি গভর্ণার বাস করিতেন বর্ত্তমান সময়ে সে স্থানে স্থানীয় কালেক্টার সাহেব বাস করেন। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক এই দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সাহেবদের সহিত জিঙ্গির খাঁ বাহাদুরের কেড্‌লোরে কুঠি স্থাপনের কথাবার্ত্তা সুস্থির হয়; খাঁ বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এস্থানে কুঠি নির্ম্মিত হয়; ক্রমে বাণিজ্যের বৃদ্ধির সহিত এস্থানে দুর্গ ও গুদাম গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফরাসীদের সহিত নানাপ্রকার যুদ্ধ, বিগ্রহ ও বিপ্লবাদির পরে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা ব্রিটিশ শাসনাধিকারেই আছে। এস্থানে প্রটেষ্টাণ্ট মতের এবং রোমান ক্যাথলিক মত, এই উভয় মতেরই গির্জ্জা ইত্যাদি আছে, এতদ্ব্যতীত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং নাগরিক অন্যান্য কোনও সুযোগ সুবিধারই অভাব দৃষ্ট হইল না। আমরা যখন রেলপথে আসিতেছিলাম, তখন একটী বিষয় আমাদের বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল, দেখিলাম যে কোন কোন গ্রামের বহির্ভাগে ইষ্টক নির্ম্মিত অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ অশ্ব মূর্ত্তি। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গাড়ীতে একটী উক্ত প্রদেশ বাসী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

নানা কথা।



শার্ঙ্গপাণি স্বামী—কুম্ভকোণাম্

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

করিলাম; তিনিও বিশেষ সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিয়া স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। এই মান্দ্রাজী ভদ্রলোকটী ডাকঘরে কাজ করেন, দিব্য ইংরেজী বলিতে পারেন, আমার সহিত ইঁহার ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা হইতেছিল; মান্দ্রাজে এই একটা সুবিধা যে রাস্তার কুলি পর্য্যন্তও মোটামুটি এক রকমে ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। ইনিও কেড্‌লোরে নামিলেন, আমাদের অনুরোধে এই ভদ্রলোকটী আমাদের সঙ্গী হইলেন, কারণ তেলেগু ভাষায় আমরা সুপণ্ডিত! গ্রামবাসী অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট হইতে কোনও বিষয় জ্ঞাত হইতে হইলে তদ্দেশবাসী ব্যক্তি ব্যতীত অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কাজেই এই ভদ্রলোকের সাহায্যে আমাদের সে অভাব ঘুচিবার সম্ভাবনা রহিল।

আমাদের যখন নগর দেখা শেষ হইল, তখন চাহিয়া দেখি দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন; চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে! আমার মাথায় কোন খেয়াল চাপিলে তাহা শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া আমার কুষ্ঠিতে লেখা নাই, কাজেই বন্ধু বান্ধবগণের বাধা বিঘ্ন না শুনিয়া একখানা গো-শকটে প্রায় দুই তিন মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামাভিমুখে গো-যানের সেই ধীর মন্থর গমনের সহিত দিব্য ব্যায়াম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার নব পরিচিত মান্দ্রাজী বন্ধুটি কিন্তু বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি বারেবারেই বলিতেছিলেন "মশায়, কাজটা ভাল করিতেছেন না, অপরিচিত স্থান, চোর-ডাকাতের ভয় খুব বেশী, ফিরে যাওয়াই ভাল।" আমি তাঁহার এই অযাচিত উপদেশের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলাম "আপনি এ দেশী, আপনার ভয় কি? আমরা অপরিচিত বহুদূর দেশবাসী, বরং আমাদেরই প্রাণটা যাইবে; জগদীশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের হাত কি বলুন?" ভায়া আর কোনও বাক্যস্ফূর্ত্তি করিলেন না, চুপ করিয়া গাড়ীর এক ধারে বসিয়া রহিলেন, বোধ হয় তিনি আমাদের অপরিণামদর্শিতার কথাই ভবিতেছিলেন।

এতক্ষণ চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিবার সময় পাই নাই, এখন চাহিয়া দেখি চারিদিকে অন্ধকারের রাজত্ব। মাথার উপরে সুনীল আকাশে আমাদেরি

দেশের মত তারকারাজি ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে! উন্নতকায় বিশাল মহীরুহ নিচয় প্রহরীর ন্যায় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান! মাঝে মাঝে গাছের পাতাগুলির মধ্য হইতে বনদেবীর অদৃশ্য হস্তে খস্‌ খস্‌ ফিস্‌ ফিস্‌ সর্‌ সর্‌ শব্দ হইতেছিল! দূরে দু' একটী পল্লীর কুটীর হইতে কথঞ্চিৎ আলোক-কণা দেখা যাইতেছিল। জন-সমাগম শূন্য এই নিস্তব্ধতার অন্ধকার রাজ্যে সত্য সত্যই তখন প্রাণের মধ্যে একটা শঙ্কার ভাব জাগিতেছিল। তখন দেশ কাল পাত্র কিছুই মনে ছিল না, আমি যে কোথায় সে কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

কিয়ৎকাল পরে রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় আমাদের গো-যান নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা অবতরণ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একটী ছোট মন্দির এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহু ছোট বড় অশ্বের মূর্ত্তি ও অদ্ভুত গঠনের কতকগুলি উদ্ভট রকমের রাক্ষস মূর্ত্তি; তাহাদের সুবৃহৎ মুখ মণ্ডল ও বৃহৎ চক্ষু দৃষ্টে এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য আকারের বিচিত্র গঠন বিস্ময়োদ্দীপকই বটে। আমরা আমাদের গাড়োয়ানকে ও নব পরিচিত মান্দ্রাজী বন্ধুটীকে গ্রামের মধ্যে পাঠাইয়া তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎকাল পরে লণ্ঠন হস্তে মন্দিরের পুরোহিতবর্গসহ গাড়োয়ান ও বন্ধুবর আসিয়া উপনীত হইলেন, ইহাদের সঙ্গে একদল গ্রামবাসীও ও জুটীয়াছিল, বোধ হয় তাহারা ভাবিয়াছিল যে আমরা তাহাদের মন্দির লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছি। কিয়ৎকাল পরে পুরোহিতবর্গের সহিত বাক্যালাপ ইত্যাদি হইলে তাহাদের অন্তর নিহিত ভয়ের তিরোধান হইল। তাহারা বলিল যে এসব স্থানে তেমন যাত্রী সমাগম হয় না, কাজেই সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই মন্দির দ্বার বন্ধ করিয়া বাস-গ্রামে চলিয়া যায়। ঐ সমুদয় অশ্বমূর্ত্তির ও রাক্ষসমূর্ত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করায় পুরোহিতেরা বলিল যে, এই মন্দিরে শীতলা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, লোকে বসন্ত রোগাক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবস্থানুযায়ী গর্দ্দভ, হাতী ইত্যাদির মূর্ত্তি মানত করিয়া থাকে। যাহার অবস্থা উন্নত তিনি বড় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, আর যাহাদের হীনাবস্থা তাহারা ছোট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, এ অঞ্চলে বসন্ত রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব; কাজেই দেবীর প্রতি



দু'টি ভাই বোন—দাক্ষিণাত্য।

কুন্তলীনপ্রেস, কলিকাতা।

সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা খুব বেশী। রেলপথের উভয় পার্শ্বে প্রায় সর্ব্বত্রই এরূপ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

আমরা পুরোহিতকে বলিয়া মন্দিরমধ্যস্থ দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদানান্তর কেড্লোর ষ্টেসনের দিকে গাড়ী চালাইবার জন্য শকট চালককে আদেশ করিলাম।

পণ্ডিচারী।

ভারতবর্ষে ফরাসীদের অধিকার ভুক্ত যে তিনটী সহর আছে। পণ্ডিচারী তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ভিলুপুরম্ জংশন হইতে ২৭ মাইল এবং মান্দ্রাজ নগরী হইতে ইহা ১২২॥ মাইল দূরে অবস্থিত।

সাধারণ বর্ণনা।

বর্ত্তমান সময়ে দাক্ষিণাত্যে ইহাই ফরাসী অধিকারের প্রধান রাজধানী এবং প্রধান আবাস। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে ভারতবর্ষে ইয়ুরোপীয় অধিকারভুক্ত নগর সমূহের মধ্যে পণ্ডিচারীই শ্রেষ্ঠ ছিল। করমণ্ডল উপকূলে সমুদ্রতটে এই সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরটী অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং প্রস্থে সিকি মাইল মাত্র। লোক সংখ্যা (৫০,০০০)। সহরের মধ্য দিয়া একটী খাল থাকায় নগরটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। রাস্তা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুপ্রশস্ত, পথের উভয় পার্শ্বেই নারিকেল বাগান থাকায় ইহাদের সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। সমুদ্র তীর হইতে এই নগরটীকে একটী বৃহৎ কুঞ্জবনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এস্থানের স্বাস্থ্য উত্তম। দক্ষিণ ভারতের বহু রেল পথের সহিত সংযুক্ত থাকায় এই নগরের বাণিজ্যের অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক। ইয়ুরোপীয়দিগের থাকিবার জন্য কয়েকটী হোটেল এবং আগন্তুক হিন্দুযাত্রিগণের বাসের জন্য ধনবান শেঠদের কয়েকটী ছত্রবাটী আছে, সেস্থানে থাকিলে বাড়ীভাড়া লাগে না। এতদ্ব্যতীত বহু হোটেল থাকায় আহারাদির নিমিত্ত ও যাত্রিগণকে কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কয়েকটী শিল্পকূপ* (Artesian well) খনিত হওয়ায় উৎকৃষ্ট পানীয় নিবন্ধন এই স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে, অনেকে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এস্থানে আসিয়া বাস করেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরের অংশে ফরাসীরা বাস করিয়া থাকে। সহরটি ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। এস্থানে তামিলি ও ফরাসী ভাষা

* এই সমুদয় কূপ জল সরবরা হর জন্ত বিশেষ উপযোগী। পাহাড়ের গায়ে জল অবস্থিত স্তরের সহিত লোহার নলদ্বারা সংযোজিত করিয়া দিলে আপনা হইতেই নলের মধ্য দিয়া জল কূপে উঠিতে থাকে। এসমুদয় কূপের জলের আস্বাদ ঠিক টিঞ্চার অব ষ্টিলের মত। বহুমূত্র রোগী ও দৌর্ব্বল্য প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।



পণ্ডিচারী।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

প্রচলিত। নগরে কলোনিয়ান কলেজ ও বহু বিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া লাইব্রেরী, কেথোলিক মিশন সভা, অরফেন হাউজ, দাতব্য সমিতি ইত্যাদি সমুদয়ই আছে। যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা এবং পুস্‌পুস্‌ পাওয়া যায়। পুস্‌পুস্‌ গাড়ী মানুষে ঠেলিয়া নেয়।

আমরা একে একে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ, গির্জ্জাঘর, পাগেগুা, নূতন বাজার, ক্লক টাউয়ার, আলোকবাটী, সৈন্যাবাস এবং সমুদ্রতটে জেটির সম্মুখে অবস্থিত বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা ডুপ্লেঁ (Dupleix) সাহেবের প্রস্তরমূর্ত্তি ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিলাম।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

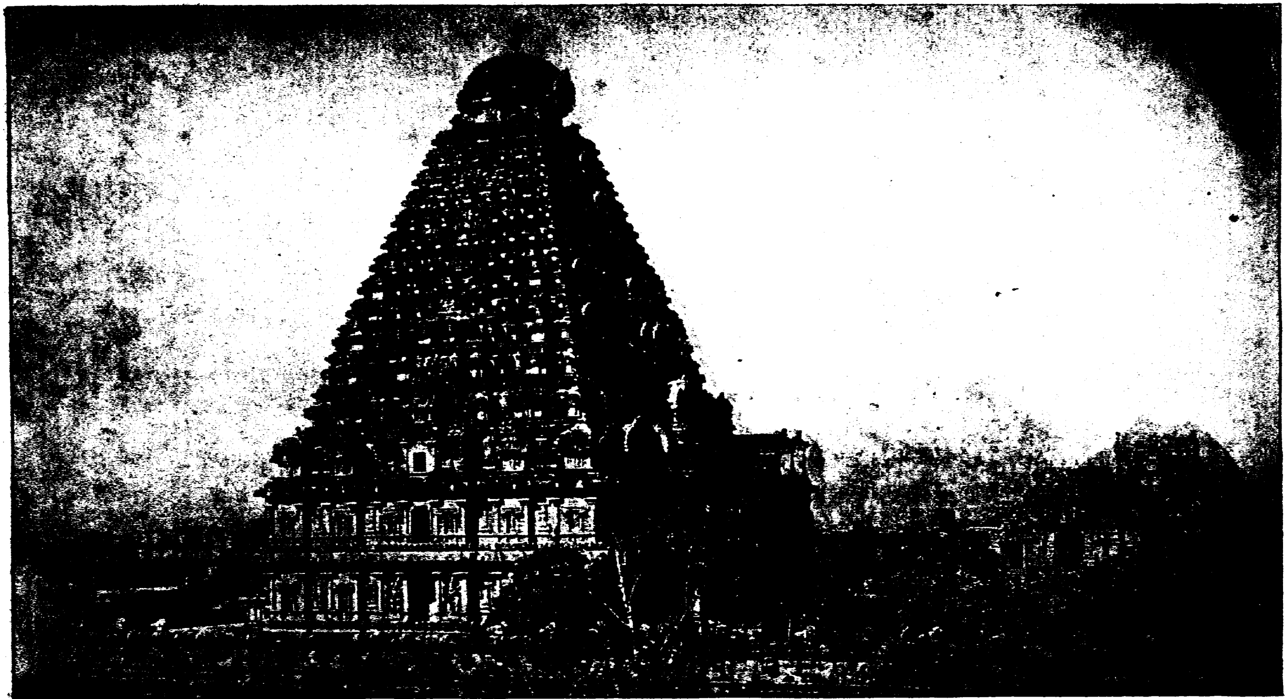
ফ্রাঙ্কো মার্টিন (Francois Martin) নামক একজন ফরাসী কর্তৃক ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এস্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা ইহা অধিকার করেন কিন্তু ছয় বৎসর পরে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নৌসেনাপতি বস্কাওবেল এই নগর অবরোধ করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। আরকুট সাহেব ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচারী অবরোধ করেন, তৎকালীন ফরাসী সেনাপতি লালি (Lally) নগর রক্ষায় অসমর্থ হইয়া এই স্থান ইংরেজদের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হন।

পণ্ডিচারী মান্দ্রাজ গভর্মেণ্টের হাতে আসিলে, ফরাসীদিগের কৃত প্রাচীন দুর্গাদি ভূমিসাৎ করা হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে ইংরেজ গভর্মেণ্ট ফরাসীদিগকে পণ্ডিচারী প্রত্যর্পণ করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় সার হেক্টর মন্‌রো এই স্থান দখল করিয়া লন। সাত বৎসর কাল ইহা ইংরেজ অধীনে ছিল, অবশেষে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির অবসানে উহা ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হয়।

যখন ইয়ুরোপে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া পেনিন্‌সুলার যুদ্ধে ফরাসী ও ইংরেজগণকে বিপর্য্যস্ত করিতেছিল, সে সময়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ইংরেজ রাজ ভারতবর্ষীয় ফরাসী অধিকারগুলি আক্রমণ করিলেন এবং নৌ-সেনাপতি কর্ণওয়ালিসের এবং সেনাপতি ব্রেবওয়েটের অধিনায়কত্বে পুনর্ব্বার

পণ্ডিচারী দখল করিয়া লন। ২৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইহা ইংরেজের অধিকারে ছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবাবসানে ফরাসীগণ পুনরায় উহা প্রাপ্ত হন এবং তদবধি উহা ফরাসীর রাজধানী রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এ স্থানে খোলাভাটির উপর কোনও কর নির্দ্দিষ্ট না থাকায় দেশীয় মদ্য অত্যন্ত সস্তা, সে জন্য মাতালের সংখ্যাও এখানে বেশী পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এ স্থান হইতে অপরাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া সে দিবস সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই তাঞ্জোর নগরে উপনীত হইলাম, রাত্রিকালে বাসা নির্দ্দেশ করিয়া উদর দেবকে শান্ত করিয়া ক্লান্ত দেহে নিদ্রাদেবীর স্নেহ-কোলে ঢলিয়া পড়িলাম।



গপুরাম সমূহের দৃশ্য—মাদুরা।

ইরোড জংশন।

আমরা ইরোডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলাম। ইহা একটী ক্ষুদ্র সহর,—সমুদ্র হইতে ৫৪৩ ফিট উচ্চ। ইরোড এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ বিশেষ উর্ব্বরা, সহরের চারিদিকে ধান্যক্ষেত্র, কদলী বাগান এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে সুপারীবৃক্ষশ্রেণী থাকায় একটী রমণীয় কুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এ অঞ্চলের কলিঙ্গ রায়ের খালের সাহায্যে কৃষকদের ক্ষেত্রে জল দিবার বিশেষ সুবিধা হয়। এই খাল অতি প্রাচীনকালে কলিঙ্গ রায় নামক একজন হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল—ইহা ভবানী নামক নদীর সহিত সংযোজিত। পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীর দক্ষিণতটে ইরোড অবস্থিত। এখানে মান্দ্রাজ, বেঙ্গালোর, সেলেম এবং কেলিকাটযাত্রীদিগের গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

রেলওয়ে ষ্টেসনের প্রায় ৮০ মাইল দূরে একটী ডাকবাংলা আছে। হিন্দুতীর্থযাত্রিগণ নগরস্থিত ছত্রমে থাকিতে পারেন, ছত্রে থাকিতে হইলে আহারাদির বন্দোবস্ত যাত্রিগণের নিজের করিতে হয়;—হোটেলেও আহারাদি করা যাইতে পারে—এখানে প্রায় ১৭ সত্তেরটী নানাজাতির আহারার্থ হোটেল আছে। যাতায়াতের জন্য ষ্টেসন হইতেই ঝটকা এবং গো-যান সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, জাফ্রান, কদলী, লঙ্কামরিচ, পান এবং তুলাই প্রধান। প্রতি বৃহস্পতিবার দিবস এখানে একটী হাট বসে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে এখানে একটী স্নানোৎসব হয়, সে সময়ে পবিত্র সলিলা কাবেরী নদীতে স্নান করিবার জন্য বহুদূর হইতেও লোক সমাগম হয়।

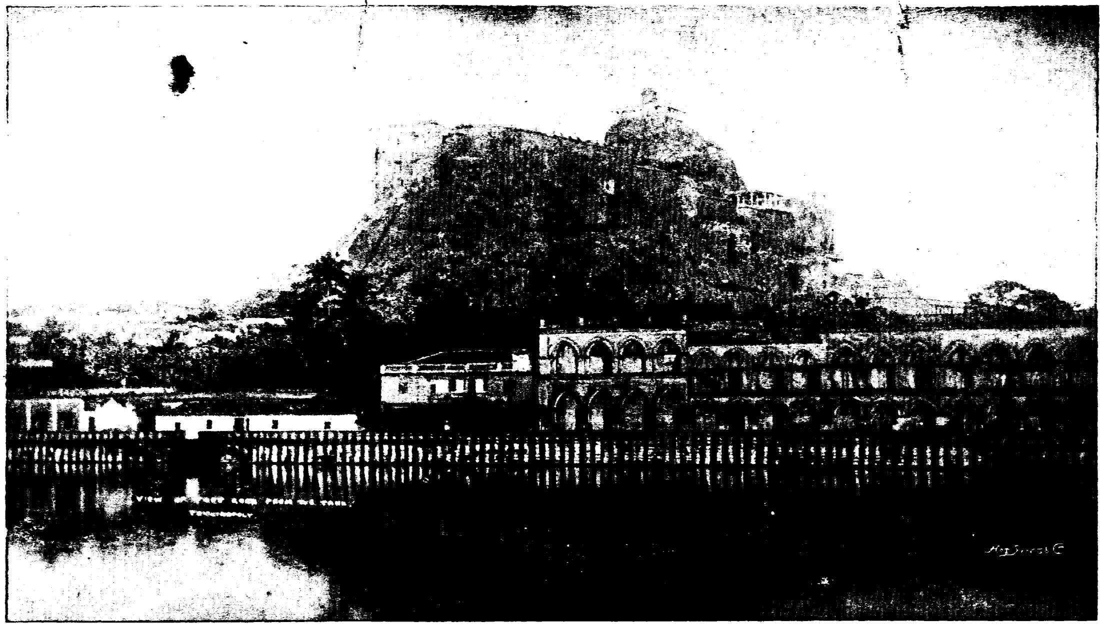
ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

হাইদার আলির সময়ে ইরোড নগরে প্রায় ৩০০০ গৃহ ও ১৫,০০০ লোকের বসতি ছিল, কিন্তু ক্রমাগত মহারাষ্ট্রীয়গণের মহীশূরের ও ব্রিটিশ সিংহের আক্রমণে এই নগর একেবারে জনশূন্য ও ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইরোড

মদুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু সেই বৎসরই পুনরায় তাহাদের হস্তচ্যুত হয়, ইহার কুড়ি বৎসর পরে ইংরেজেরা ইরোড নগরী পূর্ণরূপে দখল করিয়া লন। যখন সমুদয় অশান্তি দূর হইয়া সন্ধি এবং শান্তি সংস্থাপিত হইল তখন পুনরায় নিরাপদে বহু লোক আসিয়া এই স্থানে বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং দেখিতে দেখিতে এক বৎসরের মধ্যেই ইরোড পুনরায় সুন্দর ও সুশোভন নগরে পরিণত হইল।

দ্রষ্টব্য স্থান।

এখানে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির অবশ্য দ্রষ্টব্য। উভয় মন্দির গাত্রেই বহু প্রাচীন খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এখানে তেমন দর্শনীয় কিছুই নাই। কাবেরী নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের নৈসর্গিক শোভা সম্পদ এবং কলিঙ্গরায়ের খালের তীরবর্ত্তী ভূ-ভাগের শ্যামল তরুরাজিপূর্ণ শোভা-সম্পদ চিত্তাকর্ষক। নিম্ন বঙ্গের ন্যায় যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সে দিকেই দেখিতে পাইবে শ্রেণীবদ্ধ সুপারি বৃক্ষগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধান্যক্ষেত্রের, কদলী বৃক্ষের ও সুপারী বৃক্ষের প্রাচুর্য্যে এ অঞ্চলকে অনেক সময় বঙ্গদেশ বলিয়া আমাদের ভ্রম হইয়াছে।



ত্রিচিনাপল্লী দুর্গ।

কুন্তলীন প্রেস।

ত্রিচিনাপল্লী।

ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিচিনাপল্লী জেলাস্থ প্রধান নগর। কাবেরী নদীর দক্ষিণতটে এই নগরটী অবস্থিত। লোক সংখ্যা ১০৪,৭২১ জন। এই নগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে প্রাচীন কালে ত্রিশিরা নামে এক রাক্ষস পর্ব্বত মধ্যে বাস করিত, পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক ভয়ঙ্কর অরণ্যানী সঙ্কুল ছিল, আর রাক্ষসের ভয়ে সেস্থানে কেহ প্রবেশ করিতে সাহস পাইত না। কিয়ৎকাল পরে সুরবদিওয়ান নামে কোন সাহসী বীর পুরুষ এই রাক্ষসকে বধ করেন; সেই অবধি ইহার নাম ত্রিশিরাপল্লী হইয়াছে। সুরবদিওয়ান পরিশেষে জঙ্গল পরিষ্কার পূর্ব্বক এই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করেন। এই বীর-পুরুষ স্বকীয় বীরত্ব প্রভাবে ত্রিশিরা রাক্ষসকে বধ করিয়া নিকটবর্ত্তী জনসাধারণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি তিনি সুব্রহ্মণ্য নামে অভিহিত হইয়া কাবেরী নদীর উভয় তটে শিবালয়ে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিসহ অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টিয় পূর্ব্ব পঞ্চশতাব্দী হইতে চোলরাজগণও এখানে কিছুকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এস্থানে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। চোলরাজগণের পরে মুসলমান নৃপতিরা এইস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তবে মুসলমানেরা কোন্ সময়ে ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ নিরূপণ করা সুকঠিন। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদসাহ আলাউদ্দীনের প্রধান সেনানায়ক বল্লাল, রাজধানী দ্বারসমুদ্র লুণ্ঠ করিয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। যদিও ত্রিশিরাপল্লী লুণ্ঠনের সম্বন্ধে কোনও বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না, তবুও সে সময়ে তাহারা ত্রিশিরাপল্লী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

সাধারণ কথা।

ঐতিহাসিক বিবরণ।

নানাপ্রকার বিপ্লবের মধ্য দিয়া এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদির পরে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলি মানব-লীলা সম্বরণ করিলে তাহার পুত্র টিপু কর্ণাটিক পরিত্যাগ করিয়া মহীসুরে প্রত্যাগমন করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজ

গভর্মেণ্টের সহিত নবাবের সন্ধি হয়। নবাব ইংরেজ বিরুদ্ধে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট এই প্রদেশ নিজ অধিকার-ভুক্ত করিয়া লইলেন, নবাব বৃত্তিভোগী রহিলেন। এখন

নগরের কথা।

ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ আর নাই, দুইটী দ্বার তাহার সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান আছে। দুর্গ প্রাচীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, পরিখার খাদ পূর্ণ করিয়া ইহার উপর দিয়া রাজপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। দুর্গের ভিতর প্রাচীন রাজবাটী অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এখন তহশীলদারের কাছারী, মুন্সেফ কাছারী স্থানীয় কোষাগার ও ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। পর্ব্বতের উপরে এই দুর্গটী অবস্থিত। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্য দক্ষিণদিকে গ্রেনাইট প্রস্তরের নির্ম্মিত সিঁড়ি আছে। সহরের উত্তরাংশে পাহাড়টী অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ২৩৬ ফুট। পর্ব্বতোপরি হইতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় ত্রিশ মাইল স্থানের পরম রমণীয় দৃশ্যাবলী নয়ন-পথে পতিত হয়। সোপানের উপর চাতালের বামপার্শ্বে তয়ুমানস্বামী মহাদেবের মন্দির, সম্মুখস্থ পর্ব্বত কাটিয়া একটী ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে, কর্নাটিক যুদ্ধের সময় ইহাতে বারুদ থাকিত, এই মন্দিরটী দেখিতে অতি মনোহর। সম্ভবতঃ চোলরাজগণ এই দেবমন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে মহাদেবের উৎসবোপলক্ষে এস্থানে বহু লোক-সমাগম হয়। মন্দির মধ্যে পার্ব্বতী, গণেশ ও স্কন্দের (সুব্রহ্মণ্য) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। পর্ব্বদিনে সমুদয় দেব-বিগ্রহকে নগর প্রদক্ষিণ করান হয়। মন্দির সম্মুখস্থ রৌপ্য মণ্ডিত সুবৃহৎ নন্দিকেশ্বর বৃষের মূর্ত্তিটী বড়ই সুন্দর।

এ স্থানে জেলখানার ন্যায় সুবৃহৎ জেলখানা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে আর নাই। ফোর্টের উত্তরদিকে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে,

স্থানীয় ব্যবসায় ও শিল্প ইত্যাদি।

তাহাদিগকে ফ্রেন্স রক্স কহে। কাবেরী খালের অপর পারে সেরিঙ্গম দ্বীপ। ৩২টী খিলানের সেতু দ্বারা মূল ভূ-ভাগের সহিত দ্বীপটী সংলগ্ন। এই দ্বীপ প্রায় ১৭ মাইল দীর্ঘ ও ১॥ মাইল বিস্তৃত। ইহার উত্তরে আরও কতকগুলি পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বিশপ হিবার ও চাঁদ সাহেবের কবর অন্যতম দর্শনীয়। তামাক, চুরট প্রস্তুত এবং বস্ত্র বয়নই এখানকার লোকের প্রধান ব্যবসা। এস্থানের চুরট সর্ব্বত্র

প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐ নামের চুরট প্রায়ই ডিণ্ডিগল হইতে আমদানি হয়। এ নগরে যে সমুদয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্যাদি দর্শন করিলাম, তাহাও যে বিশেষ প্রশংসনীয় তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

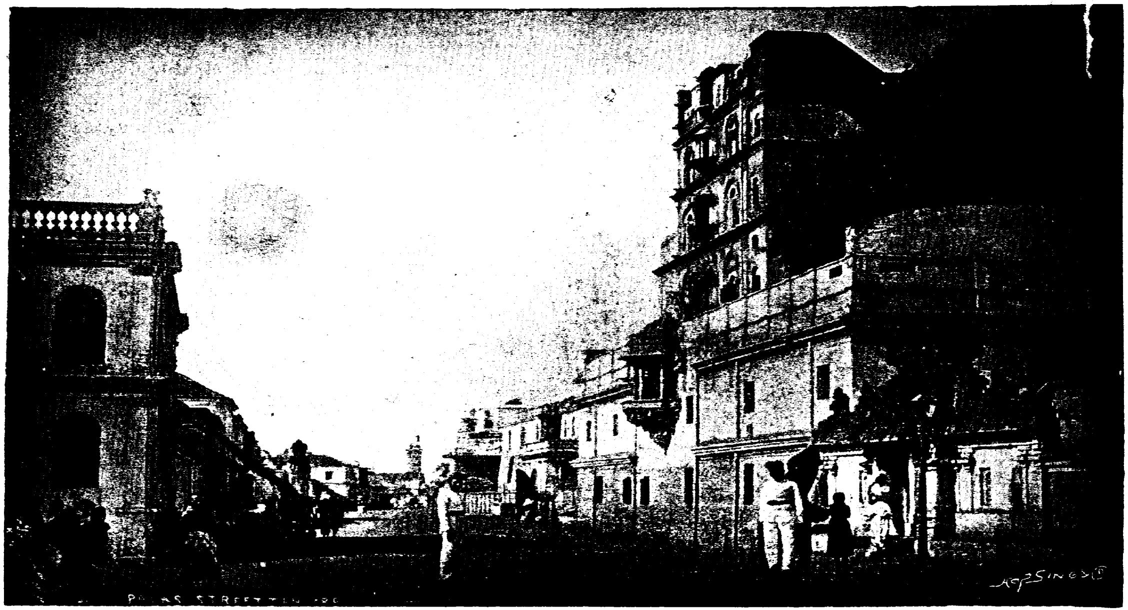
আমরা পূর্ব্বে যে সেতুর কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই শ্রীরঙ্গের পুল হইতে ভারত বিখ্যাত শ্রীরঙ্গদেবের মন্দির তিন মাইল দূরে অবস্থিত; উক্ত শ্রীরঙ্গদেব বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই মন্দিরে বহু প্রকারের কারুকার্য্যখচিত সুন্দর ও বৃহৎ গোপুরাম আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গোপুরামটি ১৫২ ফিট উচ্চ। ভারতবর্ষের আর কোনও দেব-মন্দিরই শ্রীরঙ্গমের দেব-মন্দিরের ন্যায় বৃহৎ নহে।

শ্রীরঙ্গমের দেব মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এস্থানের গোপুরামগুলির দেওয়াল ও ছাদ ভগবান্ বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি ও নানা প্রকার নরনারীর মূরত দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতিসমূহ এ সকল মন্দিরস্থ চিত্র দ্বারা বেশ অধ্যয়ন করিতে পারা যায়। এক সময়ে এই মন্দিরের মধ্য হলটি সহস্রস্তম্ভ দ্বারা রক্ষিত ছিল, কিন্তু হায়! এখন তাহার অর্দ্ধেকও নাই। সময়ের অচিন্ত্যনীয় পরিবর্ত্তনের সহিত কতইনা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তৃতীয় মণ্ডপমধ্যে শ্রীরঙ্গমদেবের বলয়, পদক প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নালঙ্কার সমূহ রক্ষিত হয়, ঠাকুরের এই বলয়, পদক ইত্যাদি হীরক, পান্না ও চুনী দ্বারা বিনির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত বহুমূল্য হীরক খচিত অঙ্গুরীয়ক, পদাভরণ প্রভৃতি অপরাপর বহু অলঙ্কারও আছে। মান্দ্রাজের সর্ব্বত্রই একটী শিবের ও একটী বিষ্ণুর এইরূপ যুগ্ম মন্দির দৃষ্ট হয়। এস্থানেও শ্রীরঙ্গদেবের মন্দিরের কিছু দক্ষিণে এক মাইল দূরে জম্বুকেশ্বর নামক এক শিব-মন্দির বিরাজিত। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও জম্বুকেশ্বরের মন্দির বহুকালের প্রাচীন এবং দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। দেবালয়ের মধ্যে টেপ্পাকোলম্ নামক কূপ, কূপে সর্ব্বদা প্রস্রবণের জল উত্থিত হইতেছে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে এস্থানের এক জম্বুবৃক্ষের মূলে ত্রিপুরারি মহাদেব বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। এস্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়।

ত্রিচিনাপল্লী ইংরেজশাসনাধিকারের পর হইতে বিশেষ উন্নত হইয়াছে।

এখানে জেলার জজ, কালেক্টর, মুন্সেফ, ডাক্তার, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অবস্থান করেন। এই নগরে একটী সেনানিবাস আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশিরাপল্লী এখন ত্রিচিনাপল্লী নামে পরিণত হইয়াছে। এস্থানের জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।



রাজপথ—তাঞ্জোর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

তাঞ্জোর।

তাঞ্জোর দক্ষিণ-ভারতের একটী সুপ্রসিদ্ধ সুন্দর নগর। সমুদ্র হইতে ইহার উচ্চতা ১৯৩ ফিট। নগরের লোকসংখ্যা ৫৭,৮৭০। তাঞ্জোর নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে এ অঞ্চলে তাঞ্জন নামক এক ভয়ঙ্কর দৈত্য বাস করিত, তাহার অত্যাচারে নিকটবর্ত্তী জনসাধারণ কেহই নিরাপদে বাস করিতে পারিত না, বিষ্ণু এই ভয়ানক দৈত্যের হস্ত হইতে সকলকে রক্ষার নিমিত্ত স্বহস্তে ইহার প্রাণ-সংহার করেন; মৃত্যুকালে তাঞ্জন বিষ্ণুকে অনুরোধ করে যে, তাহার নামানুসারে যেন এই অঞ্চলের নামকরণ হয়। বিষ্ণু মুমূর্ষু দৈত্যের অনুরোধ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; তদনুযায়ী এই স্থানের নাম তাঞ্জোর হইয়াছে।

তাঞ্জোর ষ্টেসনের অনতিদূরেই ভ্রমণকারীদের থাকিবার জন্য ডাক-বাংলা আছে, এই বাংলাতে চারিজন লোক থাকিতে পারে। নগরের মধ্যে ৩।৪টী ছত্রম্ এবং বহু হোটেল আছে, সে জন্য নবাগত ভ্রমণকারীদের কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যাতায়াতের নিমিত্ত ঝট্‌কা এবং গো-যান উভয়ই পাওয়া যায়। অশ্ব-শকটের প্রয়োজন হইলে, পূর্ব্বাহ্নে ষ্টেসন-মাষ্টারকে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। এ স্থানে ঘোড়ার গাড়ী প্রতি রোজ ৩॥০ টাকা এবং এক দুপুরের জন্য ২৲ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায়। গো-যান প্রতি মাইল ৵০ দুই আনা হিসাবে দিতে হয়; ঝট্‌কা প্রতি রোজ ২৲ টাকা এবং এক দুপুরের জন্য ১৲ এক টাকায় পাওয়া যায়। তাঞ্জোরের দ্রষ্টব্য পদার্থ সমূহ দেখাইবার জন্য প্রদর্শক (Guide) পাওয়া যায়। গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইলে, ইহারা যাত্রিগণকে বিরক্ত করিতে থাকে। নগরের সমুদয় দর্শনীয় দ্রব্যাদি খুঁটিনাটি করিয়া দেখাইতে, সারাদিনের জন্য একজন প্রদর্শক দুই টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। তাঞ্জোর নগর কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এ স্থানে দর্শনোপযোগী বহু স্থান আছে; তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকারী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষরূপে দর্শনীয় এবং হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের অবশ্য-দ্রষ্টব্য—

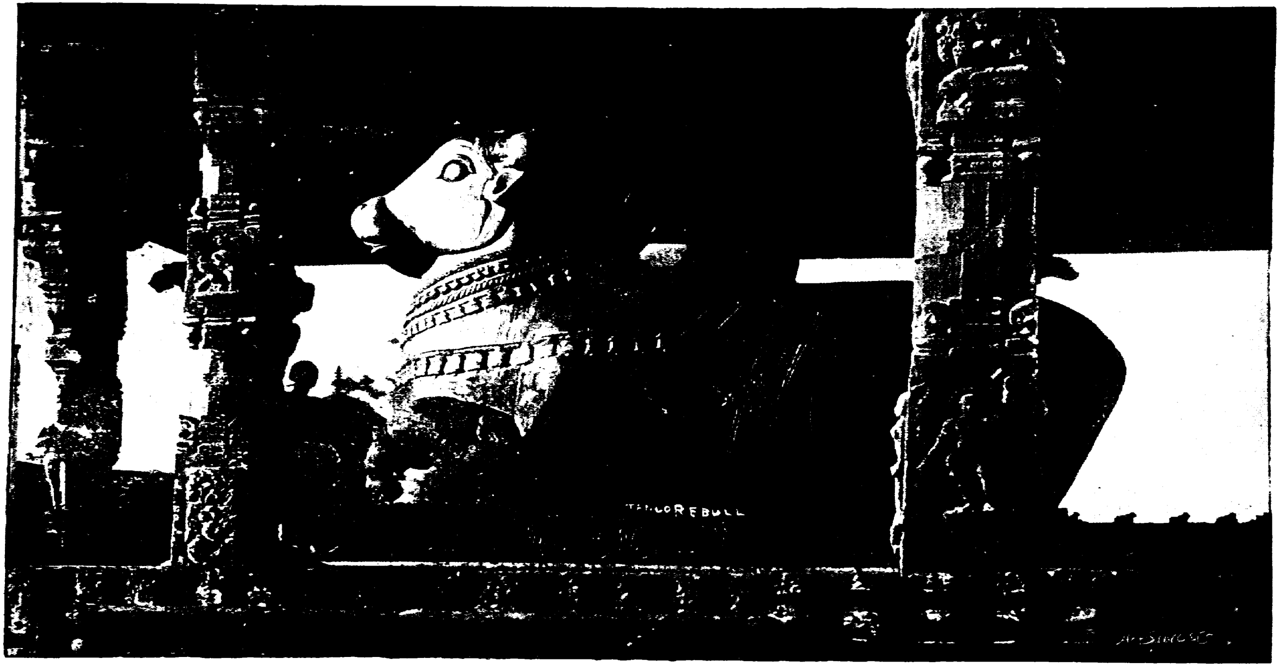
বৃহদ্বেশ্বরের মন্দির, ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। এই নগরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটী দুর্গ আছে, দুর্গ দুইটী পরস্পর এতই সংলগ্ন যে, ইহাদিগকে দুইটী দুর্গ না বলিয়া একটী দুর্গ বলাই শ্রেয়ঃ। প্রধান দেবালয় অর্থাৎ বৃহদ্বেশ্বরের মন্দির ও সোয়ার্ট গির্জ্জা ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে এবং রাজপ্রাসাদ বৃহৎ দুর্গমধ্যে অবস্থিত। এক সুবৃহৎ ও প্রায় ৯০ ফিট উচ্চ প্রথম গপুরামের মধ্য দিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিতে হয়, তাহার পর প্রায় ১৭০ ফিট দীর্ঘ পথ পার হইয়া দ্বিতীয় গপুরামের মধ্য দিয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়; দ্বিতীয় গপুরামটী প্রথমটীর অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ছোট, ইহার উচ্চতা ৬০ ফিট হইবে। পূর্ব্বে যে প্রাঙ্গণের কথা বলিয়াছি, তাহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৮০০ × ৪১৫ ফিট হইবে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পার্শ্বে যজ্ঞশালা ও সভাপতি কোভিল (শিবমন্দির) অবস্থিত;

বৃহৎ নন্দী মূর্ত্তি।

ইহার পশ্চিম দিকে ১৬ ফিট লম্বা এবং ১২ ফিট উচ্চ ও ৭ ফিট বেড়ের এব বৃহৎ নন্দীর (বলদ) মূর্ত্তি। ইহার আনুমানিক ওজন ২৫ টন। ইহা এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। কথিত আছে, যে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বলদটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ৪০০ মাইল দূরবর্ত্তী কোন এক পাহাড় হইতে আনীত। আরও এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই নন্দী প্রতি দিন অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্রমে ইহা এতদূর বড় হইবে যে, যে মণ্টপমে ইহা অবস্থিত, তাহাও ছাড়াইয়া যাইবে।

এই মূর্ত্তির পর তিন সারি কারুকার্য্য-খচিত থামের উপর বারাণ্ডা, তাহার পর ৭৫ × ৭০ ফিট করিয়া বিস্তৃত দুইটী দালান এবং ৫৬ × ৫৬ ফিট দীর্ঘপ্রস্থ আর একটা অঙ্গণ।

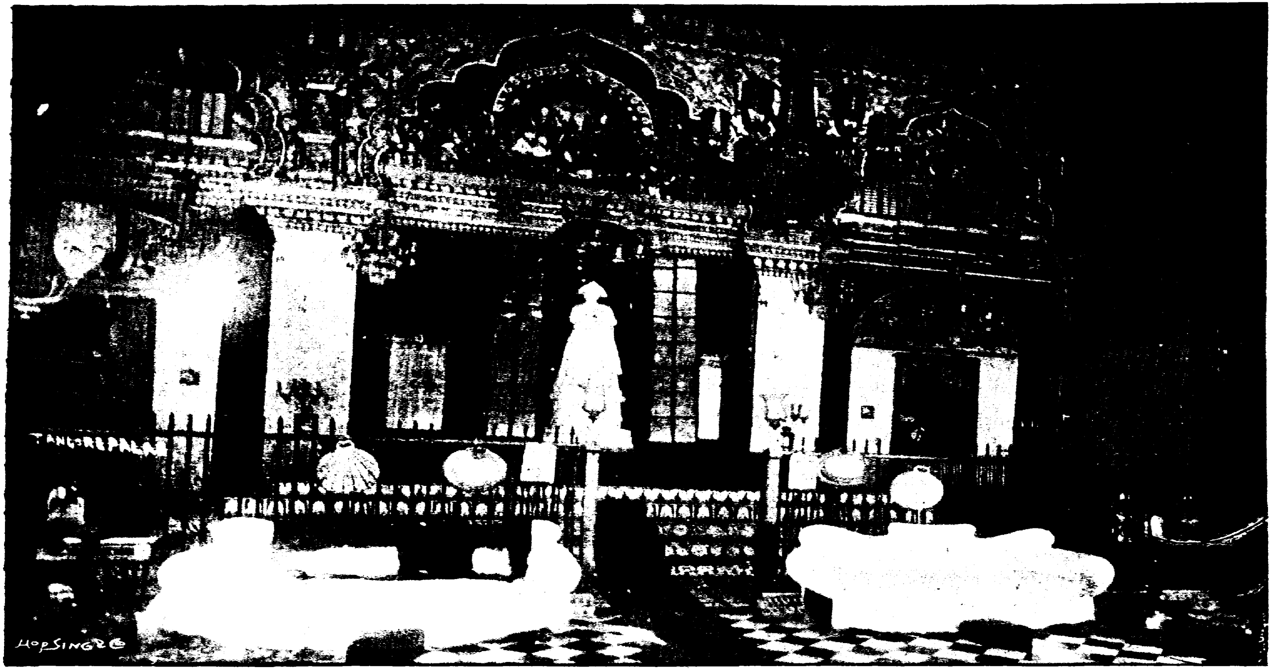
এ সমুদয়ের উপরে বৃহদ্বেশ্বরের মন্দিরের ২১৬ ফিট উচ্চ চূড়া গগনভেদ করিয়া শোভা পাইতেছে। এই মন্দিরের একটী বিশেষত্ব প্রণিধানযোগ্য যে, ইহা শিব-মন্দির হইলেও ইহার গপুরাম ও অন্যান্য সমুদয় স্থানেই বিষ্ণুমূর্ত্তি খোদিত। এই মন্দিরের অভ্রভেদী উন্নত শীর্ষ বহুদূর হইতেই পরিব্রাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মন্দিরের প্রতি প্রস্তরখণ্ডেই স্থপতিবিদ্যার অপূর্ব্ব কলাকৌশল দেদীপ্যমান। স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এই



নন্দী (বৃষ) তাঞ্জোর।

রাজবাড়ীর দরবার-হল ও লাইব্রেরী (সরস্বতী-মহল) প্রধান দ্রষ্টব্য। দরবার-হলটি সমচতুষ্কোণ। এ স্থানে পাদ্রী সোয়ার্টের প্রিয়পাত্র রাজা শিবাজীর মার্বেল প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি আছে, এই মূর্ত্তিটি ভাস্কর-বিদ্যার খ্যাতনামা শিল্পী ফ্লাক্সম্যান সাহেব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেয়ালের এক স্থানে লর্ড পিগটের তৈলচিত্র আছে, এতদ্ব্যতীত বহু রাজাদিগের ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। শিবাজী মহারাজার সুবৃহৎ মূর্ত্তির বামদিকে দেওয়ান ও দক্ষিণ দিকে তাঁহার সেক্রেটারীর মূর্ত্তি। বৃদ্ধ পাদ্রী সোয়ার্ট মহারাজা শিবাজীর গুরু ছিলেন। শিব-গঙ্গা সরোবরের নিকটস্থ সোয়ার্ট-গির্জ্জার মধ্যস্থ এক স্থানে সোয়ার্টের মৃত্যুকালীন দৃশ্য অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, দেখিলে আপনা হইতেই একটা পবিত্র ভাবের উদয় হয়। বৃদ্ধ পাদ্রী অন্তিম-শয্যায় শয়ান, বামে তাঁহার শিষ্য মহারাজা শিবাজী দুইজন সভাসদের সহিত মলিন মুখে দণ্ডায়মান, দক্ষিণদিকে পাদ্রী কোল্‌নার ও পদপ্রান্তে চারিটী সুন্দর শিশু বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ সমুদয়ই সেই অদ্বিতীয়—ভাস্করকার্য্যে সুনিপুণ ফ্ল্যাক্সম্যান সাহেব কর্ত্তৃক শ্বেত মার্বেল প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। আমরা দরবার-হল-সংলগ্ন সরস্বতী মহল বা লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। এত অধিকসংখ্যক লিখিত গ্রন্থ ভারতবর্ষে আর কোনও পুস্তকালয়ে নাই। এই পুস্তকাগারে ১৮,০০০ হাজার সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ এবং ৮০০০ হাজার তালপত্রে লিখিত পুস্তক আছে।

আমরা রাজবাড়ীর অস্ত্রাগারে নানা প্রকারের অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্র দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। এখানে ছোট ছোট কামান, সেকেলে পিস্তল, বন্দুক, হাওদা, হাতীর স্বর্ণমুকুট, সোণার বাঁট-সংযুক্ত তরবারি, মানুষের পরিধানোপযোগী এবং নানাজাতীয় জন্তুর সজ্জার উপযুক্ত বহু পোষাক বিদ্যমান। এই কক্ষটি দেখিতে বেশ বড় এবং সুন্দর। প্রত্যেকটি জিনিষও অতিশয় যত্নের সহিত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকস্থ তোরণের নিকট 'ভাসা মধু' নামক এক অপূর্ব্ব সময় নিরূপক যন্ত্র দেখিলাম। এই যন্ত্রের পার্শ্বদেশে ২৫ ফিট লম্বা এবং ২ ফিট মুখ, এইরূপ একটী অতি প্রাচীন কামান, প্রাচীন কালের সাক্ষী স্বরূপ অদ্যাপি পর্য্যাটক-



রাজপ্রাসাদ—তাঞ্জোর

গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাঞ্জোর জেলা মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সির উপবন বলিয়া কথিত। এই জেলার উত্তর ভাগে নারিকেলকুঞ্জ পরিশোভিত কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ প্রভূত রত্ন প্রসব করে।

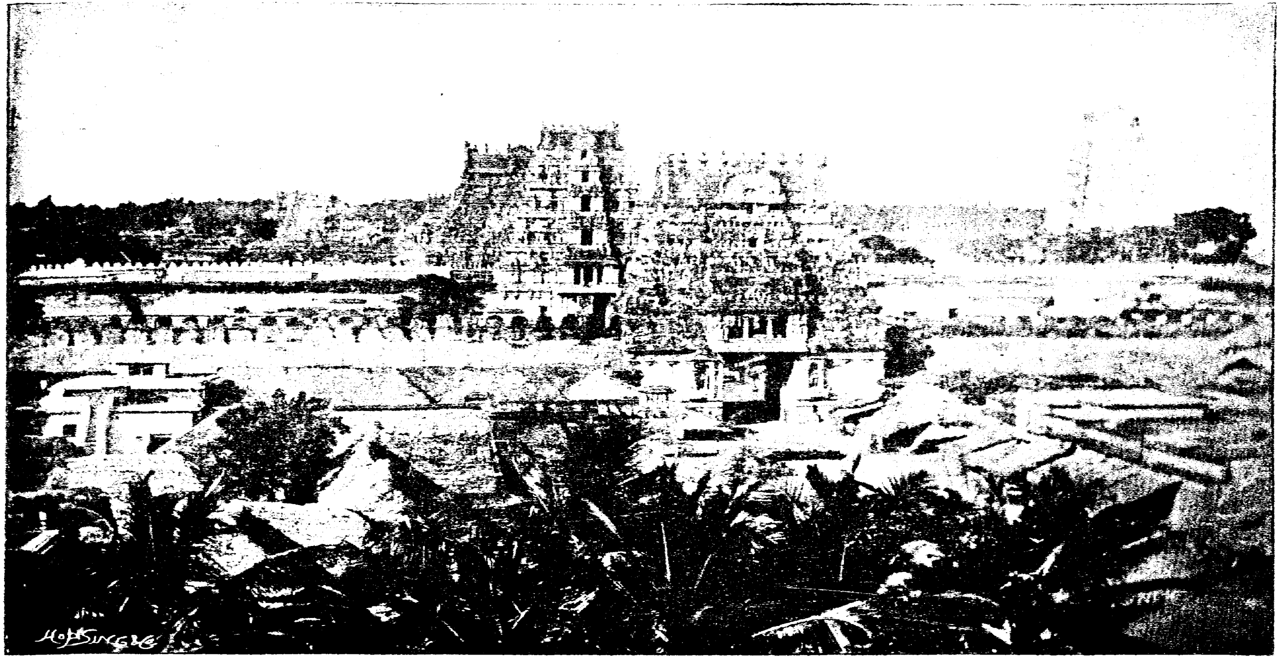
হিন্দু-রাজগণের শাসন-সময়ে তাঞ্জোর সকল প্রকার শিল্প, বাদ্যযন্ত্র, সুরবিদ্যা, কাব্যরচনা ও চিত্রবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এখন ক্রমেই এ সমুদয়ের চর্চ্চা কমিয়া আসিতেছে; কিন্তু এখনও তাঞ্জোরে যে সমুদয় চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অত্যন্ত সুন্দর, হাবভাবে কলিকাতা আর্ট ষ্টুডিওর চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ের একটী ষ্টেসন। এ স্থানে জেলার জজ, কালেক্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বাস করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

পূর্ব্বে ইহা প্রতাপান্বিত দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-রাজবংশের রাজধানী থাকায় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি আলোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল। এইস্থান প্রাচীন হিন্দু-রাজাগণের কীর্ত্তি স্বরূপ পূর্ব্বতন স্থপতি-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। নানাবিধ সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের জন্য তাঞ্জোর বিখ্যাত। এখানকার রেসমের কাজ, কার্পেট, জহরতের জিনিষ, তামার দ্রব্য প্রভৃতি সর্ব্বত্র সমাদৃত। তাঞ্জোর প্রথমে চোল নৃপতিগণের রাজধানী ছিল। পরে ইহা মহারাষ্ট্রীয়াধিকারে আইসে। মহারাষ্ট্রবংশীয় নৃপতিগণ ১২২ বৎসর কাল এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শিবাজীর ভ্রাতা ভেঙ্কজী সর্ব্বপ্রথমে তাঞ্জোর দখল করিয়া মহারাষ্ট্রবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। শরভোজীর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শিবাজী পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। শিবাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মার্কুইস্ অব্ ডালহৌসী সে দত্তক অস্বীকার করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করেন এবং রাজপরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এখন তাঞ্জোরের সে পূর্ব্ব শ্রী নাই। দুর্গটি স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রাজবাটীর কোনওরূপ সংস্কার হইতেছে না। রাণীদিগের নিজ নিজ ভূসম্পত্তি রিসিভারের হস্তে গিয়াছে। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ১॥০ দেড় লক্ষ টাকা।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণার লালি এই নগর আক্রমণপূর্ব্বক

তৎকালীন মহারাষ্ট্র-নৃপতির নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা শরভজী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সন্ধিপত্র দ্বারা সমস্ত তাঞ্জোর-প্রদেশ ইংরেজকে সমর্পণ করেন। তিনি নিজের অধিকারে কেবল দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সামান্য স্থান রাখিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, সে সময় হইতে তাঞ্জোর ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে।



সাধারণ দৃশ্য—মাদুরা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মাদুরা।

আমরা মাদুরা নগরে তিন দিন অবস্থান করিয়া এ নগর দর্শন করিয়াছিলাম। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে প্রধান ও বৃহৎ নগর। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ৪৪০ ফিট। লোকসংখ্যা ১০৫,৯৮৪। প্রাচীনকালে ইহা বহু দিন পর্য্যন্ত পাণ্ড্যবংশীয় নরপতিগণের রাজধানী ছিল।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে বংশশেখর এই নগরে তামিল চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া মাদুরা নগরকে তামিল ভাষার কেন্দ্রস্থল করিয়া গিয়াছে। ভৈগৈ নদীর তীরে মাদুরা নগরী অবস্থিত। গ্রীক্ ও রোমান্ লেখকগণের পুস্তকেও এই ভৈগৈ নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নদীগর্ভে যে সমুদয় প্রাচীন রোমীয় ও গ্রীসীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, প্রাচীন সময়েও সুদূর পাশ্চাত্য দেশের সহিত দাক্ষিণাত্যবাসীদের বাণিজ্যাদি নির্ব্বাহিত হইত।

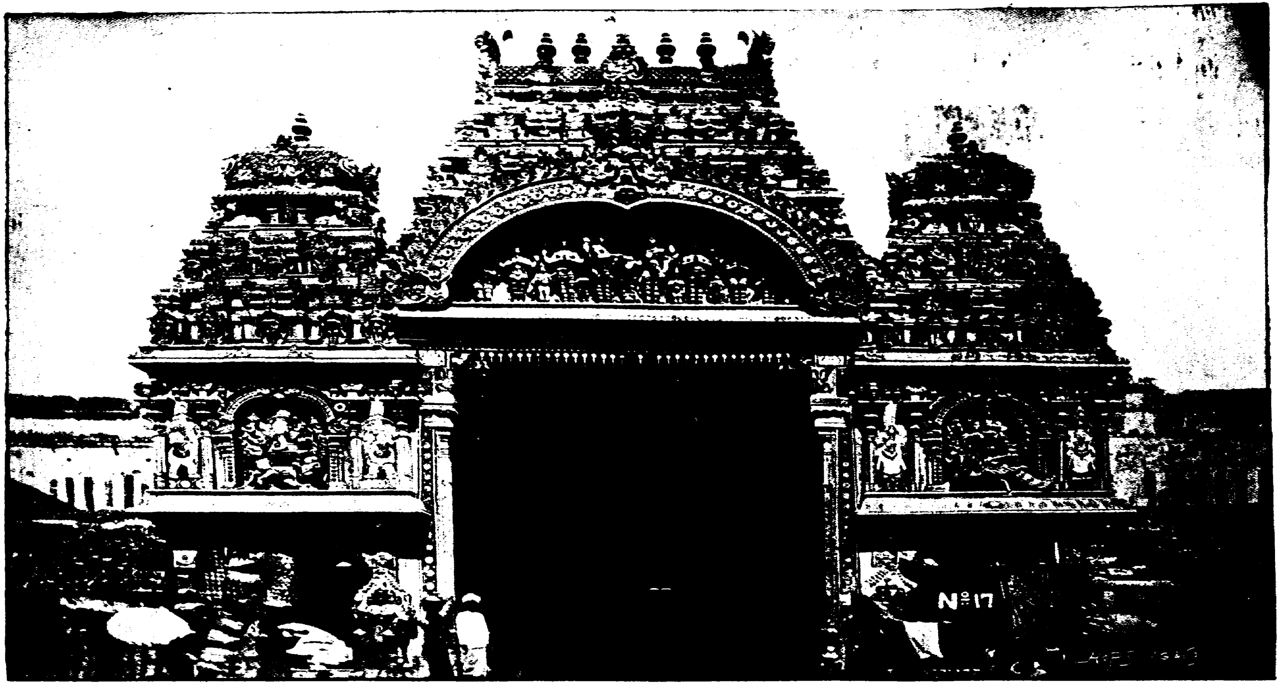
মাদুরা ষ্টেশনের অতি নিকটে একটী ডাকবাঙ্গলো আছে। সেখানে এককালে চারি জন লোক থাকিতে পারে। এ স্থানে যাতায়াতের জন্য ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী, ঝট্‌কা, গো-যান প্রভৃতি পাওয়া যায়। নগরের সমুদয় দ্রষ্টব্য পদার্থ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইবার জন্য এখানে 'গাইড' (Guide) পাওয়া যায়। ইহাদিগকে প্রতিদিন ৩৲ তিন টাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়। কৃষি ও সুকুমার শিল্পকলার জন্য মাদুরা ভারত-বিখ্যাত। এখানে মস্‌লিনের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য তারের কারুকার্য্য অতিশয় সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন হয়। মাদুরার কাষ্ঠের ও পিত্তলের নানারূপ কারুকার্য্য ভারতীয় সূক্ষ্মশিল্পের ও ভারতীয় শিল্পীর অপূর্ব্ব কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ এই সকল কারুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন। এখানকার কর্ম্মকারগণের স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও কদলীই প্রধান।

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও রবিবার এখানে হাট বসে। মাদুরার 'চৈত্র মেলা' বিশেষ বিখ্যাত। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এই মেলা হয়। পৌষ ও

মাঘ মাসে যে মেলা বসে, তাহাতেও দাক্ষিণাত্যের নানা জেলার অধিবাসিবৃন্দ সমবেত হন।

দেবমন্দিরের কথা।

মাদুরার সর্ব্বপ্রধান দেব-মন্দির রেলওয়ে-ষ্টেশনের প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই দেবালয়টি দুই ভাবে বিভক্ত। পূর্ব্বদিকবর্ত্তী মন্দিরে মীনাক্ষী (পার্ব্বতী) দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, এবং পশ্চিম দিকের মন্দিরে "সুন্দরেশ্বর" নামক শিবমূর্ত্তি বিরাজমান। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এই সুন্দরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের তোরণ দিয়া এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের নিকটে একটী 'মণ্ডপম্' আছে। তাহার নাম 'অষ্টলক্ষ্মীমণ্ডপম্'। এই 'মণ্ডপমে' অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারিনী অষ্ট লক্ষ্মীর আটটী বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মণ্ডপমের উপরিভাগে নানাপ্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে ভগবতীর জন্ম, শিবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ, কার্ত্তিকেয়ের (সুব্রহ্মণ্য) জন্ম, মহাদেবের রাজত্বগ্রহণ; ইত্যাদি বহু পৌরাণিক চিত্র অতি সুন্দর। মণ্ডপমের শেষাংশে একটী দ্বার। দ্বারের বাম পার্শ্বে গণেশের বিশাল মূর্ত্তি বিরাজিত। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেব-সেনাপতি ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি। এই দ্বার অতিক্রম করিয়া একটী বারান্দায় প্রবেশ করিতে হয়। সেখানে মহাদেবের শবর-মূর্ত্তি ও ভগবতীর শবরী-মূর্ত্তি অঙ্কিত। এই দরদালানটী অতিক্রম করিয়া যে বৃহৎ মণ্ডপমে প্রবেশ করা যায়, উহা মিনাক্ষীনায়ক নামধারী নায়ক রাজাদের প্রধান অমাত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা মন্দিরস্থ হস্তীর আবাসস্বরূপ হস্তীশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মন্দির হইতে বাহির হইলেই সম্মুখে একটী পিত্তল নির্ম্মিত দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বারটী অত্রত্য 'শিবগঙ্গা'র জমীদার মহাশয় দান করিয়াছেন। এই মন্দিরে প্রতিদিন আরতির পূর্ব্বে দশ হাজার তেলের বাতি প্রতি রাত্রিতেই দেওয়া হয়। আর পর্ব্বোপলক্ষে একলক্ষ দীপ জ্বলে। দ্বারের নিকটস্থ দীপাধারে প্রদীপ জ্বলে। এই দ্বারের পর একটী অন্ধকার মণ্ডপম্। সেই মণ্ডপে মহাদেবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন বহু মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই মণ্ডপমের সন্নিকটেই পট্টমোরাই বা স্বর্ণ-পদ্ম পুষ্করিণী।



মন্দিরের প্রবেশ দ্বার মাতুরা।

ইংরেজেরা ইহাকে Golden-Lotus tank বলেন। এই জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। তাহাতে মহাদেবের মাহাত্ম্যপ্রকাশক অলৌকিক লীলা অঙ্কিত আছে। এই সরোবরের বাম পার্শ্ব দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সুবর্ণমণ্ডিত মন্দিরচূড়ার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মন্দিরের মধ্যে ও প্রাচীর-গাত্রে শিব, গণেশ, কার্ত্তিক ইত্যাদি বহু দেব দেবীর সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এ স্থানের 'শতস্তম্ভ-মণ্ডপম্' অবশ্য-দর্শনীয়। মণ্ডপমের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে নবগ্রহের মূর্ত্তি। মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দিবাকরের মূর্ত্তি ও তাহার চারি দিকে অষ্টগ্রহের মূর্ত্তি খোদিত। এই স্থানের মন্দির, মণ্ডপম্ ইত্যাদি পরম রমণীয় ও কারুকার্য্যখচিত। ভাষার এমন শক্তি নাই যে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিয়া স্বাভাবিক চিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারি। পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তিও মণ্ডপের এক স্থানে খোদিত দেখিলাম।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

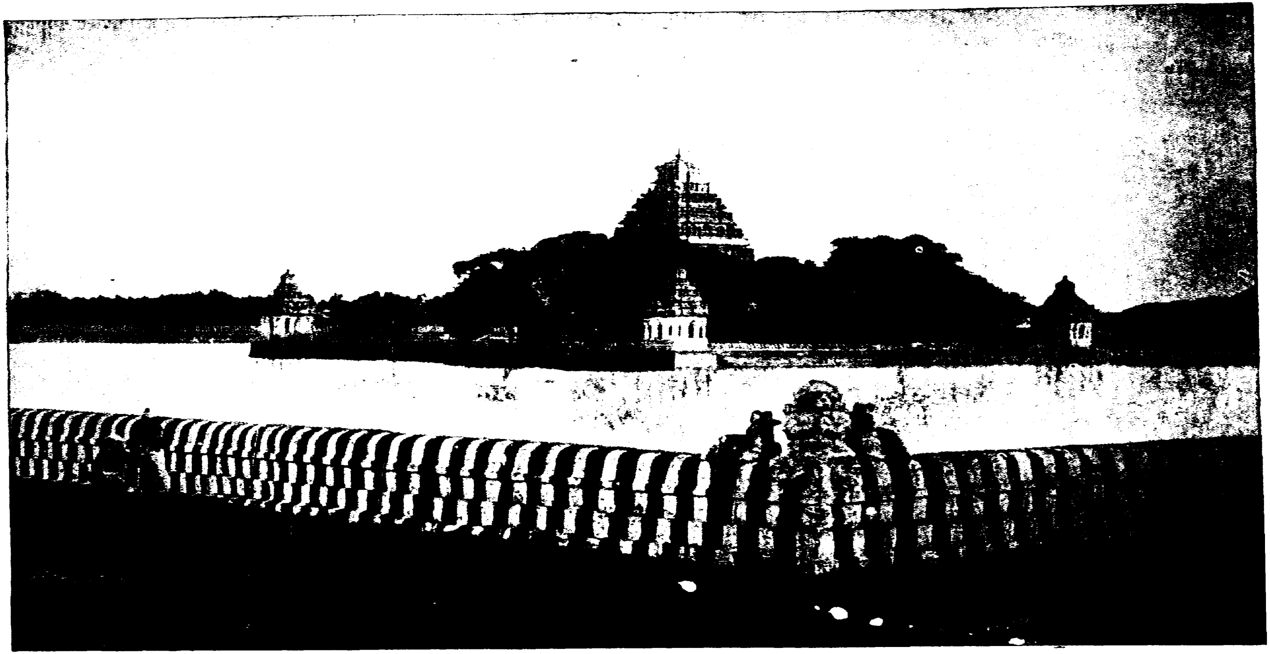
মাদুরার ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবধানযোগ্য। পাণ্ড্য রাজাদের পরে মাদুরা ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের হিন্দু নরপতিগণের অধিকৃত হয়। তাঁহারা নায়কবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়ককে মাদুরার শাসনকর্ত্তার পদে বরণ করিয়া মাদুরায় প্রেরণ করেন। এই বিশ্বনাথই নায়ক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার বংশধর ত্রিমালা নায়ক (১৬২৩—৫৭) মাদুরা নগরীকে সুন্দর নয়নাভিরাম সৌধমালায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে চান্দসাহেব মাদুরা অধিকার করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটিকের নবাব ইংরেজদের হস্তে মাদুরা সমর্পণ করেন।

যাঁহারা মাদুরার দৃষ্টিরম্য মন্দির সমূহের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় যে কত মহান্ ও কবিত্বময় ছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। দূর হইতে ইহাদের অম্বরবিচুম্বিনী চূড়া সকল দৃষ্টি-পথে পতিত হইলে হৃদয়ে আনন্দের অপূর্ব্ব বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

তিরুমলের 'ছত্রী' বা 'পডুমণ্ডপ' মাদুরার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কীর্ত্তি। এই ছত্রী উপাস্যদেব সুন্দরেশ্বরের উদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিরুমল

নায়ক ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মাতুরায় কিংবদন্তী যে, সুন্দরেশ্বর দেব ভক্ত তিরুমলকে বৎসরে দশ দিবস করিয়া দর্শন দিতেন। চারি সারি স্তম্ভের উপর ছাদ। এই স্তম্ভাবলীর মধ্যবর্ত্তী পাঁচটী স্তম্ভের মধ্যে নায়ক-বংশোদ্ভব দশ জন রাজার প্রতিমূর্ত্তি খোদিত। তিরুমল নায়কের মূর্ত্তির মস্তকের উপর চাঁদোয়া। তাঁহার বাম পার্শ্বে তদীয় সহধর্ম্মিণী তাঞ্জোর-রাজকুমারীর মূর্ত্তি। রেলওয়ে ষ্টেসনের প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে তিরুমল নায়কের রাজপ্রাসাদ এখনও বিদ্যমান আছে। রাজপ্রাসাদের স্তম্ভ প্রভৃতি গ্রাণাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এ স্থানে জজ-আদালত ও গভর্মেণ্টের অন্যান্য আফিস হইয়াছে। ভৈগৈ নদীর তীরে নগরের দক্ষিণে একটী অট্টালিকা দেখিলাম, ইহার নাম তম্‌কাম। তিরুমল নায়ক ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এ স্থানে রোম দেশের (Gladiator) গ্ল্যাডিয়েটার ক্রীড়ার ন্যায় বন্য হিংস্র জন্তুর সহিত অস্ত্রক্রীড়কগণের যুদ্ধ হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই অট্টালিকায় স্থানীয় কালেক্টার বাস করেন।

ষ্টেশনের তিন মাইল উত্তরে একটী 'তিপ্পাকুলাম' (পুষ্করিণী) আছে। এই জলাশয়ের মধ্যস্থলে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ও তাহার চারি ধারে চারিটী প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর স্তম্ভ। এই পুষ্করিণী রাজভবন হইতে পূর্ব্ব-উত্তরে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেক দিক ১২০০ গজ দীর্ঘ। চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট গ্রাণাইট প্রস্তরে গঠিত সোপানাবলী। সর্ব্বোপরি গ্রাণাইট প্রস্তর নির্ম্মিত একটী কলস। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে মনোহর উপদ্বীপ। সেই উপদ্বীপের চারি দিকও প্রস্তরে মণ্ডিত। দ্বীপের মধ্যস্থলে সুন্দর দেবমন্দির। তাহার চারি কোণেও চারিটী ক্ষুদ্র, সুন্দর, শিল্পচাতুর্য্যময় দেবমন্দির। এই দেবনিকেতন দুই মহল। মধ্যস্থলে পথ। তাহার উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের লতাগুল্ম। মন্দিরের উৎসবের সময় একদিন এই দেবালয় ও পুষ্করিণীর চারি দিকে এক লক্ষ প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে। সে সময়ে পুষ্করিণীর নির্ম্মল সলিল মধ্যে দীপরাজির উজ্জ্বলালোক প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। সে দিন প্রদোষ সময়ে সুন্দরলিঙ্গ দেব মীনাক্ষীদেবীর সহিত সমাগত হইয়া তরীতে আরোহণ



তেপ্পাকুলাম—(পুষ্করিণী) মাদুরা।

করিয়া এই তেপ্পাকুলমের বক্ষে বিহার করিয়া থাকেন। তখন পুষ্করিণীর চারি তীরে সুবিশাল জনসঙ্ঘ আনন্দধ্বনি করিতে থাকে।

নানা কথা।

বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাদুরার সর্ব্বপ্রধান উৎসব হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া পূর্ণিমা তিথিতে এই সুন্দরেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেন। সেই হইতে প্রতিবৎসর দ্বাদশদিবসব্যাপী উৎসব হইয়া আসিতেছে। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, পূর্ণিমা তিথিতে সুন্দরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সংবৎসর অর্চ্চনার সুফল লাভ হয়। এই উৎসবে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে।

সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপের নিকটস্থ যে মণ্ডপে সুন্দরলিঙ্গ দেবের বসন্তোৎসব হয়, তাহার নাম বসন্ত-মণ্ডপ। ইহা মহারাজা তিরুমল নায়ক কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মণ্ডপটী দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ ও প্রস্থে ২০ গজ। ইহার ছাদ ১২০ এক শত কুড়িটী প্রস্তর-স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফিট উচ্চ। এই মণ্ডপের মধ্যে সলিলরাশি প্রবাহিত করিবার জন্য পয়ঃপ্রণালী আছে। যখন বৈশাখ মাসে শুক্লাপঞ্চমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দশদিবসব্যাপী উৎসব হয়, তখন ঐ পয়ঃপ্রণালী জলে পূর্ণ থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার উদ্দেশ্য,—শৈত্যবিধান।

দেবতার অলঙ্কার ও দেবালয়ের তৈজসপত্র প্রভৃতি দর্শনীয়। তৈজসপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার ও মণিমুক্তাদির মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকার অধিক। আমরা পূর্ব্বে যে তেপ্পাকুলামের উল্লেখ করিয়াছি, সেখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে তিরুপরঙ্কুন্দ্রম্ নামক স্থানের পার্শ্বদেশে এক শৈব-মন্দির আছে। ইহাও সুন্দর। ঝট্‌কায় ও গো-যান-যোগে এই স্থানে যাইতে হয়। স্থানটী নির্জ্জন।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

স্থলপুরাণে এ স্থানের সুন্দরেশ্বর শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—একদা দেবরাজ ইন্দ্র দেবনর্ত্তকীগণে পরিবৃত হইয়া অভিনিবেশসহকারে তাহাদের নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় উপনীত হন। দেবরাজ তৌর্য্যত্রিকে এমন মগ্ন ও তন্ময় হইয়াছিলেন যে, বৃহস্পতিকে

উপযুক্ত অভিবাদন ও সম্ভাষণাদি করিতে বিস্মৃত হইলেন। ইহাতে দেবগুরু আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন, এবং দেবসভা হইতে প্রস্থান-পূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করিলেন। ইন্দ্র যথাসময়ে এই সংবাদ পিতামহ ব্রহ্মার গোচর করিলেন। পরে দেবরাজ পিতামহের উপদেশে ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে দেবগুরুর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই ত্রিশিরা দৈত্যকুলের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি আহুতিপ্রদানকালে গোপনে স্বীয় মাতামহ-কুলের মঙ্গলেচ্ছায় আহুতি প্রদান করিতেন। প্রকাশ্যে দেবতাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইলেও গুপ্তভাবে তিনি দৈত্যকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ক্রমে ত্রিশিরার দৈত্যকুলপ্রীতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দেবরাজ ক্রোধবশে ত্রিশিরার মস্তক ছেদন করিলেন। ত্রিশিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই জন্য ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন। পরে দেবগণের সাহায্যে ইন্দ্র সেই পাপকে চারি ভাগ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি পৃথিবীতে উদ্ভিদে নির্য্যাস, রমণীর রজ, সলিলে ফেন ও ধরণীগর্ভে ক্ষারমৃত্তিকা অর্থাৎ সাজি-মাটীর উৎপত্তি হইল!

এদিকে ত্রিশিরার মৃত্যুতে ত্বষ্টা নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি বহু ক্লেশস্বীকার করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার বৃত্র নামক এক মহাবলশালী পুত্র জন্মিল। কালে এই বৃত্র স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে পাতালে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্র বহু যন্ত্রণাভোগের পরে, ভোগাবসানে মহামুনি দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। বৃত্র-বধে পুনর্ব্বার দেবরাজকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইল। তিনি নিরুপায় হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বকীয় পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় জানিতে চাহিলেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে পৃথিবীপর্য্যটনের পরামর্শ দিলেন। দেবরাজ বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কদম্ব-বনে উপস্থিত হইলেন। কদম্ব-বনে পদার্পণ করিবামাত্র তিনি ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, এবং বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, এক পার্শ্বে এক অনাদি



আড়াহের—মাদুরা

কুন্তলীন প্রেস।

শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। দেবরাজ সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং লিঙ্গের সুন্দরেশ্বর নাম রাখিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব ইন্দ্রের অর্চ্চনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন। দেবরাজও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতে পারেন, এই বর প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন যে, "স্বর্গ এখন অরাজক; রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রতিদিবস তাঁহার পূজা করিবার প্রয়োজন নাই। বৎসরান্তে প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমায় স্বর্গ হইতে আসিয়া পূজা করিলেই তুমি সমগ্র বৎসরের পূজার ফল লাভ করিবে।" তদবধি প্রত্যেক বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই মন্দিরে উৎসব হইয়া থাকে। সুন্দরেশ্বরের ইহাই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

নগরের কথা।

বর্ত্তমান সময়ে মাদুরা এই জেলার প্রধান নগর। মাদুরায় সমুদয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ বাস করেন। এই নগরেই জেলার সমস্ত আফিস আদালত বিদ্যমান। এ স্থানের ভাষা তামিল। এখানকার নব-নির্ম্মিত জেলখানা, সিবিল ও প্রসূতি-হাঁসপাতাল, জেলা-স্কুল ও আমেরিকান্ প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মিশন বোর্ডিং বিদ্যালয় দেখিবার উপযুক্ত।

এ নগরের বায়ু শুষ্ক, উষ্ণ ও সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। শীতকালেও মাদুরা অঞ্চলে দারুণ গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। জ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক, মধ্যে মধ্যে রামেশ্বরের যাত্রীদিগের জনতায় বিসূচিকারও প্রাদুর্ভাব হয়। মাদুরায় বর্ষারই প্রকোপ অধিক। ইংরাজ-শাসনে মাদুরার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তিরুমল নায়কের ভগ্ন প্রাসাদ গভর্মেণ্ট নিজব্যয়ে সংস্কৃত করিয়া তন্মধ্যে রাজকীয় আফিস ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন।

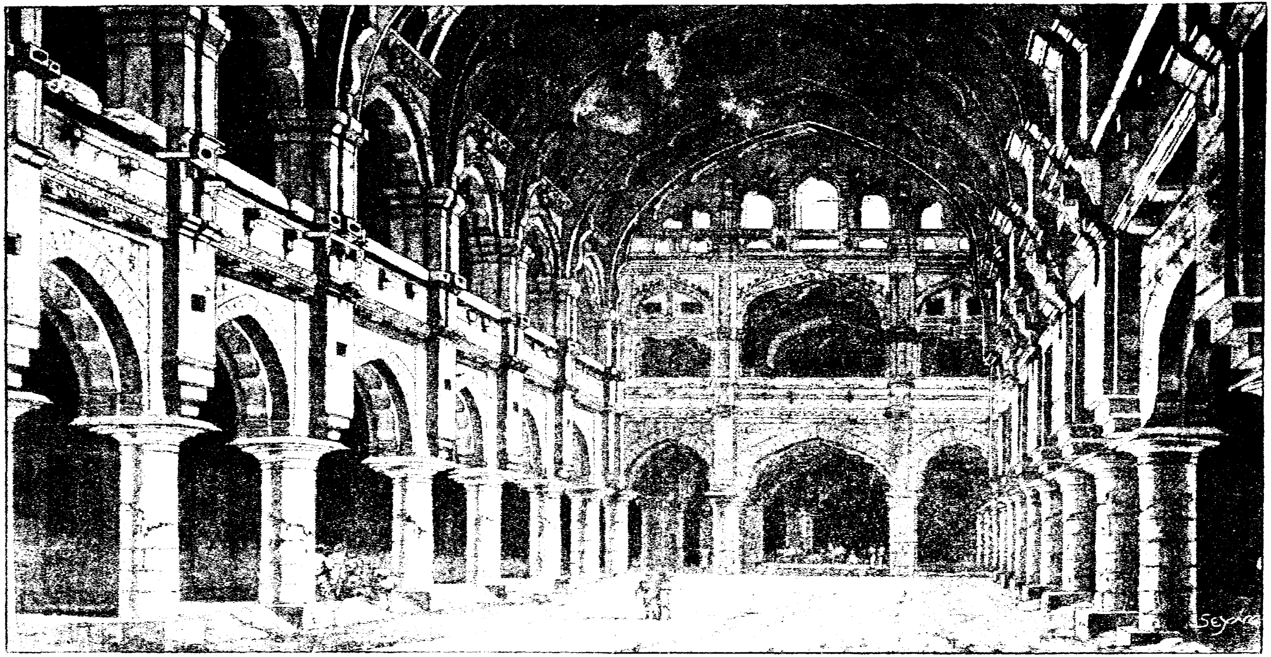
চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ মাদুরা নগর আক্রমণ করিয়া সুন্দরেশ্বর দেবের মন্দিরের বহির্ভাগ ধ্বংস করিয়াছিল। তাহারা এই মন্দিরের চতুর্দ্দশটি চূড়া, গোপুরাম ও অন্যান্য মন্দির ইত্যাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহানুভব ফার্গুসন সেই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এখানকার জজের বাঙ্গলোর হাতায় একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। তাহা দর্শন-যোগ্য। এই বৃহদায়তন বটের মূলদেশের বেড় প্রায় ৭০ ফিট। শাখা প্রশাখা ১৮০ ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাচীন বটবৃক্ষ।

এখানে প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে। আমরা এক দিন অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীর মূল্য আট আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল্য ছয় আনা। আমাদের দেশের থিয়েটারের ন্যায়, দৃশ্যপট ও রঙ্গালয় সুসজ্জিত। এখানে পুরুষেরাই স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয় করিয়া থাকে। রীতিমত ঐক্যতান-বাদনের পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। দেখিলাম, রাজা, বিদূষক, রাণী, ভৃত্যবর্গ, এমন কি, রাস্তার মুটে মজুর পর্য্যন্ত গান করিতেছে। কথার অপেক্ষা গানই অধিক শুনিলাম। অনবরত দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হইতেছে; আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দেখিতেছি, অথচ তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের গাইড্ মহাশয়কে নাটকীয় ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে,—"এক রাজা বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের বিবাহের জন্য এক সুন্দরী রাজকুমারীর সহিত পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। পরিশেষে নিজেই সেই রূপসী রাজকন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন। রাজকুমারের বিবাহের সম্বন্ধ যে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা তিনি রাজধানীতে প্রকাশ করেন নাই। এ দিকে রাজকুমারী বিবাহ সময়ে এই বৃদ্ধ নরপতিকে দেখিয়া তাঁহার গলে মালা অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ক্রমশঃ পিতার এইরূপ কুৎসিত আচরণের কাহিনী রাজকুমারের কর্ণগোচর হইল। রাজকুমার তখন অনন্যোপায় হইয়া কপোতের দ্বারা রাজকুমারীর নিকট পত্র প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" যখন এই পত্রিকা-প্রেরণের উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন আমরা ট্রেণের সময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। যদিও আমরা তামিল অভিনেতাদিগের অভিনয়ের এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই, তথাপি বলিতে পারি, প্রত্যেক অভিনেতার একই প্রকারের একঘেয়ে সুরের গানগুলি কর্ণপীড়ার উৎপাদন করিতেছিল।

নাট্যাভিনয়।



রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থিত একটী কক্ষ—মাদুরা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

আমরা রাত্রিযোগে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের উদ্দেশে মাদুরী নগরী পরিত্যাগ করিলাম। যিনি একবার মাদুরার দেবমন্দির ও সহস্রমণ্ডপ প্রভৃতি ভাস্কর-শিল্প ও চিত্র-চাতুর্য্য অবলোকন করিয়াছেন, তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। লেখনীর এমন সাধ্য নাই যে, ভাষায় সেই অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি করিতে পারে। হায়! একদিন সোনার ভারতে সবই ছিল; কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে সে সবই হারাইয়াছি। প্রাচীন ভারতের শিল্পচাতুর্য্যাদি দর্শন করিলে হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। নায়ক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়কের সহকারী আর্য্য নায়কের প্রতিষ্ঠিত যে সহস্রমণ্ডপের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে উহাতে ৯৯৭টি স্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

রেলপথ হইবার পর মাদুরার বাণিজ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন সমগ্র দক্ষিণভারত ও সিংহল পর্য্যন্ত ইহার বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে চাউল, তামাক, কার্পাসবস্ত্র, লোণা, লবণ, নোনা মাছ, গন্ধদ্রব্য ও নানাবিধ মশলাই প্রধান।

মাদুরার অধিবাসিগণ সকলেই বিশুদ্ধ তামিল ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে।

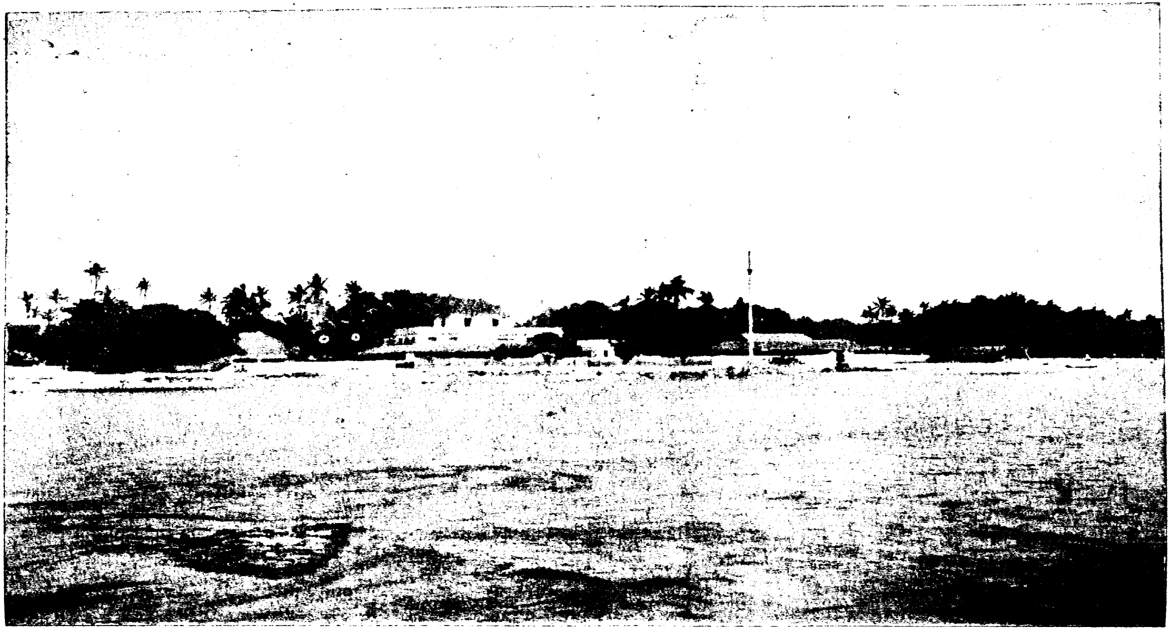
দেবার্চ্চনা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, সর্ব্বপ্রথমে শিব-গঙ্গাতীর্থে সলিল স্পর্শ করিয়া বিশ্বেশ্বর সুন্দর লিঙ্গের ও মীনাক্ষী দেবীর পূজা করিতে হয়। তাহার পর যাত্রীরা সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ, বসন্ত মণ্ডপ ইত্যাদি দর্শন করেন। মাদুরায় বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এখানে অসংখ্য ছত্র ও হোটেল আছে। সুতরাং যাত্রীদিগকে আবাস ও আহারাদির কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

পাম্বম।

ভোরের বেলা আমরা মাণ্ডাপাম পঁহুছিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড়, নারিকেলকুঞ্জ পরিশোভিত ছোট ছোট গ্রাম, বৈচিত্র তেমন কিছুই নাই। এখান হইতে আমাদিগকে লঞ্চে পম্বম্ যাইতে হইবে। আমরা লঞ্চারোহণে পাম্বামাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সমুদ্রের শাখা প্রসারিত 'খাড়ির' তরঙ্গগুলি সূর্য্য-কিরণ-প্রদীপ্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিল, দূরে ভারতমহাসাগরের সুবিস্তৃত নীল কলেবর নয়ন সমক্ষে অতুল সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় আমরা পাম্বম্ উপনীত হইলাম। ইহা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, দৈর্ঘ্যে এগার মাইল এবং প্রস্থে ছয় মাইল। ভারতবর্ষ এবং রামেশ্বর দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী পাম্বম্ প্রণালীর নাম হইতে এই নগরের নাম পাম্বম্ হইয়াছে। এই নগরটী রামেশ্বরম্ দ্বীপের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। এনগরের লোক সংখ্যা ২,০০০০। এস্থানে গভর্মেণ্টের আফিস ও কয়েক জন ব্যবসায়ীর দোকান ইত্যাদি ছাড়া দর্শনোপযোগী কিছুই নাই। একটী ছোট বাজার,

সাধারণ বিবরণ।

বাজারে খাদ্য দ্রব্যাদি যৎসামান্য পারিমাণে পাওয়া যায়। জল দুষ্প্রাপ্য; আহার্য্য ইত্যাদির জন্য আমাদিগকে এস্থানে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পাম্বমের অধিবাসীদিগকে 'লব্বর' কহিয়া থাকে। ইহারা মাঝি ও ডুবুরির কার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। এক সময়ে এস্থান মুক্তা সংগ্রহের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। পাম্বমের আলোকগৃহটি (Light-House) ৯৭ ফিট উচ্চ। ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যবর্ত্তী কৃত্রিম খাদকেই পাম্বম্ কহে। এই খাদ মাদুরা জেলার এবং রামেশ্বর দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। রামেশ্বরম্ দ্বীপে যে খোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে যে ঝড় হয় তাহাতে এই যোজক ভগ্ন হইয়া যায়, পূর্ব্বে এই স্থান দিয়া জাহাজাদি গমন করিতে পারিত না, কিন্তু পরিশেষে ইহা প্রশস্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই যোজকের দৈর্ঘ্য ৪২৩২ ফিট, বিস্তার ৮০



পাম্বাম।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

ফিট। এই খাদের দক্ষিণে যে অপর একটী খাদ আছে তাহা দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ২১০০ × ১৫০ ফিট। এই পথের নাম কল্লকাডি পথ। পাম্বম্ হইতে রামেশ্বরম্ উত্তর দিকে আট মাইল দূরে অবস্থিত, যাতায়াতের জন্য রাস্তা আছে। এখান হইতে ঝট্‌কারোহণে রামেশ্বরম যাইতে হয়। আমরা ঝট্‌কারোহণে রামেশ্বরম্ রওয়ানা হইলাম। সাধারণতঃ ঝট্‌কায় গমনাগমনের ভাড়া ১৷৷০ ও গরুর গাড়িতে ১৷০ ব্যয় পড়ে। ঋতুভেদে ভাড়ার বৃদ্ধি ও অল্পতা হয়। আমরা অপরাহ্নে রামেশ্বরম উপনীত হইলাম।

রামেশ্বরম্।

মাদুরা জেলার অন্তর্গত রামনাদ তালুকের মধ্যে ইহা একটী দ্বীপ ও নগর। দৈর্ঘ্যে এগারো মাইল এবং প্রস্থে ছয় মাইল। এই দ্বীপটি বালুকাময়, ইহা মান্নার উপসাগর মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীন কালে এই দ্বীপ ভারত মহাসাগরের প্রান্তসীমায় সংযোজিত ছিল, কিন্তু কালের আশ্চর্য্য লীলা কৌশলে ইহা এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থানে বাব্‌লা, তাল, নারিকেল এবং তেঁতুল বৃক্ষের সংখ্যা খুব বেশী। সহরের বড় রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ বিপণিতে সামান্য দেশ্‌লাইয়ের বাক্স হইতে বর্ত্তমান সভ্যতানুযায়ী আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর ভারতের ভিন্ন ২ প্রদেশ হইতে এস্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। রামেশ্বরম্ হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। কথিত আছে যে রঘুকুল তিলক শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারার্থ লঙ্কা যাইবার জন্য এই স্থানেই সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কা গমন করিয়াছিলেন, পরে তিনি জানকী দেবীকে উদ্ধার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে সেই সেতু ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই ভগ্ন সেতুর একেক অংশই একেকটী বিভিন্ন দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। জনসাধারণের বিশ্বাস যে এস্থানের শিব লিঙ্গও তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্যই এস্থানের সর্ব্বজন-সুপরিচিত নাম সেতু বন্ধ রামেশ্বর। ভারতবর্ষের সুদূর প্রান্তনিবাসী হিন্দুসন্তানও এই স্থানে আগমন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন।

সাধারণ বিবরণ।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই রামেশ্বর পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে অর্থাৎ রেল হইবার পূর্ব্বে উত্তর ভারতের তীর্থযাত্রিগণ পদব্রজে এই তীর্থ দর্শনার্থ আগমন করিতেন, অদ্যাপিও সাধু-সন্ন্যাসীরা পদব্রজে অন্যান্য তীর্থাদি দর্শন করিয়া এস্থানে আগমন করেন। আমরা সর্ব্বপ্রথমে শিবলিঙ্গ দর্শনার্থ গমন করিলাম। মন্দিরে যাওয়ার পূর্ব্বে সমুদ্রে স্নান করিয়া যাওয়াই বিশেষ পবিত্র এবং পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বীপের উত্তরাংশে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১০০০ × ৩৫৭ ফুট স্থান অধিকার

দেবমন্দিরাদি ও বিগ্রহের কথা।

করিয়া রামেশ্বরের মন্দির বিরাজিত। এই দেবালয়ের গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ দ্রাবিড়ী ধরণের। মন্দিরটী উচ্চে ১২০ ফুট হইবে। সিংহ-দরোজা বা সম্মুখস্থ গপুরামটি ১০০শত ফুট উচ্চ। এই মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় শিল্পের চরমোৎ-কর্ষতা এস্থানে দেদীপ্যমান। মন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী, গুম্বজ ও খোদিত মূর্ত্তি সমূহ দর্শনে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিলাম। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানা প্রকারের কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় জন-প্রবাদ এই যে কাণ্ডীর রাজা লঙ্কা দ্বীপ হইতে প্রস্তর কাটাইয়া ও তাহা পালিশ করাইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মন্দিরের বহির্ভাগস্থ বিচিত্র চিত্র পরিপূর্ণ শিল্পময় মণ্ডপ দাক্ষিণাত্যের একটী প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ।

এই মন্দিরের গঠন প্রণালীর একটু বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, উহার দরোজা ও চাঁদোয়া ৪০ ফুট লম্বা এক এক খানি স্বতন্ত্র প্রস্তর খণ্ডে গ্রথিত এবং অভ্যন্তরস্থ গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভ শ্রেণী পরিশোভিত দালান অতীব আশ্চর্য্য জনক। ছাদ মেজ (Floor) হইতে ৩০ ত্রিশ ফিট উচ্চ স্তম্ভোপরি স্থাপিত এবং প্রতি ২০ ফুট অন্তরে এক একটী স্তম্ভ বিরাজিত।

মন্দিরের বহির্ভাগস্থ প্রাকার ও বারাণ্ডা এই দেবালয়ের গৌরব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০০ ফুট এবং প্রস্থে ৪০০ ফুট। দৈর্ঘ্যের সমগ্র ভাগই উন্মুক্ত, পরিসরস্থ দিকের স্তম্ভের উপরে ছাদ আছে। বহিঃপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে চারিটী গপুরাম বা প্রবেশের দ্বার আছে, তন্মধ্যে তিনটীই অসমাপ্ত, কেবল পশ্চিম দিকের গপুরামটী পূর্ণগঠিত দেহে বিরাজমান। এখানকার মন্দিরস্থ বারাণ্ডার স্তম্ভশ্রেণীর কারুকার্য্য দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দিরের স্তম্ভাবলীর শিল্পনৈপুণ্যাপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। প্রতি স্তম্ভেই নানাবিধ দেবদেবী ও প্রাচীন রাজন্যবর্গের মূর্ত্তি খোদিত আছে। গর্ভ-গৃহের সন্নিকটে যে বারাণ্ডা আসিয়াছে, তাহার এক দিকে রামনাদের রাজাদিগের মূর্ত্তিও খোদিত দেখিলাম। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের অনুমানে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাদুরার পেরুমল নায়ক যখন সুন্দরেশ্বরের মন্দিরের সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করিতেছিলেন,

তখন সেতুপতিগণ তাহা দেখিয়াই বোধ হয় রামেশ্বরের মন্দিরস্থ বৃহৎ বারাণ্ডা, মণ্ডপ ও প্রাকার ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরের কারুকার্য্যাদি দর্শনে মনে হয় যে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরকাল ইহার গঠন কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। এ স্থানের প্রধান মন্দির ব্যতীত আরও ২৪টী তীর্থ দর্শন করিতে হয়, আমরা এ স্থানে সংক্ষেপে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের নিকট তাহাদের বিষয় বিবৃত করিলাম। (১) চক্রতীর্থ (২) বেতাল বরদতীর্থ (৩) পাপ বিনাশনতীর্থ (৪) সীতাশরতীর্থ (৫) মঙ্গলতীর্থ (৬) অমৃতব্যাপিকা (৭) ব্রহ্মকুণ্ড (৮) হনূমৎকুণ্ড (৯) অগস্ত্যতীর্থ (১০) শ্রীরামতীর্থ (১১) শ্রীলক্ষ্মণতীর্থ (১২) জটাতীর্থ (১৩) শ্রীলক্ষ্মীতীর্থ (১৪) অগ্নিতীর্থ (১৫) শ্রীশিবতীর্থ (১৬) শঙ্খতীর্থ (১৭) যমুনাতীর্থ (১৮) গঙ্গাতীর্থ (১৯) গয়াতীর্থ (২০) কোটিতীর্থ (২১) সাধ্যামৃততীর্থ (২২) মানসাখ্য-সর্ব্বতীর্থ (২৩) ধনুষ্কোটিতীর্থ এতদ্ব্যতীত ঋণমোচনতীর্থ, পাণ্ডবতীর্থ, দেবতীর্থ, সুগ্রীবতীর্থ, নলতীর্থ, গবাক্ষতীর্থ, অঙ্গদতীর্থ, গজ-গবয়-শরভ-কুমুদতীর্থ, বিভীষণতীর্থ, ব্রহ্মহত্যা বিমোচনতীর্থ, নাগবিলতীর্থ প্রভৃতি বহু তীর্থ বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক স্থানেই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছেন। প্রত্যেক তীর্থেই স্নান করিবার নিয়ম, আমরা প্রতি তীর্থে স্নান করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

১। চক্রতীর্থ—অহির্বুধ্ন নামক ঋষি গন্ধমাদনস্থ মুনিকুণ্ডে সুদর্শন দেবের তপস্যা করিতেন, রাক্ষসেরা মুনির তপোবিঘ্ন জন্মায়, তাহাতে সুদর্শন দেব ভক্তের রক্ষার্থ আগমন করিয়া রাক্ষসদিগকে বধ করেন। অহির্বুধ্নের প্রার্থনায় বিষ্ণুচক্র এ স্থানে অবস্থিত আছে বলিয়া ইহার নাম চক্রতীর্থ। মুনিতীর্থ নামেও ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানে স্নান করিলে নরগণ সর্ব্ববিধ ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, এমন কি অন্ধ, মূর্খ, বধির, কুব্জ, খঞ্জ প্রভৃতি বিকৃতাঙ্গ মনুষ্যেরাও সংকল্প করিয়া স্নান করিলে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়।

২। বেতালবরদতীর্থ—চক্রতীর্থের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে এই তীর্থ অবস্থিত। এস্থানে সংকল্প পূর্ব্বক অবগাহন করিলে নরগণ জীবন্মুক্ত হয়, যথা :—

যা ইদং তীর্থমাসাদ্য চক্রতীর্থস্য দক্ষিণে।
স্নানং কদাচিৎ কুর্ব্বন্তি জীবন্মুক্তা ভবন্তিতে॥

৩। পাপ বিনাশন তীর্থ—এই তীর্থ গন্ধমাদন গিরি শেখরে সংস্থাপিত। এখানে স্নান করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ ও স্মরণে গর্ভবাস ক্লেশ নষ্ট হয়।

৪। সীতাশরতীর্থ—এস্থানে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যারূপ গুরুতর পাপানুষ্ঠান হইতেও নরগণ মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। এই তীর্থও গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি অবস্থিত; ইহা একটী সাধারণ কুণ্ড মাত্র।

৫। মঙ্গলতীর্থ—ইহাও গন্ধমাদন গিরির এক প্রান্তে বিরাজিত। এস্থানে স্নান করিলে মানুষ সহজেই কমলার কৃপা লাভ করিয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করে।

৬। অমৃতব্যাপিকা—কথিত আছে যে প্রাচীন কালে এস্থানে উপবেশন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমান রাবণ বধের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। এই তীর্থে অবগাহন করিলে মানুষ দেবাদিদেব মহেশ্বরের অনুকম্পায় মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। ইহা গন্ধমাদন গিরিশিরে রামনাথ ক্ষেত্রে অবস্থিত।

৭। ব্রহ্মকুণ্ড—পুরাকালে ব্রহ্মা এইস্থানে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বর্ষার সময়ে এস্থানে জল সঞ্চিত হইয়া একটী সুন্দর হ্রদের আকারে পরিণত হয়, কিন্তু নিদাঘ-মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণ-জালে ইহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার গর্ভস্থ মৃত্তিকাকে ব্রহ্মকুণ্ড ভস্ম কহে। এই ভস্ম লেপনে বা ইহা দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিলে কৈবল্য করতলস্থ এবং স্নানে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়।

৮। হনুমৎকুণ্ড—লঙ্কাপতি দশানন ব্রাহ্মণের ঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে রঘুকুল গৌরব শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছিল। তিনি এই পাপ ক্ষালনার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, পরে ঋষিগণের উপদেশানুসারে তাঁহার একান্ত ভক্ত হনূমানকে লিঙ্গ আনিবার নিমিত্ত কৈলাসে প্রেরণ করেন। হনূমান পুচ্ছ দ্বারা লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া লিঙ্গ লইয়া আসিলেন, তাহা এই কুণ্ডতীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা দেখিলাম যে কুণ্ড সন্নিকটস্থ এক খণ্ড শিলাখণ্ডে মারুত মূর্ত্তি ও পুচ্ছবেষ্টিত লিঙ্গের

চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। এই কুণ্ডে স্নান করিলে সমুদয় গুরুতর পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৯। অগস্ত্যতীর্থ—মহাঋষি অগস্ত বিন্ধ্য পর্ব্বতকে নিগ্রহান্তর এই স্থানে আগমন করিয়া এই পুণ্য তীর্থ খনন করেন। এস্থানে স্নান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১০। শ্রীরামতীর্থ—এখানে স্নান কিংবা লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিলে সে ব্যক্তি ভব যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি পাইয়া মোক্ষলাভ করে, এই সর্ব্ব-পাপঘ্ন, সর্ব্ব-বিপদ অশান্তি ও মৃত্যু বিনাশক লিঙ্গমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার অপর নাম রাম সর বা রঘুনাথ সর।

১১। শ্রীলক্ষ্মণতীর্থ—এস্থানে লক্ষ্মণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত আছেন; স্নানান্তে এই লিঙ্গ পূজা করিতে হয়, অপুত্রক ব্যক্তিও স্নান করিলে পুত্র লাভ করে ও ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি গুরুতর পাপানুষ্ঠান হইতে নরগণ মুক্তি পাইয়া থাকে।

১২। জটাতীর্থ—এ তীর্থে অবগাহন করিলে চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ হয়। ইহার তীরে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলে গয়ার শ্রাদ্ধাদি তুল্য ফল লাভ ঘটে। কথিত আছে যে রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে তাঁহার জটা শোধন করিয়াছিলেন।

১৩। শ্রীলক্ষ্মীতীর্থ—এক্ষণে ইহা সমুদ্র গর্ভে নিহিত।

১৪। অগ্নিতীর্থ—শ্রীরামচন্দ্র এস্থানে সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা করাইয়াছিলেন, ইহাও লক্ষ্মীতীর্থের ন্যায় সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

১৫। শ্রীশিবতীর্থ—এই তীর্থ স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, ইহাতে স্নান করিবা মাত্র ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়।

১৬। শঙ্খতীর্থ—ইহার নির্ম্মাতা শঙ্খমুনি। এস্থানে স্নান করিলে গুরুনিন্দা পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি অপমানাদিজনিত শত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়।

১৭। যমুনাতীর্থ—পুরাকালে রেক্কা নামক এক মুনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিয়া তপস্যা করিতেন, কালক্রমে তিনি বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া



রাজপথ—রামেশ্বরম্।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

তীর্থ সমূহে গমন করিয়া স্নানাদি কার্য্যে অশক্ত হওয়াতে যোগবলে সমুদয় তীর্থকে আবাহন করেন, তাঁহারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যে যে স্থলে ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাই তীর্থরূপে পরিণত হইয়া সাধারণ যামুন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

১৮। গঙ্গাতীর্থ।

১৯। গয়াতীর্থ।

২০। কোটিতীর্থ—রাবণবধজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত করেন, কিন্তু বিশুদ্ধ জলাভাবে অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পাদিত করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় ধনুষ্কোটির অগ্রভাগ দ্বারা ধরণী বিদ্ধ করেন এবং পুণ্যতোয়া গঙ্গাব স্তব করিতে থাকেন, স্তবে জাহ্নবী সন্তুষ্ট হইয়া আবির্ভূতা হ'ন ; রামচন্দ্র সেই পবিত্র বারিরাশি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অভিষেক কার্য্যাদি নিস্পন্ন করেন। যখন তিনি অযোধ্যা-ভিমুখে গমন করেন, তখন এই কোটিতীর্থে শেষ স্নান করেন বলিয়া তীর্থ যাত্রিগণও এই তীর্থে স্নান করিয়া অবশিষ্ট পাপ হইতে মুক্তিলাভ করতঃ গন্ধমাদন পর্ব্বত পরিত্যাগ করেন।

২১। শ্রীসাধ্যামৃততীর্থ—এই পুণ্যতীর্থের পবিত্র নীরে স্নান করিলে পাপক্ষয় হইয়া নরগণ অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে।

২২। সর্ব্বতীর্থ—সুচরিত ঋষি সর্ব্বতীর্থে স্নানাভিলাষী হইয়া দেবাদি-দেব মহাদেবের স্তব করেন, মহাদেব ভক্তের স্তুতিতে সন্তোষ হইয়া এই তীর্থের সৃষ্টি করেন, ইহার অপর নাম মানস তীর্থ। সারা দিন নানা তীর্থ দর্শনে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিত পূর্ব্বে বাসায় ফিরিলাম। আমরা যে বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলাম সে বাড়িটী বেশ সুন্দর এবং উঁচু। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে পরিশ্রান্ত দেহে ছাদের উপরে গমন করিলাম, প্রাণ শীতল হইল। এস্থান হইতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য এত দূর চিত্ত-রঞ্জক বোধ হইল যে, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। চতুর্দ্দিকেই অনন্ত নীলাম্বুময়ী অনন্ত সাগর। সোঁ সোঁ করিয়া সমুদ্র-শীকর-সিক্ত সুশীতল বায়ু আমাদি-গের ক্লান্ত দেহে সঞ্জীবতা বর্ষণ করিতেছিল। ধীরে ধীরে দেব দিনমণি পরিশ্রান্ত দেহ শীতল করিবার জন্য সমুদ্র গর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এক দিকে সমুদ্রের গর্জ্জন, অন্যদিকে নগরের কল কোলাহল। কিন্তু সেই সন্ধ্যার উন্মুক্ত গগনতলে ছাদের উপর উপবেশন করিয়া প্রাণে যে অনন্ত শান্তি অনুভব করিতেছিলাম, তাহার সহিত সে সকলের কোন সংস্রবই ছিল না।

পরদিবস সারাদিন বিশ্রামার্থ বাসায়ই অবস্থান করিলাম। অতিরিক্ত শ্রম নিবন্ধন কোনও পীড়া হইলে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। পরদিন প্রত্যূষে নৌকায় আরোহণ করিয়া ধনুষ্কোটিতীর্থ দর্শন করিতে রওয়ানা হইলাম। সমুদ্রের তীর ধরিয়া নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, ৩।৪ ঘণ্টা পরেই আমরা ধনুকতীর্থে পঁহুছিলাম। কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে এস্থানে ধনুক রাখিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। রামেশ্বরম্ হইতে ইহা ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্রের তীরে তীরে যখন তরণী সহযোগে আমরা আমাদের গন্তব্য পথাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলাম, তখন দূর হইতে তীরবর্ত্তী নারিকেলতরুরাজি সমাকীর্ণ গ্রামগুলি কুঞ্জবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। বালুকাপূর্ণ তটপ্রদেশে সূর্য্যের প্রখর কিরণে দৃক্‌পাত না করিয়া শিশুর দল ক্রীড়া করিতেছিল। ধনুষ্কোটি তীর্থ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। কেহ কেহ বলেন যে লঙ্কা বিজয়ের পরে শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের অনুরোধে স্বীয় ধনুষ্কোটি দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন; সেই জন্য ইহার নাম ধনুষ্কোটী তীর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্র কৃত ধনুষ্কোটির রেখা দর্শন করে, তাহার আর মানব জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া গর্ভবাস যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। রামেশ্বরমে বহু তীর্থ বিরাজমান, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। প্রায় প্রতি তীর্থ এবং উপতীর্থেই লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান এবং অধিকাংশই এক প্রকার, কাজেই বিস্তারিত বিবরণ দিলেও পাঠকগণের তাদৃশ মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব না।

এ স্থানের রামঝর্‌কা বা ঝোরা দ্রষ্টব্য। দশ শত ফুট উচ্চ একটী বৃক্ষ-লতা-সমাকীর্ণ গিরি শেখরে রামঝর্‌কা অবস্থিত। তদুপরি দ্বিতল বৃহৎ ও সুন্দর মন্দির, তন্মধ্যে নিম্নতলস্থ মঞ্চোপরি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা বিদ্যমান।



কাবেরী নদীর স্নান-দৃশ্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

আমরা স্রোতবেগে এবং অনুকূল পবন ভরে ধনুষ্কোটি তীর্থ দর্শন করিয়া সে দিবসই সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

তৎপর দিবস অপরাহ্নে রামেশ্বরম্ হইতে রওয়ানা হইয়া পাম্বম্ পঁহুছিলাম, তথা হইতে পরদিন প্রত্যুষে রামনাদ হইয়া পুনরায় মাদুরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে আমরা এ স্থানে হরিদ্বার নিবাসী রামেশ্বরের জনৈক পাণ্ডা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলাম। এ ব্যক্তি হরিদ্বার হইতে রামেশ্বর দেবের জন্য গঙ্গাজল লইয়া আসিয়াছিল। আমাদের গঙ্গোত্রী যাইবার ইচ্ছা ছিল, কাজেই এখন সেখানে যাওয়া সুবিধা হইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি বলিল যে 'বাবু তাড়াতাড়ি চলে যা'ন, এ সময়ে সেখানে যেতে পার্‌বেন, বহু যাত্রীক সেখানে যাচ্ছে। আমরাও এই লুব্ধ আশায় প্রতারিত হইয়া তাড়াতাড়ি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, এজন্যই ত্রিবাঙ্কুর যাওয়া আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। রামেশ্বরম্ এবং পাম্বমের মহিমোজ্জ্বল স্মৃতি চির জীবনের জন্য হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা আর কখনও মুছিবে না।

রামনাদ।

রামনাদ মাদুরা জেলার অন্তর্গত রামনাদ তালুকের প্রধান নগর। লোকসংখ্যা ১৫,৩৬২ জন। ইহা সেতুপতি রাজগণের রাজধানী। এ স্থানে ডাকবাংলা এবং কয়েকটী ছত্র আছে, তাহা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত বহু হোটেলও আছে, সেখানে তীর্থপর্য্যটকগণ অনায়াসে আহারাদি করিতে পারেন, ব্যয়ও প্রতি বেলা ৵০ আনা ।০ চারি আনার অধিক পড়ে না। যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা এবং গো-যান পাওয়া যায়, প্রতি মাইল যথাক্রমে দশ পয়সা ও দুই আনা।

সাধারণ বিবরণ।

রামনাদের জমিদারেরা প্রাচীন এবং খ্যাতিমান। পূর্ব্বে ইঁহারা মরব প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু কালের আশ্চর্য্য লীলায় অবস্থাবিপর্য্যয়ে বর্ত্তমান সময়ে জমিদার রূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রাচীন কালে রামেশ্বরমে যাওয়া অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার ছিল, সে সময়ে রামনাদের জমিদারেরা তীর্থ যাত্রিগণের গমন ক্লেশ দূরীকরণার্থ সমুদ্র পথে গমনাগমনের বিশেষ সহায়তা করিতেন এবং বহুকাল হইতে সেতুবন্ধ তীর্থ তাঁহাদেব কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল বলিয়া ইহাঁরা সেতুপতি বলিয়া পরিচিত। রামনাদে এই সেতুপতি রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠিত বহু দেব-মন্দির বিরাজমান। তন্মধ্যে বিশ্বনাথ স্বামী, কোদণ্ডরাম স্বামী, বাণশঙ্করী, নীলকণ্ঠী ও রাজ রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রধান। এই বংশের মুণ্ডুবিজয় রঘুনাথ সেতুপতির সময়ে রামেশ্বরের ও দর্ভশয়নের মন্দিরের বহু শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

রামনাদের অনতিদূরস্থ লক্ষ্মীপুরে একটী সরোবর আছে তাহার নাম লক্ষ্মী সরোবর, সেই সরোবর তীরেও একটী ছত্রবাটী আছে। লক্ষ্মীপুরের সাত মাইল অন্তরে (১) দর্ভশয়ন এবং দশ মাইল পূর্ব্বে সমুদ্র তটে (২) নবপাষাণতীর্থ ও ২২ মাইল দূরে বিটঠল মণ্ডপ অবস্থিত।

নবপাষাণতীর্থ—শ্রীরামচন্দ্র সেতু নির্ম্মাণ সময়ে দেবীপুরে যে নবপাষাণ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন তাহাও তীর্থ বলিয়া পরিচিত। এই তীর্থ

সেতুমূলে সংস্থাপিত। তীর্থ যাত্রিগণ এই স্থানে সপ্তখণ্ড পাষাণ দান, সাগর জলে স্নান ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া পাপ বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

বিট্‌ঠলমণ্ডপ অতি প্রাচীন স্থান। সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এস্থানে কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ও মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। মণ্ডপগুলির নিমিত্তই এই স্থান বিট্‌ঠলমণ্ডপ নামে পরিচিত। সমুদ্রতটবর্ত্তী এই স্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য প্রাণ-মন-বিমোহনকারী শান্তি প্রদায়ক। ইহা দাক্ষিণাত্যের একটী ক্ষুদ্র সামুদ্রিক বন্দর। এস্থান হইতেই জাহাজ সমূহ যাত্রী লইয়া পাম্বাম্ গমন করে, উপকূল হইতে পাম্বাম্ চারি মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা রামনাদ হইতে যাত্রা করিয়া সে দিবস অপরাহ্ণেই মাদুরা উপস্থিত হইলাম। এ স্থানের হরিহর আইয়ার, বি, এল, নামক একজন উকীল আমাদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। বাড়ী হইতে আমাদের উপদেশানুযায়ী টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার যোগে এক সহস্র টাকা আসিয়াছিল, কিন্তু অত্রত্য ইংরেজ পোষ্টমাষ্টার আমাদিগকে কিছুতেই টাকা না দেওয়ায় একটু মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল, পরে বাড়ীতে পুনরায় টেলীগ্রাফ করিয়া ইঁহার নামে মণিঅর্ডার করিতে উপদেশ দেওয়ায় টাকা পাইয়াছিলাম, আমাদের জন্য ইঁহার এই ক্লেশ স্বীকার মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। মাদুরাতে আমাদের প্রদর্শক (Guide) পরমানন্দ মিস্ত্রী বিশেষ যত্নের সহিত সমুদয় দ্রষ্টব্য পদার্থ ইত্যাদি দেখাইয়াছিল।

টিউটিকোরিণ।

টিউটিকোরিণ একটী সামুদ্রিক বন্দর। মহার্ণবের মহান্ সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে এস্থানে উপভোগ করা যায়। সমুদ্রের তীরে উপবেশন করিলে মহাকবি কালিদাসের সমুদ্র-বর্ণনা আপনা হইতেই মনে হয়, সেই—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী
তমাল তালী বনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা॥

(ত্রয়োদশ সর্গ—রঘুবংশ)

এ স্থানে প্রত্যক্ষীভূত।

একদিকে তাল-খর্জ্জুর ও নারিকেল তরুরাজি বিরাজিত সৌম্যতট প্রদেশ, অন্যদিকে দিগন্ত বিস্তৃত উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল মহার্ণবের গভীর গর্জ্জন শ্রবণে মনে অপূর্ব্বপুলক ও বিস্ময়ের উদয় হয়। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল অনন্ত নালাম্বুরাশির উপরে অনন্ত তরঙ্গরাশি, একটীর উপরে আরেকটী, তার উপরে আরেকটী, এইরূপ ভাবে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। দূরে চক্রবাল রেখা (Horizon) আহা! কি সৌন্দর্য্য!

সাধারণ বর্ণনা।

"দূরে দূরে অতি দূরে সুনীল গগন,
সিন্ধু সনে গেছে মিশে সুদৃশ্য কেমন!"

দূর হইতে যখন এক একটী তরঙ্গ প্রলয়নাদে তটাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন মনে হয়, বুঝি এই মুহূর্ত্তেই বসুন্ধরা সিন্ধুর বিকটগ্রাসে পতিত হইবে। কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টা জগদীশ্বরের কার্য্যপ্রণালী এমনি নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ যে ঐ সকল তরঙ্গ-মালা ক্রমশঃ ক্ষীণ অপেক্ষা ক্ষীণতর আকার ধারণ করিয়া তটদেশে আঘাতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। 'সমুদ্র কখনো বেলাভূমি উত্তীর্ণ করে না' এ কথার যথার্থতা তখন প্রমাণিত হয়। অস্তগমনাবলম্বী সূর্য্যদেবের লোহিত-কিরণ-মণ্ডিত অপূর্ব্ব

সৌন্দর্য্য দর্শনে চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া গেল! মনে কত কি ভাবিলাম, মনে পড়িল সেই দিন,—সৃষ্টির প্রথম যুগে যখন পৃথিবীব্যাপ্ত অনন্ত নীলিমাময় অনন্ত সাগর ছিল, তখন কি এক মহান্ দৃশ্যই না ছিল! কিন্তু সে কল্পনা মানবের সাধ্যাতীত।

টিউটিকোরিণে ছোট ছোট নৌকার থাকিবার বিশেষ সুবিধা আছে, কিন্তু তীর হইতে প্রায় ছয় মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল অগভীর হওয়ায় বড় বড় জাহাজ ইত্যাদি তীরে নঙ্গর করিতে পারে না। সমুদ্র তীর হইতে নগর ছয় ফিট উচ্চ, লোক-সংখ্যা ২৮,০৪৮ জন। (British India Hotel) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া হোটেল নামক একটী হোটেল আছে, সেখানে একত্র পাঁচজন লোক থাকিতে পারে।

সর্ব্বশ্রেণীস্থ হিন্দুযাত্রিগণেরও এস্থানে আহারাদির বিশেষ সুবিধা, কারণ ষ্টেসনের নিকটে প্রায় বিশটা হোটেল আছে। যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা এবং ঘোড়ারগাড়ী ষ্টেসনেই পাওয়া যায়। টিউটিকোরিণ হইতে প্রতিদিন অপরাহ্নে জাহাজ লঙ্কা দ্বীপে যায় এবং প্রতিদিন প্রভাতে সেখান হইতে এখানে আইসে।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দর স্থাপিত হয়। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া এই বন্দর অধিকার করিয়া বসেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, পরে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের হস্তে আইসে। পলিগর যুদ্ধের সময় কিছুকালের জন্য ইহা ইংরেজদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া ওলন্দাজদিগের অধিকার-ভুক্ত হয়, কিন্তু পরিশেষে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইংরেজদের হস্তে আইসে এবং সে অবধি এই পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার-ভুক্তই আছে।

এক সময়ে এই স্থান মুক্তার ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। তখন কেপ্ কমোরিন হইতে পাম্বাম্ খাল পর্য্যন্ত মুক্তা পাওয়া যাইত। ক্রমশঃ পাম্বমের খাল গভীর হওয়ায় ভাল মুক্তা-গর্ভ শম্বুক পাওয়া যায় না। এখনও যে সমুদয় ঝিনুক পাওয়া যায় তাহাতে মুক্তা থাকে। প্রতি বৎসর মুক্তা তোলা হয় না। গভর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে মুক্তা-সংগ্রহের কার্য্য

সম্পাদিত হয়। কয়েক বৎসর অন্তর মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ভাল ভাল ডুবুরিদের সাহায্যে মুক্তা তোলা হয়। এস্থান হইতে তূলা, কাফি ও অন্যান্য বহুবিধ শস্যাদি ও অশ্ব প্রভৃতি পশু রপ্তানি হয়। এখান হইতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ পাম্বাম যাত্রা করে।

দ্রষ্টব্য স্থান।

এ নগরের প্রাচীন ওলন্দাজগণের সমাধিস্থল বিশেষ দ্রষ্টব্য। এখানকার সমাধি প্রস্তর স্তম্ভে মৃত ব্যক্তিগণের আভিজাত্য সূচক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত দেখিলাম। এ নগর হইতে কুড়ি মাইল দক্ষিণে ট্রিচেনডুর নামক গ্রামের সুব্রহ্মণ্যদেবের (কার্ত্তিকেয়) মন্দির দ্রষ্টব্য। মন্দিরে বহু সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি খোদিত আছে। টিউটিকোরিণ হইতে ট্রিচেনডুর যাইবার বেশ সুন্দর রাস্তা আছে, গরুর গাড়ীর ভাড়া পাঁচটাকা লাগে। টিউটিকোরিণেই সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল শেষ হইয়াছে। এখানকার জল বায়ু উত্তম, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীও চিত্তরঞ্জক।



স্তব্রহ্মচর্য্যা স্বামী—তাঞ্জোর

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

ত্রিনেবেল্লী।

ত্রিনেবেল্লী নগরে উপনীত হইয়া বিশ্রামান্তে নগর পর্য্যটনে বাহির হইলাম। ত্রিনেবেল্লী জেলার ইহাই প্রধান নগর। লোকসংখ্যা (৪০,৪৬৯)।

সাধারণ কথা।

মান্দ্রাজ নগরী হইতে ৪৪৩ মাইল দূরে এই সহর অবস্থিত। তাম্রপানি বা তাপ্তী নদী ইহার তটদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিতা। এ স্থানের রেলওয়ে পুলটি উল্লেখযোগ্য, উহা দৈর্ঘ্যে দুই মাইল। পালামকোটা এবং ত্রিনেবেল্লী নদীর উভয় তটস্থ দুই নগর এই পুলটি দ্বারা সংযোজিত। দক্ষিণপথ রেলওয়ের ইহাই শেষ সীমা। এ স্থানে বহু বলদ শকটের (Travancore Bullock Train Company) আফিস আছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার রাজত্বের অন্তঃর্গত কুমারিকা অন্তরীপে যাত্রিগণ এ সমুদয় বলদ শকটারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন। ষ্টেসন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একটী ডাকবাংলা আছে, সেখানে একত্র তিনজন লোক থাকিতে পারা যায়। এ স্থানে ছত্রম্ এবং হোটেল ইত্যাদি থাকায়, আহারাদি সম্পর্কে যাত্রিগণের কোনওরূপ অসুবিধা হয় না। হোটেলের আহারাদির ব্যয় প্রতি বেলা ৵৫—৶০ আনা হিসাবে পড়ে। যাত্রিগণের গমনাগমনের জন্য গরুর গাড়ী এবং ঝট্‌কা পাওয়া যায়; ভাড়া মাইল প্রতি যথাক্রমে তিন আনা ও দুই আনা। প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে একটী হাট বসে। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ে এ স্থানে বহু ব্যবসায়ী এবং তীর্থ যাত্রী সমবেত হয়। ত্রিনেবেল্লীর দেব-মন্দিরে শিব এবং পার্ব্বতী উভয়ের মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে শিবের নাম নেলিপ্পান এবং পার্ব্বতীর নাম কান্তিমতী। এই দেব-মন্দির গাত্রে বহু খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের গঠন প্রণালী অনেকটা মাদুরার মন্দিরের মত। গপুরাম পার হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেই একটী তিপ্পাকুলাম্ (পুষ্করিণী) দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তিপ্পাকুলামের বাম পার্শ্বে একটী মণ্টপম্, সেই মণ্টপমে বহু খোদিত মূরত। মণ্টপমে একশতটী স্তম্ভ আছে। মণ্টপমটী দেখিতে অত্যন্ত

সুন্দর। এ স্থানে হিন্দুকালেজ, গভর্মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসান, নর্ম্মাল বিদ্যালয়, চিনির কল ইত্যাদি ব্যতীত দর্শনীয় তেমন আর কিছুই নাই। আমরা এ স্থান হইতে পুনরায় মাদুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেখান হইতে ইরোড গমন করিলাম। রামেশ্বরের পাণ্ডার নিকট এ সময় গঙ্গোত্রী যাইতে পারিব এ সংবাদে এতদূর উৎসাহিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম যে তাড়াতাড়ি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া সেখানে যাওয়ার জন্য দ্রুততা ও সময় সংক্ষিপ্ততা বশতঃ অনেক স্থান ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই।

আজিখাল।

ইরোড হইতে অদ্য আজিখাল আসিলাম। পথের শোভা অত্যন্ত সুন্দর। হরিদ্বর্ণ তৃণ শোভিত ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে যে কত প্রকার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গকে বুঝাইতে যাওয়া অসম্ভব। দূরে আকাশের নীলিমায় ছোট ছোট গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দাক্ষিণাত্যে পাহাড়ের সংখ্যা খুব বেশী। সত্য সত্যই এই প্রদেশ "Land of the Mountain and the flood." কোথাও নয়ন মনোহর কুসুম পল্লব-পরিবৃত বৃক্ষরাজি পূর্ণ উপত্যকা ভূমি, কোথাও বা নির্ম্মল সলিলা তরঙ্গিণী ও নির্ঝরিণীর কল্ কল্ ছল্ ছল্ মধুময় প্রেমের অব্যক্ত উচ্ছ্বাস।

আজিখাল নগর একটী বৃহদায়তনা রজত সলিলা তরঙ্গিণীর বাম তটে অবস্থিত। নদীর উভয় তটে বহুল পরিমাণে নারিকেল ও অন্যান্য বহু জাতীয় বিটপী শ্রেণীর দ্বারা পরিশোভিত। এই নদী আজিখাল হইতে চারি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সমুদ্রের সহিত সম্মিলিতি হইয়াছে। নগরের জনসংখ্যা (১১,২২০)। ষ্টেসনের নিকটেই পোষ্টাফিস ও টেলীগ্রাফ আফিস (Combined) সাবরেজিষ্ট্রার আফিস এবং থানা অবস্থিত। যে স্থানে ষ্টেসনটী বিরাজমান তাহার নাম বলিয়পাটম্। কেনানোর হইতে পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে বলিয়পাটম্ বিরাজিত, এখানকার রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত, সুন্দর এবং নানাবিধ দোকান এবং বড় বড় অট্টালিকা দ্বারা পরিশোভিত। ষ্টেসন হইতে এক মাইল দূরে চেরকোল নামক স্থানে একটী শিবমন্দির দ্রষ্টব্য, মন্দিরের সম্মুখে যে পুষ্করিণী আছে, তাহার জল স্বচ্ছ ও সুপেয়। তীর্থ-পর্য্যাটকগণের জন্য এখানে ছত্র আছে, সেখানে ব্রাহ্মণগণকে বিনা ব্যয়ে আহারাদি করিতে দেওয়া হয়। শুনিলাম যে এই ছত্রটী চেরকোলের রাজা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এ স্থানে মুসলমানের সংখ্যাই

সাধারণ বর্ণনা।

দেব-মন্দিরের কথা।

খুব বেশী, ইহাদিগকে মোপ্লা কহে। মেঙ্গালোর, হোসড্রুগ, কোসেরগোড প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য আজিখালে নৌকা পাওয়া যায়। মরিচ, পিপুল, বাহাদুরি কাষ্ঠ, নারিকেল প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এ স্থানে প্রধান। এ দেশের মুসলমানেরা সকলেই হিন্দীতে পরিষ্কার কথাবার্ত্তা বলিতে পারে।

আর্ণাকোলাম।

আর্ণাকোলাম, কেনান্নুর কোচীন ইত্যাদি নগরী কেরলের অন্তর্গত ইহা অত্যন্ত প্রাচীন জনপদ। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ইত্যাদি বহু প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শক্তি সঙ্গম তন্ত্রের মতে ঃ—

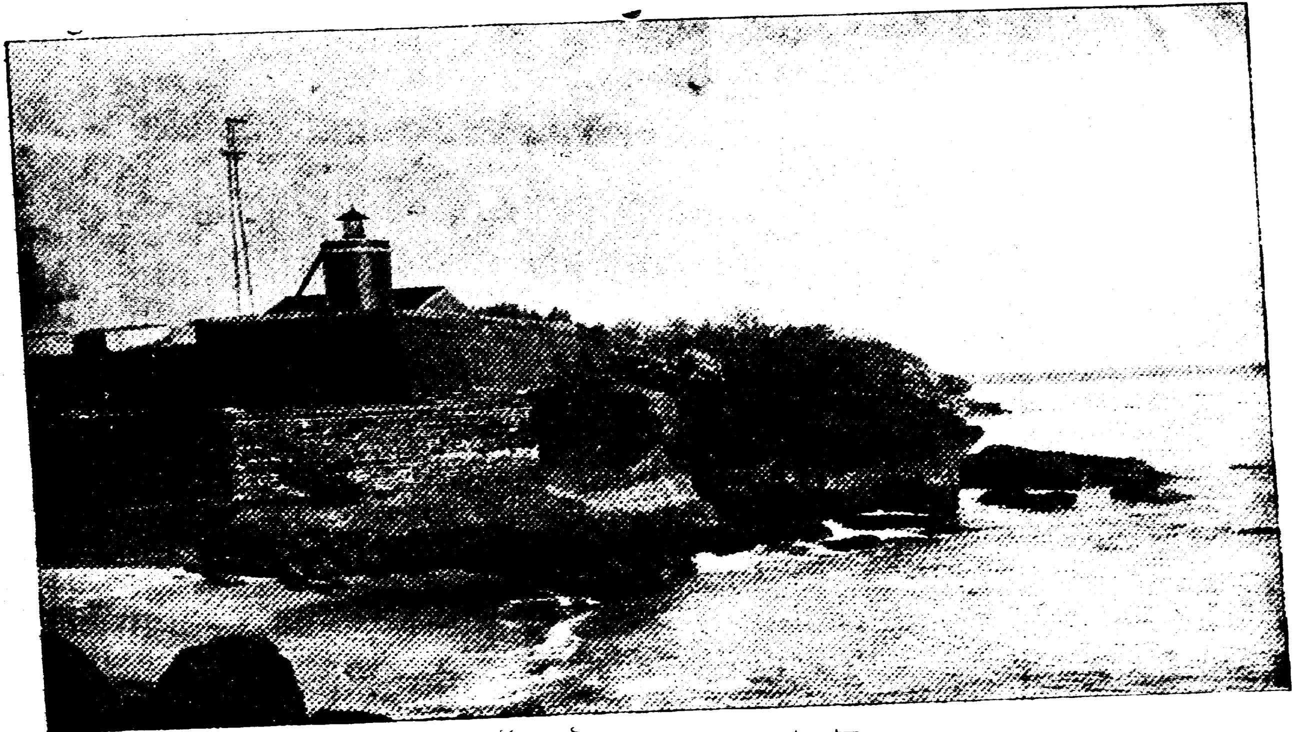
"সুব্রহ্মণ্যং সমারভ্য যাবদ্দেবো জনার্দ্দনঃ।
তাবৎ কেরল দেশঃ স্যাৎ তন্মধ্যে সিদ্ধকেরলঃ॥
রামেশ্বরাৎ ব্যঙ্কটেশাৎ হংসকেরল নামকঃ।
অনন্তশৈলমারভ্য যাবৎ স্যাদব্যয়ং পরে॥
তাবৎ সর্ব্বেশনা মাতু কেবলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

আধুনিক গোকর্ণ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সাগরতীরবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ জনপদ পূর্ব্বে কেরল নামে অভিহিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কেরল বলিতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কেবল মালাবার উপকূল বুঝায়। ইহা কবিগণের চির প্রিয়, মলয়ের দেশ। এখানে আমাদের হৃদয়েও যে কবিত্বের কুসুমপেলব সুষমা জাগিয়া ওঠে নাই একথা বলিতে পারি না; নয়ন সমক্ষে মলয় পর্ব্বতের শ্যামল সুষমা সত্য সত্যই হৃদয়ের প্রীতি বর্দ্ধক। এস্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য আমাদের বাঙ্গালা দেশের মত। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে সেই দিকেই নারিকেল উদ্যানের শোভা। ছোট ছোট নদী বা খালের উভয় পার্শ্বে ঘনবিন্যস্ত নারিকেল তরুরাজি ফলগুচ্ছ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, নারিকেলের পার্শ্বে বা অভ্যন্তরে গুবাকও আপনার মাথা তুলিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। 'শস্য শ্যামলাং মাতরমের' পূর্ণ অভিব্যক্তি এ দেশে দেদীপ্যমান। আমার বিশ্বাস বঙ্গদেশের শ্যামল রংয়ের চেয়েও এখানকার শ্যামলতা অধিক সুন্দর। কেরল বা মালাবারের তৃপ্তিদায়িনী শোভার বর্ণনা করিয়া একটা স্বাভাবিক চিত্র পাঠক পাঠিকার সম্মুখে দাঁড় করান লেখনীর পক্ষে অসম্ভব। কদলী বৃক্ষও এস্থানে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইল। এ অঞ্চলের গৃহস্থের কুটীরগুলি প্রায়ই নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে স্থাপিত। দূর হইতে তরু ছায়ার আড়ালের এই গৃহগুলি পথিকের দৃষ্টি

পথে পতিত হয় না। বাম দিকে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের আষাঢ়ের নব ঘনের ন্যায় নীল কলেবর, সৌন্দর্য্যের একটা মায়াজাল বিস্তার করিয়া দিতেছিল। আরনাকোলাম ষ্টেসন হইতে এক মাইল দূরে একটী ডাক বাংলা আছে, সে স্থানে যাত্রিগণ ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিতে পারেন।

সহরের কথা।

এস্থানে কোচীনের রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণ ও বিদ্যা মন্দিরাদি অবস্থিত। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ব্বাপেক্ষা সহরের বহু পরিমাণে উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুপ্রশস্ত রাজপথ এবং সুন্দর সুন্দর সৌধাবলী নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ষাকালে আমাদের দেশের মত এস্থানেও জল বৃদ্ধি হইয়া ভূমি সকল জলমগ্ন হয়, জল অপসৃত হইলে পরে ধান্যাদি বপন করিয়া থাকে। বেক্ওয়াটারের দুই মাইল পশ্চিম দিকে কোচিন নগর সংস্থাপিত। আমাদের বঙ্গদেশে বসন্তের প্রারম্ভে যে মধুর দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে বঙ্গকবিগণ তাহাকে মলয়ানিল কহিয়া থাকেন; সেই মলয়ানিলের জন্মভূমি মালবার বা মলয়ারের শ্যাম সৌন্দর্য্য কবিগণের একবার দর্শন করা উচিত। এস্থান সমশীতোষ্ণ দেশ। ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনের কোনও আবশ্যক হয় না। রাত্রিতে শীতবস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা একবার সমুদ্রতটে বেড়াইয়া আসিলাম। চারিদিকে সন্ধ্যা-সুন্দরীর শুভাগমন ধ্বনি নীরবতার সহিত ব্যক্ত হইতে-ছিল, দিগ্‌দিগন্তে একটী মলিন ছায়ার সুগভীর আবরণ ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে সমুদ্র-গর্ভ-শায়িত সূর্য্যদেবের বিপরীত দিক্ হইতে আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল। একটী দুইটী করিয়া তারকারাজি সন্ধ্যা-সুন্দরীর অন্ধকার মাঝে আপনাদের প্রদীপ্ত সুষমা বিকাশ করিয়া দিয়াছিল। আর্ণাকোলামের ডাক বাংলার সম্মুখে বহুদূর ব্যাপি হাটের পথ, উভয় পার্শ্বে বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী পরিপূর্ণ বিপনি নিচয় আলেখ্যবৎ বিদ্যমান। এ স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরে ত্রিপুন্তোরা নামক স্থানে কোচিনের রাজা বাস করেন। সেখানে দেবমন্দিরাদি আছে। আর্ণাকোলামের দর্শনীয় দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া এবং নগরের বিভিন্নাংশ পর্য্যাবেক্ষণান্তর কোচিন নগরে গমন করিলাম। এই নগরে রাজার সাহায্যে একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।



ফোর্ট সেণ্ট এঞ্জেনো—কেনানোর।

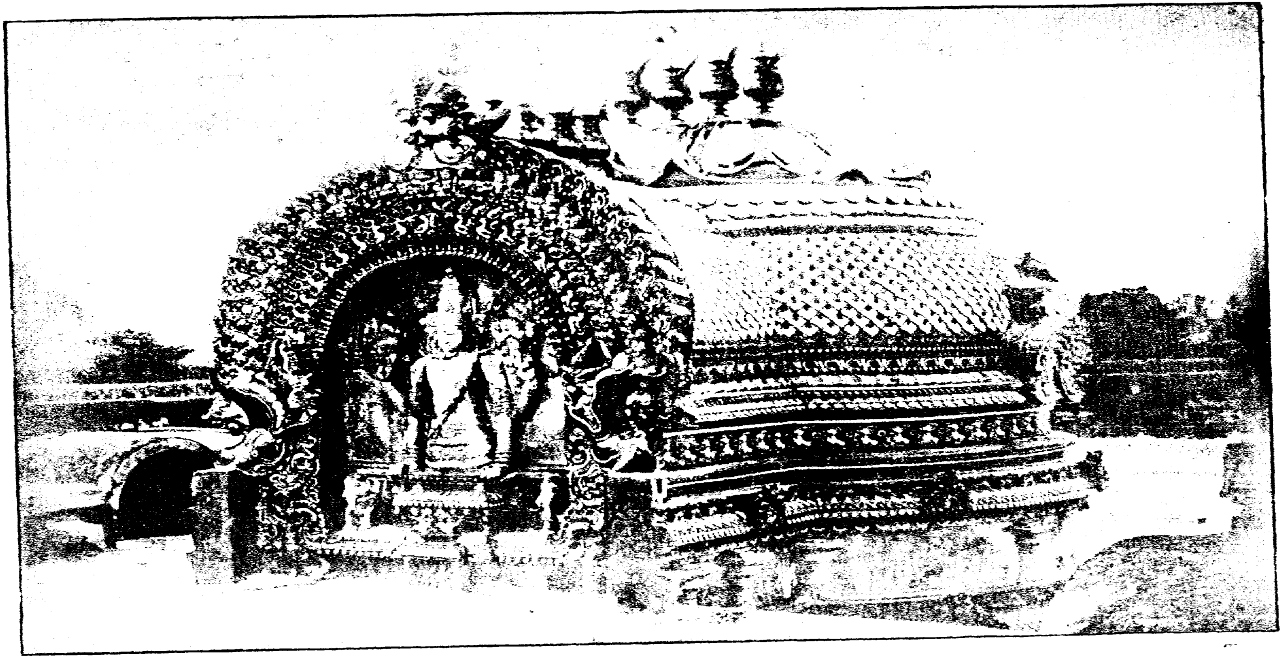
কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কেনানোর।

আমরা আজিখাল হইতে কেনানোর আসিলাম। কেনানোর তালুকের ইহাই প্রধান নগর। এই নগর দুইটী পৃথক্ অংশে বিভক্ত, এক অংশে কেনানোর সহর এবং অপর অংশে সৈন্য-নিবাস (Cantonment) প্রাচীন নগর যেখানে অবস্থিত ছিল, সেখানে অদ্যাপি সেণ্ট এঞ্জিলো ফোর্ট বিদ্যমান আছে। এই দুর্গের তিনদিকেই সমুদ্রের শাখা বেষ্টন করিয়া আছে। গৈরিক রংয়ের পার্ব্বত্য মৃত্তিকা দ্বারা দুর্গটী নির্ম্মিত। কেনানোরের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এস্থানে কমিশরিয়েট আফিস, সাবরেজিষ্ট্রারের আফিস, তহশীলদারের আফিস, গভর্মেণ্ট স্কুল ইত্যাদি সমুদয় আছে। নানাবিধ কলকারখানা এখানে খুব বেশী। নগরে ভ্রমণকারিগণের থাকিবার জন্য এস্‌প্লেনেড্ হোটেল, ডাকবাংলা এবং মুসাফেরখানা আছে। দুর্গের তিন মাইল উত্তর দিকে সেণ্ট্রাল জেল অবস্থিত। এই কারাগার সংলগ্ন একটী সুন্দর উদ্যানে কারাধ্যক্ষ মহাশয় বাস করেন। এখানে ৮২৯ জন কয়েদী থাকিতে পারে। কেনানোর নগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। সমুদ্র তটে অবস্থিত বলিয়া ইহার স্বাভাবিক দৃশ্যাবলী পথিকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে নীলজলের নীল লহরী-লীলা। কোথাও ঘনচ্ছায়া সমাকুল স্নিগ্ধ অরণ্যময় প্রদেশ, আবার কোথাও বা শস্য ক্ষেত্র ও তরুশ্রেণী দূরস্থিত শৈলেন্দ্রের পাদদেশে আপনাদের প্রকাশ করিয়া সৌন্দর্য্যময়ের অসীম শোভা সম্পদের এক কণা, সৌন্দর্য্য পিপাসী মানবের নেত্র সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিস্মিত করিতেছে। সমুদ্রের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহার সেই নিবিড় নীল কলেবরের মহিমাময় বিরাট সৌন্দর্য্য এমনই নয়নানন্দদায়ক যে দেখিয়া দেখিয়া তৃষা মিটে নাই, যতই তাহাকে দেখিয়াছি ততই তাহার নীলিমার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। মনে হইয়াছে—

"ভূধরে সাগরে তাবৎ চরাচরে,
সর্ব্বব্যাপী নাম লিখে'ছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ।"

আমরা কেনানোরে বেশীক্ষণ অবস্থিতি করি নাই। মোটামুটি যাহা দেখিবার সে সমুদয় দর্শন করিয়া এস্থান হইতে কোচিনাভিমুখে গমন করিলাম।



বিমান মন্দির—শ্রীরঙ্গম্।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কোচীন।

কোচীন অতি সুন্দর ও প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ব্রিটিশ রাজের অধীন উক্ত নামধেয় দেশীয় মিত্র-রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের আক্রমণের পর হইতেই ইহা মলয়বার জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। কোচীন রাজ্যের পশ্চিম সীমা আরব সমুদ্র, পূর্ব্বও দক্ষিণদিকে মলয়বার জেলা, উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী। ইহা কোচীন, কেনানোর, মুকুন্দপুরম্, ত্রিচূড়, তল্লপলী, চিণ্ডুর, কোদুঙ্গলূর এই সাত ভাগে বিভক্ত। কোচীন নগর সমুদ্রের তটে অবস্থিত। এস্থানে নারিকেল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলে। যেখানে সেখানেই নিবিড় নারিকেলের বন দৃষ্ট হয়। এদেশের জলবায়ু কিছু সেঁতসেঁতে হইলেও অস্বাস্থ্যকর নহে। নিদাঘের দারুণ প্রখরতা এখানে নাই। যদি কখনও উপর্য্যুপরি তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, তবে তখনি আবার ইন্দ্রদেবের কৃপায় বারিপাতে গ্রীষ্ম দূরে পালায়। কোচীন নগর এবং কোচীন দেশ সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমরা এস্থানের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের সহিত পাঠকবর্গকে পরিচিত করাইব। যে সকল পাঠকের ইতিহাসে তাদৃশ শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এ অংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বিষয় পাঠ করিতে পারেন।

সাধারণ বর্ণনা।

পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুড়, মালবার প্রভৃতি যখন কেরল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীতে চেরুম পেরুমল এ সমুদয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইনি অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার গৌরব মুকুট ধারণ করেন। কোচীনের বর্ত্তমান নৃপতি এই মহাত্মারই অধস্তন পুরুষ। কালিকট প্রদেশের জামোরীন উপাধিধারী রাজার সহিত কোচীন রাজার প্রতিদ্বন্দীতা ভারতবর্ষে পর্টুগীজদিগের প্রবেশের প্রথম সময় হইতে বিদ্যমান ছিল। সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহাদিও হইত। ১৫০০

প্রাচীন ইতিহাস।

খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে পিড্রো অলবরজ্ ডি ক্যাবরাল নামক জনৈক পর্টুগীজ সদলে কোচীন আসিয়া উপনীত হ'ন এবং বহু চেষ্টার পরে কালিকটের তদানীন্তন জামোরিনের সহিত বিবিধ বন্দোবস্ত করিয়া কতকজন পর্টুগীজের উপর ভার দিয়া একটী কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্থান করেন। তাঁহার প্রস্থানের পরেই জামোরিন পর্টুগীজদিগের কুঠি ধ্বংস করিয়া ফেলেন; এই সংবাদ পর্টুগালে পঁহুছিবামাত্র সুবিখ্যাত ভাস্কো-ডি-গামা ২০ খানা জাহাজে বহু সৈন্য লইয়া ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পঁহুছিলেন। তিনি পঁহুছিয়াই কালিকট নগর অবরোধ করেন এবং বহু বিদেশীয় জাহাজ ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। জামোরিন নানাপ্রকার বিপদাশঙ্কা করিয়া ভাস্কো-ডি-গামার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ডি-গামা বলিলেন যে পর্টুগীজগণের হত্যাকারিগণকে না পাইলে তিনি সন্ধি করিবেন না। ইহার পরে বিনা হেতুতে ও বিনা দোষে পঞ্চাশ জন মালবারী নাবিককে ফাঁসী দিয়া গোলা বর্ষণ করিয়া কালিকট নগরী ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নগর প্রায় অর্দ্ধেক ধ্বংস হইল, কিন্তু তথাপিও জামোরিন-ডি-গামার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন না। পরিশেষে ডি-গামা জামোরিনের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া কোচীন রাজের সহিত স্বকীয় বীরত্ব-গৌরব প্রকাশ করিয়া কোচীনের খাঁড়ির মুখে কুঠি স্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। এইরূপে কোচীন নগরে ইউরোপীয় অধিকারের সূত্রপাত হইল। ক্রমে পর্টুগীজরা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডি-গামার পরে হেনরিক মেনেজেজ গোয়ায় পর্টুগীজ রাজধানী স্থাপন করেন।

পর্টুগীজেরা যখন এইরূপে ভারতে স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, তখন ওলন্দাজেরা সিংহলে ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখিতে পাইল যে পর্টুগীজেরা ভারতবর্ষে স্থান অধিকার করিয়াছে, তখন তাহারাও করমণ্ডল উপকূলস্থিত নিগাপওন, কুইনন কোদঙ্গপুর অধিকার করিয়া ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে মালবার উপকূলস্থিত কোচীন নগর অবরোধ করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল, কিন্তু এ যুদ্ধে ওলন্দাজেরা পরাজিত হইয়া পালাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহারা পরাজিত হওয়ায় ভগ্নোদ্যম না হইয়া ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়

এবং নগর অধিকার করে। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে কালীকটের জামোরিণ আবার কোচীন অধিকারের চেষ্টা পান, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাহাকে পরাজিত করিয়া কোচীনের কতকাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ওলন্দাজাধিকারের পরে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহীসুরের মুসলমান নরপতি কোচীন সাম্রাজ্য স্বীয় অধিকার মধ্যে আনয়ন করিয়া কোচীন রাজাকে মিত্ররাজ বলিয়া গ্রহণ করেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে টিপু কর্ত্তৃক এই নগরের বহু অংশ ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু এ সময়ে তাহাকে শ্রীরঙ্গ পত্তন রক্ষার জন্য ফিরিতে হয় বলিয়া তিনি একেবারে এই নগরের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগর টিপুর শাসনাধীনে ছিল। এই সময়ে টিপু সুলতানের ভয়ে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কোচীনরাজ ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন লর্ড ওয়েলেস্‌লি গবর্ণর, তিনি এই সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া কোচীনরাজের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া লন। এক লক্ষ টাকা কর নির্দ্ধারিত হয়। কোচীন রাজ প্রকৃতি-পুঞ্জের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। আর্নাকোলাম তাঁহার রাজধানী, কিন্তু তিনি সচরাচর ত্রিপুন্তোরা নামক স্থানে বাস করিয়া থাকেন। কোচীনের রাজার আয় ৬২৩৬৪২০৲ টাকা। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে রবিবর্ম্মার পুত্র রামবর্ম্মা রাজা ছিলেন, ইনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রামবর্ম্মা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের নিকট হইতে K. C. S. I. উপাধিও সম্মানার্থে ১৭টি তোপ পাইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই রামবর্ম্মা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। কোচীনের চতুর্দ্দিকেই প্রায় লবণাক্ত জল। এস্থানে সুপেয় সলিলরাশি পাওয়া যায় না। এমনকি কূপ এবং পুকুরের জল পর্য্যন্ত লবণাক্ত, এই জল দীর্ঘকাল পান করিলে গোদ এবং অন্যান্য নানা প্রকারের দূষিত পীড়া হয়। শ্লীপদ রোগকে কোচীনেরা পদ কহে।

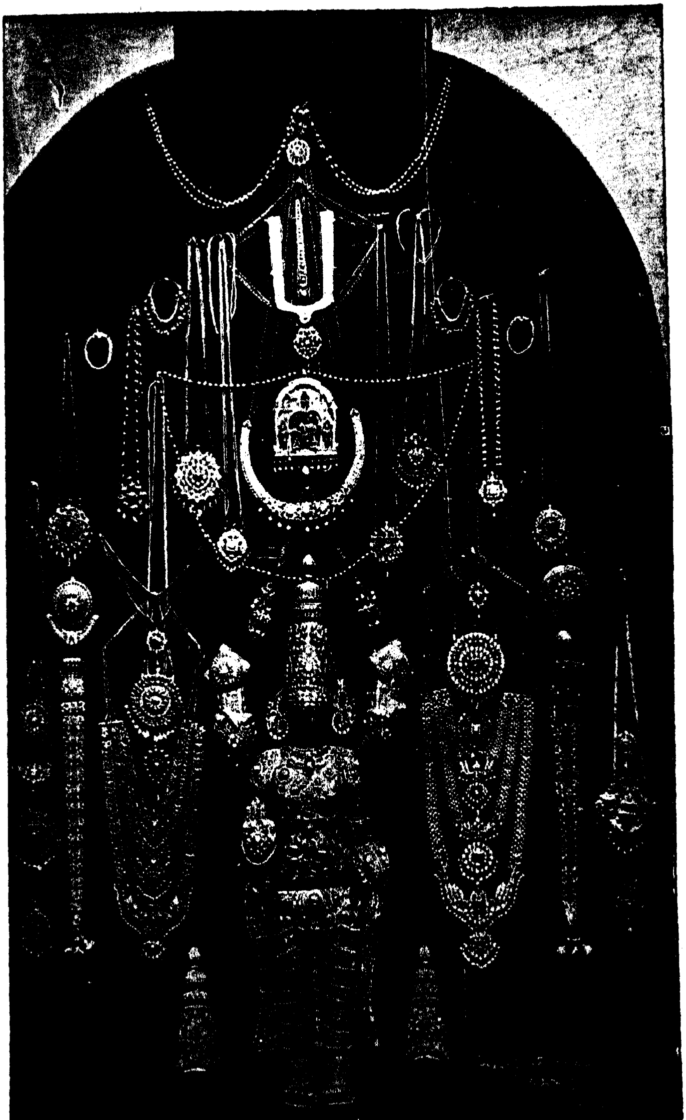
কোচীনে জল বিক্রী।

কোচীন নগর হইতে চৌদ্দমাইল দূরে এলওয়ে নামক স্থানে পেরিয়ার নামক স্রোতস্বিনী আসিয়া ব্যাকওয়াটারে পতিত হইয়াছে। এই নদীর জলে ধাতব পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া ইহা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। বহুদূর হইতেও অনেকে এই নদীর পবিত্র এবং স্বাস্থ্যপ্রদ সলিলে অবগাহন

করিতে এলওয়েতে আসিয়া থাকে। বড় একখানা নৌকায় করিয়া প্রতিদিন এলওয়ে হইতে জল আনিয়া এস্থানে বিক্রয় করে। নৌকার ভিতর অনেকগুলি পিপে থাকে, টিনের দমকল দ্বারা সেগুলি পূর্ণ করা হয় এবং সেই পম্পের সাহায্যে পিপে হইতে জল তুলিয়া কলসীতে বিক্রয় করে। কলসীর আকৃতি অনুসারে জলের মূল্য এক আনা ও দুই আনা হয়। এলওয়ে নগরের অনতিদূরে ভারতবর্ষের শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি জাতিতে নাম্বুরি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পেরিয়া নদীর জল অত্যুত্তম বলিয়া এস্থানে বহু সাহেব মেমও স্নানার্থ আগমন করিয়া থাকেন। রজতসলিলা তরঙ্গিনীর ভিতরে অস্থায়ী কুটীরগুলির সৌন্দর্য্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক। মালাবারের বৈচিত্র্য নানা প্রকারে সহজেই ভ্রমণকারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এস্থানে ধানের চাষ বেশ হয়—নিকটবর্ত্তী ত্রিবাঙ্কোরেও যথেষ্ট হয় কিন্তু তাহা দেশবাসীর প্রয়োজনানুরূপ নহে। সেজন্য ব্রহ্মদেশ, কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে ধান ও চাউল আমদানী হয়। কোচীনে দুই শ্রেণীর সওদাগর দেখিলাম—ইউরোপীয় এবং দেশীয়। ইউরোপীয় সওদাগরগণ দেশীয়দের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করেন এবং ইউরোপ হইতে আনীত দ্রব্যাদি দেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করেন। দেশীয় সওদাগরগণের অধিকাংশই বম্বের মুসলমান বা ভেটীয়া বানিয়া।

কোচীনে দুই জাতীয় ইহুদীর বাস—সাদা এবং কালো। সাদা ইহুদীরাই প্রকৃত ইহুদী বলিয়া পরিচিত, জনপ্রবাদ এইরূপ যে পূর্ব্বে কাল ইহুদীরা সাদা ইহুদীদের ক্রীতদাস ছিল, কিন্তু কালক্রমে এখন স্বাধীন হইয়াছে। ইহারা সাদা ইহুদীদের গির্জ্জা (Synagogue) এ উপাসনা করিতে পারে না, ইহাদের স্বতন্ত্র উপাসনা মন্দির আছে।

মালাবারে কতকগুলি বিষয় আলোচনার যোগ্য—তিব্বতের বহু পত্যাত্মক বিবাহ, গারো, খাসিয়া প্রভৃতি অনার্য্য জাতির ন্যায় ভাগিনেয়ের উত্তরাধিকারত্বের নিয়ম, বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। দাক্ষিণাত্যে ও মালাবার কানারিজ, তেলেগু, তালিম এবং মালয়াম এ কয়টি ভাষা প্রচলিত, এ সকলের আবার মূল দ্রাবিড় ভাষা।



শ্রীরঙ্গমের বিগ্রহ রঙ্গনাথ স্বামীর অলঙ্কারসমূহ।

কুন্তলীন প্রেস।

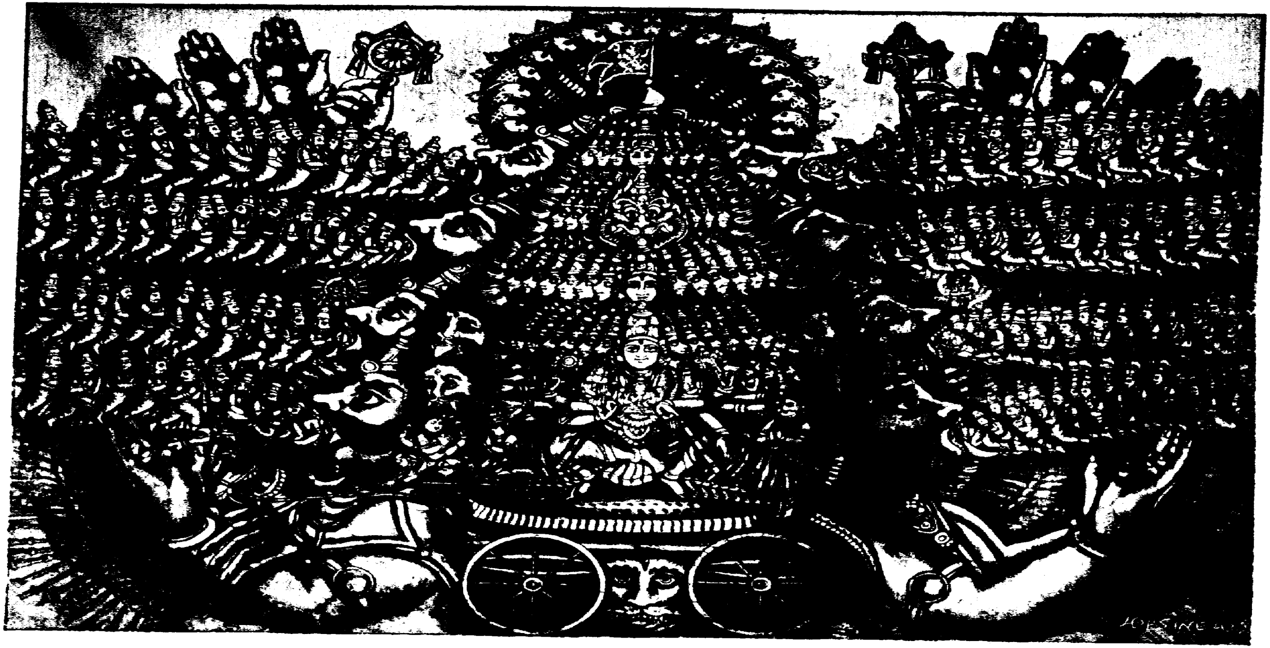
এ অঞ্চলে জাতিভেদের সংকীর্ণতা অতি গাঢ়তররূপে বিরাজমান—ব্রাহ্মণেতর জাতির এদেশে বড়ই হীনাবস্থা তাহাদিগকে প্রতি পদে নানাবিধ নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে হয়। অতএব কোনও বাঙ্গালীর পক্ষে এদেশে ভ্রমণ করিতে আসিলে ব্রাহ্মণেতর জাতিরূপে পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে তাঁহাকে এদেশে শুঁড়ি তিয়র প্রভৃতি অতি হীন জাতির সহিত গণনীয় হইতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা ভোগ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

শ্রীরঙ্গম।

ত্রিচিনপল্লী হইতে দুই মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গম বা শ্রীঙ্গম অবস্থিত। কাবেরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ইহা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ৩২টী খিলান নির্ম্মিত সুবৃহৎ পুল দ্বারা দ্বীপের সহিত মূল-ভূ-ভাগ সংযোজিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ মধ্যস্থ সুবৃহৎ দেব-মন্দির সমূহ ভারত বিখ্যাত। এইরূপ বৃহৎ মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও বিদ্যমান নাই। স্থপতি বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা কলানৈপুণ্যের জন্য ইহা বিখ্যাত নহে, কারণ সে হিসাবে দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ মন্দিরই ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৃহৎ এবং বহুস্থানব্যাপী কলেবরের জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। এই মন্দির সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ফার্গুসন সাহেব লিখিয়াছেন যে "If its principle of design could be reversed, would be one of the finest temples in the south of India. (History of Indian and Eastern Architecture—Furgusson.) বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, একজন রাজা এক সময়ে ঐ সমুদয় মন্দির ও গোপুরাম নির্ম্মাণ করেন নাই, বহু রাজার বংশপরম্পরায় বহু অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রমে এই সুবৃহৎ মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

সকলের মধ্যবর্ত্তী মন্দিরটীতে 'রঙ্গানন্দ স্বামীর' (বিষ্ণু) মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দিরটী একটীর পর একটী এই প্রকারে সাতটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে উপর্য্যুপরি সাতটী গপুরাম পার হইয়া যাইতে হয়। সর্ব্বপ্রথম গপুরাম-সংলগ্ন প্রাচীর উচ্চে ২০ ফিট ৮ ইঞ্চি, এবং ইহার উর্দ্ধ ভাগও ৬ ফিট প্রশস্ত। ইহা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ৩,০৭২ × ২,৫২১ ফিট। এই প্রাচীর এবং গোপুরাম পার হইবার পরে দ্বিতীয় গোপুরাম এবং প্রাচীর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। দ্বিতীয় গোপুরাম সংলগ্ন প্রাচীরটী দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ২,১০৮ × ১,৮৪৬ ফিট। উঁচুতে এবং উর্দ্ধাংশের প্রশস্ততায় ও ইহা প্রথম গোপুরামটী হইতে অনুপাতানুযায়ী কম। ইহার পর তৃতীয়

দেব-মন্দিরের কথা।



শ্রীরঙ্গজির বিশ্বরূপ দর্শন।

কুন্তলীন প্রেস।

গপুরাম এবং তদ্‌সংলগ্ন প্রাচীর, এই প্রাচীরটী দৈর্ঘ্যে ১,৬৫৩ ফিট এবং প্রস্থে ১,২৭০ ফিট।

এইরূপ ভাবে সাতটী গোপুরাম উত্তীর্ণ হইলে শেষ গোপুরাম বা মন্দিরের শেষ সিংহ দরজা পার হইতে হয়। এই গোপুরামটী ১৪৬॥০ ফিট উঁচু। অন্যান্য গোপুরামের তুলনায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং কারুকার্য্য খচিত। স্থানীয় অধিবাসিগণ এই গোপুরামকে "শ্বেত গোপুরাম" বলে। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় গোপুরাম এবং প্রাচীরগুলি সকলই প্রস্তর নির্ম্মিত। শেষ গোপুরামটা পার হইলেই সম্মুখে একটী মণ্টপম্, এই মণ্টপটী অতি সুন্দর, এ স্থানে প্রতি প্রস্তর স্তম্ভেই নানাপ্রকার কারুকার্য্য বিদ্যমান। চিদম্বরম্ এবং মাদুরার তুলনায় অবশ্য এখানকার শিল্পচাতুর্য্য কিছুই নহে।

মণ্টপমের এক পার্শ্বে যে একটী সুবৃহৎ হল (Hall) আছে তাহাকে হাজার স্তম্ভের কক্ষ বলে, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সেখানে মোট ৯৪০টী স্তম্ভ। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রাচীরগুলি যথাক্রমে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১,২৩৫ × ৮৪৯; ৭৬৭ × ৫০৩; ৪২৬ × ২৯৫ এবং ২৪০ × ১৮১ ফিট। ইয়ুরোপীয় কোন জাতিরই এই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। এ স্থানে বহু লক্ষ মুদ্রা মূল্যের মণি, অলঙ্কার এবং নানাবিধ তৈজস পত্র অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত নানাপ্রকার থাল, রেকাবি ইত্যাদি বহু সুন্দর সুন্দর দ্রব্য আছে। সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় যখন ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এই মন্দিরে একখানা অতি সুন্দর ও বহুমূল্য স্বর্ণথালা দান করিয়াছিলেন। এই মন্দিরস্থ মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি যদি কেহ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে মন্দিরের ন্যাসধারিগণের (Trustees) নিকট পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ প্রেরণ করিতে হয়, কারণ এ সকল মূল্যবান পদার্থগুলি তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে। সাধারণতঃ প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পাঁচ টাকা প্রদান করিলেই ন্যাসধারীগণ সকলে সমবেত হইয়া দর্শককে এ সমুদয় রত্নাভরণ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন।

জম্বুকেশ্বর মন্দির।

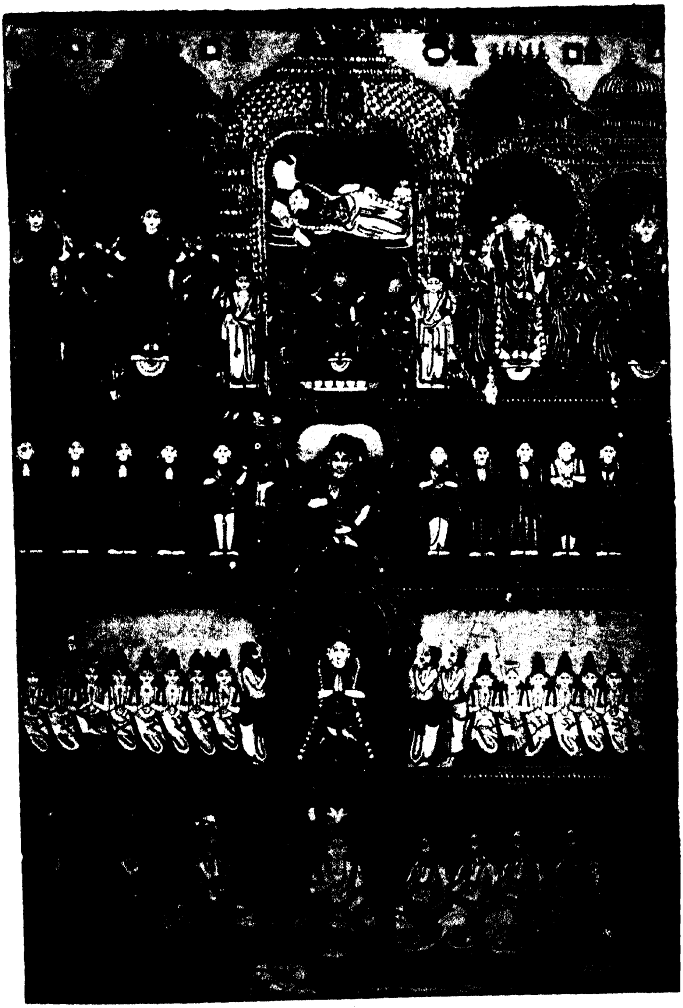
শ্রীরঙ্গমের এই সুবিখ্যাত বিষ্ণু মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বদিকে 'জম্বুকেশ্বর' নামক একটী শিব-মন্দির আছে। কথিত

আছে যে এই মন্দির মধ্যস্থিত শিব-মূর্ত্তি কেবল একশত বৎসর হইল এ স্থানে আনীত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা একটী জম্বু বৃক্ষের নীচে ছিল। রঙ্গনাদ স্বামীর মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরের চারিদিকেও পাঁচটী প্রাচীর আছে। এই প্রাচীরগুলি যথাক্রমে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১২৬ × ১২৩; ৩০৬ × ১৯৭; ৭৪৫ × ১৯৭; ২,৪৩৬ × ১,৪৯৩ ফিট। উচ্চতাও যথাক্রমে ৩০,৩৫,৬৫,৩৫। শেষ প্রাচীরটীর সহিত রাস্তা-ঘাট বাড়ী ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভাগ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক প্রাচীরের সম্মুখেই দাক্ষিণাত্যের প্রথানুযায়ী গোপুরাম আছে। গোপুরাম কোনটী ৬০ ফিট, কোনটী ৭৩ ফিট, কোনটী বা ১০০ একশত ফিট উচ্চ। এই মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে বহু খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটী বিশেষ যত্ন কিংবা সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইতেছে না, কারণ বহু স্থানই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখা গেল। শ্রীরঙ্গমের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম।

প্রাকৃতিক বর্ণনা।

একাধারে এইরূপ সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। রজত-সলিলা কাবেরী নদী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় শ্রীরঙ্গমের ক্ষুদ্র দেহখানিকে বেষ্টন করিয়া সাগরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছেন! প্রতি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে তদীয় প্রীতিরাশি উছলিয়া পড়িতেছে। তীরস্থিত বিটপীরাজির শ্যামল ছায়া নদী বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া নর্ত্তনশীল। অদূরস্থিত পাহাড়গুলি মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এ অঞ্চলে যে দিকেই দৃষ্টি কর দেখিতে পাইবে যে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ সকল উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। ত্রিচিনপল্লী হইতে এ স্থানে আসিতে ঝট্‌কা এবং গো-যান উভয়ই পাওয়া যায়।

বশিষ্ঠ দ্বৈত দর্শন-মত-সংস্থাপক সুবিখ্যাত রামানুজ এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলিয়াও শ্রীরঙ্গম বিশেষ বিখ্যাত। কিংবদন্তী এইরূপ যে তিনি ১২০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অত্রত্য একটী মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার বসিবার বেদী অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ভানুদেব ধীরে ধীরে যখন অস্তাচলে গমন করিতে-ছিলেন, দিনান্তের শান্ত মধুর মূর্ত্তি যখন প্রদোষের ধূসরছায়ারগুণ্ঠনে ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন সূর্য্যদেবের সেই স্তিমিত-লোহিত-রশ্মি-



শয়নমূর্ত্তি—শ্রীরঙ্গম্‌।

কুন্তলীন প্রেস।

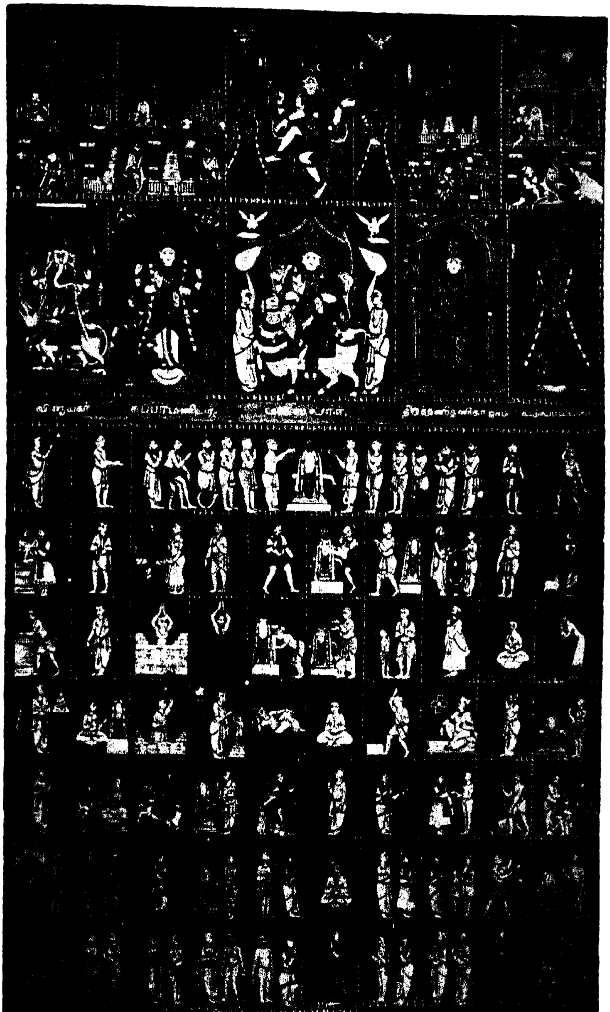
প্রদীপ্ত শ্রীরঙ্গমের মন্দির চূড়ার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ঝট্কারোহণে ত্রিচিনপল্লী ফোর্ট ষ্টেসনাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, যে ধর্ম্ম প্রাণ ভারতবাসী ধর্ম্মের জন্য হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত অতুল্য কীর্ত্তি গরিমা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও জাতিয়ত্বের সংকীর্ণ ভিত্তিকে চূড়মার করিয়া ধর্ম্মের মহিমায় গৌরব প্রভাবে একতার সুমহান্ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুজাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন না! আমরা একটী পর্ব্বোপলক্ষে আসিয়াছিলাম, এখানে বাঙ্গালা কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুতুলের ন্যায় সুন্দর সুন্দর পুতুল বিক্রেয় হয়। কষ্টি প্রস্তরের বহু সুন্দর সুন্দর থাম মন্দির মধ্যে আছে।

বিজয়নগর।

আমরা কোচীন দর্শনান্তে পুনরায় ইরোডে ফিরিয়া আসিয়া সেখান হইতে প্রাচীন বিজয়নগর বা হাম্পীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিবার উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। পথে আরকোনাম, রেণীগুণ্টা, গণ্টুকাল ইত্যাদি স্থান দর্শন করিয়াছিলাম। এ সমুদয় স্থানে দর্শন যোগ্য কিছু নাই বলিয়া তাহাদের কোনও বিবরণ প্রদত্ত হইল না। রাত্রি বারো ঘটিকার সময় আমরা হস্‌পেট পঁহুছিলাম। হস্‌পেট হইতে হাম্পি বা প্রাচীন বিদ্যা-নগরের (বিজয়নগর) ধ্বংসাবশেষ নয় মাইল দূরে অবস্থিত।

পথের বর্ণনা।

আমরা রাত্রিতেই গো-যানারোহণে হাম্পির দিকে রওয়ানা হইলাম। রজনী গাঢ় অন্ধকারময়ী, পঞ্চমীর ক্ষীণচাঁদ বহুক্ষণ হয় অস্ত গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা তিন চারি জন আরোহী নানাবিধ গল্প করিতে করিতে যাইতেছি, গো-যানের সেই ঢেকস্ ঢেকস্ শব্দ, শকট-চালকের তাহাদের উপর প্রীতি সম্ভাষণ ও মৃদু-পবন-কম্পিত বৃক্ষ পত্রের সর্ সর্ শব্দ ভিন্ন সেই নীরব নিশাথে আর কিছুই শ্রুত হইতেছিল না। মাঝে মাঝে আমাদের মনে দস্যুভীতিও জাগিতেছিল, শকট-চালকও পূর্ব্বেই সে কথা আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন কীর্ত্তিশালিনী নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিবার জন্য আমাদের প্রাণে এমনি আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল যে আমরা পূর্ব্বে সে সকল বিভীষিকাময়ী কল্পনা মনের মধ্যে স্থান দিবার অবসর পাই নাই। আর প্রত্যূষে পঁহুছিতে পারিলে দেখিবার পক্ষেও সুবিধা হইবে বলিয়া ষ্টেসনে অবস্থান পূর্ব্বক কালক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন পথি পার্শ্বস্থ বিজন অরণ্যানীর নীরব গম্ভীর ভীতিপ্রদ ভাব দর্শনে হৃদয় আতঙ্কিত হইতেছিল। বিপদে পড়িলেই লোকে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া থাকে, আমরাও এখন সেই জগৎপাতা জগদ্দীশ্বরই আমাদের রক্ষা করিবেন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, এবং একে অন্যের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া কোনও রূপে নিদ্রা-সুন্দরীকে



শ্রীরঙ্গমের শৈবমন্দিরে শিবভক্তগণের অঙ্কিত মূর্ত্তি।

কুন্তলীন প্রেস।

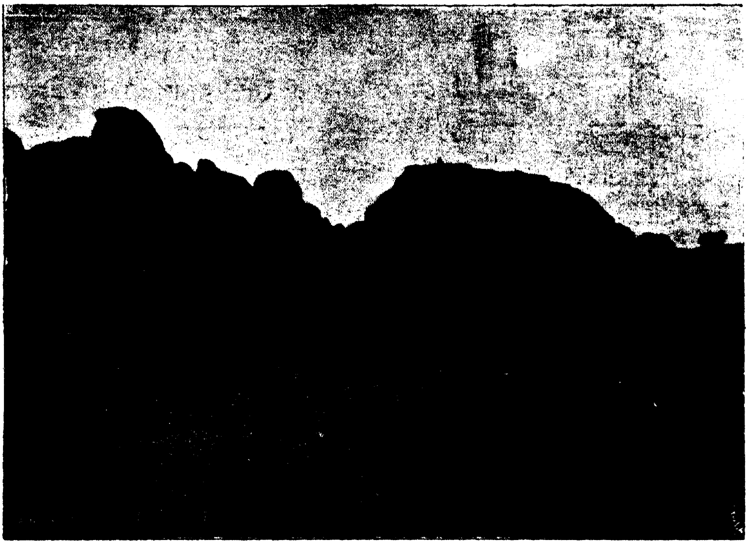
আহ্বান করিতে লাগিলাম, সুন্দরী ভক্তবৎসলা, আমাদিগকে স্নেহদানে বঞ্চিত করিলেন না। বাটীতে দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শুইয়াও যে আরাম পাই নাই, পাঠক বিস্মিত হইবেন না যে গো-যানের সেই ললিত মধুর প্রীতির দোলনির মধ্যে অপূর্ব্ব শয্যায় শুইয়াও সে শান্তি অনুভব করিয়াছিলাম।

পূর্ব্ব গগনে যখন রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিতেছিল, যখন শুকতারা সারানিশি জাগরিত থাকিয়া ধীরে ধীরে গৃহে যাইবার জন্য অদৃশ্য হইতেছিল, বিহগগণ নিজ নিজ কুলায়ে থাকিয়া দিগন্ত ছাপিয়া ঝঙ্কার দিতেছিল, তখন আমরা শরদের সেই সুন্দর নির্ম্মল প্রভাতে হাম্পিতে উপনীত হইলাম।

হাম্পা মান্দ্রাজের বেল্লরী জেলার অন্তর্গত। বেল্লরী হইতে ইহা ৩৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বেগশালিনী তুঙ্গাভদ্রা নদী হাম্পির চরণধৌত করিয়া প্রবাহিতা, ইহার দক্ষিণতীরে হাম্পি বিরাজিত। প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট ভূমিখণ্ডের পরিমাণ ৯বর্গ মাইল। এই স্থানেই একদিন প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর রাজবংশের রাজধানী ছিল, কিন্তু কালের অচিন্তনীয় লীলাকৌশলে এখন তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া একটী বৃহৎ গণ্ডগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছে। যে স্থলে এক কালে রাজধানী বিজয়নগর ছিল, তাহা এখন বিজয়নগর নামে পরিচিত না হইয়া, উহার নিকটস্থ হাম্পি নামক গ্রামের নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। যে সমুদয় ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা দৃষ্টেই প্রাচীন সুমহান্ কীর্ত্তি ও বৃহত্ত্বের বিবরণ উপলব্ধি করা যায়।

প্রাচীন বিজয় নগরের কথা।

প্রাচীনকালে বিজয়নগরের পরিসর, সুপ্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য প্রাসাদ মন্দির ও মনোহর সৌধমালায় ইহা বিশ্বপর্য্যটকগণকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। তখন এই নগর চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৪ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং ইহার রক্ষার জন্য সীমান্ত ভাগ সমূহ অনেকগুলি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য করা হইয়াছিল। এই নগরীর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী Edwards Barbessa ও Caesar Frederic লিখিয়াছিলেন যে এইরূপ সুবৃহৎ ধনজন ও বাণিজ্য সমৃদ্ধিপূর্ণ মহানগরী পৃথিবীতেই অতি বিরল ছিল।



বর্ত্তমান বিজয়নগরের সাধারণ দৃশ্য।

রুসিয়ার জার সিজার ফ্রেডারিক লিখিয়াছেন যে "আমি অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, অনেক দেশ ও রাজধানী এবং রাজপ্রাসাদ অবলোকন করিয়াছি কিন্তু এই সুমহান বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদের সহিত সে সকলের তুলনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। এই প্রাসাদে প্রবেশ করিবার জন্য নয়টী সিংহদ্বার আছে। প্রথমে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে গমন করিলে সেনাপতি ও সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত পাঁচটী দ্বার দেখিতে পাইবে, এই পঞ্চদ্বার অতিক্রম করিলে উহার অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত চারিটী ক্ষুদ্র দ্বার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, এই সমুদয় দ্বারগুলি দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ দ্বারবানগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ক্রমে ক্রমে সকল দ্বার অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সুসজ্জিত ও সুবিস্তৃত রাজপ্রাসাদ তোমার নেত্র-পথে পতিত হইয়া তোমাকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিবে।" নিকোলো কোণ্টি (Nicolo Conty) নামক একজন ইটালী দেশীয় পর্য্যাটক ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ, এই সুদীর্ঘকাল ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি বিজয়নগরের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "The great city of Bizenegalia is situated near very steep mountains. The circumference of the

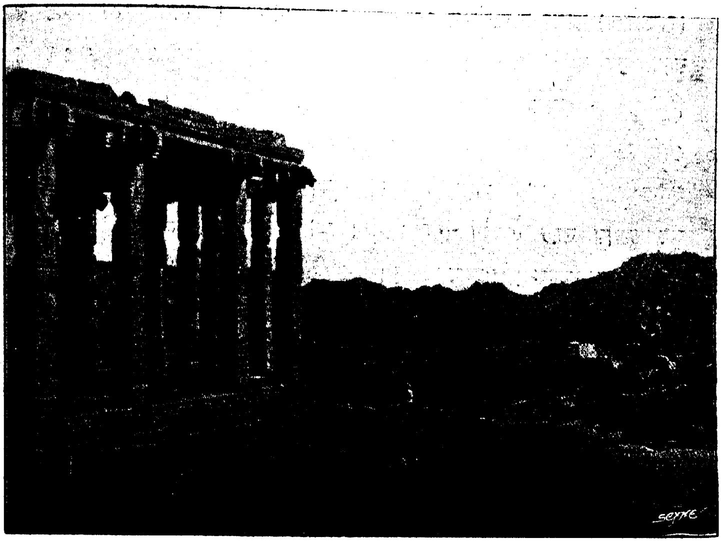
city is sixty miles, its walls are carried up to the mountains and enclose the valleys at their foot, so that its extent is thereby increased. In this city there are estimated to be ninety thousand men fit to bear arms." পাঠক! একবার মানস-নেত্রে প্রাচীন বিজয়নগরের বিশালত্ব কল্পনা করিয়া লউন। যখন এই নগরের সমৃদ্ধি ছিল, তখন নানা বিভিন্ন দেশ হইতে বহু দ্রব্যাদি এ স্থানে বিক্রয়ার্থ আনীত হইত। সে সময়ে পেগু হইতে হীরক ও চুনি, চীন, আলেকজান্দ্রিয়া ও কূনাবার হইতে রেশম, মালবার হইতে কর্পূর, মৃগনাভি, পিপুল, চন্দন ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী হইত।

আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সে দিকেই বিধ্বস্ত কীর্ত্তি সমূহ আমাদের নয়ন-গোচর হইতেছে। এ সকল অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শনে পূর্ব্বে কোন্ কোন্ কার্য্যে কোন্ কোন্‌টি ব্যবহৃত হইত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এ সময় লর্ড কার্জ্জনের আদেশ ক্রমে জঙ্গল সমূহ পরিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ উদ্ধারের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, কাজেই আমরা বিশেষ ভাবে ইহার বহু স্থান দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। লর্ড কার্জ্জন ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান সমূহের উদ্ধারে যত্নপরায়ণ হওয়ায় অনেক লুপ্ত স্থান সমূহ পুনরায় জনসাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত ও প্রাচীন মঠ, মন্দির ও মস্‌জিদ ইত্যাদি সুসংস্কৃত হইয়া নবকলেবর ধারণ করিতেছে। আমরা দেবমন্দির, অন্দরখণ্ডের স্থান, স্নানাগার, তহখানা বা ঠাণ্ডিখানা, দরবারগৃহ, হস্তীশালা, বেশ্যাপল্লী, বাজার ইত্যাদি দর্শন করিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন প্রাঙ্গণভূমি এখনও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেস্থানে অদ্যাপিও উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে কমলাপুর ও আনগুণ্ডি পর্য্যন্ত নয় মাইল বিস্তৃত স্থান পর্য্যন্ত বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কমলাপুরের সন্নিকটে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত জল-প্রণালী ও তন্নিকটস্থ একটী সুন্দর অট্টালিকা মধ্যে বৃহৎ টব দেখিতে পাওয়া যায়, এই অট্টালিকাকে স্নানাগার বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। বেশ্যা-পল্লীর অট্টালিকা সমূহ অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। এস্থানে বহু দেব-মন্দির বিরাজমান, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ ফুট উচ্চ একটী শিবমূর্ত্তি বিশেষ-



হস্তীশালা।

রূপে উল্লেখ যোগ্য। এই শিবমূর্ত্তির নাম "পদ্মাবতীশ্বর" এবং এই মন্দির বিরূপাক্ষ মন্দির নামে অভিহিত। এখনও এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে এই মন্দির মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য স্বামীর সময়ে নির্ম্মিত। তাঁহার উপাসনার স্থান ও সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহার শিষ্যেরা এখন শঙ্করাচারী নামে পরিচিত। তাঁহারা এখনও বিরূপাক্ষ মন্দিরের একাংশে বাস করিয়া থাকেন। এখানে যে সকল মন্দির এখনও কতকাংশে নিজ অস্তিত্ব লইয়া বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামস্বামী, বিঠোবা ও নরসিংহস্বামীর মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। এখনও এই দেব-মন্দিরগুলির শিল্প-নৈপুণ্য দর্শন করিলে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য শিল্পের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিয়া আপনা হইতেই হৃদয়ে সেই সমুদয় শিল্পীগণের স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে ইচ্ছা হয়। বিজয়নগরের বিট্ঠল বা বিঠোবা স্বামীর মন্দিরের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী মন্দির আর ভারতবর্ষে নাই। নরসিংহ অবতারের প্রকাণ্ড মূর্ত্তিটি রাজা কৃষ্ণদেব রায় কর্ত্তৃক ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার



প্রাচীন রাজপথের একাংশ।

সম্বন্ধে সিউয়েল সাহেব তৎপ্রণীত বিজয়নগরের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে ঃ—"It was hewn out of a single boulder of granite, which lay near the south-western angle of the Krishna Swami temple, and the king bestowed a grant of lands for its maintenance. Though it has been grievously injured, * * it is still a most striking object."

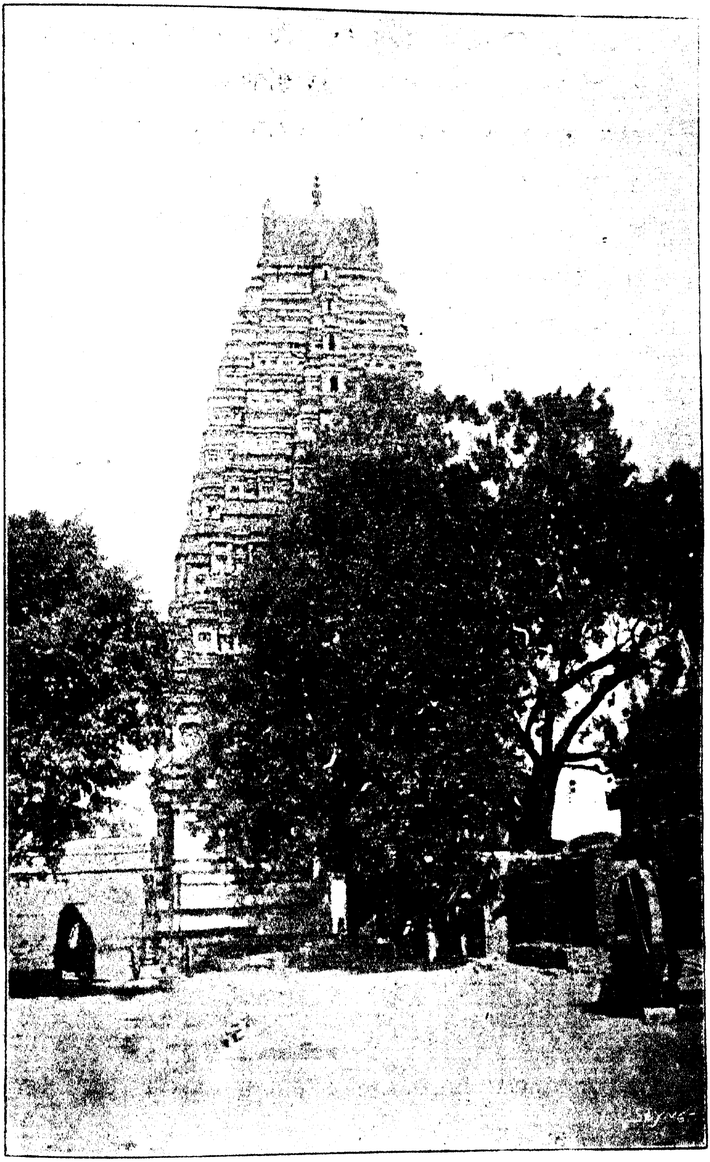
পাঠক! যদি শ্মশানের ভীষণত্বের মধ্যেও আনন্দ উপলব্ধি করিতে চাও, যদি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে কালের ভীষণ অট্টহাসি শুনিতে চাও, তবে এইখানে আইস। চারিদিকের ভীষণ দৃশ্যের মধ্যে এ সমুদয় প্রাচীন রাজবংশের কীর্ত্তি গরিমা দর্শনে তোমার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিবে। ভারতের সুমহান্ অতীত গৌরব-কাহিনী ভাবিয়া তোমাকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইবে। সত্য সত্যই বিজয়নগর এক মহাশ্মশান।

গোপুরাম, শিবালয় ও তাহার সম্মুখস্থ মণ্ডপ ও অতি বৃহৎ, ইহা গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত। এই মন্দিরের সম্মুখ ভাগে তিপ্পাকুলম্

(পুস্করিণী) উহার চারিতীরে গ্রেনাইট প্রস্তরে বাঁধান। এখানে প্রতি বৎসর রথোৎসব হইয়া থাকে। এক স্থানে একটী ৪১৷৷০ ফিট লম্বা এবং চারি ফিট চওড়া কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড প্রাচীর ও গৃহের দেওয়ালে সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালে এই গুলির দ্বারা যে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইত তাহা এখন অনুমান করা সুকঠিন। রাজপ্রাসাদের কিছু দূরে তুঙ্গাভদ্রার তটে একটী বিষ্ণু-মন্দির আছে, উহা এখনও নষ্ট হয় নাই, ইহার মধ্যে কতকগুলি স্তম্ভ আছে। প্রত্যেকটী স্তম্ভই নানাবিধ কারুকার্য্য পরিশোভিত। একটী মন্দিরে রামায়ণের ঘটনাবলীর চিত্র দর্শন করিলাম।

তুঙ্গাভদ্রার অপর তটে ঋষ্য-মুখ পর্ব্বত। এপার হইতে হরিৎলতা পল্লব-সমাচ্ছন্ন, নানাজাতিয় তরুরাজি পরিশোভিত গিরিশ্রেণী বড়ই মনোরম দেখায়। রামস্বামীর মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে তুঙ্গাভদ্রার তীরে সুপ্রসিদ্ধ বিট্‌ঠল রাওয়ের মন্দির অবস্থিত; এ মন্দিরের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তালিকোটার যুদ্ধাবসানে মুসলমানগণ বিজয়নগর ধ্বংস করিয়া যখন দেবালয় লুণ্ঠন করে, তখন তাহারা ধনপ্রাপ্তির আশায় মূল স্থান হইতে দেবমুর্ত্তি নিক্ষিপ্ত করিয়া মন্দিরের মেজ পর্য্যন্ত খনন করিয়াছিল। এখন আর বিট্‌ঠল দেবের শ্রীমূর্ত্তি পর্য্যাটকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, জন-প্রবাদ এইরূপ যে মুসলমানের অত্যাচারের পর হইতেই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। বিজয়নগরের প্রাচীন সমৃদ্ধির সময়ের বিশাল-কীর্ত্তি প্রাচীন দুর্গটির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান, এই দুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যেই রাজভবন, দেবালয়, হস্তীশালা, উষ্ট্রশালা ইত্যাদি কঙ্কাল-দেহে বিরাজিত।

লোক চলিয়া গেলে যেমন ক্ষীণ পথ পড়িয়া থাকে, তদ্রূপ এই বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষের যে কীর্ত্তি সমুদয় জীর্ণদেহে বিদ্যমান, আমরা তাহাদের মধ্য হইতেই প্রাচীনের গৌরব বৈভবময় ইতিহাস পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারতের বীর্য্য ও তেজ, আচার ও পদ্ধতি, শিল্প ও স্থাপত্যের, বীরত্বের ও ধীরত্বের মহিমময় পুরাবৃত্ত জ্ঞাত হইয়া বিস্ময়ে পুলকিত হই। এখনও হাম্পির স্থানে স্থানে প্রাচীন রাজগণের গৌরব প্রকাশক শিলালিপি সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে বিজয় নগর বিশেষ বিখ্যাত স্থান। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বিজয়



কৃষ্ণদেব রায়ের নির্ম্মিত দেবমন্দির—বিজয় নগর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নগরের প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয় রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, ইহা পাঠকগণের বিরক্তির কারণ না হইয়া তৃপ্তিরই কারণ হইবে।

বিজয়নগরের প্রাচীন ইতিহাস।

এক সময়ে বিজয় নগর বলিলে দাক্ষিণাত্যের একটী সুবিশাল সাম্রাজ্য বুঝাইত। তখন ইহা বলে, বিক্রমে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধনে, মানে, প্রভুত্বে প্রত্যেক বিষয়েই দাক্ষিণাত্যের মুকুট-মণি স্বরূপ ছিল। ঐতিহাসিকও প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারীগণ এই স্থানকে বিবিধ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার সর্ব্ব প্রাচীন নাম বিজয়নগর, পরে ইহা বিদ্যানগর নামে ও সর্ব্বসাধারণ্যে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল। এই নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে বহুপ্রকার জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে, সে সকলের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।* নৃপতি বিজয় ধ্বজ ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তুঙ্গাভদ্রার দক্ষিণ তীরে স্বীয় নামানুসারে এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার অপর নাম "বিদ্যাজন বা বিদ্যাজনু"। এই নগর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে একদা রাজা দেবরায় তুঙ্গাভদ্রা নদীর তটস্থ অরণ্যময় প্রদেশে মৃগয়া করিতে যান, সে সময়ে তুঙ্গাভদ্রার তীর অত্যন্ত শ্বাপদ-সঙ্কুল ছিল। তিনি এই স্থানে আসিয়া একটী ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইয়া পড়েন। দেবরায় মৃগয়ার জন্য সঙ্গে যে সকল কুকুর লইয়া গিয়াছিলেন সেই সকল ভীমাকৃতি কুকুর সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরগোষ দ্বারা আহত হইতেছে, তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন।

যখন তিনি এই অভাবনীয় ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথে তুঙ্গাভদ্রা নদীর তীরে একজন তাপসকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট এই অলৌকিক বিবরণ বিবৃত করিলেন। এই তাপসের নাম মাধবাচার্য্য। মাধবাচার্য্য দেবরায়ের মুখে এই সংবাদ শ্রুত হইয়া বলিলেন "এই অরণ্য মধ্যে এমন স্থান কোথায় আছে তুমি আমাকে দেখাইতে পার?" রাজা কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাধবাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া

* যাঁহারা বিজয়নগরের বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক Sewell সাহেব কৃত "A forgotten Empire" পাঠ করিবেন।



বিঠ্ঠল স্বামীর মন্দিরাভ্যন্তর।

সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তাপস কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বলিলেন "মহারাজ, এ অতি উত্তম স্থান, তুমি এ স্থানে অচিরে রাজ-প্রাসাদ ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া তোমার রাজধানী স্থাপন কর, এই স্থানে তোমার রাজধানী নির্ম্মিত হইলে বলবীর্য্য ও শক্তি প্রভাবে তুমি অজেয় হইবে। দেবরায় মাধবাচার্য্যের আদেশ মতে এই স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহার স্মৃতি ও সম্মান রক্ষার্থে এই স্থানকে "বিদ্যাজন" বা বিদ্যাজম্মু" বলিয়া অভিহিত করেন।

বিজয়নগর সংস্থাপক বিজয়ধ্বজের বংশাবলী আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশোদ্ভব নন্দ মহারাজ আনগুণ্ডীর রাজ-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি তদীয় মাতৃভূমি বাহ্লিক দেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়া স্বীয় পরাক্রমে কিষ্কিন্ধ্যায় আনগুণ্ডী রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। নন্দ মহারাজার দেহান্তে চালুক্য মহারাজ সিংহাসনারোহণ করিয়া ১০৭৬—১১১৭



উগ্র নরসিংহ—বিজয়নগর

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার বিজ্জলরায়, বিজয়ধ্বজ ও বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ বিজ্জলরায় কল্যাণপুরে যাইয়া এক স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। চালুক্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুবর্দ্ধন সম্বন্ধে কিছুই অবগত হওয়া যায় না। বিজয়ধ্বজ বিজয়নগর স্থাপন করিয়া মাত্র পাঁচ বৎসর জগতের আলো দর্শন করিয়াছিলেন, ইনি ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কালকবলে নিপতিত হন।

ইঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র অনুবেম রাজাসন অলঙ্কৃত করেন ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুবেমের মৃত্যু হইলে ইঁহার পুত্র নরসিংহ দেবরায় রাজদণ্ড গ্রহণ করেন ইনি ৬৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত রাজাসনে সমাসীন ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়া মুসলমানগণ ইঁহার নামের সহিত রাজ্যের সম্বন্ধ দৃঢ়ীকরণ মানসে বিজয়নগরকে নরসিংহ বলিয়া উল্লেখ করিত। ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাত্মার মৃত্যু হইলে উক্ত অব্দেই রামদেব রায় সিংহাসন অধিকার করেন। রামদেব রায় ১২৪৬—১২৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতাপরায়ের দেহান্তে উক্ত খ্রীষ্টাব্দেই তদীয় পুত্র জম্বুকেশ্বর রায় সিংহাসনারোহণ করেন, ইনি ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া অপুত্রক কাল কবলে পতিত হন, ইঁহার মৃত্যুতে সমগ্র দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়; এই বিপদ সময়ে বিজ্ঞ ও বিখ্যাত মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরী মঠ হইতে বিজয়নগরে আগমন করিয়া স্বীয় নামানুসারে বিজয়নগরের ভগ্নাবশেষের উপর বিদ্যানগর স্থাপন করেন।

এস্থানে মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য স্বামীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহাঁর বিষয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী নানাবিধ মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী শ্রীঙ্গেরা মঠের মহন্ত ছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য একব্যক্তি, কিন্তু কাশীর পণ্ডিতরা বলেন যে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য দুই সহোদর, আমাদের সে সব বিষয়ের আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না।

মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য।

মাধবাচার্য্য একজন ভবিষ্যতদর্শী পরম জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন,

কিন্তু দারিদ্র্যের দারুণ কষাঘাতে ইঁহাকে সতত ম্রিয়মাণ থাকিতে হইত। ধনলাভার্থ ইনি হাম্পি নগরস্থ ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে দারুণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন, ইঁহার স্তবে দেবী স্বপ্নে ইঁহাকে আদেশ দেন যে "এ জন্মে তোমার ধনলাভ হইবে না; পর-জন্মে ধনলাভ করিতে পারিবে।"

মাধব দেবীর স্বপ্নাদেশ অবগত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই হাম্পী নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৃঙ্গেরী মঠে উপনীত হন এবং তথায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং পরিশেষে এই মঠেই জগদ্গুরু বিদ্যারণ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাধবাচার্য্য জম্বুকেশ্বরের মৃত্যুর পর যখন জ্ঞাত হইলেন যে সমগ্র দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, মুসলমানগণ স্বকীয় আধিপত্য দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন এই মহাতপা ধ্যানপয়ায়ণ মহাপুরুষের ধ্যানাসন বিচলিত হইল, তিনি শৃঙ্গেরী মঠের নিভৃত সাধনপীঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বিজয়নগরের রাজসিংহাসনস্থ বৈষয়িক জঞ্জালরাশি দূরীকরণার্থ পুনরায় অসীম বলশালিনী শক্তিরূপা জগন্মাতা ভুবনেশ্বরীর কমল চরণ-প্রান্তে হাম্পিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মার নিকট মোক্ষলাভ ও অধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইল না। মাতৃভূমির প্রিয়-সন্তান আজ মাতৃভূমির মঙ্গলোদ্দেশ্যে ধর্ম্ম, মোক্ষ বিসর্জ্জন দিয়া মায়ের চরণপ্রান্তে দেশের বেদনা জানাইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, অবশেষে এই সর্ব্বত্যাগী তাপসের ঐকান্তিক ভক্তির আহ্বানে জগন্মাতা বিচলিতা হইলেন, তিনি বিদ্যারণ্যকে চিন্ময়ীভাবে দর্শন দিয়া বলিলেন "ভয় নাই বৎস, তোমার মহৎকামনা পূর্ণ হইবে, তুমি মাতৃভূমির মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হইবে। তুমি যখন মাধবাচার্য্য ছিলে, তখন আমি তোমাকে ধন প্রদান করি নাই, এখন তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, তুমি আর এখন ধনপ্রার্থী মাধবাচার্য্য নহ, এখন তুমি সর্ব্বত্যাগী নিষ্কাম সন্ন্যাসী, তোমার এই নবজীবন লাভের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইল; যাও বৎস, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তোমার দ্বারা বিজয়নগর দিন দিন শ্রীসম্পন্ন হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিতে পারগ হইবে।" বিদ্যারণ্য মনোরথ



দুর্গ-তোরণ—বিজয়নগর

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

পূর্ণ হওয়াতে প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে জগন্মাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। বিদ্যারণ্য স্বামী মহাদেবীর শুভ আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া অরাজক বিশাল বিজয়নগরের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। এতদিন সংসারে বীতস্পৃহ যে তাপস জাগতিক সমুদয় ঐশ্বর্য্য ও প্রলোভন হইতে দূরে রহিয়া নিষ্কাম সাধনায় নিরত ছিলেন, আজ সেই নিষ্কাম তাপসই রাজ্যের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। এই মাহাত্মা সাম্রাজ্যের হিতকল্পে বিগতস্পৃহ হইয়াও জীবন সমর্পণ করিলেন। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাত্মার নামানুসারে বিজয়নগরের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যানগরে পরিণত হইল।

বিদ্যানগর স্থাপিত হইলে পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত মাধবাচার্য্য নিজে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও রাজা বা মহারাজা নামে অভিহিত হন নাই।

এই দশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া তিনি সঙ্গম রাজ-বংশকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করতঃ নিজে মন্ত্রীর কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সঙ্গমরাজ প্রথম হরিহর নবস্থাপিত বিদ্যানগরের প্রথম রাজা। ইঁহারা পঞ্চভ্রাতা ছিলেন, হরিহরের অপর চারি সহোদরের নাম কম্প, বুক্ক, মারপ্প ও মুদ্দপ্প। ইঁহারা সকলেই সমর-নিপুণ ও বিশ্বাসী ছিলেন। মহারাজা হরিহর নিতান্ত বিচক্ষণ লোক ছিলেন, ভ্রাতাদের মনে যাহাতে কোনওরূপ অশান্তির ভাব না আসে, সেজন্য ইঁহাদিগের উপরে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য সমূহ অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা একদিকে যেমন রাজকার্য্যের সুবিধা হইল, অন্যদিকে আবার তেমনি ভ্রাতৃগণ ও রাজ্যের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অবগত হইলেন। এই চারি ভ্রাতার মধ্যে প্রথম বুক্কের নাম ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধ, ইনি অসাধারণ যোদ্ধা এবং সমর-নিপুণ ছিলেন। রাজা হরিহরের সোমন নামে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, হরিহরের জীব-দ্দশাতেই তাহার মৃত্যু হওয়ায় বুক্কই যুবরাজের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

এই পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডবের ন্যায় রাজগুরু মাধবাচার্য্যের পরামর্শানু-সারে বহুদিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ফেরিস্তা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে হরিহর হিন্দুরাজগণের সহিত সমবেত হইয়া দিল্লীর সুলতানকে

করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলের বরঙ্গল, দেবগিরি, হোয়শল, বনানা প্রভৃতি বহুস্থান লাভ করেন।

১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিহরের মৃত্যু হইলে পর বুক্করায় সিংহাসনারোহণ করেন। বুক্করায় অত্যন্ত তেজস্বী এবং শাসনদক্ষ কর্ম্মঠ নরপতি ছিলেন তাঁহার শাসন প্রভাবে সমুদয় দাক্ষিণাত্য বিকম্পিত হইত। একখানি তাম্র শাসনে এইরূপ লিখিত আছে যে বুক্কের শাসন সময়ে প্রজাদের কোনওরূপ কষ্ট ছিল না, ধরণী শস্যশালিনী ছিলেন, জন-সমাজে সুখের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, সমগ্র দেশে ধনে ধান্যে ও অতুল ঐশ্বর্য্যে ভারতের গৌরব স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে বিজয়নগর সত্য সত্যই স্বীয় নামের সার্থকতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগরের সুবিশাল অভেদ্য দুর্গ, অগণন সৈন্য, শত শত হস্তী ও বিপুল-যুদ্ধ-সম্ভার অন্যান্য নরপতিগণকে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিকম্পিত করিত। বুক্করায়ের অন্য তিন ভ্রাতাও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যের হিতসাধনে মনোযোগী ছিলেন।

১৩৬১ সালে মহারাজ বুক্কের সহিত দিল্লীর সুলতানের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বিস্তর ক্ষতি হয়। এই যুদ্ধের পরে শীঘ্র আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ঘটে নাই।

মল্লিনাথ নামে বুক্কের একজন সেনাপতি ছিল, তিনি অত্যন্ত বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার নামে মুসলমান নৃপতিগণের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইত। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেনাপতির পদে সমারূঢ় ছিলেন। এই বীরশ্রেষ্ঠ হিন্দু সেনাপতি আলাউদ্দীন ও মহম্মদ সাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন।

ফেরিস্তায় বুক্করায় কৃষ্ণরায় নামে এবং মল্লিনাথ হাজিমল নামে অভিহিত হইয়াছেন। এরূপ আরও অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বুক্করায়ের দেহাবসানে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় হরিহর সিংহসনারোহণ করেন। বুক্করায়ের দুই পত্নীর গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর গৌরম্বিকার পুত্র হরিহর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি প্রায় কুড়ি বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য

বিদ্যারণ্যের ভ্রাতা সায়ন ইঁহার অমাত্য ছিলেন। দ্বিতীয় হরিহর অত্যন্ত উদারমতাবলম্বী এবং দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, তিনি দেব মন্দির সমূহে যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ইঁহার হৃদয়ে জাতিগত বিদ্বেষ ভাব ছিল না, ইনি সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্ম মতের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। মুদা, এরুগ, গুণ্ডা নামে ইহার তিন জন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিল। মহীসুর, ধারবার, কাঞ্চীপুর, চিঙ্গলপৎ ও ত্রিচিনাপল্লী পর্য্যন্ত ইহার অধিকার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক ছিলেন, তিন পুত্র রাখিয়া এই মহাত্মা কাল-কবলে নিপাতিত হন। ইঁহার পুত্রের মধ্যে বুক্করায় (২) বা দেবরায় ১৪০৪—১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দেবরায়ের পুত্র দিল্লীর সুলতানের শঠতায় সরানজী নামক জনৈক কাজী ও তাহার সহচরগণ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে নিহত হন। ইঁহারা জনৈকা নর্ত্তকীর সহায়তায় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে উপনীত হয় এবং নানা-প্রকারের ক্রীড়া কৌতুক দেখাইতে দেখাইতে অবশেষে তরবারির ক্রীড়া দেখাইবার ছলনায় অসি সঞ্চালন করিয়া দেবরায়ের পুত্রকে নিহত করিয়া ফেলে। দেবরায় রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরদিন সসৈন্যে নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মুসলমান সৈন্যগণ বহু ধন রত্নাদি লুণ্ঠনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এই সময় হইতেই বিদ্যানগর-রাজবংশের অবনতির সূত্রপাত হয়। কিন্তু ইহার পরেও সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত এই বিখ্যাত রাজবংশ আনগুণ্ডি, বল্লুর ও চন্দ্রগিরিতে আপনাদের শাসন-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বীজাপুর, আহ্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বেদারের মুসলমান রাজারা একত্রিত হইয়া বিজয়নগর আক্রমণ করেন। কৃষ্ণানদীর দশ মাইল দূরে তালিকোট নামক স্থানে জানুয়ারী মাসের ২৩শে তারিখে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, দুই পক্ষেই বহু লক্ষ সৈন্য ছিল, কিন্তু সমবেত রাজশক্তির সংঘর্ষে বিজয়নগরের শেষ স্বাধীন নরপতি রামরাজা পরাভূত এবং নির্দ্দয়রূপে নিহত হন। এইরূপে সুদীর্ঘকাল পরে অন্যায়রূপে এই খ্যাতিমান্ রাজবংশের অধঃপতন ঘটে। বিজয়নগর

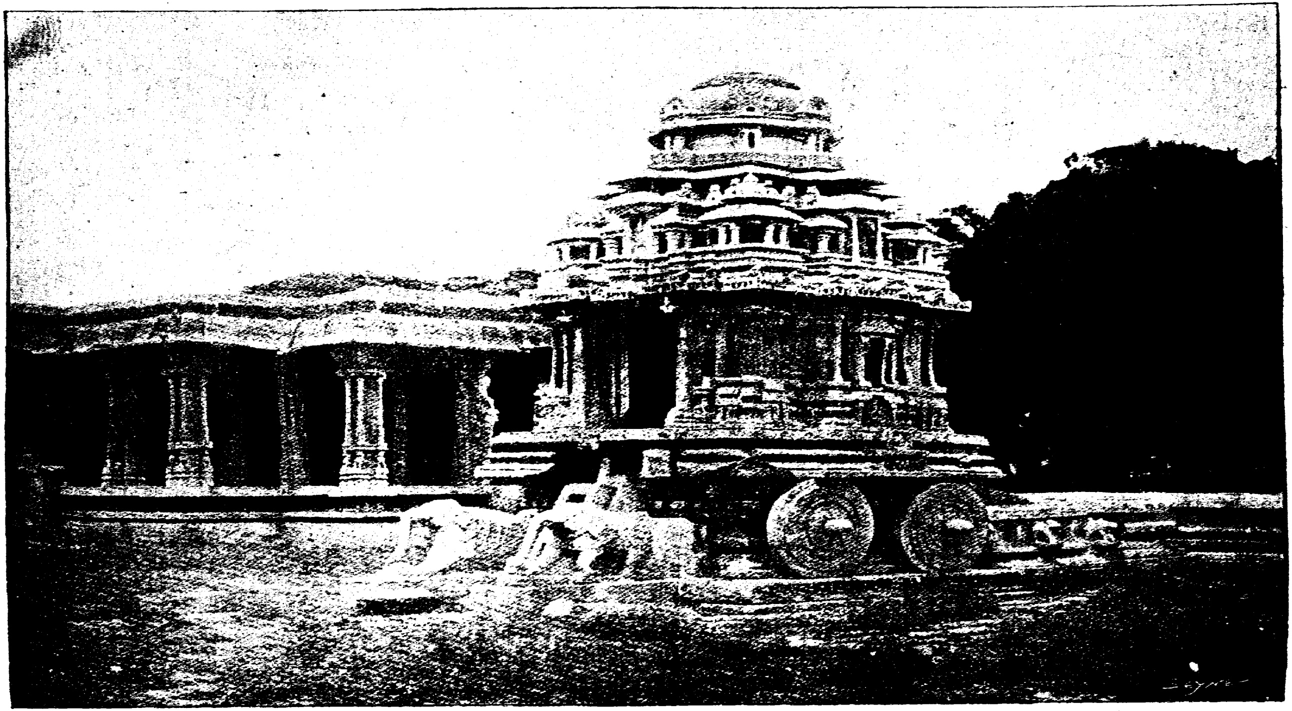
একদিন ভারতের গৌরবস্থল ছিল, কিন্তু অজেয়কালের মহাশক্তির নিকট দেখিতে দেখিতে সমুদয় গৌরব-বীর্য্য অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধের পর প্রায় পাঁচ মাস কাল পর্য্যন্ত মুসলমানেরা বিজয়নগর লুণ্ঠন করিয়াছিল, ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে "The plunder was so great that every private man in the allied army-became rich in gold, Jewels, effects, tents, arms, horses, and slaves, as the Sultans left every person in possession of what he had acquired, only taking elephants for their own use."

বর্ত্তমান অবস্থা।

বর্ত্তমান হাম্পির চতুর্দ্দিকেই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানী। উন্নতশিরে পর্ব্বত সমূহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, চারিদিক নীরব ও নির্জ্জন। তুঙ্গা ভদ্রা পার্ব্বত্য নদী, কাজেই ইহার স্রোত অত্যন্ত প্রখর। নদীর মধ্যে স্থানে স্থানে পাহাড় থাকায় নৌকায় পার হওয়া যায় না, স্রোত-বেগে পাহাড়ে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। একপ্রকার চর্ম্ম নির্ম্মিত চারির ন্যায় ডোলে নদীর অপর পারে যাইতে হয়। হাম্পি অতি ভয়ানক স্থান। এখানে আহার্য্য কিছুই পাওয়া যায় না। দেবালয়ের নিকট সামান্য দুইখানি দোকান আছে, সেখানে অতি সামান্য ও জঘন্য আহার্য্য মিলে। পর্য্যাটকগণের হস্‌পেট হইতে আহার্য্যাদি সংগ্রহ করা আবশ্যক।

বিজয়নগর রাজত্বের অভ্যুত্থানে প্রাচীন ভারতে বহু মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। এই প্রতাপশালী হিন্দু রাজবংশের জন্যই মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্যের সমুদয় অংশ জয় করিতে পারে নাই, এই হিন্দুরাজত্ব ছিল বলিয়া দক্ষিণ ভারত হইতে প্রাচীনকালের যত সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও তদ্রূপ পাওয়া যায় না।

বক্কারাজার পুত্র দ্বিতীয় হরিহরের সময়ে কোনও যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকায় বিজয়নগর প্রভূত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি অতিশয় সুকৌশলে বিজয়নগরের অধিবাসীদিগকে জল যোগাইতেন, এ বিষয়ে বিজয়নগরের ইতিবৃত্ত প্রণেতা সিউয়েল সাহেব লিখিয়াছেন যে "His great work was



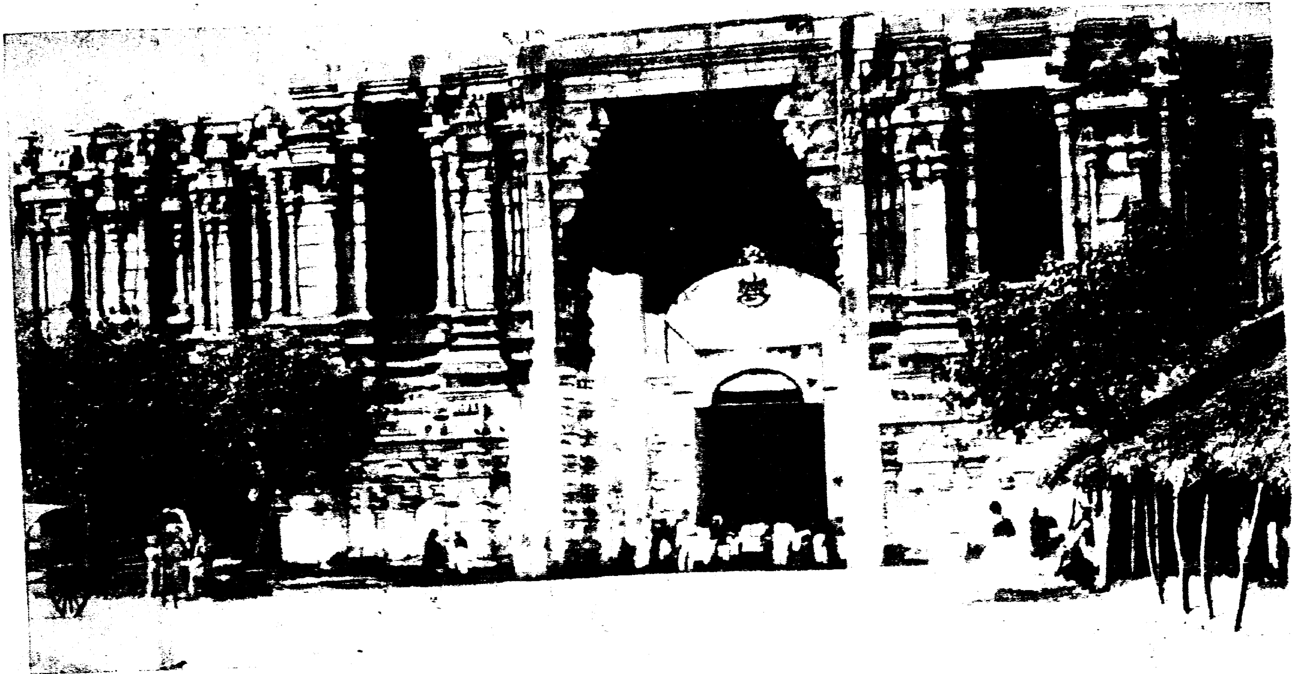
প্রস্তরনির্ম্মিত রথ—বিজয়নগর।

the construction of a huge dam in the Tungabhadra river, and the formation of an aqueduct fifteen miles long from the river into the city. If this be the same Channel that to the present day supplies the fields which occupy so much of the site of the old city, it is a most extraordinary work. For several miles this Channel is cut out of the solid rock at the base of the hills, and is one of the most remarkable irrigation works to be seen in India." বিজয়নগরের হিন্দু নৃপতিগণের শাসনাধীনে প্রজাগণ পরমসুখে কালাতিপাত করিত, তাঁহাদের সময়ে দেশে সামান্য একখণ্ড ভূমিও পতিত ছিলনা। প্রত্যেকেরই বাগান ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূমি ছিল। পথিকদিগের বিশ্রামার্থ প্রতি অৰ্দ্ধমাইল দূরে একএকটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিশ্রাম-শালা, কূপ ও একজন হিন্দু-রক্ষী নিযুক্ত ছিল। দেশে চোর ছিলনা, কারণ চুরি করিলে তজ্জন্য লোকের প্রাণদণ্ড হইত।

প্রকৃত পক্ষেই বিজয়নগরের অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার চিন্তা করিতে গেলে ও তুলনা করিতে গেলে হৃদয় দুঃখেও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হয়! যে নগর দর্শনে একদিন পারস্যাদেশাধিপতির প্রেরিত দূত আবদুররজাক বলিয়াছিলেন "The pupil of the eye has never seen a place like it and the ear of intelligence has never been informed that there existed anything to equal it in the world." সে স্থান এখন জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদ-সঙ্কুল দেখিয়া মনে হয়, "কাল প্রবল চিরদিনও"। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিজয়নগর দর্শন করা উচিত। হিন্দু-সাম্রাজ্যের শ্মশানের ভিতরে ও প্রাচীন স্বাধীনতার যে পবিত্র বীজ নিহিত আছে, তাহা গৌরবের এবং যশের। যাঁহারা একদিন এই সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই গৌরব-বৈভব মণ্ডিত মহান্ নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কি কল্পনা করিয়াছিলেন যে চিরবিজয়ী-কালপ্রভাবে উহা জনহীন হইয়া নিবিড় অরণ্য ও হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি হইবে? জেমস্ ডগলাস

সাহেবের সহিত উপসংহারে আমরাও বলি "Pompeii was less impressive, Canopus less forlorn as a spectacle of fallen greatness than the silence, the solitude and the desolation that fell upon me as I lay under the shadow of a great rock in this weary land of Vijyanagur."*

* Bombay and Western India. VOL. II, page 309. By James Douglas.



মন্দির-তোরণ—শ্রীরঙ্গম।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কিষ্কিন্ধ্যা।

হাম্পি দর্শনান্তে পরদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর হাম্পি হইতে কিষ্কিন্ধ্যা দেখিতে চলিলাম। পূর্ব্বে বিজয়নগর প্রবন্ধে যে চর্ম্ম নির্ম্মিত ডোলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি সেইরূপ একখানা তরীতে আরোহণ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যার তীরে উত্তীর্ণ হইলাম। সম্মুখে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বন-জঙ্গলা-কীর্ণ প্রস্তর গঠিত এই পাহাড় দর্শনে রামায়ণের কথা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। মনে হইল জনক-নন্দিনী সাধ্বী সতী সীতার কাহিনী, এই মহীয়সী রমণীকে সংসার-সাগরের কত দুস্তর তরঙ্গই না উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল! যখন প্রাচীন ভারতের গৌরব ছবি মনে জাগে, তখন সত্য সত্যই হৃদয়ে দারুণ ক্ষোভের ও বিষাদের সঞ্চার হয়। ঋষ্যমুখ পর্ব্বত এখনও আছে, আরো কতকাল থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু যাঁহারা একদিন ইহার প্রতি পাষাণ-অঙ্গে ক্রীড়া কৌতুকের চিহ্ন রাখিয়াছিল, যাঁহাদের বিষাদ-উচ্ছ্বাসে চারিদিকে মর্ম্মবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, হায়! তাঁহারা এখন কোথায়? আমরা প্রথমে মানস সরোবর দর্শন করিলাম, ইহা একটী নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী, জল মলিন ও বিবর্ণ, চারিদিকে নানাজাতিয় বনস্পতি মণ্ডলী ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া ধ্যান নিরত, গাছের ছায়া কালোজলে পতিত হইয়া জলের সুগভীর কালোর উপর আরো একটু মসীরেখা ফেলিয়া দিয়াছে। বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া কচিৎ ক্ষীণ-সূর্য্য-রশ্মি আসিয়া পুকুরের জলে পতিত হইয়া চিক্ চিক্ ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। এই সরোবরের তীরে সময় সময় সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া বাস করেন। একটী উচ্চগিরি শৃঙ্গে অঞ্জনা গুহা। পর্ব্বত-গাত্রে উহা একটী ক্ষুদ্র গহ্বর, জনপ্রবাদ এইরূপ যে রামচন্দ্রের পরমভক্ত বীর হনুমান এই স্থানে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানটি বড়ই জঙ্গলাকীর্ণ। যে দিকে দৃষ্টি করিবে সে দিকেই সারি সারি তরুশ্রেণী স্তরে স্তরে দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা প্রেম-বিহ্বলা লতিকা-সুন্দরী তদীয় প্রেমাস্পদ পাদপ অঙ্গ

বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে দুলিয়া দুলিয়া পুষ্পগুচ্ছ প্রেমোপহার স্বরূপ অর্পণ করিতেছে। কোথাও বা—

নির্ঝরিণী দুষ্টু মেয়ে
কুলু কুলু গেয়ে গেয়ে
লুটিয়ে ছুটিয়ে ধায় পাহাড়ের গায়!
তরুশাখে গাহে পাখী,
আলো খেলে থাকি থাকি
বনের কুসুম ফুটি বনে ঝরে যায়!

এই জন সঞ্চার শূন্য ভীম পর্ব্বত মধ্যস্থিত গম্ভীর সৌন্দর্য্য পাঠক, একবার কল্পনা কর। বিহঙ্গের মধুর কাকলী, নির্ঝরিণীর অবিরাম ঝর্ঝর শব্দ, বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মরিত অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস, মরি! মরি! কি সৌন্দর্য্যরে! আমরা যখন অঞ্জনা-গুহা দূর হইতে দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলাম তখন পশ্চিম গগনাবলম্বী দিনকরের উজ্জ্বল কিরণ দূরস্থিত গিরিগাত্রে ও গিরিশৃঙ্গে পতিত হইয়া একটী স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর আলোকে চতুর্দ্দিক দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল। কিষ্কিন্ধ্যাতে তেমন দর্শনীয় কিছুই নাই। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য অঞ্জনা-গুহা ও মানস সরোবর, তাহাদের মধ্যেও সেরূপ কিছু বিশেষত্ব না থাকায় পাঠকগণের সময় নষ্ট করিলাম না। রামায়ণের বর্ণনানুসারে এইখানেই বালিরাজের রাজধানী ছিল, শ্রীরামচন্দ্র বালিরাজাকে বিনষ্ট করিয়া এই স্থান সুগ্রীবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বালিরাজার বাড়ীর সিংহ দরজার ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীরের বিক্ষিপ্ত প্রস্তর স্তূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অঞ্জনা গুহা পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত, সে স্থানে একটী মন্দির দেখিতে পাইলাম। অত উঁচু পাহাড়ে উঠা তিন চারি ঘণ্টার কমে অসম্ভব। এরূপ ভয়াবহ শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থানে কেহ সহজে যাইতে চাহেনা, কেহ ওখানে আরোহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ, স্থানীয় লোকেরাও আমাদিগকে বারণ করিল। ছোট সুঁড়ি রাস্তা, চারিদিকে কণ্টকাকীর্ণ, পদে পদে সাপের ভয় বন্য মহিষ এবং বন্য শূকরের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোনও পর্য্যাটকের ফিরিবার আশা অতি অল্প। আমাদিগকে একটা শূকর আক্রমণ করিয়াছিল, জগদীশ্বরের কৃপায় লম্ফ দিয়া নিকটস্থ



এক প্রকার গো-যান—দাক্ষিণাত্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

উচ্চ শিলায় আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম। ময়ূরের সংখ্যা এ পর্ব্বতে খুব বেশী, উহাদের কে-কা-রবে অস্থির হইতে হয়। ভানুদেব যখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, তাহার স্তিমিত-লোহিত-রশ্মি যখন সন্ধ্যার আগমন সূচনা করিতেছিল, সে সময়ে আমরা দ্রুতপদে তুঙ্গাভদ্রার তীরে আসিলাম। নৌকায় আরোহণ করিয়া একদল, মাতাল, পাহাড়িয়া স্ত্রী-পুরুষের যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইয়াছিল ইহাদের মাতলামির দরুণ আরোহীদিগকে প্রাণভয়ে ভীত হইতে হইয়াছিল, সেই বিকট-চীৎকার, ও তাহাদের তাণ্ডব নর্ত্তনে ডোল ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল, ডোল চালক কিছুতেই ইহাদিগকে সুস্থির করিতে পারিতেছিল না, আমরা না বুঝি ভাষা, না বুঝি ভাব, কাজেই নীরবে পরিত্রাহি ডাক ডাকিয়া মনে মনে দুর্গানাম জপিতেছিলাম। এই মদমত্তগণের উৎপাতে তুঙ্গাভদ্রার প্রবল স্রোতবেগে নির্দ্ধারিত স্থান হইতে আমাদিগকে বহু দূরে সরিয়া গিয়া অবতরণ করিতে হইয়াছিল। আমরা যে তুঙ্গার প্রখর স্রোতে নিমজ্জিত হই নাই সেজন্য জগৎ পাতা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

যখন তীরে অবতরণ করিলাম, তখন সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকার চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, আকাশে হীরার মত কোটি কোটি তারা নীল চন্দ্রাতপে জ্বলিতেছিল।

বিজাপুর।

পরদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে রওয়ানা হইয়া রাত্রি প্রায় এগার ঘটিকার সময় হাস্‌পেট পঁহুছিয়া বারোটার গাড়ীতে বিজাপুর রওয়ানা হইলাম। সারারাত্রি গাড়ী ছুটিয়া চলিল, প্রভাতের তরুণ আলোক-রশ্মি বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গডাক জংশনে উপনীত হইলাম, এ স্থানটী বাণিজ্য প্রধান, এখানে তূলার কল আছে, তূলার চাষও গডাকে হইয়া থাকে। আমরা সারাদিবস এ স্থানে অবস্থান করিয়া রাত্রি সাতটার ট্রেণ ধরিয়া পরদিন প্রত্যূষে প্রায় আট ঘটিকার সময় বিজাপুর পঁহুছিলাম। বিজাপুর এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর এবং আদিলসাহি রাজাদের রাজধানীরূপে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কলীদগি জেলার প্রধান নগর। বিজাপুর বিজয়পুর শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন কালে ইহা হিন্দুদিগের নগর ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এ স্থানের ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে দ্বিতীয় মুরাদের পুত্র ওস্‌মান আলি সুলতানের দ্বারা বিজাপুরে সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়। ওসমান্ আলি সুলতানের পুত্র দ্বিতীয় মহম্মদ অতিশয় নির্দ্দয় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই অতি নিষ্ঠুর ভাবে তদীয় ভ্রাতৃবর্গকে হত্যা করিতে আদেশ প্রদান করেন। স্নেহময়ী জননী সন্তানগণের প্রতি এইরূপে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যার আদেশ শুনিয়া মর্ম্মপীড়িতা হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার এমন সাধ্য নাই যে ইহার কোনওরূপ ব্যত্যয় করিতে পারেন, তিনি অতি কষ্টে নিজ জীবনকেও বিপন্ন করিয়া সুকৌশলে যুসুফ নামক পুত্রের জীবন রক্ষা করেন। যুসুফ নানা দেশে দেশে ঘুরিয়া অতিশয় কষ্টে স্বকীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং আহ্মদাবাদ বিদার রাজের অধীনে একটী কার্য্য গ্রহণ করেন। কতিপয় বৎসর অন্তে যখন বিজাপুরের নিষ্ঠুর প্রকৃতির নরপতি দ্বিতীয় মহম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন

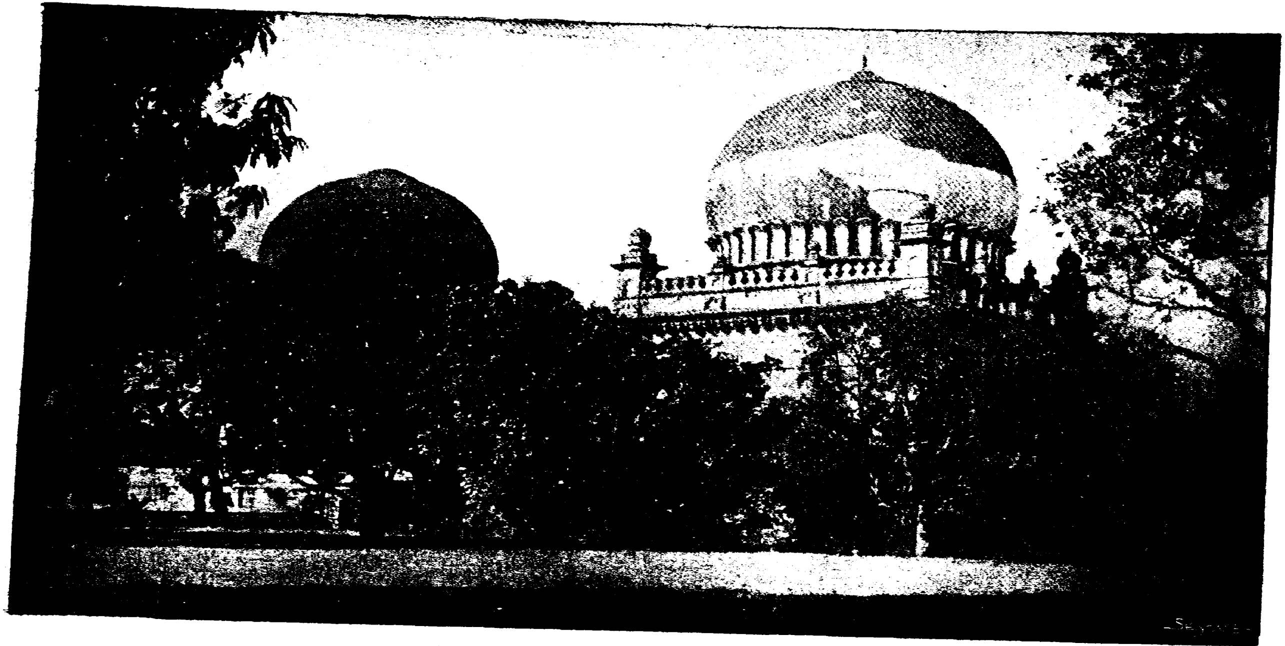
প্রাচীন ইতিহাস।

যুসুফ বিজয়পুরে গমন করিলেন এবং জনসাধারণের অভিপ্রায়ানুযায়ী আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। যুসুফ অতিশয় বীর পুরুষ এবং কর্ম্মদক্ষ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বকীয় বীরত্ব প্রভাবে বহু রাজ্য জয় করেন, এমন কি নিজ বাহুবল প্রভাবে সুদূর সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত স্বকীয় রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি পর্টুগীজদিগের নিকট হইতে গোয়া নগর দখল করিয়া লন। ইঁহারই যত্নে এবং অর্থব্যয়ে বিজাপুরের সুবৃহৎ দুর্গ-বাটিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যুসুফ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ইস্‌মাইল খাঁ অমিততেজে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর মুলু আদিল সাহ ছয় মাস রাজত্বের পরেই রাজ্যচ্যুত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম রাজাসনে আসীন হইয়া ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র আলি আদিল সাহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এই মহাত্মা অতিশয় কার্য্যকুশল নৃপতি ছিলেন, ইনি বিজাপুর নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর, জুমা মস্‌জিদ এবং জল-প্রণালী সমূহ নির্ম্মাণ করেন। নগরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহার সবিশেষ মনোযোগ ছিল। সে সময়ে দিল্লীর মোগল সম্রাট্ ব্যতীত ইঁহার ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ভারতবর্ষে আর কেহই ছিলেন না। ইনি বিদর, আহ্মদনগর ও গোলকুণ্ডার রাজার সহিত মিলিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ বিজয় নগরাধিপতি রাম রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, উক্ত নরপতি ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটের যুদ্ধে এই ত্রি-মুসলমান শক্তির নিকট পরাস্ত ও বন্দী হন।

মুসলমান সৈন্যগণের বিজয়নগর লুণ্ঠনের পরে রামরাজা নিষ্ঠুর মস্‌লেম নৃপতির আদেশে নির্দ্দয় ভাবে নিহত হন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আলি আদিল সাহার মৃত্যু হয়। আলি আদিলের মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল অতি অল্প বয়সে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে মৃত আলি আদিলের পত্নী বিখ্যাত চাঁদবিবিই প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। এই রমণীর বিচক্ষণতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইব্রাহিমও রাজ্যভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতা ও

নিপুণতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিমের মৃত্যু হইলে মহম্মদ আলি সাহ রাজত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রকেশরী হিন্দুর চিরগৌরব বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর আবির্ভাব হয়। শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুর রাজ্যের অধীনে কার্য্য করিতেন। অগ্নি-কণা যেরূপ শতখণ্ড বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে তাহার দাহিকা শক্তি বিনষ্ট না হইয়া উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তদ্রূপ মহাপ্রাণ শিবাজীর অন্তর্নিহিত মানসিক ও শারীরিক শক্তি, শত বাধাবিঘ্ন পাইয়াও অল্প কালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে যশ-প্রভা ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া দিল। শিবাজী বিজাপুর রাজভাণ্ডারের ব্যয়ে ও তথাকার সৈন্যবৃন্দের সাহায্যে ১৬৪৬—৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিজাপুর রাজাধিকৃত বহু দুর্গ দখল করিয়া ফেলিলেন। ক্রমে তিনি কোঙ্কন প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একদিকে মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের উপর্য্যুপরি আক্রমণ, অন্যদিকে বীরকেশরী মহাপ্রাণ শিবাজীর বীরত্ব প্রভাবে মহম্মদ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ঔরঙ্গজেব কোন কার্য্য বশতঃ আগ্রাতে ফিরিয়া যাওয়ায় শিবাজীর প্রভাব দাক্ষিণাত্যে অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া সমুদয় যন্ত্রণার হাত এড়াইলেন। মহম্মদের মৃত্যুর পরে আদিল সাহ রাজা হইলেন, কিন্তু তিনি বিজাপুর রাজবংশকে অধঃপতনের পথ হইতে ফিরাইতে পারিলেন না। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় শিশুপুত্র সিকেন্দর আদিল সাহ শেষ রাজত্ব করেন।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিজয়পুর অধিকৃত হয়। বহু বর্ষ পর্য্যন্ত যে রাজবংশ স্বকীয় স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল এতদ্দিনে, হায়! এতদিনের পর তাহাদের স্বাধীনতাসূর্য্য চির অস্তাচলে গমন করিল। বিশ্ববিজয়ী মহাকাল এক নবীন দৃশ্যপট উত্তোলন করিয়া প্রাচীন দৃশ্যপটকে অন্তরালে রাখিয়া দিল। মোগল রাজবংশের অধঃপতনের পরে বিজাপুর মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারেই ছিল; কিন্তু ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পেশবারের পদচ্যুতির পরে বিজাপুর ও সাতারা রাজ্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধিকার ভুক্ত হয়। বিজাপুরের মুসলমান কীর্ত্তি রক্ষার জন্য



একটী প্রাচীন সমাধিমন্দির—বিজাপুর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সাতারা রাজ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাতারা রাজ অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ইংরেজ গভর্মেণ্ট উক্ত রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিজাপুরে সর্ব্বশুদ্ধ নয় জন আদিল শাহী রাজা রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন; আমরা এ স্থানে তাঁহাদের নাম ও রাজত্বকাল প্রদান করিলাম।

নাম।			রাজত্বকাল।	
য়ুসফ লাদিল শাহ			১৪৮৯—১৫১০	খ্রীষ্টাব্দ।
ইস্‌মাইল	”		১৫১০—১৫৩৪	”
মল্লু	”		১৫৩৪	”
ইব্রাহিম	”	প্রথম	১৫৩৪—১৫৫৭	”
আলী	”	”	১৫৫৭—১৫৮০	”
ইব্রাহিম	”	দ্বিতীয়	১৫৮০—১৬২৬	”
মহমূদ	”	”	১৬২৬—১৬৫৬	”
আলী	”	দ্বিতীয়	১৬৫৬—১৬৭২	”
সিকন্দর	”	”	১৬৭২—১৬৮৬	”

আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত বীর্য্যবতী মহারাজ্ঞী চাঁদ বিবির সম্বন্ধে আর যৎকিঞ্চিত আলোচনা করিয়া বিজাপুরের ঐতিহাসিক আলোচনা পরিসমাপ্ত করিব।

যে সকল বীর্য্যবতী রমণীর গৌরব প্রভায় ভারত গর্ব্বিত, যাঁহাদের কঠোর ও কোমলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে জগত একদিন চমকিত হইয়াছিল, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইও গড়মণ্ডলের দুর্গাবতীর ন্যায় এই মহীয়সী ললনা-কুল-রত্ন ও তাঁহাদের একজন। সুলতানা চাঁদবিবি আহমদনগর যখন মোগলেরা আক্রমণ করে সে সময়ে যে অলৌকিক বীরত্ব, ধীরত্ব ও স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যবাসীর হৃদয় মধ্যে তাহা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। এখনও তাহারা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীর বীরত্ব গাথা বর্ণনা করিতে করিতে তদীয় স্বর্গগত জ্যোতির্ম্ময়ী আত্মার উদ্দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। পাঠক

একবার আপনাকে অতীতের যুবরাজ মুরাদের সৈন্যাক্রান্ত নগর দুর্গ বেষ্টিত আহমদনগরের মধ্যে স্থাপন কর। চারিদিকে রণ-কোলাহল জাগিয়া উঠিয়াছে, দুর্গের চারিদিকে মুরাদের সৈন্যগণ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া বারুদের সাহায্যে দুর্গ ও দুর্গবাসীদিগকে উড়ইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। ঝনন্ রনন্ করিয়া অসির ঝন ঝনায় চারিদিক উদ্বেলিত, মোগল সৈন্যের অপূর্ব্ব উল্লাস! কিন্তু এ দিকে ও কি? কে ঐ রমণী বীরাঙ্গনা বেশে কবচে দেহ আবৃত করিয়া, একটা সূক্ষ্ম গুণ্ঠনে বদন ঢাকিয়া উলঙ্গকরবাল হস্তে সৈন্যগণকে উৎসাহ দিতেছে? কাহার উৎসাহ ধ্বনিতে, আহ্বান বাণীতে পুনরায় পলায়নোদ্যত সৈন্যগণ ভীরুতা ভুলিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য যাহা কিছু গোলাগুলি ছিল বর্ষণ করিতে লাগিল। অই দেখ মোগল সৈন্য পিছু হটিতেছে, আবার দৃষ্টিপাতকর প্রাচীরের ছিদ্র বুজিয়া গিয়াছে। চাঁদবিবির বীরত্বে অবশেষে সেবার মুরাদকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ফিরিতে হইল। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরে মোগলেরা আবার আক্রমণ করিল, এবং নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া সৈন্যদলের বিপ্লবে তিনি প্রাণ হারাই-লেন। পাপের বীজ রোপিত হইলে তাহার ফল না ফলিয়া যায় না, এই পাপের ও ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না, অল্প সময় মধ্যেই নগর অধিকৃত ও নাবালক মহারাজা বন্দী হইলেন। বীরাঙ্গনাকে অন্যায়রূপে নিহত করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চাঁদবিবির যে বীরত্ব গাথা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে তাহা বিশ্ব বিজয়ী কাল ও মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হইবে না। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম চাঁদবিবির সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন আমরা এ স্থানে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। তিনি চাঁদবিবির শোচনীয় মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। ইব্রাহিমের রচিত শ্লোক কয়টি ব্রজ-মারাঠী মিশ্রিত পারসী—

রূপে-গুণে অতুলনা সুরবালা আছে নানা
নন্দন-কানন আহা! যাহাদের বাস,
ধরাধামে রূপবতী আছে শত গুণবতী
সৌন্দর্য্যে জ্যোছনা খেলে মধুমাখা ভাষ,

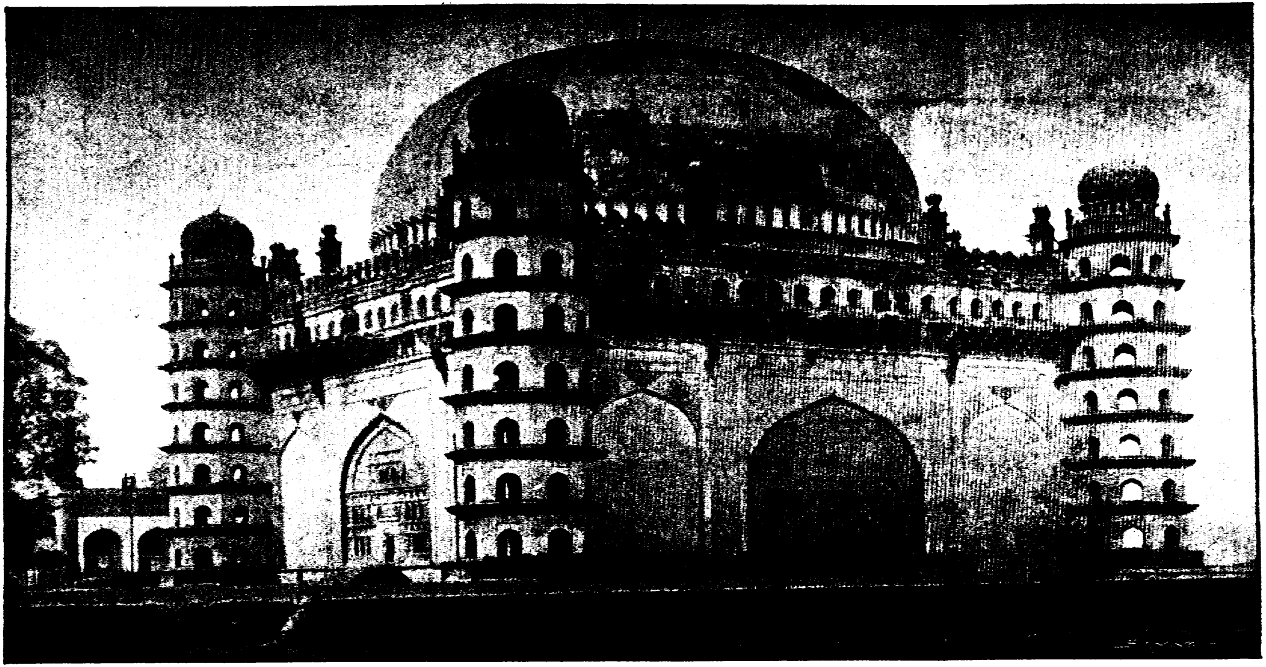
(কিন্তু) বিজাপুরের মহারাণী চাঁদ সুলতানা,
রূপে-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, কারো সাথে হয় না তুলনা !
রণাঙ্গনে বীর্য্য যাঁর সদা সুপ্রকাশ,
গৃহে শান্তি নিজে যেন দয়া-ভরা সুমঙ্গল-ভাষ
দীনজনে কতপ্রীতি ক্ষীণ প্রতি মায়ার বিকাশ
বিজাপুরের রাণী সে যে চাঁদ সুলতানা,
রূপে-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারো সাথে নাহিকো তুলনা !
সরল কোমল হৃদয়-মাধুরী তুলনা নাহিকো যার,
কুসুমের মাঝে চম্পক যেন তরুমাঝে সহকার !
একাধারে এতগুণ, কারসাধ্য বর্ণিবারে পারে ?
দয়াময়ী প্রীতিময়ী জননীর সম স্নেহভরে,
অজ্ঞান শৈশবে মোরে পালিলেন যেইজন
বিদেশে বিপাকে রাজ্যের বিপ্লবে আহা ! করিলা রক্ষণ !
সেই দয়াময়ী স্নেহময়ী জননীর পায়,
রচিতুচ্ছ স্মৃতিগাথা দ্বিতীয় ইব্রাহিম আমি অর্পিনু তাঁহায়।

বিজাপুর ভীমানদী ও কৃষ্ণানদীর অধিতক্যার মধ্যে অবস্থিত। রেলগাড়ী হইতেই এ স্থানের অট্টালিকা সমূহের গুম্বজ ইত্যাদি দৃষ্টি পথে পতিত হয়। রাস্তার ধারে বৃক্ষলতা বিহীন তরঙ্গায়িত ময়দানের পর ময়দান ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বিজাপুরের চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি, বাঙ্গালার শস্য শ্যামল সৌন্দর্য্য এস্থানে বিরল। এই নগরের চতুর্দ্দিকেই প্রস্তর প্রাচীর, ইহার পরিধি ও অন্যূন প্রায় তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকস্থ সুগভীর প্রশস্ত পরিখা এবং প্রায় একশত বুরুজ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বিজাপুরে যে সমুদয় স্থান এবং ইমারতাদি দর্শন করিয়াছিলাম একে একে তাহার উল্লেখ করিলাম। (১) জুম্মা মসজিদ—১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আলি আদিল সাহ এই মস্‌জিদটি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনি ইহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও সাতারার প্রধান নরপতি ইহার অবশিষ্ট কার্য্য সমাপ্তির চেষ্টায় প্রবৃত্ত

নগরের বর্ণনা।

হইয়াছিলেন কিন্তু কেহই সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, বহু নরপতির হস্তচিহ্ন সকল ইহাতে বিদ্যমান। দাক্ষিণাত্যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মস্‌জিদ আর নাই, ইহার গাত্রস্থিত ললিতকলা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মস্‌জিদের অভ্যন্তরস্থ হল (কক্ষ) ১৫০×৫০ হাত। মেঝের উপরে প্রত্যেক ব্যক্তির বসিবার যে ভিন্ন ভিন্ন আসন কাটা আছে তাহাতে ২৪৩০ জন লোক উপাসনা করিতে পারে। প্রধান দরোজা দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখস্থ চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ নয়ন-পথে পতিত হয়, ইহার তিন দিকে মস্‌জিদের গৃহাবলী ও মধ্যভাগে একটী শুষ্ক ফোয়ারা দেখিতে পাওয়া যায়। মস্‌জিদের মেহরাবে (ভজনালয়) কতকগুলি শিলালিপি আছে তাহার মধ্যে চারিটি ধর্ম্মনীতি সম্পর্কীয়, উহা হাফেজের পুস্তক হইতে সংগৃহীত। অপর দুইটি ফলকে লিখিত আছে যে সুলতান মাহমুদের আদেশে মালিক আকুব নামক ভৃত্য কর্ত্তৃক ১০৪৫ (১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মেহরাব নির্ম্মিত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে।

(২) আসার মহল—রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে এক মাইল দূরে এই প্রাসাদ বিরাজিত। এই বৃহৎ ও সুন্দর সৌধটি সুলতান মাহমুদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখনও ইহা অন্যান্য প্রাসাদাপেক্ষা অক্ষত দেহে বিরাজমান। মোগল সম্রাট সাজাহানের হস্ত হইতে কেবল এই প্রাসাদটিই ধ্বংসের পথ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। জনপ্রবাদ এইরূপ যে প্রথমে ইহা আদালতের কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত হয়, তখন ইহার নাম "আদালত মহল" বা দাদমহল ছিল। পরে আদালতের জন্য নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হওয়ায় ইহা "আসার মহল" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। "আদালত মহল" বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু "আসার মহল" অদ্যাবধি অক্ষত দেহে বিরাজমান। এই প্রাসাদ মধ্যে মিরমহম্মদ সালি হামেদালি কর্ত্তৃক আনীত মহাপুরুষ মহম্মদের শশ্রুর দুইটি কেশ রক্ষিত হওয়ায় এই পবিত্র নিকেতনের উপর কেহই কোনওরূপ অত্যাচার করে নাই। ইহা অদ্যাবধি যেমন ছিল ঠিক্ তেমনিই রহিয়াছে। এই কেশ দুইটি স্বচক্ষে কেহ দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। পাঁচজন ধার্ম্মিক মোল্লার উপরে ইহার তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পিত। যে কক্ষে এই কেশ দুইটি রক্ষিত আছে, সে কক্ষে এই পাঁচজন ব্যতীত অন্য



সুলতান মহম্মদের সমাধি—বিজাপুর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কাহারও প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। একটী কাঁচের নলের মধ্যে ঐ কেশ দুইটী রক্ষিত হইয়া অপর একটী স্বর্ণের কারুকার্য্য খচিত আবলুস কাষ্ঠের ক্ষুদ্র বাক্সে ঐ নলটি আবদ্ধ আছে, এই ক্ষুদ্র বাক্সটী আবার একটী বড় বাক্সে আবদ্ধ। "আসার মহল" চতুষ্কোণাকৃতি। এই অট্টালিকাটী একটু নূতন ধরণের, ইহার সুচিত্রিত প্রস্তর ছাদ ৩৫ পঁয়ত্রিশ ফুট উচ্চ চারিটি সুদৃঢ় কাষ্ঠের স্তম্ভের উপরে সংস্থাপিত। প্রাসাদের দৈর্ঘ্য ১৩৫ ফুট ও প্রস্থ ১০০ একশত ফুট। প্রাসাদটী দ্বিতল। সম্মুখে বারান্দা। প্রধান প্রধান কক্ষগুলি সমুদয়ই দ্বিতলের উপর। প্রকোষ্ঠস্থিত দেওয়ালগুলি Fresco (ফ্রেস্কো) চিত্রদ্বারা সুরঞ্জিত। আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত মহম্মদের শশ্রূর ঘরও দ্বিতলের উপর, এঘর বার মাসই প্রায় বন্ধ থাকে কেবল বার্ষিক উৎসবে ভক্তদের দর্শন জন্য এক দিবস খোলা হয়। একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে রাজকীয় দরবারাদি বিশেষ উপলক্ষ সময়ের ব্যবহার্য্য কার্পেট, মকমলের চাদর, বিছানা, পুরাণ চীনের বাসন ইত্যাদি দেখিলাম। দ্বিতলস্থিত প্রত্যেকটী প্রকোষ্ঠের প্রাচীর ও ছাদ নানাপ্রকারের লতা পাতা ও মনুষ্যের ছবি ইত্যাদি দ্বারা পরিশোভিত। এই সৌধের একাংশেই রাজকীয় পুস্তকালয় ছিল, কিন্তু লুণ্ঠন ও উইপোকার কৃপায় তাহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছিল, অবশিষ্ট পুস্তকাবলী ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সার রবার্ট বাটল কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়া আফিসে স্থানান্তরিত হইয়াছে। দ্বিতলের শেষ প্রকোষ্ঠ মধ্যে মাহমুদ বাদসাহের ছবি ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতি মোগল সম্রাটের হস্তে পড়িয়া তাহা বিনষ্ট হইয়াছে।

৩। মাহমুদের সমাধি—ইহা "বোল" অথবা "গোল" গুম্বজ নামেই সর্ব্বসাধারণ্যে সুপরিচিত। বিজাপুরে যে সমুদয় প্রাচীন প্রাসাদাদি বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার জন্যই বিজাপুর সভ্য জগতে বিশেষ বিখ্যাত। মাহমুদ আদিল সাহ ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি স্বয়ংই এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সমাধি মন্দিরগুলির মধ্যে এই সমাধি মন্দিরও অন্যতম। এই অট্টালিকাটী অসম্পূর্ণ দেহে বিরাজমান, কারণ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই। ইহার গুম্বজ পৃথিবীর অন্যান্য

ইমারতের গুম্বজ অপেক্ষা অধিক উচ্চ। রোমের প্যান্থিয়ন, ফ্লোরেন্সের ডুওমো, সেণ্টপীটার্স ইত্যাদি সমুদয় জগদ্বিখ্যাত ইমারতের গুম্বজ অপেক্ষা ইহার উচ্চতা অধিক। এই সমাধি মন্দিরের গুম্বজের বাহিরের ব্যাস ১৪২ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং ভূমি হইতে ইহার বাহিরের সর্ব্বোচ্চ বিন্দু ১৯৮ ফুট উচ্চ। যে চতুষ্কোণ প্রাকারের উপরে ইহা স্থাপিত, তাহার প্রত্যেক পার্শ্ব ১৩৫ ফুট দীর্ঘ। এই সমাধি মন্দিরস্থ উপাংশু কথন মঞ্চ বা প্রতিধ্বনি গ্যালারি (Whispering Gallery) আছে তদ্রূপ ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই, ইয়ুরোপেও কেবল এক রোমনগরের সেণ্টপীটার্স ক্যাথীড্রেল এবং লণ্ডনস্থ সেণ্টপল ক্যাথিড্রেল ব্যতীত আর কোথাও নাই। এই মঞ্চের এক সীমায় অতি ধীরস্বরে কথা কহিলে তাহার ঠিক্ বিপরীত দিকে ১২০ ফুট দূরে সেই কথাগুলি অতি উচ্চৈস্বরে উচ্চারিত হইতে শুনা যায়। এই ইমারতের বাহিরের চারিকোণে চারিটী গবাক্ষময় মিনার। ইহাদের কোন একটীর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে নিম্নস্থ দৃশ্য ছবির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দক্ষিণদিক দিয়া প্রবেশ করিয়া সুলতান মাহমুদের, তাঁহার মহিষীর এবং পুত্রদের সমাধি প্রস্তর গুলি দর্শন করিলাম, দ্বারের নিকটস্থ একটী প্রস্তর ফলকে পারস্যভাষায় সুলতান মাহমুদের স্বর্গারোহণের তারিখ লিখিত আছে, তিনি ১০৬৭ অর্থাৎ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। দ্বারের উপরিভাগে লৌহশৃঙ্খলের সহিত একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড লম্বমান, সাধারণলোকে বলিয়া থাকে যে বজ্র বিদ্যুতের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ইহা রক্ষিত হইয়াছে।

এই স্থানে মালিক-ই-ময়দান অর্থাৎ (যুদ্ধক্ষেত্রের অধিপতি) নামক একটী তোপ দর্শন করিলাম। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তোপ। এই তোপটী আহমদনগরে প্রস্তুত হয়। ইহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা মহম্মদ রুমি খাঁ। কথিত আছে যে তোপ নির্ম্মাণ শেষ হইলে নির্ম্মাতা স্বকীয় তনয়ের উষ্ণ শোণিত দ্বারা ইহা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এখনও ইহা স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। হুসেন নামক নিজামসাহী রাজা বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আইসেন, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন কালে এই তোপটী ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

এই প্রকাণ্ড তোপটী মিশ্র ধাতু ৪।৫ তামাও ১।৫ টিন দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা নগরের বাহিরের প্রাচীরে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং মুখের সর্ব্বাধিক ব্যাস ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। একবার প্রাচীন ঢালাইয়ের এই নমুনাটিকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে স্থানান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করে নাই। ইহার হুঙ্কারেই নাকি শত্রুরা কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিত না। কামানটী এত বৃহৎ যে একজন মনুষ্য ইহার গোলার স্থান অধিকার করতঃ অনায়াসে তাহার খোলের মধ্যে দিয়া বসিয়া যাইতে পারে। এই কামানটী দেখিলে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে ঢালাইয়ের কার্য্য কত সুকৌশলে সম্পাদিত হইত তাহা অনুমান করা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শত শত বৎসর ইহা বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে তথাপি ইহাতে মরিচা পড়ে নাই। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ইহা অষ্টধাতু নির্ম্মিত।

৪। মেহতর মহল—ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্ন মত প্রচলিত। ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে একটী গল্প এই যে, প্রথম ইব্রাহিম আদীল সাহ কুষ্ঠরোগগ্রস্থ হইয়াছিলেন, কোনরূপ চিকিৎসা দ্বারাই তিনি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া একজন জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কিরূপে এই রোগ হইতে তাঁহার আরোগ্যলাভ করা সম্ভব? গণৎকার তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে মহারাজ আপনি কল্য প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া যাহাকে দর্শন করিবেন তাহাকে বহু ধন রত্ন দান করিলেই রোগ হইতে মুক্ত হইবেন। সে রজনীতে ইব্রাহিম বাদসাহের আর ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না; তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া একজন মেথরকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সেই মেথরকেই গণৎকারের উপদেশানুযায়ী বহু ধন, রত্ন প্রদান করিলেন। মেথর এইরূপ স্বপ্নাতীত ঘটনায় বিস্মিত হইয়া গেল, জগদীশ্বর যে আজ কোন্ কৃপাবলে সহসা এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিলেন তাহা সে ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয় অনন্ত মহিমাময় পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় করুণায়, কৃতজ্ঞতা ভরে দ্রবীভূত হইয়া গেল, সে তাহার প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা এই মহল নির্ম্মাণ করিল, ইহা একটী মস্‌জিদের প্রবেশের দ্বার। কাহারও কাহারও মতে ইহা

ফকীর দলের মেহতর অর্থাৎ প্রধান কর্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম মেহতর মহল হইয়াছে। ইহার কারুকার্য্য পরম রমণীয়। মেহতর মহলের দ্বিতলের ছাদ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত। এই প্রাসাদের কড়িকাঠগুলি যে কিসের অবলম্বনে রহিয়াছে, তাহা ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারগণও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ইহার কারুকার্য্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ ফাগুর্সন সাহেবের মতে ইহা মিশরের কায়রো নগরীর যে কোন বাড়ীর সহিত তুলিত করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতের ও মুসলমান শিল্পিগণের ইহা চিরগৌরবময় কীর্ত্তি স্তম্ভ।

৫। ইব্রাহিম রোজা—এই প্রাসাসটী বোল গুম্বজের পরেই উল্লেখ যোগ্য। ইহাতে ইব্রাহিম বাদসাহের গোর ও মস্জিদ স্থাপিত। দূর হইতে ইহার মস্জিদ, গোর, মিণার ও উদ্যান বড়ই সুন্দর দেখায়। এতদ্ব্যতীত আর্কেল্লা, আনন্দ মহল, গগন মহল, সাত মজলী, আলিরোজ, সুলতান সেকেন্দরের গোর, ঔরঙ্গজেবের মহিষীর সমাধি, মক্কা মস্জিদ্ ইত্যাদি বহু দর্শনীয় স্থান আছে, সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন হয় আমরা এ স্থানে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

৬। আর্কেল্লা—বিজাপুর নগরের মধ্যস্থল দিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই বৃক্ষচ্ছায়া সমাকীর্ণ পথ বাহিয়া অগ্রসর হইলেই আর্কেল্লায় পঁহুছা যায়। ইহা একটী গোলাকৃতি স্থান, বেষ্টন প্রায় এক মাইল হইবে। এ স্থানে বর্ত্তমান সময় উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের বাসস্থান এবং গভর্ম্মেণ্টের কার্য্যালয় প্রভৃতি অট্টালিকা সমূহ স্থাপিত। এই কেল্লার মধ্যে বিজাপুরের প্রাচীন স্মৃতি পরিপূর্ণ কীর্ত্তিময় "সাতমজলী," "আনন্দ-মহল," "গগনমহাল" ইত্যাদি প্রাসাদ সমূহ বিরাজিত। এ স্থানে আসিলে প্রাচীনের স্মৃতি মনে হইয়া হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হয়।

য়ুসফ আদিলসাহ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ইব্রাহিম আদিলসার রাজত্ব সময়ে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। এই দুর্গের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলাম, একটী মন্দির এখনও আপনাকে কালের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা

করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার নাম নরসোবার মন্দির। জনশ্রুতি এইরূপ যে ইব্রাহিম বাদসা হিন্দুগণের ন্যায় এ স্থানে আসিয়া পূজা করিতেন। এস্থানে সময় সময় মেলা হয়। দুর্গ মধ্যস্থ চীন মহলের প্রাসাদাবলীই এক্ষণে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

৭। সাতমজলী—চীন মহলের একদিকে সরোবরের তীরে এই সপ্ততল প্রাসাদটী অবস্থিত। "গগনমহাল" রাজাদের দরবারশালারূপে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। ইহার সম্মুখেই উদ্যান ও উৎস সংযুক্ত "আনন্দমহল" প্রাসাদটী অবস্থিত। এই অট্টালিকাটি ত্রিতল। মহিষীগণের বায়ু সেবনার্থ উপরের ছাদ প্রশস্ত। এই ছাদের উপর হইতে অদৃশ্যভাবে বহির্ভাগের তামাসা ইত্যাদি দর্শন করিতে পারা যায়। এই গৃহে বহু সিঁড়ি এবং বহু ছোট ছোট ঘর, বোধ হয় বিলাসী নরপতিগণ বিলাসিনী রমণীবৃন্দসহ এস্থানে লুকোচুরি খেলিতেন। এই "আনন্দ মহল" তাঁহাদের বিহার ভবন ছিল।

আর্ককেল্লার প্রতি গৃহে বিজাপুরের প্রাচীন স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এস্থান হইতে একদিন কতলীলা খেলা হইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? বিজাপুর নগর শিক্ষার প্রশস্ত কেন্দ্রস্থল। এস্থানে আসিলে একদিকে যেমন জগতের নশ্বরত্ব দর্শনে ব্যথিত হইতে হয়, অন্যদিকে আবার তেমনি ভারতবর্ষের শিল্প ও ভাস্কর্য্য নৈপুণ্য দর্শনে চিত্ত প্রফুল্লিত হয়। কথিত আছে যে পূর্ব্বে এই সহরে ৪৫৩টি কূপ বিদ্যমান ছিল। সে সময়ে জল-প্রণালী দ্বারা নগরের জল সরবরাহ করা হইত। এই পরীবহ (Aqueduct) আফ্‌জুল খাঁ কর্তৃক নির্ম্মিত হয়, ইহার সুড়ঙ্গ একস্থানে মাটির ৬৫॥ ফুট নীচে ছিল।*

বিজাপুর এক সময়ে শোভাময় সমুন্নত প্রাসাদাবলীতে সুসজ্জিত ছিল। তখন ইহার সুপ্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বিপণি সমূহ বিবিধ

* "There are said to be 453 wells in the town, but the principal water-supply in the days when the city was teeming with a population, if tradition is to be believed, exceeding that of Bombay, was brought into it by the * * * aqueduct, which is said to have been constructed by Afzal Khan."—T. S. HEWLETT

Acting Sanitary Commissioner October 17th, 1875.

The tunnelling is at one place sixty-five and a half feet under ground.—Bijapur Sanitary Reports, 1857.

প্রকার পণ্যদ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকিয়া নগরের শান্তি সুখ ও ধনৈশ্বর্য্যের গৌরব মহিমা প্রকাশ করিত। আসাদ বেগের বিজাপুর বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন সে সময়ে ইহা অমরাপুরী ছিল। একদিকে যেমন আতর, গোলাব, অলঙ্কার, সুরা, নর্ত্তকী ইত্যাদি বিলাসোপকরণের প্রাচুর্য্য ছিল, অন্যদিকে আবার তদ্রূপ অস্ত্রশস্ত্র, রুটি, মৎস্য, মাংস, খড়গ, ছুরি ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে মিলিত। বর্ত্তমান সময়ে বিজাপুর সহর যতটুকু, তখন ইহা অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। সে সময়ে এই নগর সহর ও সহরতলি সহ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বহু লক্ষ্য লোক এস্থানে বাস করিত। কেহ কেহ বলেন যে তৎকালীন আয়নাপুর, নৌরসপুর, আল্লাপুর, সাহাপুর, জোরাপুর, ইব্রাহিমপুর প্রভৃতি



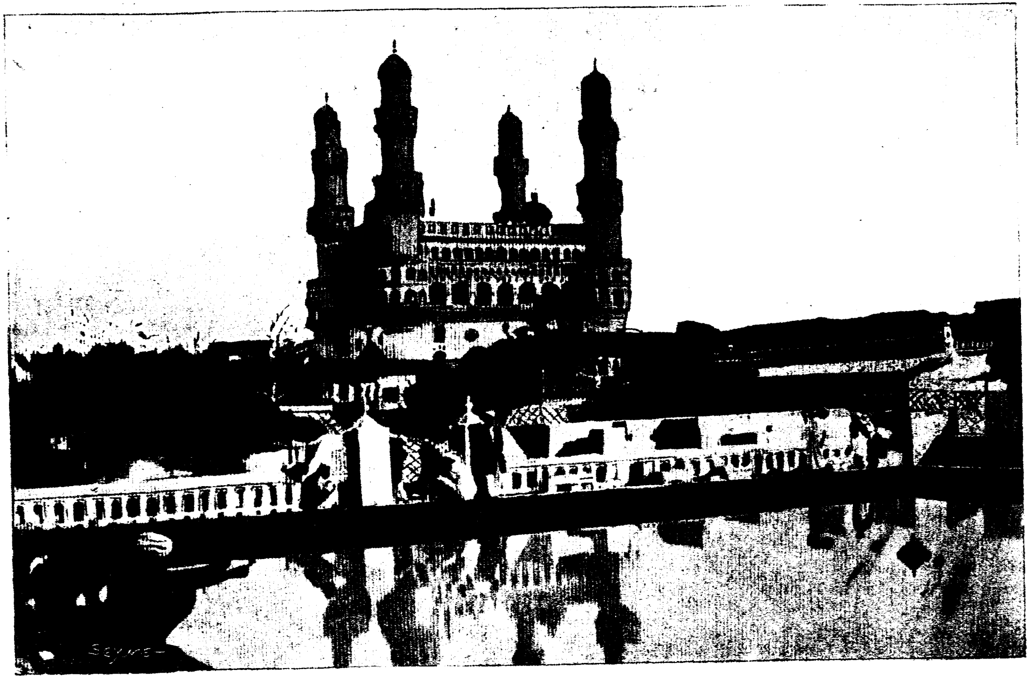
একটী প্রাচীন খিলানের দৃশ্য।

সহরতলি লইয়া এই নগরে দশলক্ষ লোকের বসতি ছিল। বিজাপুরের বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষের অবস্থা এবং চতুর্দ্দিকস্থ আধুনিক পরিত্যক্ত গ্রাম ইত্যাদি দর্শন করিলে তাহাই প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান বিজাপুর দর্শন করিয়া অতীতের ধনৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ মহত্ব অনুভব করা সহজ নহে। বর্ত্তমান নগরী অতীতের কঙ্কাল মাত্র। ফেরিস্তা ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর যেরূপ জন-কোলাহল মুখরিত ও সুরম্য প্রাসাদ বেষ্টিত আমোদ পূর্ণ দর্শন করিয়াছিলেন আমরা তাহা কিরূপে কল্পনা করিতে পারি? এস্থানে জেম্‌স্

ডগ্‌লাস সাহেবের গ্রন্থ হইতে বিজাপুর সংক্রান্ত কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ ইহা হইতেই আমাদের উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—"The Bijapur which we see to-day is not the Bijapur which Ferishta saw in 1589, more than three hundred years ago. We now see its ghost. But from the palace of the seven stories we can see the ground he often travelled over and the place he made his home. That great street, nearly three miles in length, which bisects the city now crowded on either side with the ruins of tomb, mosque or mahall, was then alive with thousands of people. We are not left in doubt on this point, for we have an exact description by one (Asad Beg, 1604) whom Ferishta knew, for he travelled with him that year to Burhanpur. The bazar which lined this great street was filled with shops, brimful of every commodity that the East and the then West could furnish. Cairo or Damascus to-day may exhibit its counterpart but not its extent. All the luxuries and necessities which the ingenuity of man could devise—crystal goblets, porcelain vases, gold and silver ornaments, rare essences and perfumes, double distilled spirits from Dabal or Goa, tobacco also and the finest wines from Portugal, with groups of pleasure-seekers, fair faced choristers and dancing girls: everything to fill with wonder the stranger from distant provinces. As he passed the great suburbs of Shahapur and Torri, now a white heap of ruins, the indications of what awaited him in the palaces of the nobles and the garden houses of the rich, embowered in greenery,

followers of every hue creepers trailing up to lattice and jalusi, with bubbling springs of water, fountains and streams which transported his mind to the qoran paradise and the garden of God.*" তখন সত্য সত্যই বিজাপুর পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি ছিল। আমাদের বিজাপুর প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে এসম্বন্ধে পাঠকের ধৈর্য্যের উপরে আর অধিক দাবি করা নিষ্প্রয়োজন। আশা করি ভ্রমণ-পরাঙ্মুখ বঙ্গবাসী একবার অলসতা ত্যাগ করিয়া প্রাচীন-কালের এসমুদয় কীর্ত্তি দর্শনে ধন্য হইবেন। আমরা বিজাপুর নগর দর্শনান্তে সে দিবস রাত্রিতে নিজামের হাইদ্রাবাদ নগরী দেখিবার জন্য রওয়ানা হইলাম। বৃক্ষলতা পরিশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া বাষ্পীয় শকট বেগে ছুটিয়া চলিল, গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া বিজাপুরের দিকে চাহিয়া রহিলাম, এয়োদেশীর চন্দ্রের সুবিমল জ্যোছনা মণ্ডিত, বোল গুম্বজ, ইব্রাহিম রোজা প্রভৃতি সুবিখ্যাত সৌধাবলীর নয়ন-মন-মোহকর দৃশ্য রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের ন্যায় দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল! জানিনা হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে কেন একটা নৈরাশ্যের বিষাদ-ছায়া জাগিয়া উঠিল।

* Bombay and Western India, page 272, by James Douglas. VOL. I.



চার মিনার—হাইদ্রাবাদ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

হাইদ্রাবাদ।

সারারাত্রি গাড়ীতে কাটাইয়া পরদিন প্রত্যূষে হাইদ্রাবাদ পঁহুছিলাম। প্রভাতের নব বিকশিত আলোর সহিত আমরা দূর হইতেই গিরিমালা পরিবেষ্টিত সৌধমালা, মস্‌জিদ, চার মিনার প্রভৃতি সুবিখ্যাত প্রাসাদ নিচয়ের উচ্চ চূড়া দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। হাইদ্রাবাদ নিজাম রাজ্যের রাজধানী। মুসী নদী ইহার চরণ ধৌত করিয়া প্রবাহিতা। এই নগরীর চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। কলিকাতা হইতে ইহা ৯৬২ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮৭২ সনের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে তখন এস্থানে মোট ৩৫,২৭২ জন লোক ছিল, তন্মধ্যে মুসলমান ১৩,০৬৫, ১৬৮৮৯ হিন্দু, ৩৬৭ খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতি মোট ৪৯৫১ জন ছিল। এ কয় বৎসরে যে লোক সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। নগরের পশ্চিম দিক্ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইতে হয়। নগরের চতুর্দ্দিকে শ্যামল লতাপল্লব সমাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী থাকায় এই নগর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পর্য্যাটকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। এ নগরে পূর্ব্বাপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাইদ্রাবাদের জুম্মা মস্‌জিদ দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। এই মস্‌জিদটী ভারত বিখ্যাত। ইহা মক্কার মস্‌জিদের অনুকরণে নির্ম্মিত। এই নগরে মস্‌জিদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। নিজামের প্রাসাদ, রেসিডেণ্ট সাহেবের বাড়ী এবং জুম্মা মস্‌জিদ এই তিনটী হাইদ্রাবাদের বিশেষ দর্শনীয়। নিজামের প্রাসাদটী আকারে অত্যন্ত বৃহৎ। আকারানুযায়ী ইহার কারুকার্য্য মনোহারিণী নহে। জুম্মা মস্‌জিদের চূড়াটী অত্যন্ত উচ্চ। এখানকার কলেজ-গৃহ চারমিনার নামে পরিচিত। এই ইমারত, চারিটী প্রকাণ্ড খিলানের উপর দণ্ডায়মান, সহরের প্রধান প্রধান চারিটী রাস্তা আসিয়া এস্থানে মিলিত হওয়ায় ইহার সৌষ্ঠব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে

সাধারণ কথা।

এই সৌধের এক একটী তালা ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা অভ্যাসের জন্য ব্যবহৃত হইত; এখন তাহা গুদামরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মুসীনদীর অপর তীরে উত্তরাংশে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সাহেব বাস করেন। নিজামের প্রাসাদ হইতে রেসিডেন্টের প্রাসাদে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটী সুরম্য সুগঠিত সেতু বিদ্যমান আছে। নিজামের বর্ত্তমান মন্ত্রী বার-দোয়ারিতে বাস করিয়া থাকেন। এ স্থানের 'বেগম-বাজার'ও দ্রষ্টব্য। রেসিডেন্টের প্রাসাদটী ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন, কারুকার্য্যে অতুলনীয়। Encyclopœdia Britanicaতে এই প্রাসাদ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে "The residency is a very handsome building, and is remarkable as having been raised entirely by native workmen. It stands in ornamental pleasure grounds enclosed by a wall with two gateways. The staircase is the handsomest in India, each step being a single block of the finest granite." বিক্রমপুরবাসী বিলাত ফেরত ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। এই প্রবাসী বাঙ্গালী মহোদয় আমাদের এ স্থানে অবস্থানের এবং দর্শনীয় দ্রব্যাদি দর্শন সম্পর্কে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার দুইটী কন্যাই সুশিক্ষিতা, জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই সুপরিচিত। ইনি সুলেখিকা ও সুবক্তা। বিগত কংগ্রেসোপলক্ষে যখন কলিকাতা আসিয়াছিলেন, সে সময়ে বেথুন কলেজ গৃহে যে মহিলা সভা হইয়াছিল, তাহাতে ইনি বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ও ইঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল। আমরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সদাশয়তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার মুসলমান বংশের আদিপুরুষ সুলতান কুলী কুতব শাহের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ কুতব শাহ মহম্মদ কুলী এই নগর নির্ম্মাণ করেন। তিনি নগর স্থাপনান্তে গোলকুণ্ডা হইতে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সে সময়ে এই নগর তদীয় সহধর্ম্মিণী ভাগমতীর নামানুসারে ভাগনগর নামে পরিচিত ছিল, পরে হায়দরের নামানুযায়ী হাইদ্রাবাদ

নগরের উৎপত্তির বিবরণ।

অর্থাৎ হাইদারের নগর নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভাগনগর বলিলে কেহই হাইদ্রাবাদকে চিনিতে পারিবেন না। মহম্মদ কুলী প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন; তিনি দীর্ঘ ৩৪ বৎসরকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাইদ্রাবাদের সুবিখ্যাত জুম্মা মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, নহবত ঘাটের রাজবাটী প্রভৃতি ইনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ কুলীর মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র সুলতান আবদুল্লা কুতব শাহ রাজদণ্ড গ্রহণ করেন, ইঁহার সময়ে শাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, শাজাহানের পুত্র ঔরঙ্গজেব পিতার আদেশে কুতব শাহকে আক্রমণ করেন, কুতব শাহ যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং তাঁহার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে মীর মহবুব্ আলী হাইদ্রাবাদের নিজাম। ইনি মুসলমান রাজন্যবর্গের মধ্যে মানে, সম্ভ্রমে সর্ব্বপ্রধান। ইঁহার ৭১টি বড় কামান, ৬৫৪টি ছোট কামান, ৫৫১ জন গোলন্দাজ, ১৪০০ অশ্বারোহী, ১২৭৭৫ পদাতিক সৈন্য এবং বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত সেনা আছে। হাইদ্রাবাদ নগরে দাতব্য চিকিৎসালয়, লাইব্রেরী, পুলিশ হাঁসপাতাল, ডাকবাংলা ইত্যাদি সমুদয়ই আছে। ভ্রমণকারিগণের কোন প্রকার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। নগরের অল্প কয়েক মাইল দক্ষিণ দিকে প্রায় দশহাজার ১০,০০০ একার জমিব্যাপী একটা বৃহৎ হ্রদ আছে, এই হ্রদ হইতেই নগরের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সমুদ্রতীর হইতে হাইদ্রাবাদ ১৭০০ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই নগরে হাইদ্রাবাদ গভর্মেণ্টের একটী স্বতন্ত্র টাকশাল আছে, সে স্থানে হালি-সিক্কা নামীয় একরূপ মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ইহা যদিও দেখিতে ছোট, কিন্তু ওজনে ও মূল্যে ইংরেজ গভর্মেণ্টের মুদ্রার সমতুল্য, পূর্ব্বে এই রাজ্যে আরও বহু টাকশাল ছিল এবং নানাপ্রকার বিভিন্নাকৃতির মুদ্রাও প্রস্তুত হইত, এখন তাহা হয় না। হাইদ্রাবাদের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। আমরা এস্থানে ইতিহাসানুরাগী পাঠকবর্গের তৃপ্তির জন্য এবং সাধারণ পাঠকবর্গের যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুত না হয় সে নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে নিজাম রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহাসিকতত্ত্ব বিবৃত করিলাম।

অন্যান্য কথা।

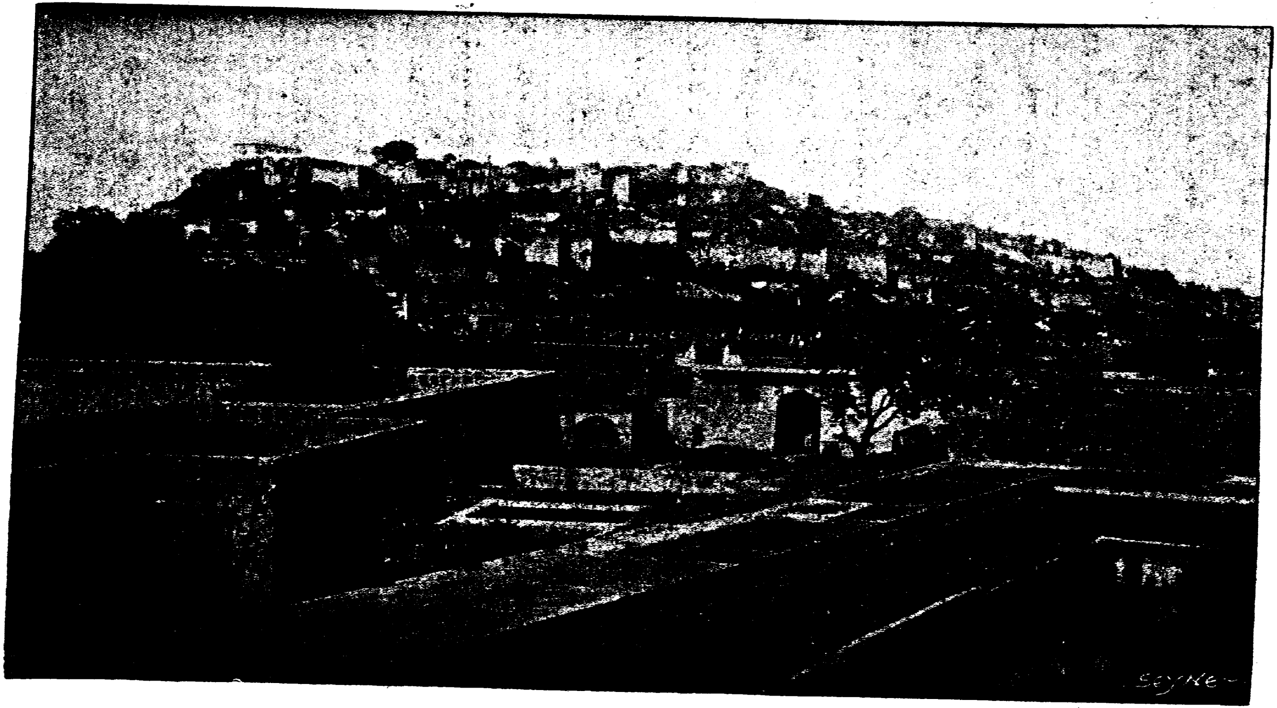
প্রাচীন ইতিহাস।

আসফ্জাহ্ নামক তুর্কীবংশীয় একব্যক্তি মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি ছিলেন; ইঁহার যুদ্ধ বিদ্যার নিপুণতা এবং রাজনীতি কুশলতা দেখিতে পাইয়া সম্রাট ইঁহাকে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ উপাধি প্রদান পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের পদে নিযুক্ত করেন, ইনিই নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা, ইঁহার পর হইতে এই উপাধি ইঁহাদের বংশগত হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়ে এবং মোগল রাজ্যের অন্তর্ব্বিবাদে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, আসফ্জাহ্ও এই সুযোগ পাইয়া নিজকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া হাইদ্রাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে সিংহাসন লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। আসফ্জাহের দ্বিতীয় পুত্র নাশিরজঙ্গ এ সময়ে দিল্লিতে অবস্থিত করায় ধনাগার ইত্যাদি দখল করিয়া তিনিই সিংহাসন গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে আসফ্জাহ্ তাঁহার এক প্রিয় কন্যার গর্ভজাত তনয় মজঃফর-জঙ্গ্‌কেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, এই মজঃফরজঙ্গও সিংহাসন প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছিল। তখন দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব স্থাপন লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীতে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, ফরাসীগণ মজঃফরের সহায় হইলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে উহাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় ফরাসীরা মজঃফরকে ত্যাগ করিল, নাশিরজঙ্গ মজঃফরকে এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় পাইয়া কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ও তাঁহার স্বপক্ষীয় দল কর্ত্তৃক অল্পকাল মধ্যেই নিহত হইতে হইল। নাসিরজঙ্গের মৃত্যুর পর মজঃফরজঙ্গ সিংহাসনারোহণ করিলেন কিন্তু তাঁহাকে বেশী দিন রাজত্ব সুখভোগ করিতে হইল না, তিনিও অল্পকাল মধ্যে একদল পাঠান সেনা কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। অতঃপর ফরাসীদের প্রভুত্বে সালাবৎজঙ্গ সিংহাসনারোহণ করেন, এই সালাবৎজঙ্গ নাসিরজঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে সালাবৎ ভ্রাতা নিজামআলী কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হন ও ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। নিজাম ইংরেজগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, এই সন্ধির কিছুদিন পরে নিজামআলী মহীসুরের রাজা হায়দারআলীর সহিত যোগ দেওয়ায় সন্ধি ভঙ্গ হয়, পুনরায়

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত নিজামআলীর সন্ধি বন্ধন হয়, এই সন্ধির সর্ত্তে ইংরেজ গভর্মেণ্ট নিজামের কার্য্যের সহায়তার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিবেন, কিন্তু নিজাম তাহাদিগকে ইংরেজগণের মিত্ররাজাদের বিরুদ্ধে পাঠাইতে পারিবেন না। সন্ধি স্থাপনের কতিপয় বৎসর অন্তে নিজাম মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ন, এবং ইংরেজ গভর্মেণ্টের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন, তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারল সার জন সোর, কিছুদিন পূর্ব্বে মারাঠাগণের সহিত ইংরেজ গভর্মেণ্টের সন্ধি স্থাপিত হওয়ার দরুণ সৈন্য পাঠাইতে বিরত হইলেন, ইহাতে নিজাম বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইহার পরে লর্ড ওয়েলস্লি যখন গবর্ণর-জেনারল হইয়া আসিলেন তখন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইংরেজদের সহিত নিজামের সন্ধি হয়, এই সন্ধির সর্ত্তে ইহা স্থির হয় যে ইংরেজ গভর্মেণ্টের ৬০০০ সিপাহী সৈন্য এবং তদুপযুক্ত কামান নিজামআলীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তিনিও এ সকলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২৪১৭১০০৲ টাকা ইংরেজ-দিগকে দিবেন।

ক্রমশঃ নিজামরাজগণ ইংরেজের নিকট ঋণী হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ১৮৫৬ সনে পুনরায় এক নূতন সন্ধি হয়, ইহার সর্ত্তানুযায়ী নিজাম রাজ ইংরেজ গভর্মেণ্টকে ৫০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি অর্পণ করিতে স্বীকার করেন, ইংরেজ গভর্মেণ্টও নিজ দায়ে ৫০০০ পদাতিক, ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ৪টী কামান রাখিয়া দেন। যখন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চারিদিকে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রবল অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে নিজাম ইংরেজ রাজের কোনওরূপ বিপক্ষতাচরণ না করায় ইংরেজ রাজ সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাপ দিয়া বেরার রাজ্য গ্রহণ করেন, সে সময়ে বেরার রাজ্যের আয় ৩২ লক্ষ টাকা ছিল; ইংরেজের হাতে আসিয়া উহার রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতিরিক্ত আয় নিজামকে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ফেরত দেন। লর্ড কর্জ্জনের সময় বেরার রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব্বে উক্ত ঋণ শোধ করিবার জন্য গভর্মেণ্টের হাতে ছিল। বর্ত্তমান নিজাম মীর মহবুর আলীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

আমরা হাইদ্রাবাদ দর্শনান্তে গোলকুণ্ডা গমন করিলাম। ইহা নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এ স্থানে অদ্যাপিও গ্রেনাইট পর্ব্বতের তুঙ্গ শিখর দেশে একটী দুর্গ বিরাজিত। এই দুর্গটীর অবস্থান বড়ই সুন্দর, সে জন্য ইহা শত্রুগণের সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য। দুর্গ হইতে প্রায় ৬০০ গজ দূরে প্রাচীন রাজন্যবর্গের নির্ম্মিত বহু অত্যুচ্চ সুন্দর সুন্দর মস্‌জিদ আছে কালের নানাপ্রকার আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এখনও এই মস্‌জিদগুলি অক্ষত দেহে বিরাজমান থাকিয়া নির্ম্মাতাগণের গৌরব-গরিমা প্রকাশ করিতেছে। হাইদ্রাবাদ হইতে ইহা ৭ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বাহ্মণী রাজ্যের অধঃপতনের পরে গোলকুণ্ডা রাজ্য দাক্ষিণাত্যের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও খ্যাতিমান হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা রাজ্য অধিকার করিয়া উহা স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। এ স্থানে যে সমুদয় সমাধি মন্দির দেখা যায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে উহা নির্ম্মাণ করিতে ১৫০০০০২ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। গোলকুণ্ডার দুর্গ বর্ত্তমান সময়ে নিজাম রাজের কারাগার ও কোষাগাররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এ স্থানের হীরকের কথা জগদ্বিখ্যাত। আমরা গোলকুণ্ডা দর্শনান্তে পুনরায় হাইদ্রাবাদ ফিরিয়া আসিলাম। এখন হাইদ্রাবাদ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমরা আমাদের এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। গোলকুণ্ডার দুর্গ দর্শন করিতে হইলে রেসিডেণ্ট আফিস হইতে পাস লওয়া প্রয়োজন, নচেৎ দুর্গে প্রবেশ করা যায় না। দুর্গের আটটী ফটক ছিল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে কেবল ৪টী ব্যবহৃত হয়, ইহার মধ্যে আবার বান্‌জারা ফটকই প্রধান প্রবেশ দ্বার। দুর্গের পূর্ব্বদিকে নিজাম সাগর নামক একটী সরোবর আছে। পূর্ব্বে এ স্থানে বহু লোকের বসতি ছিল। ফটকের কিছু দূরে নয় মহল নামক নয়টী প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। এতদ্ব্যতীত দুর্গের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ কোণে বহু ভগ্ন প্রাসাদ ও মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকলের প্রাচীন ইতিহাস নির্ণয় করা সুকঠিন। এ সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নকরখানা (সঙ্গীত ভবন) এবং বালাহিসার বা দুর্গ ও জুমা মস্‌জিদ এখনও



গোলকুণ্ডা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

চিনিতে পারা যায়। নিজাম রাজ্যের পার্টিয়াল প্রদেশ ও কৃষ্ণা জেলার কুলুর দেশ হইতে আনীত হীরা এ স্থানে কাটাই ও পালিশ হয় বলিয়াই গোলকুণ্ডা হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ, নচেৎ এ স্থানে হীরক জন্মে না। হাইদ্রাবাদ নগরে দিল্লী গেট, চম্পা গেট, চাদর গেট, পুরাতন মহল, গাজিবাঁধ, মিরজুমলা ফটক প্রভৃতি কয়েকটী সুন্দর সুন্দর তোরণ আছে। রেলওয়ে ষ্টেসনের উত্তর দিকে (Public pleasure) পাব্লিক প্লেসার গ্রাউণ্ড নামক একটী সুন্দর প্রমোদ-কানন আছে। এই উদ্যান মধ্যস্থ নওবৎ নামক গ্রেণাইট প্রস্তরের পাহাড়টী দেখিতে বড়ই সুন্দর। মুসী নদীর উপরে অ্যালিফেণ্ট ব্রিজ, আফজাল গঞ্জ ব্রিজ ও পুরাতন ব্রিজ এই তিনটী সেতু আছে। আফজালগঞ্জ ব্রিজটী পার হইলে উদ্যান মধ্যস্থিত সালরজঙ্গ বাহাদুরের প্রাসাদে যাওয়া যায়। বাগানের চতুর্দ্দিকস্থ নানাজাতীয় বিটপীরাজির শ্যামল শোভা-সম্পদ ও ফোয়ারাগুলির সুন্দর অবস্থান দৃষ্টি মনোরম্য। এই প্রাসাদ মধ্যস্থ অস্ত্রাগারে প্রাচীনকালের বিবিধ প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিজামের প্রাসাদ নাকি তিহারাণের সাহার প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত। প্রাসাদটী তিন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে নিজাম স্বয়ং বাস করেন এবং অপর দুই ভাগে তাঁহার শরীর রক্ষক, ভৃত্যবর্গ ও অনুচরবর্গ প্রভৃতি বাস করিয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ এই প্রাসাদে প্রায় সাত হাজার লোক বাস করে। মহরমের সময় হাইদ্রাবাদে বিশেষ আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, তখন নিজামের সমুদয় সৈন্য রণবেশে সুসজ্জিত হইয়া প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়া যায়। এ স্থান হইতে ৫।৷০ সারে পাঁচ মাইল দূরে সেকেন্দ্রাবাদ নামক স্থানে ইংরেজদিগের সৈন্যনিবাস আছে। আমরা পরদিন বেলা দশ ঘটিকার সময় আহারান্তে ইন্দোর রওয়ানা হইলাম।

ইন্দোর।

আমরা বেলা এগারটার সময় ইন্দোর নগরীতে উপনীত হইয়া মুসাফের খানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ইন্দোর—ইন্দোর রাজ্যের প্রধান নগর। প্রাচীন শিলালিপিতে ইহার নাম ইন্দ্রপুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপুর একটী ক্ষুদ্র নগরী ছিল; বর্ত্তমান সময়ে উহাই ইন্দোর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কটকী নাম্নী একটী ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনী এই নগরীর পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিতা। নগরটি ন্যূনাধিক এক বর্গ মাইল ব্যাপী। আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে নগর পর্য্যাটনে বাহির হইলাম। হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মলহর বাওয়ের মৃত্যুর পর এই স্থানেই প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী অহল্যাবাই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এখনও ইহা ইন্দোর মহারাজের রাজধানী। এই নগরীটী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ উন্নতিশীল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি বিপণিশ্রেণী, ভিন্ন ভিন্ন দোকানে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সমূহ শৃঙ্খলতার সহিত সুসজ্জিত।

সাধারণ বর্ণনা।

এ নগরের প্রধান দ্রষ্টব্য মহারাজার লালবাগ নামক প্রমোদোদ্যান। রাজবাটী হইতে একটী সুপ্রশস্ত রাজপথ উদ্যান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই সুন্দর উদ্যানটী বহু স্থান ব্যাপিয়া বিরাজিত। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ সরসী। নির্ম্মল সলিলপূর্ণ এই জলাশয়টী দেখিতে বড়ই সুন্দর। ধীর পবনে ছোট ছোট ঢেউগুলি উঠিতেছে নাবিতেছে, তীরস্থ সুন্দর প্রাসাদের শ্বেত ছায়া ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। মণ্ডলাকার পুষ্পিত তরু-শ্রেণী, উৎস সমূহ, সত্য সত্যই দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করে। গ্রীষ্মকালে মহারাজ হোলকার এই উদ্যান মধ্যে বাস করেন; এ স্থানে নানাবিধ জীব জন্তুও সংগৃহীত আছে। লালবাগ দর্শনান্তে আমরা সেই পথ ধরিয়াই মহারাজার প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। মহারাজা হোলকারের

লালবাগ।

প্রাসাদের একটী বিশেষত্ব আছে। এই সুবৃহৎ সপ্ততল অট্টালিকাটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত। দূর হইতে ইহা রথের ন্যায় বোধ হয়। এই প্রাসাদের কোন অংশে রাজ কার্য্যালয়, কোন অংশে দেবালয়, কোন অংশে ভাণ্ডার, কোন অংশে অন্তঃপুর এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অংশে কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হয়। প্রাসাদ-গাত্র নানাবিধ নয়ন-তৃপ্তিকর কারুকার্য্যে মণ্ডিত। ইহার কোন কোন অংশ অতিশয় সুন্দর রূপে চিত্রিত দেখিলাম। প্রাসাদের শীর্ষদেশে লোহিত বর্ণের পতাকা সমূহ উড্ডীয়মান থাকায় দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়।

মহারাজা নিজে এই কাষ্ঠময় প্রাসাদে বাস করেন না। যদিও ঝড় ঝঞ্ঝার হস্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ, তথাপি অগ্নিদেবের বিন্দুমাত্র কৃপা হইলেই ভস্মস্তূপে পরিণত হওয়া অধিক সময় সাপেক্ষ নহে।

এই প্রাসাদের উত্তর ভাগে দুইটী ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা আছে, বর্ত্তমান মহারাজ তথায় বাস করিয়া থাকেন। শিবাজী মহারাজা প্রকৃতি-পুঞ্জের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রায়ই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদের অবস্থা ও মফঃস্বলস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাবলী বিশেষরূপে পরিদর্শন করিতেন। নিজেও বিশেষ কৃতবিদ্য লোক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজা জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ। ইনি ষোল বৎসর রাজত্বের পর স্বীয় পুত্র যুবরাজ বালা সাহেবকে গদী দিয়াছেন।

ইন্দোরে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে “রাজকুমার কলেজ” প্রধান। এই কলেজ বাড়ীটী দেখিতে বেশ সুন্দর। মহারাজা হোলকার এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তিনিই ইহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। ইন্দোরে আমেরিকান খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদের সংখ্যা ও প্রভাব খুব দেখিলাম। ইহারা মহারাজার নিকট হইতে বিনা করে বহু ভূমি গ্রহণ করিয়া উহাতে ক্যানেডিয়ান্ মিশন কলেজ ও গির্জ্জা ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন। এ নগরে মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত “আর্য্য সভা”ও আছে।

ইন্দোর নগর সমুদ্র হইতে ১৭৮৬ ফুট উচ্চ। লোক-সংখ্যা ৭৫৪০১।

তন্মধ্যে ৫৭২০৫ জন হিন্দু। সমুদয় হোলকার রাজ্যে ১০৫৪২৩৭ লোকের বাস। পূর্ব্বে মহারাজার আয় এককোটি ছয় লক্ষ এগার হাজার ছয় শত টাকা ছিল, এখন পূর্ব্বাপেক্ষা আয় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহারাজার অধীনে জাওরার নবাব প্রভৃতি কয়েকজন সামন্ত ভূপতি আছেন, ইহারা নিজ নিজ রাজ্যের শাসন কার্য্যাদি নিজেরাই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, কেবল বর্ষ শেষে নির্দ্ধারিত হার মত মহারাজ হোলকারকে বার্ষিক কর দেন মাত্র, ইহারা মহারাজার করদ ভূপতি।

সৈন্য বিভাগ।

ইন্দোরের সৈন্য বিভাগে প্রায় তিন হাজার একশত (৩১০০) নিয়মিত এবং দুই হাজার একশত পঞ্চাশ (২১৫০) অনিয়মিত পদাতিক সৈন্য এবং দুই হাজার একশত নিয়মিত ও একহাজার দুইশত অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য আছে। ইহা ছাড়া ৩৪০টী ছোট কামান ও ৪২টী বৃহৎ কামান আছে। হোল্‌কার রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত, বেণিয়া, কায়স্থ, কুন্‌বী, ধন্‌গর, ভীল প্রভৃতি বহু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস। পূর্ব্বে পবিত্র তোয়া নর্ম্মদার তীরে নিমাতের মহেশ্বর নগরে হোলকারের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এই হোলকার বংশের রাজ্ঞী অহল্যার ন্যায় কীর্ত্তিশালিনী রমণী

অহল্যাবাই।

ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতে এমন তীর্থস্থল অতি বিরল, যে স্থানে এই মহীয়সী রমণীর কোন না কোন কীর্ত্তি না আছে। আমরা এ স্থানে সংক্ষেপে এই মহীয়সী ললনা রত্নের জীবনী পাঠকবর্গকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

আহম্মদনগরের অন্তর্গত পাথরডী নামক একটী ক্ষুদ্রগ্রামে আনন্দরাও নামক একজন ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়ের গৃহে অহল্যাবাই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই এই সুগঠিত-দেহা সুস্থ সবল মেয়েটীর স্বভাব প্রফুল্ল-মুখের কমনীয়তায় সকলেই মুগ্ধ হইত। গ্রামের সকলেই নানাবিধ সদ্‌গুণ বিভূষিতা সুশীলা ও বুদ্ধিমতী মেয়েটীর কোমলতায় বিমোহিত হইয়া স্নেহ করিত। এই পাথরডী গ্রামে পেশোয়াদিগের একটী সেনা নিবাস ছিল, এক দিবস কয়েক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি পুনা যাইবার পথে এস্থানে

বিশ্রাম করিতেছিলেন এবং গ্রামবাসী লোকজনের সহিত বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, সে সময়ে দৈবক্রমে নবমবর্ষ বয়স্কা বালিকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিজ গ্রামবাসী আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে সেস্থানে উপবেশন করিয়া উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বালিকাটীর প্রীতিমাখা হাস্যময়ী মুখ ও সুন্দর আকার দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গের নিকট মেয়েটীর পরিচয় চাহিল, উত্তরদাতা সবিশেষ উত্তর দিতে দিতে বলিল যে, "অল্প বয়সে এরূপ দয়াবতী, গুণবতী এবং সুশীলা মেয়ে অতি কমই দেখা যায়, ইহার পিতা আনন্দরাও সিন্দে নিজে যেমন ধার্ম্মিক ও দয়াবান্ কন্যাও তদ্রূপ হইয়াছে, কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন উপযুক্ত পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিতেছে না, এই বালিকার জন্ম-পত্রিকায় লিখিত আছে যে এই বালিকা একদিন রাজরাণী হইবে। বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মলহাররাও হোলকার একমাত্র পুত্র খণ্ডে রাওয়ের সহিত অহল্যার বিবাহ দেওয়াইলেন জ্যোতিষী-গণনা সফল হইল। কিন্তু হায়! অহল্যা রাজ-রাণী হইয়াও সুখী হইলেন না, বিধাতা তাঁহাকে জগতের যে মহদুপকার সাধনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, পাছে তাঁহার অন্তরায় হয় এই জন্যই বুঝি সংসারের সুখ শান্তি হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছিলেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে অহল্যার অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার স্বামী খণ্ডে রাও একটী যুদ্ধে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। স্বামীর এইরূপ মৃত্যুতে স্বামী ভক্তিপরায়ণা অহল্যা পতির জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃতুল্য শ্বশুরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে বিরত হইতে হইল। মল্হার রাও পুত্রবধূ অহল্যার ক্রোড়দেশে মস্তক স্থাপন করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া-ছিলেন "মা! তুমি আমাকে আজ হইতে তোমার সন্তান বলিয়া মনে করিও; খণ্ডুজী এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দারুণ শোকানলে জর্জ্জরীভূত করিয়া সংসারের মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া পালাইয়াছে, ইহার উপরে আবার তুমিও যদি আমাকে নিরাশ্রয় করিয়া ফেলিয়া যাও, তবে আমি কিরূপে

সংসারে জীবন ধারণ করিব ?” বৃদ্ধের এই মর্ম্মস্পর্শী কাতরোক্তিতে দয়াবতী অহল্যার করুণ-হৃদয় ব্যথিত হইল, সেজন্যই তিনি চিতারোহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মলহর রাওয়ের মৃত্যুর পরে খণ্ডে রাওয়ের শিশু পুত্র মালেরাও সিংহাসনারোহণ করিলেন। মালেরাও অতিশয় নির্দ্দয় প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন, রাজ্ঞী অহল্যা ইঁহার পাশবাচরণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যথিত থাকিতেন, ব্রাহ্মণ ও সাধু সন্ন্যাসীদিগকে নানারূপে নির্য্যাতন করিয়া তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। রাজ্ঞী অহল্যা পুত্র কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগকে উপযুক্তরূপ পুরস্কারাদিদানে এবং স্নেহের বচনে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে এই পশু প্রকৃতির নরপতি সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া কেবল নয় মাস কাল জীবিত ছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পরে অহল্যাবাই স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। এরূপ প্রতিভাশালিনী রমণী এবং আদর্শ সাম্রাজ্ঞী পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। ইনি একদিকে যেমন বলিষ্ঠ দেহা বীর-রমণী ছিলেন, অন্যদিকে আবার তেমনি ধর্ম্ম পরায়ণা ও রাজনীতি প্রয়োগে সুদক্ষা ছিলেন। তিনি সুপবিত্র ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য ও স্নানের পর পূজা আহ্নিকাদি করিয়া কিয়ৎকাল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করতঃ ব্রাহ্মণ ভোজন করাই-তেন, ব্রাহ্মণেরা আহারাদি করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলে পর তিনি স্বয়ং আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর রাজোচিত বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক দরবারে গমন করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজকার্য্যাদি করণান্তর পুনরায় সাংয়কৃত্য ও জলযোগ করিয়া রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাজ্যের ও প্রজাগণের মঙ্গল ও শান্তি সুখের নিমিত্ত ইঁহার প্রত্যেক বিষয়েই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার শাসন সময়ে প্রকৃতি-পুঞ্জ সর্ব্ববিধ সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছিল। এই বীর্য্যবতী ও গুণবতী মহিলার মহচ্চরিত্র প্রত্যেকেরই সবিশেষ আলোচনার যোগ্য। ইঁহার ন্যায় ধৈর্য্যবতী ও কর্ম্মনিষ্ঠা রমণীও জগতে অতি বিরল। অহল্যার জীবনের পবিত্রকাহিনী ভারত-ললনা-কুলের গৌরব-কিরীট-মণি। ইনি কাহারও অন্যায় প্রশংসা শুনিতে পারিতেন না, একবার একজন ব্রাহ্মণ অহল্যার দয়ালাভ করিবার জন্য অহল্যার গৌরববাণী পূর্ণ একখানা



রাজা মানার—নাগাপট্টম

কুন্তলীন প্রেস।

গ্রন্থ রচনা করিয়া অহল্যাকে শুনাইয়াছিলেন; আত্মপ্রশংসা শুনিতে সঙ্কুচিতা রাজ্ঞী অহল্যা ব্রাহ্মণের অনুরোধে সমুদয় গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, "আমি অতি পাপীয়সী রমণী, এত প্রশংসার যোগ্য নহি," ইহা বলিয়া তন্মুহূর্ত্তেই গ্রন্থখানা নর্ম্মদা সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। এ জগতে সকলেই আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভাল বাসে, কিন্তু কয়জন এরূপ আত্ম-প্রশংসা শুনিতে বিমুখ দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি দেখা যায়? অহল্যাবাইকে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে যেরূপ মর্ম্ম পীড়িতা হইতে হইয়াছিল,—এতটা বোধ হয় অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। পুত্র মালেরাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যা তাহার কন্যা মুক্তা বাইর একটী পুত্রকে নিকটে রাখিয়া পুত্রবৎ পালন করিতেন, কারণ মুক্তা বিবাহের পর হইতেই স্বামী গৃহে বাস করিত। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে যিনি যত সৎলোক, তাঁহার অদৃষ্টেই তত ক্লেশ ও শোক ভোগ। পুণ্যবতী রাজ্ঞী অহল্যার জীবনালোচনা করিলে এই সত্যটী আরও দৃঢ় হয়। মুক্তার যে শিশু সন্তানটিকে তিনি নিজের উত্তপ্ত হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া স্নেহে লালন পালন করিতেছিলেন, বিধাতার বিচিত্র বিধানে সেই শিশুটী যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, একদিকে এইরূপ দারুণ শোক, অন্যদিকে আবার দেখিতে দেখিতে এক বৎসরের মধ্যেই মুক্তার পতি বিয়োগ হইল। মাতার অনুরোধ উপরোধ ও চক্ষের জলে না ভুলিয়া সাধবী সতী মুক্তাবাই স্বামীর সহিত চিতারোহণে আত্ম-বিসর্জ্জন করিল। যখন পবিত্র তোয়া নর্ম্মদার তীর আলোকিত করিয়া চিতা জ্বলিতেছিল, সে সময়ে ধৈর্য্য সহকারে অদূরে দাঁড়াইয়া অহল্যা তদীয় প্রিয়তমা কন্যার প্রাণ বিসর্জ্জন দেখিতে ছিলেন। অগ্নি শিখা মুক্তার শরীর স্পর্শ করায় মুক্তা যখন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল তখন মাতৃ হৃদয়ের প্রবল স্নেহোচ্ছ্বাসে তিনি উন্মত্তার ন্যায় কন্যার চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন, সে সময়ে কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিরস্ত করিয়াছিল। কন্যার শোকে অহল্যা এতদূর ব্যথিতা হইয়াছিলেন যে তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত আহার্য্য গ্রহণে নিরস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া এই পূতশীলা রমণী সংসারের পঙ্কিলতা হইতে পুণ্যলোকে প্রয়াণ করিলেন।

সংসারে অনাশক্ত হইয়াও ইনি প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত যখন স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন, তখনও ইনি যথাসাধ্য রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। অহল্যা চলিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, যতদিন ভারতবর্ষে মানুষের চিহ্ন থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এই সর্ব্বত্যাগিনী হিন্দু-বিধবার আদর্শ-মহিমা কর্ম্মক্ষেত্রে মহিলাকুলের পরম আদরণীয় ও একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়া থাকিবে। আমরা যেন শুনিতে পাইতেছি,—জগতের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্য হইতে চির বিজয়ী মহাকাল বলিতেছে, "অহল্যা তুমি একদিন ছিলে, এখনও আছ এবং অনন্ত কাল রহিবে, আমার সাধ্য নাই যে তোমাকে আমি ধ্বংস করিতে পারি।" রাজ্ঞী অহল্যাবাই দুহিতার ও জামাতার উদ্দেশে যে স্মৃতি মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সারজন ম্যালকম বলেন যে, ভারতবর্ষে এইরূপ মাতৃস্নেহের নিদর্শক সুন্দর স্মৃতি সৌধ আর কোথাও নাই।

ইন্দোরে মহারাজ্ঞী কৃষ্ণাবাই নির্ম্মিত গোবিন্দের মন্দির অবশ্য দ্রষ্টব্য। স্থানীয় রেসিডেণ্টের প্রাসাদটী একটী উদ্যান মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হয়। এখানকার হাঁসপাতাল অস্ত্র চিকিৎসার জন্য সর্ব্বপ্রধান। দেশীয় রাজ্য, কাজেই দেশী প্রথানুসারে অনেক স্বামী অবিশ্বাসিনী পত্নীর নাসিকা ছেদন করিয়া দেয়, এই সমুদয় কর্ত্তিত নাসিকা রমণীরা ছিন্ন নাসা বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া হাঁসপাতালে উপস্থিত হয় এবং চিকিৎসাগুণে অনেকেরই নাসিকোদ্গম হয়, সেজন্যও মধ্যভারতে ও রাজপুতনায় এই হাঁসপাতালের বিশেষ প্রাধান্য।

শিবাজী রাওয়ের পিতা মহারাজা তুকাজী রাও হোলকার নানা সদ্‌গুণালঙ্কৃত নরপতি ছিলেন। তিনি উৎসাহী, পরিশ্রমী ও পরিমিতব্যয়ী ছিলেন। ইনি কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, ইংরেজী, মারাঠী, সংস্কৃত ও পারশী ভাষায় ইঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। মহারাজা দেখিতে দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ পুরুষ, অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিলেন। প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য এবং সর্ব্ববিধ নাগরিক উন্নতির জন্য ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ইংরেজদিগের গূঢ় কূট নীতি সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা

করিতেন। এই মহাত্মার মৃত্যুর পরে ১৯০: খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী যুবরাজ বালাসাহেবকে গদী প্রদান করেন তিনি মহারাজা তুকাজীরাও হোলকার নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ইঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসরের বেশী হইবে না, ইনি এখনও ইন্দোর রাজ-কুমার কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

উজ্জয়িনী যাত্রা।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ইন্দোর হইতে উজ্জয়িনী রওয়ানা হইলাম। অন্ধকার ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকট দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। রজনী অন্ধকারময়ী, অতি ক্ষীণ আলোকে রেলপথের উভয় পার্শ্বস্থ নিবিড় অরণ্য ও দূরস্থিত গিরিশ্রেণী নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। ষ্টেসনের পর ষ্টেসন ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতে লাগিলাম। শরদের নির্ম্মল গগনে অসংখ্য তারকারাজি নৈশ-সুন্দরীর নীল কেশে অনন্ত রত্নরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, আমাদের পাশের গাড়ীতে একটা হিন্দুস্থানী তন্দ্রালস কণ্ঠে গাহিতে ছিল,—

"ক্যায়সে কাটোঙ্গি রয়না, সো পিয়া বিনা।
একেলি জাগি স্বজনি আজু মরি মা, নয়নামে নিদনা
আওয়ে চড়ি সৈঁইয়া।"

তাহার এই বিরহ-সঙ্গীতে কাহারও হৃদয় মাঝে বিরহের হা-হতাশ জাগিয়া উঠিয়াছিল কি না জানি না! তবে আমাদিগকে নিদ্রার তাড়নায় বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, কিয়ৎকাল পরে নিদ্রাদেবী আমাদিগকে তাঁহার স্নেহ-কোমল অঙ্কে টানিয়া লইলেন। পথে ফতেয়াবাদ ষ্টেসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া অতি প্রত্যূষে উজ্জয়িনীতে উপনীত হইলাম। তখনও নৈশান্ধকার একেবারে দূরীভূত হয় নাই, তখনও ঊষার রক্তিম-রশ্মি পূর্ব্ব গগনে ভাল করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই, তখনও বিহগগুলি একেবারে কুলায় পরিত্যাগ করে নাই। প্রভাতীয় মৃদুমন্দ সমীরণ সেবনে সমুদয় ক্লান্তি অপসৃত হইল। দূর হইতেই সৌধমালিনী নগরীর নানাবিধ মঠ ও গগনস্পর্শী উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট দেবমন্দিরগুলির শ্বেতচ্ছবি আমাদিগের হৃদয়ের উপরে একটা অযাচিত আধিপত্য বিস্তার করিয়া দিল। আমরা নবরবির কনক কিরণ-রেখা-রঞ্জিত হসিত সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে নগরে প্রবেশ করিলাম।

অবন্তী বা উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনী অতি প্রাচীন নগরী। মহাভারতের সময়ে ইহার নাম ছিল অবন্তী, কিন্তু পৌরাণিক সময় হইতে ইহা উজ্জয়িনী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এস্থানের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। পুরাকালে কত রাজা, মহারাজা যে এই পুণ্যক্ষেত্রে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সে ইতিহাস উদ্ধার করা সুকঠিন। "মহাবংশ" নামক সিংহলীদিগের বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মহারাজা অশোক কিয়ৎকাল উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সাধারণ কথা।

যিনিই উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করুন, কিন্তু কেহই রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় খ্যাতিমান হইতে পারেন নাই। উজ্জয়িনীর কথা মনে হইলেই সে মুহূর্ত্তে মহারাজা বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাস প্রভৃতি "নব রত্নের" কথা মনে পড়ে। এই মহাত্মার রাজত্ব সময়ে উজ্জয়িনী যেমন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল এরূপ আর কখনও হয় নাই। তখন উজ্জয়িনী সত্যসত্যই রত্নশালিনী ছিল। সে সময়ে ধনে, জ্ঞানে ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে এস্থান জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। একদিকে বরাহমিহির প্রভৃতি মনীষীগণের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে কবীন্দ্রকালিদাসের মধুময়ী লেখনীর মধুময় ঝঙ্কার! একদিকে চন্দ্রালোক, অন্যদিকে বিদ্যুৎ-প্রতিভা-স্ফূরিত অপূর্ব্ব জ্যোতি। তখন নগরবাসিগণ নিত্য নব নাটকাভিনয় দর্শনে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিত, কবিতার সুমধুর স্বর-লহরীতে চারিদিক আমোদিত হইত, হায়! কোথায় সেইদিন? কেবল নির্ম্মল সলিলা শিপ্রা এখনও—

"কল কল ভাষে বহিয়ে কাহিনী
কহিছে সবে কি পুরাতন—ও।"

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চিয়ঙ্ উজ্জয়িনী দর্শন করিতে আইসেন তখনও তিনি এস্থানে বহু লোকের বাসভূমি ও উন্নতিশালী সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়েও এস্থানে মহাযান ও হীনযান এই উভয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ

প্রাচীন তত্ত্ব।

অবস্থিতি করিতেন এবং স্বাধীন ক্ষত্রিয় নরপতি রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সে সুখের দিন চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, আর কি সে সুখ সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে ? যে দিন একবার যায় সেত আর ফিরিয়া আসেনা! বর্ত্তমান উজ্জয়িনী ও প্রাচীন উজ্জয়িনী এক নহে। প্রাচীন উজ্জয়িনী নিজপূর্ব্ব গৌরব বৈভব লইয়া মাতা বসুন্ধরার কোলে অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান উজ্জয়িনী প্রাচীন উজ্জয়িনীর উত্তর পার্শ্বে নির্ম্মিত। প্রাচীন উজ্জয়িনী বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর দক্ষিণদিকে বিলুপ্ত অবস্থায় আছে। মৃত্তিকা খনন করিলে প্রায় ১২।১৩ হাত ভূমির নীচে এখনও নগরের প্রস্তর নির্ম্মিত অভগ্ন স্তম্ভ সকল প্রথিতাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কতকাল হইল প্রাচীন উজ্জয়িনী ভূমিমধ্যে নিহিত আছে এবং কি কারণে ভূমিসাৎ হইল তাহার কোনওরূপ প্রমাণ বিদ্যমান নাই এবং এ বিষয়ে কেহ কোনওরূপ সঠিক মন্তব্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। উজ্জয়িনী একটী অতি বিখ্যাত তীর্থ স্থান। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির নিকটই ইহা একটী মহাতীর্থ।

নানা বিষয়।

এস্থানে পাণ্ডারা যাত্রী লইয়া বড়ই গোলমাল করে এবং সেজন্য ভ্রমণকারীর বহু সময় ব্যয় হয়, এ নিমিত্ত প্রথমেই পাণ্ডা ঠিক্ করিয়া লওয়া উচিত, আমাদের পাণ্ডার নাম ছিল কানাইলাল তেওয়ারী।

এ নগরে বহুতীর্থ বিরাজিত। আমরা সর্ব্ব প্রথমে বিখ্যাত মহাকাল শিবমন্দির দর্শনার্থ গমন করিলাম। এই শিবের মন্দির অত্যন্ত বৃহৎ। মহাকালের এই বৃহৎ ও সুন্দর মন্দিরটী দর্শন করিলে প্রাচীন যুগের হিন্দু শিল্পিগণের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে ইহা নির্ম্মাণ হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ মহাভারতের বন-পর্ব্বেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়েও মহাকালের এই অধিষ্ঠিত ক্ষেত্র কোটি তীর্থ নামে পরিচিত ছিল ; যথা ঃ—

"মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ
কোটি তীর্থ মুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ॥"

মহাভারত বনপর্ব্ব (অধ্যায়)।

স্কন্ধ, মৎস্য, এবং নারসিংহ প্রভৃতি পুরাণেও এই মহাকাল শিবলিঙ্গের

বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। ইহা একটী বিখ্যাত পীঠস্থান। এই সুবৃহৎ দেবালয় রক্ষার জন্য এবং ইহার সেবার্থ অনেক রাজা মহারাজা মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়া মাসিক ৩০০৲ বরোদার মহারাজা গাইকোঁয়ার মাসিক ১২০৲ ইন্দোরের মহারাজা হোলকার মাসিক ৬০৲ দেবাসের প্রমর ভূপতিগণ ৫০৲।৬০৲ প্রদান করিয়া থাকেন। 'ফিরিস্তায়' লিখিত আছে যে "এই মন্দির সোমনাথ মন্দিরের সমতুল্য। ইহার বৃহৎ স্বর্ণস্তম্ভ সমূহ মণিমাণিক্য খচিত ছিল। গর্ভ-গৃহ মধ্যে একটী সামান্য আলোক জ্বালাইয়া দিলে সেই আলোক অসামান্য হীরকে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত মন্দির উজ্জ্বল করিয়া ফেলিত। আল্‌তমাস্ মন্দিরের সমুদয় মণি, মাণিক্য রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়া মন্দিরের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। সে সময়ে মন্দিরের পাণ্ডারা বহু যত্নে লিঙ্গমূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করিয়া অতি গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। শত বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তি মন্দিরের পুনঃ সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এখনও বহু দূর হইতেই মন্দির চূড়াস্থ সুবর্ণ কলস যাত্রিগণের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দেয়।

মন্দিরের কথা।

মহাকাল এই বৃহৎ মন্দিরে বাস করেন না মন্দিরের সন্নিকটে দক্ষিণদিকে একটী ক্ষুদ্র দরোজা আছে, সেই দ্বার দিয়া একটী সুরঙ্গে প্রবেশ করণান্তর পাষাণময় সোপানপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই একটী কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই মন্দির মধ্যে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজমান। লিঙ্গের চারিদিকে ঘৃতের প্রদীপ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, যদি এ সমুদয় দীপ এ স্থানে না থাকিত, তবে প্রখর দিবালোকেও এই স্থানে সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইত। এ স্থানে বাতাস প্রবেশের সেরূপ সুপ্রশস্ত পথ না থাকায় এবং প্রতিনিয়ত জন-স্রোতে আবৃত থাকায় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইতেছিল, বহু স্ত্রী পুরুষ শিবার্চ্চনায় নিরত ছিলেন, ভক্তবৃন্দের ঘন ঘন সমবেত কণ্ঠে বম্ বম্ ধ্বনি বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। আমরা পূজা ইত্যাদি সমাপনান্তে বহু কষ্টে ও ত্রস্ততার সহিত উপরে উঠিয়া আলো ও বাতাসের মুখ দেখিয়া

প্রাণ বাঁচাইলাম। বড় মন্দিরের প্রধান দ্বার সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে, উহার সম্মুখে একটী সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত বারান্দা, বারান্দার অনতিদূরে প্রাচীন একটী জলাশয়, এই জলাশয়ের চতুর্দ্দিকেই পাষাণ বিনির্ম্মিত সোপাণশ্রেণী বিরাজিত। মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রধান দ্বারের অগ্রভাগে একটী অতি প্রকাণ্ড ঘণ্টা দোদুল্যমান, যাত্রিগণ মহাকালের অর্চ্চনান্তর ফিরিবার সময়ে প্রত্যেকেই এক এক বার ঘণ্টায় আঘাত করিতেছে, ঘণ্টার সেই ঢন্ ঢনা ঢন্ রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমাদের নিকট এই দেব-মন্দির তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হয় মুসলমান-গণের আক্রমণ সময় হইতেই শিবলিঙ্গ এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কারণ সুরঙ্গাভ্যন্তরস্থ মন্দিরটীকে আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বাহিরের মন্দিরটী বহু প্রাচীন নহে, মহাকাললিঙ্গ প্রাচীন, কিন্তু তাহার মন্দির বহুকালের প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

কেদারেশ্বর—আমরা মহাকালের মন্দির হইতে কেদারেশ্বর দর্শনার্থ গমন করিলাম। একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে কেদারেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। অবন্তীখণ্ডের মতে এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।

এই লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে কোনও এক সময়ে হিমালয়বাসী ব্যক্তিগণ অসহ্য হিম সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট তৎ প্রতিকার প্রার্থী হন; মহাদেব তাহাদের দুঃখে দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া হিমালয় পর্ব্বতকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে হিমগিরি উত্তর করিলেন যে "যদি আপনি আমার শিখরদেশে আসিয়া বাস করেন, তবে আমি চিরকাল আপনার অর্চ্চনা করিয়া ধন্য হইব এবং বৎসর মধ্যে আট মাস কাল আমার হিমের প্রভাব হ্রাস করিব।" ভোলা মহেশ্বর ভক্তবৃন্দের ক্লেশ হ্রাস করিবার নিমিত্ত হিমালয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং গিরিরাজের একটী উচ্চ শেখরস্থ কুণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন।

এ স্থানে যোগী, ঋষি ও সাধু মোহন্তগণ কেদারেশ্বর নামে তাঁহাকে

অভিহিত করিয়া পূজা করিতে লাগিল। কালক্রমে মানবের কলুষ রাশিতে যখন পৃথিবী কলঙ্কিত হইল, তখন দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলেন।

একদিন কয়েকজন মহর্ষি কেদারেশ্বর দর্শনার্থ হিমাদ্রি শেখরে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা তথায় কেদারেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত মনের দুঃখে তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন সহসা দৈববাণী হইল যে "মহাকালের বনে যাও, শিপ্রা নদীর উপর আমাকে দর্শন পাইবে।"

ঋষিগণ মনের আনন্দে দেবাদিদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন এবং প্রেমাকুল চিত্তে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে স্রোতস্বিনীর বক্ষে একটী শিলা ভাসিয়া উঠিল, ঋষিগণ তাঁহাকেই কেদারেশ্বর বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উজ্জয়িনীতেও পাপস্পর্শ করায় পুনরায় কেদারেশ্বর সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মহাবলী বৃকোদর ঋষিগণের সহিত পুনরায় কেদারেশ্বরকে পাওয়ার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একজন ঋষি ভীমকে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত বৃষ তাহার নীচ দিয়া যাইবার আদেশ করিলেন, একে একে সমুদয় বৃষই চলিয়া গেল কেবল একটী বৃষ কিছুতেই গেলনা, ভীম তাহাকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া মাত্রই বৃষরূপী কেদারেশ্বর পুনরায় ভূমি মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কেদারেশ্বর পুনর্ব্বার হিমালয়ে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার মস্তক হিমালয় এবং দেহ উজ্জয়িনীতে রহিল। আবার এরূপ কিংবদন্তীও শুনিতে পাওয়া যায় যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ কালে উজ্জয়িনীতে এই শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হন।

এই নগরীতে বহু ভৈরব মূর্ত্তি ও ভৈরব মন্দির আছে। শিপ্রা নদীর দক্ষিণতটস্থ ভৈরব গড় দর্শনীয়। ইহার আকার অশ্বখুরের ন্যায়। শিপ্রাতীরে ইহা প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, গড়ের প্রাচীর এবং কতকগুলি প্রাচীন দ্বার দিয়া এই গড়ে প্রবেশ করিলে দক্ষিণদিকে একটী সুবৃহৎ দেবালয় দৃষ্ট হয়, দৃষ্টিপথে পতিত এই দেবালয়ের নাম কালভৈরবের মন্দির।

এই মূর্ত্তি বহুকালের প্রাচীন বলিয়াই অনুমান হয়। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকে যে কালভৈরব উজ্জয়িনী নগরীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই মন্দির মধুজী সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। উজ্জয়িনীর কালীয় দীঘী (কালীয়দী) অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এ স্থানের মনোরম দৃশ্য চিত্ত-মুগ্ধকর। কালীয় দীঘী যাইবার পথও আমাদিগের নিকট অতি সুন্দর বোধ হইয়াছিল। মাঠের মধ্য দিয়া পথ। শরৎকাল, বিশেষ এসব অঞ্চলে শীতাধিক্য, কাজেই সূর্য্যের কিরণ তত প্রখর বোধ হইতেছিল না। মৃদু মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া আমাদের শ্রম-কাতর দেহে সজীবতা ঢালিয়া দিতেছিল। কোথাও বা গো-মহিষাদি পশুগণ বিচরণ করিতেছিল, কোথাও বা মাঠের কিনারায় বসিয়া বাল্যকালের স্বভাব-জাত চঞ্চলতার উচ্ছ্বাসে চাষার ছেলেরা 'কন্হাইয়া লাল হো, কন্হাইয়া লালা' রবে অতীতের কোন্ এক দুষ্ট—গোয়ালার ছেলের নামোল্লেখ করিয়া মধ্যাহ্নের রৌদ্রের মধ্যে নিজেদের তৈরী সুরে গলা সাধিতেছিল। চারিদিকের একটা প্রসন্ন মধুরতার তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করিতে করিতে আমরা কালীয় দীঘীতে পঁহুছিলাম। বৃন্দাবনে যেরূপ কালীয়দহে শ্রীকৃষ্ণরূপ বিরাজিত আছে, এখানেও তদ্রূপ দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কালীয় দীঘীর মধ্যস্থলে দ্বীপাকার ভূমিখণ্ডের উপর একটী জল প্রাসাদ অবস্থিত। দীঘীর কালো জলে এই প্রাসাদের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া ছোট ছোট বীচিমালার সহিত ধীরে ধীরে দুলিতেছিল,—সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে এই জল-প্রাসাদটি নাসির-উদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দৃষ্টে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। জল-প্রাসাদে যাতায়াতের জন্য সেতু আছে। কাহারও কাহারও মতে মহারাজা বিক্রমাদিত্য গ্রীষ্মকালে যে জল-প্রাসাদে বাস করিতেন ইহা তাহাই; আমাদেরও বিশ্বাস এই প্রাসাদ মহারাজা বিক্রমাদিত্যেরই নির্ম্মিত; মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়, যথা —

কালীয় দীঘী।

"নিশাঃ শশাঙ্ক-ক্ষতনীল রাজয়ঃ
ক্বচিদ্ বিচিত্রং জল যন্ত্র-মন্দিরং।

মণি প্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং
শুচে প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥”
(ঋতুসংহারকাব্যম্)

বর্ত্তমান সময়ে যদিও এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে কোনও ফোয়ারা নাই, কিন্তু পূর্ব্বে যে অনেকগুলি ফোয়ারা ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ প্রণালী অতীব চমৎকার। যেরূপ উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী উপাদানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে দুই চারি সহস্র বর্ষে ইহা ধ্বংস হইবেনা, কারণ নিয়ত জলস্রোতে এতদিনেও ইহার কিছুমাত্র বিকৃতি সাধিত হয় নাই। প্রাসাদ-প্রাচীর গাত্রে সর্পোপরি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। নটবর বংশীধারীর চতুর্দ্দিকে গোপীগণ জোর হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া পরিধেয় বস্ত্র প্রার্থনা করিতেছে। কাহারও কাহারও মতে এই স্থানেই অবন্তীখণ্ডোক্ত ব্রহ্মকুণ্ড ছিল, কাল ক্রমে সেই ব্রহ্মকুণ্ডই কালীয়দী নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবুলফজল প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডের কোনও কথা উল্লেখ করেন নাই; তাহাদের পুস্তকে কেবল কালীয় দীঘীর নামই দৃষ্ট হয়। উজ্জয়িনীর দশাশ্বমেধের নিকটে একটী তীর্থ আছে তাহার নাম “অঙ্কপাত”। এই স্থানটী বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রিয়। কথিত আছে যে কৃষ্ণ বলরাম সান্দীপাণী মুনির নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে অঙ্কপাতে লিখিতে আরম্ভ করেন, সেজন্য ইহার নাম অঙ্কপাত হইয়াছে। এস্থানে বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি আছে। কেহ কেহ বলেন মলহর রাও, আবার কেহ কেহ বলেন রঙ্গরাও আপ্পা এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। রাজ্ঞী অহল্যাবাইর নির্দ্ধারিত বৃত্তি অনুসারে প্রত্যহ এখানে দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে। এই তীর্থের কিয়দ্দূরে দামোদর, গোমতী, বিষ্ণুসাগর প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন কুণ্ডের খাত দৃষ্ট হয়। আমরা এ সমুদয় তীর্থাদি দর্শন করিয়া হর্ষদ্বীপস্থিত কালিকা-মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য গমন করিলাম। এই স্থানটি কালীয়দীঘী হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। স্থানটী অতিশয় নির্জ্জন, মন্দির সমীপে মহীরুহরাজি উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত মাঠ, লোকালয়ের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে এই দ্বীপের

চারিধারে সুবিস্তৃত দীর্ঘিকার কৃষ্ণ বারিরাশি রঙ্গে ভঙ্গে ক্রীড়া করিত। তখন সত্য সত্যই এই স্থান অতিশয় মনোরম অথচ ভয়াবহ ছিল। সেই বহুদূর ব্যাপী সরোবর সমূহ এখন বিশুষ্ক। দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে দেব মন্দির বিরাজমান। লোকে এই কালী মন্দিরকে বিক্রমাদিত্যের স্থাপিত কালিকা মূর্ত্তি কহে। দূর হইতেই এই অত্যুচ্চ দেব মন্দিরটী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সুবৃহৎ মন্দির মধ্যস্থ বিশাল কায়া লেলিহান রসনা কালিকা দেবী দর্শন করিলে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ইনি এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিশিষ্ট বৃহদাকার শিবের বক্ষে পদস্থাপন পূর্ব্বক দণ্ডয়মানা। দেবালয়ের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে হাড়ীকাট প্রথিত আছে, পূর্ব্বে নাকি এস্থানে নরবলি পর্য্যন্ত হইয়াছে। আমরা অন্য কোথাও এত বড় ভয়ঙ্করা কালিকা মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তি সত্য সত্যই ভীতিপ্রদা। মন্দিরের দ্বার দেশে সশস্ত্র প্রহরী নিয়ত দণ্ডায়মান থাকে। এখানে দেবীর পূজা নির্ব্বাহার্থ ২।৩ জন ব্রাহ্মণ আছে। সময়ে সময়ে এস্থানে অনেক রাজা মহারাজা ও পূজা দিতে আসিয়া থাকেন।

হর্ষ দ্বীপ।

উজ্জয়িনীর সিদ্ধনাথের ঘাট সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী শুনিতে পাইলাম। পূর্ব্বে নাকি এস্থানে নাগ কন্যাগণ আসিয়া ক্রীড়া করিতেন। তাহাদের উপরার্দ্ধ স্বাভাবিক নারীমূর্ত্তি এবং অপরার্দ্ধ মৎস্যের মত। এখন আর নাগকন্যাগণের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় না।

সিদ্ধনাথ তীর্থ।

নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে যোগসহীদ বা যোগসিদ্ধ নামক একটি পর্ব্বত আছে, অনেকে বলিলেন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন ইহার নীচেই প্রোথিত ছিল। আমরা সূর্য্যাস্তের প্রায় ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে পর্ব্বতারোহণ করিলাম, এস্থান হইতে উজ্জয়িনীও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগ্রামের দৃশ্য যেইরূপ সুন্দর বোধ হইতে লাগিল তাহা অবর্ণনীয়; দূরস্থিত মাঠ ও তরুসমাকীর্ণ পল্লীগ্রাম সমূহ রমণীয় কুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, নগরের সৌধশ্রেণী ও মঠশীর্ষ সমুদয়ই আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিল, সমুদয় দৃশ্যাবলী একখানা আলেখ্যের ন্যায় নয়ন সমক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছিল। উজ্জয়িনী-তল-বাহিনী নির্ম্মল-সলিলা শিপ্রাতরঙ্গিনী একখানা শুভ্র বস্ত্রের

ন্যায় বোধ হইল। ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগন-প্রান্তে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন, অস্তগামী ভানুদেবের লোহিত রশ্মিমালা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল, আমরাও সন্ধ্যা-সুন্দরীর শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে ভর্ত্তৃগুহা ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সমূহ দর্শন করিলাম।

ভর্ত্তৃ-গুহা।

উজ্জয়িনী নগরের এক পার্শ্বে ভর্ত্তৃগুহা অবস্থিত। এ স্থানটীও বিশেষ নির্জ্জন। কথিত আছে যে মহারাজা ভর্ত্তৃহরি স্ত্রীর চরিত্র-দোষে সংসারে বীতরাগ হইয়া এ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানটী প্রায় সকল লোকেই অবগত আছেন, কাজেই আমরা এ স্থানে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। একটী দক্ষিণ দ্বারী মন্দিরের মধ্য দিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। গুহাটী ত্রিতল। প্রস্তরময় সোপান-শ্রেণী দ্বারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ নিম্নাবতরণ করিতে হয়। ভূগর্ভে বায়ু-সঞ্চার-রহিত স্থানে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, সময়ে সময়ে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে। গুহার ভিতরে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাথা ঠেকে। গুহার মধ্যে তিন দিকে থাম দৃষ্ট হয়, থামের মধ্যে কতকগুলি অস্পষ্ট মূর্ত্তি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কক্ষে যে সমুদয় মূর্ত্তি বিরাজমান তাহার অধিকাংশই বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি। একটী মন্দিরের উপরে গোরক্ষনাথ ও নিম্নে তাঁহার শিষ্য ভর্ত্তৃহরির মূর্ত্তি আছে, ভর্ত্তৃহরির মূর্ত্তির পার্শ্বে তদীয়া মহিষী পিঙ্গলার মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে কয়েকটী লিঙ্গমূর্ত্তিও দৃষ্ট হইল। তন্মধ্যে কেবল কেদারেশ্বরের লিঙ্গের পূজা হয়। প্রদীপের সাহায্য ব্যতীত গুহায় অবতরণ করা এবং তাহা দর্শন করা অসম্ভব। এখানে একজন সাধু বাবাজী আছেন, তিনিই দর্শনকারীকে সমুদয় দর্শন করাইয়া থাকেন। আমরা এস্থান হইতে মহারাজা বিক্রমাদিত্য বীরাচার মতে শক্তি-সাধনা করিয়া যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই কালী মন্দির দর্শনার্থ গমন করিলাম। ইহা নগর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। নদীর তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলাম; সূর্য্যদেব মাথার উপরে কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন, সময়ে সময়ে শাদা শাদা মেঘমালার অন্তরালে লুকাইতেছিলেন। শিপ্রা-শীতল-শীকর-সিক্ত

সমীরণ সেবনে আমরা বিশেষ ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই গিরিশ্রেণীর সন্নিকটস্থ প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী একটী প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দির নয়ন-পথে পতিত হইল। আমরা ক্রমে মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইলাম। এরূপ বিজনস্থানে আগমন করিলে মনের ভিতর অতি বড় সাহসী পুরুষেরও ভয়ের সঞ্চার না হইয়া যায় না। স্থানটি বড়ই বিজন। অদূরে শৈলশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে তাহারি পাদদেশে শ্মশান-বিহারিণী নৃমুণ্ডমালিনী শবাসনা ভয়ঙ্করা কালীর মন্দির। মন্দির মধ্যে কালীমূর্ত্তি অঙ্কিতা আছেন। এই নির্জ্জন ভয়াবহ স্থানে কোনও পুরোহিত বাস করেন না, প্রত্যহ যথারীতি আসিয়া পূজা দিয়া থাকেন মাত্র। পথের ধারে স্থানে স্থানে নরকঙ্কাল ইত্যাদি দৃষ্ট হইল। অদূরে শিপ্রাতীরে শ্মশান ভূমি, কি গম্ভীর, কি নির্জ্জন! এখানে নগরের কল-কোলাহল প্রবেশ করিতে পারে না। নদীর কুলু কুলু ধ্বনি এবং বিহগগণের সুমধুর সঙ্গীত-লহরী ও পবনের মর্ম্মর রব ভিন্ন আর কিছুই শ্রুত হয় না। আমরা এই কালীমূর্ত্তি দর্শনান্তে মঙ্গলেশ্বর, সহস্রধনুকেশ্বর, পিশাচমোচন, দণ্ডাত্রেয়, চামুণ্ডা, সরস্বতী দেবীর মন্দির প্রভৃতি বহু দেবমন্দির দর্শন করিলাম। এই সমুদয়ের মধ্যে সরস্বতী দেবীর মন্দিরই অতীব প্রাচীন, এই মন্দিরে অনেকগুলি মাতৃকামূর্ত্তি আছে, কথিত আছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই মন্দিরে আগমন করিয়া দেবী পূজাদি নির্ব্বাহ করিতেন।

উজ্জয়িনীর চতুর্দ্দিকেই ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কত রাজা মহারাজার এবং কত বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে এস্থানে উত্থান পতন হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সে দিকেই প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদ, প্রাচীর এবং দেবমূর্ত্তি সমূহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উজ্জয়িনীর একস্থানে একটী সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ অবলোকন করিলাম, উহাকে স্থানীয় লোকে বিক্রমাদিত্যের সিংহদ্বার বলিয়া থাকে, ইহা আমাদের নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমাদের ধর্ম্মান্ধ দেশের লোকের সমুদয়ই বিচিত্র, দেখিলাম বহু নর নারী গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সেই সিংহদ্বারকেও দেবতারূপে পূজা করিতেছেন! বিক্রমাদিত্যের না হইলেও হয়ত কোনও পরবর্ত্তী উজ্জয়িনীপতি ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

উজ্জয়িনী নগরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দর্শনোপযোগী বহু দ্রব্য আছে। এখান হইতেই প্রাচীন গ্রীক, বাহ্লিক, শক এবং দেশীয় হিন্দু-নরপতিগণের সময়ের প্রচলিত বহু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন উজ্জয়িনী যে বন মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, সেস্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে বহু পাথর, হীরা, জহরৎ, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, এমন কি সেকালের স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত অলঙ্কার পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, এজন্যই বোধ হয় এ স্থানের নাম "রোজ-গারকা সদাব্রত" হইয়াছে।

এ নগরে জৈনদিগেরও কতকগুলি মঠ আছে, তন্মধ্যে শ্বেতাম্বরীদের দশটী ও দিগম্বরীদের আটটী। কতকগুলি জৈন মঠ আবার হিন্দুদিগের হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে জবরেশ্বর ও জৈনভঞ্জনীশ্বরই উল্লেখ যোগ্য।

উজ্জয়িনীতে একটী অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। প্রায় প্রতি বৃক্ষের তলেই 'সতী স্তম্ভ' দেখিতে পাওয়া যায়, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সতীর যে কত আদর, কত সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল, এ সমুদয় প্রস্তর খণ্ড দেখিলেই তাহা অনুভব করা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণক্রমে এই প্রস্তর সকলে স্ত্রী পুরুষ মূর্ত্তি খোদিত আছে। ব্রাহ্মণ জাতির পরিচয়ের জন্য গো, ক্ষত্রিয়ের পরিচয়ের জন্য অশ্ব প্রভৃতিও ঐ সঙ্গে অঙ্কিত দেখিলাম। স্থানীয় ধর্ম্মশীলা রমণীগণ আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত স্নানান্তে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা এ সকল সতী স্তম্ভের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

সন্ধ্যার সময়ে মহাকালের আরতি দর্শনে গমন করিলাম। দেখিলাম রাজপথে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া বহু নর নারী আরতি দর্শনার্থ গমন করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ও উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। আমরা যখন মন্দিরে উপনীত হইলাম, তখন আরতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ভয়ানক জনতা! ভক্তবৃন্দের বম্ বম্ রবে ও সুমধুর স্তোত্র ধ্বনিতে যে কি এক প্রাণারাম পবিত্র ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মহাকালের মন্দিরস্থ প্রদীপগুলির বর্ত্তিকা অগুরু চন্দন, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতিতে রচিত হওয়ায় এবং ধূপ ধূনার সৌগন্ধে কক্ষটী সৌরভামোদিত বোধ হইয়াছিল।

প্রতি সোমবার দিবস মন্দিরের সেবকেরা পঞ্চমুখী মুকুট লইয়া মহা সমারোহে কুণ্ডাভিমুখে গমন করে, সে সময়ে মন্ত্র পাঠ ও জয়ধ্বনি হইতে থাকে এবং দুই দিক্ হইতে পাণ্ডাগণ ময়ূরপুচ্ছের চামর বীজন করে। মুকুট জলাশয় তীরে আনীত হইলে প্রধান পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উহা ধৌত করিয়া মন্দিরে আনয়ন করতঃ মহাকালের মাথায় পরাইয়া দেন, তখন মহাকাল কৌষেয় বসন পরিধান পূর্ব্বক মণি-মাণিক্যেবিভূষিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করেন এবং ভক্তবৃন্দের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দেব-মন্দিরের সমুদয় কার্য্যভার তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ ও বাহোরী নামক কতক-গুলি মাড়োয়ারীর উপর ন্যস্ত আছে। মহাকাল শিবলিঙ্গ সাধারণতঃ "অনন্ত-কল্পেশ্বর" নামে পরিচিত।

এস্থানে গুজরাটী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। রামসনেহী, দাদু, কবীর পন্থী, রামাৎ, রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ও উজ্জয়িনীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

বর্ত্তমান উজ্জয়িনী নগরী কে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন যুগে মহারাজা বিক্রমাদিত্য এবং তাহার পরবর্ত্তী অধীশ্বরগণের পরে ভোজবংশীয় নৃপতিগণও কিয়দ্দিনের নিমিত্ত এস্থানে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খিলিজির সময় হইতে ইহা মুসলমানগণের হস্তে পতিত হয়। ১২৯৫—১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক এক জন রাজপ্রতি-নিধির উপরে শাসনভার অর্পিত ছিল। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান শাসন-কর্ত্তা স্বাধীনতা লাভ করেন এবং ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর গুজরাটের রাজা, বাহাদুর সাহ কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী অধিকৃত হয়। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর সাহ এই স্থান জয় করেন। এস্থানের নিকটেই ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীব ও দারা এই দুই সহোদরে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র নরপতি বাজীরাও পেশোয়া মালব প্রদেশ ও তাহার রাজধানী উজ্জয়িনী অধিকার করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে হোলকার এই স্থান দখল করিয়া বহুস্থান দগ্ধ করিয়া ফেলেন, তৎপরে সিন্ধিয়ার হস্তগত হয়। এখন এই প্রাচীন নগরীর শাসনভার ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের মিত্ররাজ সিন্ধিয়ার উপরেই

অর্পিত আছে। আধুনিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে রাজবাটী, রাজকীয় বিচারালয়, পোলিশষ্টেসন, সৈন্যাবাস, সংস্কৃত-পাঠশালা ও কালেজ। রাজ-প্রাসাদের উন্নত শীর্ষে লোহিতবর্ণের পতাকা পত্ পত্ করিয়া উড়িতেছিল, এই প্রাসাদ মধ্যে মহারাজ সিন্ধিয়ার নিযুক্ত ফৌজদার (শাসনকর্ত্তা) বাস করেন। এ নগরের লোক-সংখ্যা প্রায় চৌত্রিশ হাজার হইবে। উজ্জয়িনীতে বহু ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাস, কাজেই আচার ব্যবহার ইত্যাদিও বহু বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থানের বণিক রমণীদের পরিচ্ছদ বেশ সুরুচিসঙ্গত ও সুন্দর। স্ত্রী ও পুরুষেরা সাধারণতঃ সুন্দর ও সুন্দরী। উজ্জয়িনীবাসিনী রমণীরা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রমণীদিগকে পণ্ডিতা কহিয়া থাকে।

উজ্জয়িনীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দূরে একটী প্রান্তর মধ্যে অদ্যাপিও "মৃচ্ছকটিক" নাটকোক্ত জীর্ণোদ্যান দৃষ্টিগোচর হয়। সেই অতি প্রাচীন যুগের তেঁতুল, আম, বট প্রভৃতি মহীরুহরাজি অদ্যাপিও দৃষ্টি পথে পতিত হয়। তাহারা আছে, কিন্তু সেই চারুদত্তই বা কোথায়, আর প্রেম-বিহ্বলা সুন্দরী-কুল অগ্রগন্যা সুচরিতা বসন্তসেনাই বা কোথায়? আর ত তেমন করিয়া আষাঢ়ের ঘন মেঘাবৃত অন্ধকার নিশীথে অভিসারিকা নাগরিকাগণের প্রেমাস্পদের উদ্দেশে গমনের চরণ-নূপুর রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু করিয়া নিনাদিত হয় না! মনে পড়িল কালিদাসের সেই—

"গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্রনক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনক নিকর্ষ স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্মভূর্বিক্লবাস্তাঃ।"

(মেঘদূতম্)

আজকাল ও আষাঢ়ের রজনীতে আগেরই মত গাঢ় নীল সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তেমনি করিয়া দিগদিগন্ত প্রকম্পিত করতঃ জলদ গর্জ্জন করিয়া ওঠে, তেমনি করিয়া বিদ্যুল্লতা ঝলসিত হয়, কিন্তু হায়! একাগ্রমনা অভিসারিণীর প্রেমাস্পদের উদ্দেশে গমন কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। উজ্জয়িনীর রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে যে কত মদালসা, নিপুণিকা,

চিত্রলেখার মাধুর্য্যময়ী প্রেম-বিহ্বলা মূর্ত্তি কল্পনা-নয়নে প্রতিভাত হইতেছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

উজ্জয়িনীর প্রতি মৃত্তিকাকণায় কালিদাসের পদচিহ্ন ও সুন্দরীগণের অলক্ত-রাগ দেখিতে পাইতেছিলাম। আমাদের মনে হইয়াছিল অই বুঝিবা বকুলের শ্যামচ্ছায়ায় সারিকার মুখের প্রেম-গীতি শুনিতে শুনিতে কোনও মদ-বিহ্বলা চিত্রলেখা আমাদের প্রতি উৎসুক নয়নে চাহিয়া আছে!

ভূপাল।

পর দিবস প্রত্যুষে উজ্জয়িনী হইতে ভূপাল রওয়ানা হইলাম। অপরাহ্ন প্রায় চারি ঘটিকার সময় ভূপাল ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। মধ্য ভারতের মধ্যে ভূপাল কেবল একটী মাত্র মুসলমান মিত্র রাজ্য। নগরটী দৈর্ঘ্যে ৪॥ মাইল এবং প্রস্থে ১॥ মাইল মাত্র। একটী সুন্দর স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ হ্রদের উত্তর তটে ভূপাল নগর অবস্থিত। বেটোয়া নাম্নী স্রোতস্বিনীর স্রোত আবদ্ধ করিয়া এই হ্রদটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রাচীন কালে ভোজরাজ এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম পূর্ব্বে ভোজপাল ছিল, ক্রমে ভোজপাল শব্দ অপভ্রংশ হইয়াই ভূপালে পরিণত হইয়াছে। ভূপালের এই রাজবংশ বহুদিন হইতেই ব্রিটিশগভর্মেণ্টের অনুগত। এই রাজবংশের আদিপুরুষ দোস্ত মহম্মদ ঔরঙ্গজেবের অন্যতম আফগান সরদার ছিলেন, ইনি সম্রাটের দেহান্তরের পরে স্বাধীন হইয়া এই ভূপাল রাজ্য স্থাপন করেন। সিন্ধিয়া ও রঘুজি ভোঁসলা একত্রিত হইয়া যখন ভূপাল নগরী অবরোধ করিয়াছিলেন তখন নবাব পিণ্ডারীগণের সহায়তা লইয়া বিশেষ বিক্রমের সহিত নগর রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সহিত নবাবের সন্ধি হয়, সেই সন্ধি সূত্রানুসারে গভর্মেণ্টের নিমিত্ত নবাবকে ৬০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ পদাতিক সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। ভূপালের ভূতপূর্ব্ব নবাব জাহাঙ্গীর মহম্মদের পত্নী সেকন্দর বেগমের দুহিতা সাজিহান বেগম বিশেষ প্রতিভাশালিনী এবং গুণবতী রাজ্ঞী ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার কন্যা নবাব সুলতানা জিহান বেগম ভূপালের রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন।

এস্থানের রাজ-প্রাসাদটী আকারে খুব বৃহৎ। দেখিতে তাদৃশ লোচনানন্দ-দায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। ভূপালের বাগানটী দৃষ্টি মনোরম্য। বাগান দেখিতে হইলে পাশ লওয়া প্রয়োজন। আমরা পাশ লইয়া উদ্যানটী দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম। শ্রেণীবদ্ধ তরু শ্রেণী বিভিন্ন বিভিন্ন জাতীয় কুসুম বৃক্ষ সমূহ, উৎসগুলি, বাগান মধ্যস্থ অট্টালিকা সমুদয়ই

দেখিবার উপযুক্ত। ভূপালের জুমা মস্‌জিদ্‌টী বড়ই সুন্দর; উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলীর দ্বারা মস্‌জিদের উপরে আরোহণ করিতে হয়; মস্‌জিদের চারিদিকে নগরের মণি, মুক্তা, জহরত এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান দোকান সমূহ বিদ্যমান। এই মস্‌জিদ্‌টী খুদা বেগম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সহরের অনতিদূরে গিরিশ্রেণী শোভমান। শ্যামল গিরিশ্রেণীর সৌন্দর্য্য নয়নানন্দদায়ক। এই পর্ব্বতের শিখর দেশে ফতেগড় কেল্লা অবস্থিত। ভূপালে জলের কল থাকায় ঘরে ঘরেই জলের সরবরাহ হয়, কাজেই এস্থানের লোকের জলাভাবে কোনও কষ্ট হয় না। এখানকার দুর্গের উপর হইতে হ্রদের ও নগরের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এই নগরের রাজপথ সমূহ প্রশস্ত ও সুন্দর। আলোর ব্যবস্থাও সন্তোষজনক। ষ্টেসনের সন্নিকটেই ডাকবাংলা আছে। ইহা ছাড়া হোটেল ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি থাকায় যাত্রিগণের কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

এ নগরের টাকশাল, অস্ত্রাগার প্রভৃতিও দর্শনীয়, তবে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। সেকন্দর বেগমের নির্ম্মিত মতিমস্‌জিদটিও নয়ন-মুগ্ধকর। আমরা ভূপালের এ সমুদয় দর্শনোপযোগী স্থান সমূহ দর্শনান্তে সে দিবস রাত্রিতেই ভূপালনগরী পরিত্যাগ করিলাম। নৈশান্ধকারে চতুর্দ্দিক আলোড়িত করিয়া একটা দৈত্যের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনে বাষ্পীয় শকট আমাদিগকে বুকে করিয়া তাহার লক্ষ্যপথে ছুটিয়া চলিল।

নাসিক।

আমরা ভূপাল হইতে নাসিক আসিলাম, নানাকারণে আমাদের ভ্রমণের গতি একটু বৈচিত্র্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল, কাজেই কখন কোন স্থানে যাইতাম তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না। দক্ষিণ ভারতে নাসিকনগর অতি প্রাচীন সহর ও তীর্থস্থল বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। আমরা যখন নাসিক নগরীতে উপনীত হইলাম তখন শরতের সুন্দর নির্ম্মল প্রভাতে গিরি-বন-নদী সৌম্য মধুর উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া পাহাড়ের মাথার উপরে সূর্য্যদেব দেখা দিয়াছিলেন। প্রভাতের সেই প্রফুল্ল ছবি মানস নেত্রে বাঙ্গালার সমতল ভূমির শ্যাম সৌন্দর্য্যের শ্যাম কমনীয়তার মত বোধ হইয়াছিল। নাসিক ষ্টেসন হইতে নাসিক সহর প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দূর। এখন ষ্টেসন হইতে সহর পর্য্যন্ত ট্রাম হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া নগরে গিয়াছিলাম। পুণ্যসলিলা গোদাবরী নদীর উত্তর তীরে নাসিক নগরী অবস্থিত। 'রামায়ণের' রামের বনবাসের ইতিবৃত্তের সহিত নাসিকের প্রাচীন ইতিহাস গ্রথিত। এখানকার পাণ্ডারা বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত পঞ্চবটী বন এস্থানে ছিল বলিয়া বলেন। পিতৃসত্য পালনার্থ রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র যখন সতীকুল শিরোমণি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে আগমন করিয়া এই পঞ্চবটি বনে বাস করিতেন, সে সময়ে রাবণ ভগিনী সূর্প-

নাসিক নামের উৎপত্তি।

নখা রামের সেই ভুবন-মোহন-রূপ দর্শনে বিমোহিত হয় এবং তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহে; রাম উহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, ইহাতে সূর্পনখা ক্রুদ্ধা হইয়া সীতা দেবীকে গ্রাস করিতে চাহিলে রামের ইঙ্গিত ক্রমে ভ্রাতৃ-বৎসল সৌমিত্রি সূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া বিরূপ করিয়া দেন; কেহ কেহ বলেন যে সূর্পনখার নাসিকা কর্ণ এই স্থানে ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম নাসিক হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণের নিকট ইহা যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাঁহারা বলেন যে নাসিক শব্দ সংস্কৃত নবশিখা শব্দের অপভ্রংশ। নয়টি পর্ব্বতের

উপর স্থাপিত বলিয়াই এই নগরীর নাম নাসিক হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য বাসিগণের নিকট বারাণসী অপেক্ষা এবং গোদাবরী জাহ্নবী অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যপ্রদা বলিয়া বিশেষ খ্যাতিমান। গোদাবরী নদীর প্রতি দক্ষিণ দেশবাসীরা অত্যন্ত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই

নানা কথা।

নদীর অপর নাম গৌতমী গঙ্গা। নাসিকের নিকটস্থ ত্র্যম্বক নামক পর্ব্বত হইতে গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যবাসীরা ইহাকে গঙ্গা নামে অভিহিত করে। নাসিকে গোদাবরী নদী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা বলিয়া হিন্দুদিগের নিকট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ পুরাণে লিখিত আছে যে উত্তরবাহিনী গঙ্গা, পশ্চিম বাহিনী যমুনা এবং দক্ষিণবাহিনী গোদাবরী অতিশয় মোক্ষপ্রদ তীর্থ ক্ষেত্র। নাসিকে অরুণা, বরুণা, সরস্বতী, শ্রদ্ধা, মেধা, সাবিত্রী এবং গায়ত্রী নাম্নী সাতটি ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনী আসিয়া মিলিত হওয়ায় এ স্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। ত্র্যম্বক নামক গ্রামের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ত্র্যম্বক নামক পর্ব্বতের যে স্থান হইতে গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে সে স্থানে একটী কূপ আছে, ৬৯০টী সিঁড়ি পার হইয়া ঐ স্থানে অবতরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটী খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তির মুখ হইতে বিন্দু বিন্দু জল পতিত হইতেছে এবং ঐ সকল বারিবিন্দুর সহায়তায়ই এই গোদাবরী নদীর উৎপত্তি। এ স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভাষাতীত। বোধ হইল সংসারের নির্ম্মম কঠোরতায় ব্যথিতা হইয়া প্রকৃতি-সুন্দরী যেন স্বহস্তে সমুদয় সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া বিশ্রাম-সুখ-লাভ করিতেছেন। বিহগেরা মনের আনন্দে সুমিষ্ট স্বরে তাঁহার গুণ গাহিতেছে, ফুলেরা ফুটিয়া হাসিয়া নীরবে আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর, বাতাসে একটু একটু আন্দোলিত হইয়া যেন একে অন্যকে বলিতেছে, "দেখ, দেখ, একবার আমায় দেখ।" নাসিকের ন্যায় পবিত্র এবং শান্তিপ্রদ স্থান ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছে। এস্থানের সৌন্দর্য্যে এবং স্বাস্থ্যে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার জর্জ্জ কেম্বেল সাহেব ভারত গভর্মেণ্টকে কলিকাতা হইতে এ স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। এখনও ইংরেজ সৈন্যগণ বিলাত হইতে প্রথমে এ দেশে পদার্পণ করিয়া নাসিকের অদূরবর্ত্তী দেবলালী নামক

স্থানে বাস করে, উহাদের পীড়া হইলেও জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এ স্থানেই প্রেরিত হয়।

এক সময়ে নাসিকে বৌদ্ধ ও জৈনদের বহু মন্দির ইত্যাদি ছিল, তখন ইহা ঐ উভয় সম্প্রদায়ের লোকগণ কর্ত্তৃক ও বিশেষ তীর্থ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। পর্ব্বত কাটিয়া তাঁহারা যে সমুদয় গুহা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিল, সে সকল গহ্বরস্থিত খোদিত লিপি পাঠ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতবর্গ বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা এক্ষণে পাঠকদিগকে নাসিকের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত পরিচিত করিয়া পরে এখানকার দর্শনীয় স্থান সমূহের বিষয় জ্ঞাত করাইব। বহু

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

প্রাচীন কাল হইতেই নাসিক বিখ্যাত স্থান। প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে বিভিন্ন বিভিন্ন যুগে নাসিকের ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পদ্মনগর, ত্রেতাযুগে ত্রিকণ্টক, দ্বাপরযুগে জনস্থান এবং বর্ত্তমান কলিযুগে নাসিক। রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে রামায়ণের বহু ঘটনা এই নাসিকেই সংঘটিত হইয়াছিল, অদ্যাপিও "পঞ্চবটী" বন, "সীতার গহ্বর," "রামকুণ্ড," "তপোবন" এবং সূর্পনখার নাক কাণ কাটার স্থান বিদ্যমান থাকিয়া সে সকলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতালোচনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এ স্থানে অন্ধ্র ভৃত্যবংশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিবৃন্দ রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। কারণ বর্ত্তমান সময়ে এ স্থানের নিকটস্থ পর্ব্বতশিখরে বৌদ্ধস্তূপ ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। নাসিক, এই নামের উল্লেখ জব্বলপুর হইতে একশত মাইল দূরে "ভরহুত" নামক স্থানের একটী বৌদ্ধস্তূপের স্তম্ভে প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। এই স্তূপ মহাত্মা যীশুর আবির্ভাবের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। পতঞ্জলি প্রণীত মহাভাষ্য নামক গ্রন্থেও নাসিকের নাম দৃষ্ট হয়, এই পতঞ্জলির অভ্যুদয় কাল নিরূপণ সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, কাহারও কাহারও মতে তিনি খ্রীষ্টের ৭০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন তিনি খ্রীষ্টের জন্মের ১৫০ শত বৎসর

পূর্ব্বে জগতের আলোক দর্শন করিয়াছিলেন, এ সমুদয় পণ্ডিতবর্গের কল-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া আমরা নাসিক যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিখ্যাত এবং প্রাচীন স্থান এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। নাসিকের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুলেনা গহ্বরেও নাসিকের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক (Ptolemy) টলেমির গ্রন্থে, প্রাভাস্যুরী নামক জনৈক জৈনগুরুর গ্রন্থেও এ স্থানের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, অতএব এ স্থানের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অযৌক্তিকতা ও নিষ্প্রয়োজন।

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তটস্থ অন্ধ্র ভূপতিগণের পরে এ স্থান যথাক্রমে চালুক্য, রাঠোর এবং যাদব বংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। পরে দেবগিরির যাদববংশ ধ্বংস হইলে দক্ষিণ দেশ যখন মুসলমানগণের হস্তগত হয়, তখন নাসিকও মুসলমানদিগের রাজ্যভুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় ১২৯৫—১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, অহমদনগর, নিজামসাহী রাজগণ এবং মোগলদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল;—মোগলেরা নাসিক নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার নাম গুলসানাবাদ রাখিয়াছিল। পরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এস্থান যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয় তখন গুলসানাবাদ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় নাসিক নামে অভিহিত হইতে থাকে এবং সে সময়ে ইহার পূর্ব্ব মাহাত্ম্য পুনরায় চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হয়। পেশোবাগণ এ স্থানের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এ নগরে বহুসংখ্যক দেবালয়, মঠ, মন্দির ও সুন্দর সুন্দর সৌধাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে সকল দেবালয় ও মঠ এখনও বিদ্যমান। মহারাষ্ট্রীয়গণ এ স্থানে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা ইংরেজদিগের অধিকারে আসিয়াছে। নাসিক জেলার ইহাই প্রধান নগর। এ স্থানের লোকসংখ্যা ঋতুভেদে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। তবে মোটামুটি কোন সময়েই এই স্থানে ২৪,৪৫০ জনের কম লোক-সংখ্যা হয় না। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট এবং মিউনিসি-পালিটি স্থাপিত আছে। এ নগরে চিত্তপাবন ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। প্রাচীনকাল হইতেই এই স্থান সংস্কৃতালোচনার জন্য বিখ্যাত, বর্ত্তমান

সময়েও তাহার কোনও ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইল না। পূর্ব্বে এ স্থানে কাগজ প্রস্তুত হইত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে ব্যবসায় মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। এখানকার পিত্তল ও তাম্রের দ্রব্য বড়ই সুন্দর, এই ব্যবসার জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে নাসিক নগরী বিশেষ বিখ্যাত। কাংস্য দ্রব্যও এ স্থানের মন্দ নহে। সৌন্দর্য্যে ও স্বাস্থ্য-সুখ প্রদান করিতে নাসিকের ন্যায় ভারতে অতি অল্প স্থানই আছে। ইহাকে ভারতবর্ষের পুণ্যতপোবন বলিয়া উল্লেখ করিলে কোনওরূপ অতিশয়োক্তি হয় না।

নাসিকের দ্রষ্টব্য স্থান ও তীর্থ সমূহ।

আমরা এখন নাসিকের দর্শনীয় স্থানসমূহের ও তীর্থস্থানগুলির বিষয় বলিব, নাসিকে বর্ত্তমান সময়ে দর্শন যোগ্য বহু স্থান আছে। আমরা প্রথমে গোদাবরী নদী পার হইয়া পঞ্চবটী তীর্থ দর্শনে গমন করিলাম। গোদাবরী নদীর দৃশ্য অতিশয় মনোহর। নদীবক্ষে কত তরী ভাসমান, কত সাধু সন্ন্যাসী, কত যাত্রী, কত গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণ ললনারা নদীবক্ষে স্নান করিতেছে! তীরস্থিত দেব-মন্দির সমূহ ও অট্টালিকাগুলির শ্বেতচ্ছবি নদীবুকে প্রতিবিম্বিত হইয়া শরতের অম্লান উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে চক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিকে শান্ত ও সৌম্যের মাধুর্য্যমণ্ডিত পবিত্র ছবি দেদীপ্যমান। কোথাও মলিনতার চিহ্ন নাই,—"সত্য শিব সুন্দরের" মহিমামণ্ডিত মহান ছবির বিন্দু মাধুরী বোধ হয় এ স্থানে পতিত হইয়াছিল, নতুবা এত শান্তি, এত সুখ চিত্তে জাগিল কিরূপে? পঞ্চবটীতে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতা দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গরাও ওঢ়িকর কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা রামসীতা মূর্ত্তি দর্শনান্তে সীতাগুহায় উপনীত হইলাম, এস্থানে একটী নৈসর্গিক পর্ব্বতগহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুহামধ্যস্থিত ক্ষীণ দীপালোকে সীতামূর্ত্তি খোদিত দর্শন করিলাম। ক্ষুদ্র একটী দ্বার ব্যতীত এ গুহায় প্রবেশ করিবার কিংবা বায়ু নির্গমের অন্য কোনও স্থান নাই, একত্রে এ স্থানে পঞ্চাধিক যাত্রী প্রবেশ করিলে নিঃশ্বাস রোধ হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে অন্য কোনও যাত্রী এই স্থানে আইসে নাই। নাসিকে সর্ব্বশুদ্ধ মন্দিরের সংখ্যা প্রায় ৬০টী।

এ স্থানে বহু মন্দির দেখা যায় বটে কিন্তু কোনটীই ১৫০ দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে; ইহার কারণ অনুমান করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে, যে সময় নাসিক মুসলমান শাসনাধীনে আইসে সে সময়েই ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি গোঁড়া মুসলমানের বিষ নয়নে পতিত হইয়া প্রাচীন মন্দির সমূহ যে ধ্বংস হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত, কারণ ঔরঙ্গজেব বাদসাহ হইবার পূর্ব্বে পিতা সাজাহানের প্রতিনিধি স্বরূপ দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে রাজ্যশাসন করিতেন। পেশোবাদের সময়ের মধ্যেও তৃতীয় পেশোবার সময়েই নাসিক বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী নগরী ছিল। নাসিকের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য এবং মঠ ও দেব মন্দিরাদির নিমিত্ত রাণী অহল্যার নামও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই মহীয়সী রমণী ত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইন্দোরের রাজসিংহাসনে সমাসীনা থাকিয়া মুক্তহস্তে দান ও দীন, দুঃখী ও পীড়িত প্রজাগণের প্রতিপালন ও শুশ্রূষা করিয়া মাতৃত্বের যে মহান্ আদর্শ দাক্ষিণাত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা প্রবাদের ন্যায় দাক্ষিণাত্যবাসিগণের মুখেমুখে গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার নির্ম্মিত রামমন্দির বিশেষ দর্শন যোগ্য। দাক্ষিণাত্যবাসীরা অদ্যাপি রাজ্ঞী অহল্যার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

পঞ্চবটী।—এ স্থানের প্রত্যেক দেব-মন্দিরের বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক—এবং তাহাতে অযথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় মাত্র, কারণ প্রধান প্রধান প্রায় ৩০।৪০ টী মন্দিরেই কোন না কোন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। যিনি এই স্থানের প্রাণারাম পবিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন তিনি জীবনে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। পঞ্চবটীর যে অংশে শ্রীরামচন্দ্র পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বাস করিয়াছিলেন পাণ্ডা আমাদিগকে সেই স্থান দেখাইয়া দিল। অদূরে মেঘের মত গিরিমালা ছবির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, চতুর্দ্দিকে শ্যামল তরুরাজি মাথা তুলিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান। আমরা কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনরায় গোদাবরীর তীরে উপনীত হইলাম। গোদাবরীর নির্ম্মল-রজত-সলিল-প্রবাহ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও বা তীরস্থিত বনস্পতির গাত্র হইতে লতিকা সুন্দরী একটু অবনত হইয়া জলের

সঙ্গে মিশিতেছে-উঠিতেছে—আবার ডুবিতেছে। মিলন-সুখ-বিহ্বলা লতা-বধূ বোধ হয় গোদাবরীকে তাহার বিরহের জন্য সমবেদনা জানাইতেছিল। হে পাঠক! একবার এখানে এস, অই দেখ ময়ুরগুলি কেমন সুন্দর নিঃশঙ্ক চিত্তে আমাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল! অই দেখ, বনের শোভা পীত ও শুভ্রবর্ণে সুচিত্রিত শৃঙ্গহীন হরিণগুলি কেমন সুন্দর লাফাইয়া লাফাইয়া বন হইতে বনান্তরে পলায়ন করিতেছে! আমরা পথের উভয় পার্শ্বস্থ সাধুগণের আশ্রম দর্শন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অরুণা ও গোদাবরীর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। এখানকার দৃশ্য পরম রমণীয়। চতুর্দ্দিকে নিবিড় পাদপরাজি পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ কাননভূমি। নীরব ও বিজন। এরূপ নীরব ও গাম্ভীর্য্যময় স্থান অতি অল্পই দেখিয়াছি, এখানে আসিলে এমন একটা গুরু গম্ভীর ভাবের উদয় হয় যে তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা অসম্ভব। মৃদু পবনান্দোলিত বৃক্ষ পত্রের সর্ সর্ শব্দ, ও পক্ষীগণের কলরব ভিন্ন আর কিছুই শ্রুত হইতেছিল না। মাঝে মাঝে অদূরস্থিত অরুণা ও গোদাবরীর কল্ কল্ ছল্ ছল্ রব বনদেবীর বীণার সুমধুর নিক্বণের ন্যায় বোধ হইতেছিল। ভাবিতেছিলাম বুঝি কৃত্রিম-সৌন্দর্য্যাভিমানী সভ্য জগতের বৃথা দম্ভে ব্যথিতা হইয়া প্রকৃতি দেবী লোক-লোচন হইতে দূরে এই গাম্ভীর্য্যময় নীরব ও নির্জ্জন প্রদেশে নিজের অলৌকিক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন! এস্থান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকের কোনও আবাস ভূমি নাই। বিটপী সকলের মধ্যে সহকার, জম্বু, কদম্ব, বিল্ব প্রভৃতিই কেবল আমাদের পরিচিত। এ সকল তরুর শাখায় বসিয়া আমাদের বঙ্গীয় কবিগণের ও যুবক যুবতীদের প্রিয় পিকবধূ ও কুহু কুহু রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে নাই! তাহার এই বিরহ-সঙ্গীতে কোনও সীমন্তিনীর শঙ্কিতা হইবার কারণ অতি অল্পই ছিল! নির্লজ্জ পাখীর এই আকুল কণ্ঠের ব্যাকুল রবে বনের পশু পক্ষীর মধ্যে চিত্ত চাঞ্চল্যের উদ্রেক ব্যতীত অপর কাহারও হওয়া অসম্ভব!

এস্থানে পদক্ষেপ করিতে করিতে প্রতিমুহূর্ত্তে অমর কবি মধুসূদনের সীতা ও সরমার কথোপকথনের সীতার সেই—

"ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
* * * শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ শিশু, বিহঙ্গম। * * *
— হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ?"

এই উক্তি মনে জাগিতেছিল। সত্য সত্যই এ স্থানের সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। তীরস্থিত তরুরাজির সুদীর্ঘ ছায়া গোদাবরী নীরে প্রতিফলিত হইয়া নাচিতে লাগিল। সান্ধ্য সমীরণ শীতলতা ও উগ্রগন্ধ জম্বীর-কুসুমের সৌরভ উপহার দিয়া ছুটিয়া চলিল ! দিবাবধূ সারাদিনের কর্ম্মাবসানে, তারা-রত্ন খচিত ধূসর রংয়ের আস্তরণে শরীর ঢাকিয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইলেন। আমরাও হিংস্র জন্তুর ভয়ে ভীত পাণ্ডার আহ্বানে সেদিনের মত বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পঞ্চবটীতে সীতাগুহা, কপালেশ্বরের মন্দির, রামকুণ্ড প্রভৃতি স্থান দ্রষ্টব্য। রামায়ণের বর্ণনানুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে এই সীতাগুহা হইতেই রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কপালেশ্বরের মন্দিরে ৫০টী সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। ইহার নিকটেই রামকুণ্ড অবস্থিত। কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র এস্থানে স্নান করিয়াছিলেন। নাসিকের তীর্থযাত্রিগণের নিকট এস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়।

পাণ্ডলেনা গুহাবলী—পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আমরা নাসিক হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী পাণ্ডলেনা গুহাবলী দর্শনার্থ গমন করিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট এস্থান বিশেষ আদরণীয়। তিনটী পর্ব্বত কাটিয়া

এই গুহাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে, সর্ব্বসমেত এস্থানে ২৪টী গুহা আছে। এই গুহাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কারণ গুহাগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের ঘটনা সংক্রান্ত অনেকগুলি চিত্র খোদিত আছে। এ সকল চিত্রের জন্য এ স্থান আদৃত নয়, এখানকার গহ্বরে যে ২৭টী খোদিত লিপি (Inscription) আছে সেজন্যই এ স্থান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট বিশেষ প্রিয়। নাসিক জেলায় ত্র্যম্বক, সপ্তশৃঙ্গ ও পার্ব্বতীয় দুর্গাদিও দ্রষ্টব্য। নাসিক নগরী হইতে ত্র্যম্বক ২০ কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত; ইহা হিন্দুদিগের একটী বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। স্কন্দপুরাণে এ স্থানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ভারতের প্রধান প্রধান দ্বাদশ শিবলিঙ্গের মধ্যে ত্র্যম্বকের শিবলিঙ্গ নবম। নাসিক হইতে ৩০ মাইল উত্তরে সপ্তশৃঙ্গ নামক পর্ব্বতোপরি উহা অবস্থিত। এস্থানে সপ্তশৃঙ্গ নিবাসিনী দেবীর মন্দির আছে উহাই যাত্রীদের পূজনীয় এবং দর্শনীয়। এই স্থানে গৌড়স্বামী নামক জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহার সমাধি অদ্যাপি এস্থানে বিদ্যমান আছে। তাঁহার সম্বন্ধে Nasik Gazeteerএ যাহা লিখিত আছে আমরা পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থ এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Gaudsvami was a Bengal ascetic who lived on the hill about 1730 in the time of the Second Peshwa Bajirao (1720—1740). He lived in the Kalika Tirth and had many disciples among the Maratha nobles. One of the cheif was Chuttrasing Thoke of Abhona who built the Kalika and Surya reservoirs."

এই মহাত্মার সমাধির নিকটে তাঁহার শিষ্য ধর্ম্মদেবের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর অতীত জীবনী উদ্ধার করা সুকঠিন। প্রত্যেক বঙ্গবাসী তীর্থযাত্রীর পক্ষেই নিজ দেশের এই সাধু মহাত্মার পুণ্য তপোবন দর্শন করিয়া জাতীয় গৌরবের পুলকান্দোলনটুকু হৃদয়ে অনুভব না করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। নাসিক জেলায় পর্ব্বতোপরি পূর্ব্বে ৩৮টী দুর্গ ছিল, এই দুর্গগুলি বিশেষ মজবুত ও দুর্ভেদ্য ছিল। এখন

সেই সকল দুর্গ ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহাদের গঠন দৃঢ়তা ও স্থান নির্ব্বাচনের নৈপুণ্য দেখিয়া বিখ্যাত লেফ্‌টেনেণ্ট লেক (Lake) লিখিয়াছিলেন যে "Nothing but a determined garrison is necessary to make these positions impregnable." নাসিক যে এত রমণীয় স্থান পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। একদিকে নগরের কল-কোলাহল, অন্যদিকে তপোবনের মধুর নিস্তব্ধ ভাব। সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য এস্থানে দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করে।

আমরা আমাদের পাণ্ডা মহাশয়ের প্রাপ্য হিসাব কড়ায় গণ্ডায় নিকাশ করিয়া রাত্রিতে নাসিক ষ্টেসন হইতে অহমদনগর লক্ষ্য করিয়া বাস্পীয় শকটে আরোহণ করিলাম—পথে ভাবিতেছিলাম অতীত ভারতের গৌরব কাহিনী ও শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি। ভারতবর্ষের এই অপূর্ব্ব পিতৃমাতৃ ভক্তি দর্শনে শ্লিমেন সাহেব তদীয় "Rambles and Recollections" নামক গ্রন্থের একস্থানে বিস্ময়-পুলকিত হৃদয়ে লিখিয়াছেন যে "There is no part of the world, I believe where parents are so much reverenced by their sons as they are in India, in all classes of society" (Vol. 1, page 308).

ভারতবাসীর অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়েই অধঃপতন হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু একথা ঠিক্ যে এখনও তাহারা পিতৃমাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃ প্রেম, ও সতীত্বের অপূর্ব্ব গৌরবপ্রভায় সমগ্র সভ্য জগতের আদর্শ—তাহারা তাহাদের এই মহত্ত্ব হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। যে দেশের—যে সমাজের মূল ভিত্তিই ধর্ম্ম,—তাহারা ধর্ম্মচ্যুত কেন হইবে? প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তর এখানে সুবিখ্যাত কুম্ভমেলা হয়, তখন নানা দেশ বিদেশ হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হইয়া থাকে

অহমদনগর।

আমরা যখন অহমদ বা আহ্মদনগরে পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বাসা ঠিক্ করিয়া বিশ্রামাদি করিতে করিতেই সন্ধ্যার ম্লানান্ধকার ছড়াইয়া পড়িল। সারা আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিল এবং একটা সমাধি মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃক্ষের আড়াল দিয়া চন্দ্রদেব দেখা দিলেন। সে রাত্রিতে আহারাদি করিয়া নিদ্রাদেবীর কোমলকর পরশে পথের সমুদয় যন্ত্রণা দূর করিলাম। পরদিন ভোরে নগর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। অহমদনগর প্রাচীনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। বুয়ার যুদ্ধের সময় পরাজিত বুয়রবন্দিগণ এস্থানে আনীত হইয়াছিল; তাহাতেই এই নগরের নাম সুসভ্য জগতে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। অহমদনগর ভারতবর্ষের মধ্যে একটী পরম রমণীয় এবং দর্শনীয় স্থান। এ স্থানের প্রাচীন ইতিহাস সকলেরই জানা উচিত। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এখানকার দুর্গ, রুমীখাঁর সমাধি মন্দির, দামড়ি মস্‌জিদ, ফরাবাগ, ঔরঙ্গজেবের কবর, সলাবৎখাঁর সমাধি প্রভৃতি পরম রমণীয়। অহমদনগর অতি প্রাচীন সহর

প্রাচীন ইতিহাস।

হইলেও হিন্দুদের সময় ইহার অস্তিত্ব ছিল কি না তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না;—তবে যে স্থানে অহমদ নগর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সহর হইতে ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে পুণ্য-তোয়া গোদাবরী নদীর তীরে পৈঠান নামক যে গ্রাম আছে, পূর্ব্বে তাহা প্রতিষ্ঠান নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মহারাজা অশোকের খোদিত প্রস্তর স্তম্ভে এই স্থানের নাম ও এই গ্রামের অধিবাসীবর্গের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশর দেশের প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টোলেমীর (Ptolemy) ভূগোলেও এই স্থানের নামোল্লেখ আছে। তৎকালে এই নগরী বিখ্যাত আন্ধ্রভৃত্য রাজগণের রাজধানী ও ব্যবসায় বাণিজ্যের নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই রাজবংশ দাক্ষিণাত্যে চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। ইহাদের পরে যখন চালুক্য ও দেবগিরি যাদবেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন তখনও এস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্য সর্ব্ব প্রথমে মুসলমানদের কর্ত্তৃক আক্রমিত হয়। কিন্তু ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেবগিরির যাদবদের রাজ্য ধ্বংস হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে টোগ্‌লক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর তাহার পুত্র যুনাস পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন এবং ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদয় তৈলঙ্গ প্রদেশ অধিকার করিতে সক্ষম হন। পরে ইনি মহম্মাদ টোগলক্ নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পরে, দাক্ষিণাত্যের রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি দিল্লী হইতে রাজধানী দেবগড়ে পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম দৌলতাবাদ রাখেন। মহম্মদ টোগলক অত্যন্ত নৃশংস ও অত্যাচারী নরপতি ছিলেন, তাঁহার অত্যাচারে দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তৈলঙ্গ দেশ জয়ের পবে কতিপয় হিন্দু অধিবাসী ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া একটী বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করেন। দক্ষিণদেশবাসিগণ টোগলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে হোসেন গঙ্গু নামক একজন পাঠান সৈন্য এই বিদ্রোহীদের নেতা হইয়া সেনাপতি উম্মাদ উল মুলককে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদে একটী স্বতন্ত্র মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হ'ন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটী প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল, প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানগণ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য কোনওরূপ প্রয়াস পান নাই। আমরা এস্থানে যে হোসেন গঙ্গুর নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য।

আলা-উদ্দীন্ হসন গঙ্গো বামণী। কথিত আছে যে দক্ষিণাপথের বা দৌলতাবাদের প্রথম বামণী রাজ পূর্ব্বে গঙ্গু নামক একজন জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ এক দিবস হসন বা জাফর খাঁর করকোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন যে ভবিষ্যতে তুমি রাজা হইবে। হসন ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যদি তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হন তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করিবেন। জ্যোতিষী ঠাকুর এই বালকের বুদ্ধি প্রাখর্য্য দেখিয়া ইহাকে মুক্ত করিয়া দেন এবং নিজ কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন; এই নিমিত্তই হসনের বংশ বাহমণী (ব্রাহ্মণীয়) বংশ বলিয়া

বিখ্যাত। দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হইয়া হোসেনের নেতৃত্বে জয়লাভ করেন, ব্রাহ্মণের জ্যোতিষী গণনাও সত্য হইল, হোসেন অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি তাঁহার অঙ্গীকারানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণী রাজবংশ দক্ষিণ দেশে প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইঁহারা হিন্দু প্রজাদের উপরে কোনওরূপ অত্যাচার করিতেন না। এ বিষয়ে কর্ণেল মেডো টেলার বলেন যে—"The Bahmani kings protected their people and governed them justly and well." ব্রাহ্মণী বংশের রাজত্বে প্রজাগণ বিশেষ সুখী ছিলেন। কিন্তু জগতে কিছুই চির-স্থায়ী হয় না; আর প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যখন যে রাজ বংশের অধঃপতন হইয়াছে বিলাসিতাই তাহার মূল কারণ। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণী রাজবংশ ও দৌলতাবাদ রাজ্য লোপ পাইলে মুসলমান রাজগণ একত্রিত হইয়া ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে টেলিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের রামরাজাকে পরাজিত ও নির্দ্দয়রূপে নিহত করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়া দিল। সে সময়ে বিজাপুর, গলকন্দ ও আহ্মদনগর এই তিনটী রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে নিজামসাহী রাজাদিগের দ্বারা অহমদনগর স্থাপিত হয়। এই বংশের প্রথম রাজা আহ্মদ সাহা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তিনি

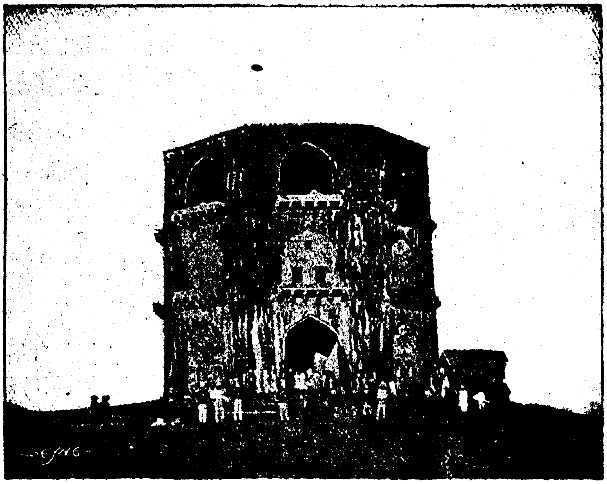
নগরের কথা।

নিজ নামানুসারে ইহার নাম আহ্মদনগর বা অহমদনগর রাখিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে এই নগর তৎকালীন প্রসিদ্ধ নগরী মিশরের কৈরো এবং আরব দেশের বোগদাদ সহরের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আহ্মদ সাহা ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। আহ্মদ সাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বুর্হান রাজা হন, ইঁহার সময়ে আহ্মদনগরের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হুসেন রাজা হইয়াছিলেন। হুসেন এই নগরের চতুর্দ্দিকে ১২ ফিট উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের পুত্র দানিয়েল অহমদনগর আক্রমণ করেন; এ সময় হইতেই এই রাজবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ করে, তখনও তাহারা নামে মাত্র রাজা ছিলেন, কিন্তু ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট

সাজাহান আহ্মদনগর একেবারে রাজা শূন্য করেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পেশোবাদের অধিকারভুক্ত হয়, ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র নেতা দৌলতরায় সিন্ধিয়ার হাতে আইসে এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাচীন ইতিহাস শেষ হইল, আমরা এখন পাঠকবর্গের নিকট এস্থানে যে সকল দর্শনীয় স্থান রহিয়াছে একে একে তাহাদের বিবরণ প্রদান করিব। সর্ব্ব প্রথমে আমরা অহমদনগরের দুর্গ দেখিতে গমন করিলাম। এই দুর্গটি হুসেন নিজাম সাহ তদীয় রাজত্ব সময়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইনি ১৫৫৩—১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, কিন্তু ইহাকে রাজত্বের অধিক সময়েই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। জন-প্রবাদ এইরূপ যে এমন সুদৃশ্য ও মজবুত দুর্গ ভারতবর্ষে কেন, এসিয়া মহাপ্রদেশের মধ্যেই বিরল। এই দুর্গের অনতিদূরেই 'দামড়ি মস্‌জিদ' ; কথিত আছে, যে সমুদয় মজুরেরা এই দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্রতী ছিল, তাহারা প্রতিদিনের মজুরি হইতে এক দামড়ি অর্থাৎ সিকি পয়সা বাঁচাইয়া এই মস্‌জিদটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, সে জন্যই ইহার নাম 'দামড়ি মস্‌জিদ' হইয়াছে। মস্‌জিদটি দেখিতে বেশ সুন্দর।

রুমী খাঁর সমাধি—রুমী খাঁ হুসেনের একজন সেনাপতি ছিলেন, ইনি তোপ নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইহাঁর সমাধিটি দেখিতে বেশ সুন্দর, উপরের গুম্বজটির গঠন বেশ মনোরম। সমাধির চতুর্দ্দিকে বাগান, ইহা এখন একটী বাংলায় পরিণত হইয়াছে। বীজাপুরস্থিত "মালিক-ই মৈদান" নামক কামানটি রুমি খাঁ এই স্থানেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও বাগানের যে স্থানে গর্ত্ত করিয়া এই তোপ ঢালা হয় তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

সলাবৎ খাঁর সমাধি—হুসেনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মুর্ত্তজা নিজাম শাহ ১৫৬৫—১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে প্রধান মন্ত্রী সলাবত খাঁ ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফেরিস্তার নাম উল্লেখ যোগ্য। সলাবৎ খাঁ অতিশয় জ্ঞানবান এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার দক্ষতাগুণে সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রজারাই বিশেষ সুখী ছিল। ইনি নিজের মৃত্যুর পূর্ব্বেই অহমদনগরে তাঁহার সমাধি গৃহ নির্ম্মাণ করেন ; এই সুন্দর



সলবৎখাঁর সমাধি।

সমাধিটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। সলাবৎ খাঁ ফরাবাগ নামক একটী প্রাসাদ বাগানের মধ্যস্থ জলাশয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, উহা এখন ভগ্নাবস্থায় আছে, বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে এই সরসীতে জল থাকে না।

ফেরিস্তার সম্বন্ধে এস্থানে দু' একটী কথা বলা আবশ্যক। ইনি কাস্পিয়ান হ্রদের তীরস্থ আস্ত্রাবাদনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা

ফেরিস্তা।

গোলাম আলি হিন্দু সাহা যখন রাজ পুত্র মারান হোসেনের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন তখন ফেরিস্তাও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে ফেরিস্তার বয়স মাত্র বারো বৎসর ছিল। ইহার পূর্ণ নাম মহম্মদ কাসিম ফেরিস্তা। গোলাম আলি হিন্দু সাহা বিশেষ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুত্র ফেরিস্তাকেও রাজকুমার মিরাণকে একত্র শিক্ষা দিতেন। মিরাণ ও ফেরিস্তা সমবয়স্ক বলিয়া উভয়ে একত্র বাস করিতেন। গোলাম আলির মৃত্যুর পর ফেরিস্তাকে রাজা সৈন্য বিভাগে কর্ম্ম দেন, কিন্তু ফেরিস্তা বেশী দিন অহমদনগরে থাকিতে পারেন নাই, ইহার কারণ এই যে তিনি শিয়াসম্প্রদায়ী মুসলমান ছিলেন ও সেখানকার নৃপতিরা সুন্নী সম্প্রদায়-ভুক্ত মুসলমান ছিলেন, এই কারণেই তাহাকে বাধ্য হইয়া বিজাপুরে যাইতে

হয়, তিনি সেখানেই তদীয় প্রসিদ্ধ দক্ষিণ দেশের ইতিহাস রচনা করেন। এই ইতিহাস রচনার সময় ফেরিস্তা তৎকালীন বিজাপুরের রাজা দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল সাহা কর্ত্তৃক বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইব্রাহিম তাঁহাকে নির্ভয়ে এবং বিনা তোষামোদীতে ইতিহাস রচনা করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। এই মহানুভবতার জন্য ফেরিস্তা মুক্তকণ্ঠে ইব্রাহিমকে প্রশংসা করিয়াছেন। ফেরিস্তার ইতিহাস একটী অমূল্য রত্ন। ইহাতে কোন স্থানেই ন্যায়ের মর্য্যদা পদদলিত হয় নাই।* মিরান হোসেন অত্যন্ত নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই পাপিষ্ঠ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় পিতা মুর্ত্তজাকে বধ করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিল। এ সময় হইতেই এই রাজবংশের অধঃপতন হইতে আরম্ভ করে। পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিরা সকলেই বিলাসীও অত্যাচারী ছিলেন। এ সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সম্রাট সাজাহান দক্ষিণ প্রদেশ জয় করিবার জন্য পুত্র মুরাদকে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ খান খানানের সহিত ত্রিশ সহস্র সৈন্যসহ পাঠাইয়াছিলেন। তখন রাজা নাবালক থাকায় প্রখ্যাতনামা চাঁদবিবি সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।† এই মহীয়সী রমণীর বীরত্ব ও বীরত্বের অপূর্ব্ব কাহিনী বিজাপুর শীর্ষক প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। যখন বড় বড় সেনানায়কগণ দুর্গের কিয়দংশ পতিত হইলে কি করিবেন ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছিলেন না, সে সময়ে বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা সর্ব্বশরীরে বর্ম্ম ধারণ করিয়া

* "* * He was a Persian from the shores of the Caspian, he and his work are essentially creations of the Dekhan. Born at Astrabad he was twelve years of age when he reached Ahmadnagar. His father, Ghulam 'Ali Hindu Shah, was appointed Persian Tutor to the young Prince Miran Hussain, and died there. He was in his twentieth year when he arrived at Bijapur. It was in Bijapur that he wrote his History and spent the remainder of his days. * * * Ferishta wrote his history during the most flourishing period of Bijapur and it was fortunate that Ibrahim Adil Shah II—he who sleeps under the Majestic Mausoleum of the Rauza was his patron. He told him to write without fear or flattery, and he has done so."

Bombay and Western India Vol. I, p. 269—70.

† "Daughtet of Husain Nizam Shah I. of Ahmadnagar, and wife of "Ali Adil Shah I. of Bijapur, after whose death, in 1580, she was Regent of Ahmadnagar, and defended that city successfully against the Mugahalsim, 1595. She was put to death by the Dekhanis in 1599."—Beale's Dictionary.

তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার এই অলৌকিক বীরত্বে সোনানায়কগণ সকলেই লজ্জিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অহমদনগরে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে যখন দুর্গস্থ সমুদয় গোলাগুলি ফুরাইয়া গিয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার বন্দুক ও কামান প্রভৃতিতে তামা, রূপা ও স্বর্ণ মুদ্রা পুরিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যখন মণি, রত্নাদির নিক্ষেপের সময় আইসে তখন মুরাদ এই রমণীর অপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শনে সন্ধিস্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ফেরিস্তা চাঁদবিবির সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া ডগ্‌লাস সাহেব লিখিয়াছেন যে—"Chand Sultana (1599) he (Ferishta) has placed on a pedestal among the "immortals" side by side with Joan of Arc. He describes her "in armour, a veil on her face and a naked sword in her hand." That veil has now been gently removed and reveals to us blue or grey eyes, and a thin aquiline nose. Her face was fair, but her character was fairer; her form was light and graceful, but she was of womanly resolution and had the soul of a heroine: and the pedestal on which she stands is a bastion of Ahmadnagar."—(Bombay and Western India, Vol. I, p. 276). সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল মেডোজ টেলর তদ্‌রচিত "A Noble Queen" শীর্ষক ঐতিহাসিক উপন্যাসে চাঁদবিবির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন; সম্প্রতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় চাঁদবিবির চরিত্র অবলম্বন করিয়া যে নাটক রচিত হইয়াছে তাহাও বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর হইয়াছে।

বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের সমাধি—সম্রাট ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া আর দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ২১শে তারিখে ৯০ নব্বই বৎসর বয়সে অহমদনগরে দেহত্যাগ করেন। এ স্থানে অদ্যাপিও তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে।

এই সমাধি দেখিতে তেমন সুন্দর নহে। ঔরঙ্গজেবের ন্যায় প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাটের উপযুক্ত যে এই সমাধি হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ এই যে ঔরঙ্গজেব নিজে অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি নিজের খরচের জন্য রাজকোষ হইতে কখনও এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। নিজে স্বহস্তে কোরাণ লিখিয়া তুরস্ক দেশের সম্রাটের নিকট ২০০০ টাকায় বিক্রী করিয়াছিলেন, সেই টাকা দ্বারাই তিনি স্বকীয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার সেই টাকা হইতে মাত্র ৯০ টাকা অবশিষ্ট ছিল। ঔরঙ্গজেব মৃত্যু সময়ে বলিয়া যান যে তাঁহার সমাধির জন্য যেন কোনও প্রকার ব্যয় বাহুল্য না হইয়া তাঁহার রক্ষিত অবশিষ্ট টাকা দিয়াই উহা সম্পাদিত হয়। এই নিমিত্তই তাঁহার সমাধি অতিশয় সাধারণ রকমের। পূর্ব্বে এই সমাধির দেয়াল পর্য্যন্তও ছিল না, ঔরঙ্গজেবের এক কন্যা নিজব্যয়ে দেয়াল নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়াইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের দুইটী সমাধি। একটী অহমদনগরে, অপরটী রোজা নামক স্থানে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে অহমদনগরেই তাঁহার শব স্নাত এবং এ স্থানেই তাহার অন্যান্য পারলৌকিক কার্য্যাদি সম্পন্ন হয়। যেস্থানে এ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, অহমদনগরের সে স্থানেই ঔরঙ্গজেবের সমাধি বলিয়া বিখ্যাত। দক্ষিণ দেশের মুসলমানেরা এ স্থানকেই বেশী সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থও কতিপয় গ্রাম আছে। রোজা অর্থাৎ যে স্থানে ঔরঙ্গজেবের মৃতদেহ প্রথিত আছে তাহা দৌলতাবাদ হইতে ৬ মাইল দূরে পর্ব্বতোপরি একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এস্থানে বহু মুসলমান সাধুর সমাধি বিদ্যমান আছে। বোধ হয় ঔরঙ্গজেবকে গোঁড়া মুসলমান বিবেচনা করিয়াই মুসলমানগণ অন্যান্য সাধু মহাত্মাগণের দেহের নিকট তাঁহার শবও প্রোথিত করিয়াছিল। ঔরঙ্গজেব নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়াই এতদিন পর্য্যন্ত সকলে জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রও যে কলুষিত ছিল তাহা কেহই জানিতেন না। সম্প্রতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় 'প্রবাসী' নামক মাসিক পত্রে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত "মাসির্-উল্-উমরা" নামক মোগল সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত-

বর্গের যে অভিধান আছে তাহা হইতে ঔরঙ্গজেবের যে চরিত্র উদ্ধার করিয়াছেন তাহা পাঠে ঔরঙ্গজেবের চরিত্র সম্পর্কিত বদ্ধমূল ধারণা দূরীভূত করিতে হয়। তিনি ত জিতেন্দ্রিয় ছিলেনই না—বরং প্রথম জীবনে আমোদ প্রমোদ ও সুন্দরী রমণীগণের মধুর সঙ্গীতাদি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, শুনা যায় যে জৈনাবাদী নাম্নী এক সুন্দরী বিলাসিনী রমণীর হাব ভাবে ও সঙ্গীত-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি সেই রমণীকে নিজ অন্তঃপুরচারিণী (মদখুলা) করিয়াছিলেন।* বোধ হয় এখন হইতে ঐতিহাসিকগণকে চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণের রং ফলাইতে হইবে। তবে একথা ঠিক্ যে ঔরঙ্গজেবের ন্যায় কর্ম্মঠ ও কষ্ট সহিষ্ণু নৃপতি দিল্লীর সিংহাসনে অতি অল্পই আরোহণ করিয়াছিল। যদি তিনি স্বকীয় গোঁড়ামির দোষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ বীজ বপন না করিতেন তবে ইতিহাস ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত হইত এবং মোগল বংশ এত শীঘ্র ধ্বংস হইত না। বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের দেহাবসানে ক্রমশঃ মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইতে আরম্ভ হইল। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম-উল-মুলক দিল্লীর সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া অহমদনগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু স্বাধীনতার সুখ তাঁহার বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। কাফীজঙ্গ নামক তাঁহার জনৈক নীচ স্বভাব স্বার্থপর সেনাপতি অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অহমদনগরের দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দের তৃতীয় পেশবা বালাজী বাজীরাওকে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাড়িয়া দেয়। পেশবা আবার ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ সিন্ধিয়াকে প্রদান করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ওয়েলসলি (পরে ইনি ডিউক অব ওয়েলিংটন হইয়াছিলন) সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং অতি অল্প পরিশ্রমেই এবং একরূপ বিনা রক্তপাতে অহমদনগরের দুর্গ অধিকার করেন। অহমদনগর দুর্গ যে এত অল্প আয়াসে কিরূপে অধিকৃত হইল তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। জনপ্রবাদ এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে দুর্গাধিপতি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই দুর্গ ইংরেজের হাতে ছাড়িয়া দেন; এই উক্তি অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যে দুর্গ সম্বন্ধে ওয়েলিংটন নিজে

ডিউক অব ওয়েলিংটন।

* 'প্রবাসী' চতুর্থ ভাগ, ৭ম সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩১১ "আওরাঙ্গজেবের আদিলীলা" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।



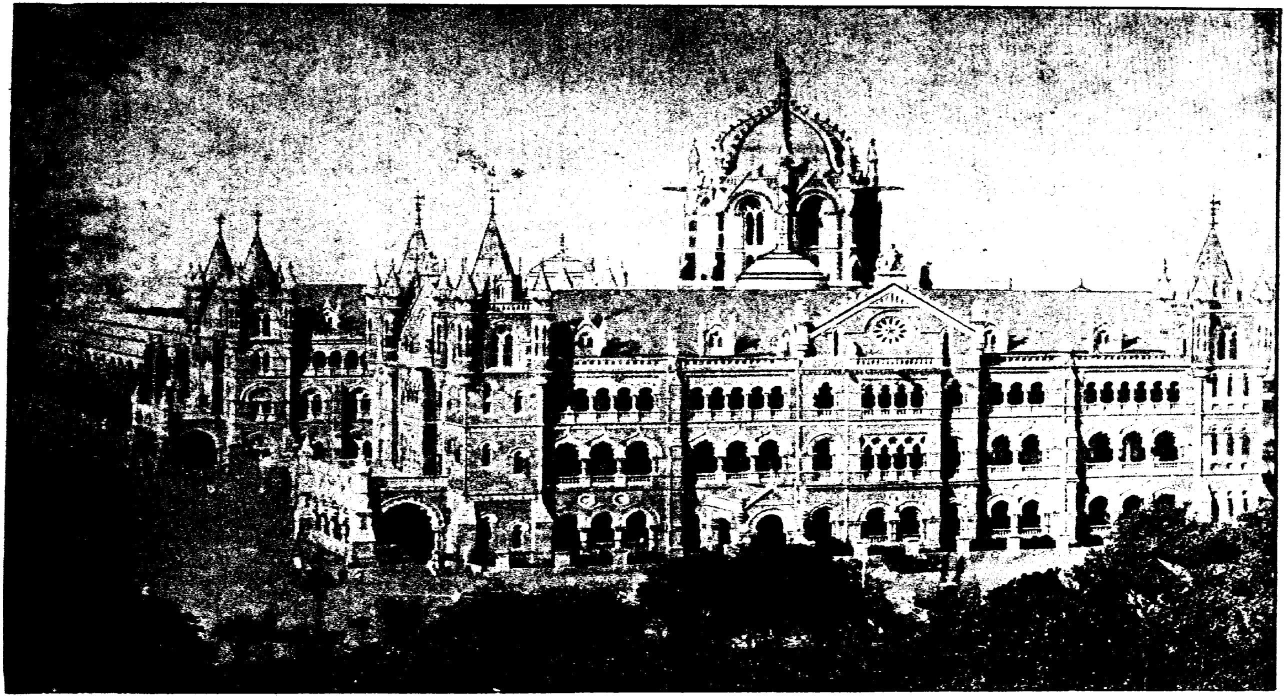
ডিউক অব ওয়েলিংটন ট্রি।

বলিয়াছেন যে আমরা যখন দুর্গ দখল করি তখন উহা ভাল অবস্থাতেই ছিল; তবে তাহা এত সহজে কিরূপে অধিকৃত হইল? আরও জানিতে পারা যায় যে সে সময়ে দুর্গের ভিতরে রসদ, বারুদ, ও গোলাগুলি প্রচুর পরিমাণে ছিল, এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও যখন বিনা রক্তপাতে দুর্গ ইংরেজদের হস্তে পতিত হইল, তখন উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপরই বটে। দুর্গ হাতে আসিবার পরে ওয়েলিংটন যে বৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষের নীচে ভোজন করিয়াছিলেন অদ্যাপিও তাহা "Duke's tree বা Wellington tree" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই বৃক্ষটি এখনও জীবিত আছে। এই ঘটনার স্মৃতি জীবিত রাখিবার জন্য ইংরেজ রাজ এ স্থানের চারিদিকে চারিটি তোপ রাখিয়া দিয়াছেন। গোখলা নামক একজন মহারাষ্ট্র সেনানায়ক অহমদনগরের দুর্গ জয়ের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ওয়েলিংটনের বিষয় তাহার এক বন্ধুর নিকট লিখিয়াছিল যে "These English are a strange people and their General a wonderful man; they come here in the morning, looked at the Peta wall, walked over it, killed the garrison, and return-

ed to breakfast. What can withstand them?" কথিত আছে যে এই দুর্গ লুট করিয়া ডিউক অব্‌ওয়েলিংটন এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়কগণ ধনী হইয়া গিয়াছিলেন। দুর্গ অধিকৃত হইবার কিছুদিন পরে ইহা পেশবাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশবা রাজ্যচ্যুত হইলে সে অবধি ইহা ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মুসলমান রাজগণের হস্তে অহমদনগর সুন্দর সুন্দর সৌধমালায় এবং উদ্যান সমূহে সুসজ্জিত ও সুশোভিত ছিল। এস্থানে জলসরবরাহ করিবার জন্য নিজামসাহী রাজগণ যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এবং যেরূপ সুকৌশলে নগরবাসীদিগের জল যোগাইতেন তাহা সবিশেষ প্রশংসনীয় এবং তাঁহাদের প্রজারঞ্জনের অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মুসলমান রাজগণকে বৈদেশিক ঐতিহাসিক-বৃন্দ যে বর্ণেই চিত্রিত করুক না কেন, তাঁহাদের কঠিন হৃদয়ের অন্তস্থলে ফল্গুনদীর সুনির্ম্মল পবিত্রধারার ন্যায় যে প্রজাপ্রীতির পূত স্নেহ-স্রোত প্রবাহিত হইত তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিলাসী ছিলেন —সময়ে সময়ে নিষ্ঠুর ছিলেন একথা স্বীকার করিলেও—অন্যদিকে তাঁহাদের মহত্ত্বের ও ঔদার্য্যের এবং সাম্য ভাবের কথা উল্লেখ না করিলে সে সমুদয় মোস্লেম-কুল-সম্ভূত মহাত্মাগণের স্বর্গীয় আত্মার প্রতি অবিচার করা হয়। অহমদনগরের প্রাচীন ইতিহাস ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয় ছাইয়া ফেলিয়াছিল। আমাদের মনে হইতেছিল যে সত্য সত্যই বুঝি আমরা নিজামসাহী রাজগণের রাজত্ব সময়ে বিচরণ করিতেছি। বিনা বিশ্রামে এবং এত অনিদ্রা ভোগ করিয়াও ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ যতই দর্শন করিতেছি, ততই অপূর্ণ হৃদয়ে পূর্ণতা জাগিতেছে। যখন অহমদনগর হইতে আমাদের বাস উঠাইয়া বোম্বাই গমনোদ্দেশ্যে অহমদনগর ষ্টেসনে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলাম—তখন অদূরস্থিত মস্‌জিদের গুম্বজ ইত্যাদি দর্শনে এক বিন্দু অশ্রুর সহিত কবির কথা মনে জাগিল :—

"Like leaves on trees the race of man is found,
Now green in youth, now shed upon the ground;
So generations in their course decay,
So flourish these when those have passed away."



ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বোম্বাই।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নগর বোম্বাই সহরে আসিয়া আমরা উপনীত হইলাম। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের মত (Victoria Terminus) রেলওয়ে ষ্টেসন ভারতবর্ষে আর নাই। কি সুন্দর উচ্চ অট্টালিকা, কি সুন্দর নির্ম্মাণ কৌশল! বহুদূর হইতেই এই ষ্টেসনের গগন-স্পর্শী চূড়া সকল নয়ন-গোচর হয়। এ ষ্টেসনে বহু টিকেট বিক্রয়ের স্থান। পুরুষ ও মহিলাদিগের বিশ্রাম-গৃহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে অবস্থিত। দিনরাত কত লোক আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু বন্দোবস্তের গুণে কোনওরূপ গোলযোগে পড়িতে হয় না। অগণ্য জনস্রোতের কল-কোলাহলে এঞ্জিনের ঘন ঘন বংশীধ্বনিতে, মুটের সোরগোলে,— যাত্রীদের ত্রস্তব্যস্ততার মধ্যে এমন একটা সজীবতা ও চঞ্চলতা বিদ্যমান ছিল যে তাহার যথার্থ বর্ণনা করিবার চেষ্টা অসম্ভব। ইংরেজেরা ভারতের রাজধানী কলিকাতাকে যেরূপ City of Palaces, বা প্রাসাদপূর্ণা নগরী বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ বোম্বাই সহরকেও "Bombay the beautiful," "London of the East" ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বোম্বাইর মত সুন্দর নগরী পৃথিবীতেই অতি অল্প আছে। একদিকে যেমন নৈসর্গের শ্যামল শোভা সম্পদে ইহা গরীয়ান্, অপর দিকে তদ্রূপ সুন্দর সুন্দর সৌধমালায় ও নাগরিক সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বেও ইহা ভারতবর্ষের কোনও নগর হইতে ন্যূন নহে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রাচীন কাল হইতেই বোম্বাই নগর বিখ্যাত ছিল। বোম্বাই সহরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুণির নানা মত। কেহ কেহ বলেন যে এখানকার 'মুম্বাই' দেবীর নাম হইতেই ইহার নাম বোম্বাই হইয়াছে; কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে পর্টুগীজেরা এ স্থানের সুন্দর উপসাগর (Bon-bay) দেখিয়াই এই দ্বীপের নাম রাখিয়াছেন। *

নামোৎপত্তি সম্পর্কে কথা।

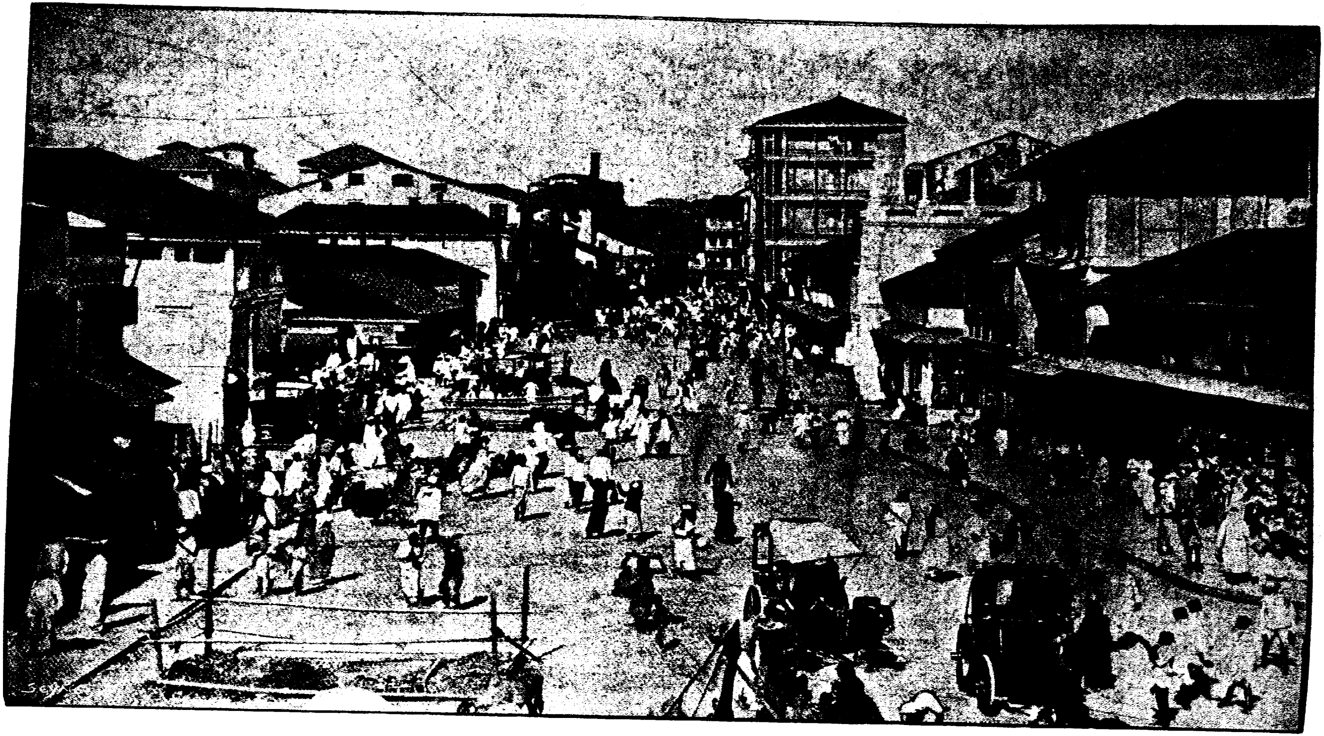
* "The word Bombay is written by Indians Mambé, and some times Bambé, from a goddess called Mamba Debi, to whom there was a temple 120 years ago on what is now called the Esplanade. It was pulled down and

নামোৎপত্তির সুগভীর রহস্য উদ্ঘাটন করিতে যাওয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের কর্ত্তব্য, আমরা প্রত্নতত্ত্বের কোনও ধার ধারি না কাজেই সে ব্যাপারে বেশী সময় নষ্ট করিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তির কারণ না হইয়া নগর সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাচীন ইতিহাস।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বহু আলোচনা করিয়া যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে সৌধকিরীটিনী বোম্বাই সহর অবস্থিত পূর্ব্বে তাহা একটী জঙ্গল পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র ছিল। সে সময়ে এ স্থানের নিকটবর্ত্তী এলিফেণ্টা, কানেরী প্রভৃতি গুহাবলী এবং বোম্বাই দ্বীপপুঞ্জ সমূহ কোনও প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার অধীনে ছিল বলিয়া তাঁহারা অনুমান করেন, কিন্তু কোন্ রাজবংশ এ স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্বীয় স্বীয় মতানুযায়ী নানাপ্রকারের আলোচনা করিয়াছেন সে আলোচনা আমাদের অনাবশ্যক। তবে ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, যে দ্বীপ এখন এলিফেণ্টা (Elephanta) বলিয়া পরিচিত উহাই তাহার রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে এই দ্বীপের প্রধান ঘাটের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড হস্তীর মূর্ত্তি ছিল ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মূর্ত্তি ধ্বংস হইয়াছে। হিন্দুগণ এই দ্বীপকে পুরী নামে অভিহিত করে। ইহা যে হিন্দু রাজার অধীনে এবং হিন্দু তীর্থ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, কারণ এখনও পর্ব্বত খোদিত গুহাবলী ও হিন্দুদিগের পূজনীয় বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান থাকিয়া প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ আধিপত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে গুজরাতের অনহিলপুরের রাজা চালুক্যবংশীয় ভীমদেব বোম্বাই দ্বীপ-পুঞ্জ জয় করিয়া মাহিম নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি ১০২২ হইতে ১০৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ সিংহাসনে

rebuilt near the Bhendi Bázár. The Maratha name of Bombay is Mumbai, from Mahima, "Great mother," a title of Devi, still traceable in Mahim, a tower on the W. Coast of Bombay Island. Some people derive the name from Buon Bahia, "fair haven," and in support of that etymology it may be said that it is undoubtedly one of the finest harbours in the world."—Hand Book of Bombay by Edward B. Eastwick, Page 113.



রাজপথ—বোম্বে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

সমাসীন ছিলেন। মাহিমের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই এলিফেণ্টার গৌরব অন্তর্হিত হয়। এই ভীমদেব মহারাজা কর্ত্তৃকই বোম্বাইর উন্নতির সূত্রপাত হয়, তিনি যখন এ স্থানে রাজত্ব করিতেন তখন এই স্থান বাবলা গাছে পরিপূর্ণ এবং জেলেদের কুটীরে পরিশোভিত ছিল। মহারাজা ভীমদেব বিশেষ উৎসাহী ও কর্ম্মঠ নরপতি ছিলেন, তিনি এ স্থানের লোককে ফল-বৃক্ষ রোপণে এবং নারিকেলের চাষ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। ইঁহার চেষ্টা ও যত্নে বহু ব্রাহ্মণ ও বণিক্‌গণ এখানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি বোম্বাইতে দেব-মন্দির ও ধর্ম্মশালা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজিও বোম্বাইবাসী নরনারীগণ এই মহাত্মার নাম গৌরবের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে

মুসলমান রাজত্বে বোম্বাই।

বোম্বাইর নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে সে সময়ে ইহা নগণ্য ক্ষুদ্র বন্দর মাত্র ছিল। বোম্বাই-দ্বীপ ১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদের হাতে পতিত হয়।

পর্ত্তুগীজদের কথা।

পর্ত্তুগীজদিগের সময় হইতেই এস্থানের ইতিহাস ভাল করিয়া অবগত হইতে পারা যায়। সমুদ্র পথে ভারতাগমনের পথ পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হইলে পর ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নাবিক শ্রেষ্ঠ ভ্যাস্কো-ডি-গামা সর্ব্ব প্রথমে ভারতের কেলিকাট নগরে অবতরণ করেন। তখন তাহাদের ভারত সমুদ্রে বাণিজ্যাধিকার হস্তগত করিবার জন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজাদের সহিত বহু যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজদের প্রথমে মালাকরের তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, কালিকট, কেনানোর, গোয়া প্রভৃতি স্থানেই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইহাদের সময়ে বোম্বাই বন্দর, গুজরাট দেশীয় মুসলমান রাজাদের অধিকার ভুক্ত ছিল, পর্ত্তুগীজরা ঐ বন্দর উক্ত নৃপতিদের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লয় এবং এই দ্বীপগুলি শতাধিক বৎসর তাহাদিগের শাসনাধীনে থাকে। পর্ত্তুগীজরা অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিল, কাজেই ইহাদের কর্ত্তৃক এলিফেণ্টা ও কানেরী প্রভৃতি দ্বীপস্থ গুহাবলীর প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি সমূহ বহু পরিমাণে নষ্ট হয়। ধর্ম্মের গোঁড়ামির জন্য ভারতের কত সুন্দর সুন্দর মন্দির ও মঠ, কত স্থপতি

কৌশলের ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার গৌরব-জ্ঞাপক প্রাসাদাবলী যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে ভারতবাসী মাত্রেরই শোণিত-স্রোত ধমনীতে একটু বেগে প্রবাহিত হয় ও ব্যথিত হৃদয়ের একবিন্দু অশ্রু অলক্ষ্যে মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া শুকাইয়া যায়। মুসলনান হিন্দুর মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে, হিন্দুর আরাধ্য দেবতার নাক কাণ কাটিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়াছে, খ্রীষ্টান অম্লান বদনে সাম্যের পরিবর্ত্তে হিন্দু ধর্ম্মের দেব দেবীগণের প্রতি অভদ্রোচিত ভাষা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং হইতেছেও না, কিন্তু কেহ কি এ কথা বলিতে পারেন যে হিন্দু মুসলমানের মস্‌জিদ ভাঙিয়াছে এবং খ্রীষ্টানের বাইবেলের নিন্দা করিয়াছে? যদি বিশ্বজনীন প্রেম ও ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক মহত্ব কোথাও থাকে তবে এক হিন্দু ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের অপর কোনও ধর্ম্মে নাই ইহা স্বতঃ সিদ্ধবাক্য। হিন্দুর চক্ষে জগত ব্রহ্ম,—তাহারা কোন্ প্রাণে পরধর্ম্মের নিন্দা করিবে? আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্মের বিদ্বেষের ন্যায় পাপ জগতে অতি বিরল,—সব ধর্ম্মই সেই এক পরম পুরুষের মহিমামণ্ডিত সিংহাসনের গন্তব্য পথের প্রদর্শক, তবে রীতিভেদ—জাতিভেদ এবং দেশ ভেদে বিভিন্নরূপ হয়, ইহা স্বাভাবিক। এই যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন সংঘটিত হইতেছেনা, আমাদের বিশ্বাস ইহা ধর্ম্মগত প্রভেদের জন্য নহে, কেবল আমাদের হৃদয়-গত সংকীর্ণতাই ইহার মূল উপাদান। যাক্ এসব কথা। পর্ত্তুগীজদের পরে আর এক ক্ষমতাশালী ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য ছলে উপনীত হয়—ইহারাই ইংরেজ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজরা এদেশে প্রবেশ করে এবং তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি বোম্বাই বন্দরের উপর পতিত হয়। তখন কি কেহ মনে কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল যে চঞ্চলা সৌভাগ্য লক্ষ্মী গোপনে ভারতের রাজটীকা ইহাদের শুভ্র ভালে গৌরবের সুকল্যাণ প্রভার সহিত অঙ্কিত করিয়া দিবে? ইংরেজেরা বোম্বাই পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে দখল করিবার দুই একবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পর্ত্তুগালের রাজকন্যার বিবাহ হওয়ায় চার্লস বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই বন্দর প্রাপ্ত হন। প্রকৃত পক্ষে ১৬৬১

খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বন্দর ইংরেজদের হস্তগত হয়। সে সময়ে বোম্বাই দ্বীপ নিতান্ত হতাদরের বস্তু ছিল, এমন কি ইংলণ্ডের রাজা কেবল মাত্র ১০ দশ পাউণ্ড করের বিনিময়ে কোম্পানী বাহাদুরের হস্তে ইহা অর্পণ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই নগরীর আদিম অবস্থার সহিত বর্ত্তমান সুখ ও সমৃদ্ধির বিষয় তুলনা করিতে গেলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। যেখানে একদিন কেবল সমুদ্র তটস্থ সুশ্যামল তালীবনের তরঙ্গায়িত উন্মাদ সৌন্দর্য্য বাবলাগাছের সারি, জেলেদের কুটীর ও সর্প সমেত মাত্র দশ হাজার জন-সংখ্যা ছিল,—আজ বিজ্ঞানবিদ্ ঐন্দ্রজালিক ইংরেজজাতির মায়াদণ্ড প্রভাবে ইহা অমল ধবল সুন্দর নগরে ও বন্দরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ সুবৃহৎ ও সুন্দর বন্দর ভারতবর্ষে ত নাই-ই, পৃথিবীতেও অতি অল্প আছে। নানা কারণে এই বন্দর এত শীঘ্র উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে। উপসাগরের সুন্দর সংস্থানই ইহার প্রধানতম কারণ। মান্দ্রাজ, পণ্ডিচারী প্রভৃতি অন্যান্য উপকূলবর্ত্তী নগরের প্রতি প্রকৃতি সুন্দরীর স্নেহ-দৃষ্টি না থাকায় এবং স্বভাবদত্ত আশ্রয় স্থান নাই বলিয়াই তাহাদের এত উন্নতি হয় নাই, কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত; এস্থানে প্রতিকূল সমুদ্রতটের উপর তাহার অনুকূল দৃষ্টি। এই বন্দরে জলের ডক্, স্থলের ডক্, ঘাট, যন্ত্র-সরঞ্জাম প্রভৃতি সকলই আছে। এখানে সর্ব্বদাই নানাজাতীয় জাহাজের বহুল গতিবিধি। Hand Book of Bombay নামক পুস্তক প্রণেতা বলেন যে "The port is always crowded with vessels of all nations, and conspicuous amongst them are 2 monitors, which constitute one of the important defences of the Harbour. বন্দরের এক কোণে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে যে "১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ধনীপার্সীর চেষ্টায় ও যত্নে এই বন্দর নির্ম্মিত হয়।" বন্দরে আসিলে পথিককে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। চারিদিকে সমুদ্রের নীল তরঙ্গমধ্যে শাদা শাদা রণতরীগুলি আপনাদের পৌরুষ গর্ব্বে ভাসমান। যে দিকে নয়ন ফিরাইবে সে দিকেই

অতীত ও বর্ত্তমান।

বন্দর।

মাস্তুলের পর মাস্তুল তার উপরে মাস্তুল,—মাস্তুলের এক নিবিড় অরণ্য,—ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় পতাকা পবনভরে আন্দোলিত হইয়া স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিতেছে; কি সুন্দর—কি মহিমা ব্যঞ্জক, তখন ইংরেজ-রাজের অদম্য উদ্যমশীলতা ও পুরুষকারের প্রশংসার সহিত বিজয়-সঙ্গীত না গাহিয়া থাকিতে পারা যায় না। বোম্বাই সহরে দেখিবার যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ডক, ব্যাঙ্ক, কালেজ, বাজার, যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে সে দিকেই তোমার মন আকর্ষণ করিবে। নগরের চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, সে সব পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলে নারিকেলের সুশ্যামল কুঞ্জের অভ্যন্তরে সৌধাবলীর শ্বেতচ্ছবি ও কলকারখানাগুলির উচ্চ ধূম-ধ্বজ দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য।

বোম্বাই নগরীকে এসিয়ার ম্যাঞ্চেষ্টার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ সমুদয় ভারতবর্ষে যে সূত্র ও কাপড়ের কল আছে তাহাদের মূলধনের সমষ্টি ৩ কোটি বিশলক্ষ টাকা এবং সর্ব্বসমেত স্ত্রী ও পুরুষে ১৮,০০০ মজুর খাটিয়া থাকে, এবং মোট ১৯২টি কারখানা ও ৫০ লক্ষ টাকু (spindle) আর এক বোম্বাই সহরেই ৮০টা কারখানা, ২০ লক্ষ টাকু এবং ৮৫০০০ মজুর খাটে। এস্থানের বণিক্‌দের কার্পাস-শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত, রপ্তানী মালের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, বোম্বাই নগরীর কন্‌সলের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৮৯৬ সন হইতে নিদারুণ মহামারী (প্লেগ) এই নগরে স্থায়ীরূপে আড্ডা করা সত্ত্বেও ইহার সুবিস্তৃত ব্যবসা বাণিজ্যের কোনওরূপ অন্তরায় হয় নাই। ভারতবর্ষের কার্পাস-শিল্প ব্যবসায়ের একমাত্র বোম্বাই নগরীই কেন্দ্রস্থান। বোম্বাই কন্‌সলের রিপোর্ট হইতে আরও জানা যায় যে ১৯০২-১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বাষ্পীয় পোত ও পালের জাহাজ মোট ৯১১ খানা ১২৯০২৬৫ টন মাল লইয়া আসিয়াছিল এবং ৭২৮ খানা বাষ্পীয় পোত ও পালের জাহাজ ১২০৪২৯৩ টন্ ওজনের মাল বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। মোট যাতায়াতে ১৬৩৯ খানি জাহাজ ও ২৪৯৪৫৫৮ টন ওজনের মাল আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে, ইহা হইতেই বোম্বাই নগরীর বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব পাঠকবর্গ অনুভব করিতে পারিবেন। সমস্ত ভারতের

বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ বোম্বাইনগরে হয়। এস্থানে ফরাসী, ইটালীয়, জাপানী, পেনিনসুলার, মেসাজেয়ার ম্যারিটিম, নিপোঁয়ুসেন কাইসা প্রভৃতি কোম্পানীর জাহাজ প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিয়া থাকে। বোম্বাই নগর বিশ্বজনিক নগর। এস্থানে যত ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক দেখা যায় ও ভাষা শুনিতে পারা যায় তদ্রূপ ভারতবর্ষের আর কোথাও নহে। এনগরে ভারতের সমুদয় প্রধান প্রধান জাতিরাই আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। এ নগরে গির্জ্জা, মসজিদ, অগ্নিমন্দির, দেবালয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ও রুচি পাশাপাশি ভাবে থাকা সত্বেও কোনরূপ নীচ হিংসা ও দ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হয় না। এ হিসাবেও বোম্বাই সহরের গৌরব কম নহে। সকলেই কর্ম্মে ব্যস্ত, কে কাহার কথা কাণে তুলিবে? "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" প্রাচীন শাস্ত্রকারের এই উক্তির মহিমা এস্থানে পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয়। এ নগরের বণিক্‌জাতির মধ্যে পার্সী ও ভাটিয়াই প্রধান। ইহাদের উদ্যমশীলতা ব্যবসা-বাণিজ্য বুদ্ধিবিহীন বাঙ্গালী আমরা যদি অনুকরণ করিতে পারিতাম তবে ধন্য হইতাম। এ স্থানের ধনাঢ্যগণ ধনের সদ্ব্যবহার করিতেও জানেন। বোম্বাই নগরীর হাঁসপাতাল, স্কুল, অতিথশালা, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি অধিকাংশই ধনশালী বণিকগণ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এ নগরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী হাইকোর্ট, গভর্মেণ্ট সেক্রেটারিয়েট, ইউনিভারসিটি হল, লাইব্রেরী, ক্লকটাউয়ার, তাজমহল হোটেল, মিউনিসিপালিটির বাড়ী, ক্রফোর্ড বাজার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস, টাউনহল, ও ধনাঢ্য পার্সী ও ভাটিয়াদের প্রাসাদসমূহও দেখিবার জিনিষ। আমরা একে একে তাহাদের বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাইর ক্রমোন্নতির সহিত তুলনা করিতে গেলে ইহা কলিকাতা হইতে কোন অংশেই হীন বলিয়া বোধ হয় না।

দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ।

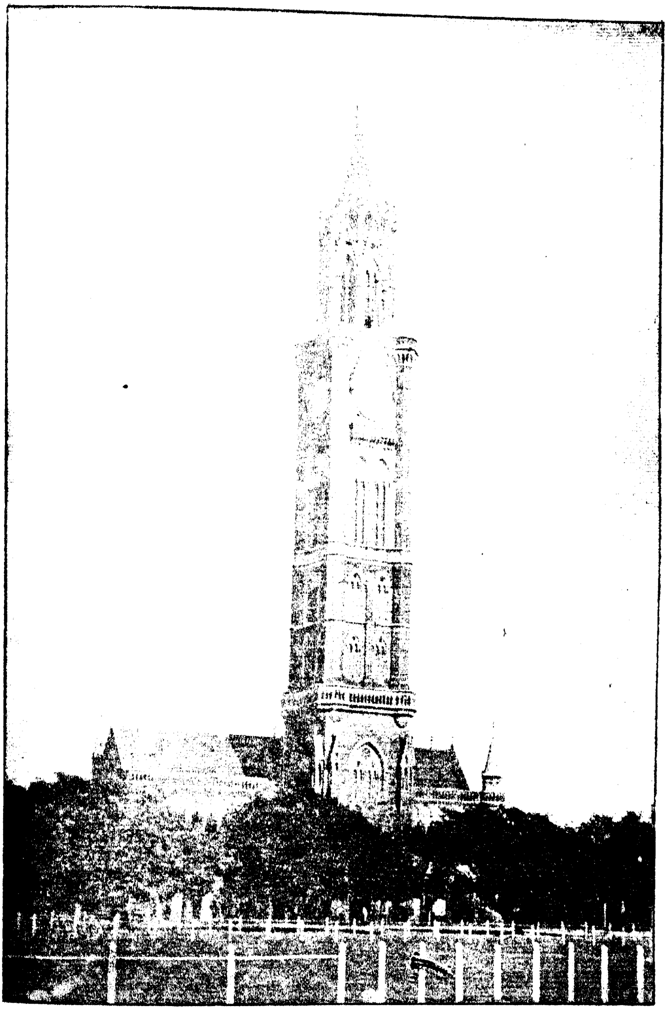
এস্থানে গভর্মেণ্টের আফিসগুলি যেরূপ সুন্দররূপে সংস্থাপিত ভারতবর্ষের আর কোন সহরেই তদ্রূপ নাই। হাইকোর্টের সৌধটী তাহার নিকটস্থ অন্যান্য সমুদয় সৌধাবলী অপেক্ষা সুবিশাল ও গৌরবশালী এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটী দৈর্ঘ্যে ৫৬২ ফিট এবং প্রস্থে ১৮৭ ফিট।

এবং মৃত্তিকা হইতে টাওয়ারের উচ্চতা ১৭৫ ফিট হইবে। প্রথম ও তৃতীয় তলে হাইকোর্টের আফিসগুলি, দ্বিতীয়তলে অরিজিনাল সাইড ও আপিলেট সাইড, মধ্যভাগে ফৌজদারী কোর্ট। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী এই হাইকোর্ট সর্ব্বপ্রথমে খোলা হয়। জে, এ, ফুলার, R.E. সাহেবের নক্সানুসারে ১০০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রাব্যয়ে এই সুগঠিত ও সুদৃশ্য অট্টালিকাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী ও ক্লকটাওয়ারের নির্ম্মাণ কৌশল অপূর্ব্ব কল্পনা ও শিল্পের চরমোৎকর্ষ বলিলে কোনও রূপ অতিশয়োক্তি হয় না।

ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী ও ক্লকটাউওয়ার।

ইহার ঘটিকাস্তম্ভ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। ইহা আট স্তরে বিভক্ত ও ২৬০ ফিট উচ্চ—দিল্লীর সুবিখ্যাত কুতবমিনারও উচ্চতায় ইহা অপেক্ষা ৮ ফিট কম। প্রসিদ্ধ দাতা খ্যাত নামা প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের মাতার স্মরণার্থ নির্ম্মিত রাজাবাই টাউয়ার ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। সমুদ্রের তটদেশে অবস্থিত বলিয়া ইহার সৌন্দর্য্য ও বিশালত্ব আরও গৌরবময় বলিয়া অনুভূত হয়। এই স্তম্ভটী চারিতল বিশিষ্ট। ইহার মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া যে সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দ্বারা উপরে উঠিতে হয়। চতুর্থ তলে বৃহৎ ঘড়িখানা, এই জন্যই ইহাকে ক্লক টাউয়ার বলিয়া থাকে। এই ঘড়িটির বৃহত্বের কথা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। এই ঘড়ি প্রতি পনের মিনিট অন্তর আপনাআপনি সুমধুর তানলয়ের সহিত বাজিয়া ওঠে। এই স্তম্ভের উপর হইতে চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিলে নৈসর্গের প্রাণারাম সৌন্দর্য্যে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। বোম্বাই বন্দরের সমগ্র সৌন্দর্য্য এক মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পশ্চিম দিকে আকাশের নীলিমায়ও সমুদ্রের নীলিমার অনন্ত সৌন্দর্য্য—কত জাহাজ কত নৌকা ও আলোক স্তম্ভ সমূহ বিরাজমান,—আর একদিকে হরিৎ-শ্যামল তরুকুঞ্জের মধ্যস্থ উপবন, কারখানা, সুন্দর সুন্দর সৌধমালা ও বালুকেশ্বর শৈলবর গৌরবের সহিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে! এপোলো বন্দর, ত্রিতল, পঞ্চতল সৌধ সমূহ, রাজপথ সমুদয় এ স্থান হইতে একটা সঙ্গীতবৎ আলেখ্যের ন্যায় প্রতিয়মান হয়। এই স্তম্ভ ও ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী প্রসিদ্ধ দাতা প্রেমচাঁদ রায়.চাঁদ চতুর্লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে



রাজাবাই স্তম্ভ—বোম্বে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীটী বোম্বাইবাসীর গৌরবের বিষয়। লাইব্রেরী গৃহে যে একখানা ক্ষুদ্র খোদিত ফলকলিপি আছে তাহাতে এই স্তম্ভ ও লাইব্রেরী গৃহের সমগ্র ইতিহাস গ্রথিত আছে। আমরা পাঠক বর্গের জ্ঞাতার্থ এ স্থানে তাহার অনুলিপি প্রদান করিলাম—

"The University Library and Raja Bai Clock Tower was erected from designs by Sir Gilbert Scott, R.A., F.S.A., F.R.I.A., and sanctioned by the Government of Bombay on the 16th January, 1869.

The work was commenced on the 1st of March, 1869. His Excellency the Right Honorable Sir Seymour Vesey Fitzgerald, G.C.S.I., Chancellor; Rev. John Wilson, F.R.S., Vice-Chancellor.

This work was carried out under the immediate orders of Lieutenant Colonel J. A. Fuller, R.E., from March 1869 to May 1871; T. H. E. Hart, M. Inst, C.E., from May 1871 to November 1872; Lieutenant Colonel J. A. Fuller, R.E., from December 1872 to November 1878; Rao Bahadur Makund Ramchandra being Assistant Engineer in charge.

The entire cost of the building, together with the Clock and Chimes, was contributed by Premchand Raichand, Esq., J.P.

Lieutenant-General Sir Michael Kennedy, Kt. C.S.I., R.E., Secretary to Government, Public Works Department."

একটা গৌরবের বিষয় এই যে এইরূপ একটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গৌরব স্তম্ভ নির্ম্মাণে আমাদের দেশীয় একজন নিপুণ শিল্পীর হস্ত চিহ্ন বিদ্যমান থাকায় আমরা বিশেষ গৌরব ও আনন্দের সহিত ইহার শিল্প নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি। রায় বাহাদুর মুকুন্দ রামচন্দ্র এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ইহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। গ্যালারির উর্দ্ধভাগে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতি, কচ্ছি, পার্সী প্রভৃতি বোম্বাইবাসী বিভিন্ন শ্রেণীস্থ জাতিজ্ঞাপক মূর্ত্তি সমূহ ইঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা এই স্তম্ভ সম্বন্ধে এডওয়ার্ড্ বি ইষ্টউইক (Edward B. Eastwick) সাহেবের

মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াই এতৎ সম্পর্কিত বক্তব্য শেষ করিলাম। এডওয়ার্ড সাহেব বলেন "The Great University or Raja Bai Tower is annexed to the Library on the W. Side, and is from its vast height the most remarkable buildings in Bombay. It is 200 ft. high, and therefore 8ft. higher than the Kutub Minar at Dilli, and was founded at the expense of Mr. Premchand Raichand, who assigned for its erection 300,000 Rs., being a gift in memory of his mother, Raja Bai." শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে এমন লোক অতি বিরল যিনি প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের নাম শোনেন নাই। এই বোম্বাই নিবাসী দানবীর বণিক্ প্রবরের প্রদত্ত অর্থ হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বিশেষ পরীক্ষা প্রদান করিয়া বার্ষিক দশহাজার টাকার একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহারই নাম Roy Chand Prem Chand Scholarship। বর্ত্তমান সময়ে কোম্পানির কাগজের সুধ কমিয়া যাওয়ায় এই বৃত্তি এখন দশ হাজার হইতে আট হাজারে পরিণত হইয়াছে। প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের বংশের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছল না থাকিলেও ইঁহারা পূর্ব্ব পুরুষের বদান্যতার জন্য সমাজে বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকেন।

ইউনিভারসিটি হল—এই সুন্দর অট্টালিকাটী আদিম ফরাসী প্রণালী অনুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হলটীর দৈর্ঘ্য ১০৪ ফিট এবং প্রস্থ ৪৪ ফিট, উচ্চতা প্রায় ৬৩ ফিট হইবে। এই গৃহের কাঁচ নির্ম্মিত চিত্রিত জানালাগুলি বড়ই সুন্দর। সার কাউসজী জাহাঙ্গীর, কে, সি, এস, আই, নামক জনৈক পার্সী দাতা ইহার নির্ম্মাণের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। ইউনিভার্সিটি হল তৈরি করিতে মোট ৩,৭৯৭,৩৮৯ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আলোক-গৃহ—এখানকার সমুদ্র গর্ভস্থ প্রধান আলোক-গৃহ (Light-house) ১৫০ ফিট উচ্চ, ইহার আভ্যন্তরিক পরিধি ১২ ফিটের কম হইবে না। আলোক-গৃহের নিম্নস্থ রোয়াকে জল হইতে আরোহণ করিবার জন্য ১১ এগারটী সিঁড়ি আছে। সেই নিম্নতল হইতে ২৬টী সিড়ি পার হইলে প্রথম কক্ষে পঁহুছা যায়। একটী সিঁড়ি হইতে অপর সিড়ি এক ফিট উচ্চ। ঝড়ের সময় সমুদ্র তরঙ্গ প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ হইয়া ভীষণ রবে

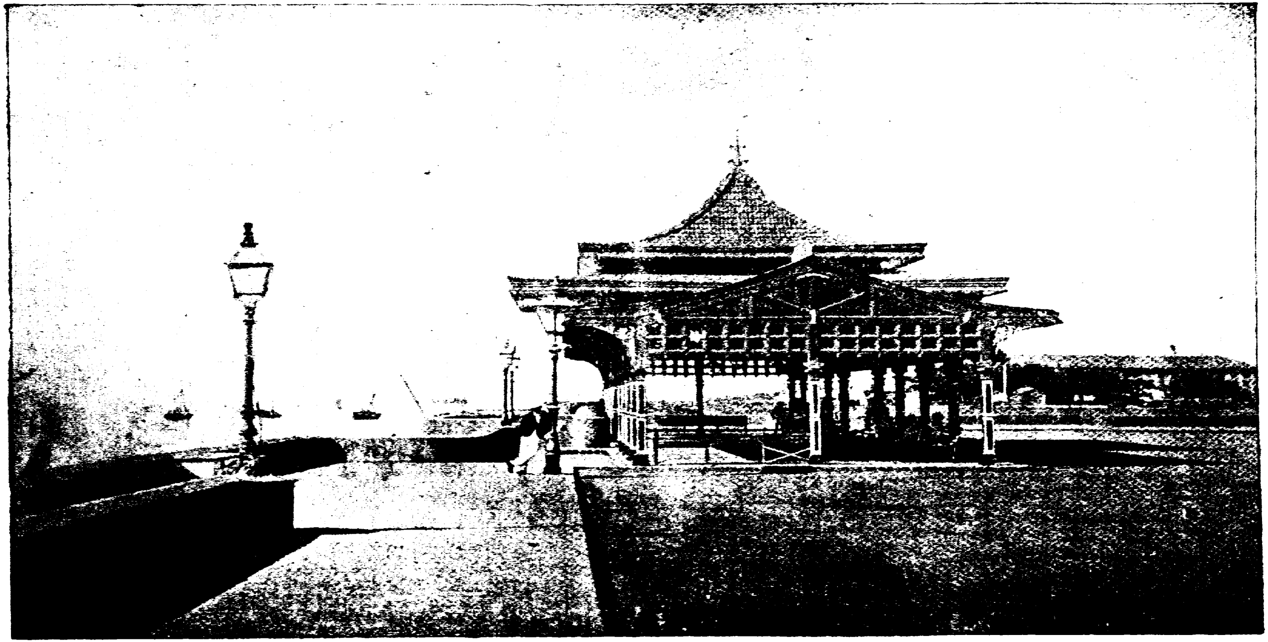
আলোক-গৃহের গায়ে আঘাত করিয়া থাকে। এই আলোক-স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করিতে গভর্মেণ্টের ৬০,০০০ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। একজন সাহেব ও পাঁচ জন দেশী লোকের তত্বাবধানে ইহা রক্ষিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম তারিখে এই আলোক-গৃহ হইতে সর্ব্ব প্রথমে আলোক প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই আলোক-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে কত জাহাজ ও কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন এই আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমুদ্রের সমুজ্জ্বল ফেণিল নীল তরঙ্গ মধ্যে নৃত্য করিতে থাকে, তখন উহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টে সত্যসত্যই মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। বোম্বাইনগরী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রুতগতিতে উন্নতির স্তরে আরোহণ করিয়াছে। বিশ বৎসরের মধ্যে ইহার রাস্তা ইমারত ইত্যাদিতে ৬ ক্রোর টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইনগরে প্রথম প্লেগ হয়, ঐ ভীষণ ব্যাধিতে এস্থানের বহু অধিবাসী প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। প্লেগ রোগ সাধারণতঃ দরিদ্রের মধ্যেই বেশী হয় এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানেই ইহার আধিক্য দৃষ্টে এই নগরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এবং দরিদ্রদের বাসের জন্য সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মিত হইতেছে, গভর্মেণ্টের এই নগরের উন্নতিকল্পে যেরূপ মনোযোগ, ইহাতে আশা করা যায় যে একদিন এই নগর ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর হইবে। জনসংখ্যায় ইহা এখন ভারতের তৃতীয় স্থানীয়। ১৮৮১, ১৮৯১ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরের লোক-সংখ্যা যথাক্রমে ৭৭৩১৯৬, ৮২১৭৬৪ এবং ৭৭০০৪৩ ছিল। ১৮৮১ হইতে ৯১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে লোকসংখ্যা শতকরা ৬ জন বাড়িয়াছিল এবং তাহার পরবর্ত্তী দশ বৎসরে শতকরা ছয় জন কমিয়াছে। এস্থানের লোকসংখ্যার মধ্যে এক আনা রকমের লোক পার্সী, ইঁহারা ধনে জ্ঞানে বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে বিশেষ উন্নত।

সেক্রেটারিয়েটের বাড়ীটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৪৩॥ ফিট, ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি শাখা-গৃহ আছে। প্রথম তলায় কাউন্সিল হল ও গভর্ণরের ও মেম্বরদের গৃহ। কাউন্সিল গৃহটী দৈর্ঘ্যে ৫০ ফিট এবং প্রস্থে ৪০ ফিট। এই গৃহ মধ্যস্থ টেবিলটি বড়ই সুন্দর। এখানে ব্যবস্থা-

পক সভার (Legislative Council) সভ্যগণের ও গভর্ণর সাহেবের বসিবার জন্য সুন্দর সুন্দর চেয়ার আছে, গভর্ণর সাহেবের চেয়ারের পশ্চাদ্‌ভাগ, সভ্যগণের চেয়ারের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। এস্থানের লাইব্রেরী গৃহটী বড়ই সুন্দর। হল-গৃহের মধ্যস্থ খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ১৮৬৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে এই বৃহৎ বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৭৪ সনের মার্চ্চ মাসে ইহার শেষ হয়। একজন দেশীয় ইঞ্জিনিয়া-রের তত্ত্বাবধানে ইহার কার্য্য পরিচালিত হইত। ইহার নির্ম্মাণে ১২,৬০,৮৪৪ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। উপরিস্থিত স্তম্ভটী ১৭০ ফিট উচ্চ হইবে।

সেক্রেটারিয়েট আফিসের বামদিকে প্রায় ২৫০ গজ পথ অগ্রসর হইলেই নাবিকদের গৃহ বা Sailor's Home দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। এই বাড়ীটী দৈর্ঘ্যে ২৭০ ফিট এবং প্রস্থে ৫৫ ফিট। ইহার উত্তর দক্ষিণ দিকে দুইটী শাখা-গৃহও আছে। এখানে ২০ জন কর্ম্মচারী, ৫৮ জন নাবিক একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একজন সহকারী সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট ও ২০ বিশজন চাকর থাকিতে পারে। কোনও বিপদাপদ হইলে এস্থানে শতাবধি লোকও থাকিতে পারে। সামান্য অর্থব্যয়ে নাবিকগণ এস্থানে আহারাদি করিয়া থাকে। কাহারও পীড়া হইলে তাহাকে হাঁস-পাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ এখানে কোনও পীড়িতদের থাকিবার উপযোগী গৃহ নাই। এখানকার পড়িবার ঘরটী বেশ সুন্দর, পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। এই কক্ষটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩৫ × ৩০ ফিট। নাবিক-গৃহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১৭০ টাকা বেতন পান, থাকিবার জন্য ভিন্ন কোয়ার্টার আছে, আহারাদির নিমিত্তও তাহাকে স্বতন্ত্র কিছুই দিতে হয় না। বরোদার ভূতপূর্ব্ব নৃপতি খাণ্ডেরাও গুইকোয়ার ডিউক অব্ এডিনবরার ভারতাগমনের স্মৃতি জীবিত রাখিবার জন্য এই গৃহের নির্ম্মাণার্থ ২০০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ ডিউক কর্ত্তৃক এই গৃহের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত হইয়াছিল। এই গৃহস্থ হলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মার্ব্বেল প্রস্তরের উপর সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহার নির্ম্মাণে ৩৬৬,৬২৯ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ফলকের মধ্যে লিখিত আছে যে * * * * H. H. Khande

নাবিকদের ঘর বা Sailor's Home



আপোলো বন্দর—বোম্বাই।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

Rao Gaekwad, G.C.S.I. contributed Rs. 200,000. Estimate as sanctioned, Rs. 3,68,565, actual cost, Rs 366,629.

The first stone of this building, erected as a home for the Sea men of this Port, and dedicated by His Highness Khande Rao Gaekward, as a perpetual token of his loyal attachment to H. M. Queen Victoria, and in commemoration of the auspicious arrival in Bombay of H. R. H. the Duke of Edinburgh, K.G., K.T., G.C.M.G., G.C.S.I., P.N., Master of the Corporation of Trinity House, was laid by His Royal Highness this 17th day of March, 1870, The Right Honorable W. R. Seymour V. Fitzgerald being Governor of Bombay.

সেইলারার্স হোম হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই এপোলো বন্দর (Apollo Bandar) দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটী দেখিতে পরম রমণীয়। এখানে সপ্তাহের মধ্যে ২।৩ দিবস মধুর রবে ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। নয়ন-সমক্ষে দিগন্ত বিস্তৃত নীলজলধির নীল সীমা গগনের নীলিমার সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। কত জাহাজ কে তাহার সংখ্যা করে? সমুদ্রের তীরস্থ ঘাট প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার সিঁড়িগুলি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা এইরূপ দৃঢ়তার সহিত নির্ম্মিত যে দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। একদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার অমল ধবল সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতে হয় অপর দিকে প্রকৃতি সুন্দরীর বিবিধ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্য নিচয় দর্শককে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। কৃত্রিম অকৃত্রিমের মানবের ও বিধাতার হস্তের অপূর্ব্ব শিল্প এস্থানে একাধারে বিরাজমান। তটের উপরিভাগে দর্শকগণের বসিবার জন্য যে সকল প্রস্তরাসন ও কাষ্ঠাসন আছে উহার উপরে উপবেশন পূর্ব্বক একবার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলাম, দূরস্থিত সমুদ্র বক্ষস্থ তাল-খর্জ্জুর গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষ সমূহ পরিশোভিত সুন্দর সুন্দর দ্বীপশ্রেণী মন-মুগ্ধ করিতেছিল, আর "পদতলে ঢল ঢল, সুনীল সাগর-জল" তাহার মহিমাময় অনন্ত সৌন্দর্য্য যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন, এক একটী তরঙ্গ তীরে আসিতেছে আবার ধীরে পিছু হটিয়া

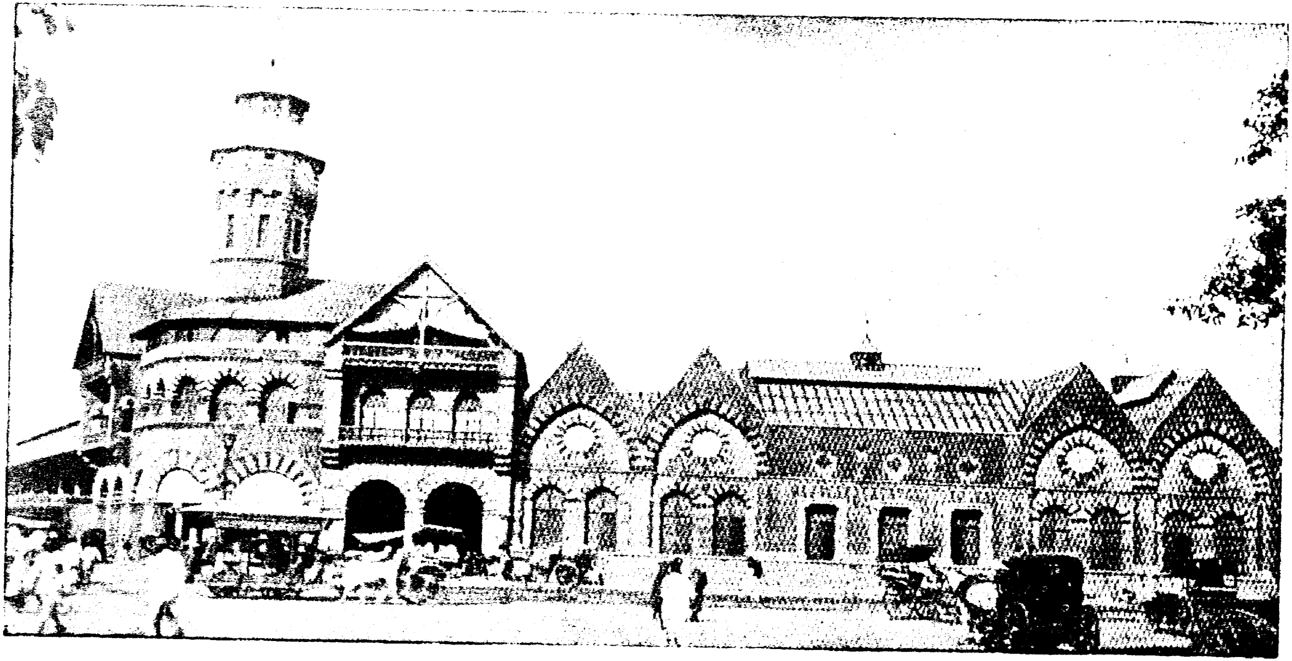
এপোলো বন্দর।

যাইতেছে কি সুন্দর! কে বলে জড় পদার্থের প্রাণ নাই! অই না প্রতি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে শত ভাষা ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। অই না ঢেউগুলো কি যেন প্রাণের কথা প্রাণের ব্যথা কহিয়া গেল! কবি সত্যই গাহিয়াছেন

--"একি সুগম্ভীর খেলা
অম্বুনিধি ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হ'টি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপিয়া পড় বুকে,
রাশি রাশি শুভ্র হাস্যে, অশ্রুজলে স্নেহগর্ব্ব সুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে।"

এ স্থান হইতেই ইউরোপ যাত্রিগণ অর্ণব-যানে আরোহণ, অবতরণ করেন। বোম্বাই নগরীর মত মনোরম নগরী সত্য সত্যই ভারতে নাই; তুমি যাহা চাও তাহাই পাইবে। বিশ্ব-বিধাতা॰ সার সৃষ্টি, পর্ব্বত, সমুদ্র, দ্বীপ এখানে একত্রিত। যদি বোম্বাই দ্বীপ ও বন্দরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে চাও, তবে একবার সমুদ্র তীরবর্ত্তী রাস্তা দিয়া অগ্রসর হও এবং মালাবার গিরি শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ কর। আহা! কি সুন্দর, কি সুন্দর সৌন্দর্য্য শতদল পূর্ণ বিকশিত। ভাষায় কি এমন কথা আছে, হৃদয়ে কি এমন ভাব আছে, লেখনীর কি এমন শক্তি আছে যে সে চিত্র পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশ করিতে পারে? বাস্তবিকই সৌন্দর্য্য বুঝিবার বুঝাইবার নহে, ভাবিবার প্রকাশ করিবার নহে। এজন্যই বুঝি বাইরণ লিখিয়াছিলেন '————To me
High mountains are a feeling.'

অই দেখ সমুদ্রের চঞ্চল বারিরাশি কেমন সুন্দর নৃত্য করিতেছে, ভূধরের শ্যামল অঙ্গে মোহিনী মায়ার মোহন যাদুবলে হাসিয়া হাসিয়া ফুল দুলিতেছে, কত তরু, কত লতা কে তাহাদের খোঁজ নেয়! অই না মাথার উপর দিয়া পাখীটা গাহিয়া গেল, সে কি সৌন্দর্য্যের একটা অভিব্যক্তি তোমার হৃদয়ে তাহার আকুল কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারের সহিত জাগাইয়া দিল না! বন্দরের



ক্রফোর্ডবাজার—বোম্বাই ।

জাহাজগুলি নগরের সুউচ্চ গৃহাবলী, হরিৎ নারিকেল কুঞ্জ সকলি সুন্দর! ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়া পড়িলেন; ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসিয়া মসীবর্ণে জগতকে আবৃত করিয়া ফেলিল। অই দেখ গগনে আমাদের দেশের তারাগুলি এখানেও ফুটিয়াছে! এপোলো বন্দরের সৌন্দর্য্য ও সজীবতায় ও সামুদ্রিক বাতাসের শীতলতায় যে স্নিগ্ধতা বোধ করিয়াছিলাম তাহা চিরদিন মনে থাকিবে। এস্থানের শোভা ও সম্পদ প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয়ে যে আত্ম-প্রসাদ জন্মে তাহা যিনি আপনাকে এই সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমজ্জিত করিতে পারিয়াছেন তিনিই বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

ক্রফোর্ড মার্কেট ও দেশীয়-বণিক-পল্লী।

বোম্বাই নগরীর ক্রফোর্ড মার্কেট একটী দেখিবার জিনিষ। এখানকার ধনী বণিকদিগের ত্রিতল, পঞ্চতল, সপ্ততল সৌধাবলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত থাকায় কৃত্রিম দৃশ্যের মধ্যে ইহা একটী বিশেষরূপে উপভোগ্য। সুপ্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য বিপনি দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। ইংরেজ পরিব্রাজকদিগের মতে পৃথিবীর মধ্যেই এই বাজারের ন্যায় সুন্দরতম বাজার অতি অল্প আছে। যাঁহার নামে এই বাজারটীর নামকরণ হইয়াছে, তাঁহার পূর্ণ নাম আর্থার ক্রফোর্ড সি, এস, ইনি ১৮৬৫ সনের জুলাই মাস হইতে ১৮৭১ সনের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত বোম্বাই সহরের মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন। প্রায় ৭২,০০০ গজ স্থান ব্যাপিয়া এই বাজারটি অবস্থিত। বাজারের সন্নিকটস্থ ক্লক-টাউয়ারে আরোহণ করিয়া একবার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য উপভোগ করা প্রত্যেক দর্শকেরই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এই টাউয়ারের উচ্চতা ১২৮ ফিট। ক্রফোর্ড সাহেবের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমেই এই মার্কেট নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাহ্য দৃশ্য এবং ইহার উভয় দৃশ্যাবলীই বিশেষ চিত্ত-রঞ্জক। আভ্যন্তরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ইহার সমকক্ষ অন্য কোনও মার্কেট আমাদের দেশে নাই একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভোরের বেলাই এই বাজার দেখিবার উৎকৃষ্ট সময়। সে সময়ে এ বাজারের ফুল, ফল ও তরকারির প্রাচুর্য্য দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। নভেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত এখানে প্রচুর ফলের আমদানি হইয়া থাকে, তখন নানা জাতীয় কদলী, লেবু, তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির স্তূপ দর্শন করিলে বিশেষ আনন্দ ও

সংগ্রহের নিপুণতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বোম্বাই নগরের আম বিশেষ প্রসিদ্ধ, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার আমদানী হইয়া থাকে। এখানকার আমের মধ্যেও আবার আফুস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাজারে নানা জাতীয় মানুষের ভিড়—বাঙ্গলা দেশের পর্য্যটকগণের দেখিবার ও জানিবার বটে। ভারতের প্রায় সকল দেশের লোকেরই মাথার উপর কোন না কোনরূপ পাগ্‌ড়ী আছে, কেবল আমাদের বাঙ্‌লা দেশের লোকেরাই সে বিষয়ে উদাসীন। আমাদের এই পাগড়ীশূন্য মাথা সকলেরই বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বোম্বাইর এই মার্কেটে নানা জাতীয় সুগন্ধি পুষ্পের ও প্রচুর আমদানি হয়, গোলাপ, যুঁই, বেলা, চম্পক কত নাম করিব? বাজারের দক্ষিণাংশের বিপণি সমূহই নানা জাতিয় পুষ্প স্তবক ও বহু প্রকার সুপক্ক ফলে সুশোভিত। এই মার্কেটের সুন্দর সুন্দর সৌধমালা, প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ দ্রব্য ইত্যাদি দেখিলেই বোম্বাই নগরীর সুখ-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যদি কেহ বোম্বাই নগরীর বাণিজ্য সমৃদ্ধির বিষয় উপলব্ধি করিতে চাহেন, তবে তাঁহার

তুলার বাজার।

এখানকার তুলার বাজার দর্শন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। ইহা নগরস্থ ফোর্ট হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে কোলাবার নিকট দেড় মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। এখান হইতে প্রতি বৎসর দশ লক্ষাধিক তুলার বস্তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত এখানকার বাজার সরগরম থাকে, তখন নানা জাতিয় বণিকগণের এস্তব্যস্ততার মধ্য দিয়া বোম্বাইর বাণিজ্য-লক্ষ্মীর মহিমাময়ী মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। বাণিজ্য বিষয়ে যে আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি এ নগরের গুজরাতি মারহাটি ও পার্সী বণিকগণের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। বক্তৃতা দ্বারা জাতীয় জীবন উন্নত হয় না,—কর্ম্ম চাই। ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে বাণিজ্যের সহায়তা ভিন্ন তাহা লাভ করিবার আশা আকাশ-কুসুম-কল্পনা মাত্র। দেশীয় পল্লীতে এ নগরের অধিকাংশ ধনী মহাজনগণ বাস করিয়া থাকেন। এ স্থানে নগরের অত্যন্ত ঘনবসতি। এই পল্লীর মধ্য দিয়া প্যারেল পর্য্যন্ত গমন করিলে নানা রঙ্‌ বেরঙের বাড়ী ঘর দর্শকের

দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, কিন্তু সে সকল তেমন উল্লেখ যোগ্য বলিয়া মনে হইল না। এই ঘনবসতি অতিক্রম করিলেই সর্ব্বপ্রথমে এল্‌ফিনষ্টোন-চক্রে পঁহুছা যায়। এই গোলাকার সবুজ দূর্ব্বামণ্ডিত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে পাষাণময় প্রাসাদ সমূহ উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। এ সমুদয় সৌধরাজি কারুকার্য্যময় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বোম্বাইর জীবন্তভাব দেশীয় পল্লীতে যেরূপ উপভোগ করা যায় অন্যত্র তদ্রূপ নহে, কারণ এ স্থানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস, তাহাদের ক্রয় বিক্রয়, আচার পদ্ধতি প্রভৃতি কৌতূহলি পর্য্যটকের বিশেষ মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। মিউনিসিপালিটির শৃঙ্খলা-কৌশলও এস্থানে বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রয় বিক্রয়, ট্রাম ও ঘোড়া-গাড়ীর চলাচল খুব বেশী। এ নগরের টাউন হলটিও দেখিতে বড়ই সুন্দর। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৫ বৎসরে অর্থাৎ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয়ে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। কর্ণেল টমাস কাউপারের নক্সা অনুসারে ইহা তৈরী হইয়াছে। টাউন হলের নির্ম্মাণের টাকার অধিকাংশই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, বাকী টাকা চাঁদা দ্বারা সংগ্রহ করিয়া ইহার ব্যয়-সংকুলান করা হয়। টাউন হলের থামগুলি কোম্পানীর ব্যয়ে বিলাত হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছিল। এই প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি দ্বিতল। উপরের তলে সমিতি হল। সেখানে সভাসমিতি ও বল নাচ ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই এসেম্‌ব্লি রুমে খ্যাতনামা গভর্ণার এলফিনষ্টোন সাহেবের ছবি আছে। এই গৃহটি একশত ফিট স্কোয়ার হইবে। হলের একস্থানে একটা ক্ষুদ্র ফলকে টাউন হলের স্থাপনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ খোদিত লিপি আছে ঃ—

এলফিন্‌ষ্টোন্-চক্র।

টাউন হল।

This Organ,
Built by Messrs. Christopher and Stone,
London,
was the gift of
The Hon. Sir Albert David Sasson, K. T.,
C. S. I., Member of the Legislative

Council of Bombay,
To The Town Hall, Bombay,
As a Memorial of the visit of
H. R. H. The Duke of Edinburgh,
March, 1870. Erected 1872.

আমরা যে এলফিনষ্টোন সাহেবের কথা উল্লেখ করিয়াছি ইনি সিপাহী বিদ্রোহের হাঙ্গামার সময়ে বোম্বাইর গভর্ণার ছিলেন। সিঁড়ির এক পার্শ্বে এলফিনষ্টোন সাহেবের আরেকখানি ছবি ও তাহার অপর পার্শ্বে সার বার্টল ফিয়ারের ছবি, গোল সিঁড়ির ঠিক্ মধ্যস্থলে সার জামশেটজি জিজি-ভাইয়ের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কাউন্সিল কক্ষেও বহু ছবি আছে, সেখানে বাজিরাও পেশোয়া তাঁহার মন্ত্রী নানা ফার্ণিভিস এবং মাধোজি সিন্ধিয়ার চিত্র আছে। কাণপুরের হত্যাকাণ্ডের নায়ক নানা সাহেব এই বাজি রাওয়ের ই পোষ্য পুত্র ছিলেন। এই তিনখানা চিত্র মিষ্টার ওয়েলস্ নামক একজন সাহেবের হস্তাঙ্কিত। টাউনহলস্থ এসিয়াটিক সোসাইটিতে পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত নানা প্রকারের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ দৃষ্টি করিলাম। টাউন হলের নিম্নতলে মেডিকেল বোর্ডের আফিস ও মিলিটারি অডিটার আফিস প্রভৃতি বহু আফিস আছে। দূর হইতেই উচ্চ স্তম্ভরাজির মধ্য দিয়া এই সুশোভিত টাউন হল পর্য্যাটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা পূর্ব্বে যে সমুদয় মহাত্মাগণের মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে একজন পার্সীর ও একজন হিন্দুর প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিই আমাদের বিশেষ-রূপে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। পারসী ভদ্রমহোদয়ের নাম কারনেট-সার জমসদজী জিজিভাই বাট্‌লীওয়ালা। এই মহাত্মা সামান্য বোতলের ব্যবসা হইতে স্বকীয় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি স্বকীয় অসামান্য সৌজন্যতা ও ন্যায়পরায়তা গুণে অবশেষে ব্রিটিশ নাইট শ্রেণীভুক্ত হইয়া সমাজের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। কোনও কার্য্যে দৃঢ়তা ও সংযম থাকিলে, তাহা মানবের পক্ষে সুসম্পন্ন ও করায়ত্ত করা বিশেষ আশ্চর্য্য নহে। দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তিটি জগন্নাথ শঙ্কর শেঠনামক একজন হিন্দু স্বর্ণবণিকের। ইনিও নিজ প্রতিভাগুণে জাতিতে স্বর্ণকার হইয়াও হিন্দু-

জাতির প্রতিনিধি স্বরূপগণ্য ছিলেন। প্রতিভাও জ্ঞান জাতি বিচার করেনা। উহা সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়,—যিনি একাগ্র মনে উহাদের সাধনা করিবেন তিনি নিশ্চয়ই সফল মনোরথ হইয়া বিজয়-মাল্য গলে ধারণ করিতে পারিবেন। এ নগরের মধ্যে এমন একটা সজীবতা আছে যে তাহাতে সহজেই পথিককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এ স্থানে নানাজাতির বাসের পরিচয় সহজেই অনুভব করা যায়। এমন কি এস্থানে একটী 'ফরাসী সাহিত্য সম্মিলনী, পর্য্যন্ত আছে। সেই পুস্তকাগার ও পাঠ গৃহটি দেখিতে প্রশস্ত ও মনোরম। তাহাতে বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকারগণের বহু গ্রন্থ আছে। এই সম্মিলনীটি একজন পার্সী বণিক স্থাপন করেন। ফরাসী দেশের বহু প্রাচীন সংবাদ পত্রাদিও এস্থানে আছে। আধুনিক বিখ্যাত পত্র সমূহও এখানে আইসে। হরিৎ-শ্যামল বিটপী-পুঞ্জের অভ্যন্তরে সমুদ্রবায়ু মৃদু-মধুর শীতল স্পর্শ জনিত সুখলাভ করিতে হইলে এখানকার উদ্যান সমূহ বিশেষ সুন্দর ও তৃপ্তি দায়ক। এনগরের সমুদয় দৃশ্যই উজ্জ্বল প্রমোদময়। বোম্বাই সহরে নবাগত ব্যক্তিগণের দেখিবার জিনিষের অভাব নাই। প্রত্যেকটি স্থানের ও প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য পদার্থের বিস্তৃত বিবরণ দিতে হইলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়। আমরা এস্থানের আরও কয়েকটি বিখ্যাত স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের কেবলমাত্র নামোল্লেখ করিব, তাহাতে পাঠকবর্গের কোনও অসুবিধার কারণ নাই।

এস্থানের গভর্মেণ্ট হাউস কলিকাতার ন্যায়-দেখিতে তত সুন্দর নহে। মালাবার পর্ব্বতের শেষ প্রান্তে মালাবার পয়েণ্ট নামক স্থানে ইহা অবস্থিত।

গভর্মেণ্ট হাউস।

সমুদ্রের তীর ধরিয়া ঘুরিয়া গেলে ফোর্ট হইতে চারি মাইল যাইতে হয়। ফোর্ট হইতে তিন মাইল দূর হইতে পাহাড়ে আরোহণ করিতে হয়, সমুদ্র তটস্থ শেষার্দ্ধ পথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ শির তরুরাজি পরিশোভিত। একদিকে সমুদ্র তরঙ্গের আকুল উচ্ছ্বাস, অন্য দিকে মৃদু-বায়ু বিকম্পিত তরু পল্লবের ঘন বিন্যস্ত পত্রাবলীর মধুর উন্মাদ সঙ্গীত। এ পথে নগরের পথের ন্যায় তত জন-কোলাহলও নাই,—একটী নিরিবিলি শান্ত সৌন্দর্য্য এ পথকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। সমুদ্র তীরস্থ

এই হরিৎ বিটপী-কুঞ্জের অভ্যন্তর দিয়া লাট ভবনে পঁহুছা যায়। গভর্ণার সাহেবের বাস অট্টালিকা সমুহের তাদৃশ সৌন্দর্য্য নাই, ইহা কতকগুলি প্রাসাদ সমষ্টি মাত্র। লাট সাহেবের ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণের বাঙ্গলা একটু দূরে দূরে অবস্থিত। পর্ব্বতের শেষ প্রান্তে তোপ সমূহ সুসজ্জিত। পর্ব্বতোপরি হইতে বোম্বাই সহরের ও সমুদ্রের দৃশ্যাবলী বেশ সুন্দর দেখায়। এখানকার কাষ্টম হাউসটি দেখিতে অতিশয় বিশ্রী। পূর্ব্বে ইহা পর্ত্তুগীজদিগের ব্যারাক ছিল। বোম্বাইনগরে অনেকগুলি ডক আছে।

কাষ্টম হাউস ও ডক।

১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটনগরের লোজি নসির বা নজি নামক জনৈক পার্সি সর্ব্ব প্রথমে এখানে ডক নির্ম্মাণ করেন, তদবধি তাঁহার বংশধরেরাই ডকের সুপারিণ্টেডেণ্টের পদে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এলফিনষ্টোন ডক্, ডনকান গ্রেভিং ডক্, সেসুন ডক্, প্রিন্সেস্ ডক্, মেরি ওয়েদার ডক্ ও মাজাগনস্থিত পি এণ্ড ও কোম্পানীর ডক প্রধান। এলফিনষ্টোন ডক্ বর্ত্তমান সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যখন প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ ছিলেন সে সময়ে তাঁহার ভারতাগমন উপলক্ষে ১৮৭৫-৬ সনে এই ডকের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা খনন কালে ১০ ফিট মাটীর নীচে একটা অন্তর্নিহিত অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে ১০ ফিট হইতে ২০ ফিট লম্বা এইরূপ প্রায় এক শতটি বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছিল। এই ডকটি প্রায় ৷১০ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া বিদ্যমান। ৭০০০ কুলি ইহার খনন কার্য্যে প্রতিদিন নিযুক্ত ছিল। পুরুষেরা প্রতিদিন ।৵০ আনা এবং স্ত্রীলোকেরা ৶০ তিন আনা করিয়া মজুরি পাইত। মাদাগণের ডক এলফিনষ্টোনের ডক অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ছোট, উহা ৪২০ ফিট দৈর্ঘ্য। যে জাহাজ ২০ ফিট জলভেদ করিয়া গমনাগমন করিতে পারে সেরূপ জাহাজ এইস্থানে আইসে। এস্থানে ভূতপূর্ব্ব কাপ্তেন হেন্‌রি সাহেবের একটী সুন্দর সমাধি-মন্দির আছে, ইনি গাড়ী হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। মাজাগণের সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জায় ৩০০ শত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারে। পেরেলের গভর্মেণ্ট হাউসে সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণার হর্নবি সাহেব বাস করিয়াছিলেন। একখানা প্রস্তর ফলকে এই কয়টি অক্ষর খোদিত আছে ;—

"This built by the Direction of
Honourable Hornby,
1771."

বোম্বাই সহরে বহু গির্জ্জা, বহু প্রেতভূমি আছে। শিক্ষায় ইহা কলিকাতা হইতে অনেকটা পশ্চাৎপদ। সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য কেবল মাত্র ১১টি কলেজ আছে। তন্মধ্যে ভবনগর, জুনাগড়, বরোদা ও কোল্‌হাপুর নামক দেশীয় রাজ্যে চারিটি অবস্থিত। নিজ বোম্বাই সহরের মধ্যে এলফিনষ্টোন, সেণ্ট জেভিয়ার্স ও উইলসন কলেজ প্রধান, এ সব কালেজে সহস্র সহস্র ছাত্র শিক্ষা পাইতেছে। এ নগরে পার্সি বালিকাগণের শিক্ষার্থ আলেক্‌জেণ্ড্রা কলেজ নামক একটী বিদ্যালয় আছে, ইহা মাণিকজি খুরসেদজি নামক জনৈক পার্সী কর্ত্তৃক ১৮৬৩ সনে স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা যখন গভর্মেণ্টের নর্ম্মাল বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত সম্মিলিত ছিল, তখন গভর্মেণ্ট এই বিদ্যালয়ে ৩১২০ টাকা বাৎসরিক সাহায্য করিতেন। এখন গভর্মেণ্টের উক্ত নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় হইতে ইহা পৃথক হইয়াছে, কাজেই গভর্মেণ্টও তাঁহার সাহায্য প্রদানে বিরত হইয়াছেন। এস্থানে রমণীগণ ২৪।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক, সাধারণঃ মেয়েরা ইতিহাস ভূগোল ও সূচীর কার্য্যে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাণিকজি খুরসেদজি একজন খ্যাতনামা ইউরোপ পর্য্যটক। ইনি ইউরোপের বিখ্যাত বিখ্যাত স্থান সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন এবং নিজেও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এখানকার শিল্পবিদ্যালয়টি কলিকাতার শিল্প-বিদ্যালয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই বিদ্যালয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বার মাসে সর্ব্ব প্রথমে খোলা হয়; পরে গোকুলদাসের হাঁসপাতালের নিকটে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে একটী সুন্দর অট্টালিকায় ইহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। এ বিদ্যালয়ে চিত্রগ্যালারি মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এ বিদ্যালয়ের গ্রিফিথ্‌স (Griffiths) সাহেব একটী দেশীয় রমণী জলের পাত্র হাতে জল আনিতে যাইতেছে এইরূপ ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া ৪০০ পাউণ্ড পুরস্কার

শিল্প বিদ্যালয়।

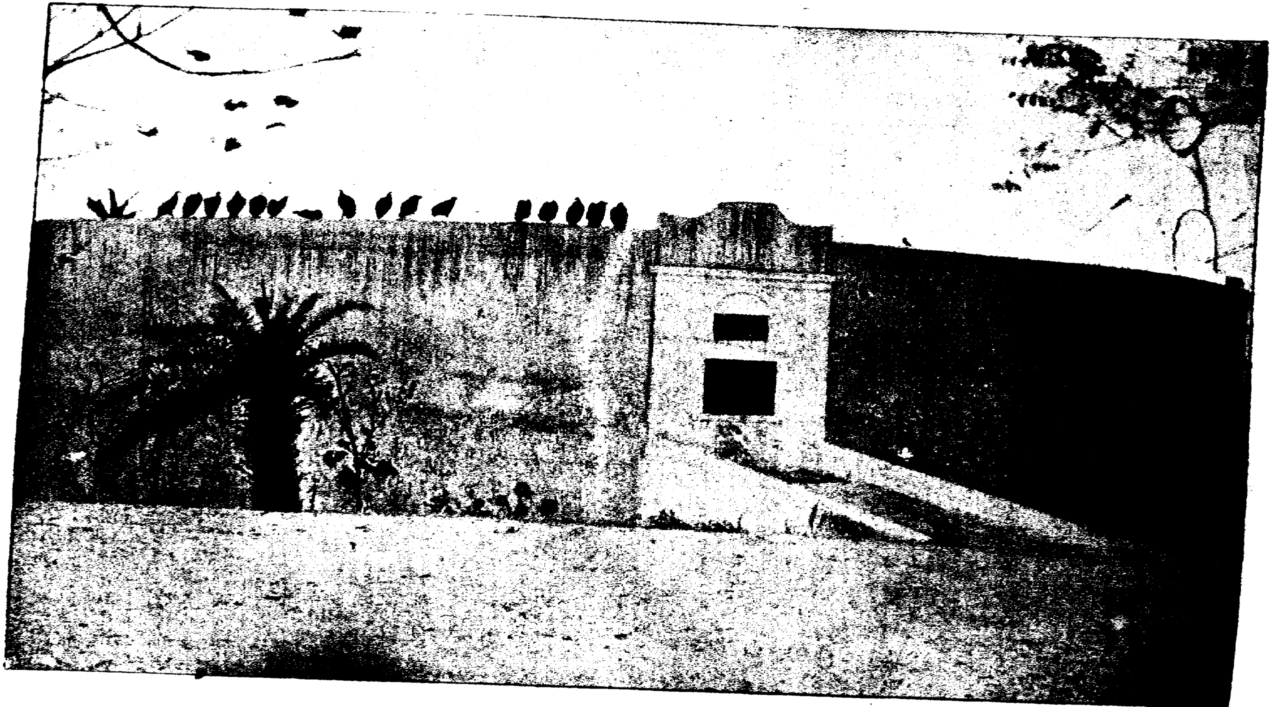
পাইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে নানা রূপ শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছাত্রদের শিক্ষার্থ মাসিক কেবল মাত্র একটাকা করিয়া বেতন দিতে হয়।

ধর্ম্মমন্দিরাদি।

এ নগরে হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, জৈন, ইহুদী প্রভৃতি প্রত্যেক বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-মন্দির আছে। কোলাবা হইতে মাহিম পর্য্যন্ত মুসলমানগণের মস্‌জিদ প্রায় একশত হইবে। এই সব মসজিদের মধ্যে আবার খোজা, মোগল ও বোরাদের জন্য কয়েকটী মস্‌জিদ পৃথক্‌ আছে। অন্যান্য মুসলমান প্রধান স্থানে জুম্মা মস্‌জিদ (শুক্রবার দিবস মুসলমানগণ যে স্থানে নমাজ পড়ে) যেমন প্রধান; এ নগরেও তদ্রূপ জুম্মা মস্‌জিদই প্রধান। এই প্রাচীন সুবৃহৎ মস্‌জিদটির বার্ষিক আয় প্রায় ৩০,০০০ হাজার টাকা হইবে। এ স্থানে শুক্রবার দিবস প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য একজন মোল্লা, প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য একজন ধর্ম্মযাজক, একজন মুয়াজ্জিম (যে ব্যক্তি উপাসনার জন্য) উচ্চৈস্বরে আহ্বান করিয়া থাকে) ও কতকগুলি কর্ম্মচারী মস্‌জিদের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত আছে। এই মস্‌জিদ সংশ্লিষ্ট একটী বিদ্যালয়ে আরবী, পারসী ও হিন্দুস্থানী শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম্ম শিক্ষাই এই শিক্ষাগারের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহার ব্যয় মহম্মদ আলি বেগের দাতব্য বিদ্যালয়-ফণ্ড হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই প্রধান জুম্মা মস্‌জিদ ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমান পাড়াতেই এক একটী মস্‌জিদ আছে, উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সেই সেই পাড়ার মুসলমানগণ জনপ্রতি বার্ষিক একটাকা হিসাবে চাঁদা দিয়া থাকে। এ নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩টি পার্সী ধর্ম্ম-মন্দির আছে।

পার্সী অগ্নি মন্দির।

তন্মধ্যে কএকটি মন্দির কএকজন পারসী পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি, উহাতে সাধারণের যাইবার কোনও অধিকার নাই। এ সব মন্দির আতস বেহরাম, আতস আদারণ বা অঘিয়ারি এ এবং আতস দাদগা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। মধ্য প্রকোষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে। উহার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি অগ্নির আহার যোগাইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখাই তাঁহার এক মাত্র কর্ত্তব্য। এ সব মন্দিরের অগ্নি প্রতিষ্ঠা বিশেষ কৌতূহল জনক। ইহারা নানাজাতীয় অগ্নির সংগ্রহ করিয়া থাকে পরে সে



পার্সি সমাধিস্তম্ভ—বোম্বে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সমুদয় অগ্নি সংস্কৃত ও পরিশোধিত করিয়া লয়। ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি সংস্থাপিত হয়। অগ্নি-সংস্কারের নিয়ম যে, সর্ব্ব প্রথমে একটী ধাতুময় পাত্রে অগ্নি রক্ষিত হইয়া উহার উপর একটী দণ্ডবিশিষ্ট ছিদ্রওয়ালা চ্যাপটা ধাতু নির্ম্মিত দণ্ড রাখা হয় পরে পাত্র'স্থত সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড ক্রমশঃ দগ্ধ হইয়া নবানল উদ্ভুত হয়, এই নবসংস্কার প্রসূত অগ্নিকেই পূতাগ্নি কহে। পার্সীরা অগ্নির উপাসক। পারসীগণের মৃত ব্যক্তির সৎকার একটু বিচিত্র রকমের। ইহারা যে স্থানে বাস করে সে স্থানেই ইহাদের অগ্নি মন্দির ও শবস্তম্ভ দেখিতে পাইবে।

মালাবার পর্ব্বতোপরি বোম্বাই নগরীস্থ পার্সীগণের শবস্তম্ভ অবস্থিত। এই সকল স্তম্ভ প্রস্তরময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এখানে পাঁচটি স্তম্ভ প্রায় ৮০০০ হাজার গজভূমি অধিকার করিয়া অবস্থিত। প্রাচীরের অভ্যন্তরে এক একটি অগ্নি মন্দির অবস্থিত। এই সকল শবস্তম্ভের উত্তর দিকস্থ স্তম্ভের দ্বারের নিকট একটী খোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে শবস্তম্ভে যাতায়াতের রাস্তাটি প্রথম ব্যারোনেট মৃত জামসেড্‌জি জিজিভাইর স্মরণার্থ তৎপুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা এখানে খোদিত লিপির অনুলিপি প্রদান করিলাম;—

পার্সীশবস্তম্ভ বা টাউয়ার অব সায়লেন্স।

"This Road, leading to the Parsi Towers of silence, was constructed in Memory of the late Jamshidji Jijivai, the first Baronet, by his son, and has been given in charge of the Trustees of the Parsi Panchayat Fund, for the use of Parsi's only. 19th December, 1868. A. C. 1238 yezd."

শ্মশান ভূমির জানি না কেমন একটা গাম্ভীর্য্য আছে, কি যেন একটা ভীতি ভাব—কি যেন একটা বিজনতা সে স্থানে গমন করিলে আপনা হইতেই হৃদয় অধিকার করে। পার্সী শবস্তম্ভের সমীপবর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর হইলেও ভীতিব্যঞ্জক—মনোহর হইলেও অবসাদ প্রদানে অগ্রসর। অদূরে সমুদ্রের নীল লহরী লীলা, সুন্দর ও মহান্—সৃষ্টির বিশালত্বের অদ্ভুত নিদর্শন! তবু ওই যে তোমার সম্মুখে শবস্তম্ভগুলি বিরাজমান,

উহারা কি নীরব ভাষায় তোমাকে মৃত্যুর গম্ভীর আদেশ-বাণী কর্ণে শুনাইতেছে না? যে পাঁচটি শবস্তম্ভ এখানে আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটীর বেড় এবং উচ্চতা ২৫ ফিট হইবে। এইটী নির্ম্মাণ করিতে ৩০,০০০ পাউণ্ড ও অন্য চারিটীর প্রত্যেকটী তৈরী করিতে ২০,০০০ হাজার পাউণ্ড করিয়া ব্যয় পড়িয়াছে। পার্সীগণ শ্বেত-বস্ত্রে শব আচ্ছাদিত করিয়া প্রথমতঃ উহা একটী বিশ্রাম-গৃহে আনয়ন করিয়া স্থাপিত করে, সেখানে পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে মঙ্গল প্রার্থনা ও উপাসনাদির পর শব, শব-স্তম্ভে নীত হয়। শব-স্তম্ভের প্রাচীরের নিকট একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে তাহা দিয়া শব বাহকেরা উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুর নির্দ্দিষ্ট স্থান সমূহে শব রক্ষা করে। স্তম্ভের উপরে কোনও প্রকার ছাদ নাই, ভিতরে প্রস্তর নির্ম্মিত গোলাকার শ্মশান-ভূমি। সেই, গোল-চক্রের তিনটী স্তর গড়ান ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে একটী সুগভীর গর্ত্ত। পুরুষদের দেহ প্রথম স্তরে, নারী দেহ দ্বিতীয় স্তরে ও শিশুদিগের শব নিম্ন স্তরে স্থাপিত হয়। প্রাচীরের উপরে এক পাল শকুনি বসিয়া থাকে, মৃতদেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় নির্দ্দিষ্ট স্তর মধ্যে স্থাপন করা মাত্রই উহারা উহার উপর পতিত হয় এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে মাংস ভক্ষণ করিয়া অস্থিরাশি রাখিয়া যায়। কয়েক দিন পরে শব-বাহকেরা ফিরিয়া আসে এবং চিমটার সাহায্যে অস্থিরাশি সংগ্রহ করতঃ মধ্যস্থ কূপে নিক্ষেপ করে, ক্রমে উহা প্রকৃতির সাহায্যে লয় প্রাপ্ত হয়।* হায়! মানব, শেষে তোমার এই পরিণাম! যাহাতে মৃত দেহ হইতে রসাদি নির্গমন হইয়া শ্মশান ভূমি দূষিত কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত না হয় সে জন্যও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। কয়লা ও বালুকার সাহায্যে শোধিত হইয়া

* "The bodies are deposited in fluted groves in 3 series, with a circular path, 3 ft. broad, round each, and a straigut path to the well from the operture in the wall, which straight path communicates with the 3 circular ones. The adult males are laid in the outer series, the women in the middle series, and the children in that nearest the well. The bodies are placed in the groves quite naked, and in half an hour the flesh is so completely devoured by the numerous vultures that inhabit the trees around, that nothing but the skeleton remains.

Hand Book of Bombay, p. 142.

রসাদি ভূগর্ভে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। যদি কোন সময়ে কূপের কোনও অংশ অপরিষ্কৃত কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত মনে করে তাহা হইলে শব বাহকগণ একটা সিঁড়ি বাহিয়া কূপের অভ্যন্তরে অবতরণ করিয়া পরিষ্কৃত ও সংস্কৃত করে। পার্সীদের এইরূপ ভাবে শবের সৎকার করা সাম্যভাবেরও পরিচায়ক বটে। এখানে ধনী, নির্ধন, ছোট, বড়, বিদ্বান্, মূর্খ প্রভৃতি কাহারও কোনও প্রভেদ নাই—সকলেরই এক ভাবে মৃত্যুর পরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে হয়। পার্সীরা মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেও শবকে অত্যন্ত অপবিত্র এবং অস্পর্শ্য বলিয়া বিবেচনা করে, এজন্য ইহাদের মধ্যে শববাহক-শ্রেণী পৃথক, উহারা অন্যান্য পার্সীগণের সহিত সামাজিক ভাবে মিলিতে মিশিতে পারে না। এমন কি শববাহকেরা পর্য্যন্ত মৃত দেহের সৎকারান্তে পরিহিত পোষাক ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করে। পার্সীরা অগ্নি ও জলকে এত পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে যে উহা দ্বারা শবদেহ দাহ করিয়া অগ্নিকে অপবিত্র করিতে ইহারা সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রাচীর বেষ্টিত ভূ-ভাগের চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান আছে—পার্সীরা এই শবস্তম্ভগুলিকে দোখ্মা কহে। এই দোখ্মার বহির্ভাগে অগ্নি-মন্দির ও উপাসনালয় আছে। বাহক ব্যতীত অন্য কাহারও দোখ্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। বর্ত্তমান ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজাবস্থায় যখন ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন সে সময়ে তিনি এই দোখ্মার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পদ্ধতি দেখিতে চাহিলে, পার্সীগণ তাঁহাকে কাষ্ঠ দ্বারা যে আদর্শ (model) অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, পর্য্যাটকগণ দোখ্মার কর্ম্মচারিগণের নিকট উহা দেখিতে চাহিলে কর্ম্মচারিগণ উহা দেখাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অনুসন্ধিৎসু পথিক ও কর্ম্মচারিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সমুদয় বিবরণ বুঝাইয়া দেয়। পার্সীরা বলেন যে মৃতদেহ সমাহিত করিলে ভূমি দূষিত হয়, দাহ করিলে অগ্নি অপবিত্র হয়, কিন্তু ইহাতে শবদেহ দ্বারা জগতের কোনও জীব জন্তুরই উপকার হয় না, কিন্তু এইরূপ ভাবে মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিলে এক জাতীয় প্রাণীর আহারের সংস্থান করিয়া দিয়া তাহার উপকার করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন

দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন বিভিন্ন রীতি আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে কাহারও তর্ক কিংবা যুক্তি অনাবশ্যক। প্রত্যেক নদীরই লক্ষ্য সাগর-সঙ্গম, কিন্তু কোন্ নদীর গমন-পথ শীঘ্রও সংক্ষিপ্ত তাহা নির্ণয় করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ ধর্ম্ম-সম্পর্কিত মূল সত্য কোথায়, তাহা কে বলিতে পারেন? পার্সী ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রের (Zoroastor) গ্রন্থে আছে যে জীবাত্মা তিন দিবস পর্য্যন্ত ধরাধাম পরিত্যাগ করে না, চতুর্থ দিবসে উহা ইহলোক হইতে অপসৃত হয়। এই চতুর্থ দিবসে পার্সীগণ নিজ নিজ অবস্থানুসারে পরলোকগত ব্যক্তির মঙ্গলোদ্দেশে দান ইত্যাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহার নাম "উথম্না"। পার্সীদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার একটী অতি অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। উহারা কুকুর দিয়া শবের মুখাবলোকন করাইয়া থাকে, কুকুরের এইরূপ দৃষ্টিকে উহারা অত্যন্ত শুভদৃষ্টি বলিয়া বিবেচনা করে।

রীতিনীতি।

ইহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে কুকুর মৃতব্যক্তির আত্মাকে পথ প্রদর্শন করিয়া স্বর্গপথে লইয়া যায়। প্রাচীনকালে হিন্দু ও পার্সী জাতি মূলে যে এক-জাতি ছিল তাহার কোনও সন্দেহ নাই, কারণ এখনও উভয়জাতির রীতিনীতির মধ্যে কতকটা সৌসাদৃশ্য কঙ্কাল-দেহে বিরাজমান। মৃতব্যক্তির আত্মার পারলৌকিক হিতার্থ হিন্দুরা যেরূপ শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া থাকেন, পার্সীরাও তদ্রূপ প্রেতাত্মার কল্যাণোদ্দেশে বৎসরের শেষ দশ দিবস একটী কক্ষ সুন্দররূপে পরিষ্কৃত করিয়া ফুল ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করেন ও পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্য উপসনাদি করেন,— পার্সীরা এই প্রথাকে 'দিগান' বা 'মুক্তাদ' কহেন। ইহাঁরা বলেন যে এই মুক্তাদ সময়ে আত্মা পৃথিবীতে আগমন করিয়া স্বীয় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে আশীর্ব্বাদ করেন ও তাহারা যে তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই, ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হন। কিন্তু হায়! কে জানে কিসে আত্মার তৃপ্তি? মরিলে কি হয়, কে বলে? জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে যে সূক্ষ্ম অথচ চিরঅন্ধকার যবনিকা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ ফেলিয়া রাখিয়াছেন তাহা কি কখন উত্তোলিত হইবে? সে দেশ কেমন, কে

বলিতে পারে? মানবের ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রজ্ঞান, দর্শন বিজ্ঞান এখানে নীরব। এ রহস্য কখনও উদ্ঘাটিত হইবে কিনা, তাহা মানুষ জানে না, কল্পনার বিচিত্র লীলাময়ী সৌন্দর্য্য একটা ছবি আঁকে বটে, কিন্তু সে প্রত্যেকের নিজ মনের সংকীর্ণ কেন্দ্রে আবদ্ধ। সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত মহিমাময়ের অনন্তদীপ্তি ও প্রতিভা—সে বিশালত্ব ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করা অসম্ভব। সে দেশের পথিক এ পর্য্যন্ত ত আর ফিরিয়া আইসে নাই,—তাই কবি মনের দুঃখে গাহিয়াছেন,—

"The undiscovered country from whose
Bourne no traveller returns."

কোন্ তারকার পারে, কোন্ সুদূরে সে সোণার দেশ অনন্তরূপে, অনন্ত ঐশ্বর্য্যে জ্যোতির্ম্ময়,—শান্তির শ্যাম-স্নিগ্ধ কোমল পক্ষপুটে ঢাকা, তাহা কে বুঝিবে, আর কেই বা বুঝাইবে? সে বোধ অন্তরেন্দ্রিয়ের, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নহে,—তাই আমাদের ভাষা এখানে মূক। আমরা যখন 'শবস্তম্ভ' দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম, সে সময়ে আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ একটী বৃদ্ধের ও একটী শিশুর শব এখানে আনীত হইয়াছিল। পর্ব্বতোপরিস্থ এই শবস্তম্ভের স্থানটি একটী নীরব ও গম্ভীরভাবের পূর্ণতা-দায়ক স্থান। একদিকে সুনীল তরঙ্গ মুখরিত ফেনিল সমুদ্র কুসুম-স্তবক তুল্য ফেণরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া উন্মাদনৃত্যে বহিয়া চলিয়াছে—কি অনন্ত মহিমা জ্ঞাপক। দূরে—অতিদূরে—আরো দূরে অধীর আকাশ সমুদ্রকে চুম্বন করিতেছে—নীলিমায় নীলিমায় কি প্রাণের মিলন!—কি আবেগ-পূর্ণ হৃদয়ভরা প্রীতির চুম্বন! আর এদিকে বনস্পতিরাজি পাহাড়ের গায়ে গায়ে সরল উন্নতদেহে দণ্ডায়মান। প্রফুল্ল কুসুম-সৌরভিত বিটপী ছায়ার নিম্নে শবের আত্মীয়বর্গ যখন বিশ্রাম করিতে বসে, অলক্ষ্যে যখন নয়ন হইতে তপ্ত অশ্রু পতিত হইয়া ভূমিতে শুকাইয়া যায়, তখন প্রকৃতির প্রাণভরা প্রেমভরা হাসি, সমুদ্রের সেই উন্মাদ দানবের ন্যায় প্রচণ্ড তাণ্ডব কিছুতেই শান্তি দিতে পারে না। এ ব্যথা কেমন? ইহার একমাত্র উত্তর "সেই জানে শোকে যার পুড়িছে হৃদয়।" হৃদয়ের ভিতরে একটা অবসাদের ছায়া লইয়া নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে সেদিন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বোম্বাই নগরে আগমন করিলে প্রত্যেকের পার্সী জাতির ও ভাটিয়া বেণেদের শিক্ষা, সভ্যতা ও রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। আমরা প্রথমে পার্সীদের বিষয় বলিব, ভাটিয়া বেণেদের কথা পরে বলা যাইবে। পার্সীরা সংখ্যায় কম হইলেও ইহারা জাতীয় শিক্ষায় ও সভ্যতায় বোম্বাই নগরীর একমাত্র গৌরব। ইহাদের ছাড়িয়া দিলে বোম্বাই নগরীর বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠতার আদর্শটা অনেক পরিমাণে খাটো হইয়া পড়ে। সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যদেশ যখন মুসলমানদের হস্তে নিপতিত হয়, সে সময়ে এই অগ্নি-উপাসকজাতি ধর্ম্মনাশ ভয়ে বনে-জঙ্গলে ও নানা কষ্ট সহ্য করিয়া, ভারতে আগমন করে। পার্সীরা এ দেশে প্রথমে সুরাটে এবং তাহার পরে বোম্বাই নগরে আগমন করে। ইউরোপীয়জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদেরও ক্রমোন্নতি হইয়াছে। সুরাটনগরীর বাণিজ্যের অধঃপতন হইতে আরম্ভ হইলে, ইহারাও বোম্বাই নগরীর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সহরে আগমন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য ও নানারূপ অর্থাগমের কার্য্য করিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পার্সীজাতির ন্যায় উন্নতিশালী ও ধনীজাতি বিরল। উহাদের ঘনিষ্ট সামাজিকতা, নানাবিধ বিদ্যালয় ও বিবিধ সদনুষ্ঠানে দিন দিনই ইহাদিগকে উন্নত করিতেছে। ভারতের সমগ্রজাতির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বপেক্ষা শিক্ষিত। পার্সীদের মধ্যে অনুপাতে শতকরা সাত হইতে পাঁচজন মাত্র নিরক্ষর। এইরূপ সুনীতিপরায়ণ জাতিও ভারতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, বেশ্যা শ্রেণীর মধ্যে পার্সী রমণী একটীও নাই। ইহাদের জনসংখ্যা অত্যন্ত কম, সর্ব্বশুদ্ধ নব্বইহাজারের অধিক হইবে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? বীর্য্য উদ্যম ও উৎসাহে ইহারা অসাধারণ। পাশ্চত্য রীতি নীতি ও সভ্যতার অনুকরণে ইহারা এমন সুপারগ যে, সে সকল ধরণ-ধারণ ইহাদের পূর্ণরূপে নিজস্ব (assimilation হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ইহাদের সজাগ দৃষ্টি, ক্রিকেট খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যিক রচনা পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই ইহারা অনুন্নত নহে। কর্ত্তব্য জ্ঞান ইহাদের অত্যন্ত প্রখর। এক কথায় বলিতে গেলে পার্সীরাই বর্ত্তমান সময়ে ভারতের উন্নত জাতি। একদিকে যেমন সর্ব্ববিষয়েই ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি হইতে ইহাদের

পার্সীদের কথা।

বিশেষত্ব—তদ্রূপ আবার প্রত্যেক বিষয়েই ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব। জাতিয় একতা ও ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃবন্ধনের নিমিত্তই পার্সীদের এত সহজে উন্নতি হইয়াছে। সার্ব্বজনিক কোনও কল্যাণের নিমিত্ত অর্থদানে ইহাঁরা মুক্ত হস্ত। এমন ধনী পার্সী অতি বিরল, যিনি কোনও সৎকার্য্যে দুই লক্ষ তিন লক্ষ টাকা দান করেন নাই। পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, হাঁসপাতাল প্রভৃতি ইঁহাদের দ্বারা বহু স্থাপিত হইয়াছে। খুরসেদজি আর্দেশির ধর্ম্মশালা, জাম্‌সিদজি ধর্ম্মশালা প্রভৃতি ইহার উত্তম পরিচায়ক। ভারত পর্য্যাটক মাত্রেই বোম্বাই নগরীতে আসিয়া ইহাদের উদ্যমশীলতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

পার্সীধর্ম্ম ও জরটষ্ট।

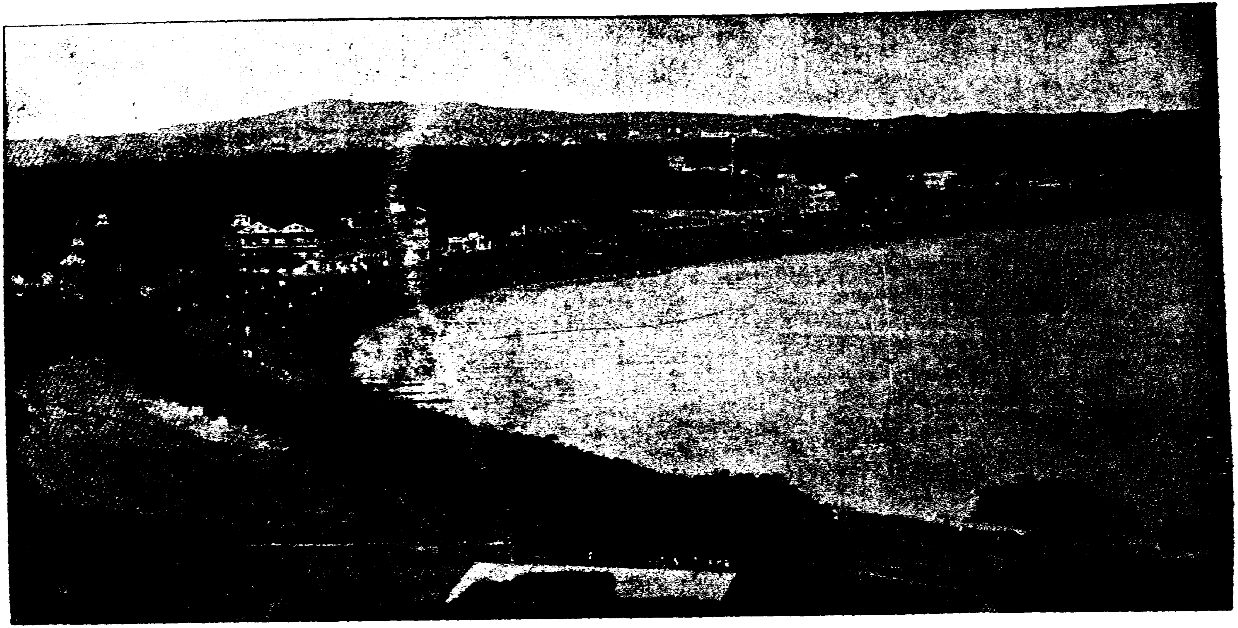
পার্সীরা নানাপ্রকার বিপ্লবের মধ্য দিয়াও নিজ জাতিয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহারা সাধারণতঃ অগ্নির উপাসনা করিলেও প্রকৃত ভাবে একেশ্বরবাদী। অগ্নি ও সূর্য্য ঈশ্বরের বিশেষ মহিমা জ্ঞাপক বলিয়া উহারা এই দুই শ্রেষ্ঠ জড় পদার্থের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পার্সীরা আপনাদিগকে জরথুস্ত্রের শিষ্য ও অনুচর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে এই জরথুস্ত্র খ্রীষ্টাব্দের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। জরটষ্ঠের উপদেশ সমূহ জেন্দ বা প্রাচীন বৈদিক ছন্দে লিখিত। ইহাঁর গ্রন্থ সকল নীতিগর্ভ উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ। তাহার সারতত্ত্ব তিনটি মাত্র কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে। যথা "হুমাতা ; হুখ্‌তা, হবরর্ষ্যা অর্থাৎ মনোবাক্ কার্য্যে পবিত্রতা করিবে।* প্রভাতে ও সন্ধ্যায় "বোটানি-বে"র সমুদ্রতটে কৃতাঞ্জলি করে যখন ধার্ম্মিক পার্সীগণ স্বীয় যজ্ঞসূত্রের দুই প্রান্ত টানিয়া টঙ্কার ধ্বনিকরতঃ অস্তমান সূর্য্যের ও নবোদিত অরুণের দিকে চাহিয়া স্তবস্তুতি করিতে থাকে ---তখন তাহাদের সুগৌর তনুর উজ্জ্বল বিভার সহিত সূর্য্যের কনকোজ্জ্বল কিরণের সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়া উহাদের প্রশান্ত সুন্দর মুখমণ্ডলের শোভা পূর্ণ বিকশিত করিয়া তোলে। বিদুষী মহিলাদের সুন্দর স্বর ও স্তোত্রের মাধুর্য্য, নবাগত পথিককে আকৃষ্ট করে,—পর্য্যটক দাঁড়াইয়া

* বোম্বাই চিত্র—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দাঁড়াইয়া সে স্বরলহরীর মধুর নর্ত্তন শোনেন, কিন্তু শব্দের ঝঙ্কার ব্যতীত একবর্ণ ও তাহার বোধ গম্য হয় না। পার্সীরা মাথায় সাদা ধুচ্‌নীটুপি কিংবা মোমজামা কাপড় দ্বারা মণ্ডিত মটরের মত সাদা ফুট্‌কি আলা টুপি ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা একখানা অতি শুভ্র রুমাল দিয়া মস্তক বাঁধিয়া ফেলে। সন্ধ্যার সময়ে বোম্বাইর সমুদ্র তটে রূপের বাজার মিলে। অপূর্ব্বরূপ-লাবণ্যবতী পার্সী রমণীরা কটিদেশে বিলম্বিত উপবীত ধারণ করিয়া সমুদ্রের নীল সলিলের মধ্যে সুন্দর সুন্দর প্রস্ফুটিত সুরভি-কুসুম যখন ভাসাইয়া দেয়, অন্যদিকে দলে দলে রূপ-লাবণ্যবতী পার্সীযুবতীরা উজ্জ্বল সিল্কের শাড়ী ও হীরকালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া যখন বেড়াইতে থাকে, তখন ইহাদিগকে স্বপ্নরাজ্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়, কি সুন্দর গজেন্দ্র গমন! মরি! মরি! কি সুন্দর চম্পক-কুসুম-সন্নিভ অঙ্গের বরণ, কেমন কমনীয় মুখ, গাঢ় আকর্ণ বিশ্রান্ত ভ্রমর কৃষ্ণ নয়ন যুগল, কেমন সুন্দর বঙ্কিম ভ্রু রেখা অধর কেমন লোহিতবর্ণ! দৈহিক গঠনে ও আচার ব্যবহারে সর্ব্ববিষয়েই ইহারা সুরুচি সম্পন্ন। পার্সী রমণীদের সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের নির্ম্মলতার কথা চিন্তা করিলে, ইহাদিগকে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় সৌন্দর্য্য মুগ্ধ কবি বুঝি এমনি এক রূপের মোহে মুগ্ধ চিত্তে লিখিয়াছিলেনঃ—

"A thing of beauty Joy for ever!"

বাস্তবিক সৌন্দর্য্যের উপাসনা বড় সুন্দর—কিন্তু বড় কঠিন, বড় সুগভীর সাধনার প্রয়োজন, এজন্যই বড় ভয়ে, বড় সন্তর্পণের সহিত ইহার সাধনা প্রয়োজন, কারণ "নিকটে তরঙ্গ—দূরে রজত রেখা।" আমরা পার্সীদের সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, বোধ হয় পাঠকগণ ইহা হইতেই পার্সী-জাতির সম্বন্ধে কতকটা বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। পার্সীদের মধ্যে বাণিজ্য দ্বারা যাঁহারা ধনী হইয়াছেন, তন্মধ্যে জামশেদজী জিজিভাই, দিনশাহ্ মানেকজী পেতিত, জাহাঙ্গীর রেডিমণি, ওয়াডিয়া, তাতা প্রভৃতি প্রধান। এই সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি যেরূপভাবে অর্থের সদ্ব্যবহার করেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয় এবং প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিরই তাহা অনুকরণ করা উচিত। বোম্বাই নগরের গুজরাটী ও মারহাটীরাও বিশেষ শিক্ষিত ও



বেক বে—বোম্বে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

উন্নত। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন যিনি বালগঙ্গাধর তিলক, ডাক্তার ভাউদাজী, বিশ্বনাথনারায়ণ মাণ্ডলিক, ডাক্তার ডাকুন্ হা ও সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের নাম শ্রবণ করেন নাই। আমরা এখন ভাটিয়া বেণেদের কথা বলিব।

ভাটিয়া বেণে।

পার্সীদের ন্যায় ভাটিয়া বেণে সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু ধনীব্যক্তি আছেন। এই বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত মিতব্যয়ী জাতি। এ নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৯,৪১৭ ভাটিয়া বেণের সংখ্যা বিদ্যমান। ইহারা বিশেষ সংযত চরিত্র, কোনওরূপ বিলাসব্যসনে কখনও এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে না। জগতের সর্ব্ববিধ আমোদপ্রমোদ হইতে দূরে রহিয়া অর্থ সঞ্চয় করাই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ধনসঞ্চয়ই ইহারা জীবনের ধর্ম্ম ও মোক্ষ ঠিক্ করিয়াছে। বোম্বাইর বল্লভাচারী নামক অপর এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা আবার এ নগরের অন্যান্য দর্শনযোগ্য স্থান সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

বল্লভাচারী সম্প্রদায়।

জগতের অন্য কোথাও এইরূপ নৈতিক উশৃঙ্খলতাপূর্ণ বিলাসের ধর্ম্ম আছে কিনা জানি না। পাঠকগণ আমাদের বর্ণনা শুনিয়া এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি নিশ্চিতই বীতস্পৃহ হইবেন। বল্লভাচার্য্য নামক একব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের স্থাপন কর্ত্তা। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চম্পকারণ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর বিষয় ভক্তমাল নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে বিশেষরূপে লিখিত আছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে তিনি বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়নগরের বৈষ্ণবগণের গুরুর পদে অভিষিক্ত হ'ন; পরে সেখান হইতে উজ্জয়িনী নগরে গমন করেন ও সেখানে শিপ্রাতটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে কঠোর ধ্যানের পরে পীতবসন বনমালীর সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হ'ন। ৺কাশীধামে ইহাঁর দেহাবসান হয়। ইহাঁর মৃত্যু-ঘটনা অলৌকিক রকমের। ইনি একদিবস বারাণসীস্থ হনুমান ঘাটের নিকট জাহ্নবী জলে অবগাহন করিতে নামিয়া অন্তর্হিত হইয়া যান। কথিত আছে যে তাঁহার অবগাহন স্থান হইতে একটী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইল এবং তিনি এইরূপে সর্ব্বজন

সমক্ষে স্বর্গগমন করিলেন। এই বল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায়কেই বল্লভাচারী সম্প্রদায় কহে। বল্লভাচার্য্য মহাত্মার প্রকৃত ধর্ম্মমত কি ছিল, তাহা বর্ত্তমান বিলাস-বাসনা-সক্ত গোস্বামী মহোদয়গণের দুর্নীতি হইতে জানিতে পারা যায় না। ইঁহারা বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্মমত যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা এই যে "পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য উপবাস, বনবাস ও নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সুন্দর বেশভূষা পরিধান ও বিষয়-সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর তাহা হইলে মোক্ষলাভ হইবে।" ভাটিয়া বণিক ও বণিক পত্নীরাই সাধারণতঃ এই সম্প্রদায় ভুক্ত। উহারা গোস্বামী মহারাজদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে মনপ্রাণ এমন কি দেহ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে মহারাজ কহে। প্রকৃতপক্ষেই ইহাঁরা মহারাজ উপাধি ধারণের উপযুক্ত, কারণ এই বল্লভপন্থী মহারাজদের ঐশ্বর্য্য ও ভোগসুখ দেখিলে রাজভোগও তুলনায় অতি সামান্য ও তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শিষ্য এবং শিষ্যার গুরুদর্শন, স্পর্শন, গুরুকে দোলায় বসাইয়া দোল দেওয়া, গুরুর অঙ্গে চন্দন লেপন, তাহার পদ প্রক্ষালন, গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন, গুরুর সহিত অর্থাৎ মদন মূর্ত্তির সহিত স্ত্রীজাতি শিষ্যার একগৃহে অবস্থিতির জন্য গুরুর নিজের কিংবা তাহার কোনও সেবকের পদাঘাত খাইবার জন্য, গুরুর প্রতিনিধির দ্বারা রাসক্রীড়া ইত্যাদি নানাপ্রকার কুৎসিৎ ব্যাপারে ৫৲ পাঁচ টাকা হইতে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শিষ্য ও শিষ্যাগণকে দিতে হয়। লিখিতেও ঘৃণা বোধ হয় যে বৈষ্ণব-কুল-বধূগণ এই সকল মহারাজগণকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় রমণীর অমূল্য গৌরব সতীত্ব রত্ন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন না। হায়রে ধর্ম্মান্ধ ভারতবাসী! কিছুদিন পূর্ব্বে গুজরাটের প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক স্বর্গীয় করসন দাস মূলজী— বোম্বাই সুপ্রীমকোর্টে মহারাজ লাইবেল নামক মোকদ্দমায় এই সম্প্রদায়ের নীতি বিগর্হিত আচরণগুলি জনসমাজে প্রচার করিয়া গুজরাত সমাজের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন, ইহার পর হইতে মহারাজগণের নানাবিধ জঘন্য অত্যাচার কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত স্বামী নারায়ণ নামক এক মহাত্মা কর্ত্তৃক বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের জঘন্য নীতি হইতে পবিত্রতম এক ধর্ম্মও বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণী সাধু, অপর শ্রেণী গৃহী।

স্বামী নারায়ণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম।

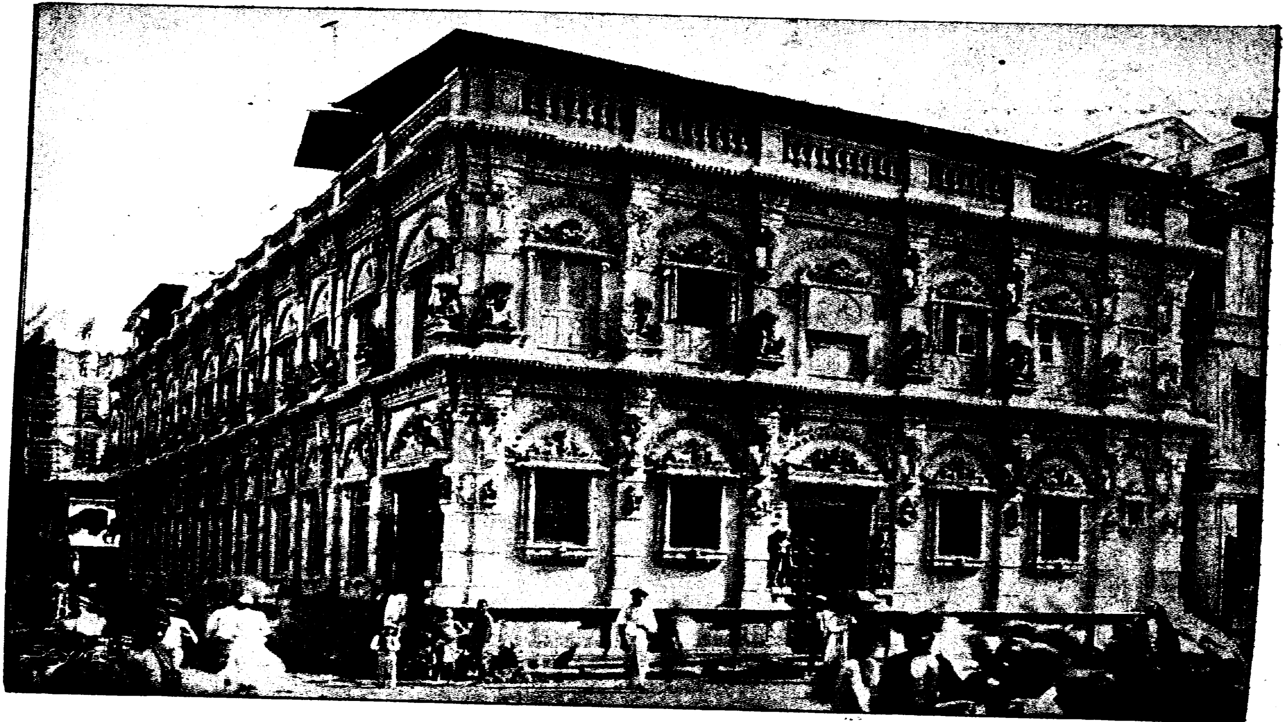
সাধুরা জগতের সমুদয় মায়ার বন্ধন হইতে দূরে রহিয়া অবিবাহিতাবস্থায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ায়। ইহাদের ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। কেবল মাত্র দণ্ড কমণ্ডলু ও ভিক্ষার ঝুলি এবং একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বল পূর্ব্বক ইহারা নানা দূর দেশ গমন পূর্ব্বক ছোট, বড়, উচ্চ সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ায়। এই সাধু-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমাজের বহু হিত সধিত হইয়াছে। স্বামী নারায়ণের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম "শিক্ষাপত্রী" এই গ্রন্থ সহজানন্দ স্বামী সরল প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিঠ্‌ঠল ভক্ত নামক আর একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, উহারা বিঠোবাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। মহারাষ্ট্র দেশের সুবিখ্যাত কবি তুকারামের কবিতাবলী বিঠোবার স্তুতি গানে পরিপূর্ণ। তুকারাম প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পুণা সহরের নিকটস্থ দেহুগ্রামে বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শিবাজীর রাজত্বকালে ইনি প্রাদুর্ভুত হ'ন ও প্রায় পাঁচ শত অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর জীবনী বিশেষ কৌতূহলদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। ভগবান ভক্তের জীবনে যে কত প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রদান করেন এবং কত পরীক্ষার পরে যে তাঁহার অমৃতময় কৃপাকণা লাভ করা যায় তাহা এই পবিত্রাত্মা ঈশ্বর জানিত মহাত্মার মহজ্জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

বোম্বাইনগরে বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী প্রভৃতি যে কয়েকটি হিন্দু ধর্ম্ম-মন্দির আছে তাহা প্রত্যেকেরই দেখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপেক্ষা এই নগরে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের আধিক্যের সহিত হিন্দু-মন্দিরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের হিন্দুগণের দেব-মন্দির এখনে অনেক হইয়াছে।

আমরা একদিবস প্রত্যূষে বালুকেশ্বর দর্শন করিতে গমন করিলাম। সাহেবরা ইহাঁর নাম "Sand Lord' রাখিয়াছেন। ইহা মালাবারগিরির

পশ্চিমদিকে অবস্থিত। বোম্বাইনগরের প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দির ইত্যাদির মধ্যে ইহাই সর্ব্বাগ্রগণ্য; পৌরাণিক প্রবাদ এইরূপ যে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণ কর্ত্তৃক সীতাদেবী অপহৃত হইলে পর সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া এই স্থানে এক রাত্রি অবস্থিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের শিব পূজার জন্য ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ প্রত্যহ রাত্রিতে কাশীধাম হইতে এক একটী নূতন শিবলিঙ্গ আনয়ন করিতেন। দৈবগতিকে এক দিবস লক্ষ্মণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় রামচন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া বালুকাদ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজার্চ্চনা সম্পন্ন করেন। এই ঘটনা হইতেই এই মন্দিরের নাম বালুকেশ্বর হইয়াছে। পরে কাশীর আনীত শিবটীকে রামচন্দ্র মন্দির মধ্যে স্থাপন করেন, বর্ত্তমান সময়ে মন্দির মধ্যে যে শিবলিঙ্গ পূজিত হন ইহা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আনীত বারাণসীর শিবলিঙ্গ। কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র বালুকাদ্বারা যে শিবলিঙ্গ করিয়াছিলেন তাহা পর্ত্তুগীজদের আগমনকালে ম্লেচ্ছ দর্শনে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এখানে একটী অতি সুন্দর ক্ষুদ্রাকার পুষ্করিণী আছে। ইহার নাম বাণতীর্থ। পৌরাণিক প্রবাদ হইতে ইহাও মুক্ত নহে। রামচন্দ্র তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এস্থানের চারিদিকে কোথাও জল দেখিতে না পাইয়া ভূমধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন অমনি মৃত্তিকাভেদ করিয়া সুনির্ম্মল জলস্রোত উত্থিত হইয়া তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিল, তদবধি ইহা "বাণতীর্থ" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই পুকুরের চারি তীরে সোপানাবলী ও চারিধারে ঘন পত্র পল্লব সমাচ্ছন্ন বিটপীরাজি ও তুষার ধবল বহু সুন্দর সুন্দর দেব-মন্দির থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এখানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের সুন্দর ও পরিষ্কার গৃহাবলী ও ধর্ম্মশালা বিদ্যমান আছে। পুষ্করিণীর নির্ম্মল সলিল মধ্যে দেব-মন্দিরের ও তরুশ্রেণীর শ্যামল ছায়া প্রতিফলিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখায়। সমুদ্র তীরস্থিত পাহাড়ের গায় একটী ছিদ্র আছে, উহার ভিতর দিয়া যাইতে পারিলে, সমুদয় পাপক্ষয় হয় ও পুনর্জ্জন্ম হয় না বলিয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের বিশ্বাস। জন-প্রবাদ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শিবাজী মহারাজা এই উপায়ে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কৃশাঙ্গ ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ ভাবে পুণ্য সঞ্চয় করা বিশেষ কষ্ট

বালুকেশ্বর।



মুম্বাদেবীর মন্দির— বোম্বে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সাধ্য নহে, কিন্তু স্থূলকায় ব্যক্তিদের পক্ষেই একটু কষ্ট ভোগের কারণ হয়।

মুম্বাদেবী ও ভুবনেশ্বর মহাদেব।

সেদিনই পুনরায় মুম্বাদেবীকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মন্দিরের দিকে গমন করিলাম। একটী জলাশয়ের তীরে উক্ত দেবীর মন্দির অবস্থিত। সরোবরের চারিপাশে পাষাণ বিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী, তটদেশে নানাবিধ দেব-মন্দির সৌন্দর্য্যে ও স্থাপত্য-কৌশলে বিশেষ মনোরম। কেহ কেহ বলেন যে এই মুম্বাই দেবীর নাম হইতেই বোম্বাই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পর্ত্তুগীজদিগের ভারতাগমনের পূর্ব্বেও মুম্বাইদেবীর মন্দির ছিল বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। এখনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ও বণিকেরা "শ্রীমুম্বই" এইরূপ লিখিয়া থাকেন। এ মন্দিরে অত্যন্ত ভিড়—প্রায় সকল সময়েই জন-সমাগম হয়, বিশেষ প্রাতে ও সন্ধ্যায়। মুম্বাদেবীর মন্দিরের অনতি দূরে ভুলেশ্বর মহাদেবের মন্দির, আমরা সে বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্যও অগ্রসর হইলাম। একটী অতি বৃহৎ মন্দির মধ্যে ভুলেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। এখানে সাধু সন্ন্যাসী ও গুজরাটী রমণীদের ভিড়ই অত্যন্ত বেশী। এই পল্লীতে বহু জৈন মন্দির আছে, প্রত্যেক মন্দিরেই পার্শ্বনাথের স্বর্ণ ও হীরকমণ্ডিত দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিলাম। মহালক্ষ্মীর মন্দির, দ্বারকানাথের মন্দির ও নাগাদেবীর মন্দিরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী নারায়ণের মন্দিরটিও বেশ সুন্দর।

ভিক্টোরিয়া উদ্যান।

আমরা সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া উদ্যান দর্শন করিতে গমন করিলাম, তখন সূর্য্যের তেজ একটু কমিয়া আসিয়াছিল,' সমুদ্রের শীতল বায়ু বহিয়া আসিতেছিল! এই উদ্যানের মধ্যে একটী যাদুঘরও আছে। বিশাল উদ্যান, হরিৎ-শ্যামল-তরুকুঞ্জে পরিশোভিত হইয়া বড়ই শোভাময় বোধ হইল, উদ্যানটি ৩৪ চৌত্রিশ একার জমি ব্যাপিয়া বিরাজিত। যাদুঘরের সুবৃহৎ প্রাসাদ সম্মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর-প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, বরদার ভূতপূর্ব্ব গাইকোবার খণ্ডেরাওয়ের প্রযত্নে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণে মোট ১৮০০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কলিকাতার

যাদুঘরের ন্যায় এ স্থানেও নানাবিধ জীব জন্তুর ও সামুদ্রিক প্রাণী সমূহের কঙ্কাল দৃষ্ট হয় তবে এ স্থানের তিমিমৎস্যের কঙ্কালটি অত্যন্ত বৃহৎ উপলখণ্ড, শিল্পীগণ বিনির্ম্মিত দেশীয় বালকবালিকাগণের বড়ই সুন্দর। এতদ্ব্যতীত প্রাণীশালার নানা বিহঙ্গমগণের মধুরকণ্ঠবিনিস্থত প্রাণমন মুগ্ধকারী সঙ্গীতে ও নানাশ্রেণীস্থ জীবজন্তু দর্শনে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলাম।

বোম্বাই নগরের রুগ্ন ও জরাগ্রস্ত প্রাণীগণের এই রক্ষাগার ও বিশেষ দ্রষ্টব্য, এই প্রাণী রক্ষালয়টি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ও জৈনদিগের প্রযত্নে স্থাপিত হইয়াছে, বহু একার ভূমি লইয়া পিঁজরাপোলটি অবস্থিত। এই প্রাণীরক্ষালয়টি চারিটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে জরাগ্রস্থ গরু ইত্যাদি, দ্বিতীয় অংশে ঘোড়া, বানর, ভেড়া, গাধা, ছাগল, প্রভৃতি থাকে। তৃতীয় অংশে মহিষ এবং চতুর্থশ্রেণীতে কুকুর থাকে। এই কুকুরের অংশেই একটু সরগরম ভাব, নচেৎ অন্য তিন বিভাগের কোন বিভাগেই কোনও রূপ গোলমাল নাই। জন্তুগণ বার্দ্ধক্যের জড়তায় শান্তভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। যাঁহারা দয়ার মহীয়সী শক্তি দ্বারা পরিচলিত হইয়া এইরূপ মহৎকার্য্য করিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই যথার্থ মহাপুরুষ। নিষ্কাম দানের মহত্ত্ব এখানেই হৃদয়ঙ্গম হয়। যখনি রাস্তায় চোখের উপর দেখিতে পাই নিরীহ পশুগুলি মানবের তৃপ্তির জন্য দারুণ নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে, মূক জাতি ইহারা ইহাদের যাতনা কে বোঝে? তখনি ঐ পিঁজরাপোলের সংস্থাপকগণের সাত্বিক দানের পূত মহিমা হৃদয়ে জাগিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে মস্তক নত করিয়াছি। যেখানে মানুষের ব্যথা বোঝে না, যে সংসারে প্রতি নিয়ত নির্দ্দয়তার কঠোর নির্ম্মম ব্যবহার দিবারাত্রি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে বিরাজমানা, সেথায় একটু পুণ্যের জ্যোতি স্ফূরিত হইলে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা থাকে না।

পিঁজরাপোল।

আমাদের বর্ণিত দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ ব্যতীত এই বৃহৎ নগরে স্কুল, কালেজ, মঠ, মন্দির, মস্‌জিদ্‌ গির্জ্জা প্রভৃতি যে কত আছে তাহা বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। রয়াল্‌এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখা দ্বারা প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রায় ২৩।২৪ বৎসর হইল এই স্থানে Natural History Society বা প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌ সভা নামক একটী সভা স্থাপিত

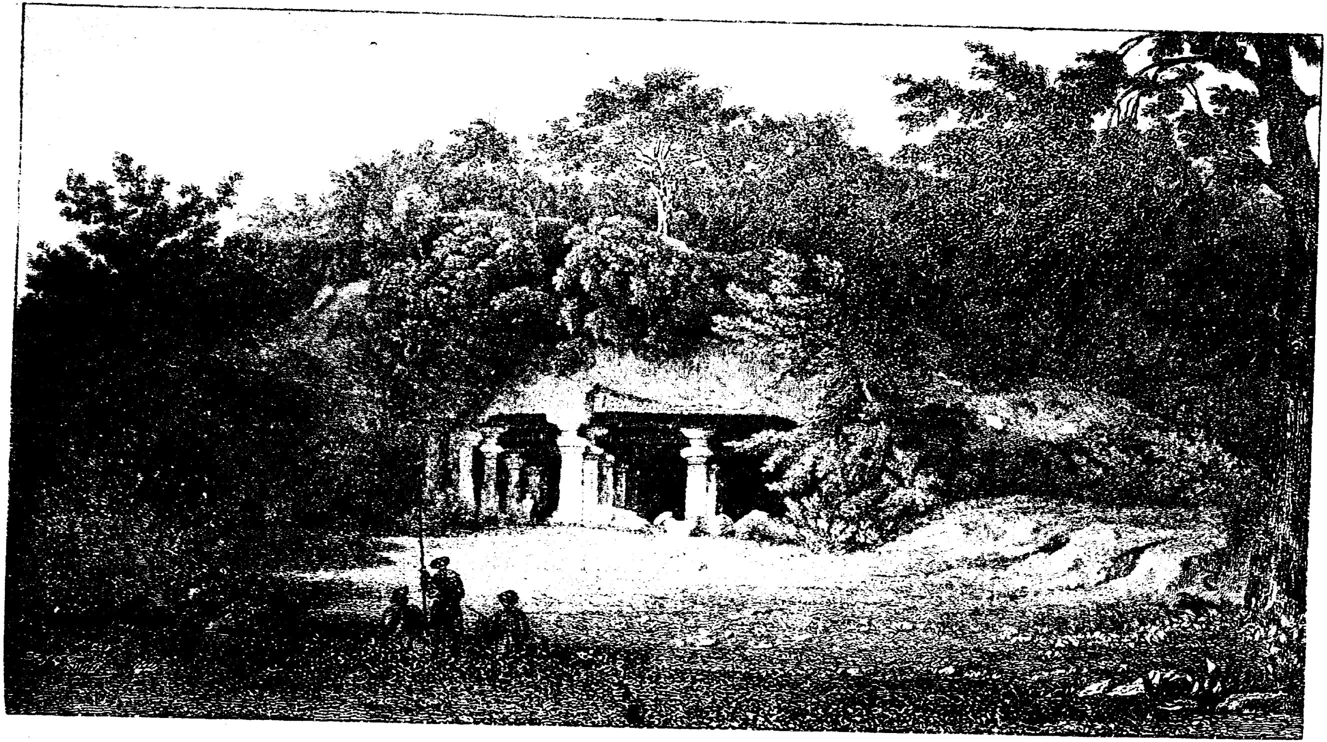
হইয়াছে। উদ্ভিদ্ বিদ্যা প্রাণীবিদ্যাও ভূগর্ভ বিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা ও গবেষণা করাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভারশ্রেণীভুক্ত বোম্বাই সহরের ডাক্তার লিসবো এবং ডাক্তার কীর্ত্তিকর নামক দুইজন ডাক্তার উদ্ভিদ্ বিদ্যায় গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্বন্মণ্ডলীতে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বাঙ্‌লাদেশে কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরে একটী সুন্দর ও বৃহৎ উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক উদ্যান (Botanical Garden) থাকা সত্বেও এপর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই। ইহা নিতান্তই লজ্জার বিষয়। সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে বোম্বাই নগরের মাধবদাস রঘুনাথ দাস শেঠের বিধবাবিবাহ মন্দির বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বোম্বাইনগরে হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীস্থ জাতীয় উৎসবের অন্ত নাই, তাহাদের মধ্যে যে সকলের বঙ্গদেশ হইতে একটু স্বাতন্ত্র্য বিরাজমান তাহাদের বিষয় এখানে উল্লেখ করিলাম। হিন্দু-

উৎসব।

দের যে সকল উৎসব, তাহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই আমাদের মত, তবে একটু পার্থক্য প্রত্যেকটার মধ্যেই আছে, সেটা স্বাভাবিক, কারণ দেশভেদে রুচিভেদ হইবেই। আমাদের বঙ্গদেশে শরৎকালীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে যেরূপ সারা দেশ ব্যাপিয়া একটা আনন্দ-কোলাহল জাগিয়া ওঠে, ছোট বড় সকলেই যেমন তখন হৃদয়ে নবীন তেজ, নবীন উৎসাহ ও প্রফুল্লতা লাভ করিয়া উন্মত্ত হয় এদেশে দুর্গোৎসব সেরূপ জাতীয় উৎসব বলিয়া বিবেচিত হয় না, কোন কোন হিন্দু গৃহে দুর্গোৎসব হয় এবং গুজরাটী রমণীরা 'গরবা' গানে পাড়া মুখরিত করিয়া তোলে বটে, তথাপি তাহা প্রাণহীন, বঙ্গদেশের শারদীয় পূজার সে প্রাণোন্মাদকারা আকুল প্রীতির উচ্ছ্বাস তাহাতে নাই। তবে দশহরার দিন এখানে আমোদের কল-কোলাহল জাগিয়া ওঠে বটে। এখানে দশ-হরার দিবসই শারদীয় উৎসবের প্রধান দিবস। সে দিবস মুম্বাদেবী ও ভুলেশ্বর দেবের মন্দিরে খুব জনতা হয়। প্রতি হিন্দুর ঘরে পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ, আমাদেরি দেশের মত শত্রু মিত্রভেদ ভুলিয়া কোলাকুলি ও শমীপত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। এদেশে বিজয়া দশমীর দিবস

শমীপূজার রীতি ও প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে পাণ্ডবেরা নাকি সেই দিবস শমীবৃক্ষের নীচে অস্ত্র শস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের মহরম ও বিশেষ জাঁক জমকের সহিত হয়। মহরমের বিবরণ সকলেই জানেন, কাজেই সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ দেশের দেওয়ালীই প্রধান উৎসব, সে সময়ে এক খ্রীষ্টান ব্যতীত নগরের অন্যান্য সকল জাতিই এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকে। হিন্দু, মুসলমান, পার্সী সকলেই নিজ নিজ বাড়ীর সম্মুখ দীপাবলিতে সুসজ্জিত করেন—সে এক মনোহর দৃশ্য। গৃহে গৃহে দীপমালা শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে। তখন বোম্বাই নগরীকে আলোক-নগরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ত্রয়োদশী তিথি হইতে আরম্ভ হইয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত ইহা থাকে। আমাদের দেশে এই দীপান্বিতা উপলক্ষে যেমন শ্মশান-বিহারিণী নৃমুণ্ডমালিনী কালীকাদেবীর পূজা হয়, এখানে সেরূপ হয় না। এখানে ধন ধান্যের অধিকারিণী মঙ্গলপ্রদা কমলা এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হন। এই দিবস বাঙলা দেশের মহাজনগণের ন্যায় এ দেশের বণিকেরাও পুরাতন হিসাব পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবোৎসাহে নবীন হিসাব পত্র লইয়া নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহা ছাড়া নারেল পুণম্, দোলযাত্রা, গণেশচতুর্থী, নাগপঞ্চমী, গোকুলাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি বহু হিন্দু-উৎসব আছে সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা কে করিতে পারে? দোলের সময় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে উন্মাদ নর্ত্তন ও উৎকট আমোদ হয়—এ নগরেও তাহার বাতাসের জোর নিতান্ত অল্প নহে। এদেশে ঠাকুর দেবতাদের মধ্যে গণেশের সম্মান অত্যন্ত বেশী। প্রায় প্রতি গ্রামেই গণপতিদেবের মন্দির আছে ও বিশেষ ঘটার সহিত তাঁহার পূজা ও বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। বীণাপানি এখানে ময়ূরাসনা—হনুমানদেবের সম্মানও এ অঞ্চলে কম নয়। আমোদ প্রমোদের মধ্যে এনগরেও পেশাদারী রঙ্গালয় সমূহ আছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নাম এদেশে যমদ্বিতীয়া, সে দিবস ভাই ভগ্নীর গৃহে আহারাদির জন্য গমন করে, ভগ্নী বাঙ্গালাদেশের মতই ভ্রাতার কপালে তিলক দিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া থাকে; ভ্রাতারও ইহার পরিবর্ত্তে ভগ্নীকে ধন রত্নাদি দানে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। বোম্বাইর লোক সংখ্যা

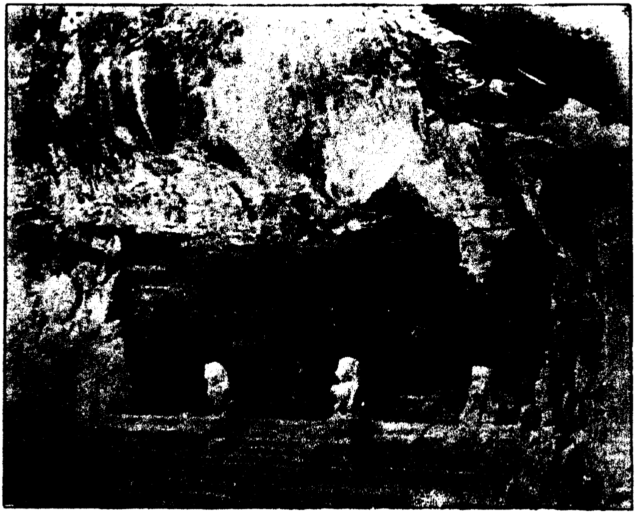


এলিফেণ্টার—গুহা সম্মুখ।

১৯০১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে ৭,৭৩,১১৬ জন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩৫,৪২৮ ধর্ম্মচ্যুত হিন্দু ৪,৭,৭১৭ অন্য জাতীয় হিন্দু ৪৯,১২২ পার্সী ৪৮,৫৯৭ বৌদ্ধ ও জৈন ১৭২১৮ ভাটিয়া ৯,৪১৭ ইহুদি ৩,৩২১ মুসলমান ১৫৮,০২৪ য়ুরোপীয় ১০৫৫১ ফিরিঙ্গি ১,১৬৮ চীনদেশীয় .৬৯ দেশীয় খ্রীষ্টান ৩০৭০৮ আফ্রিকা মহাদেশবাসী ৬৮৯ জন : বোম্বাই নগরের এই জনসংখ্যা হইতে জানিতে পারা যায় এখানকার এক আনা রকম লোক পার্সী। ইঁহাদের ধন ও বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্টতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমরা বিবৃত করিয়াছি। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মিউনিসিপাল কমিশনার মোট ৭২ জনের মধ্যে ২৪ জন পার্সী ছিল। বোম্বাইনগরের সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে হইলে নৌকায় করিয়া সমুদ্রে বেড়ান কর্ত্তব্য।

এলিফেণ্টা।

বোম্বাই নগরে আসিয়া যিনি এলিফেণ্টা বা হস্তীদ্বীপ দর্শন না করিয়া ফিরিয়াছেন তাহার দুর্ভাগ্য বলিতে হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও প্রাচীন স্থপতি বিদ্যার ও ভাস্কর বিদ্যার এখানে দিব্য সমাবেশ। 'চারিদিকে নীলজল করিছে খেলা' তার মাঝখানে কত দিনের পুরাণো স্মৃতি বুকে করিয়া এলিফেণ্টা জগতের বুকে নিজ অস্তিত্ব লইয়া দণ্ডায়মান। এলিফেণ্টার অপর নাম ঘারপুরী। এলিফেণ্টাদ্বীপে যাইতে হইলে এপলোবন্দর হইতে ষ্টীমারে যাওয়াই সুবিধা, তাহা হইলে এক ঘণ্টার মধ্যেই পঁহুছাযায়। ৪।৫৲



এলিফেণ্টাগুহার বহির্দৃশ্য।

টাকা ব্যয় করিয়া বন্দর- বোট ভাড়া করিয়াও যাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে একটু সময় বেশী লাগে। বাতাস অনুকূল থাকিলে সমুদ্রতরঙ্গে পালতুলিয়া দিয়া সাধের তরণী ভাসান আরামের সন্দেহ নাই, কিন্তু বিধির বিধান বলে যদি বাতাস একটু জোরে বহে, তবে বহু সময় সাপেক্ষ এবং প্রাণভয়ে ভীত হইতে হয়। সময়েরও দরকার। সেজন্য সহজে কাহারও নৌকাভাড়া



এলিফেণ্টা গুম্ফার বৃহত্তম কক্ষ—দূরে ত্রিমূর্ত্তি।

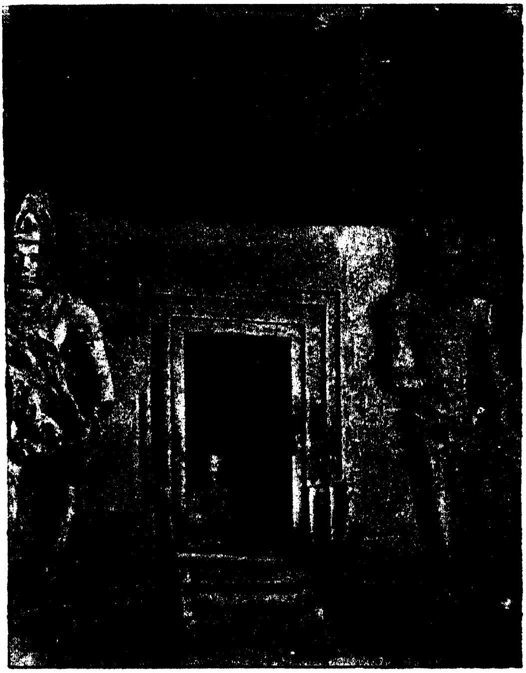
কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে পর্য্যটকদিগের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সমুদ্র-তীর হইতে গুহার মুখ পর্য্যন্ত পাথর ফেলিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ ১১৮ টি সিঁড়ি। অবতরণ করিবার স্থানের প্রায় ২৫০ গজ-দক্ষিণ-দিকে পূর্ব্বকালে একটা অতি বৃহদাকারের-হস্তীর পাষাণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিদ্য-মান ছিল, কথিত আছে যে পর্ত্তুগীজেরা এই পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি হইতেই এই দ্বীপের নাম হস্তীদ্বীপ রাখিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এলিফেণ্টাদ্বীপে সেই প্রাচীন হস্তীমূর্ত্তির কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই। যাকিছু ভগ্নাবশেষ ছিল তাহা সযত্নে বোম্বাই নগরস্থ ভিক্টোরিয়া উদ্যানে রাখা হইয়াছে। বোধ হয় দশম শতাব্দীতে এই প্রস্তর মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা এস্থানে পাঠকবর্গের জ্ঞাতির জন্য ইহার পরিমাণ প্রদান করিলাম।

দৈর্ঘ্য,—কপাল হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত	ফিট	১৩	ইঞ্চি	২
উচ্চতা	"	৭	"	৪
কাঁধের দিকের বেড়	"	৩৫	"	৫
ল্যাজের দৈর্ঘ্য	"	৭	"	৯
ল্যাজের বেড়	"	২	"	১০
দেহ মধ্যস্থ বেড়	"	২০	"	২
পশ্চাদ্দিগের পদের উচ্চতা	"	৫	"	৬
সম্মুখস্থ দক্ষিণ পদের উচ্চতা	"	৬	"	৭॥
সম্মুখস্থ বাম পদের উচ্চতা	"	৬	"	৩
শুঁড়ের বক্রতা	"	৫	"	৩
দক্ষিণ দন্ত	"		"	১১
বাম দন্ত	"		"	৬•

ইহা হইতেই হস্তীটির বিরাট আকৃতি সম্বন্ধে পাঠকগণ মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিবেন। সমুদ্রের অবতরণ প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে সোপানাবলী বাহিয়া উপরে আরোহণ করিলে পর গুহার মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়, সেখান হইতে সাগরের সুমহান্ নীল সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তের মধ্যে পর্য্যাটকের হৃদয়ে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সত্ত্বাউপলব্ধি করাইয়া দেয়। সে বিরাটত্বের মাঝখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিবার জন্য

শাস্ত্রের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, তখন আপনা হইতেই মহিমাময়ের মহান শক্তি হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে, ভক্তি স্রোতে হৃদয় ভাসিয়া যায়। এই জন্যই বুঝি আমাদের প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ প্রকৃতির উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতি বালুকাকণায় ঈশ্বরের মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, হিমাদ্রির অভ্রভেদী তুষার ধবল শৃঙ্গে প্রভাত রবির কনক কিরণ রঞ্জিত হেম সুষমা দর্শনে সেই অনন্ত পুরুষের মহিমা দেখিয়া জড় হিমাদ্রির বিশাল দেহে সজীবতা অনুভব করিয়াছেন। তাই সামান্য ফুলটি হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বত, ক্ষুদ্রকায়া গিরি-নির্ঝরিণীর রজত-সলিল-প্রবাহ হইতে, গঙ্গার কলকল নাদে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে, প্রত্যেকের ভিতরেই তাঁহাকে অনুভব করিয়া ঈশ্বরত্ব



লিঙ্গমূর্ত্তি—এলিফেণ্টা।

আরোপ করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন,—তাই হিন্দুর ধর্ম্ম পৌত্তলিকের ধর্ম্ম। কিন্তু জগতে পৌত্তলিক নয় কে? পৌত্তলিক ছাড়া



ত্রিমূর্ত্তি—এলিফেণ্টা।

জগত কোথায়! এস্থান হইতে সমুদ্রের বক্ষস্থিত কশাই দ্বীপ ও দূরস্থিত বোম্বাই বন্দরের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। গুহার প্রবেশ দরোজাটি বেশ বড় ও সারি সারি চারি থাক স্তম্ভ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায়। এই সকল স্তম্ভ প্রস্তর নির্ম্মিত, মোট সংখ্যা ৪২টি। ইহাদের উপরেই প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদের ভার অর্পিত আছে। কয়েকটি কারুকার্য্য খচিত সুন্দর স্তম্ভের ভগ্নদশা। এই মন্দিরের প্রবেশ দ্বার হইতে শেষপ্রান্তপর্য্যন্ত স্থান ১৩০ ফিট দীর্ঘ্য ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দ্বার পর্য্যন্ত প্রায় ততটা প্রশস্ত। এস্থানে নিয়মিত মত কোনও রূপ পূজা ইত্যাদি হয় না, বহুকাল হইতেই ইহা পরিত্যক্ত। মাঝে মাঝে যাত্রীদের সমাগম ও শিবরাত্রির সময় এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। এই মন্দির যে পূর্ব্বে শৈবদিগের অধিকারভুক্ত ছিল তাহা মন্দিরস্থ খোদিত মূর্ত্তি সমূহ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কারণ অধিকাংশই শৈব মূর্ত্তি। এই সকল মূর্ত্তি ঈষৎ আলো ও অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্ট হয়—মন্দিরাভ্যন্তরে উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। একটী চতুর্দ্বার বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এ-স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ৬টি গুহা আছে, তন্মধ্যে চারিটি সম্পূর্ণ, পঞ্চমটি বৃহৎ হইলেও এখন ভরিয়া গিয়াছে, ৬ষ্ঠ গুহা, কেবল খোদিত হইতেছিল, তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। প্রথম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহাটির দৈর্ঘ্য ১৫০ ফুট। এই গুহা ২৫০ ফুট উর্দ্ধে খোদিত এবং সমুদ্রতটস্থ অবতরণ স্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে হইবে। আমরা পূর্ব্বে মন্দির মধ্যস্থ যে লিঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছি কথিত আছে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসকালে এই গুহা খোদিত ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কক্ষের বাহিরের চতুর্দ্দিকস্থ দ্বারবানগন পিশাচ মূর্ত্তির উপর ভর করিয়া দণ্ডায়মান। গুহার পশ্চাৎ ভাগে অর্থাৎ

ত্রিমূর্ত্তি।

মন্দিরের উত্তর দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত ত্রিমূর্ত্তি বিরাজমান। এই মূর্ত্তি এয়ের উচ্চতা ১৯ উনিশ ফুট। এই মূর্ত্তিতে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং মহাদেব সংহার-কর্ত্তারূপে নির্ম্মিত হইয়াছেন। ব্রহ্মার সৌম্যশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর, ইহাঁর এক হস্তে কমণ্ডলু। ইনিই মধ্যস্থলে বিরাজিত, ব্রহ্মার বাম পার্শ্বে পালককর্ত্তা বিষ্ণু বিকসিত শতদল হস্তে দণ্ডায়মান; দক্ষিণ দিকে সংহারকর্ত্তা

জটাজূটবিভূষিত মহাদেব করধৃত ফণীর ফণার উপর ঈষৎ বক্রনয়নে হাস্যদৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার শিরোভূষণ নরকপাল ও বিল্বপাত্র। এই ত্রিমূর্ত্তি হইতে প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে দুইটি ১২ ও ১৩ ফুট দীর্ঘ প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারপাল দণ্ডায়মান আছে। ব্রহ্মার বক্ষস্থিত অলঙ্কারগুলির নূতনত্ব ও নিপুণতা নয়নরঞ্জক বটে।

অর্দ্ধনারীশ্বর।

ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণপার্শ্বে অর্দ্ধনারীশ্বর বা অর্দ্ধেক পুরুষ অর্দ্ধেক স্ত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বামার্দ্ধ গৌরীদেবীর, দক্ষিণার্দ্ধ মহাদেবের মূর্ত্তি। ইহার সম্মুখে নন্দী বা শিবের বাহন বৃষের মূর্ত্তি স্থাপিত। মহাদেব চতুর্হস্তের এক হস্ত নন্দীর শৃঙ্গোপরি স্থাপন করিয়াছেন। এই মূর্ত্তির দক্ষিণদিকে ব্রহ্মা শতদল নির্ম্মিত সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন, সিংহাসনের নীচে পাঁচটি হাঁস তাহা ধারণ করিয়া আছে। বামদিকে গরুড় বাহন বিষ্ণু, গরুড় এক্ষণে ছিন্ন মস্তক। পশ্চাৎদিকে ঐরাবতারোহণে ইন্দ্র আসীন, উর্দ্ধদিকে ও পশ্চাৎদিকে অসংখ্য দেবদেবী ও ঋষিগণের মূর্ত্তি বিরাজিত। প্রত্যেক মূর্ত্তির গঠন কৌশল হইতেই শিল্পীগণের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতাও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেরূপ ভাবে খোদিত করিলে স্বাভাবিক হইবে এবিষয়ে যে তাহাদের বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

শিবপার্ব্বতী।

ত্রিমূর্ত্তির বামপার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শিব ও পার্ব্বতীর বৃহদাকারের মূর্ত্তি বিরাজিত, শিব মূর্ত্তি ১৬ ফিট এবং পার্ব্বতীর মূর্ত্তি ১২ ফিট উচ্চ, শিবের মস্তকোপরি গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তরঙ্গায়িত সুষমা অঙ্কিত, শিবমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, তাঁহার চারি বাহু, এক বাহু একজন পিশাচের অঙ্গোপরি ন্যস্ত তাহাতে সে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শিবের দক্ষিণ দিকে তাঁহার অন্যান্য অনুচর ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি অনুচরগণ, ইহার উপরে ব্রহ্মা ও শিবের মধ্য খানে ঐরাবতোপরি ইন্দ্রদেব, ঐরাবত যেন হাঁটুগাড়িয়া বসিতেছে এরূপ ভাবে খোদিত। ভগবতী বা পার্ব্বতীদেবী শিবের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক পিশাচীর হাতে ভর দিয়া দণ্ডায়-মানা। ইহার উপরে গরুড়াসীন বিষ্ণু, গরুড়ের গলায় মালার আকারে একটী সর্প দোলায়মান।



শিব-পার্ব্বতী—এলিফেণ্টা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সর্ব্বোপরি ছয়টি মূর্ত্তি। তাহার মধ্যে দুইটি নারী, অন্য গুলি নরমূর্ত্তি।

হরপার্ব্বতীর বিবাহ।

ত্রিমূর্ত্তির আরও একটু বামদিকে অগ্রসর হইলে পশ্চিম দিকস্থ প্রকোষ্ঠে হরপার্ব্বতীর বিবাহ সভা। লজ্জিতা পার্ব্বতীকে একজন পুরোহিত সম্মুখদিকে ঠেলিয়া দিতেছেন, এককোণে চতুর্ম্মুখব্রহ্মা গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, ইহা ছাড়া বিষ্ণুমূর্ত্তি ও পার্ব্বতীর দক্ষিণ দিকে তাঁহার সহচরীগণ নানারূপ পাত্র হাতে করিয়া দণ্ডায়মানা। বোম্বাই প্রদেশের রীতি নীতির অনুসরণ করিয়াই এ সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত। এই প্রকোষ্ঠের অপরদিকের কক্ষে গণেশের জন্মের দৃশ্য খোদিত। হর-পার্ব্বতী

গণেশের জন্ম।

কৈলাস পর্ব্বতে একাসনে উপবিষ্ট। কৈলাস-পর্ব্বতস্থিত অভ্ররাজি প্রদর্শনের জন্য প্রস্তর নানারূপে কাটা হইয়াছে। শূন্য প্রদেশ হইতে দেব দেবীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। শিবের পাদদেশে কঙ্কাল-সার ভৃঙ্গির মূর্ত্তি। পার্ব্বতীর পশ্চাতে একটী স্ত্রীলোকের ক্রোড়দেশে শিশু গণেশ, রমণী উপাবিষ্টা। নিম্নদেশে শিব ও পার্ব্বতীর বাহন নন্দী ও ব্যাঘ্র বিরাজিত। গণেশের জন্ম দৃশ্যের অপর প্রকোষ্ঠে রাবণ কৈলাস

রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন।

পর্ব্বত উত্তোলন কবিয়া লঙ্কায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন এই দৃশ্য অঙ্কিত। রাবণের দশ মাথাই খোদিত। রাবণ শিবের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, কৈলাস পর্ব্বত অতিদূরে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার শিব পূজায় ব্যাঘাত হয় তাই তাহা উঠাইয়া লঙ্কা পুরীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, রাবণের আকর্ষণে পর্ব্বত কম্পমান হওয়ায় পার্ব্বতীর ভীতিভাবের সঞ্চার হইল ইহাতে মহাদেব স্বীয় পদাঙ্গুলি দ্বারা রাবণের শিরোপরি এত বলের সহিত চাপিয়া ধরিলেন যে অবশেষে রাবণের পিতামহ পুলস্ত দশ সহস্র বৎসর পরে আসিয়া তাঁহার উদ্ধার করেন। এই কক্ষের পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে দক্ষ যজ্ঞের চিত্র

দক্ষ যজ্ঞ।

খোদিত আছে। অষ্টভুজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কপালমাল শোভিত রুদ্রমূর্ত্তি বীরভদ্র দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট করিতেছেন। লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে দেবতারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া ভয়ের সহিত যজ্ঞ ধ্বংস অবলোকনে নিরত। এই লিঙ্গের উপরিভাগে একটী আশ্চর্য্যজনক অক্ষর খোদিত আছে, ষ্টিভেনসন্, এর্সকিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উহা ওঁকার

প্রতিপাদক চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে বীরভদ্রের অষ্টভুজের মধ্যে তিন বাহু দক্ষের নিধনে নিযুক্ত, দুই বাহু প্রসারিত ও অপর তিন ভুজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ কক্ষ হইতে অগ্রসর হইয়া মন্দিরের দ্বারে প্রবেশ পথের সম্মুখে অগ্রসর হইলে আরেকটি কক্ষে পঁহুছা যায়। এখানে মহাদেব ভৈরববেশে সমাসীন; অষ্টভুজের মধ্যে সাতখানাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কেবল একখানা অবশিষ্ট। ভৈরবের মস্তকোপরি গণেশের মূর্ত্তি খোদিত। হস্তীমুখো গণেশের গজানন বড়ই সুন্দর ভাবে খোদিত রহিয়াছে।

ভৈরব ও মহাদেবের যোগীবেশের মূর্ত্তি।

ভৈরবমূর্ত্তির নিকট হইতে কয়েক পা আগু বাড়াইলেই যোগাসনোপবিষ্ট মহাদেবের যোগীমূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে। বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির এতটা সৌসাদৃশ্য যে অনেক পর্য্যাটকেরা পূর্ব্বে ইহাকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। একটী পদ্মের উপরে মহাদেব যোগাসনে উপবিষ্ট, পদ্মের বৃন্ত নিম্নস্থ দুইটি মূরত কর্ত্তৃক ধৃত, ইহা যে বুদ্ধমূর্ত্তি নয় তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কারণ এইরূপ হিন্দুমন্দিরে তদ্রূপ কোনও মূর্ত্তি থাকা অসম্ভব,—বৌদ্ধধর্ম্ম কোনোদিনই হিন্দুসমাজের পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয় নাই এবং কোন প্রকারেরই সহানুভূতি পায় নাই। এখানে ঘোড়ার যে একটী ভগ্ন মূরত আছে তাহার পৃষ্টে পাশ্চাত্যরীতি অনুযায়ী জিন, লাগাম ইত্যাদি সজ্জা আছে, এর্সকিন (Erskine) সাহেবের মতে এই অশ্বটির গঠন নৈপুণ্য ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এলিফেণ্টা গুহার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। এখানকার চিত্রাবলীর ভগ্নদশা দুর্দ্দান্ত পর্ত্তুগীজদিগের কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে, মুসলমানদের দ্বারা ইহার কোনও অনিষ্ট হয় নাই। এই মন্দির ও এই মন্দিরস্থ খোদিত মূর্ত্তিসমূহ ইহাদের নবীন বয়সে যে কিরূপ সুন্দর ছিল তাহার অনুমান করা এখন সুকঠিন। প্রাচীনকালে ইহার প্রবেশের সম্মুখে একখানা শিলালিপি ছিল, তাহা পর্ত্তুগীজদিগের কর্ত্তৃক লিসবনে প্রেরিত হয় কিন্তু উহার কোনও পাঠোদ্ধার হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না। ইহা হইতেও এলিফেণ্টার প্রাচীনত্ব অনুমান করা অসঙ্গত নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ইহাকে চারি সহস্র



এলিফেণ্টাগুম্ফার আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত যে অন্যায় নহে তাহা যিনি এস্থান দর্শন করিয়াছেন তিনি সহজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দুঃখের বিষয় এ সকল মূর্ত্তির মধ্যে অধিকাংশই বিকলাঙ্গ। এ সমুদয় খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন বলিয়া বোধ হয়, বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে যে সুবৃহৎ ব্যবধান আছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া কল্পনার আজ্ঞাকারীরূপে নানা দৃশ্যের মধ্যে আপনার অস্তিত্বটুকু হারাইয়া যায়, কখনও ভীষণমূর্ত্তি ভৈরবের ভীমদৃষ্টি, কখনও পিশাচ দ্বারপালগণের বিকট মুখভঙ্গিমা কখনও বা ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্রের প্রশান্ত মুখশ্রী—পদ্মযোনী ব্রহ্মার সৌম্য মধুর হসিত বদনের গাম্ভীর্য্য, কন্যারূপা গৌরীর বিবাহ সভায় যাইবার সলজ্জ অথচ ঈষৎ হাসিভরা মুখখানির ঢল ঢল যৌবন-সুষমা—গঙ্গা, সরস্বতী যমুনার তরঙ্গময়ী হরজটা বিহারিণীমূর্ত্তি, সকলি শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। যাহাদের ললিতকলার নিপুণতা প্রভাবে ইহারা প্রস্তরের মধ্যেও প্রাণ পাইয়াছিল—সে সব শিল্পীরা এখন কোথায়? জগতের কয়জন তাহাদের স্মরণ করিয়াছে? একদিন শ্মশানভস্মের উপর আত্মীয়স্বজনের যে দুই ফোঁটা শোকাশ্রু পতিত হইয়াছিল তাহার সহিতই কি সব শেষ হয় নাই? তাহারা গিয়াছেন বটে, তাহাদের দেহাবশেষের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন জগতের বুকে নাই বটে, কিন্তু একথা ঠিক যে যতদিন পর্য্যন্ত এলিফেণ্টা গুহার একটী ভগ্ন মূর্ত্তিরও চিহ্ন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাদের স্মৃতি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে চিরকাল সকলের হৃদয়ে জাগুরক থাকিবে। প্রতিপদবিক্ষেপে আমরা সুদূর অতীতের গৌরবগরিমা অনুভব করিতেছি। সমুদ্রতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ দ্বীপমধ্যস্থ পর্ব্বতগাত্রে কত অধ্যবসায়, কত দৃঢ়তা, কত সূক্ষ্মদৃষ্টি, কত দুরগামী কল্পনাও মনোবৃত্তির উচ্চতা দ্বারা ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছিলতাহা ভাবিবার বিষয় বটে। এই গুহা রাত্রিকালে আলোকিত হইলে বড়ই সুন্দর দেখায়। ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় যখন বোম্বাই সহরে আগমন করেন তখন তাঁহার প্রীত্যার্থ ও সম্মানার্থ এলিফেণ্টায় যে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে গুহাভ্যন্তর দীপালোকে সুরঞ্জিত করা হইয়াছিল। বোম্বাই সহর হইতে এলিফেণ্টা ৬ মাইল দূর।

আমরা যখন এলিফেণ্টা হইতে বোম্বাইনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম,তখন সূর্য্যদেব দিবসের কার্য্য সমাপনান্তে সমুদ্রবক্ষে অবগাহন করিতেছিলেন,—মৌনসন্ধ্যার ম্লান আবরণে সমুদ্র ও আকাশ ঢাকা পড়িতে না পড়িতেই অগণ্য তারামালায় পরিবেষ্টিত হইয়া ত্রয়োদশীর চন্দ্র আকাশে হাসিতে ছিলেন, উন্মাদ তরঙ্গবুকে শুভ্রজ্যোৎস্নারাশি প্রতিফলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, সেই দিগন্তবিস্তৃত সুনীলগগন চুম্বিত নীল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ ফেনিল অনন্ত সাগর! যে দিকেই দৃষ্টি পাত কর সেদিকেই জলধিরসুনীল সৌন্দর্য্য, দর্শনে মনে হইল:—

"The Sea! The Sea! The open Sea!
The blue, the fresh, the ever free!
Without a mark, without a bound,
It runneth the earth's wide regiant round;
It plays with the clouds; it mocks the skies;
Or like a cradled creature lies.

* * * *

With the blue above, and the blue below,
And silence wheresoe'er I go.

* * * *

I love (O! how I love) to ride
On the fierce foaming bursting tide,
When every mad wave downs the moon,
Or whistles aloft his tempest tune,
And tells how goeth the world below,
And why the south-west blasts do blow."

আমরা প্রায় রাত্রি আট ঘটিকার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, সে রাত্রিতে কেবল এলিফেণ্টার কথাই মনে হইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল বর্ত্তমানেও অতীতে গাঢ় সম্বন্ধ আছে—নতুবা সেই কোন্ যুগের আমাদেরি



ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণের ভগ্নমূর্ত্তি সমূহ—এলিফেণ্টা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মত দেহধারী শিল্পিগণের স্মৃতি কেন হৃদয়ে পীড়া দিতেছে! মনে হইতেছিল যেন তাহারা আমাদের অতি নিকট,—দূরে নহে।

আমরা যখন বোম্বাই নগরী দর্শন করিয়াছিলাম, সে সময়ে সেখানে বাঙ্গালী নাই বলিলেও ক্ষতি ছিলনা, অতি অল্প দুই চারি জন মাত্র ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে স্থানে বাঙ্গালীর সংখ্যা বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই নগরে প্লেগের আক্রমণের পর হইতে ইহার উন্নতির জন্য গভর্মেণ্ট বহু অর্থব্যয় করিতেছেন। বোম্বাই সহর ভারতের সর্ব্বপ্রধান বন্দর, ইহা কতকগুলি দ্বীপ সমষ্টি লইয়া গঠিত। পূর্ব্বে এই সমুদয় দ্বীপ ছোট ছোট খাল দ্বারা পরস্পরও সীমান্ত প্রদেশ হইতে পৃথক ছিল, কিন্তু এখন বহু খাল বুজাইয়া দিয়া পরস্পর সংযুক্ত করা হইয়াছে। এ সকল দ্বীপের সংখ্যা মোট দ্বাদশটি। বম্বের মত ঘনবসতি ভারতের আর কোন সহরেই নাই। এখানকার জল বায়ু নাতি শীতোষ্ণ, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও বেশী গরম এবং শীতের সময়ও খুব বেশী শীত হয়না, কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ বন্দর রক্ষা করিতেছে; সম্মুখে তীর ভূমি হইতে প্রায় ১০০০ ইইতে ২০০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। এই পর্ব্বতের পাদ দেশেই দুর্ভেদ্য ব্রিটিশ দুর্গ অবস্থিত। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন অবিংটন কর্ত্তৃক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল, তিনি পর্ব্বততলস্থ এই দুর্গ অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পর্ব্বতোপরিস্থ বর্ত্তমান ভগ্ন দুর্গটি অধিকার করিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজ নগরের ন্যায় বোম্বাই নগরেও একজন গভর্ণার বাস করেন, ইহাঁরও কাউন্সিল আছে। ইনিও বড়লাটের অধীন। যাঁহাদের সময় ও সুযোগ দুইই আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই সৌধমালা পরিশোভিতা নীল-সিন্ধু-জল-চরণধৌতা, ধনৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণা,—নানাজাতিয় লোকের পরিসেবিতা এই মহীয়সী নগরী দর্শন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অর্থব্যয়ের যথার্থ সার্থকতা হইবে।

জল বায়ু।

সুরাট।

আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সুরাট বন্দরে উপস্থিত হইয়া সেখানকার এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তপতী বা তাপ্তী নদীর দক্ষিণ তটে প্রায় নদীর মোহানার নিকট সুরাট অবস্থিত, এই নগরী সমুদ্র হইতে জলপথে সাত ক্রোশ এবং স্থল পথে পাঁচ ক্রোশ দূরে বিরাজিত। প্রাচীনকালে সুরাট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তপতী নদী দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে যাইতে যাইতে যে স্থানে বাঁকিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়াছে সেই বাঁকের উপরই সুরাট অবস্থিত। পুরাকাল হইতেই এই নগরী বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পার্সীগণ আসিয়া এস্থানে বাস করে এবং ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকেরা সর্ব্বপ্রথমে এখানে কুঠি নির্ম্মাণ করেন, পূর্ব্বকালে অর্ণবযান নির্ম্মিত হইত বলিয়াও ইহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তপতী নদী স্থানীয় লোকের নিকট পবিত্রতার জন্য বিশেষ আদৃত। এই স্রোতস্বিনী মধ্য প্রদেশের বেতুল জেলার নিকটস্থ মূলতাই হইতে জন্মলাভ করিয়া সাতপুরা গিরিশৃঙ্গ ভেদ করতঃ খান্দেশ জেলার উচ্চভূমি দিয়া অবশেষে সাগরে মিলিতা হইয়াছে। সুরাট জেলার মধ্যে তপতীর কতকগুলি শাখা প্রবাহিতা, তন্মধ্যে পূর্ণা, অরুণাবতী গোমতী প্রভৃতি শাখা নদীগুলি প্রসিদ্ধ। তপতীর উৎপত্তি স্থান হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত ইহার উভয় তটস্থ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যই বৈচিত্র্যময়, কোথাও অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী বিরাজিত, কোথাও সবুজ-সুন্দর শস্যক্ষেত্র, কোথাও শালবন শ্রেণী, কোথাও জনকোলাহল মুখরিত সুন্দর নগর আর কোথাও বা বিজন প্রদেশ, এইরূপ বৈচিত্র্য অধিকাংশস্থলে সুদুর্লভ। তপতীর উভয়তীরে ১০০টি মহালিঙ্গ বা তীর্থ বিরাজিত। এ সকলের মধ্যে সুজাতীশ্বর, নরবাহন লিঙ্গ, মচুকুন্দেশ্বর জামদগ্ন্যেশ, উজ্জ্বলেশ্বর এবং সুরাট হইতে ১৫ মাইল পূর্ব্বে বোধন নামক তীর্থ বিখ্যাত, এই বোধন তীর্থে প্রতি দ্বাদশ বর্ষান্তে ধর্ম্মমেলা হইয়া থাকে। সুরাট হইতে দুই মাইল দূরস্থিত নদীর উজানে অশ্বিনীকুমার এবং গুপ্তেশ্বর



সিংহগুম্ফা — এলিফেণ্টা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নামক স্থান দুইটীও পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এই উভয় তীর্থ স্থলেই অনেক মন্দির, যাত্রীগৃহ ও নদীগর্ভে অবতরণ করিবার উপযোগী সোপানশ্রেণী বিদ্যমান আছে, প্রতি বৎসর এস্থানে স্নানার্থ বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গুপ্তেশ্বর এ অঞ্চলের একটী বিখ্যাত শ্মশানভূমি। তপতী নদী নর্ম্মদার ন্যায় পুণ্যপ্রদা বিবেচিত না হইলেও সময় বিশেষে ইহাতে স্নান করিলে মানুষ পাপযুক্ত হইয়া থাকে ; কারণ স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে ঃ—

"যো দীপদানং কুরুতে আষাঢ়ে তপতা তটে।
কুলকোটি সহস্রাণি স তারয়তি মানবঃ॥

স্কন্দপুরাণ, তাপীখণ্ড ৩।৪১।

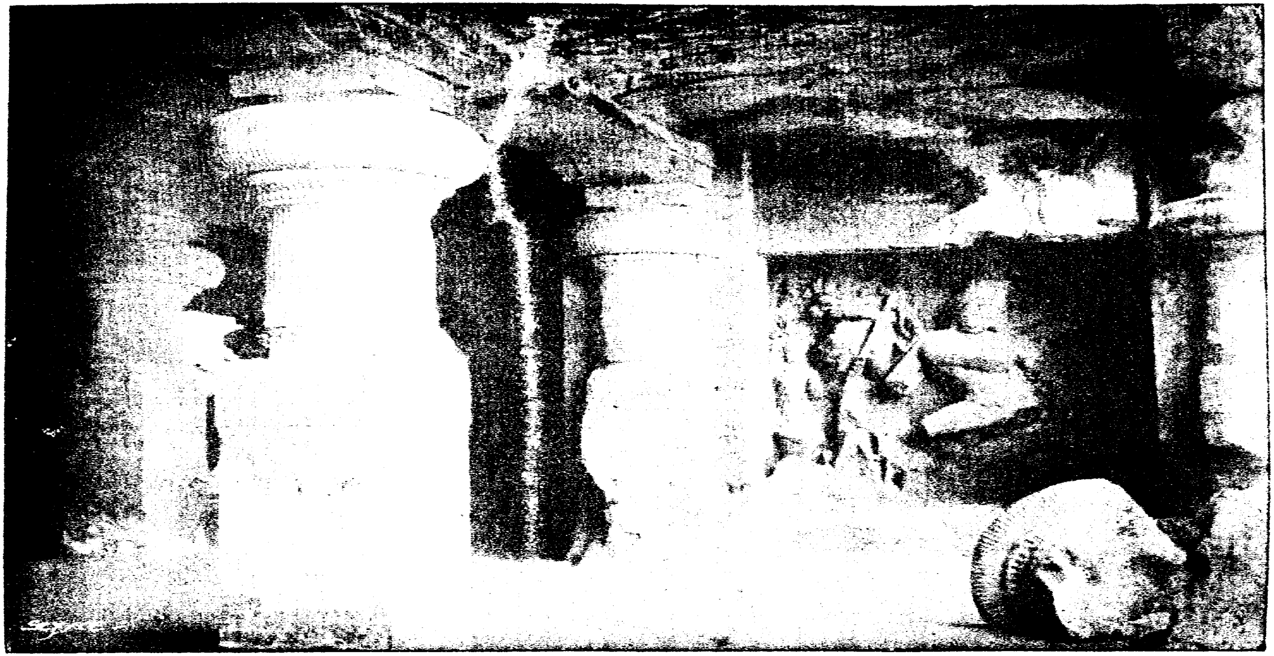
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসে তপতী নদীতে অবগাহন করে এবং উক্ত মাসে প্রদীপ দান করে সে ব্যক্তির সহস্র কোটী কুল উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে।

সুরাটনগরী নদীর কূলে প্রায় পোয়া মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। নগরের প্রধান রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় রাস্তাই অপ্রশস্ত ও বক্র, কিন্তু তাহা হইলেও সমুদয়গুলিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঘন বসতি যুক্ত। রাজ-পথের উভয় পার্শ্বে ধনী হিন্দু ও পার্সীগণের সুগঠিত উচ্চ হর্ম্ম্যশ্রেণী থাকায় ইহার নাগরিক সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপভোগ্য। নগরীটি ঘন বসতিযুক্ত হইলেও স্থানে স্থানে বেশ ফাঁকা জমিও আছে। সুরাটের দর্শনীয় সৌধাবলীর মধ্যে ক্লক টাওয়ার, স্বামী নারায়ণ মন্দির, নবাবের প্রাসাদ, বিষ্ণুমন্দির, ১৬১২ খ্রীঃ অঃ সংস্থাপিত প্রাচীন ইংরেজ কুঠি, সিভিল হাঁসপাতাল, ইংরেজ-দিগের গোরস্থান, স্ত্রীলোকদিগের হাঁসপাতাল, পারেখ আর্টস্কুল, জৈনমন্দির, ডাচ্ সমাধিস্থান, ভিক্টোরিয়া উদ্যান, ইংরেজী বিদ্যালয়, ও উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট শ্রীনাথজীর মন্দির বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। এখানকার সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় স্থান কেন্দ্রবর্ত্তী কেল্লা। ইহার নক্সাও নির্ম্মাণ ১৫৪০—৪৮খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে খোদাবন্দ খাঁ নামক জনৈক তুর্কী সৈনিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত এই দুর্গে ইউরোপীয় এবং দেশীয় সৈন্য ছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে নানাবিধ সরকারী আফিস আদালতাদি অধিষ্ঠিত আছে। এ

নগরেও পার্সীদের অগ্নি মন্দির (আতস্ বেহেরাম) আছে। সুরাটের পশু হাঁসপাতাল গুলি অবশ্য দর্শনীয়, এস্থানে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী পশু হাঁসপাতালের মধ্যে রুগ্ন, সুস্থ, বৃদ্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর পশুগুলিই পালিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে রুগ্ন পশুদিগের ঔষধ ইত্যাদি দ্বারা সেবা করা হয়, এবং দুর্ব্বল ও কর্ম্মশ্রান্ত পশুদিগকে চরিতে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং সুস্থ পশুগুলি অন্যান্য পশু সমূহের খাদ্য দ্রব্যাদি বহন করা ইত্যাদি লঘু কর্ম্ম করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এস্থানে গরু, বলদ, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল, হরিণ, কুকুর, গাধা, হাঁস, মোরগ ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেণীর পশু পক্ষীই দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে নাকি এস্থানে ছারপোকা, ও মশা প্রভৃতির হাঁসপাতাল ছিল,—সে সময়ে লোক ভাড়া করিয়া আনিয়া ইহাদিগকে রক্ত খাওয়ান হইত, এক্ষণে সেস্থানে কীট পতঙ্গাদিকে শস্য খাওয়ান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই চারিটি হাঁসপাতালে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক হাজার পশুর বাসস্থান আছে।

মোগল সম্রাটদের শাসন সময়েই সুরাট বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে,—মহাত্মা আকবরের রাজত্ব সময়ে সুরাট একটী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। সুরাট ইংরেজাধিকৃত হইবার পূর্ব্বে জন বহুল এবং বহু বণিক অধ্যুষিত স্থান ছিল, তখন লোহিত সাগরোপকূলস্থ মোচা সহরের সহিত এবং সুমাত্রার রাজধানী অচিনের সহিত ইহার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, সে সময়ে এ স্থানের বাণিজ্য দ্রব্যাদির মধ্যে লৌহ, তাম্র, ফটকিরি, হীরক, চুনি, পান্না, গম, ছোলা, মটর, শুটি, ঔষধ, মাখন, জ্বালানি, তৈল ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদি হইত এবং এ সকল ক্রয় করিবার নিমিত্ত ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌গণ সমবেত হইতেন। বোম্বাই নগরীর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুরাট তাহার পূর্ব্ব গৌরব বৈভব হারাইয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে পার্সীদের আধিপত্যে সুরাটে বাষ্পীয়তরী সমূহ নির্ম্মিত হইত, এখনও বোম্বাইয়ের ডক্‌ইয়ার্ডে পার্সী মাষ্টার বিলডার পদে নিযুক্ত আছেন। সেকালে এখানে মূল্যবান সুন্দর সুন্দর কার্পেট ইত্যাদি নির্ম্মিত হইত, কিন্তু এখন আর সেদিন নাই।

সুরাটের মিষ্টান্ন অতি উপাদেয়, গুজরাটিরা বলিয়া থাকে "কাশীনো মরণ,



এলিফেণ্টার বৃহত্তম গুহার পার্শ্বদৃশ্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সুরত নো ভোজন” অর্থাৎ কাশীতে মৃত্যু যেমন প্রার্থনীয়, সুরাটের মিষ্টান্ন ভোজনও তদ্রূপ লোভনীয়। এখানকার ‘ঘরি’ নামক মিঠাই অত্যন্ত উপাদেয়, বরফি জমাইয়া তাহার উপর ঘৃত ঢালিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়। এখানে লুচি পাওয়া যায় না, নিম্‌কি প্রভৃতি অন্যান্য ভোজনীয় দ্রব্যাদিও ঘৃত পক্ক। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আমরা বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের শ্রীনাথজীর দেবালয় দর্শন করিয়া আসিলাম, ইহা অতি বিচিত্র স্থান। আমাদের দেশের বঙ্গীয় বৈরাগী শ্রেণীর মধ্যে যেরূপ অপবিত্রতা প্রবেশ করিয়াছে, বল্লভাচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও তদ্রূপ বহুভণ্ডামী এবং অপবিত্রতা বিরাজিত। দেখিলাম, দেবমন্দিরের আরতির সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নরনারী সুসজ্জিত হইয়া আসিতেছে, আর দ্বার উদ্ঘাটিত হইবা মাত্র স্ত্রী-পুরুষ সকলে এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছে পুনরায় তন্মুহূর্ত্তেই অন্য দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, কারণ মন্দির মধ্যে ক্ষণকাল বিলম্ব হইলেই দেব দর্শনকারীদিগকে কোড়ার (চাবুক) আঘাত সহ্য করিতে হয়। সাধারণতঃ এদেশের নরনারীর নীতি-জ্ঞান এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাদৃশ প্রবল নহে—নানা প্রকার কলুষিত উশৃঙ্খলতা ইহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। এ স্থানের নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কলু প্রভৃতি জাতির নরনারীরা মদিরালয়ে যাইয়া প্রকাশ্যভাবে মদ্য পান করিতেও কোন প্রকারের দ্বিধা বোধ করে না।

গুজরাটি রমণীদের কথা।

গুজরাটি মহিলারা দেখিতে প্রায় সকলেই সুন্দরী। ইহারা হিন্দুস্থানী রমণীদের প্রণালী অনুযায়ী সাড়ি পরিধান করে। রঙ্গ করা বস্ত্র ভিন্ন ইহারা পরিধান করে না। ইহাদের কাপড়ের বহিরাবরণের মধ্যেও আরেকটা আবরণ থাকে, বঙ্গ-রমণীগণের মত কখনও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে না। গুজরাটি মহিলাদের কঞ্চুলি বা কাঁচুলী কিছু অদ্ভুত রকমের, ইহাকে বক্ষাবরণ ভিন্ন অন্য নামে ঠিক্ অভিহিত করা যায় না, কারণ পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত রহিয়া এই কাঁচুলী দ্বারা কেবল বক্ষদেশ আবৃত করা হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে পুরুষ হইতে রমণীরাই সর্ব্ব বিষয়ে অধিক দক্ষ। রমণীগণের মধ্যে অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত নাই। গুজরাটী রমণীদের দন্তের বিশেষত্ব আলোচনার যোগ্য। ইহারা দন্তে লোহিত রঙ্ ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহাতে যে কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় বুঝিতে পারি

না, আমাদের চক্ষে কিন্তু উহা বড়ই কদর্য্য দেখায়। শুনিয়াছি কোন কোন গুজরাটি সীমন্তিনীরা নাকি কৃত্রিম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রকৃতি প্রদত্ত দন্তগুলি অবলীলা ক্রমে বিসর্জ্জন দিয়া সুবর্ণ নির্ম্মিত কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যে কি মনোহর শোভাই বিকাশ পায় তাহা আমাদের বোধগম্যই হয় না, পীত দন্তচ্ছটায় কি স্বাভাবিক শ্বেত মুক্তাদন্ত অপেক্ষা অধিক সুষমার বিকাশ করে? দেশ ভেদে রুচি ভেদে সৌন্দর্য্যের যে কত প্রকার মহিমাই প্রকাশ পায় তাহা গৃহ-কোণে আবদ্ধ জীবের পক্ষে উপলব্ধি করা সুকঠিন। আমরা সুরাট সম্বন্ধে আর গুটি কয়েক কথা বলিয়া এ স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

বর্ত্তমান সময়ে সুরাটের জন সংখ্যা ১০৭১৪৯। এইস্থান কার্পাস ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। পূর্ব্বে সুরাট ছিটের ব্যবসায়ের নিমিত্ত সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইউরোপীয় সস্তা ছিটেব আমদানী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা একেবারেই হ্রাস হইয়া গিরাছে, এখন এই নগরে রেস্‌মী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, কিংখাব বয়ন এবং সূচী-শিল্পের খ্যাতি এ স্থান হইতে এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। ধাতব দ্রব্য সমূহের মধ্যে সুরাটের ধারালো যাঁতি বিশেষ সুন্দর ও কর্ম্মোপযোগী।

সুরাটের হিন্দু মুসলমান ও পার্সী প্রভৃতি সমুদয় অধিবাসীবর্গ ই জাঁকজমক প্রিয় এবং আনন্দোল্লাসে সময় কাটাইতে ভালবাসে। নগরের অধিবাসী-বর্গের পানীয় জল সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি বেশ সুন্দর। যদিও সুরাটের অধিবাসী বর্গের প্রায় প্রত্যেকের গৃহেই কূপ আছে, তথাপি ইহাদিগকে প্রায় সকলেরই বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া পানীয় রূপে ব্যবহার করিতে হা অধিকাংশ কূপের জলেই ক্ষার স্বাদ।

এই জন্য সুরাটের প্রতি গৃহেই কূপের ন্যায় বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিবার জন্য এক একটী চৌবাচ্চাও আছে—ধনী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ প্রায় সকলেই বৃষ্টির জল পান করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ বৃষ্টির জল সিমেণ্ট করা ছাদে পতিত হয়, সেখান হইতে ধাতু নির্ম্মিত নলের মধ্য দিয়া চৌবাচ্চায় আসিয়া পতিত হয় এবং পরে পানের উপযুক্ত হইলে তাহাই সারা বৎসর পান করা হইয়া থাকে। যাহাদের এইরূপে পানীয় সংগ্রহের ক্ষমতা থাকে না তাহারা



গুম্ফা মধ্যস্থ সর্ব্ববৃহৎ দেবমন্দির—এলিফেণ্টা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

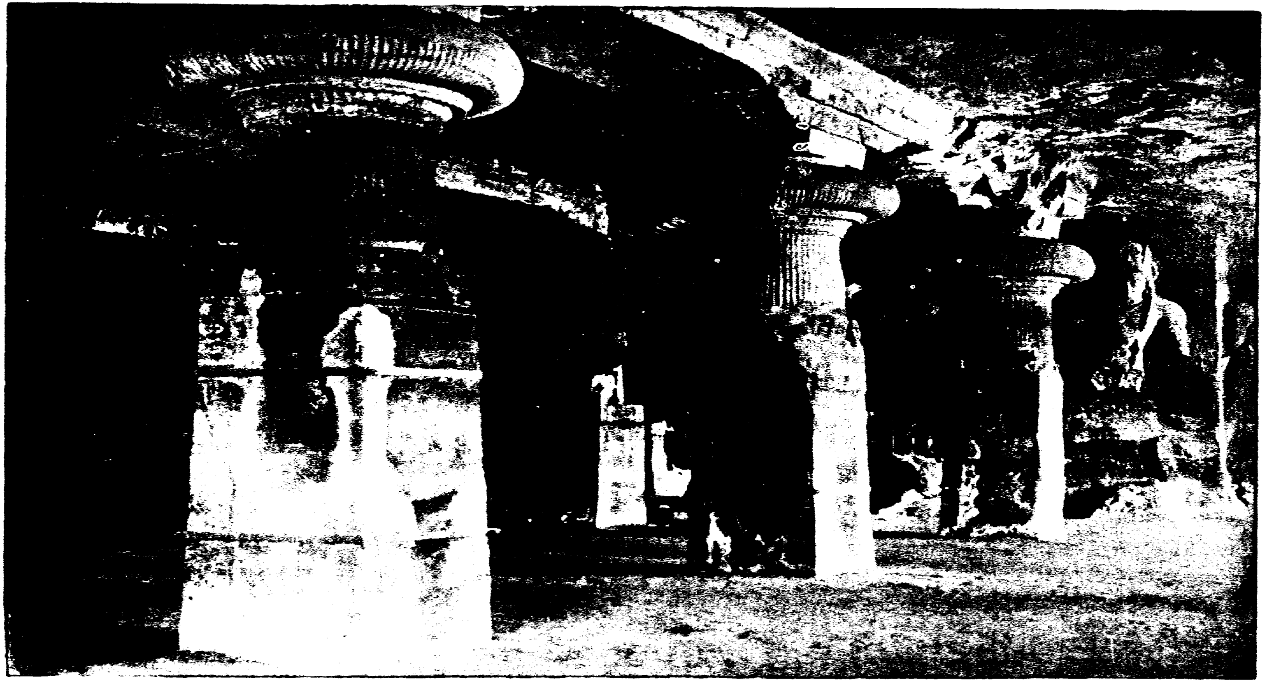
সুরাটের পাদদেশ প্রবাহিতা তপতী কিংবা কোনও ধনাঢ্যের সুমিষ্ট সলিল পূর্ণ কূপ হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পান করে।

১৮৯৬ সালে এই স্থান প্লেগ-দৈত্যের তাণ্ডবনর্ত্তনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। সুরাটের ইংরেজ পল্লীটি বড়ই সুন্দর এবং সেস্থানে ভ্রমণ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। সুরাটে আমরা প্রায় দুই দিবস রহিয়া ভ্রমণের গতি অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলাম।

ভরোচ।

সুরাটের পথে ভরোচ নামক ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া প্রাচীন ভরোচনগরী দর্শন করিয়া লইলাম। ইহা অতি প্রাচীন স্থান। মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ও ইহা ভরুকচ্ছ, ভীরুকচ্ছ, এবং ভরোচ্ছ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিক টলেমি এই ভরুকচ্ছ নগরীকে বারিগজ নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে প্রাচীন কালে এস্থানে ভৃগুমুনির আশ্রম ছিল, পরে ঐ শব্দ অপভ্রংশ হইয়া ভরু হইয়াছে এবং ভৃগুর অধিষ্ঠিত কচ্ছ বা বেলা ভূমি বলিয়া ইহা ভরোচ্ছ বা ভরোচ নাম ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই নগর সমুদ্র ও নর্ম্মদার সঙ্গম স্থানে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এখন সাগর ইহার নিকট হইতে বহুদূরে গিয়া সরিয়া পড়িয়াছে,—এই প্রদেশ ও গুর্জ্জরের অন্তর্গত। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন্‌চয়ঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে এক সময়ে ইহা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের একটী কেন্দ্রস্থল ছিল, তখন এস্থানে ১০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, ১০টি বৌদ্ধ মন্দির ও তিন শত বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। দঙ্গবংশীয়, সেনবংশীয় এবং অনহিল বাড়পতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের রাজত্বের পরে ইহা মুসলমানদের করতলগত হয়; মহারাজ জয়সিংহই নর্ম্মদার স্রোতবেগ হইতে এনগর রক্ষা করিবার জন্য উক্ত নদীর তটভাগে প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, অদ্যাপি স্থানে স্থানে সে প্রাচীন কীর্ত্তি গরিমার চিহ্ন সমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান রাজত্বে এই স্থানের বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, পরে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক এস্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ হইবার পর হইতে ইহার খ্যাতি আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান সময়ে ভরোচনগরী গুর্জ্জরের অন্যতম প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। এ স্থানের লৌহ, কাষ্ঠ, সুপারি, গুড়, কার্পাস বস্ত্র, চাউল ইত্যাদি নানাদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ভরোচনগরী রেবার তটদেশে অবস্থিত। নর্ম্মদাও ইহার নিকট দিয়াই প্রবাহিতা। বর্ত্তমান সময়ে এই নগরী বিশেষ প্রসিদ্ধ



সম্মুখস্থ গুম্ফা—এলিফেণ্টা।

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

ও সমৃদ্ধ। রাজ পথের উভয় পার্শ্বে ধনী পারসীক বণিক্‌গণের ও হিন্দুদের সুন্দর সুন্দর সৌধমালা থাকায় বড়ই সুন্দর দেখায়—সুবিখ্যাত বেগশালিনী নর্ম্মদা নদী ভরোচের কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। এ নগরে হিন্দু ও মুসলমান তীর্থ উভয়ই বিরাজিত আছে। এখানে ভৃগুর আশ্রম, গঙ্গানাথ মহাদেব, অম্বাজী মাতা, পিঙ্গলেশ্বর মহাদেব, বহুচারাজী মাতা প্রভৃতি হিন্দুর প্রায় এগারটি ও মুসলমানের চারিটি তীর্থ বিরাজিত আছে। আমরা একে একে সে সমুদয় তীর্থ স্থানাদি দর্শন করিয়া শান্তিলাভ করিলাম। ভরোচনগরীর সৌন্দর্য্য আমাদিগের হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল। এস্থানে পল্লী ও নগরের সৌন্দর্য্য একত্র গ্রথিত ও বাণিজ্যের কল কোলাহলে নিয়ত মুখরিত। নর্ম্মদার পুলটা দর্শনযোগ্য।

৷

আমরা ভরোচ হইতে কবীর বট দেখিতে চলিলাম। ভরোচ ষ্টেসনের প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী সেখানকার মামলতদার বা মহকুমার হাকিম মহাশয়ের কাছারী অবস্থিত, সেখান হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্যাদি পাইবার আশায় প্রথমে মামলতদারের উদ্দেশেই গো-যানারোহণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—বিদেশী ভ্রমণকারিগণ কোন বিষয়ে সাহায্যপ্রার্থী হইলে সাহায্য করাও স্থানীয় গভর্মেণ্টের আদেশ। আমরাও সেই আশায় আশান্বিত হইয়া মামলতদার মহাশয়ের কাছারীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনৈক চাপরাশিদ্বারা তাহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলাম যে কয়েকজন বাঙ্গালী ভ্রমণকারী তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী। মামলতদার মহাশয় সংবাদ পাওয়ামাত্রই বিশেষ সমাদরের সহিত আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাটীস্থিত দ্বিতলের একটী সুবিস্তৃত কক্ষে লইয়া গিয়া ফরাসে বসিতে বলিলেন। তাঁহার কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে বুঝিয়াছিলাম যে তিনি আমাদের বাঙ্গালী বড় বেশী দেখেন নাই—নানাবিধ প্রশ্নদ্বারা আমাদের পরিচয় লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন চাপরাশি পাঠাইয়া আমাদিগকে দেখাইবার জন্য স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে ডাকাইয়া আনিলেন। মামলতদার মহাশয় বলিলেন যে তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত স্বর্গীয় মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ব্যতীত আর কোনও বাঙ্গালী দেখেন নাই। প্রতাপবাবুর বক্তৃতা শুনিয়া যে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন সে কথা বলিতেও ভুলিলেন না—প্রতাপ বাবুর পরে—আজ আমাদের এই বাঙ্গালী ত্রিমূর্ত্তি দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল। আমরা ব্রাহ্ম কি হিন্দু ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে আমরা গোঁড়া হিন্দু এইরূপ কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল। এখন প্রয়োজনের কথা বলিলাম, কবীর বট দেখিতে আমরা ইচ্ছুক এবং সেখানে যাওয়ার কোনরূপ সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্যই যে তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী তাহাও বলিলাম। মামলতদার মহাশয় তন্মুহূর্ত্তে একজন চাপরাশিকে কি যেন কি উপদেশ দিয়া আমাদিগকে তৎসহ থানায় যাইতে বলিলেন—

আমরাও সুবোধ বালকের মত তাহার অনুসরণ করিলাম। আমরা থানায় পঁহুছিবামাত্র দারোগা মহাশয় একটা চীৎকারে কি বলিয়া হিন্দি ভাষায় বলিলেন "এধার আও।" আমরাও তাহার এ আহ্বানবাণী শুনিয়া পরস্পরে আমাদের মাতৃভাষায় বলিলাম "ভগবান বুঝি হাজতের দৃশ্য দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন।" যাহা হউক "এধার আও" শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমি যাইয়া দারোগা মহাশয়ের টেবিলের অপর পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিলাম—আমার সঙ্গীদ্বয় (আত্মীয় দু'টী) নিকটস্থ একখানা বেঞ্চির উপরে উপবেশন করিলেন। দারোগা মহাশয় প্রথমতঃ আমাকে উপর্য্যুপরি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তাহার এক বিন্দুও বুঝিতে পারিলাম না। তখন তাঁহার কেরাণী একটী পার্সী মোহরেরকে কি বলিলেন, উক্ত পার্সী মোহরেরটি আমার হস্তস্থিত পুস্তকখানা দেখিতে চাহিলেন—আমি দেখিলাম যে সে ব্যক্তি পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া সব লেখা দেখিয়া আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল এবং আমরা কি সাহায্য চাই তাহা জানিতে চাহিল।

নর্ম্মদা তীরে কবীর বট দেখিবার জন্য বাহন চাই এ কথা বলিবামাত্রই দারোগা মহাশয় একজন কনেষ্টবলকে গাড়ী আনিতে পাঠাইলেন। আমি যখন পার্সী মোহরের সঙ্গে হিন্দীতে কথোপকথন করিতেছিলাম তখন দারোগা মহাশয়ও মাঝে মাঝে দু' একটী কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ছিলেন কারণ তিনি হিন্দী চলনসইগোছ জানেন। বেলা প্রায় এগারটার সময় অতি প্রকাণ্ড এক গরুর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল—আমরা গরুর গাড়ীতে প্রায় ২০।২২ মাইল রাস্তা যাতায়াত সুবিধাজনক হইবে না বলিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী আনিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম—অন্ততঃ পক্ষে একখানা সিগ্রাম * হইলেও হয়। দারোগা মহাশয় আমাদের অশ্ব-যানের প্রার্থনা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "আপ্‌লোক গাড্ডা কা ওয়াস্তে বোলা নেই, লানে বোলা হাম গাড়ী মাঙ্গায়া, গাড্ডা হিঁয়া দো একটো হ্যায়, উহা জল্‌দি মিলেগা নেই"। আমরা পরামর্শ করিয়া দেখিলাম যে

* সিগ্রাম এক প্রকার পাল্কী গাড়ীর মত গাড়ী, পাশাপাশি চারিজন বসিতে পারে, অথচ এক ঘোড়ায় টানিয়া নেয়। দ্বিচক্রযুক্ত।

বাদানুবাদে সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা গো-যানে যাওয়াই সঙ্গত। গাড়ীতে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই দারোগা মহাশয় এবং তিন চারিজন মোহরের আসিয়া বিশেষ সৌজন্যতা দেখাইলেন এবং ইচ্ছা করিলে একজন কনেষ্টবলও তাঁহারা সঙ্গে দিতে পারেন এবং আরও কোনরূপ সাহায্য আবশ্যক হইলে তাহাও তাঁহারা করিতে প্রস্তুত। আমরা তাঁহাদের এ সৌজন্যতার জন্য বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গো-যানে কবীর বটাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ভারতের নানা স্থান পর্য্যটনের সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল এই যে—প্রত্যেক স্থানের ভদ্রলোকেরাই ভদ্রতা গুণে ভূষিত এবং বিদেশী ভ্রমণকারীগণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত—যদি এরূপ সাহায্য নানা স্থানে না পাইতাম তাহা হইলে আমাদিগকে কত বিভিন্ন স্থানে কত প্রকার বিপদেই না পড়িতে হইত! আমরা গো-যানে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর পথে একখানা সিগ্রাম দেখিতে পাইয়া উহা ৭৲ টাকায় ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া এবং যৎকিঞ্চিৎ বক্‌সিস দিলাম, সে দারোগার ভয়ে উহা কিছুতেই লইতে চাহিল না,—আমাদের সাধ্য নাই যে তাহাকে বুঝাই যে ইহা আমরা সন্তোষ হইয়া দিতেছি! যা'হক সিগ্রামের চালক মুসলমানটী হিন্দী জানিত—সে আমাদের দ্বিভাষির কাজ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল—তবে সে সন্তুষ্ট চিত্তে সেলাম করিয়া গাড়ী হাঁকাইল।

আমরা বেলা প্রায় তিনটার সময় নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইলাম,—নর্ম্মদা-সলিল প্রবাহের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে কবীর বট বৃক্ষটী বিরাজিত, কাজেই নৌকা ব্যতীত তথায় পঁহুছান অসম্ভব। খুব জোরে বাতাস বহিতেছিল—তাই নর্ম্মদা বক্ষে প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছিল সে জন্য নৌকার মাঝিরা কেহই অত দূরে যাইতে সাহস করিল না,—কোন কোন নৌকার মাঝি আমাদের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া দৌড়িয়া পালাইতেছিল—হায়রে দুর্ভাগ্য—এক ভারতবর্ষের অধিবাসীরাই পরস্পরে পরস্পরকে জানে না। মাঝিরা কিছুতেই যাইতে চাহিতেছে না—কি বিপদ, দূরে নর্ম্মদার দ্বীপস্থিত সেই বৃহৎ বৃক্ষটী দেখা যাইতেছে আর আমরা যাইতে

পারিতেছি না—কি যে মানসিক অশান্তি অনুভব করিতেছিলাম তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। নদীর তীরে যতগুলি নৌকা ছিল সে সকলের মাঝিদের মধ্যে কাহাকেও রাজী করিতে না পারিয়া অবশেষে একটা চরার মত স্থানে কয়েকখানা নৌকা নঙ্গর করিয়া আছে দেখিয়া সে দিকে চলিলাম—কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে কতকটা জল পার হইয়া যাইতে হয়, দেখিবার কৌতূহল প্রবৃত্তির নিকট সমুদয় অসুবিধাই পরাজিত হইল—আমরা বহু কষ্টে কাপড় ভিজাইয়া সে নৌকা-গুলির নিকট পঁহুছিলাম এবং বহু তোষামোদে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়া যাতায়াতের জন্য একখানা নৌকা ঠিক্ করিয়া বৃক্ষটার নিকটে পঁহুছিলাম।

বৃক্ষটার সমীপস্থ হইয়া ইহার বিরাট সৌন্দর্য্য দৃষ্টে আমাদের সমুদয় অশান্তি দূর হইল। মূল বৃক্ষটার উপর হইতে প্রায় চারিশত জট বাহির হইয়াছে—ঠিক্ যেন ইহার নীচে একখানা বিরাট গ্রাম। কথিত আছে যে এই বৃক্ষের নিম্নদেশে দশ সহস্র লোক অক্লেশে বিশ্রাম করিতে পারে। * আমরা চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কি যেন পাছে আবার এখানেই নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকিতে হয় সেজন্য শীঘ্রই নৌকায় আরোহণ করিলাম। আমাদিগকে বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া স্থানীয় দু'চারজন লোক আমাদের নিকট আসিয়া নানা বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছিল, কিন্তু কি করিয়াই বা তাহাদিগকে বুঝাই! হিন্দী, ইংরাজী সব বিষয়েই তাহারা পণ্ডিত। কাজেই বৃক্ষটী সম্বন্ধে স্থানীয় কোন সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না—তবে কিংবদন্তীতে প্রকাশ এই স্থানে সাধু কবীর তাঁহার জীবনের কতকাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার ক্ষীণ দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তীরে উত্তীর্ণ হইয়া সিগ্রামে আরোহণ করিলাম—গাড়োয়ান কাতর কণ্ঠে বলিল "বাবু সাহেব, হামারা বড় কশুর হুয়া, লণ্ঠন ল্যায়া নেই, আন্ধিয়ারা রাত যানে মে বড়া তক্‌লিপ্ হোগে গাড়ীভি গির যায়গে", আমরাও নিরুপায় হইয়া বলিলাম "খোদা যো কিয়া ছো আচ্ছাই কিয়া" সন্ধ্যার পরে রওনা হইলাম। রাস্তার

* * on an island, near Sakaltith is the famous *banian tree* (Kabir wad), So large that there is said to be cover for 10,000 men under it.
Tourist Guide, P. 141.

অধিকাংশ স্থলই ছোট, বড় ও মধ্যমাকৃতির পাথরময়, তাহার উপর গাড়ির চাকা সময় সময় উঠিয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি ক্ষীণ আলোক রেখাও পরিস্ফুট ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল না, কিন্তু অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পদেই গাড়ির চাকা পাথরের উপর উঠিতে লাগিল। সইশ না থাকায় বাধ্য হইয়া আমাদের মধ্যে অবস্থা বিবেচনায় গাড়ির চাকা পাথর হইতে নামাইয়া দিতে লাগিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের তিন জনের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদার জন্যই এক জন নীচে থাকিতে হইত। কোচোমান বেচারা দুঃখ, রাগ, আপশোশ করিত যে তাহার ভাল ঘোড়া বিক্রী করিয়াছে এই ঘোড়াটা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, যে হেতু সে অন্ধকারে রাস্তা দেখিয়া পাথর বাঁচাইয়া চলিতে পারে না! এইরূপ ভাবে রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় ভরে'চ ষ্টেসনে পঁহুছিয়া সেখান হইতে বরদা রওনা হইলাম।

বরদা।

প্রত্যূষে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন দেখিতে পাইলাম চতুর্দ্দিকে তরুণ রবির অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ কিরণরাশি হাসিতেছে—ভোরের পাখীগুলি সুমধুর কলরবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ধীরে ধীরে গাছের পাতা কাঁপাইয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে শান্ত সৌন্দর্য্য পরিব্যক্ত। জগতে যদি কিছু উপভোগ্য থাকে তাহা প্রভাতের ও সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য,—ঊষা যেমন সোণার সাজে সাজিয়া ফুলের মালা গলায় পরিয়া আশাভরা বুকে আইসে—আবার সন্ধ্যা তেমনি ধরণীর দৃশ্যগুলিকে ঢাকিয়া দিয়া আপনার নীল অলকায় কোটি কোটি হীরারমালা পরিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনে ধীর বীজনে শান্তি ও সুখ ঢালিয়া দেয়! উভয়ে কত প্রভেদ, তবু কি সুন্দর! একে আনে আশা, উৎসাহ ও কর্ম্ম তৎপরতা, অপরে আনে শান্তি সুখ ও নীরবতা। যিনি কখন নিবিষ্ট মনে এতদুভয়ের সৌন্দর্য্য তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই এক স্বপ্নময় দেশের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর অশ্ব-শকটারোহণে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বরদা গাইকোয়ারের রাজধানী ও গুজরাটের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। বরদা নগরের বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বে এস্থানে সংক্ষেপে আমরা বরদা রাজ্যের ও যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিলাম, আশাকরি উহা দ্বারা পাঠক সাধারণ এই স্বনাম খ্যাত দেশীয় নৃপতির রাজ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ জ্ঞাত হইবেন।

বরদা রাজ্যের বিবরণ।

প্রাচীন গুর্জ্জর রাজ্যই বর্ত্তমান সময়ে গায়কবাড় রাজের শাসনাধীনে রহিয়া গায়কবাড় রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। যদিও ইহা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সামন্ত রাজ্যভুক্ত নহে তথাপি এই রাজ্যের রাজকীয় কার্য্যাবলী ইত্যাদি ভারত-গভর্মেণ্টের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংলিষ্ট। ইহার ভূ-পরিমান ৮২২৬ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২১৮৫০০৫, তন্মধ্যে হিন্দুই বেশী, ইহা ছাড়া মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, পার্সী এবং অপরাপর জাতিও আছে।

এই রাজ্যের ভূমি সকল অতিশয় উর্ব্বরা, এ বিষয়ে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ বই নিকৃষ্ট নহে। ইতিহাস এবং পুরাণ পাঠে এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে আমরা ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হইতে পারি। সেকালে গুর্জ্জর বীরপ্রসূ ছিল,—একদিন এই প্রদেশের বীর ব্রাহ্মণ তনয়গণই মহম্মদ গজনভীর আক্রমণ হইতে সোমনাথ দেবমন্দির রক্ষার জন্য বিপুল বিক্রমে দুই দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সেদিন এখন সুদূর অতীতের তমসাগর্ভে নিহিত হইয়াছে। সেই গুর্জ্জর এখন ম্রিয়-মাণ,—সে বীরত্ব, সে তেজ, সে দর্প এখন কিছুই নাই। বরদা রাজ্য উত্তর বা কড়ি বিভাগ, বরোদা বিভাগ, নবসারি বিভাগ এবং অমরেলী বিভাগ সাধারণতঃ এই চারি ভাগে বিভক্ত। এই রাজ্যের জেলাগুলি সমতল এবং নর্ম্মদা, তাপ্তী, পূর্ণা, সূর্য্যা, কিম, লুন এবং আরও বহু নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বিনী ইহার বক্ষ ভেদ করিয়া প্রবাহিতা। এখানকার শস্য সমূহের মধ্যে তূলা, তামাক, অহিফেন, ইক্ষু ইত্যাদি প্রধান। অধিবাসিগণ সাধা-রণতঃ চাল, গম, বজরা প্রভৃতি খাইয়াই জীবনধারণ করিয়া থাকে। স্বাধীন নৃপতি বৃন্দের ন্যায় বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই রাজ্যে টাকশাল সংস্থাপিত আছে—বরোদা রাজের নামাঙ্কিত মুদ্রাকে বাদশাহী মুদ্রা কহে। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনাদির নিমিত্ত এবং রাজস্ব ইত্যাদি আদায়ের জন্য এস্থানে সরসুভা, নায়েব সুভা, বহিবতিদার, মহলকার ইত্যাদি নানাবিধ বিভাগ এবং নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। বরদা রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়কে (High Court) বরিষ্ট আদালত কহে। বরোদার মহারাজা গাইকবার নামে পরিচিত, গাইকবার অর্থে গোরক্ষক বুঝায়। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে পূর্ব্বে ইহাঁরা মহারাষ্ট্র ভূপতির গাভী রক্ষক ছিলেন বলিয়াই গাইকোয়ার নাম হইয়াছে, এই অনুমান একেবারে অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বর্ত্তমান মহারাজার নাম His Highness ফরজন্দ ইখাস্ই দৌলৎ ইংলিসিয়া মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর সার্ সয়াজীরাও গায়কবাড় সেনাখাস্ খেল্ সম্সর্ বাহাদুর G. C. S. I.। ইহাঁর ন্যায় সুশিক্ষিত ও স্বদেশ বৎসল নরপতি দেশীয় রাজন্যবৃন্দের মধ্যে অতি বিরল।

ইনি পূর্ব্বে এক দরিদ্র বালক ছিলেন,—ভূতপূর্ব্ব গাইকোয়ার তৎকালীন পলিটিকেল এজেণ্টের বিষনয়নে পতিত হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হ'ন—সে সময়ে ইংরেজ গভর্মেণ্ট তাঁহার দূর সম্পর্কিত এই দরিদ্র বালককে এই সুবৃহ রাজ্যের অধিকার প্রদান করেন। মহারাজা গাইকোয়ার ইংরেজ রাজ্যে গমন করিলে ২১টি তোপ পাইয়া থাকেন।

বরদানগর বিশ্বামিত্র নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত, এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থানীয়। ইহার আয়তন প্রায় তিন শত বর্গ মাইল। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে যে সুপ্রশস্ত রাজপথটি নগরে প্রবেশ করিয়াছে আমরা বরাবর সে পথেই অগ্রসর হইয়াছিলাম, এই রাজপথটি ছাড়া এই নগরের অন্যান্য রাজপথগুলিও বেশ প্রশস্ত। বরদা সহর দুইটি বৃহৎ রাজপথ দ্বারা চারি ভাগে বিভক্ত, নগরের ঠিক্ মধ্যস্থলে বাজারের নিকটে মোগলদিগের সময়ের একটী তিন খিলানী চৌকা দালান আছে—প্রাচীন দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বরোদানগরে ইহাই কেবল মাত্র দ্রষ্টব্য পদার্থ। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্র অধিকারের সময়ে নির্ম্মিত ফতেসিংহের দরবার প্রভৃতি অট্টালিকা প্রাচীন হইলেও ভাস্কর কার্য্যের নিপুণতা প্রযুক্তই হউক কিংবা অন্যরূপ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের জন্যই হউক—ইহার তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই যাহা উল্লেখ যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে কেণ্টনমেণ্ট এক মাইল দূরে অবস্থিত। সেনানিবাসে যাইবার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র নদী ও তাহার শাখার উপর চারিটি সুন্দর সেতু আছে। সেনানিবাসের পাশেই রেসিডেন্সী, রেসিডেন্সী এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট উভয়ই দেখিতে অতিশয় সুন্দর। রেসিডেন্সীতে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট বাস করিয়া থাকেন—রাজ্য-সংক্রান্ত যদি কোনও গুরুতর বিষয়ের আলোচনার দরকার পড়ে, তবে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়।

দ্রষ্টব্য স্থান ইত্যাদি।

মলহর রাও গাইকোয়ারের সময়ই বরোদা নগরীর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। নজরবাদ, মকরপুরা, লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি রাজকীয় প্রাসাদ এবং যমুনাবাই হাসপাতাল, রাজকীয় পুস্তকাগার, জেলখানা, বরোদাকালেজ ও রাজগণের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দেবমন্দিরাদি সমূহের মধ্যে বিট্ঠল মন্দির

নারায়ণ স্বামীর মন্দির, খণ্ডোবা, চারজী, ভীমনাথ, সিদ্ধনাথ, কালিকা, বলাই, রামনাথ, মহাকালী, গণপতি, বলদেবজী এবং কাশীবিশ্বেশ্বরের মন্দির সর্ব্বপ্রধান এবং তাহা প্রত্যেক ভ্রমণকারীরই দর্শন করা উচিত। আমরা বরোদার প্রাচীন রাজবাটী দর্শন করিতে গমন করিলাম, উহা নগরের মধ্য স্থলে বহু স্থান ব্যাপিয়া বিদ্যমান, চতুর্দ্দিকে চারিতলা, ছতলা, সাততলা এইরূপ গগনস্পর্শী অট্টালিকা সমূহ সুশোভিত। ইহাদের প্রত্যেকটির প্রবেশ দ্বারেই সশস্ত্র প্রহরীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই সকল অট্টালিকা গুলি নানাবিধ রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, ইহার কোনটিতে রাজকীয় পারিবারিক দেব মন্দির, কোনটিতে রাজমহিলারা, কোনটিতে শিক্ষাবিভাগ সংক্রান্ত কার্য্যালয়, কোনটিতে রাজস্ববিভাগের কার্য্য, এইরূপ ইহাতে যে কত কার্য্যালয় এবং কত কর্ম্মচারী অবস্থান করে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, বেলা দশ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত এ স্থানে অনবরত জন-কোলাহল শ্রুত হইয়া থাকে, কতলোক যে এখানে আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বৃহত্তম প্রাসাদে প্রবেশ ও প্রস্থানের দ্বারও অসংখ্য। ইহার পরে আমরা রবদারাজের নব নির্ম্মিত লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম, এইরূপ সুন্দর ও সুকল্পিত রাজপ্রাসাদ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কিরূপে ইহার বর্ণনা করিয়া উঠিব তাহা ভাবিয়া ঠিক্ পাই না। এই প্রাসাদটির সম্বন্ধে "Glimpses of India" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের সম্পাদক J. H. Furneaun লিখিয়াছেন "It is a magnificent structure, and is one of the most elegant and sumptuously furnished princely abodes in India." আমরা এই প্রাসাদটি যখন প্রস্তুত প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল তখন ইহা দর্শন করায় অন্দর মহল বাহির দরবার প্রভৃতি সমুদয় অংশই দেখিয়াছিলাম।

যিনি এই অপূর্ব্ব প্রাসাদ কল্পনা করিয়াছেন তাঁহার হৃদয় যে কতদূর কবিত্বময় তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়, স্থাপত্য সৌন্দর্য্যে ইহা অতুলনীয়। দূর হইতেই ইহার মহান্ সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল, বহুক্ষণ প্রাসাদ নিকটস্থ প্রাঙ্গণ ভূমে দাঁড়াইয়া ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য প্রাণ মন ভরিয়া অবলোকন করিলাম, কি সুন্দর গঠন নৈপুণ্য।

বুঝি দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকৃত অমরাবতীর বৈজয়ন্ত ধামের সৌন্দর্য্য ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। এই প্রাসাদ আয়তনেও অত্যন্ত বৃহৎ ইহা নির্ম্মাণ করিতে মহারাজার প্রায় অর্দ্ধ ক্রোড় টাকা ব্যয় হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে একটী প্রকাণ্ড ত্রিতল উচ্চ হল, তাহার পরে প্রাঙ্গণের চারিদিক বেষ্টন করিয়া বহির্ম্মহল, ইহার পর অন্তঃপুর মহল। লক্ষ্মী বিলাস প্রাসাদের প্রায় সমুদয় অংশই সুদৃঢ় লৌহরাশির দ্বারা প্রস্তুত। গৃহাভ্যন্তর এবং আরোহণ করিবার সোপানশ্রেণী অত্যুৎকৃষ্ট মর্ম্মর পাষাণ দ্বারা সুশোভিত, উপরে উঠিবার সময় দর্শকের সমগ্রঅবয়ব স্বচ্ছ মর্ম্মর প্রস্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে। বহির্ম্মহল এবং অন্তপুর মহলের উচ্চতা মধ্যবর্ত্তী হলের সমান—এবং এই তিনটিই ত্রিতল। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী প্রকোষ্ঠ নিচয় প্রত্যেকটি এক একটী ভিন্ন গৃহের মত সুপ্রশস্ত। একটী স্তম্ভ ত্রিতল ভেদ করিয়া গগনমার্গে উঠিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে, উহা প্রায় দ্বাদশ তলা হইবে। এই বৃহৎ রাজপ্রাসাদের সমগ্র প্রকোষ্ঠ গুলি এমন কি প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত অতি সুন্দর কলা বিচিত্রতার সহিত সুবর্ণ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সৌধমালার উপরে স্নানাগার, বিশ্রামাগার, শয়ন মন্দির, ক্রীড়াভবন প্রভৃতি অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত। এই প্রাসাদের নিম্নতলস্থ পুস্তকাগারে সুন্দর সুন্দর আলমারায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, উর্দ্দু, জর্ম্মান, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, পার্সী প্রভৃতি বহু ভাষার বহু পুস্তক সুশোভিত রহিয়াছে। মহারাজা তাঁহার পূর্ব্বতন মহিষী লক্ষ্মী বাইর নামানুসারে ইহার নাম 'লক্ষ্মীবিলাস' বা লক্ষ্মী মহল রাখিয়াছেন। এই রমণী দৈহিক সৌন্দর্য্যে যেরূপ বিখ্যাত ছিলেন মানসিক সৌন্দর্য্য তাহা অপেক্ষাও বেশী ছিল, তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর বিষয় স্মরণ করিয়া এখনও প্রজাগণ অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে। অতি অল্প বয়সেই ইহাঁর সদ্‌গুণাবলীর মধুর সৌরভ চারিদিকে ব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে এতদূর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত যে তাঁহারাও ইহাঁর স্মরণার্থে নগর মধ্যে একটী ঘটিকা স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রমণীয় উদ্যান থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রাসাদে প্রবেশ করিতে হইলে স্বয়ং মহারাজ কিংবা তাঁহার দুই তিনটি

সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহার স্মৃতি সংরক্ষণার্থ এই ইন্দ্রপুরী নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই দেবী তুল্যা লক্ষ্মীবাই এবং তাহার পুত্র ও বর্ত্তমান রাজ্ঞী চিম্নাবাই প্রভৃতির তৈল চিত্রের সহিত মহারাজার ও এক সুবৃহৎ তৈল চিত্র এই প্রাসাদ মধ্যে বিরাজিত আছে।

লক্ষ্মীবিলাস মহল দর্শনান্তে আমরা মহারাজের পল্লী প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম, উহা বরদা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে 'মাখনপুরা' নামক পল্লীতে অবস্থিত। এ স্থানের প্রাসাদটিও অত্যন্ত বৃহৎ। তিনটি অট্টালিকা পাশাপাশি ভাবে নির্ম্মিত, একটী আবৃত রাজপথ দিয়া নূতন অট্টালিকা হইতে প্রাচীন অট্টালিকায় যাইতে হয়। বৈঠকখানা দু'টি এবং নূতন অন্তঃপুরটি অতিশয় সুন্দর রূপে সুসজ্জিত রুচি ও কারাজ্ঞানের পুন পরিচারক। অতঃপর একে একে বরদার অন্যান্য সুন্দর সুন্দর সৌধাবলী দর্শন করিলাম, তন্মধ্যে লেডি ডফরিণ হস্পিটেল, কোর্ট অব জষ্টিস, বরদাষ্টেট লাইব্রেরী, নজরাগ প্রাসাদ, পশুশালা, সেণ্ট্রালজেল, বরদা কলেজ ইত্যাদি দেখিতেও যেরূপ সুন্দর কার্য্যপ্রণালীও সেরূপ মনোহর। মহারাজার নূতন উদ্যানটি দর্শন করিয়াও বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম, উহা দেখিতে বড়ই মনোহর, নগরস্থ ভদ্রপল্লী পরিত্যাগ করিয়া যে রাজপথ বরাবর ষ্টেসনের দিকে চলিয়াছে সে পথ দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই উদ্যানে পঁহুছিতে পারা যায়। উদ্যানটি বেশ বড়, যদিও ইহার মধ্যে নানাজাতিয় সুন্দর সুন্দর পুষ্প-বৃক্ষ-বল্লীরী শোভমানা তথাপি যেন ইহা বর্জ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। বরদানগর হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী অজয় নামক একটী কৃত্রিম হ্রদ আছে, উহা হইতেই বরদার পানীয় জলের সরবরাহ হইয়া থাকে। আর নয় লক্ষ্মী নামক একটী কূপ হইতে পাইপে করিয়া নগরের মতিবাগে এবং নজরবাগে জল আনীত হয়, এই নজরবাগের ফটকের দক্ষিণদিকস্থ একটী ব্যারাকে কয়েকটী স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত কামান আছে, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত কামান বলিয়া ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, লৌহের কামান হইতে ছোট বলিয়া কোন মতেই আমাদের মনে হইল না, সাড়ে তিন মণ করিয়া খাঁটি সোণা আছে, কামানগুলি রজত মণ্ডিত শকটোপরি সুসজ্জিত। বরদা রাজ যখন দিল্লীর

দরবারে গমন করিয়াছিলেন তখন এই কামানগুলি তাঁহার ক্যাম্পের সম্মুখে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এ সমুদয় নাগরিক দর্শনীয় দ্রব্য সমূহ দর্শনান্তে আমরা নগরের অন্যান্য উপকণ্ঠাদি পর্য্যটন করিয়া দর্শন করিলাম। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহাদির মধ্যে কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহই বেশী। নগরের কোন কোন গৃহ তিন চারি তল হইলেও উহা দেখিতে অত্যন্ত কুৎসিৎ দেখায়। নগরে গুজরাটী এবং মারহাটি উভয় শ্রেণীর লোকই বাস করিয়া থাকে। গুজরাটীরা নগর প্রাচীর মধ্যে বাস করে। এই দুই জাতি উভয়ে উভয়কে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। গুজরাটী ব্রাহ্মণ কিংবা জৈন সম্প্রদায় যেরূপ মৎস্য মাংস ভক্ষণ করে না তদ্রূপ মৎস্য মাংস ভোজীগণকেও অত্যন্ত ঘৃণা করে।

সন্ধ্যাকালে যখন সমুদয় দেব মন্দিরের আরতির বাদ্য তালে তালে একটা সুমধুর ঝঙ্কার তুলিয়া ধূসর সান্ধ্য গগন ছাইয়া ফেলিয়াছিল, একটী দুইটি করিয়া তারা আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছিল সে সময়ে আমরা সুরাট গমনাভিলাষী হইয়া ষ্টেসনাভিমুখে গমন করিলাম। বরোদার অনতিদূরে পবনগড় পাহাড় ও প্রাচীন চম্পানি নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এই চম্পানি—প্রাচীনকালে বহু রাজার রাজধানী ছিল, এখনও নাকি উহার নিবিড় জঙ্গলময় অংশে বহু প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা, মস্‌জিদ, কবর প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা উহা দেখিয়া আসিতে পারি নাই।

ষ্টেসনে আমাদিগকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই, কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল, দেখিতে দেখিতে দেব মন্দিরের উচ্চ চূড়া, প্রাসাদমালার—শ্বেত শোভা, অন্ধকারে আপনাকে ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ করিয়া অন্তর্ধান হইয়া গেল। বরদা রাজ্যে কার্পাস জন্মিয়া থাকে, রেলপথের কোথাও কোথাও তাহা দেখিতে পাইয়াছিলাম। বরদার জনসংখ্যা ১১৬,০০০।

আহম্মদাবাদ।

আহম্মদাবাদ গুজরাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর, এবং ইহাই গুর্জ্জর প্রদেশের রাজধানী। শাবরমতী নাম্নী নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনীর বাম পার্শ্বে এই নগর অবস্থিত। নদীবক্ষ হইতে নগরের দৃশ্য অতিশয় রমণীয়। যিনি দূর হইতে প্রাচীন গৌরব বৈভবে পূর্ণ এই নগরের মহান সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছেন, তিনি যে মুগ্ধ হইয়াছেন, এ কথা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। নগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রায় একক্রোশপথব্যাপী উচ্চ প্রাচীর আছে। ১৪১৩ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুজরাটের রাজা আহম্মদশাহ কর্ত্তৃক এই প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আহম্মদনগরের উৎপত্তি সম্পর্কিত ইতিহাস সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, সুলতান্ দাউদ শাহের পুত্র আহম্মদ শাহকে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ফিরোজ শাহ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়িয়া দিবার কিয়দ্দিবস পরে এক দিন তিনি মৃগয়া করিতে করিতে এক পরমরমণীয় স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইতেছে; উহার উভয় তীরে শ্যামল বৃক্ষবল্লরীসমূহ ফল-ফুলে শোভমান; নদীবক্ষে তাহাদের ছায়া প্রতিফলিত হইয়া প্রত্যেক তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে; নানাজাতীয় বিহগনিচয়ের সুমধুর কলধ্বনিতে কাননভূমি মুখরিত। এই স্থানের এইরূপ মনোমোহন সৌন্দর্য্যে সুলতান নিতান্ত বিমোহিত হইলেন, এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি আহম্মদাবাদ বিদর নামক এক সুন্দর নগরের পত্তন ও দুর্গাদির নির্ম্মাণ করিলেন। ইহাই বর্ত্তমান আহম্মদাবাদ।

প্রাচীন ইতিহাস।

প্রাচীন কালে এই নগরেই দময়ন্তীর পিতা বিদর্ভাধিপতি ভীম সেনের রাজধানী ছিল। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আহম্মদ শাহ এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। অতিপূর্ব্বে এই স্থানের নাম অশ্ববল কর্ণাবতী ছিল। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর মোগল সম্রাট্ আকবরের অধিকারভুক্ত হয়। ষোড়শ

ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানের অতিশয় সমৃদ্ধি হয়। সে সময়ে ইহার খ্যাতি বিশেষরূপে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফেরেস্তা-পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, আহম্মদাবাদের উন্নতির সময়ে সে স্থানের প্রায় ৩৬০টি রাজ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই নগর মুনিম খাঁ ও দামাজী গাইকোয়াড়ের অধিকারভুক্ত হয়। ইহারা উভয়ে মিলিয়া কিছু দিন ইহার উপস্বত্বাদি ভোগ করিবার পরে, ১৭:৩ খৃষ্টাব্দে আহম্মদাবাদ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পতিত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ গর্ডন আহম্মদবাদ আক্রমণ করেন; এবং :৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই নগর ইংরাজের অধিকৃত হইয়াছে।

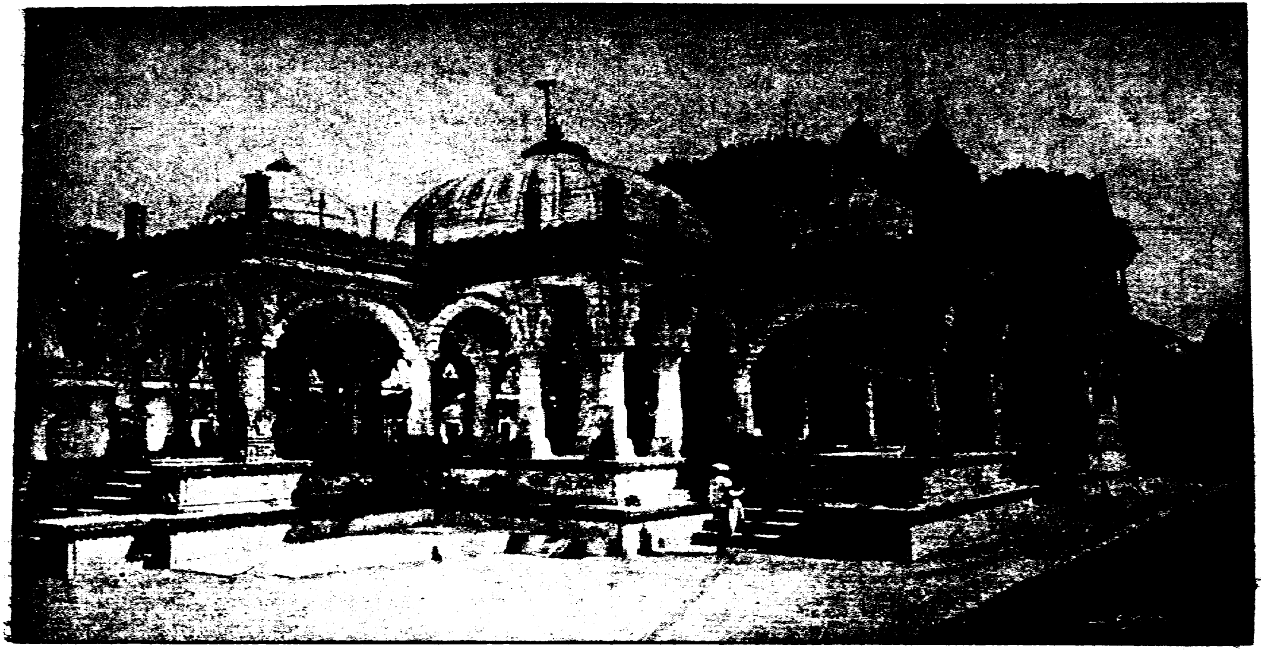
সমস্ত রাত্রি বাসায় নিদ্রার স্নেহময় ক্রোড়ে ক্লান্তি দূর করিয়া পর দিবস প্রত্যূষে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। আমরা নগরের সর্ব্বপ্রধান রাজপথে উপস্থিত হইলাম। উভয় পার্শ্বে অট্টালিকা অপেক্ষা খোলার চালওয়ালা গৃহের সংখ্যাই অধিক। রাজপথে অত্যন্ত জনতা। সকলেই ব্যস্তবাগীশ! ক্রমে আমরা মাণিক চৌক নামক নগরের সুপ্রসিদ্ধ বাজারে আসিয়া উপনীত হইলাম। এ স্থানের ধাঁচী বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয়,—"পাগড়ীর উপরে পাগ্ড়ী, পাগ্ড়ি তদুপরি!" কত লোক আসিতেছে; যাইতেছে; কেহ বস্ত্র কিনিতেছে; কেহ তামাসা দেখিতেছে; কেহ বেড়াইতেছে; কেহ বা মিছামিছি দর দস্তুর করিতেছে। আহম্মদাবাদের-প্রাচীন সমৃদ্ধি বর্ত্তমান সময়েও বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে প্রাচীন জুম্মা মস্জিদ, আহম্মদ শা ও তাঁহার বেগমদিগের সমাধি, দস্তুর খাঁর মস্জিদ (এই মস্জিদটি কুতবউদ্দীনের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল)। মির্জ্জাপুরের রাণীর মস্জিদ, নারায়ণ স্বামীর মন্দির, নয় গজ পীর। নয় জন পীরের কবর এই স্থানে আছে বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। কিন্তু এখানকার সমুদয় দর্শন-যোগ্য সৌধ ইত্যাদির মধ্যে সিপারের মস্জিদ ও কবর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ। এই সকল নগরমধ্যবর্ত্তী দর্শনীয় স্থানসমূহ ব্যতীত আহম্মদা-

বাদের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১২ মাইল স্থানের মধ্যে আরও বহুতর দর্শনীয় ভগ্নাবশেষ আছে। তন্মধ্যে হাতি সিংহের মন্দির, দরিয়া খাঁর কবর, শাহিবাগ, মিয়া খাঁ চিস্তির মস্‌জিদ, অচ্যুত বিবির মস্‌জিদ, দাদাহরির হ্রদ, ভবানীর হ্রদ, চিন্তামনের জৈন মন্দির, হৌজ-ই-কুতবক, কঙ্করিয়াতলাও প্রভৃতি প্রধান। আমরা এই স্থানের প্রধানতম স্পৃহনীয়দর্শন স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। অনেকে এখানকার সিদি সৈয়দের ও মহাফিজ খাঁর মস্‌জিদেরও প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাদের শিল্প নৈপুণ্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল অল্প প্রশংসনীয় নহে। বৈদেশিকগণের নানাবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও আক্রমণ পুনঃপুনঃ সহিয়াও আহম্মদাবাদে যে সমুদয় দর্শনীয় কীর্ত্তি বিশ্বধ্বংসী কালের সহিত যুদ্ধ করিয়া অদ্যাপি জীবিত আছে, সে সকল ভারতের চির গৌরবের ও চির আদরের।

জুম্মা মস্‌জিদ।—এই সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জিদ আহম্মদাবাদের সুবিখ্যাত তিন দরজার সন্নিহিত। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মস্‌জিদসমূহের মধ্যে সৌন্দর্য্যে ইহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসন ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—* * The principal was the Jumma Musjid, which though not remarkable for its size, is one of the most beautiful mosques in the East. (History of Indian and Eastern Architecture by James Fergusson, Page 527) ইহার বাহ্যিক পরিসর ৩৮২ × ২৫৮ ফিট, এবং মূলমস্‌জিদটি দৈর্ঘ্য ২১০ ফিট, এবং প্রস্থে ৯৫ ফিট। ইহার মেজে (ফ্লোর) মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত। ছাতের উপরে শ্রেণীবদ্ধভাবে পঞ্চদশটি অনিন্দ্যসুন্দর গুম্বজ বিরাজিত থাকায় দূর হইতে এই মস্‌জিদের সৌন্দর্য্য সহজেই ভ্রমণকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং নিকটে আসিলে আরও বিশেষরূপে মুগ্ধ হইতে হয়। মধ্যস্থ গুম্বজ তিনটি অপরাপর গুম্বজ অপেক্ষা হইতে বৃহত্তর ও উচ্চতম। ২৬০টি স্তম্ভে মস্‌জিদটি পরিশোভিত।

রাণী সিপ্‌রিরমস্‌জিদ। ইহাকে "আহম্মদাবাদের রত্ন" নামে সর্ব্বসাধারণে অভিহিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃই ইহা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে



হাতীসিংহের মন্দির—আহম্মদাবাদ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মহম্মদ শা বেগুরার (Mahamid Shah Begura) বিধবা পত্নী কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর সৌধাবলীর পর্য্যায়ে ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেও উল্লেখযোগ্য, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। ইহা দ্বারা পাঠকবর্গ সহজেই ইহার কলা-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইহা স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

এতদ্ব্যতীত হাতি সিংহের সমাধি ও অধুনাতনকালে নির্ম্মিত স্বামী নারায়ণের মন্দিরটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের মসজিদ ও অট্টালিকা প্রভৃতির গঠনপ্রণালী অধিকাংশই হিন্দুভাবাপন্ন বলিতে পারা যায়।

কঙ্করিয়া তলাও।—ইহার প্রাচীন নাম হৌজ-ই-কুতব। ইহা গুজরাটের নরপতি সুলতানউদ্দীন কর্ত্তৃক ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে খনিত হইয়াছিল। এই জলাশয়টি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় এক মাইল হইবে। এই সুদীর্ঘ সরোবরের চতুর্দ্দিকে সোপানাবলী বিদ্যমান আছে। সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে। তাহার নাম নাগিনা, অর্থাৎ অঙ্গুরী-মধ্যবর্ত্তী রত্ন। তীর হইতে ঐ দ্বীপে যাইবার একটি সুন্দর তৃণশস্পাবৃত পথ আছে। সরোবরের নির্ম্মল সলিলে বেষ্টিত, কলকাকলীকূজিত, বৃক্ষবল্লরীসমাকীর্ণ এই দ্বীপটি বড়ই সুন্দর। শীতল সমীরণসেবনে ক্লান্ত দেহ সজীবতা লাভ করে। দ্বীপের মধ্য হইতে তীরের শোভা ও অদূরবর্ত্তী নগরের সৌন্দর্য্য নিতান্ত লোচনানন্দ-দায়ক। আমরা বহুক্ষণ এই স্থানে বসিয়া শান্তি লাভ করিলাম। সরোবর-বক্ষে মৃদুপবনস্পর্শে ছোট ছোট ঢেউগুলি উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। পাখীগুলি মনের সুখে গাহিয়া হৃদয়ে শান্তির সুবিমল ধারা ঢালিয়া দিতে-ছিল। কি সুন্দর! হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রীতি অনুভব করিলাম।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়েই আহম্মদাবাদের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তাঁহারাই আহম্মদ শাহ প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণের নির্ম্মিত প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের ধ্বংস করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ গভর্মেণ্টের অধীনে এই নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এ নগরে বহুতর বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, পিঁজরাপোল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে।

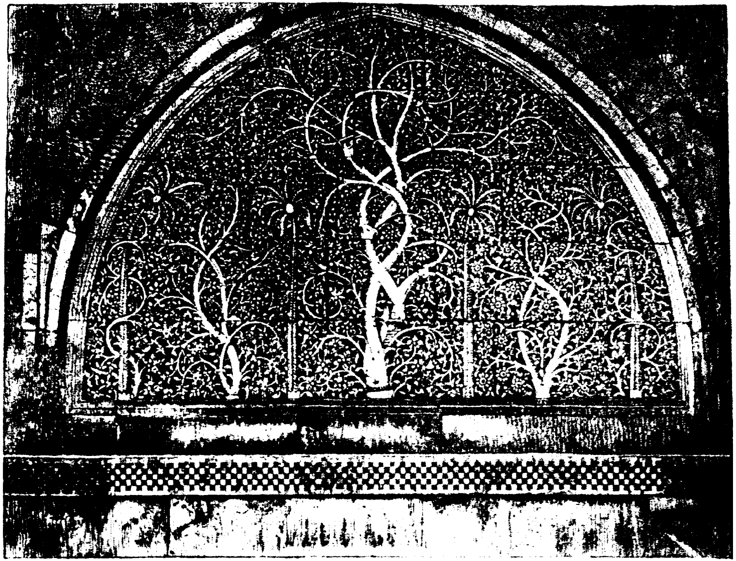
প্রতি বৎসর এখানে বহুতর মেলা হইয়া থাকে। এখানকার সোনা, রূপা ও জরির বুটা দেওয়া বস্ত্রাদি বিশেষ বিখ্যাত। এই নগরে প্রস্তুত কাগজ সমগ্র গুজরাট প্রদেশে, এমন কি, সমস্ত দেশীয় রাজগণের রাজ্যেও আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আহম্মদাবাদ বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। এই জেলার ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা, এবং বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে ইহা একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন কালে আহম্মদাবাদ জেলা সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল;—কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইহা বর্ত্তমান ভূমির আকার ধারণ করিয়াছে।

আমরা এ সকল বিষয়ের আলোচনার অধিকারী নহি। তবে আহম্মদা-বাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিলে ইহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। এ জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে কুনবি, রাজপুত ও কোলিরাই প্রধান। ইহাদিগের মধ্যে আবার কুনবিরা অঞ্জনা, কদাবা ও নেবা, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কুনবিদের মধ্যে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করে। পূর্ব্বে ইহারা কন্যা জন্মিলে তাহাকে হত্যা করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু ১৮৭০ সালে কুনবিদের শিশু-হত্যা-নিবারণের উদ্দেশে একটি আইন প্রবর্ত্তনের পর হইতেই তাহা নিবারিত হইয়াছে।

এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০০০০ লক্ষ। আহম্মদাবাদ, ধোলকা, বীরঙ্গাম, ধোলেরা, ধন্ধুক, গোঘা, পরাণ্ডিজ, মোরাশ ও শানন্দ, এই কয়টি ইহার প্রধান নগর। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহা রেশম ও তুলার নিমিত্তই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আহম্মদাবাদ নগর পরিত্যাগ করিলাম। সে দিন রজনী জ্যোৎস্নাময়ী ছিল। কাজেই রেলপথের উভয় দিকের সৌন্দর্য্য-চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। কোথাও কৌমুদীপরিপ্লাবিত, তৃণগুল্মবিহীন, সুবিস্তৃত প্রান্তরভূমি সমুদ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল; কোথাও শ্যামল শৈলশ্রেণী মাথা তুলিয়া তারা-চন্দ্রবিভূষিত



একটী মস্‌জিদের জানালার কারুকার্য্য—আহম্মদাবাদ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

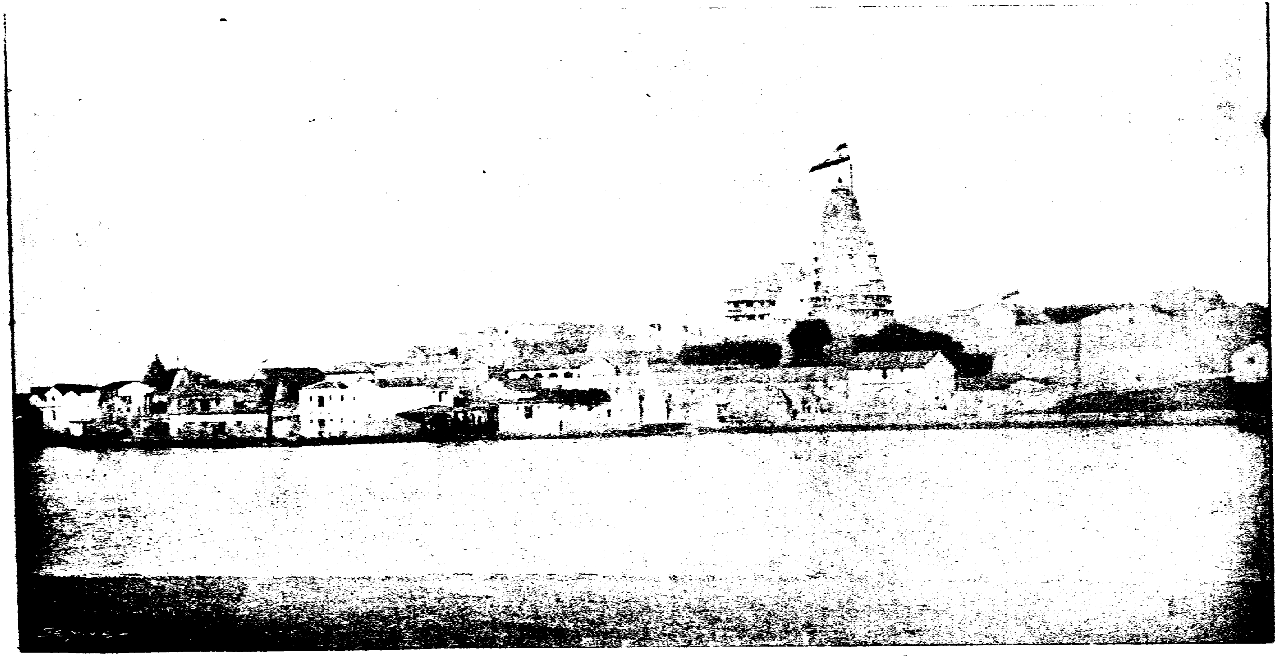
আকাশের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। কোথাও শালবনে সারি সারি শালবৃক্ষসমূহ একটির পর একটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—কোন্ দূর বনে সীমান্তরেখা মিলাইয়া গিয়াছে, তাহা গাড়ী হইতে বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায় না।

জুনাগড়।

আহম্মদাবাদ বা আমেদাবাদ হইতে ভবনগর আসিলাম,—ভবনগরে এক রাজপ্রাসাদ ও সুন্দরবাগ নামক রাজোদ্যানটি ব্যতীত তেমন দর্শনীয় কিছু না থাকায় আর সেখানকার বিস্তারিত বিবরণ দিলাম না, ভবনগর হইতে জুনাগড় আসিলাম, জুনাগড় ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, উহা বোম্বাই বিভাগস্থ কাঠিয়াবারের অন্তর্গত জুনাগড় নামক করদ রাজ্যের প্রধান নগর। এই নগরের অবস্থান বড়ই সুন্দর, গিরিনর এবং দাতার নামক পর্ব্বতের অধিতক্যা প্রদেশে সহরটি অবস্থিত বলিয়া দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়। ভারতবর্ষের মধ্যে সৌন্দর্য্যে এই নগরের নামও বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ধ্বংসাবশেষ গুলি—ইহার অতীত ঐতিহাসিক স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দেয়। জুনাগড় নগরটি প্রাচান ও নূতন এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন অংশটিকে উপারকোট কহে। নগরে প্রবেশ করিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত ও আহারাদির সমুদয় ঠিক্ ঠাক্ করিয়া প্রথমেই আমরা প্রাচীন দুর্গটি দেখিতে গমন করিলাম, উহা বর্ত্তমান সহর হইতে অল্পদূরে অবস্থিত। প্রাচান দুর্গে দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে বৌদ্ধ যুগের কতকগুলি

প্রাচীন দুর্গ।

কৃত্রিম খোদিত গহ্বর বড়ই মনোরম। দুর্গের পরিখার স্থানে স্থানে ঐরূপ কতকগুলি কৃত্রিম গুহা আছে। এখানকার ঘন সন্নিবিষ্ট গুহাগুলি দেখিলে মনে হয় যেন উহা একটী মধুচক্র। এ সকল গুহার মধ্যে খাপ্রাফোড়িয়ার গুহাটি অত্যন্ত সুন্দর, ইহা দৃষ্টে বোধ হয় নিশ্চয়ই পূর্ব্বে এখানে একটী দ্বিতল কিংবা ত্রিতল মঠ ছিল। পাহাড় কাটিয়া এই গুহার অবয়ব গঠিত হইয়াছিল। চূড়ামন বংশীয়গণের রাজত্বকালে তখন একজন নৃপতির দুইটি বালিকা দাসী উপর কোটে যে দুইটি বাপী নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার খাত এখনও বিদ্যমান আছে। প্রাচীন দুর্গের সন্নিকটে একটী মস্‌জিদ দেখিলাম, এই মস্‌জিদটি সুলতান মামুদ বেগ্‌রা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মস্‌জিদটি অক্ষতদেহে বিরাজমান আছে, উহার সন্নিকটে একটী ১৭ ফিট লম্বা কামান দেখিলাম। বহুবার এই দুর্গ শত্রুগণ



দ্বারকার সাধারণ দৃশ্য।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কর্ত্তৃক আক্রমিত হইয়াছে—এবং অনেকবার তাহারা ইহা অধিকার করিয়াছে—সেই বিপদ সময়ে রাজা এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গির্নর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। গির্নর দুর্গ অতিশয় দুরারোহ বলিয়া শত্রুগণ সহজে তাহা অধিকার করিতে পারিত না। বর্ত্তমান সময়ে গভর্মেণ্টের কাছারি এবং বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ইহার নাগরিক সমৃদ্ধি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্ত্তমান সহরের নাম মুস্তফাবাদ। বর্ত্তমান নগরী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে "দামোদর কুণ্ড" নামক একটী পবিত্র তীর্থ আছে—একটী ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণীর নির্ম্মল সলিল রাশিতে ইহা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। এখানে ধর্ম্মশালা থাকায় ভ্রমণকারীগণের অবস্থানের জন্য কোনও রূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। জুনাগড় ও দামোদর কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ে প্রাচীন পুরাতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কিত কতকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল শিলালিপিতে মহারাজা অশোক, স্কন্দগুপ্ত এবং রুদ্রদামার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মধ্যে মান্দোল নগরের জুমামস্জিদ, বামনস্থলীর সূর্য্যকুণ্ড, গিরনারের বোর দেবীর মন্দির, মুসলমান রীত্যানুযায়ী নির্ম্মিত নানাবিধ কারুকার্য্য পরিশোভিত বাহাদুর খাঁজি ও লাড়লি বিবির মুকোর্চার গঠন অত্যন্ত মনোরম। পূর্ব্বে জুনাগড়ে সুদর্শন কুণ্ড নামক একটী তীর্থস্থল বিদ্যমান ছিল—এখান তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জুনাগড় বোম্বাই বিভাগের একটী স্বাস্থ্যকর স্থান, ইহার জল বায়ু উত্তম, এ স্থানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, প্রভৃতি বহু শ্রেণীর লোক বাস করে। আমরা এস্থান হইতে পোড়বন্দর রওয়ানা হইলাম।

দ্বারকা।

আমরা পোড়বন্দর হইয়া দ্বারকা আসিলাম, পোড়বন্দর ক্ষুদ্র সহর, আর তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছুই এখানে নাই বলিয়া আর পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। এ পথের একটু বর্ণনা প্রয়োজন। বোম্বে ডক্ হইতে সেফার্ড কোম্পানীর জাহাজে ২৲ দুই টাকা ভাড়া দিয়া ও দ্বারকা আসিতে পারা যায় বটে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিয়াই ভবনগর ও জুনাগড় হইয়া এ পথে আসিয়াছিলাম। একদিন প্রত্যূষে গো-শকটে পোড়বন্দর হইতে দ্বারকাভিমুখে রওয়ানা হওয়া গেল, দ্বারকা সেখান হইতে চারি দিনের পথ। ঢেকস্ ঢেকস্ করিয়া সেই জনমানবহীন পথ ধরিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পার্ব্বত্য প্রদেশ দুই ধারেই উঁচু নীচু ছোট ছোট উপল বিভূষিত গিরিশ্রেণী বিরাজমান—কোথাও বন্ধুর উপত্যকা—শালবন শ্রেণী, আবার কোথাও বা একদিকে সমুদ্র, ধূ-ধূ-করে মরুময় প্রান্তর জন-মানবের আবাস-ভূমি কোথাও আছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয় না। এ পথে যে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা চিরদিনের নিমিত্ত হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে। প্রখর রৌদ্রের তাপে যখন প্রান্তর ভূমির ভিতর দিয়া গাড়ী চলিত,—তখন উত্তপ্ত বাতাসে ও ধূলির যন্ত্রণায় এবং সর্ব্বোপরি পিপাসায় যেরূপ জলাভাবে কষ্ট পাইতে হইত—তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরকে বুঝান অসম্ভব। এ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে আমরা চার দিনের দিন প্রত্যূষে দ্বারকা নগরীতে উপনীত হইলাম। আমাদিগের গাড়োয়ান প্রতিমুহূর্ত্তেই আমা-দিগকে ডাকাতের হাতে পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বুঝাইয়া দিত, কিন্তু জগদীশ্বরের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে আমরা পথে কোনও রূপ বিপদগ্রস্থ হই নাই। এতদীর্ঘকাল গো-শকটে আর কোথাও ভ্রমণ করি নাই—দ্বারকায় পঁহুছিয়া বড়ই ক্লান্তি অনুভব করিয়াছিলাম। যাঁহারা দ্বারকা দর্শনাভিলাষী তাহাদের সকলকেই আমি বোম্বে হইয়া এখানে আসিতে অনুরোধ করি, নচেৎ এ পথে আসিলে বিশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে।



মন্দিরের পথ—দ্বারকা।

By the Courtsey of Purushottam Visram Mavj

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বর্ত্তমান দ্বারকা ও শ্রীকৃষ্ণের সে দ্বারকাপুরী এক নহে, মুরলীধারী বনমালীর সে সাধের দ্বারকাপুরী এখন সমুদ্র গর্ভে নিহিত। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? এখন এই দ্বারকাই প্রাচীন দ্বারকার প্রতিভূরূপে তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। দ্বারকা, বরোদা রাজ গাইকোবারের অধিকার ভুক্ত, এবং কঠিয়াবাড়ে মধ্যে একটী প্রধান বন্দর ও হিন্দু তীর্থ। ইহা আহম্মদাবাদ নগর হইতে ২৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং বরদা নগরী হইতে ২৭০ মাইল পশ্চিমদিকে অবস্থিত। দ্বারকা নগরীর লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র হইবে, ইহা বরদা রাজ্যের ও খমণ্ডল প্রদেশস্থ বাঘের নামক জেলার প্রধান নগর। এস্থানে বোম্বাই প্রদেশীয় দেশীয় পদাতিক সৈন্য ও ওখমণ্ডল ব্যাটালিয়ন নামে একদল গোরা সৈন্য বাস করিয়া থাকে।

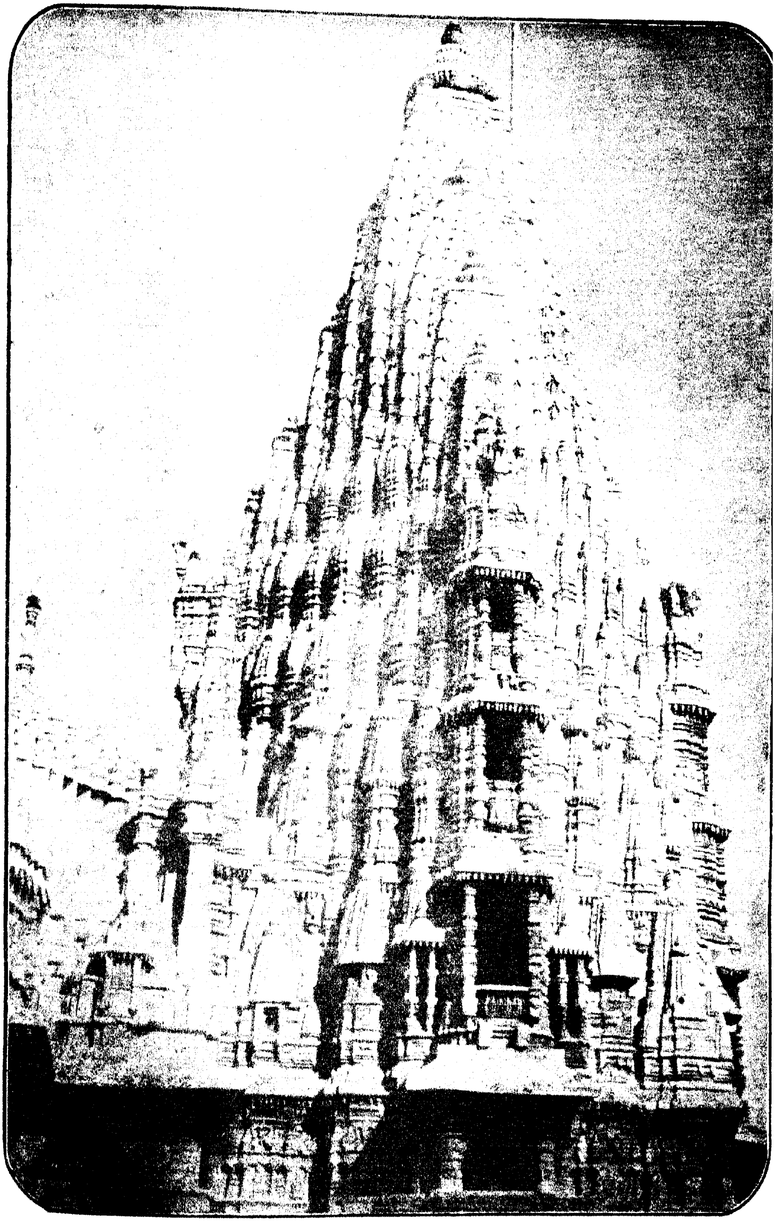
আমরা সারা দিবস বাসায় অবস্থান করিয়া বিশ্রামাদি করতঃ অপরাহ্নে একবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম। ইহা একটী ক্ষুদ্র সহর, দু' একটী রাস্তা ছাড়া অধিকাংশই অপ্রশস্ত। এখানকার প্রধান সৌন্দর্য্য কচ্ছোপ-সাগরের সুনীল সৌন্দর্য্য। সাগর কতবার দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি তবু জানিনা কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণী শক্তিতে উহা আমাকে আকর্ষণ করিয়া ফেলে। কি সুন্দর, কি মহান্! বিশ্বপতির সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে এমনি মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব আছে যে যাহা দেখিয়া মানুষের আশা মিটেনা এবং ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেনা। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার ধূসর আবরণে 'দিবসের রাজকার্য্য সমাপন করিয়া সূর্য্যদেব সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া গেলেন, আমরা ও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে দ্বারকানাথের মন্দির দেখিতে চলিলাম। তীর্থ যাত্রিগণের পক্ষে ইহাই এ স্থানের প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ। কথিত আছে যে দ্বারকায় দ্বারকানাথ দর্শন করিলে এবং সাগর-সঙ্গমে অবগাহন করিলে মানুষের আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। গোমতী নাম্নী স্রোতস্বিনী এস্থানে সাগরের সহিত মিলিত হওয়ায় এস্থানের পবিত্রতা আরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বারকা নগরে প্রতি বৎসর প্রায় দশ সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। দ্বারকানাথের মন্দিরটি পঞ্চতল ও ১০০ একশত ফিট উচ্চ। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে এই সুবৃহৎ মন্দিরটি ঐশ্বরিক শক্তি প্রভাবে

এক রাত্রিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের ঠিক সম্মুখভাগে একটী নাট মন্দির আছে, উহার ছাদ ৬০টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এই নাট মন্দিরের ত্রিকোণাকৃতি চূড়া প্রায় ১৭০ ফিট উঁচু। যাত্রীবৃন্দের প্রদত্ত দক্ষিণা ইত্যাদি হইতে এই মন্দিরের প্রায় দুই সহস্র টাকা বার্ষিক আয় হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মানুসারে দ্বারকা একটী প্রধানতম তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। যাত্রিগণকে দেব দর্শনের পূর্ব্বে গোমতী নদীতে অবগাহণ তর্পণাদি করিয়া লইবার পদ্ধতি আছে, এই স্নান করার পর দ্বারকায় সামন্তগণকে ও পুরোহিতগণকে যথাক্রমে ৪।০ টাকা ও ৩।০ টাকা দর্শনী দিয়া তবে দেব দর্শনে যাইতে হয়। স্নানের পূর্ব্বে বরোদার রাজার কর্ম্মচারীগণ স্নান করিবার জন্য হাতে ম্যাজান্টরের ছাপ দিয়া দেন, নচেৎ গোমতীতে স্নান করা যায় না, ইহাতে ২৲ টাকা করিয়া দিতে লাগে। এখানকার প্রতিমার নাম রণছোড়জী। কথিত আছে যে প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় পুরোহিতেরা মূল প্রতিমা চুরি করিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ঢাকুর নামক স্থানে নিয়া রাখিয়া দেয় তদবধি মূলমূর্ত্তি সেখানেই আছে। দ্বারকার বর্ত্তমান মূর্ত্তি আধুনিক, কারণ প্রথম বিগ্রহ রণছোড়জী দ্বারকা হইতে অপহৃত হইলে যে দ্বিতীয় বিগ্রহ নির্ম্মিত হয় তাহাও নাকি অপহৃত হইয়া একটী খাঁড়ীর অপর তীরে বট দ্বীপ বা শঙ্খের দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

মন্দিরের কথা।

যাত্রিগণ মূল দ্বারকানাথ দর্শনান্তে বটদ্বীপস্থ দ্বারকানাথ দর্শনের জন্যও গমন করিয়া থাকে, সেখানে পহুঁছিয়া প্রত্যেক যাত্রীকে পাঁচটাকা দেবকর দিতে হয়। যাত্রীরা এখানে অবস্থানুযায়ী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ক্রয় করতঃ রণছোড় দেবতাকে প্রদান করিয়া থাকে, পাণ্ডাগণ যাত্রিগণ প্রদত্ত এই পরিচ্ছদ পুনরায় বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলে এইরূপ ভাবে এক পোষাকই একেবারে উহার পঞ্চত্ব পাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া রণছোড়জীর অঙ্গ শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। দ্বারকা নগরীর অপর নাম কুশস্থলী—ইহা পূর্ব্বকালে আনর্ত্তদেশের রাজধানী ছিল, পরে শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। বর্ত্তমান দ্বারকা প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নহে একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সে দ্বারকা



রণছোড়জির মন্দিরের উর্দ্ধাংশ—দ্বারকা।

By the courtsey of Purushottam Visram Mavji.

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

পোড়বন্দরের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র গর্ভে নিহিত আছে বলিয়াই স্থানীয় জনসাধারণে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। দ্বারকার তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণের বাসাবধির পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কারণ মহাভারতের সভাপর্ব্বে ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে যে তীর্থের ইতিহাস শুনাইতেছেন তাহাতেও দ্বারকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'দ্বারকামাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে দ্বারকার উৎপত্তি সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে শয্যাতি নামে এক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বাস করিতেন, তাঁহার উত্তানবর্হি, আনার্ত্ত ও ভূরিসেন নামক তিনটী পুত্র ছিল, রাজার পুত্রত্রয়ের মধ্যে আনর্ত্ত বিশেষ ধার্ম্মিক এবং কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ ছিল সে একদিন পিতাকে বলিয়াছিল যে এ সমস্ত রাজ্য আপনার কিছুই নহে সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের গর্ব্বান্ধ নরপতি শর্য্যাতি পুত্রের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আনর্ত্তকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ আনর্ত্ত পিতার দ্বারা এইরূপে বিতাড়িত হইয়া অবশেষে সমুদ্রকূলে আগমন করতঃ বৈকুণ্ঠ পতিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, ভক্তবৎসল দীননাথ ভক্তের করুণ প্রার্থনায় প্রীত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে শতযোজন ভূমি উৎপাটন করিয়া ভীমনাদী নামক সাগরে সুদর্শন চক্রধারণ পূর্ব্বক তাহার উপরে স্থাপন করাইয়া আনর্ত্তকে বাস করিতে বলিলেন। কৃষ্ণভক্ত আনর্ত্ত সেই ভূমিখণ্ডে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার রেবত নামক পুত্র হইতেই রৈবতক গিরির উৎপত্তি এবং ইহাঁর দ্বারাই কুশস্থলী বা দ্বারাবতী পুরী নির্ম্মিত হয়।

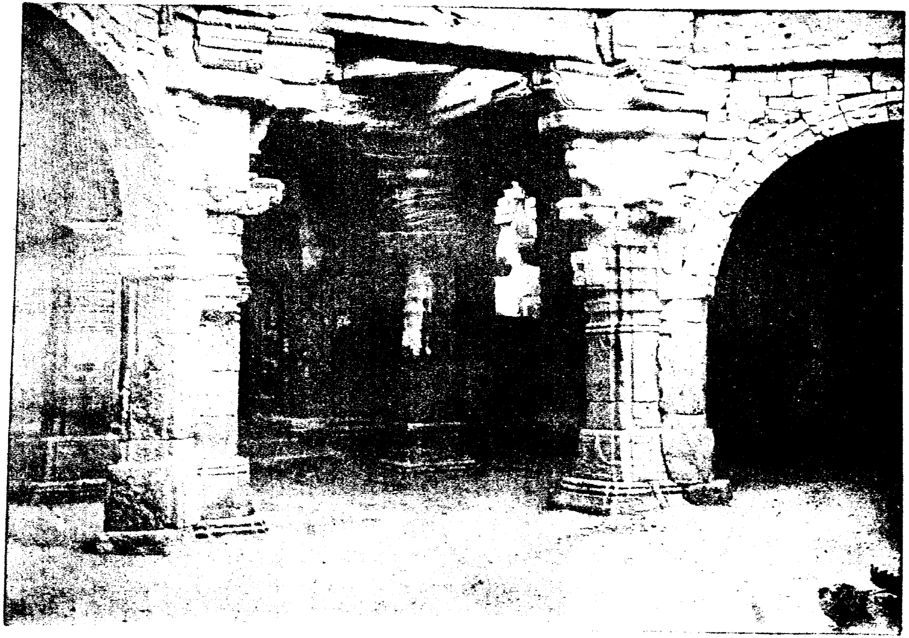
তীর্থ মাহাত্ম্য।

দ্বারকার উৎপত্তি।

দ্বারকার পাণ্ডারা একটী গল্প বলেন যে প্রতিদিন কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটী পক্ষী প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণ সমুদ্র গর্ভে হইতে উত্থিত হইয়া দেবমন্দিরের নিকটে আসে এবং দেবের প্রসাদী তণ্ডুল ভক্ষণ করে দেব সমক্ষে নৃত্যকরে পরিশেষে কিয়ৎকাল মধুর স্বরে গান গাহিয়া গাহিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই পক্ষীর গাত্রবর্ণ ও লক্ষণাদি দৃষ্টে পাণ্ডারা মৌসুম বায়ুর গতি স্থির করিয়া থাকেন। আবুল ফজল 'আইন-ই-আক্‌বরী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বারকানাথের মন্দির ব্যতীত এ স্থানে আরও কয়েকটি দেব মন্দির এবং

গঙ্গা, গোমতীর চক্রতীর্থ, সপ্তকুণ্ড, গো প্রচার প্রভৃতি বিরাজিত আছে। অরমরা নামক স্থানে যাত্রিগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত অভিলষিত অঙ্গে ছাপ লইয়া থাকেন এবং পথে গোপীতালাও নামক পুষ্করিণীর মৃত্তিকায় তিলক রচনা করেন। দ্বারকা নগরে শঙ্কর স্বামী মহারাজের ও একটী মঠ আছে।

দ্বারকা হইতে আমরা প্রভাসের দিকে রওয়ানা হইলাম। দ্বারকার জলবায়ু উত্তম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা মনোরম। আমরা দ্বারকা হইতে একদিন প্রভাস পত্তন দেখিতে গিয়াছিলাম, সেখানে এখন ধ্বংসাবশিষ্ট দু' চারিটি অট্টালিকা ব্যতীত দেখিবার ও বলিবার কিছুই নাই, পাঠক বর্গ চিত্র হইতে তাহার কতকটা আভাস পাইবেন। 'প্রভাস' বলিতে আমাদের হৃদয় মধ্যে যে কবিত্ব পূর্ণ মনোহর ছবি ফুটিয়া উঠে—বর্ত্তমান প্রভাসপত্তনের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে—তাহা হৃদয় মধ্যে আপনা হইতেই লুকাইয়া যায়। আর সেই কতকালের প্রাচীন প্রভাসকে এখনও যৌবনাবস্থায় দর্শন করিবার আশা সেও বিড়ম্বনা নহে কি?



প্রাচীন মন্দিরাভ্যন্তর—প্রভাসপত্তন।

By the Courtesy of Purushottam Visram Mawji.

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

করাচী।

করাচী ভারতের সর্ব্বপশ্চিম প্রদেশ সিন্ধুদেশের একটী নগর। আমরা দ্বারকা হইতে এ স্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম। পথে সমুদ্রে ঝড় হওয়ায় সামুদ্রিক পীড়ায় (Sea Sickness) আমি এবং আমার সঙ্গীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উভয়েই আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কস্ট পাইয়াছিলাম। করাচী উপসাগরের উত্তর তীরে এই নগর অবস্থিত। সমুদ্র তটবর্ত্তী বলিয়া ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোরম, এই নগরে সিন্ধু প্রদেশের সৈনিকাবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। করাচী জেলার ইহাই প্রধান সহর। উক্ত জেলার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল ইহার পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃতি প্রায় ১১০ মাইল হইবে, পরিমাণফল ১৪১১৫ বর্গ মাইল। এই জেলায় সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধু নদ প্রায় ১২৫ মাইল বিস্তৃত, ইহার দক্ষিণাংশে উহা বহুশাখা ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। হাবনামক নদী হইতেও এজেলায় বহু স্থানে জল পাইয়া থাকে। করাচী জেলার অধিবাসিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, তৎপর হিন্দু ও অপরাপরজাতি। হিন্দুর মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং লোহানার সংখ্যাই বেশী, অপরাপর জাতির মধ্যে পারসীক, জৈন, ইহুদী, বৌদ্ধ এমন কি কয়েকজন ব্রাহ্ম ও আছেন। এই জেলা করাচী, সেওয়ান, জিবক, এবং শাহবন্দর এই চারিটি উপবিভাগে বিভক্ত এবং ইহার বন্দর মধ্যে করাচী, কেতি ও শিরগণ্ড (শ্রীগণ্ড) প্রধান।

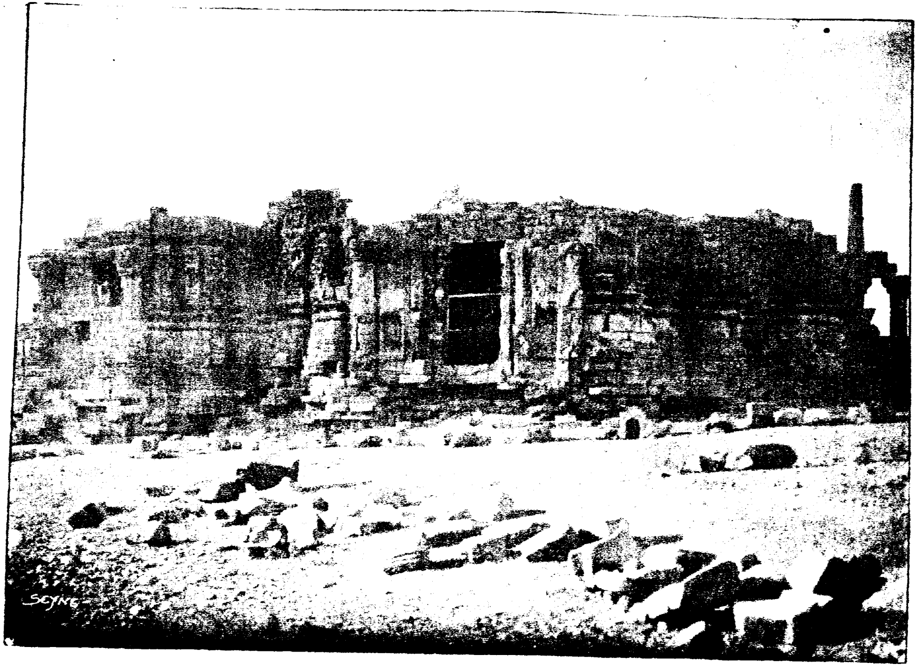
করাচির নামোৎপত্তি সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র ইতিহাস প্রচলিত আছে, বর্ত্তমান সময়ে যেস্থানে হাবনদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতেছে ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে সে স্থানে খড়ক নামে একটী নগর বিদ্যমান ছিল এবং উহা ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতেও সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু কালের বিচিত্রগতি, ক্রমশঃ উক্ত বন্দরে প্রবেশের পথ বালিতে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ধীরে ধীরে ইহার বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি হ্রাস হইতে থাকে সে সময়ে এই বন্দরের অল্প দক্ষিণদিকে 'কলাচিকুন' নামক একটী ক্ষুদ্র সহর বিরাজিত

ছিল, খাড়বন্দরের ব্যবসার হ্রাসের সহিত ইহার ব্যবসায় ও বাণিজ্যের আম্‌দানি রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং চারিদিকে ইহার বাণিজ্য খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, ক্রমশঃ এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয় এবং মস্কট নগর হইতে তোপ আনিয়া উহা সুরক্ষিত করা হয়—এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়। "কলাচি কুন" হইতেই অপভ্রংশ হইয়া পরিশেষে এই বন্দরের নাম করাচি হইয়াছে বলিয়াই এদেশের জনসাধারণের দৃঢ়তর বিশ্বাস।

বর্ত্তমান সময়ে ইহাই সিন্ধু প্রদেশের প্রধান নগর। বোম্বাই হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীমার সপ্তাহে দুইবার করিয়া এখানে আইসে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের আমীর এই নগর ইংরেজ গভর্মেণ্টকে প্রদান করেন। করাচি বন্দরে বহু বড় বড় ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে। করাচি উপসাগরের সৌন্দর্য্য প্রত্যেক ভ্রমণকারীকেই বিশেষরূপে মুগ্ধ করে, এই উপসাগরের এক পার্শ্বে মানোরা অন্তরীপ অবস্থিত। মানোরা অন্তরীপও ক্লিফটন নামক স্বাস্থ্যনিবাসের মধ্যে উপসাগরের বিস্তৃতি প্রায় ৩॥ মাইল হইবে। উপসাগরের প্রবেশ মুখে "ঝিনুক পাহাড়" এবং "কিয়ামারি" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দ্বীপ বিরাজিত আছে—মানোরা অন্তরীপে একটী আলোক স্তম্ভ এবং ক্ষুদ্র দুর্গও দেখিলাম।

করাচিতে দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে নেপিয়ার ব্যারাক, গভর্মেণ্ট ট্রেজারি, ট্রিনিটি চার্চ্চ, মিলিটারি সেনিটেরিয়াম্, সেণ্ট এণ্ডুস স্কচ চার্চ্চ, ফ্রেরি হল আডুলজি দিনসার ডিস্‌পেন্সারি ও আলোকস্তম্ভ ইত্যাদিই প্রধান, এতদ্ব্যতীত তেমন উল্লেখ যোগ্য ও বিস্তারিত বর্ণনার উপযুক্ত কিছুই নাই। করাচি জেলার পণ্যদ্রব্য সমূহের মধ্যে তুলা, গম ও পশুলোম প্রধান। করাচির পশুবাটিকা Zoological garden. কলিকাতার পরেই বিশেষ বিখ্যাত, ইহা ভারতে দ্বিতীয় স্থানীয়। ফ্রেরিহল নামক সুবৃহৎ অট্টালিকাটিও প্রত্যেক ভ্রমণকারীর দর্শন করা উচিত।

করাচী হইতে বাষ্পীয় পোতে বোম্বে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক (ভায়া জব্বলপুর) ডাকগাড়ীতে স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলাম।



প্রভাসপত্তনের ধ্বংসাবশেষ।

By the Courtsey of Purushottam Visram Mavji.

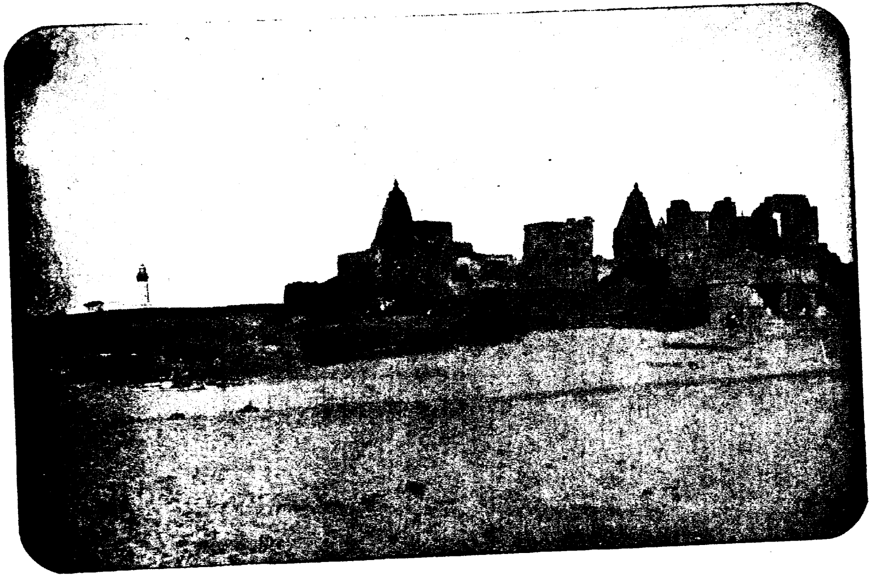
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস কলিকাতা।

জব্বলপুর।

বোম্বাই হইতে আসিবার পথে আমরা জব্বলপুর অবতরণ করি। মধ্য প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুর একটী প্রধান ও সুন্দর নগর। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৪৫৮ ফিট উচ্চ একটী পার্ব্বত্য প্রান্তরে এই সুন্দর নগর বিরাজিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ের সংযোগ স্থল বলিয়া ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিচিত একটী প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন। দূরে নগরের বাহিরে নীলগিরি শ্রেণী বিরাজিত থাকায় এ সহরটিকে বড়ই সুন্দর বোধ হয়। জব্বলপুর সহর অত্যন্ত আধুনিক, ইহার নাগরিক সমৃদ্ধি ইংরেজ রাজের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের একটী পৃথক জেলারূপে পরিণত হইবার পর হইতেই ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। একজন ডেপুটি কমিশনার, সহকারী ও তহশীলদারদের সাহায্যে শাসন-সংরক্ষণাদি কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত, ষ্টেসনে সিগ্‌রাম, টাঙা ও এক্কা যথেষ্ট পাওয়া যায়। সিগ্‌রাম পাল্কী গাড়ীর নামান্তর, টাঙা টমটমের মত এক প্রকার শকট, এক্কার বিষয় কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা ধীরে ধীরে একখানা টাঙা আরোহণে নগরের দিকে অগ্রসর হইলাম, সহরটি সাহেবী ধরণের, সুন্দর সুন্দর বাংলো ও বৃহৎ বৃহৎ সৌধমালায় নাগরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। প্রধান প্রধান বিচারালয় ও আফিস-গুলিও এই সহরেই বিরাজিত। নগরের চতুর্দ্দিকের বহু বড় বড় গর্ত্ত সরোবরের আকারে পরিণত হইয়া বড়ই সুষমা বৃদ্ধি করিয়াছে। ঐ সকল পুকুর বা দীর্ঘিকার চারি তীরে নানারূপ শ্যামল বিটপী শ্রেণী ও সুন্দর সুন্দর ঘাট থাকায় অতিশয় মনোরম বোধ হয়। সহরে একটি সুন্দর সরকারী উদ্যান আছে, উহার নিকট দিয়া নগরে প্রবেশের পথ চলিয়াছে, নগর প্রবেশের সময় গাড়ী হইতেই ঐ রম্য উদ্যানের একটা ছায়া-চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইলাম। একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া আড্ডা গাড়িয়া লওয়া

গেল, জব্বলপুরের শ্বেত মর্ম্মর শৈল ও নর্ম্মদা প্রপাতের দৃশ্য দর্শন করিবার জন্যই আমাদের এখানে অবতরণ করা, কাজেই ঐ দুইটি দৃশ্য দেখিবার জন্য একটা ব্যাকুলতা হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই জাগরিত হইয়াছিল, বহু পর্য্যটনে বন্ধু-বান্ধবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে জব্বলপুরের এ দৃশ্য দুটির মত দৃশ্য আর ভারতে নাই, কাজেই ঔৎসুক্যের পরিমাণটা যে একটু বেশী হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য। বাস্তবিকই জব্বলপুর স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে মধ্যভারতের মধ্যে একটা অতুলনীয় নগর। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ও নাগরিক মাধুর্য্যে ইহা অত্যন্ত মনোহর। জব্বলপুর একটা মিলিটারি ষ্টেশনও বটে, কারণ কিয়দংশ ব্রিটীশ সৈন্য সর্ব্বদাই এ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এ স্থানে ঠগীদিগের প্রধান আড্ডা ছিল, এই দুর্দ্দান্ত নরহত্যাকারিগণ পূর্ব্বে পথিকের মুখে রুমাল পুরিয়া দিয়া শ্বাসরোধ করতঃ নরহত্যা করিত। ইহাদের সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কর্ণেল স্লিম্যান সাহেবের অসীম চেষ্টা ও যত্নে ইহাদের অনেক দল ধৃত হয় ও অত্যাচার দমিত হয়। ঠগীগণ নরহত্যাকে কোনওরূপ দুষ্কার্য্য মনে করিত না, তাহারা ইহাকে ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া মনে করিত। স্লিম্যান সাহেব যে গ্রামে ঠগীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আবদ্ধ করিয়াছিলেন উহা এক্ষণে ঠগীগ্রাম নামে পরিচিত, ঐ গ্রাম দেখিতে হইলে পাশ সংগ্রহের প্রয়োজন। ঠগীদের জন্য জব্বলপুরে একটী শিল্পবিদ্যালয় (Industrial School) স্থাপিত আছে, এই বিদ্যালয়ে ঠগ ও ডাকাত ব্যবসায়ীদিগকে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে তাম্বু ও কার্পেট ইত্যাদি বুনন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে তাহারা সদুপায়ে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। জব্বলপুরের তাম্বু ও কার্পেট ভারতবর্ষে বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৩৫ খ্রীঃ অঃ প্রথম যখন এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন ইহাতে ঠগী ছাত্র সংখ্যা ২৫০০ হইয়াছিল এখন তাহাদের অতি অল্প সংখ্যকই জীবিত আছে। জব্বলপুর সহরের মধ্য দিয়া রেলওয়ে হওয়ায় ইহার ব্যাণিজ্য সমৃদ্ধি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। রেলওয়ে ব্যতীত রাস্তা দিয়াও সিওনি, দামু, মণ্ডলা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিলাতী কাপড়, তণ্ডুল, গোধুম, চিনি, লবণ, দেশী কাপড়, সর্ষপাদি মসলা, ঘৃত, তৈল,



প্রাচীন প্রভাসের পার্শ্ব-দৃশ্য— প্রভাস।

By the Courtesy of Bisharam Mavji (Bombay).

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

লাক্ষা ও কার্পাস প্রভৃতি দ্রব্যাদি রেলওয়ের সহায়তায় আমদানী হয়। নগরের মধ্যস্থানে চতুর্দ্দিকে বহু মন্দির বেষ্টিত একটী বৃহৎ পুস্করিণী আছে। উমতি নামক একটী ছোট সরিৎ নগরের ও কাছারীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় নগরের প্রাকৃতিক শোভা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সদর রাস্তা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গ্রেনাইট পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত গণ্ড (গোন্দ) রাজাদিগের প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত।

পরদিন প্রত্যুষে জব্বলপুর হইতে মর্ম্মর শৈল দেখিতে রওয়ানা হইলাম। সহর হইতে মর্ম্মর শৈল দেখিতে যাইতে হইলে ১২।১৩ মাইল দূরবর্ত্তী 'ভেড়াঘাট' নামক স্থান পর্য্যন্ত শকটারোহণে যাইতে হয়। এ পথের সৌন্দর্য্যও উপভোগ্য বটে,- দুই ধারে গিরিশ্রেণী, নির্জ্জন উপত্যকা, শ্যামল বনশ্রেণী, পাখীদিগের কলতান হৃদয়ে শান্তি-সুধা ঢালিয়া দিতেছিল। আমরা শকটারোহণে নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী "ভেড়াঘাট" নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে পদব্রজেই শৈলোপরি আরোহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কাও বিস্তর আছে। মর্ম্মর শৈলের সৌন্দর্য্য উত্তমরূপে হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে ভেড়াঘাট হইতে নৌকা করিয়া নর্ম্মদার প্রপাত দেখিতে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। জব্বলপুর হইতে ভেড়াঘাট সিগ্‌রাম গাড়ীতে আসিলে ৫।৬ টাকা ও টাঙা করিয়া আসিলে ৩।৪ টাকা এবং এক্কা করিয়া আসিলে টাকা দুই ব্যয় লাগে। ভেড়াঘাট হইতে প্রপাত দেখিতে যাইতে নৌকার ভাড়া দুই টাকার বেশী দিতে হয় না। সরকার হইতেই দর্শকদের জন্য বোটের বন্দোবস্ত করা আছে। নৌকা-রোহণে যাইবার সময় নর্ম্মদার উভয় তীরবর্ত্তী স্বচ্ছদেহ মর্ম্মর শৈলের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য হৃদয় মুগ্ধ করিয়া ফেলে। নর্ম্মদার স্বচ্ছ সলিলপ্রবাহের প্রতিবিম্ব উভয় তটবর্ত্তী পর্ব্বত গাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া আরও দুইটী প্রবাহের মত দেখা যায়, বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া থাকিলে সেই প্রতিবিম্বিত স্রোতধারা দুইটীকেও নর্ম্মদার প্রকৃত স্রোতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। কি সুন্দর দৃশ্য! ঊর্দ্ধে নীল—অতি সুন্দর নীল অনন্ত বিস্তৃত আকাশ, নিম্নে—স্বচ্ছশীতল রজত সলিলা নর্ম্মদা তরঙ্গিণী মর্ম্মর শৈলের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। স্থানে স্থানে উভয় তীরবর্ত্তী গিরি মিলিয়া

গিয়াছে। দূরস্থ নর্ম্মদার বিরাট প্রপাতের অবিরাম ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্ রব কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তন্মধ্যে দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দই যেন সেই সামঞ্জস্যের মধ্যে এক বৈসাদৃশ্য আনিয়া ফেলিতে ছিল। নৌকা ধীর গমনে চলিতেছিল, নর্ম্মদার রজত-শুভ্র সলিল রাশি সূর্য্যের দীপ্তোজ্জ্বল কিরণ রাশিতে ঝিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ক্রমশঃ আমরা প্রপাতের নিকটে আসিয়া পঁহুছিলাম। যেখানে থাকিলে প্রপাতের দৃশ্য সম্যক দেখা যায়, অথচ কোন আশঙ্কা থাকে না, এমন স্থানে নৌকা রাখিয়া আমরা সেই মহান্ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, প্রপাতের দৃশ্য অতুলনীয়, ভারতের আর কোথাও এইরূপ অনির্ব্বচনীয় মহান্ দৃশ্য দেখি নাই। শুনিয়াছি নায়েগ্রার জলপ্রপাত পৃথিবীতে অদ্বিতীয়,—দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই এ জীবনে হইবেও না। কিন্তু নর্ম্মদার প্রপাত দর্শনেই হৃদয়ে সেই বিরাট দৃশ্যের চিত্র অনুভব করিতে পারিলাম। প্রপাতের উর্দ্ধদিকে অল্প দূরে নর্ম্মদার জল স্রোত স্তূপে স্তূপে বাধা পাইতে পাইতে আসিতে আসিতে হঠাৎ একেবারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভীমনাদে প্রায় ত্রিশ হস্ত নিম্নে পতিত হইয়াছে। এ দৃশ্য দেখিবার,—ভাষায় তাহার বিরাট, মহান্, ভয়ঙ্কর অথচ শোভাপূর্ণ ভাব কিছুতেই ফুটাইয়া তোলা যায় না। যে স্থানে বারিরাশি সবেগে পতিত হইতেছে সেখান হইতে স্তম্ভাকারে বাষ্পরাশি উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। চারিদিকের বিজনতা দূর করিয়া ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্ এই গগনভেদী বিরাট শব্দ সত্য সত্যই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় করিয়া দিতেছিল। জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি জড় জগতের অনন্ত শক্তিময় চেতনা এস্থানে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে-হয়

"থর থর কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।"

বর্ষার সময় এ প্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ জলের বৃদ্ধির জন্য প্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থান বহুদূর পর্য্যন্ত জলে প্লাবিত হইয়া পড়ে। এ

অঞ্চলে প্রায় চারি মাস কাল বর্ষা থাকে। শীত ঋতুতে আসিলেই প্রপাতের সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যিনি শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত পূর্ণিমা নিশীথে এ স্থানের কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন তাঁহার সে সৌন্দর্য্য মোহ চিরজীবনেও কাটিবে না। শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে কৌমুদী যখন প্রতিফলিত হইতে থাকে, যখন নর্ম্মদার রজতশুভ্র সলিল মধ্যে আবার তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়—তখন কি যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দৃশ্য নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় তাহা একমাত্র কবি জন উপভোগ্য। জগতের সমুদয় ভুলিয়া গিয়া সেই অনন্ত পুরুষের এ মহান্ চিত্র দেখিতে দেখিতে হৃদয় তন্ময় হইয়া পড়ে। বাস্তবিকই পূর্ণিমালোকে এ দৃশ্য কল্পনাতীত। সেই সময় তরণী বাহিয়া পরিভ্রমণ করিলে সত্য সত্যই বলিতে ইচ্ছা হয়;—

> "জ্যোছনা ঢলে তটিনী জলে কেগো! বাহ তরণী!
> নীরবে ঘুমায় ধরা, বিবশা আপন হারা!
> আকাশে তারা হাসে, ঢলে পড়ে নিশামণি।"

এ স্থানে রাত্রিতে থাকিবারও বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। প্রপাতের কিয়দ্দূরে ছোট পাহাড়ের উপর একটা ডাক বাংলা আছে, ঐ বাংলোর নিকটে কতকগুলি দেবমন্দির ও তাঁহাদের সেবক কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরোহিতাদির গৃহ থাকায় অবস্থানের পক্ষে কোনওরূপ অসুবিধা নাই। ডাকবাংলা সংশ্লিষ্ট একটী ক্ষুদ্র পুস্তকালয় থাকায় একেবারে নির্জ্জন কারাবাস বলিয়াও বোধ হয় না। এ স্থানের সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে এখানে একটা দিন থাকা আবশ্যক। সহর হইতে প্রত্যূষে আহার্য্য সামগ্রী ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া আসিলেই কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সারাদিন ও রাত্রি এখানে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রত্যূষে নগরে ফিরিয়া গেলেই বেশ হয়। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় নর্ম্মদার এই প্রপাত স্থলে আসিলে চারিদিকের ভীষণ স্তব্ধতায় প্রাণ কি যেন এক অজ্ঞাত ভয়ে শঙ্কিত হইয়া ওঠে, কেমন একটা বিজনতা—কেমন একটা নীরবতা—কেমন একটা গম্ভীর উদাস ভাব যে হৃদয়ে আসে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয় জগতে এই নর্ম্মদার উৎক্ষিপ্ত

ফেনিল রজত সলিল রাশি উর্দ্ধে অনন্ত নীল গগন, আর তীরের এই উভয় পার্শ্ববর্ত্তী মর্ম্মর শৈল প্রাচীরের মধ্যেই বুঝি জগতের সীমা আবদ্ধ। একজন ইংরেজ পর্য্যাটক যথার্থই লিখিয়াছেন 'at any hour, speciall... midday, the quietude and the silence of the ... excluded from ... the sights and signs of life ... outer world around—the utter solitude, as if the ... were left alo... with the Nurbudda in her marble... —strike the senses with a sort of awe."* নর্ম্মদা ...তে আসিবার আর একটী সুগম পথ আছে। জব্বলপুর ষ্টেসনের পরবর্ত্তী ষ্টেসনের নাম "সিরাজগঞ্জ" এই সিরাজগঞ্জ ষ্টেসন হইতে মর্ম্মর শৈল মাত্র পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী, তবে একটা কথা এই যে এ পথে ধনবান পর্য্যটকগণের পক্ষে আসাই সুবিধাজনক, কারণ এখানে কোনওরূপ শকটাদি যান বা অশ্বাদি বাহন পাওয়া যায় না, সেজন্য এ স্থানে আসিতে হইলে পূর্ব্ব রাত্রেই জব্বলপুর হইতে এ স্থানে কোন শকটাদি পাঠাইয়া দিয়া পরে বেলা দশটা এগারটার সময় সিরাজগঞ্জে আসিলে অল্প ব্যয়ে, এবং অল্প পরিশ্রমে নর্ম্মদা প্রপাত ও মর্ম্মর শৈল দেখিতে পাওয়া যায়; তবে তাহাতে নদীগর্ভে ভ্রমণের যে সুখ, যে তৃপ্তি, তাহা পাইবার উপায় থাকে না, নগরের জনকোলাহল ক্রমশঃ পশ্চাতে ফেলিয়া নীরবতার মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করাই যেন এই মহান্ সৌন্দর্য্য উপভোগের পক্ষে উপযুক্ত সাধনা বলিয়া মনে হয়। এই অননুভূত আনন্দ উপভোগের জন্য পথ সংক্ষেপ করিয়া দ্রুততার মধ্য দিয়া হঠাৎ মক্ষিকার মত মধুর হ্রদে ডুবিয়া গেলে মধুর রসের মিষ্টতা উপভোগ করা যায় না। যাঁহার শক্তি আছে, ভ্রমণে যিনি আনন্দানুভব করেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এ স্থানের এই নয়ন-মন-মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য দর্শন করা উচিত। জব্বলপুরে আমরা যে জন্য নামিয়াছিলাম, তাহা এইরূপে সফল হইল। মর্ম্মর শৈলের পদধৌত পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার সলিল-প্রবাহে নৌকা বাহিয়া আসিয়া জগতের এক বিশেষ দৃশ্য মহিমাময় জলপ্রপাত—দর্শন করা শেষ

* "Once in a way."

হইল, অনন্তমহিমামণ্ডিত পরম পুরুষের অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টির কবিত্বপূর্ণ দৃশ্যগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা আবার নৌকাযোগে সহরে ফিরিতে পথে সঙ্গীদিগের সঙ্গে কেবল বিস্ময়ের ও তৃপ্তির উপভোগের বিনিময় ব্যতীত আর কোন কথা হইল না। যথাকালে সহরে ...ছলাম এবং আর একদিন অপেক্ষা করি... ...শ ফিরিবার জন্য ...ম।

...! তোমার স্নেহময় ক্রোড় ছাড়িয়া প্রব... ...থক্লেশের মধ্যে ...না ... নানা দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু মা তোমার কোলে যে আরাম, যে শান্তি, যে সুখ পাইতাম তাহা কি কোথাও পাইয়াছি মা! সাধে কি স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া সন্তানেরা তোমার মহিমা গাহিয়া থাকে— সেটা কি কেবলই কবির অতিশয়োক্তি! যদি কেহ দীর্ঘ প্রবাস ও ভ্রমণের ক্লেশ সহিয়া দেশের দিকে ফিরিবার দিন জন্মভূমির কথা স্মরণ করিয়া শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্রতা অনুভব করিয়া থাকেন,—তিনিই আজ আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন!

সম্পূর্ণ।